রূপমঞ্জরী

প্রথম খণ্ড

নারায়ণ সান্যাল

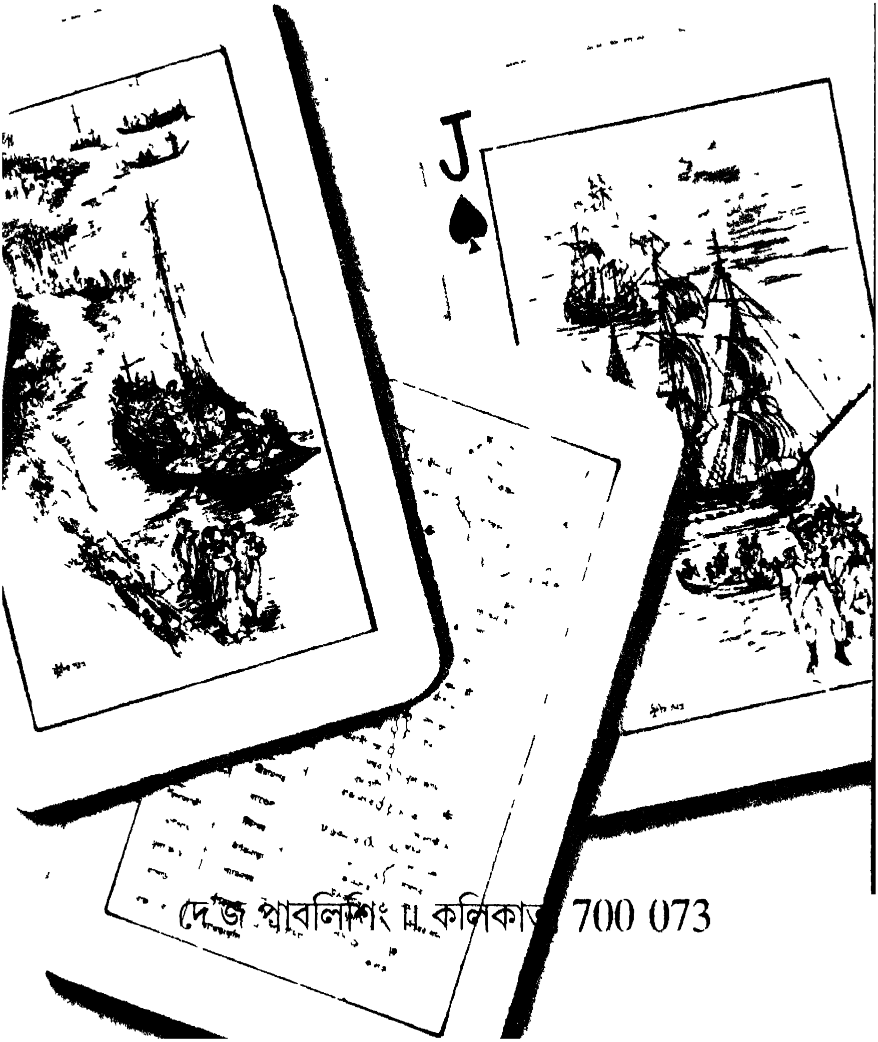

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা 700 073

উৎসর্গ

মহর্ষি

রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত

শ্রীচরণারবিন্দেষু,

রাজানুগ্রহমণ্ডিত নিষ্কর ব্রহ্মত্রা বা বৃত্তি, পণ্ডিতসমাজের উপাধিদানের প্রস্তাব আর ছাত্রদের সম্মানদক্ষিণা বা 'সিধা' তুমি ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করে গিয়েছিলে।

দুশ' বছর স্বর্গবাসের পর তোমার মতটা কি কিছু পালটেছে ?

তাহলে

ধূলিধুসরিত চরণপ্রান্তে এই অর্ঘ্যটি সমর্পণের সৌভাগ্য থেকে আমাকে বঞ্চিত কর না।

শ্রদ্ধাবিনম্র

রূপমঞ্জরীর অগ্রজ :

শিশুসাহিত্য (যুক্তাক্ষর বর্জিত)

হাতি আর হাতি

কিশোর সাহিত্য

কালো-কালো
শার্লক হেবো
কিশোর অমনিবাস
না-মানুষের পাঁচালী
বাস্কেল
না-মানুষের কাহিনী
নাকউঁচু

সদ্য-সাক্ষর সাহিত্য

গ্রাম্যবাস্তু
পরিকল্পিত পরিবার
দশেমিলি

জীবনী ভিত্তিক

আমি নেতাজীকে দেখেছি
আমি বাসবিহাবীকে দেখেছি
লিগুবার্গ
রোদ্যাঁ

গবেষণামূলক

নেতাজী রহস্য সন্ধানে
পয়োমুখম্
গ্রামোন্নয়ন কর্মসহায়িকা
চীনভারত লঙমার্চ
অরিগামি
বাস্তুবিজ্ঞান
গ্রামের বাড়ি

উদ্‌বাস্তু-বিষয়ক সাহিত্য

বকুলতলা পি·এল·ক্যাম্প
বল্মীক
অরণ্যদণ্ডক

ভ্রমণ-ভিত্তিক রচনা

পথের মহাপ্রস্থান
জাপান থেকে ফিরে
দণ্ডকশবরী
ডিজনেল্যাণ্ড

কথাসাহিত্য

ব্রাত্য
মনামী
অন্তর্লীনা
অলক নন্দা
নীলিমায় নীল
সত্যকাম
তাজের স্বপ্ন
পাষণ্ড পণ্ডিত
প্যাবাবোলা স্যাব
আবার যদি ইচ্ছা কব
অশ্লীলতার দায়ে
লালত্রিকোণ
প্রবঞ্চক
পূরবৈয়া
মিলনান্তক

রহস্যরোমাঞ্চ-গোয়েন্দা

নাগচম্পা
সোনার কাঁটা
মাছের কাঁটা
পথের কাঁটা
ঘড়ির কাঁটা
উলের কাঁটা
কুলের কাঁটা
আ আ কখুনেব কাঁটা
সারমেয় গেণ্ডুকের কাঁটা
অচ্ছেদবন্ধন
ছোবল
ছয়তানের খাওয়াল

না-মানুষ ভিত্তিক

গজমুক্তা
তিমি-তিমিঙ্গিল
না-মানুষী বিশ্বকোষ
(অমেরুদণ্ডী)

বিজ্ঞান-ভিত্তিক

বিশ্বাসঘাতক
আজি হতে শতবর্ষ পরে
নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা
অবাক পৃথিবী
হে হংস-বলাকা

স্মৃতিচারণ ধর্মী

পঞ্চাশোর্দ্ধে
ষাট-একষট্টি
আবাব সে এসেছে
ফিবিয়া

শিল্প-ভাস্কর্য-স্থাপত্য

অজন্তা অপরূপা
কারুতীর্থ কলিঙ্গ
ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন
লা-জবাব দেহ্‌লী
অপরূপ আগ্রা

দেবদাসী-সংশ্লিষ্ট

সুতনুকা একটি
দেবদাসীর নাম
সুতনুকা কোন
দেবদাসীর নাম নয়

ঐতিহাসিক উপন্যাস

মহাকালের মন্দির
হংসেশ্বরী
আনন্দস্বরূপিণী
লাডলিবেগম

কৈফিয়ৎ

স্বীকার্য — অষ্টাদশ শতাব্দীর চালচিত্রে একটি বৃহদায়তন উপন্যাস রচনার এই ইচ্ছেটা হঠাৎ কেন জাগল সে-বিষয়ে আপনাদের কৌতূহল হতেই পারে। বিশেষত আজ বছর-দশেক ধরে লেঅনার্দো দ্য ভিঞ্চির বিষয়ে কাগজপত্র, বই ইত্যাদি সংগ্রহ করে চলেছি, নোট রাখছি, কাজে হাত দিতে পারিনি হঠাৎ একটা 'না-মানুষী' দরদ উথলে ওঠায়। সে 'বিশ্বকোষ' ও অসমাপ্ত — শুধু ঐ অমেরুদণ্ডী পর্যায়টুকু পাড়ি দেওয়া গেছে। সেক্ষেত্রে—

কী জানেন? খেয়াল-বেখেয়ালে কোন গানের তান যে ধরে বসবে ঐ 'সাধের লাউ' তা কি বাউল নিজেই আগে-ভাগে টের পায়? আঙুলের সঙ্গে গুবগুবির আঁতাত, কণ্ঠকে গলা মেলাতেই হয়।

শিবনাথ শাস্ত্রী যাকে বলেছেন 'বঙ্গের নবযুগ', পরে যার নাম হয় 'বেঙ্গল রেনেসাঁস', তার উপর যথেষ্ট গবেষণাগ্রন্থ আছে; অগুনতি গবেষক তাঁদের বজ্রমণিশলাকায় সেই সময়-এর অসংখ্য মণিমাণিক্য সমুৎকীর্ণ করে রেখেছেন। তাই সেই সময়ের মালা গাঁথা দুঃসাধ্য হতে পারে, অসাধ্য নয়। সাম্প্রতিককালে বৃহদাকারে সে-চেষ্টা করাও হয়েছে। আমি নৌকাটাকে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে আরও একশ বছর উজানে নিয়ে যেতে চেয়েছি। উনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় প্রাক-রামমোহনের 'সেই তর' যুগের বঙ্গসমাজ তথা গৌড়-সংস্কৃতি গভীর তমসাচ্ছন্ন।

কোন ধারাবাহিক সাহিত্য-সাপ্তাহিকে অথবা দৈনিক পত্রিকার রবিবাসরীয়তে যদি এ রচনা প্রকাশ করা সম্ভবপর হত তাহলে যে-সব তথ্যগত বিচ্যুতি বা 'কালানৌচিত্যদোষ' (অ্যানাক্রনিজম্) আমার অজ্ঞতাবশত রয়ে গেল তার অনেকটাই সংশোধন করা যেত। এ-জাতীয় বৃহৎ কাজে সেটা বাঞ্ছনীয়। তাহলে ধারাবাহিক প্রকাশকালে সতর্ক ও গবেষকমনা পাঠকের হুঁসিয়ারিতে লেখক মার্জনার সুযোগ পায়। উভয় অর্থেই 'মার্জনা'। সম্পাদকের কাছে লেখা সতর্ক পাঠকের চিঠির কল্যাণে গ্রন্থাকারে প্রকাশ কালে সংশোধনগুলি করা চলে এবং লেখক মার্জনা চেয়ে নেবার অবকাশ পায়। দুর্ভাগ্যবশত সে সুযোগ পাইনি।

তবে সজ্ঞানে কিছু কিছু কালানৌচিত্য-দোষ উপেক্ষা করেছি কথাসাহিত্যের অনুরোধে। কথাসাহিত্যিককে এ জাতীয় ছাড়পত্র দিয়ে গেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধে। তাছাড়া স্বীকৃতিতে পাপের কিছুটা স্খালন হয়। তাই এখানে তা লিপিবদ্ধ করে যাই। ঐতিহাসিক চরিত্রের ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় কল্পনার আশ্রয় নিয়েছি তা গ্রন্থমধ্যেই স্বীকার করা গেছে — যেমন ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী রাধার প্রথম সাক্ষাৎ, রামপ্রসাদের বাগানের বেড়াবাঁধা, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পরিবারে সতীদাহ ইত্যাদি। সজ্ঞান কালবিরোধ-দোষগুলি ইতিহাসের সামগ্রিক স্বরূপকে বিন্দুমাত্র কলুষিত করেনি বলেই আমাদের বিশ্বাস। তবে কট্টর ইতিহাসবিদ্‌দের মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে যতদূর মনে পড়ে স্বীকার করে যাই:

1. কাহিনী অনুসারে রূপেন্দ্রনাথ 1742 খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের পর্ণকুটীরে 'বিদ্যাসুন্দর'-এর পাণ্ডুলিপি পড়ছেন; অথচ অধিকাংশ বাঙলা-সাহিত্যের পণ্ডিতদের মতে (ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ ভূদেব চৌধুরী সহ) অন্নদামঙ্গল রচনা শেষ হয়েছিল 1752 খ্রীষ্টাব্দে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে আলিবর্দীর কাছ থেকে মুক্তি পাবার পর স্বপ্নাদেশে কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে 1743 খ্রীষ্টাব্দে কালিকামঙ্গল লিখতে বলেন এবং রচনা সমাপ্ত হয় 1752-53তে। ডঃ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় এবং ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের মতেও 'বিদ্যাসুন্দর' সম্পূর্ণ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে।

2. গবেষকদের মতে নদীয়া কৃষ্ণনগরে 'বারোদোল'-এর মেলার সূচনা পলাশীযুদ্ধের পরবর্তীকালে। শতাব্দীর চতুর্থদশকে তার বর্ণনা: অ্যানাক্রনিজম্।

3. রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যদি 1743 সালে স্বপ্নটা দেখে থাকেন তাহলে তার পূর্ব বৎসর রূপেন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রীপূজা দেখেন কোন সুবাদে?

4. ফরাসী গভর্নর ডুপ্লেক্স (আজ্ঞে হ্যাঁ, উচ্চারণটা ঐভাবেই দেখানো হয়েছে চেম্বার্স বাইওগ্রাফিকাল ডিক্সনারীতে — 'দুপ্লে' বা 'ডুপ্লে' নয়) চন্দননগরে যে বছর প্রথমে আসেন তার পূর্ববৎসর তাঁকে চন্দননগরে দেখানো হয়েছে।
এইসব 'কালানৌচিত্যদোষ'গুলিকে পাত্তা দেওয়া হয়নি। এই অজুহাতে বিদ্যাসুন্দর, বারোদোল, জগদ্ধাত্রীপূজা বা ডুপ্লেক্সকে বাদ দেওয়ার ইচ্ছে হয়নি। ঠিক যে যুক্তিতে 'দ্রবময়ী'র কথাও উপেক্ষা করা যায়নি।

এছাড়া অন্তেবাসী হওয়ায় হাতের কাছে ভালো গ্রন্থাগার ছিল না — তা অবশ্য কোন কালেই ছিল না। কিন্তু যত বয়স বাড়ছে ততই দেখছি ওয়ারেন হেস্টিংস্-এর সেই বেলভেডিয়ার প্রমোদভবনটা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। কালের দূরত্বে নয়, ভৌগোলিক বিচারে। জাতীয় গ্রন্থাগারগামী পাবলিক-বাসের হাতল আরও পিচ্ছিল, পা-দানি আরও সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

সাম্প্রতিককালে বঙ্গসাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস-আশ্রিত যে গ্রন্থটি নানা পুরস্কারে অভিনন্দিত এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তাতে এই চতুর্মাত্রিক বিশ্বপ্রপঞ্চের ঘন জ্যামিতির প্রথম তিনটি মাত্রা ছিল ধ্রুবক; শুধুমাত্র চতুর্থমাত্রাটি ছিল পরিবর্তনশীল: 'সময়'! লেখকের স্বীকৃতিমতে যে তাঁর নায়ক। সেই সময়-এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ছিল শহর-কলকাতার চৌহদ্দী; উচ্চতা — যেহেতু গোবিন্দ মিত্তিরের 'ব্ল্যাক-প্যাগোডা' ধূলিসাৎ — তাই 1828 সালে নির্মিত নেপালজয়-স্মারকের চূড়া। অধমের ক্ষেত্রে শুধু 'সময়' নয়, ভৌগোলিক মাত্রা তিনটিও সর্বদা পরিবর্তনশীল। ডিহি-গোবিন্দপুর-সুতানুটি তখন আঁতুড় ঘরে। তাই এ অধমকে দাবড়ে বেড়াতে হয়েছে তদানীন্তন বৃহত্তর-বঙ্গের — অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের—এ-প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। কখনো বা বঙ্গ-সংস্কৃতির উপনিবেশ — কাশীধাম! পাঠক-পাঠিকা যাতে লেখকের মতো দিশেহারা না হয়ে পড়েন তাই মার্জিনে স্থান-কালের ইঙ্গিত রাখা গেছে।

শেষ কথা: উনবিংশ শতাব্দী সাদায়-কালোয় মেশানো। সে যেন শরৎকালের আকাশ। মেঘরৌদ্রের লুকোচুরি। এদিকে বাইজী-বেড়ালের বিয়ে-বুলবুল-বাবুকালচার, ওদিকে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথের অতন্দ্র সাধনার আশীর্বাদ। তুলনায় বক্ষ্যমাণ ঐতিহাসিক উপন্যাসের 'সেই-তর সময়' নীরন্ধ্র অন্ধকারাচ্ছন্ন শ্রাবণের অমারাত্রি। শুধুমাত্র তথ্যের অপ্রতুলতা নয়, যেটুকু দৃষ্টিগোচর তাও পঙ্কিল, ক্লেদাক্ত, আদ্যন্ত পূতিগন্ধময় পুরীষ! ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল অথবা রামপ্রসাদের বিশুদ্ধ কালীভক্তি সমকালীন গৌড়জনের সঙ্গে সম্পর্কবিমুক্ত। সতীদাহ প্রথাটাকে তখনো কারও আপত্তিকর বলে মনে হয়নি, বিধবাবিবাহ একটা অলীক দিবাস্বপ্ন, কুলীনপাত্রের ধর্মপত্নীর সংখ্যা গুনতি করা হত 'কুড়ি'-র এককে। স্ত্রীশিক্ষা এবং বৈধব্যযোগ বাগর্থের মতো সম্পৃক্ত!

জাতীয় উন্মাদনায় প্রাকস্বাধীনতাকালে সিরাজ বা মহারাজ নন্দকুমারকে আদর্শ নায়ক খাড়া করার প্রচেষ্টা হয়েছিল বটে কিন্তু আজ আমরা বুঝি—তার অনেকটাই ফাঁকা বুলি। তাহলে? এমনটা তো হবার কথা নয়? বিবর্তনের একটি ফল্গুধারা যে থাকতেই হবে। লোকচক্ষুর অন্তরালে কেউ-না-কেউ নদীয়ার সেই প্রেমানন্দে-পাগল বিদ্রোহী পণ্ডিতের পর্ণকুটীর থেকে হোমাগ্নি শিখাটি নিশ্চয় পৌঁছে দিয়েছিলেন রাধানগরের রাজপ্রাসাদে — জ্ঞানগরিমার দার্ঢ্যে সমুন্নতশির নবীন ঋত্বিকের হাতে। উনবিংশ শতাব্দীর সূর্যোদয় যখন প্রত্যক্ষ সত্য তখন কেউ-না-কেউ নিশ্চয় গোপনে করে গেছেন অষ্টাদশ-শতাব্দীর অমানিশায় অতন্দ্র 'রাত্রির তপস্যা'। বুড়ো ইতিহাস কথাটা বে-মালুম ভুলে বসে আছে!

খুঁজতে শুরু করলাম অন্ধকারে হাৎড়ে হাৎড়ে। একটি অলোকসামান্য ঐতিহাসিক নায়কোচিত চরিত্রকে খুঁজেও পেলাম। উনবিংশ শতাব্দীর কালীপ্রসন্ন সিংহ শুধু নয়, বীরসিংহের সিংহশিশুর

পাশাপাশিও তাঁকে বেমানান লাগত না—কী পাণ্ডিত্যে, কী সরলতায়, কী চারিত্রিক দার্ঢ্যে! কিন্তু পরে মনে হল — যে বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁকে আদর্শ নায়ক করে অষ্টাদশ শতাব্দীকে কব্জা করতে চাইছি, সেই 'গুণ'টাই তাঁর 'দোষ'! তাঁর কোন প্রামাণিক জীবনী নেই। 'বাঙালী চরিতাভিধান'-এর পণ্ডিতেরা না খুঁজে পেয়েছেন তাঁর জন্ম তারিখ, না তিরোধান দিবস! ওমা, সেকি! কেন? সমকালীন পণ্ডিতদের বিস্তারিত পরিচয় সমন্বিত একাধিক পুথি তো আছে? হ্যাঁ তা আছে। তিন-গোষ্ঠিভুক্ত দলেরই: নবদ্বীপকেন্দ্রিক, ভাটপাড়াকেন্দ্রিক এবং ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম কেন্দ্রিক। নেই শুধু সেই অন্তেবাসী, অসামাজিক, অরণ্যচারীর পরিচয়! সঙ্গত হেতুতে। সেই আত্মাভিমানী পণ্ডিত সমকালীন মহামহোপাধ্যায়দের পদাঙ্ক অনুসরণে — নবদ্বীপের জ্যোতিষ্ক শঙ্কর তর্কবাগীশ থেকে ত্রিবেণীর ক্ষণজন্মা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মতো — 'লাঙ্গুলহীন শৃগাল' হতে স্বীকৃত হননি! মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং উপযাচক হয়ে তাঁর পর্ণকুটীরে এসেছিলেন বৃত্তিদানের প্রস্তাব নিয়ে, রাজানুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করে তিন্তিড়ি-পত্রপ্রেমী সেই আজীবন অরণ্যচারী ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে রইলেন: 'বুনো' রামনাথ নামে!

ইতিহাস রচনা করে রাজার বেতনভুক্ত একডালে-বসা 'হুম-সব-পক্ষী'। ইদানীং যেমন রাজনৈতিক দলের পার্টি-ফান্ড অথবা বৃহৎ পত্রিকা-গোষ্ঠীর অর্থানুকূল্যে সাহিত্যের বিচার-সমালোচনা-ইতিহাস রচিত হয়, সে-কালেও তাই হত। যুগে-যুগে একডালে-বসা একই রঙের পালকধারী পার্শ্ববর্তীর কর্ণকুহরে গেয়ে চলে, "তোর গানে পেঁচি রে/সব ভুলে গেছি রে!"

ঐ 'বুনো বামুনের' নামটা ইতিহাসের পাতা থেকে একেবারে মুছে ফেলা যায়নি। উপায় কী? কিছু কিছু তথ্য যে চাপা দেওয়া যায় না। যেমন রাজা নবকৃষ্ণের সেই 'আন্তর্জাতিক' বিচারসভার ইতিবৃত্তটা! ভারতজয়ী দক্ষিণ ভারতের পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করতে সবাই যখন অধোবদন — মায়, নবদ্বীপের শঙ্কর তর্কবাগীশ, শান্তিপুরের গোস্বামীপাদ রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি, এমনকি ত্রিবেণীর সেই 'শতাব্দীর-শ্রেষ্ঠ-পণ্ডিত' জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন স্বয়ং, তখন গৌড়দেশকে ভরাডুবি হতে রক্ষা করতে বিচারসভায় উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ঐ অন্তেবাসী 'বুনো' রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত! দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত পরাজয় স্বীকার করে ফিরে গেলেন দাক্ষিণাত্যে, চীরধারী চির-অপরাজেয় 'বুনো'-পণ্ডিত ফিরে গেলেন বনে।

তথ্যের অপ্রতুলতাজনিত কারণে ইতিহাসে উপেক্ষিত সেই অন্তেবাসী এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের নায়ক হবার অনুপযুক্ত।

না! ভুল হল! বরং বলা উচিত: অর্থলোভী, যশোলোভী বিংশ শতাব্দীর কোনও শহুরে কথাসাহিত্যিক তাঁকে নায়করূপে লাভ করার অনুপযুক্ত!

অনুসন্ধানকার্যে ক্ষান্ত হইনি তা বলে।

খুঁজতে-খুঁজতে-খুঁজতে অবশেষে হাতে এল চব্বিশ-পৃষ্ঠার একটি চটি বই। ক্ষুদ্র, কিন্তু প্রামাণিক। প্রকাশক: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। লেখক: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যসাধক চরিতমালার উননব্বইতম পুস্তিকাটি: *চতুষ্পাঠীর যুগে বিদুষী মহিলা*।

তিনজন অসামান্যা বিদুষীর কথা লিখে গেছেন গবেষক: হটী বিদ্যালঙ্কার (1743?-1810), হটু বিদ্যালঙ্কার (1775?-1875?) এবং দ্রবময়ী (1837?-?)

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। যা খুঁজছি এতদিন। নায়ক নয়, নায়িকা।

তৃতীয়জন উনবিংশ শতাব্দীর; কিন্তু প্রথম দুজনের জীবনের অনেকটাই অষ্টাদশ শতাব্দীর। দুজনেরই আদি নিবাস বর্ধমানভুক্তিতে। হটীর পিতৃপরিচয় জানা যায় না। জন্ম: সোঞাই, বর্ধমান। পিতার কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণাদি শেখেন। বিধবা হবার পর তাঁর পিতৃদেব তাঁকে সহমরণে যেতে দেননি। পিতৃবিয়োগের পরে তিনি কাশীধামে চলে যান, সেখানে স্মৃতি, ব্যাকরণ ও নব্যন্যায় অধ্যয়ন করে অসাধারণ জ্ঞানার্জন করেন। কাশীর পণ্ডিত সমাজ তাঁকে 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধি দান করেন। সেখানেই চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতেন, প্রকাশ্যে পণ্ডিতসভায় তর্কাদিতে যোগ দিতেন এবং চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতদের মতো দক্ষিণা গ্রহণ করতেন।

অপরপক্ষে হটু বিদ্যালঙ্কার, ওরফে 'রূপমঞ্জরী' হটী অপেক্ষা প্রায় তিন দশকের অনুজা। জন্ম: কলাইঝুটি, বর্ধমান। পিতা পরমবৈষ্ণব নারায়ণ দাস। কন্যার অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধার পরিচয় লাভ করে তিনি প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় আত্মজার বাল্যবিবাহ দিতে অস্বীকার করেন। পরিবর্তে তাঁকে নানা বিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলেন — ব্যাকরণ, সাহিত্য, নব্যন্যায় এবং চিকিৎসাবিদ্যা। রূপমঞ্জরী পরে সরগ্রামনিবাসী আচার্য গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কারের কাছে সাহিত্য এবং চরক, সুশ্রুত, নিদান ইত্যাদি জটিল চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইনি চিরকুমারী। আশ্চর্যের কথা, ইনি পুরুষদের মতো মস্তক-মুণ্ডন, শিখাধারণ এবং উত্তরীয় পরিধান করতেন।

এই দুজন অলোকসামান্য মহিলার পূর্ণ পরিচয় পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা গেছে, যাতে ঐ দুই অসামান্যার বাস্তবজীবনের উপাদানের মিশ্রণে এই বিংশশতাব্দীর নারায়ণদাসের মানসকন্যার জীবনীটা আপনাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়! বিশ্বাস করা শক্ত বই কি! রাজা রামমোহন যখন হামাগুড়ি দিতে শেখেননি তখন কোন পিতৃহীন বালবিধবা চিতাভ্রষ্টা বারাণসীধামে 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধি নিয়ে বিচারসভায় পুরুষদের সঙ্গে তর্ক করছেন, লেখকের কল্পনায় নয়, বাস্তবে — এটা সহজে মেনে নেওয়া কঠিন! কিংবা রামমোহনের প্রায় সমবয়সী একটি বাঙালী মহিলা পুরুষের বেশে স্বগ্রামে নরনারী নির্বিশেষে চিকিৎসা করছেন, ছাত্রদের চিকিৎসাবিদ্যা শেখাচ্ছেন এ কি সহজে বিশ্বাসযোগ্য?

না! 'রূপমঞ্জরী'র নায়ক 'সময়' নয়।

কারণ গোটা অষ্টাদশ-শতাব্দীব্যাপী মহাকাল এ গৌড়দেশে বড় একদেশদর্শী! শতাব্দীর শুরু থেকে দক্ষিণাঞ্চলে মগ-আরাকান-পর্তুগীজ বোম্বেটের অত্যাচার, তার পরেই বর্গীর হাঙ্গামা; মিটতে-না-মিটতেই পলাশীপ্রান্তরে যৌথ বিশ্বাসঘাতকতা! এরপর ক্রমান্বয়ে মীরজাফর-রেজা খাঁ-দেবীলালের নির্মম শোষণ; ওদিকে বেনিয়া ইংরাজের রাজ্যলাভে শেষ হয়ে গেল বাঙলার তাঁতশিল্প, কুটির-শিল্প, লবণের ব্যবসা। অনিবার্য ফল: ছিয়াত্তরের মন্বন্তর!

'সুসময়' আদৌ এল না সেই-তর গোটা শতাব্দীতে, সবটাই — 'দুঃসময়'!

তাই আমার কাহিনীর নায়ক সেই নিঃসঙ্গ ক্লান্ত বিহঙ্গটি যে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বাস রেখেছিল: 'আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ অঙ্গন!'

তাঁকে খুঁজে পেয়েছি একই চিন্তাসূত্রে। রাজা রামমোহন যদি স্বয়ম্ভূ লিঙ্গের মতো অলৌকিক ক্ষমতায় গজিয়ে উঠতে না পারেন, তাহলে হটী বা হটু বিদ্যালঙ্কারও তা পারেন না। পারে না আমার মানসকন্যাও। তাঁদেরও প্রয়োজন এক-একজন পূর্বসূরী। শিক্ষা, দীক্ষা, প্রতিটি রক্তকণিকার প্রতিটি 'জীন'-এ চাই সেই পূর্বসূরীর আশীর্বাদ। বাস্তব রূপমঞ্জরীর পিতৃদেব অষ্টাদশ শতাব্দীর নারায়ণ দাস ছিলেন পরম বৈষ্ণব। কিন্তু সেই তৃণাদপি সুনীচকে দেখা গেল কূপমণ্ডূক সমাজের বিরুদ্ধে বজ্রাদপি কঠোর হতে। হটীর পিতৃদেবের নামটা মনে করে রাখতে পারেনি বুড়ো ইতিহাস। তবে এটুকু তার স্মরণে আছে — সমাজপতিদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে তিনি আত্মজার অক্ষর-পরিচয় করিয়েছিলেন, সহমরণের চিতা থেকে নাবালিকাকে হাত ধরে টেনে নামিয়ে এনেছিলেন।

সেই অজ্ঞাতনামা বজ্রাদপি কঠোর টুলো পণ্ডিতই আমার উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র।

এ-গ্রন্থ রচনার সময় নানাভাবে তথ্য সরবরাহ করে আমাকে সাহায্য করেছেন ব্যারাকপুর নিবাসী চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, সুবর্ণরেখা প্রকাশনীর ইন্দ্রনাথ মজুমদার, জাতীয় গ্রন্থাগারের অপর্ণা বসু। প্রয়োজন মতো গ্রন্থ সরবরাহ করে কৃতজ্ঞতা পাশে বেঁধেছেন প্রকাশক-মহলের সুধাংশুকুমার দে, প্রসূন বসু এবং বামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

পাণ্ডুলিপি পাঠ করে নানা পরামর্শে গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে আমাকে সাহায্যে করেছে দুজন — দে'জ প্রকাশনীর সুবীর ভট্টাচার্য এবং ভাগিনেয় সুবাস মৈত্র। তাদের দুজনের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

শিল্পী সুধীর মৈত্র অলঙ্করণের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত করেছেন। আশা হয়েছে — লেখার গুণে আকৃষ্ট না হলেও রেখার আকর্ষণে এ-বই পাতা উল্টে দেখতে হবে। আলোকচিত্রগুলি কোথা থেকে সংগৃহীত সে বিষয়ে গ্রন্থ-শেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা গেছে।

সবশেষে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনাদের কাছে। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি আপনাদের কথাই বলছি — আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং/অথবা শ্রদ্ধেয় পাঠক-পাঠিকার কাছে। কী জানেন? এই 'কৈফিয়ৎ'টি লিখবার সময়েই হঠাৎ আপনাদের কথা মনে পড়েছে। গ্রন্থরচনাকালে সারাক্ষণ আমার মানসচক্ষে উপস্থিত ছিল আমার দিদিভাইয়েরা—'সমবয়সী' হওয়ার সুবাদে যেসব নাতনিদের সঙ্গে আমার কোন জেনারেশান-গ্যাপ্' নেই। আপনারা অনুমতি দিলে সব শেষে তাদের সঙ্গে জনান্তিক আলাপচারীটুকু সেরে নিতে পারি:

* * *

—তো, যে-কথা বলছিলাম, দিদিভাই: ওটা, তোমাদের ভুল ধারণা। নারীমুক্তি বল, স্ত্রী-স্বাধীনতা অথবা 'উইমেন্স লিব' — তোমরা নতুন কিছুই করছ না। এ লড়াই আগেও ছিল, পরেও থাকবে। তোমাদের মা-ঠাকুমা-দিদিমা, তাঁদের-তাঁদের-তাঁদের 'পূর্বনারী'—'এন-এথ টার্ম' পর্যন্ত পিছিয়ে যাও — একই ছবি। ওদেশে 'জোন অব আর্ক' তো এ-দেশে ঝাঁসির রানী। রণচণ্ডীর 'উত্তরসূরিণী'। বণিকের মানদণ্ড যখন রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হচ্ছে তখন আদিমতমা যে নারী-বিদ্রোহিণী ইংরেজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর নামটাই আমরা জানি না। শুধু অস্তিত্বটা টের পাই — গ্লেজিয়ার-সাহেবের 'রিপোর্ট অন্ দ্য ডিস্ট্রিক্ট অব রঙপুর'-এর 42 পৃষ্ঠাতে! লেখা আছে এই মহিলা-ডাকাত 'দেবী' সন্ন্যাসীবিদ্রোহের নায়ক মজনু শাহ্‌র সহযোগী এবং সম্ভবত ভবানী পাঠকের মন্ত্রশিষ্যা। তিনি নাকি মহিলা, ডাকাত, জমিদার! ইতিহাসে লেখা নেই, কিন্তু তিনি নিশ্চয় কারও কন্যা, কারও স্ত্রী বা 'মা' না হলেও! আমরা ভুল করে ভাবি তিনি বঙ্কিমের মানসকন্যা, বঙ্কিমের 'কল্পনা'।

তারও আগের কালে আর একজনের কথা বলি। পাটবাড়ী - ময়মনসিংহের কবি বংশীদাস ভট্টাচার্যের আত্মজা: চন্দ্রাবতী। জন্ম তাঁর ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি। চৈতন্যদেব তিরোহিত হবার পর দুই দশকও অতিক্রান্ত হয়নি। ভট্টাচার্য-মশাই নিজে কবি, অষ্টমবর্ষে গৌরী দান করতে সম্মত হলেন না। আত্মজাকে ভর্তি করে দিলেন চতুষ্পাঠীতে। সেখানে কিশোরী চন্দ্রাবতীর রূপেগুণে মুগ্ধ এক ভ্রমর এগিয়ে এল প্রেম নিবেদন করতে। ওরই সহপাঠী জয়চন্দ্র। কিশোর-কিশোরী। তোমাদের ভাষায় 'কাফ-ল্যাভ'। কিন্তু দুজনেই দুজনের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তারপর কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল! এক যবনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে জয়চন্দ্র গ্রাম ত্যাগ করল। চন্দ্রাবতীর দিকে ফিরেও তাকালো না! মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে বিবাহ করল সেই যবনীকে। বংশীদাস স্বভাবকবি, বুঝলেন সবই। সুপাত্রে বিবাহ দিতে চাইলেন চন্দ্রাবতীর। ততদিনে চন্দ্রাবতী আর কিশোরী নয়, যুবতী। প্রত্যাখ্যান করল সে। পিতাকে জানালো, চিরকুমারী থেকে গৃহদেবতার পূজার্চনা আর সাহিত্যসেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দেবে। কন্যাপণের টাকায় বংশীদাস একটি মন্দির নির্মাণ করে দিলেন। সেই দেবতার সেবাতেই জীবন অতিবাহিত করতে বসলেন চন্দ্রাবতী! কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস একেই বলে! কিছুদিনের মধ্যেই গ্রামে প্রত্যাবর্তন করলেন জয়চন্দ্র। জানালেন, যবনীর মৃত্যু হয়েছে; এখন তিনি চন্দ্রাবতীকে বিবাহ করতে প্রস্তুত, প্রয়োজনে নাথ-পন্থী হয়ে, অথবা বৈষ্ণব! প্রত্যাখ্যান করলেন চন্দ্রাবতী! জয়চন্দ্র স্তম্ভিত হয়ে জানতে চাইলেন, তুমি আমাকে আর ভালোবাস না?

চন্দ্রাবতী ম্লান হেসে বললেন, সেটাই তো সব চেয়ে বেদনার! বাসি!

—তাহলে কোথায় তোমার আপত্তি? 'ধর্ম' ত্যাগ করতে?

—হ্যাঁ। কিন্তু 'ব্রাহ্মণ্যধর্মের' কথা বলছি না আমি। আমার 'নারীত্বধর্মের মর্যাদা'! সেটা ত্যাগ করতে পারব না!

জনশ্রুতি, জয়চন্দ্র আত্মহত্যা করেন এবং চন্দ্রাবতী সেই নিদারুণ সংবাদশ্রবণে মূর্ছিতা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সে মূর্ছা আর তাঁর ভাঙেনি। 'ময়মনসিংহগীতিকা'র কবি হিসাবেই তাঁর খ্যাতি; কিন্তু তিনিই কি 'দেবী-চৌধুরাণী'র পূর্বসূরিণী নন? এবং রূপমঞ্জরীর?

* * * *

রূপমঞ্জরী এবং তার বাবা দুজনকেই অষ্টাদশ শতাব্দীর দুই অর্ধে দুই সংকটজনক অবস্থায় ফেলে রেখে অসমাপ্ত গানে আচম্‌কা থামতে বাধ্য হয়েছি নিতান্ত বাধ্য হয়ে, ব্যক্তিগত কারণে।

বর্তমান বছরের বইমেলার শেষাশেষি ঐ বইমেলা থেকে বাড়ি ফেরার পথে একদিন কিছু 'চিত্তচাঞ্চল্য' অনুভব করি। একটি নার্সিং হোমের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে এক কালো মুখোশধারীর সঙ্গে কিছু তক্‌রার হয় — একটি প্রত্যঙ্গের দখলদারী নিয়ে। সওয়া-তিনকুড়ি বছরের স্বত্বাধিকার অগ্রাহ্য করে সে আমার হৃদপিণ্ডটি জবরদখল করতে চাইছিল। যাহোক, শেষ-মেষ হামলাদারটা ক্ষমাঘেন্না করে বলে গেল, "এখনো আমার সময় হয়নি, আজি তাই পেলে ছুটি/সময় যেদিন আসিবে আপনি ধরিব তোমার টুঁটি।" সে-সব কথা বিস্তারিত লিখেছি আমার পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থে: 'আবার সে এসেছে ফিরিয়া'।

ফিরে এলাম নিজের ডেরায়। এসে দেখি, ইত্যবসরে আমার অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিখানি ছিন্তাই হয়ে গেছে। এবার অপরিচিত জবরদখলকারী নয়, সুপরিচিত 'হামলাদারনী': তোমাদের দিদা!

ন্যাপ্‌থালিন-সুরভিত আমার সে পাণ্ডুলিপি আলমারিতে বন্দিনী। এখনো পর্যন্ত তার দিকে দেখি নাই ফিরে। যেটুকু আগেই লিখেছি তাই ছেপে ফেলা গেল।

এসব খবর তোমরা অনেকেই জান না। জানবে কোথা থেকে? 'খানদানি' খবরের কাগজে সে খবর তো ছাপা হয়নি। আর সেসব কাগজকেও দোষ দেওয়া যায় না। অহন্যহনি কত কত ভেন্ন-বাঙের সাহিত্য-যশোপ্রার্থী অখ্যাত চিড়িয়া নার্সিং হোমে 'গচ্ছন্তি' এবং সেখান থেকে সৎকার-সমিতির ভ্যানে অন্যত্র 'পুনর্গচ্ছন্তি', অত সব খবর কি ছাপা সম্ভব?

তবু 'আজকাল' পত্রিকায় সংবাদটা ছাপা হয়েছিল। তাই তোমাদের মধ্যে অনেকে আবার জানতে পেরেছিলে। তার ভিতর কেউ-কেউ খামে ভরে আমাকে প্রসাদী নির্মালা পাঠিয়েছ, আমার রোগমুক্তি কামনা করেছ।

তাদের শুভেচ্ছায় আশা রাখি এ কাহিনীর দ্বিতীয় খণ্ডটি শেষ করে যেতে পারব।

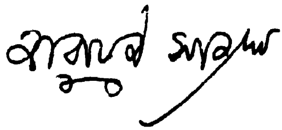

পুনশ্চ :

পরিকল্পনা ছিল প্রথম খণ্ডটির যবনিকাপাত ঘটবে সূতিকাগারে কুসুমমঞ্জরীর প্রয়াণে অর্থাৎ রূপমঞ্জরীর আবির্ভাবে। কিন্তু ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ি। দ্বিতীয়বার নার্সিং-হোম থেকে ফিরে আসার পর সিদ্ধান্ত নিতে হল: 'অসমাপ্ত গানে'ই আপাতত থামতে হবে। ময়দানে যখন নব্বই-দশকের বইমেলা জমজমাট তখন আমাকে একটি অস্ত্রোপচার করাতে হবে। প্রতিশ্রুত নির্ঘণ্ট, ফটো-ক্রেডিট প্রভৃতি দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে সংযুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

তাবলে এ কিছু ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নয়।
গঙ্গাপুত্রের মতো 'ইচ্ছামৃত্যু'র পুঁজি তো আমার তূণীরে নেই।
আগে অস্ত্রোপচার করে ফিরে তো আসি।

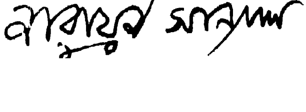

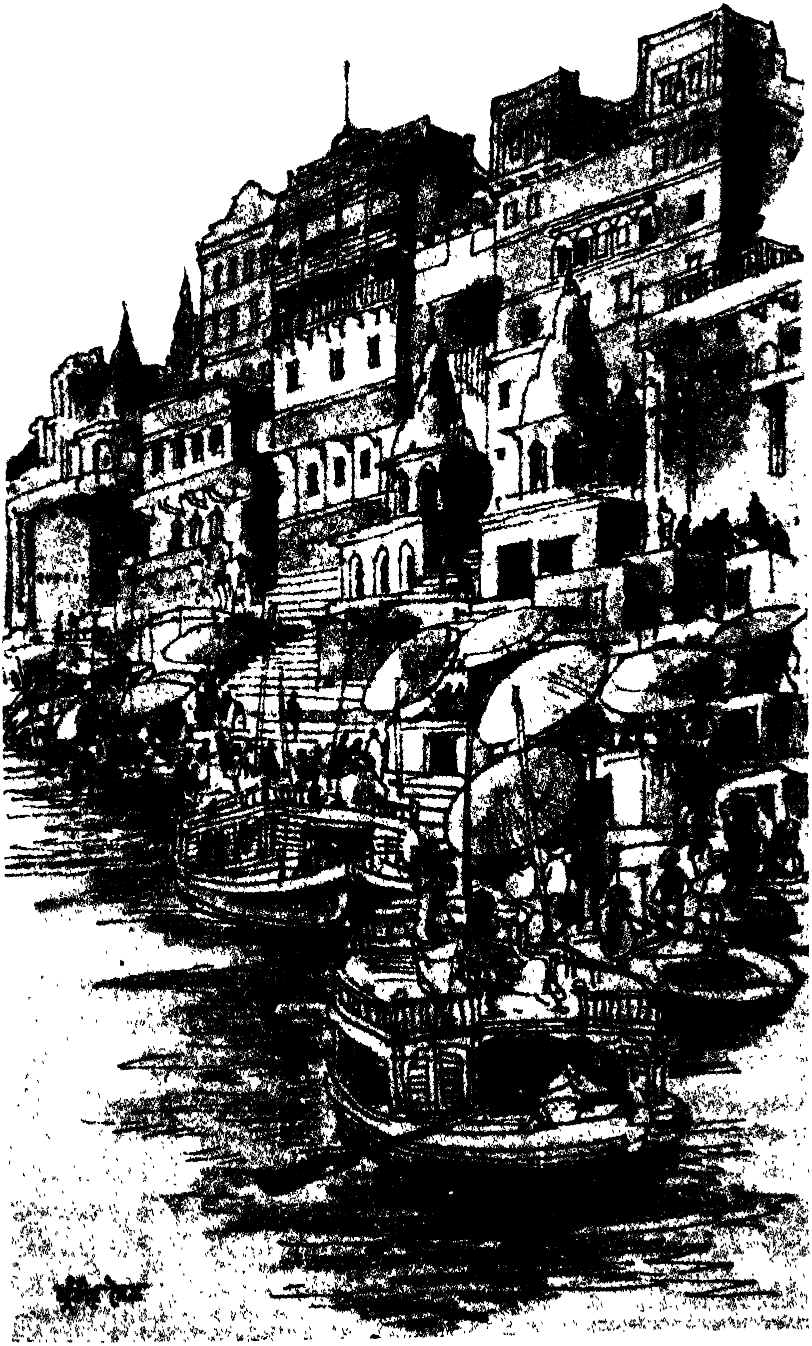

কাশীধাম

1774

প্রথম পর্ব

স্থান, কাল আর পাত্র।

প্রথমেই চিহ্নিত করে নেওয়া যাক।

স্থান: সেই যেখানে নাকি ভূমিকম্প হয় না—বাবা বিশ্বনাথের ত্রিশূলপ্রান্তে চিহ্নিত মহানগরী কাশীধাম।

কাল: 1696 শকাব্দ; সংবৎ: 1831—অর্থাৎ ফেরঙ্গমতে 1774 খ্রীষ্টাব্দ। সূর্য কুম্ভরাশিতে, তিথি কৃষ্ণা নবমী। হিসাব মতো ফরাসী দেশে ব্যাস্টিল দুর্গের পতন হতে যেমন পনের বছর বাকি, তেমনি পলাশীর যুদ্ধ সতের বছর অতীতের ঘটনা। কোম্পানির রাজত্ব সবে শিকড় গেড়ে বসছে। ইংলন্ডে তখন তৃতীয় জর্জ সিংহাসনে আসীন। রাজা রামমোহন রায় মাত্র দুই বৎসরের শিশু।

পাত্র: না, পাত্র নয়, পাত্রী। কিন্তু তাঁর কথা পরে আসবে। আপাতত যার প্রসঙ্গ দিয়ে কাহিনী শুরু হচ্ছে তার নাম সুখিয়া—মহামহিম কাশীরাজ সরকারের বেতনভুক 'হসিসিয়ুন'—সাদা-বাঙলায়—গুপ্তচর, প্রয়োজনে যাকে গুপ্তহত্যার কাজে নিয়োগ করা চলে।

তিনতলা পাষাণ-হর্ম্য। গঙ্গাতীর। অসিঘাটের কাছাকাছি। আদ্যন্ত চুনা-পাথরে চুন-সুরকির মশলায় গাঁথা। দেখলে মনে হয় না এটা প্রমোদভবন, যেন—দুর্গ! এ অট্টালিকার পরিচয়—'অসিঘাটের বাগানবাড়ি'। জনহীন, নির্বান্ধব পাষাণপুরী সারাটি দিন ঝিমায়। সন্ধ্যা সমাগমে তার নিদ্রাভঙ্গ হয়। তখন শোনা যায় কিছু কলগুঞ্জন। রাজকার্যে ক্লান্ত-তনু রাজাসাহেবের শুভাগমন ঘটে। বাগানের মালি ছুটে এসে সেলাম করে, ঘোড়ার লাগামটা ধরে। রাজাসাহেব ময়ূরপঙ্খী-নাগরা মশ্মশিয়ে সোপান বেয়ে উঠে যান ফাঁকা ছাদে। আসে কিছু বয়স্য, আর আসে কিংখাবে-মোড়া পালকি চেপে নৃত্যগীত-পটিয়সী কিছু বেহেস্তের হুরী।

সেটাই হচ্ছে সুখিয়ার চিন্তার কারণ।

প্রয়োজনে সে রাজাসাহেবের শয়নকক্ষে বিনা-এত্তেলায় হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়তে পারে—সে অধিকার তার আছে—যদি তেমন-তেমন গোপন সংবাদ লুকানো থাকে তার

আস্তিনের তলায়। রাজারানীর মিলন-মুহূর্তটাকে খান্‌খান্‌ করে সে জানলা দিয়ে ঢুকে পড়তে পারে, যদি তার কুর্তার জেব্‌-এ লুকানো থাকে রাজহত্যার গোপন ষড়যন্ত্রের বার্তা। কিন্তু আজ সে যে খবরটি সংগ্রহ করে এনেছে তা চমকপ্রদ হলেও রাজাসাহেবের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত নয়—শুধু তাঁর একটা কৌতূহল চরিতার্থ করতে। এ সময় রাজাসাহেবের সান্ধ্য-বিনোদনে ব্যাঘাত ঘটানো উচিত হবে কিনা ঠাওর করে উঠতে পারে না।

অশ্বপৃষ্ঠে ওকে এগিয়ে আসতে দেখে লোহার-শিক দেওয়া বিরাট ফটকটা খুলে গেল। দ্বাররক্ষক ওকে চেনে। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে অশ্বটিকে রজ্জুবদ্ধ করল। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। প্রমোদ-প্রাসাদে কোথাও আলো জ্বলছে না। শুধু খোলা ছাদে কিছু স্তিমিত আলোকরশ্মি। একটু কান করে শোনার চেষ্টা করল—না, তব্‌লা বা ঘুঙুরের শব্দ উঠছে না। বাগানেও নেই কোনো কিংখাবে-মোড়া পালকি। তার মানে. নাচ্‌নেওয়ালীরা এখনো এসে পৌঁছায়নি। কিন্তু রাজাসাহেবের ঘোড়াটাকে দেখা যাচ্ছে।

নজরে পড়ে সিঁড়ির ও প্রান্তে রামলগন বসে সিদ্ধি ঘুঁটছে। রামলগন রাজাসাহেবের দেহরক্ষী—মহিষাসুরের মতো চেহারা। ঈয়া পাকানো মোঁচ, ঈয়া বুকের পাটা--লাঠিয়াল-দলের সর্দার। ছেদিলাল শিলাপটে পেস্তাবাদাম জাতীয় কী যেন পিষছে।

সুখিয়া সেদিকে এগিয়ে আসে। বলে, রাম-রাম লগনজী. ক্যা হালচাল?

রামলগন একবার চোখ তুলে তাকায়। জবাব দেয় না।

রাজসন্দর্শনে যাবার আগে একটি অনিবার্য প্রশ্ন থাকে। সেটা জেনে যাওয়াই প্রথা। গবজ বড় বালাই। সুখিয়া জানতে চায়: রাজাসাহেবেব মেজাজ শরীফ?

এবারও প্রত্যুত্তর করল না সর্দার-লেঠেল।

সুখিয়া প্রশ্ন করে, উপর যাঁউ?

—তোঁহার মর্জি!

বোঝা গেল, রাজাসাহেবের মেজাজ যেমনই থাক. তাঁর খাশ দেহরক্ষীটির মেজাজ তিরিক্ষে। সুখিয়া পেশায় গুপ্তচর, রাজ্যের যাবতীয় তথ্যের হক-হদিস্‌ তার নখদর্পণে। তার জানা আছে, কী হেতুতে রামলগনের মেজাজ এতটা বিগড়ে আছে।

তা তো হতেই পারে। রামলগনের স্বহস্তে বানানো সিদ্ধির সুখ্যাতি তামাম কাশীধামে সুবিদিত—দশাশ্বমেধ ঘাটের মেঠাইওয়ালা তেওয়ারিজীর 'জিলাইবী' অথবা দড়িয়া-কা-পোলের ভুঁজাওয়ালার পিস্তা-কা-হালুয়ার মতো—'যো খায়া বহ পস্তায়া, যো নহী খায়া বহ্‌ভি পস্তায়া'। অনেকের ধারণা—ঐ সিদ্ধির সিদ্ধিতেই রামলগন সর্দার-লেঠেলের পদে উন্নীত। না হলে ঈশান কৈবর্তের নোকরি-খতমের পরে এই বারাণসীধামে কি 'পালওয়ানে'র আকাল পড়েছিল? কিন্তু রাজাসাহেব ইদানীং আর সিদ্ধির নেশায় মৌজ করেন না। বেশ কিছুদিন প্রয়াগ ক্যান্টনমেন্টে বাস করে যখন কাশীতে ফিরে এলেন তখন দেখা গেল তাঁর নেশাটিরও বদল হয়েছে। রাজারাজড়ার ব্যাপার—শয্যাসঙ্গিনীর মতো ওঁদের মাঝে মাঝে নেশারও বদল করতে হয়। ওঁর এখন ধারণা হয়েছে—সিদ্ধি-ভাঙ হচ্ছে নাবালকের আর গঞ্জিকা নাঙ্গা ফকিরের নেশা। বর্তমানে তিনি নাকি কী এক আজীব বিলাইতির মহব্বতে

মাতোয়ারা—সুখিয়া বাপের জন্মে তার নাম শোনেনি—'শ্যামপিন', না কী যেন নাম। আকবরী মোহর দিয়ে তা রাজাসাহেব আমদানি করেন ফেরঙ্গ ক্যান্টনমেন্ট থেকে।

তা রাজাসাহেবের অমৃতে অরুচি হতে পারে, রামলগনের তো সেটা হয়নি। সে তার তিনপুরুষের সিদ্ধিকে ত্যাগ করতে পারে না। ইদানীং বেচারি গ্যাঁটের কড়ি গচ্চা দিয়ে নেশার যোগান দেয়। পারতপক্ষে রাজাসাহেবের সামনে আসে না আজকাল। সেই যেদিন ভাঙের ভাঁড়টা রাজাসাহেব ওর মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মেরেছিলেন তার পর থেকে।

সুখিয়া এসব বৃত্তান্ত জানে। তাই বলে, আমার জন্যেও এক লোটা 'অম্‌রিৎ' বানিও ভাই রামলগন। আমি তো রাজকাজে দেশ-বিদেশ ঘুরি—তোমার সিদ্ধির সুখ্যাতি দেখছি ইদানীং কাশীর বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে।

খুশি হল রামলগন। বলে, সে সব ফেরার পথে হবে। তুমি যাও, ছাদে চলে যাও। ফেরার সময় মহাবীরজীর পরসাদ পেয়ে যেও। লেকিন এগো বাৎ শুনিহ্ সুখিয়া ভেইয়া—এক লোটা পীলে তিন দিন তোমার নিদ্ টুটবে না। যতটুকু পরসাদ তোমার সহ্য হবে তা আমি নিজে হাতে মেপে দেব। সমঝা? যাও! উপর যাও!

—নাচনেওয়ালী কসবিরা এসে পৌঁছায়নি তা তো দেখতেই পাচ্ছি। ছাদে আছেন কে কে?

—কবিজী আছেন, আড্ডাধাবী ঔর বটু।

তিনজনই সুপরিচিত। রাজাসাহেবের তিন অন্তরঙ্গ ইয়ার দোস্ত। কবিজী, অর্থাৎ কাব্যতীর্থ ব্রাহ্মণ, রাজা-সাহেবের চেয়ে না হোক দশ বছরের বড়। তবু তিনি বয়স্যপদে বহাল। কারণ নবরসের প্রথম রসটিতে তাঁর দিল সর্বদাই টুবুটুবু—ঘনরসে পান্তুয়ার মতো। কাঁচা খিস্তিকে সুচারুরূপে কাব্যরস মণ্ডিত করার দুর্লভ প্রতিভা তাঁর এক্তিয়ারে। কাব্য আর খিস্তির ফারাকটা বোঝা যায় না। আড্ডাধারী রাজা-সাহেবের ঘুন্সিযুগের বন্ধু। অর্থাৎ যে আমলে মাজায় কষি দেবারও প্রয়োজন ছিল না—স্রেফ ঘুন্‌সি। রাজা-সাহেবের উত্থান-পতনের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলেছেন। ছায়ার মতো তাঁর পিছন পিছন ঘোরেন। কুপরামর্শের যোগান দিয়ে চলেন ক্রমাগত।

তৃতীয় ব্যক্তি বটু। বামন। প্রাক্তন রাজামশায়ের বিদূষক। সচরাচর বিদূষকের পদ লাভ করে পৈতাধারী বামুন। বটুকেশ্বর প্রামাণিক। অতি ধূর্ত লোক। প্রাক্তন কাশীনরেশ বলবন্ত সিং-এর গঙ্গাপ্রাপ্তির পর রাজ-সরকারের খোল-নলচে আদ্যন্ত পালটে গেছে। সেনাপতি বজ্রধর দেশত্যাগী, রাজপুরোহিত গঙ্গারাম মিশ্র অপসারিত, মন্ত্রী বেপাত্তা। রাজার লাঠিয়াল-সর্দার ঈশান কৈবর্তকে সপরিবারে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হয়েছিল—কোনক্রমে সে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। তার বউটাই শুধু পুড়ে মারা যায়। বোধকরি এতদিনে সে তার পিতৃভূমি বঙ্গাল-মুলুকে ফিরে গেছে—কারণ তার ডাকাতির খবর আর ইদানীং পাওয়া যাচ্ছে না। যা বদলায় নি তা: বিদূষক! একমাত্র ব্যতিক্রম তাই বটুকেশ্বর প্রামাণিক! ভাঁড়ামোর পারদর্শিতায় সে কর্মচ্যুত হয়নি।

সিঁড়ি বেয়ে, ছাদে পৌঁছে সুখিয়া আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। ভারী পর্দার ফাঁকে একটা চোখ লাগিয়ে সে ওদিককার অবস্থাটা সমঝে নিতে চায়।

ফাল্গুনের শেষাশেষি। দিব্যি ফুরফুরে গঙ্গার হাওয়া। ছাদে প্রকাণ্ড গদি বিছানো। তার উপর

জাজিম। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মখমলে মোড়া খানকতক কামদার তাকিয়া। রাজাসাহেব অর্ধশয়ান। তাঁর হাতে আলবোলার ফরসি। সামনে মোরাদাবাদী কাজ-করা ধাতবপাত্রের উপর বিলাইতির বোতল আর পানপাত্র। একপাশে রাখা আছে কিছু বাদ্যযন্ত্র। একটা রূপার রেকাবিতে অপর্যাপ্ত জুঁই ফুল। বয়স্য তিনজন রাজাসাহেবকে ঘিরে। নর্তকীরা এখনো এসে পৌছায়নি।

—কৌন? কৌন হ্যায়?—সবার আগে বটুকের নজর পড়েছে ভারী পর্দার নিচে একজোড়া নাগরাপরা পা। পর্দা সরিয়ে সুখিয়া ছাদে উঠে আসে। আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করে। লোকটা ধূর্ত—সাবেক রাজামশায়কে সে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করত। এখন কুর্নিশের কায়দা রপ্ত করেছে। জানে, রাজাসাহেবের ঐসব মোগলাই কেতা মনপসন্দ্।

রাজাসাহেব উর্দু-মেশানো হিন্দুস্থানীতে বললেন, ও। তুই। খবর নিয়ে এসেছিস?

—জী সরকার। লেকিন খবরটা তো তেমন জরুরী নয়, এখনি হুজুরের দিল বিগড়ে দিতে চাই না। ওয়ার্না কাল সুবে আপনার খিদমতে…

হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন রাজাসাহেব, হারামজাদা! কোন ব্যাপারটা জরুরী তা বিচার করব আমি! সমঝ গয়ে? বেতমিজ, গিদ্ধড়! তুই হুকুমের খিদ্‌মদ্‌গার। যা হুকুম হবে সিরেফ তামিল করে যাবি! বল, কী জেনে এসেছিস? জগু পণ্ডিত যা বলেছে তা সচ্?

যুক্তকর গরুড়পক্ষীর মতো সুখিয়া দাঁড়িয়ে থাকে। বয়স্যের অধিকারে আড্ডাধারী রাজাসাহেবকে সস্নেহ ধমক দেয়, তোমার যেমন কাণ্ড, রাজাসাহেব! সুখিয়া হারামজাদা কি জানে—জগুয়া কী অভিযোগ করে গেছে? র'স, অ'মি জেরা করছি। অ্যাই সুখিয়া, তুই নিজে চোখে বিদ্যালঙ্কারকে দেখে এসেছিস?

—জী সরকার!

—কী করছিল র‍্যা? ছাত্তর ঠেঙাচ্ছিল?

সুখিয়া ইতস্তত করে। না, কোন ছাত্রকে প্রহার করতে দেখেনি। স্বীকার করল সে কথা। সে শুধু দেখে এসেছে—বিদ্যালঙ্কার তাঁর চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করছিলেন।

—ঐ হল! তারেই বলে ছাত্তর ঠ্যাঙানো! এখন বল দিনি—ওর ছাত্তরদের বয়স কত হবে? দশ, পনের, বিশ, বাইশ?

—জী হাঁ। যেয়াদা ভি হো সক্‌তা।

—আর বিদ্যালঙ্কারের বয়স?

সুখিয়া মাথা চুলকায়। কী জবাব দেবে ঠাওর করে উঠ্‌তে পারে না।

—আন্দাজে বল্ হারামজাদা! বিশ-পঁচিশ? নাকি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ?

—ঐসিনই হো সক্‌তা।

কাব্যতীর্থ অট্টহাস্য করে ওঠে, বাঃ! বাঃ! তুই যে সমদর্শী হয়ে উঠলি রে সুখিয়া—'সদন্নে বা কদন্নে বা লোষ্ট্রে বা কাঞ্চনে তথা'। অ্যা? কাঁচা-মিঠে 'কিশোরী রসাল' আর শ্রোণীভারাদলসগমনা 'পক্ব পনস' তোর চোখে এক?

আড্ডাধারী ওসব চটুলতায় বিচলিত না হয়ে প্রশ্ন করে, কী দেখলি বল? বিদ্যালঙ্কারের মাথা কামানো? টিকি দেখলি?

—জী।

বটুকেশ্বর উপর-পড়া হয়ে জানতে চায়, কত বড় টিকি দেখলি বল? দু' চার আঙুল? বিঘৎখানেক? নাকি দেড় হাত?

সুখিয়া সকলের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে দেখে। বটু বিদূষক। প্রথা বলে, তার প্রতি কথাতেই হেসে উঠতে হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তার কথায় কেউই এখন হাসছে না। সুখিয়ার মনে হল, প্রশ্নটা রসিকতা নয়, জবাবের অপেক্ষা রাখে। বলে, এৎনা বড়া হোগা শায়েদ!

হাতের মুদ্রায় বিদ্যালঙ্কারের অর্কফলার দৈর্ঘ্যটা বোঝাবার চেষ্টা করে।

আড্ডাধারী জানতে চায়, বিদ্যালঙ্কারের পরিধানে কী দেখলি? ধুতি পিরান?

—জী!

কাব্যতীর্থ প্রচণ্ড ধমক লাগায়, কী তখন থেকে শুধু 'জী-জী' করছিস্। বলি, তুই কি 'জুজু' দেখে এলি? ঠিক করে বল্ বেটা: পিরান না কামিজ, নাকি কুর্তা? অথবা ফতুয়া?

সুখিয়ার সব কিছু গুলিয়ে যায়। ঐ চারটি অঙ্গাবরণ পুরুষে ঊর্ধ্বাঙ্গে পরিধান করে এটুকুই জানা আছে; তাদের পার্থক্যটা ঠিক কী, তা ওর জ্ঞানসীমার বাইরে। স্বীকার করল সে কথা।

কাব্যতীর্থ এবার অন্বয়-ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে, 'পিরান' হচ্ছে ঢিলে-ঢালা জামা—যা ভবিষ্যতে বিবর্তিত হবে পাঞ্জাবিতে; 'কামিজ' হচ্ছে 'শার্ট'-এর আদিমরূপ; 'কুর্তা' হচ্ছে ফেরঙ্গ সৈনিকদের অঙ্গাবরণ—আঁটো-জামা। আর ফতুয়া—হাতকাটা গ্রীষ্মের পোশাক।

এবার সুখিয়া নিবেদন করে—সেক্ষেত্রে বিদ্যালঙ্কারের গায়ে যে জামাটা দেখে এসেছে তাকে 'পিরানই' বলা উচিত।

কাব্যতীর্থ আরও গভীরে প্রবেশ করতে চায়, আর পিরানের তলায়?

সুখিয়া হালে পানি পায় না।

—বলি, পিরানের তলায় কী দেখলি, বল?

সুখিয়া নির্বাক!

—বল্ হারামজাদা! পিরানের নিচে কী আছে তা দেখেছিলি? চোখে বা হাত চালিয়ে?

এবারেও কেউ হাসছে না। কী বিড়ম্বনা! কোনটা রসিকতা আর কোনটা প্রশ্ন বোঝা ভার। সুখিয়া মাথা নেড়ে জানায়, সে কথা ও জানে না!

কাব্যতীর্থ এবার ন্যায়তীর্থ হয়ে উঠতে চায়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ, আনুমানিক প্রমাণ, 'আনুভূতিক' প্রমাণ! প্রশ্ন করে, তবে তুই কেমন করে বুঝলি বাপধন, যে তুই ন্যায্য সেই হটী বিদ্যালঙ্কারকেই দেখে এসেছিস? আর কোনও টুলো পণ্ডিতকে নয়?

—সবাই তো বললে, উনিই বিদ্যালঙ্কার!

—মানছি! সেটা তো অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু পিরানটা তুলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া ইস্তক তুই কী করে বুঝলি যে, সে স্ত্রীলোক? কামানো মাথায় চুটকি দেখে?

এবারেও কেউ হাসছে না। এমন একটা অশ্লীল ইঙ্গিতে। সুখিয়া জবাব দিল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েই রইল।

—তার মানে তুই বলতে চাস্ যে, পিরানের উপর থেকেই মর্মভেদী দৃষ্টিতে সেটা আন্দাজ করতে পারছিলি! কেমন?

এবারও সুখিয়া মেদিনীনিবদ্ধদৃষ্টি।

কাশীধাম

—কিরে ব্যাটা? তোর বাক্যি হরে গেল যে! তা উপর থেকে কী সম্বন্ধে নিলি তাই না হয় খুলে বল—বদরী, দাড়িম্ব, নাকি বাবা বিশ্বনাথের যা মন্‌পসন্দ: যুগল পক্কবিল্ব?

এতক্ষণে রাজাসাহেব কথা বলে ওঠেন। কাব্যতীর্থকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, অ্যাই সুখিয়া, তুই শুধু বল—ঠিক লোককে দেখে এসেছিস্ তো?

—জী হুজুর, গরিবপরবর!

ধমক খেয়েও কাব্যতীর্থ ক্ষান্ত হল না। লোকটা জানে, কাব্যালোচনার নল্‌চের আড়ালে ক্রমাগত আদিরস পরিবেশনের জন্যই সে রাজসরকার থেকে বৃত্তিভোগী। বললে, ব্যাপারটা কিন্তু প্রমাণ হল না, রাজাসাহেব।

রাজাসাহেব হাত নাড়লেন। মক্ষিকাবিতাড়নমুদ্রা। সুখিয়া মুক্তি পেল। খানদানি মোগলাই কায়দায় তিনবার কুর্নিশ করে তিনপা পিছু হটে পর্দার ওপাশে অন্তর্হিত হল।

আড্ডাধারী বুঝে নিয়েছে রাজাসাহেবের মন এখন অন্য দিকে। কাব্যতীর্থের চটুলতায় তাঁর মন নেই। আড়চোখে তাঁর দিকে একনজর দেখে নিয়ে বলে, জগৎ পণ্ডিত তো তাহলে মিছে কথা বলেনি! এতদূর দুঃসাহস! একজন স্ত্রীলোক কাশীধামে এসে চতুষ্পাঠী খুলে বসেছে! পুরুষদের সঙ্গে সমানতালে ছাত্তর ঠ্যাঙাচ্ছে।

রাজাসাহেব বলেন, কাব্যতীর্থ! চ্যাঙড়ামি কর না। ভেবে চিন্তে বল তো—তোমার জ্ঞানমতে এমন ঘটনা কাশীধামে ইতিপূর্বে ঘটেছে?

কাব্যতীর্থ এবার নিজেকে সামলে নেয়। গম্ভীর হয়ে প্রত্যুত্তর করে, আজ্ঞে না, রাজা-সাহেব! এমন বিচিত্র কথা আমি জীবনে শুনিনি!

—শুধু 'বিচিত্র' নয়! অসামাজিক! অশাস্ত্রীয়!

—তা তো বটেই। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'স্ত্রীষু দুষ্টাষু' হলে 'বর্ণসঙ্কর' জন্মগ্রহণ করে। স্ত্রীলোকের দুষ্টামি কদাচ সহ্য করতে নেই। সুখিয়ার কথায় মনে হল মেয়েটি পূর্ণ-যৌবনা। কোন সাহসে সে প্রকাশ্যে পুরুষের বেশে, মাথা কামিয়ে, টিকি রেখে চতুষ্পাঠী খুলে বসে? মনুর সুনির্দিষ্ট বিধান আছে—স্ত্রীলোক শুধু সন্তানের জন্ম দেবে, তাদের স্তনদান করবে, লালন-পালন করবে, স্বামীর পদসেবা করবে ...

বটুকেশ্বরও বুঝে নিয়েছে। এ আসরে ভাঁড়ামি চলবে না। বললে, শুনেছি সে বিধবা। নিঃসন্তান!

— তাহলে তার সহমরণে যাবার কথা। না হলে অন্তঃপুরের চতুঃসীমায় লুক্কায়িত থাকা!

রাজাসাহেব জানতে চান, কোন দেশের লেড়কি? তৈলঙ্গী?

— আজ্ঞে না। শুনেছি বঙ্গদেশের। রাঢ়খণ্ডের। ব্রাহ্মণ কন্যা। বালবিধবা...

— বামুনের মেয়ে? বিধবা। সহমরণে যায়নি?

— যায়নি যে, তা তো দেখতেই পাচ্ছ।

— কতদিন হল সে টোল খুলে বসেছে?

— প্রায় ছয় মাস।

— ছয় মাস! আশ্চর্য তোমাদের! আমি রাজকার্যে এলাহাবাদে ছিলাম। তোমরা কোনও ব্যবস্থা নাওনি! আমি ফিরে আসার পরেও কিছু জানাওনি। নেহাৎ জগাপণ্ডিত দরবার করতে এসেছিল তাই এতবড় অনাচারটা আমার গোচরে এল।

417 Dt 24/5/10

আড্ডাধারী এক কথায় অভিযোগটা মেনে নেয়। বলে, তা ঠিক। আমাদের খবর নেওয়া উচিত ছিল—তোমাকে জানানো উচিত ছিল। যাক, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন বল, কী কর্তব্য?

রাজাসাহেব বলেন, তোমরাই আমার পরামর্শদাতা। প্রথমে তোমাদের অভিমতগুলো শুনি। কাব্যতীর্থ কী বল? কী শাস্তি দেওয়া উচিত বিদ্যালঙ্কারকে?

কাব্যতীর্থ বলে, শূদ্র আর স্ত্রীলোকের বেদপাঠের অধিকার নাই। শ্রীরামচন্দ্র প্রথমটির বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তা শম্বুক উপাখ্যানে বাল্মীকি আমাদের শুনিয়ে গেছেন। দ্বিতীয়টির বিষয়ে কাশীনরেশ কী ব্যবস্থা নেন তাই আমরা এখন দেখব।

—আর আড্ডাধারী? তোমার অভিমত?

—না, রাজাসাহেব। আমি কাব্যতীর্থের সঙ্গে একমত নই। কাব্যতীর্থ স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছে—শিরশ্ছেদ! তোমার শুভানুধ্যায়ী হিসাবে আমার পরামর্শ—অতটা বাড়াবাড়ি কর না!

— কেন?

—শম্বুক গোপনে বেদাভ্যাস করছিল। এ মেয়েটি করছে প্রকাশ্যে। কাশীর পণ্ডিতসমাজ তাকে 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধি প্রদান করেছেন। এতবড় উপাধি আব কোনও স্ত্রীলোক কখনো পেয়েছে বলে আমি তো শুনিনি। না বয়স্য—শিরশ্ছেদ করাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। আমি বলি—ওকে লঘুতর শাস্তি দাও। মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, উল্টোগাধায় চড়িয়ে কাশীরাজ্যর সীমানার বাইরে বার করে দাও। কী বল বটু?

বটু তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে, আজ্ঞে না! তাতে আমার ঘোরতর আপত্তি! প্রথম কথা, অপরাধী শিখা-বাদে মাথাটা নিজেই মুড়িয়ে রেখেছে। দ্বিতীয়ত তক্র অতি উপাদেয় পানীয়, অপচয় করা ঠিক নয়। তৃতীয়ত উল্টো গাধা? শাটিকের[১] বদলে শাটিকা[২]-গাত্রাবরণী, চোলিকার পরিবর্তে পিরান, কুঞ্চিত কেশদামের বদলে ন্যাড়ামুণ্ডি—মহারাজ, উল্টোগাধার আর বাকিটা কী!

অড্ডাধারী বলে, তা বটে! এবার রাজা-সাহেবের অন্তিম ফতোয়াটা শোনা যাক।

রাজাসাহেব সোজা হয়ে বসেন। বলেন, রসিকতা নয়, আড্ডাধারী। এ একটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। রাজশক্তি সচেতন না হলে সমাজে পাপ প্রবেশ করে। অপরাধ একা হটী বিদ্যালঙ্কার করেনি—করেছে কাশীর ঐ তথাকথিত পণ্ডিত-মূর্খরা! যারা ওকে চতুষ্পাঠী খুলে এই ধাষ্টামো দেখানোর পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে। অত্যন্ত নির্মমভাবে আমাকে শাস্তি দিতে হবে। যাতে এ জাতীয় বেলেল্লাপনা আর কোন স্ত্রীলোক ভবিষ্যতে দেখাবার সাহস না পায়!

—তার মানে মৃত্যুদণ্ড?

—না! তার চেয়েও কঠিনতর দণ্ড! সময়ে তা জানতে পারবে তোমরা।

---

[১] শাটিক—পুরুষদের পরিধেয় বস্ত্র = ধুতি
[২] শাটিকা—রমণীদের পরিধেয় বস্ত্র = শাড়ি

কাশীধাম

রাজাসাহেব পুরন্দর ক্ষেত্রী কাশীধামের দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসক। তা বলে তিনি কিন্তু কাশীনরেশ নন। কাশীরাজ বলবন্ত সিংহের দেহান্ত হয়েছে গত দশকে। তাঁর নাবালকপুত্র কৃষ্ণেন্দুনারায়ণের তরফে প্রাক্তন কাশীনরেশের ভাগিনেয় পুরন্দর ক্ষেত্রী এখন শাসক। কিন্তু প্রজারা তাকে সিংহাসনে বসবার নিরঙ্কুশ অধিকার দেয়নি। ভোগৈশ্বর্য, বিলাসবৈভব সব কিছু হস্তামলকবৎ পেয়েও পুরন্দর তাই মানসিক শান্তি লাভ করেনি। মনে মনে সে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে। যতদিন মাথায় মুকুট, হাতে রাজদণ্ড এবং পশ্চাদ্দেশে সিংহাসনের কোমলস্পর্শ অনুভব না করছে ততদিন সে বিবাহ করবে না। তা বলে সে কিছু শুকদেব গোঁসাই নয়। সহধর্মিণী না হলেও নিত্যনতুন শয্যাসঙ্গিনীর গোপন ব্যবস্থা আছে।

সমস্ত কাশীরাজ্য প্রতীক্ষা করে আছে—কবে ঐ কিশোর রাজপুত্র সাবালক হবে, অপশাসকের হাত থেকে শাসনদণ্ডটি ছিনিয়ে নেবে। পুরন্দরের অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি নেই। পূর্বতন রাজকর্মচারীদের হত্যা অথবা অপসারণ করেছে একে একে। নিজের বিশ্বস্ত অনুচরদের বসিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে। রাজ্যের কোন প্রত্যন্ত-দেশে বিক্ষোভের বীজ অঙ্কুরিত হবার উপক্রম হলেই, সে সুচারুরূপে ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু মামাতো ভাইটিকে বিষপ্রয়োগে মণিকর্ণিকার ঘাটের দিকে পাঠিয়ে দেবার হিম্মৎ তার হয়নি। বিষের নয়, সাহসের অভাবে। পুরন্দর জানে, প্রজাবৃন্দ তাকে সাময়িক উপদ্রব বলে মনে করে মাত্র। প্রজাবিদ্রোহের একটা সূচনাও হয়েছিল, অত্যন্ত কঠোর হস্তে সে অভ্যুত্থান দমন করেছে। প্রাক্তন সেনাপতি বজ্রধর সপরিবারে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছিল। বর্তমানে সে শাহাবাদ জেলায় রোহিতাশ্ব দুর্গের দুর্গাধিপ। প্রাক্তন কাশীনরেশের লাঠিয়াল-সর্দার ঈশান কৈবর্তও পালিয়ে যায়। কিছুদিন কাশীরাজ্যের ভিতরেই ডাকাতি করত। ইদানীং তার সাড়া-শব্দ নেই; সম্ভবত পিতৃভূমি বঙ্গাল-মুলুকেই ফিরে গেছে।

বিদ্রোহদমনের পরে পুরন্দর চলে গিয়েছিল এলাহাবাদ। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির একটা জঙ্গী ছাউনি সেখানে গড়ে উঠবার উপক্রম করছে। কোম্পানির মূল ঘাঁটি শহর-মাদ্রাজ আর শহর-কলকাতা। আগের জমানায় মাদ্রাজের রবরবাই ছিল বেশী। পলাশী-যুদ্ধের পর জাঁকিয়ে উঠেছে শহর-কলকাতা।

পলাশী-যুদ্ধে পরাজয়ের পর সিরাজের মর্মান্তিক মৃত্যু। তারপর নবাবী পেয়েছিল বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর আলি খাঁ। বছরতিনেকের জন্য। কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণের জন্য প্রজাসাধারণের উপর নির্মমভাবে অত্যাচার করতে থাকে মীরজাফর। ইতিমধ্যে ক্লাইভ ফিরে গেল বিলাতে। কিন্তু মীরজাফর ইংরেজের অর্থদাবি মিটাতে পারল না। ফলে ষাটের দশক শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিশ্বাসঘাতকের নবাবীও ফুরালো। জাফর খাঁকে হটিয়ে ইংরাজ বাঙলার নবাবী গদিতে বসিয়ে দিল তারই জামাইকে—মীরকাশিমকে। মীরজাফর-তনয়া ফতেমাকে

বিবাহ করেছিল সে। পূজ্যপাদ শ্বশুরমশাইকে যখন ইংরাজ-কোম্পানির কাউন্সিলাররা ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিল তখন মীরকাশিম এগিয়ে এল প্রচুর অর্থদানের প্রতিশ্রুতিসহ। কিন্তু বঙ্গদেশের ততদিনে নাভিশ্বাস উঠেছে। দীর্ঘ দিনের বর্গীর-হাঙ্গামা, ইংরাজের অত্যাচার, মীরজাফরের অপশাসন—মীরকাশিম ব্যর্থ না হবে কেন? তবে জামাই ঠিক শ্বশুরের মতো ছিল না—মনে মনে তার তাল ছিল সুবিধামতো ইংরাজকে সমূলে উৎপাটন করবে। তাই প্রথম পদক্ষেপ মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তর করা—সেটা ইংরেজের ফোর্ট উইলিয়াম থেকে কিছু বেশী দূরে। পরের ধাপে মীরকাশিম আর একটা কাজ করে বসল যাতে বেনিয়া ইংরাজ প্রমাদ গণল। তাদের এতদিনের একচেটিয়া বিনা-শুল্কে বাণিজ্য অধিকার মীরকাশিম অর্পণ করল প্রতিযোগী বিদেশী ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলিকেও। ফলে বিরোধ বেধে গেল। 1763 খ্রীষ্টাব্দে—অর্থাৎ আমাদের কাহিনীর কালের পূর্ব দশকে নবাবের সৈন্যদলের সঙ্গে ইংরাজের প্রত্যক্ষ যুদ্ধ হল—প্রথমে উধুয়ানালায়, পরে ঘেরিয়ায়। পরের বছর মারা গেল মীরকাশিম।

রঙ্গমঞ্চে এবার আর্বিভূত হল দিল্লীর বাদশাহ শাহ্ আলম আর অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা।

ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির কাউন্সিলাররা কিন্তু ফিরিয়ে আনল আবার মীরজাফরকেই। তখন তার বয়স সত্তরের উপর। মাত্র দুটি বছর নবাবী করে মাটি নিল সেই বিশ্বাসঘাতক 5.2.1765 তারিখে।

তার তিন মাস পরে ক্লাইভ ফিরে এল বিলাত থেকে।

মাদ্রাজ থেকে ক্লাইভ—ততদিনে সে লর্ড ক্লাইভ—শহর কলকাতায় এসে পৌঁছাল তেশ্‌রা মে। তার দুদিন পরেই কাউন্সিলের জরুরী মিটিং ডাকল।

মীরজাফর, মীরকাশিম দুজনেই ফৌত হয়েছে—ক্লাইভের ইচ্ছা ছিল এবার বাঙলার গদীতে বসিয়ে দেবে সিরাজউদ্দৌলা-হত্যার নায়ক এবং মীরজাফর-তনয় মীরণের শিশুপুত্র মীর সৈইদকে। কারণ ক্লাইভ ততদিনে বুঝে নিয়েছে যে, কোম্পানি তাকে দ্বিতীয়বার গভর্নর করে দেবে। ঐ শিশুপুত্রকে শিখণ্ডী করে বস্তুত ক্লাইভ নিজেই হয়ে বসবে বাঙলার হর্তাকর্তা। নবাব না হলেও সুবেদার। কিন্তু তার মনের সাধে বাদ সাধল তদানীন্তন গভর্নর আর তার কাউন্সিলাররা। তারা প্রস্তাব করল বাঙলার মসনদে বসানো হবে ঢাকার ফৌজদার মহম্মদ রেজা খাঁকে। ক্লাইভের প্রথমটা প্রবল আপত্তি ছিল, কিন্তু সতেরো বছরের ঐ মেদামারা হাঁদা-গঙ্গারাম রেজা খাঁকে দেখে ক্লাইভ আশ্বস্ত হল। এই ছোকরা-নবাবকে দিয়ে কাজ চলবে—বিশেষ, ঐ কিশোর বিশ লাখ টাকার নজরানা কাউন্সিলারদের দিতে প্রস্তুত।

ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে হচ্ছে এজন্য যে, আমাদের কাহিনীর চরিত্র পুরন্দর ক্ষেত্রী ঐ স্রোতে গা ভাসাতে চেয়েছিল। একই ঢঙে, একই ছাঁদে। এবার সে-কথাই বলব।

পূর্ব-প্রান্তে যাবতীয় সুবন্দোবস্ত করে—লর্ড ক্লাইভ এল 'ওয়েস্টার্নফ্রন্টের' মহড়া নিতে। দিল্লীর নখদন্তহীন শাহ-য়েন-শাহ্ শাহ্আলম আর অযোধ্যানবাব সুজাউদৌল্লা ভিতর ন্যায়বিচার-সম্মতভাবে পিঠাবণ্টন করে দিতে।

প্রাচীন নথিপত্র হাতড়ে দেখবেন—স্থান: কাশীধাম; কাল: 1.8.1765 এবং পাত্র: লর্ড

ক্লাইভ। তখনো কাশীনরেশ বলবন্ত সিং জীবিত। ইংরাজ সেপাই-পল্টন ক্লাইভকে রাজকীয় সম্মান জানালো উনিশবার তোপধ্বনি করে। খোদায়-মালুম প্রটোকলের কোন্ ধারা মোতাবেক রাজকীয় সম্বর্ধনায় তোপধ্বনি এক কুড়ি পূরণ হল না! সে যাই হোক, ক্লাইভ দিল্লীশ্বর আর অযোধ্যা-নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে কনফারেন্সে বসল। বাহাত্তর ঘণ্টা! ব্যস্! খতম্! এতবড় একটা মহাযজ্ঞের ফয়শালা হয়ে গেল মাত্তর তিনটি দিনে। বাদশা শাহ্ আলম এবং সুজাউদ্দৌলা বোধকরি বুঝতে পেরেছিল এই বানরের পিঠাভাগ দীর্ঘায়ত করলে আহার্য-পাত্রের অবস্থা হবে—'পিপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে'!

সুজাউদ্দৌলা আর শাহ্ আলম দুজনেই ইংরাজের বিরুদ্ধে মীরকাশিমকে মদৎ জুগিয়েছিল! ফলে, আলোচনা-সভায় তাদের ভূমিকা ছিল পরাজিতের। যা পেল—'যথালাভ' বলে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

সুজাউদ্দৌলা ফেরত পেল প্রায় তার গোটা রাজত্বটাই। দুটি জেলা বাদে—এলাহাবাদ আর কোরা। সে দুটি শাহ্ আলমের খাশে রাখা হল। কাশীরাজ বলবন্ত সিং কনফারেন্স-কক্ষের আনাচ-কানাচে তিনদিন ধরেই ঘুরঘুর করছেন। জেনারেল কারন্যাককে যথেষ্ট পরিমাণ তৈলাক্ত করেও রেখেছিলেন। বস্তুত কারন্যাকের সুপারিশেই কাশীনরেশের স্বাধীনতা অটুট থাকল। কাশীরাজ্য সুজাউদ্দৌলার অধীনে রাখা হল না।

সে সময় পুরন্দরও ছিল মামাব পাশে পাশে। কী ভাবে গদী লাভ করা যায় তা স্বচক্ষে দেখেছিল। তাই কাশীনরেশ বলবন্ত সিং-এর দেহান্ত হবার পর সে দরবার করতে গিয়েছিল এলাহাবাদে। সেটা 1772 খ্রীষ্টাব্দে। ততদিনে ক্লাইভ ফিরে গেছে কলকাতায়। এলাহাবাদের ফৌজি ছাউনির দায়িত্ব মেজর কিল্‌প্যাট্রিকের। তাকেই মুরুব্বি পাকড়াও করে পুরন্দর চেষ্টা করেছিল কাশীর গদীটা পাকাপাকি হাতাতে। কিল্‌প্যাট্রিক প্রথমে সম্মত হয়েছিল। উৎকোচের অঙ্কটা দরদস্তুর করে স্থির হবার পূর্বেই হঠাৎ বেঁকে বসল কিল্‌প্যাট্রিক।

কারণ ছিল। ইতিমধ্যে বিলাত থেকে কাউন্সিলারদের উপর হুকুম এসে গেছে যে, কোম্পানির কোন কর্মচারী কাউন্সিলারেদের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে "এদেশের রাজারাজড়া নবাব-বাদশা আমীর-ওমরা কারো কাছ থেকে চার হাজার টাকার বেশি দামের উপহার, জমি জিরাৎ, জায়গির, খাজনাজমা ইত্যাদি নিতে পারবে না, আর ঐ মর্মে তাদের প্রত্যেককেই দু'-প্রস্থ করে মুচলেকা সই করে দিতে হবে। তার একটা থাকবে কাউন্সিলের দপ্তরে, আর একটা চলে যাবে লন্ডনে, ডিরেক্টরদের অফিসে।"

শুনে পুরন্দর বলেছিল, তাহলে উপায়?

মেজর কিল্‌প্যাট্রিক হেসে বলেছিল, চুটিয়ে রাজত্ব তো করেই চলেছ পুরন্দর, মাথায় ঐ মুকুটটা নাই বা চড়ালে?

পুরন্দর মুকুটহীন মাথাটা নেড়ে বলেছিল, তা হয় না! মুকুটটা আমার চাইই। আমি যদি তোমাকে মাসে-মাসে তিন হাজার ন'শ নিরানব্বই করে জমা দিতে থাকি? তাহলে কত বছর পরে তুমি ব্যবস্থা করতে পারবে?

কিল্‌প্যাট্রিক বলেছিল, হিসাবটা পরে করা যাবে। তুমি মাস-মাস পাঠাতে থাক তো!

ফাঁদে পড়ে গেছিল পুরন্দর। এ কী ঝামেলা! কবে সিংহাসন পাবে তার কোনও স্থিরতা

নেই, মাস-মাস কিস্তি দিয়ে চল? লোকটা ফৌজি জোয়ান! বেমক্কা ফৌত হয়ে গেলে? আবার কিস্তির টাকা না পাঠালেও কিল্‌প্যাট্রিক চটে যাবে! ইংরাজের দয়া না হলে সে যুগে নবাবী বা রাজত্ব করা চলত না।

কী আতান্তরিতেই পড়েছে পুরন্দর! মেজাজ তার খাপ্পা হয়ে থাকবে এতে বিচিত্র কী?

সপ্তাহখানেক আগে একদল টুলো-পণ্ডিত রাজদরবারে এসে অভিযোগ জানিয়ে গিয়েছিল মহামহোপাধ্যায় দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণবের বিরুদ্ধে। দ্বারকেশ্বর কাশীধামের সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিতদের অন্যতম। অশীতিপর বৃদ্ধ। এককালে নব্যন্যায় চর্চা করতেন। ইদানীং আর নিজে চতুষ্পাঠী পরিচালনা করেন না। তাঁর অনেকগুলি শিষ্য—প্রশিষ্য। তারাই চতুষ্পাঠীর ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। উনি নিজে সাধন-ভজন নিয়ে আছেন। প্রায় সন্ন্যাসী। আজন্ম ব্রহ্মচারী। তাঁরই গুরুগৃহে পালিতা হচ্ছিল ঐ মেয়েটি। শোনা যায়—বঙ্গভূমের, কুলীন ব্রাহ্মণবংশের বালবিধবা। সে যে কী করে এই সুদূর কাশীধামে এসে উপনীত হয়েছিল, কেমন করে ঐ মহাপণ্ডিতের স্নেহধন্যা হয়ে ওঠে, সেটা ইতিহাসের এক অনুদ্‌ঘাটিত অধ্যায়। এতদিন কাশীর নব্যপণ্ডিতেরা এ বিষয়ে নজর করেনি। কেউ ভ্রূক্ষেপও করেনি। কিন্তু অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠল কয়েক বছর পরেই।

অপরাধ সেই মেয়েটিরই: অনন্যসাধারণ মেধাবিনী সে! একে একে উত্তীর্ণ হয়ে গেল নানান পরীক্ষায়—ব্যাকরণ, স্মৃতি, কাব্য—শেষমেশ নব্যন্যায়! সহাধ্যায়ী পুরুষ প্রতিযোগীদের অনেক পিছনে ফেলে। সব শেষে মহামহোপাধ্যায় দ্বারকেশ্বর তাকে উপাধি দান করে বসলেন: বিদ্যালঙ্কার!

এটা বাড়াবাড়ি!

হতে পারে মেয়েটি মেধাবী। তাই বলে অমন সম্মানজনক উপাধি—স্ত্রীলোককে! এমন অঘটন আগে কখনো ঘটেছে? যা হোক, তাতেও কোন প্রতিবাদ ওঠেনি। বুড়ো পণ্ডিতের খেয়াল—ওটা নজর না করলেই হল।

কিন্তু দেখা গেল সেই আরবী উটের গল্পটি পুনরভিনীত হতে চলেছে। প্রথমে নাক, পরে গলা, ক্রমে সারা দেহ—শেষমেশ আশ্রয়দাতাকেই বিতাড়ন করে গোটা তাঁবুর অধিকার। হটী বিদ্যালঙ্কার বিদ্যার্ণবের পরিত্যক্ত চতুষ্পাঠীর একান্তে নিজেই একটি টোল খুলে বসেছেন। আশ্চর্য! বিদ্যার্থীদের ভিড় দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। জগমোহন তর্কবাগীশ প্রমুখ নব্যপণ্ডিতদের মনে হল—এটা শুধু আপত্তিকর নয়, অপমানজনক! কাশীর বিদ্যাচর্চার দীর্ঘদিনের ইতিহাসে এটা অভূতপূর্ব। যার উপনয়ন হয়নি, অর্কফলায় ভারতীয় সংস্কৃতির বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করার হিম্মৎ যার নেই—সেই অর্বাচীন কোন সাহসে টোল খুলে বসে! দ্বিতীয় আপত্তি, হটী বিদ্যালঙ্কার অসম প্রতিযোগিতার সুযোগ নিচ্ছেন। অন্যান্য টোল থেকে কেন যে তরুণ ছাত্রের দল ঐ চতুষ্পাঠীতে ছুটে আসছে এ কথা বুঝতে হলে দিগ্‌গজ পণ্ডিত হবার দরকার নেই। চতুষ্পাঠী তো নয়—লীলাকুঞ্জ! ছাত্ররা কেন যে মুগ্ধ হয়ে পড়া শোনে, তা কে না বোঝে! বয়সটাই যে মুগ্ধ হবার। জনশ্রুতি হটী বিদ্যালঙ্কারের চতুষ্পাঠীতে সর্বাপেক্ষা আবশ্যিক বস্তুটিই অনুপস্থিত: বেত্রদণ্ড! কী দরকার? ঈশ্বরদত্ত বিলোলকটাক্ষ যার অধিকারে, তার ছাত্ররা অমনোযোগী হবে কেন?

কাশীধাম

জগমোহন পণ্ডিতের দল এসে প্রথমে দরবার করেছিল বিদ্যার্ণবের কাছে: কাশীর নব্যপণ্ডিতসমাজ এ জাতীয় অনাচার বরদাস্ত করবে ন'!

দ্বারকেশ্বর ধৈর্য ধরে ওদের বক্তব্য শুনলেন। অর্থগ্রহণ হল না। প্রশ্ন করেন, এটাকে 'অনাচার' বলছ কেন?

—কাশীধামে কোনও স্ত্রীলোক কখনো কোনও চতুষ্পাঠী পরিচালনা করেনি।

—মানছি। কাশীধামে আজকের প্রভাতটিও ইতিপূর্বে আসেনি!

—আজ্ঞে?

—বাপু হে! যা কখনো হয়নি তা কখনো হবে না—এটা তোমাদের কেমন যুক্তি? ঐ যুক্তিতে 'ম্লেচ্ছান্ মূর্ছয়তে' দশম অবতার এলে তোমরা তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারবে?

—আমরা সে কথা বলছি না। বল্‌ছি, স্ত্রীলোকের ধর্ম ভিন্ন প্রকার। বেদপাঠের অধিকার তার নাই!

—আমি সে মত স্বীকার করি না!

—শূদ্র এবং স্ত্রীলোকের যে বেদপাঠের অধিকার নাই—এই ধ্রুবসত্যকে আপনি স্বীকার করেন না?

বিদ্যার্ণব বললেন, দেখ বাবাসকল! আমার একার মতামতে তো কিছু হবে না। তোমরা বরং একটি বিচার সভার আয়োজন কর। স্ত্রীজাতির বেদাধ্যয়ন, বেদাধ্যাপনের অধিকার ব্রাহ্মণ্যধর্মে স্বীকৃত কি না সেটাই হবে বিচার্য বিষয়। তোমরা তোমাদের ভিতর থেকে পাঁচজন প্রতিনিধিকে নির্বাচন কর। তর্কযুদ্ধে আমার পালিতকন্যাটিকে পরাস্ত কর। তার পর কাশীর পণ্ডিতসমাজ যথাকর্তব্য করবেন।

নব্যপণ্ডিতের দল সানন্দে স্বীকৃত হল। বললে, তাহলে আপনিই হবেন সে সভার বিচারক।

দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করেন বিদ্যার্ণব, না। তা হবে না। যেহেতু এ বিষয়ে আমি স্থিরসিদ্ধান্ত। আমার বিচার একদেশদর্শী হয়ে যাবে। ও বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত না হলে আমি আমার পালিতা কন্যাটিকে চতুষ্পাঠীতে গ্রহণ করতাম না। তাকে বেদাভ্যাস করতে দিতাম না। তোমরা বরং কাশীধামের তিনজন সর্বাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায়কে সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ কর।

অগত্যা তাই। স্থির হল, প্রধান বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করবেন মহাপণ্ডিত রামপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন। বিদ্যার্ণবের অনুরোধে তিনি স্বীকৃতি হলেন এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে।

রামপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন কাশীর পণ্ডিত সমাজের এক প্রখ্যাত নৈয়ায়িক। আদি নিবাস হুগলীর ইলছোবা গ্রামে। বাঁশবেড়িয়া বিদ্যাসমাজের ভট্টাচার্য বংশীয় এই মহাপণ্ডিত আকৈশোর কাশীবাসী। প্রসঙ্গত বলি, আমাদের আখ্যায়িকার যে সময়কাল তার সতের বছর পরে, 1791 খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিরাশী বৎসর বয়সে তখন ঐ রামপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন সেখানে ন্যায়ের প্রথম অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। আর তার পরের বাইশ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে অধ্যাপনা করে এই অসাধারণ পণ্ডিত যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন তাঁর বয়স: একশ তিন! তখন তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ! তবু নিষ্কৃতি পাননি। অবসর গ্রহণের পরেও অনেক জ্ঞানপিপাসু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসত। অন্ধ পণ্ডিতের স্মৃতি-মঞ্জুষায় থরে থরে সাজানো জ্ঞানের মাধ্যমে তারা তাদের 'অনুপপত্তি' নিরাকরণ করে যেত!

আমাদের কাহিনীর কালে তাঁর বয়স চৌষট্টি। তাঁর দুই সহকারী বিচারক — শ্রীজীব ন্যায়াধীশ এবং শ্রীরতনলাল ব্রহ্মচারী।

প্রথমে স্থির হয়েছিল বিচার সভার আয়োজন করা হবে দুর্গাবাড়িতে। দুর্গাবাড়ি তখন যুবতী—মাত্র উনিশ বছর বয়স তার। নাটোরের পুণ্যশ্লোক রানী ভবানী নির্মিত এ মন্দিরের পোড়ামাটির মূর্তিগুলি তখন ঝকঝক্-তক্তক্ করছে। কিন্তু পরে স্থান পরিবর্তন করতে হল। বিপুল জনসমাগমের আশঙ্কায়। আলোচনা হবে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে—যা শ্রোতৃবৃন্দের বৃকোদরভাগের কাছে অর্থহীন। তা হোক—বিচার্যবিষয়টি অতি অদ্ভুত। তার চেয়ে বড় কথা—প্রতিযোগীদের এক তরফে পাঁচজন নব্যপণ্ডিত, অন্যদিকে এক যুবতী! এ যে অবিশ্বাস্য! কাশীর অতিবৃদ্ধ নাগরিকেরাও স্মরণ করতে পারলেন না—কোন বিচারসভায় স্ত্রীলোক প্রতিযোগীরূপে আবির্ভূতা!

স্থির হল, দুর্গাকুণ্ডের অনতিদূরে 'কুরুক্ষেত্র তালাও'-এর মুক্তমণ্ডপে এই বিচারসভার আয়োজন করা হবে। এই তালাওটিও রাণী ভবানীর কীর্তি।

নব্যপণ্ডিতেরা দলে ভারি। তারা মোটামুটি নিশ্চিন্ত। বারোহাত কাপড়ে যে হতভাগিনী কাছা দিতে শেখেনি—দেবার চেষ্টা করছে এখন—তাকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করা তো ছেলেখেলা! দ্বারকেশ্বর নেহাৎ স্নেহে অন্ধ। সংসারধর্ম করেননি, শেষবয়সে পালিতা কন্যার পিতা হয়েছেন—তাই ওকে 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধি দিয়ে বসে আছেন!

মেয়েটির বিরুদ্ধে শুধু টুলো পণ্ডিতেরা নন, আবও একদল সোচ্চার। বাবাণসীধামের কিছু বিচক্ষণ কবিরাজ। যাঁরা চতুষ্পাঠী আদৌ পরিচালনা করেন না—দেহধারী মানুষের আধি-ব্যাধিই যাঁদের উপার্জনের রাজপথ। ঐ দুর্বিনীতা নাকি তাঁদেরও যারপরনাই অপমান করেছে। মেয়েটির দাবী—কাশীধামে আগমনের পূর্বেই সে নাকি চরক, সুশ্রুত, নিদান আয়ত্ত করে বসে আছে। দেবমূর্তির পিছনে চালচিত্রের মতো অনৃতভাষণের পশ্চাতে একটা বিশ্বাসযোগ্যতার আচ্ছাদন প্রয়োজন। তাও ও মেয়েটি জানে না। হিসাব মতো সে কাশীতে এসে পৌচেছে পঁচিশ বছর বয়সে। তার পূর্বে সেই এরণ্ডের-দেশ বঙ্গভূমে কে ঐ যুবতীকে চরক, সুশ্রুত শিখিয়েছে? আর কী আকাশচুম্বী স্পর্ধা! সে আর্তের সেবা করতে চায়! শিকড়, বাকড়, ঘাস-পাতা, জড়ি-বুটি খাইয়ে। যদি বলতিস্ —ডাকিনীবিদ্যা জানি, তাহলেও না হয় মেনে নেওয়া যেত! আয়ুর্বেদশাস্ত্র যে বিজ্ঞানসম্মত! দীর্ঘদিন ভেষগাচার্যের পদতলে বসে শিক্ষা না করলে তাতে অধিকার জন্মায় না। বয়ঃপ্রাপ্তি হওয়ার পূর্বে সে বিদ্যা শিক্ষা করা যায় না। এমন কি যেসব হতভাগ্যের জন্য অন্তর্জলিযাত্রার নিদান হেঁকেছেন কাশীর সর্বাগ্রগণ্য কবিরাজেরা—ও তাদেরও দায়িত্ব নিতে চায়! অপিচ তাদের দু-চারজনকে নিরাময় করে সে গঙ্গাতীর থেকে সংসারাশ্রমে ফেরত পাঠিয়েছে! দুর্বিনীতা এই সহজ কথাটাও জানে না—অন্তর্জলি যাত্রা থেকে প্রত্যাবর্তন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ! তাছাড়া এর অর্থ কী? একটাই অর্থ—প্রতিষ্ঠাবান ভেষগাচার্যদের বেইজ্জত করা! অপমান করা! নয় কি?

সভার একপ্রান্তে একটি উঁচু বেদী। সেখানে তিন বিচারকের অজিনাসন। তার দক্ষিণে পঞ্চ নব্যপণ্ডিতের আসন। বামে একটিমাত্র আসন, প্রতিবাদীর। বেদীর দক্ষিণপার্শ্বে আর একটি পৃথক বেদীর উপর রত্নখচিত সিংহাসন। সেটি কাশীনরেশের জন্য চিহ্নিত। যেহেতু কাশীনরেশ

বলবন্ত সিং লোকান্তরিত, তাঁর উত্তরাধিকারী নাবালক—তাই ঐ সিংহাসনের উপর আনুষ্ঠানিকভাবে রাখা আছে কাশীরাজের রাজদণ্ডটি। সম্মুখে দর্শকদের আসন। 'শ্রোতৃবৃন্দ' শব্দটি সুপ্রযুক্ত হবে না—কারণ আলোচনা হবে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে। দূর-দূরান্ত থেকে যারা এসেছে, তারা শুনতে আসেনি, এসেছে তামাশা দেখতে। তামাশা বইকি! স্ত্রীলোক, অথচ পুরুষের বেশ! অবগুণ্ঠন নাই, অর্কফলা! সে সমানতালে তর্ক করতে চায় পুরুষের সঙ্গে। তামাশা নয়?

বামপ্রান্তে চিকন মাদুরের একটি চিকের আড়াল। এটি মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট। এটিও অভূতপূর্ব! কাশীর কোনও বিচারসভায় ঐ চিকের ব্যবস্থা কখনো হয়নি। যাত্রার আসরে তা থাকে; কীর্তন, রামলীলা বা কবিগানের ব্যবস্থা হলে চিকের আড়াল থাকে। কিন্তু বিচার সভায় চিকের আড়াল! এ তো নপুংসকের বিবাহে ছাদনাতলার ছাউনি! এ তো অহৈতুকী! মহিলা তো কেউ আসবে না!

হটী বিদ্যালঙ্কার সে যুক্তিটি মেনে নিতে পারেননি। বলে পাঠিয়েছিলেন —কেউ আসুক, না আসুক ঐ ব্যবস্থা থাকা চাই!

স্ত্রীলোকের জিদ্দিবাজি! ঠিক আছে, মা!

বিচারারম্ভের পূর্বেই সভামণ্ডল পরিপূর্ণ। হটী বিদ্যালঙ্কার সভায় এলেন—না, পালকি চেপে নয়, পদব্রজে। অনেকটা পথ হেঁটে। আশ্রম থেকে এই মণ্ডপের দূরত্ব প্রায় এক ক্রোশ!

মুণ্ডিত মস্তক। দীর্ঘ শিখাপ্রান্তে একটি শ্বেতকরবী পুষ্প অনুবিদ্ধ। পরিধানে পট্টবস্ত্র—শাড়ি নয়, ধুতি। পুরুষের মতো কাছা-কোঁচা দিয়ে পরা। নগ্নপদ। ঊর্ধ্বাঙ্গে ঢিলে-ঢালা পিরান, তদুপরি নামাবলী। কর্ণাভরণ নাই, দু'হাতে নাই কোনও অলঙ্কার, শুধু প্রতিযোগীদের উপবীতের পরিপূরক কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা।

একাকী নন। দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণবের গুরুকুলভুক্ত অনেকেই পদব্রজে তাঁর সঙ্গে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে এসেছেন। সর্বাগ্রে আসছিলেন প্রধান আচার্য স্বয়ং। অশীতিপর বৃদ্ধ—কিন্তু বয়সের ভারে নুয়ে পড়েননি। তাঁরও মস্তক মুণ্ডিত, দীর্ঘ অর্কফলা। ঊর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ, শুধু সামবেদী দীর্ঘ যজ্ঞোপবীত। পাশে পাশে আসছে রমারঞ্জন ভট্টশালী—হটী বিদ্যালঙ্কারের সহাধ্যায়ী। একটি তালপাতার ছত্র বৃদ্ধের মাথার উপর ধরে। সভায় বিচারকদল ইতিপূর্বেই এসেছেন। প্রতিপক্ষরা উপস্থিত। দর্শকের আসনগুলিও পূর্ণ। দূর থেকে শোভাযাত্রাটিকে আসতে দেখেই একটা কলগুঞ্জন উঠল: এসে গেছেন। এসে গেছেন।

কোথাও কিছু নেই, ঘেরাটোপ চিকের আড়াল থেকে বেজে উঠল মঙ্গলশঙ্খ। সকলেই হতচকিত। এমনটি তো হবার কথা ছিল না!

হটী বিদ্যালঙ্কার তাঁর গুরুর কর্ণমূলে কী যেন অনুমতি প্রার্থনা করলেন মনে হল। বৃদ্ধ শিরশ্চালনে সম্মতি জানালেন। পদপ্রক্ষালনান্তে তিনি দর্শকদলের প্রথম সারিতে তাঁর চিহ্নিত আসনে উপবেশন করলেন। আজ তিনি শ্রোতামাত্র।

ততক্ষণে হটী বিদ্যালঙ্কার একাকী অগ্রসর হয়ে গেলেন ঐ ঘেরাটোপের দিকে। তাঁর সহযাত্রীরা, যারা এতক্ষণ শোভাযাত্রা করে আসছিল—তারা একে একে দর্শক-সভায় আসন গ্রহণ করল।

বিদ্যালঙ্কারের দুরন্ত কৌতূহল হয়েছিল—শঙ্খধ্বনি করল কে? তাঁর ধারণা ছিল ঐ অংশটা জনশূন্য পড়ে থাকবে। এ শুধু নারীর সম-অধিকারের দাবীতে; জেনে বুঝে যে, বিচারসভায় কোন স্ত্রীলোক উপস্থিত থাকবে না। সভায় উপস্থিত হয়েই টের পেলেন, তাঁর ধারণাটা ভ্রান্ত!

হটী পর্দা সরিয়ে ভিতরে এলেন।

দেখলেন মাত্র দুইজন মহিলা বসে আছেন।

দুজনেই উঠে এসে ওঁর চরণবন্দনা করলেন। একজনকে সহজেই চিনতে পারলেন—স্বর্গত কাশীনরেশের বিধবা। রাজরানী—কিন্তু নিরাভরণা। দ্বিতীয়াও তাই। সম্পূর্ণ নিরাভরণা, ফেনশুভ্র থান তাঁর পরিধানে। অপূর্ব সুন্দরী। কণ্ঠে একটা স্ফটিকের মালা।

বিদ্যালঙ্কার রানীকে বললেন, আপনি যে এ সভায় আসতে পারবেন তা ভাবতে পারিনি। কিন্তু ইনি-- ?

রানী বললেন, ইনি তারাসুন্দরী। ঘটনাচক্রে উনি এখন কাশীধামে। আমি তো কিছুই বুঝব না, উনি হয়তো কিছু কিছু বুঝবেন।

তারাসুন্দরী সলজ্জে বলেন, না, না, আমার সংস্কৃতজ্ঞান অতি অল্প। আজ যদি মা কাশীতে থাকতেন......

—মা?—বিদ্যালঙ্কার জানতে চান।

রানী-মা বলেন, আপনি ওঁকে চিনতে পারেননি। উনি নাটোরের স্বনামধন্যা রানী ভবানী—যাঁর দেবোত্তর ভূখণ্ডে এই বিচারসভার আয়োজন হয়েছে—তাঁরই একমাত্র কন্যা।

বিদ্যালঙ্কার যুক্তকরে বলেন, আপনার জননী তো প্রাতঃস্মরণীয়া! আপনি এ সভায় এসে আমাকে কৃতার্থ করেছেন।

যুক্তকরে কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে তারাসুন্দরী প্রতিবাদ করেন, এ আপনি কী বলছেন! আপনি নারীমুক্তির প্রথম ধ্বজাধারিণী! এ তো আমাদের কর্তব্য!

এই তাহলে সেই তারাসুন্দরী—ভাবেন বিদ্যালঙ্কার—রানী ভবানীর আত্মজা। বালবিধবা। অসাধারণ রূপবতী—তা তো স্বচক্ষেই দেখছেন। যাঁর সৌন্দর্যে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে বাঙলার সেই শেষ নবাব তারাহরণের চক্রান্ত করেছিল। ঐ অনিন্দ্যকান্তির রূপই হচ্ছে পরোক্ষ কারণ, যে জন্য পুণ্যশ্লোক নাটোরের রানী ভবানী পলাশী-প্রান্তরে সিরাজপক্ষে যোগ দিতে পারেননি।

ইতিহাস যুগে যুগে একই কাহিনী লিখে চলেছে। পুনরুক্তি দোষের দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার—লঙ্কেশ্বর রাবণ—আলাউদ্দিন খিলজী—মুর্শিদাবাদের সিরাজ!

ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলেন সভামণ্ডপে। বিচারবেদীতে পদার্পণের পূর্বে মুণ্ডিত মস্তকটি সেই মৃত্তিকা বেদিকায় স্পর্শ করালেন। বিচারক ও সমাগত পণ্ডিতদের সমবেত প্রণাম জানিয়ে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন তাঁর নির্দিষ্ট আসনে। উপবেশন করলেন ধ্যানস্থ যোগীর ভঙ্গিতে—সমংকায়শিরোগ্রীব।

ক্ষত্রিয়ের বেশে চিত্রাঙ্গদা যুদ্ধ করেছিলেন অর্জুনের সঙ্গে। ব্রাহ্মণের বেশে বিদ্যালঙ্কার আজ যুদ্ধ করতে এসেছেন পঞ্চপণ্ডিতের সঙ্গে। বেশভূষায় যদিচ নারীত্বের বাষ্পমাত্র নাই, তবু ত্রিংশতিবর্ষীয়ার প্রকৃতিদত্ত প্রভায় বিচারসভাটি যেন প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

প্রধান বিচারক মহাপণ্ডিত রামপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন তাঁর কৌতূহলটি গোপন করতে পারলেন না। বললেন, এ তোমার কী বেশ, মা?

—যে প্রতর্কের সমাধান সন্ধানে আপনাদের দ্বারে উপস্থিত হয়েছি এ তারই উপযুক্ত সাজ, বাবা!

নামিয়ে রাখলেন বিচারকদের পদপ্রান্তে ভূর্জপত্রে রচিত তাঁর স্বীকৃতি-প্রতিজ্ঞা। সংস্কৃতে, দেবনাগরী হরফে:

নিম্নস্বাক্ষরকারী, আদি নিবাস সোঞাই বর্ধমানভুক্তি, গৌড়দেশ, পিতা ৺রূপেন্দ্রনাথ ভেষগাচার্য, বর্তমানে মহামহোপাধ্যায় দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণবের গুরুকুলভুক্তা বিদ্যার্থী, এই মত কড়ার করিলাম বিচার মানিলাম, তাহাতে পাতসাহী শুভ শ্রীমন্ মহারাজ কাশীনরেশের অনুজ্ঞাক্রমে দলিল লিখিয়া দিলাম। অদ্য বিচারসভায় স্ত্রীজাতীয়ার অধ্যাপন ও বেদাধ্যয়ন সংক্রান্ত যে সিদ্ধান্ত হইবে তাহা মানিতে বাধ্য থাকিব।

প্রতিপক্ষ পঞ্চপণ্ডিতের তরফে জগমোহন তর্কবাগীশ তাঁদের প্রতিজ্ঞাপত্রটি এবার পেশ করলেন। সেটি পাঠান্তে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন হটী বিদ্যালঙ্কার। বললেন, না, এই শর্তে আমি বর্তমান বিচারসভায় অংশগ্রহণ করিতে আসিনি। হটী বিদ্যালঙ্কারের এই কাশীধামে চতুষ্পাঠী পরিচালনার অধিকার আছে কি নাই, এ প্রশ্ন বিচারসভার এক্তিয়ার-বহির্ভূত, বাহুল্য ও প্রক্ষিপ্ত।

জগমোহন মৃদু হেসে বলেন, আমাদের তো ধারণা ছিল, সেটাই এই বিতর্কসভার আলোচ্য।

—তাহলে বলব, আপনারা ভ্রান্ত ধারণার বশীভূত। মহামহোপাধ্যায় দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণবের চতুষ্পাঠীভুক্তা জনৈকা বিদ্যার্থীকে কাশীর পণ্ডিতসমাজ বিদ্যালঙ্কার উপাধি প্রদান করেছেন; তাঁকে চতুষ্পাঠী পরিচালনের অনুমতিও দান করা হয়েছে। কাশীনরেশের অনুপস্থিতিতে রাজগুরুর অনুমতিক্রমে রাজমাতা সে আদেশে পাতসাহী ছাপও দিয়েছেন। এক্ষেত্রে বর্তমান বিচারসভায় পূর্বপক্ষীয় প্রতিযোগীদের সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের কোন অধিকার নাই! আমার বিশ্বাস ছিল, আজিকার বিচারসভার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক—নারীর অধ্যাপনা ও বেদাধ্যয়নের অধিকার আছে বা নাই। এটুকুই বিচারসভার এক্তিয়ারভুক্ত। আমি মাননীয় বিচারকমণ্ডলীর নির্দেশপ্রার্থী।

বিচারকত্রয়ী নিম্নকণ্ঠে আলোচনা করে বিদ্যালঙ্কারের মতটিই স্বীকার করে নিলেন। দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণবের গুরুকুল যাঁকে চতুষ্পাঠী পরিচালনার অধিকার দিয়েছেন, রাজমাতা যা অনুমোদন করেছেন সেইসব প্রসঙ্গে সন্দেহ প্রকাশ করার কোনও অধিকার পঞ্চ নব্যপণ্ডিতের নাই। তাঁরা নির্দেশ দিলেন, পূর্বপক্ষকে নূতনভাবে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখে দিতে হবে।

জগমোহন ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে, কী লিখতে হবে বলুন?

বিদ্যালঙ্কার বলেন, আপনাদের এই মর্মে স্বীকৃতিপত্র দিতে হবে যে, তর্কে পরাজিত হলে ভবিষ্যতে কোনও মহিলা-পণ্ডিতকে কোনভাবেই বাধা দেবেন না।

তর্কবাগীশ রুখে ওঠে, তা কী করে সম্ভব? ভবিষ্যতে যে মহিলা ঐ জাতের ধৃষ্টতা দেখাবেন, তাঁর শিক্ষা বা জ্ঞান কতদূর তা আমাদের বিচার করে দেখতে হবে না!

—না! নিশ্চয় নয়! সে বিষয়টি বিচার করে দেখবেন যে গুরুকুল তাঁকে অধ্যাপন-অধিকার

প্রদান করছেন, দেখবেন কাশীনরেশ সে সিদ্ধান্তে পাতসাহীছাপ দেওয়ার পূর্বে। আপনাদের কী অধিকার? কে দিয়েছে সেই দায়িত্ব?

এবারও বিচারকত্রয়ী বিদ্যালঙ্কারের মতই স্বীকার করলেন। পঞ্চপণ্ডিতকে সেই মর্মে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখে দিতে হল।

শুরু হল বিচার।

যুক্তি-তর্ক, প্রতিতর্ক, বিপ্রতীপতর্ক, উদ্ধৃতি, অনুজ্ঞা, নির্দেশ। জগমোহন এবং তাঁর সহযোগীরা স্তূপাকারে সাজিয়ে রেখেছেন নানান পুঁথি। যখন যা প্রয়োজন যেন হাতের কাছে পাওয়া যায়।

তালিকা মিলিয়ে ক্রমে ক্রমে যুক্তিগুলি পেশ করতে থাকেন। নানান পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, স্ত্রীজাতীয়াকে হিন্দুধর্ম বেদপাঠের অধিকার দেয়নি, বস্তুত তার দেবার্চনা, দেবপূজার অধিকার নাই। শুধু স্বামীসেবা:

গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।।

অর্থাৎ দ্বিজগণের গুরু হচ্ছেন অগ্নি, ব্রাহ্মণ সকল বর্ণেরই গুরু, অতিথি গৃহস্থের গুরু আর স্বামী স্ত্রীলোকের পরম গুরু।

বিদ্যালঙ্কার বললেন, এটি কোনও প্রামাণ্য শাস্ত্রবাক্যরূপে চিহ্নিত করা যায় না। সম্ভবত এটি একটি উদ্ভট শ্লোক। কিন্তু পূর্বপক্ষ যখন সেটিকেই যুক্তি হিসাবে দাখিল করেছেন তখন তারই বিচার করি: অগ্নি নির্বাপিত হলে অরণি কাষ্ঠের সাহায্যে তাকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়। অতিথির অভাব কোন গৃহস্থকেই কখনো সহ্য করতে হয় না, বিশেষ করে আমাদের মতো দরিদ্র দেশে। মন্ত্রটি যখন ব্রাহ্মণ-রচিত তখন ব্রাহ্মণদেরই সকলের গুরু হিসাবে দেখানো স্বাভাবিক। কিন্তু স্বামী? কোথায় তার পরিপূরক? এই ব্রাহ্মণ্যধর্মে? পতিব্রতা সাধ্বী বিধবা হয়ে পড়লে তখন সে গুরু কোথায় পাবে? তখন সে যদি স্বাবলম্বী হতে চায়—নিজের এবং সন্তানের অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন মেটাতে—তখন তাকে উপার্জনক্ষম হতেই হয়। সেই বিধবা যদি বিদুষী হন, তাহলে তাঁকে চতুষ্পাঠী পরিচালনাই বা করতে দেওয়া যাবে না কেন? অন্যথায় সে কীভাবে তার এবং তার সন্তানের ভরণপোষণ করবে? তার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবে?

তর্কবাগীশ বললেন, করবে না। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যর এই ধারণাটা অর্বাচীন, প্রাচীন শাস্ত্রে তার কোনও স্বীকৃতি নেই। বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রে স্পষ্ট নির্দেশ আছে:

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।।[১]

বিদ্যালঙ্কার বললেন, বশিষ্ঠের এই ধর্মসূত্রটি সাধারণ সূত্র। আর্য ঋষিরা যাযাবরবৃত্তি ত্যাগ করে যখন কৃষিনির্ভর সমাজব্যবস্থা গ্রহণ করছেন, মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার গোষ্ঠী ও কৌম যখন পিতৃতান্ত্রিক 'কুল' ও 'প্রবর'-এর জন্ম দিচ্ছে তখন এই নীতি সাধারণভাবে গ্রাহ্য হয়েছিল।

---

[১] কুমারীকালে নারীকে রক্ষা করবেন পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্ররা। নারীর স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য বলে কিছু নাই [৫/১-২]।

সূতিকাগৃহে যে কন্যা পিতৃহীন হয়ে যাচ্ছে, যৌবনপ্রাপ্তির পূর্বেই যে বিধবা হয়ে যাচ্ছে, তার প্রতি যে এই সাধারণ সূত্র প্রযোজ্য নয় এ-কথা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

—আপনি কি তাহলে সেই ব্যতিক্রমক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের অধিকার প্রার্থনা করছেন?

—নিশ্চয় নয়। শৈশবে পিতৃহীন, কৈশোরে বিধবা না হলে স্ত্রীলোক বিদ্যাচর্চা করতে পারবে না এ-কথা আমি বলছি না। আমি সাধারণভাবেই বলতে চাই—'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' বিধানটি ক্ষেত্রবিশেষে প্রযোজ্য হলেও সর্বত্র স্বীকার্য নয়।

—কিন্তু ভারতীয় শাস্ত্রে সর্বত্র এই নির্দেশই আছে যে, স্ত্রী সর্বদা স্বামীর অনুগামিনী হবেন। শতপথ ব্রাহ্মণ বলছেন, "স্ত্রীয়ঃ পুংযোঽনুবর্ত্মানো ভাবুকাঃ"[১]। বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলছেন, "পতিং বা অনুজায়া"[২]।

বিদ্যালঙ্কার সহাস্যে বললেন, আপনি শতপথ ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের উদ্ধৃতি শুনিয়েছেন। তার প্রত্যুত্তরে আমি ঋগ্বেদের উদ্ধৃতি দিই। ঋগ্বেদের ঋষি বলছেন, "উষো যাতি স্বসরস্য পত্নী[৩]। অর্থাৎ পতি-সূর্য পত্নী-উষার অনুগমন করেন। এবার আপনিই বলুন—কোন নির্দেশটি মানবেন? বৈদিক নির্দেশ অথবা পরবর্তী যুগের রচনা?

—ঋগ্বেদের ঋষি ওখানে কবিত্ব করেছেন মাত্র!

—কিন্তু তথ্যটা প্রাকৃতিক। সূর্যপত্নী উষা কোনদিন সূর্যের অনুগমন করেন না!

তর্কবাগীশ বলেন, মনে হচ্ছে আমরা সামাজিক বিধান এবং তত্ত্বকথা ছেড়ে কাব্য নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠেছি। আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করি: ব্রাহ্মণ্যধর্মে স্ত্রীলোক বেদমন্ত্র পাঠ করতে পারত না। স্বামী যজ্ঞ করলে সে শুধু উপস্থিত থাকত, কোন মন্ত্রোচ্চারণ করার অধিকার তার ছিল না—"ন স্ত্রী জুহুয়াৎ"[৪]। বৈদিক যজ্ঞের পূর্বার্ধ স্বয়ং যজমান, উত্তরার্ধ তার পত্নী, কিন্তু পত্নী শুধু তার স্বামীর পাশে বসে থাকার অধিকার লাভ করত। শতপথ ব্রাহ্মণের স্পষ্ট নির্দেশ—"পূর্বার্ধো বৈ যজ্ঞস্যাধ্বর্যুর্দ্ধর্জঘনার্ধং পত্নী"[৫]।

—জানি। সে জন্য শ্রীরামচন্দ্র স্বর্ণসীতাকে বামে বসিয়ে যজ্ঞ সম্পাদন করতে চেয়েছিলেন। তাতে কী প্রমাণ হয়?

—প্রমাণ হয় "অস্বতন্ত্রা ধর্মে স্ত্রী"[৬] সন্তান উৎপাদন, স্বামীসেবা, এবং গৃহকর্ম ব্যতীত সামান্য দু' একটি বৃত্তি কুলনারীর অধিকারভুক্ত বলে শতপথব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে, যথা—পশম পাকানো, বোনা, সূতা-কাটা বা রেশমের গুটি বানানো। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ তো বহু দূরের কথা, বৈদিকমন্ত্র তাঁদের শোনাও পাপ। বোধকরি যজমানের বামপার্শ্বে উপবিষ্টা তদীয় পত্নীর কর্ণমূলে কার্পাসখণ্ড প্রবিষ্ট করার বিধান ছিল, কারণঃ "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা"[৭]

[১] নারীর কর্তব্য পুরুষের অনুগামিনী হওয়া [১৩/২/২৪]।

[২] স্ত্রী স্বামীর পশ্চাতে অনুগমন করবে [১/৯/২/১৪]।

[৩] উষা সূর্যদেবের আগে আগে যান [১/১১৫/২]।

[৪] নারী হোম করতে পারবে না [অবাস্তব ধর্মসূত্র ২/৭/১৫/১৭]।

[৫] যজমান পূর্বার্ধ, তদীয় পত্নী যজ্ঞের উত্তরার্ধ [শ· ব্রা· ১/৯/১/২, ৫/২/১-১০]।

[৬] ধর্মচারণে নারীর কোন স্বাতন্ত্র্য নেই, ভূমিকা নেই [গৌতম ধর্মসূত্র, ১৮/১]।

[৭] স্ত্রীলোক, শূদ্র এবং ব্রাহ্মণদের বন্ধুস্থানীয় ক্ষাত্রিয়-বৈশ্য আদির পক্ষে তিন বেদের মন্ত্র শোনাও পাপ।

এটিকে আপনি নিশ্চয় অর্বাচীন শ্লোক বলবেন না, কারণ এ শ্লোক যখন রচিত হয়েছিল তখন 'অথর্ববেদ' পর্যন্ত অনুপস্থিত। তাই 'ত্রয়ী' বলা হয়েছে। অর্থাৎ 'ঋক্, সাম ও যজুঃ বেদই তখন উপস্থিত।

বিদ্যালঙ্কার বললেন, এটিও কোনও বৈদিক সূক্ত নয়। মনে হয় ঐ শ্লোকটি খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম থেকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে রচিত, কারণ সেই সময়েই সূত্রসাহিত্য সংকলিত হয়। যে কোন হেতুতেই হোক সূত্ররচনাকার অথর্ববেদকে পরিত্যাগ করেছেন। সে যাই হোক, আলোচ্য শ্লোকে বক্ষ্যমান তিনটি দৃষ্টিকোণ—স্ত্রীলোক, শূদ্র এবং ক্ষত্রিয়-বৈশ্য। সম্ভবত এ শ্লোক মহাকাব্য যুগের পূর্বে রচিত—না হলে শম্বুক উপাখ্যানে বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করতেন না…

সভায় একটা অস্ফুট গুঞ্জন শ্রুত হল।

বিদ্যালঙ্কার তৎক্ষণাৎ সংযত হলেন। যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়ে বলেন, আমি কোনভাবেই শ্রীরামচন্দ্রের পূত চরিত্রে অথবা আদি কবির রচনার সমালোচনা করতে চাইছি না। তাঁরা তৎকালীন সামাজিক নির্দেশে পরিচালিত হয়েছিলেন মাত্র। কিন্তু অপর দুইটি দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আছে। উপনিষদের যুগে "ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব নরপতিরা অনেকেই আত্মজ্ঞানের উপদেষ্টা ছিলেন; ব্রাহ্মণ সন্তানেরা তাঁহাদের সমীপে শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তদ্বিষয়ে উপদিষ্ট হইতেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে স্পষ্টই লিখিত আছে, প্রবাহন রাজা গৌতম ঋষিকে কহিতেছেন—

যথেয়ন্ন প্রাক্ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্
গচ্ছতি তস্মাদুসর্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যেব
প্রশাসনমভূদিমি।"—ছান্দোগ্য ।৫।৩।৭।[১]

অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের সমান্তরালে আদি যুগে ক্ষত্রিয় নৃপতিরাও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতেন। ব্রাহ্মণরা তাঁদের শিষ্যত্বও গ্রহণ করেছেন। যেমন বিশ্বামিত্র মুনি, যেমন কাশীমহিষী মদালসা।

তৃতীয় দৃষ্টিকোণ: নারীজাতি।

সে সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করার পূর্বে আমি পূর্বপক্ষকে একটি প্রতিপ্রশ্ন পেশ করছি: 'উপাধ্যায়া' এবং 'উপাধ্যায়িনী' শব্দদ্বয়ের পার্থক্য কী?

তর্কবাগীশ কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে বলেন, মতভেদে কিছু যোগরূঢ় অর্থভেদ হতে পারে, মূলত শব্দ দুটি সমার্থক। তার অর্থ: অধ্যাপকের সহধর্মিণী।

হাসলেন হটী বিদ্যালঙ্কার। বললেন, বিশ্বাস করা কঠিন, এমন দুইটি বহুলব্যবহৃত শব্দের অর্থ পূর্বপক্ষীয় পণ্ডিতদের জানা নাই। ঐ শব্দ দুটি আদৌ সমার্থক নয়। পাণিনির সুস্পষ্ট নির্দেশে 'উপাধ্যায়িনী' শব্দের অর্থ উপাধ্যায়ের স্ত্রী; এবং 'উপাধ্যায়া' শব্দের একটিমাত্র অর্থ —'স্ত্রী-জাতীয়া অধ্যাপক' বা অধ্যাপিকা। আমি সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীকে সম্বোধন করে প্রশ্ন

---

[১] উদ্ধৃতিটি অক্ষয়কুমার দত্ত বিরচিত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'(করুণা প্রকাশনী, ১৩৯৪, পৃঃ ১১১) থেকে। বিদ্যালঙ্কার এ ভাষায় কথা বলছেন তা লেখকের কল্পনা—কিন্তু তথ্যটা যে কাল্পনিক নয় এটা বোঝাতে ঐ উদ্ধৃতি। শ্লোকের অর্থ: "তোমার পূর্বে ব্রাহ্মণদের এই বিদ্যায় অধিকার ছিল না। অতএব সর্বত্র ক্ষত্রিয়জাতিরই ইহা উপদেশ দেবার অধিকার ছিল।"

রাখছি—এখানে এমন কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কি আছেন, যিনি আমার সঙ্গে একমত নন? অর্থাৎ 'উপাধ্যায়া' শব্দের অন্য কোনও যোগরূঢ় ব্যবহার যিনি লক্ষ্য করেছেন? থাকলে, তিনি অনুগ্রহ করে আমার ভ্রান্তি অপনোদন করুন।

সভাস্থলে মৃদু গুঞ্জনই শুধু উঠল। হটী বিদ্যালঙ্কারের সঙ্গে তাঁরা যে একমত তা বোঝা গেল।

বিদ্যালঙ্কার পুনরায় বলতে থাকেন, ঐ শব্দটির অস্তিত্বই প্রমাণ করে—ব্যবহারিক প্রয়োজনে শব্দটির সৃষ্টি হয়েছিল। স্ত্রীজাতীয়া অধ্যাপকের অস্তিত্ব না থাকলে তার অর্থবোধক ঐ শব্দটি আদৌ সৃষ্টি হত না। এবার আমার প্রশ্ন—বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক-গার্গী উপাখ্যান:

মিথিলাধিপতি জনক একবার এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছেন। দেশ-দেশান্তর থেকে দক্ষিণার লোভে সমবেত হয়েছেন বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রালোচনা শ্রবণমানসে ঐ সঙ্গে সমবেত হয়েছেন অনেকানেক নির্লোভ ব্রহ্মজ্ঞও। মহারাজ সভাস্থলে নিয়ে এলেন এক সহস্র গাভী। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি গাভীর প্রতিটি শৃঙ্গে দশাদ পরিমাণ সুবর্ণ-অলংকার! ধরুন প্রতিটি তিন তোলা ওজনের। সমবেত পণ্ডিতদের সম্বোধন করে রাজা জনক ঘোষণা করলেন, 'আপনাদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ তিনি অনুগ্রহ করে অগ্রসর হয়ে আসুন, এই গাভীকুল তাঁর প্রাপ্য।' স্বভাববিনয়ী ব্রাহ্মণেরা অধোবদনে নিস্তব্ধ হয়ে বসেই রইলেন। গোধনে তাঁদের যথেষ্টই লোভ। কিন্তু লোভের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে সঙ্কোচ ও আতঙ্ক। শুধু আর্যাবর্তের নয়, হিমবর্ত থেকেও একান্তচারী সাধকবৃন্দও সমাগত—কোন আক্কেলে উঠে দাঁড়ান? ওঁরা যদি সমবেতভাবে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তখন?

সভাস্থ ব্রাহ্মণদের অধোবদন দেখে উঠে দাঁড়ালেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য। বিশ্বামিত্রের বংশধর, ঋষি যজ্ঞবল্ক বা চারায়ণের তনয়। মহামুনি তিনি। বাজসনেয়ী সংহিতা, শতপথব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ এঁরই রচনা। তিনি শিষ্যদের ডেকে বললেন, বাবাসকল! এই গাভীকুলকে আমার আশ্রম অভিমুখে পরিচালিত কর।

স্তম্ভিত হয়ে গেল সভাস্থ সকলে!

এবার গাত্রোত্থান করলেন জনকরাজের কুলপুরোহিত অশ্বল। বললেন, ঋষিবর যাজ্ঞবল্ক্য! আপনি কি বলতে চান যে, এই আর্যাবর্তের ভিতর আপনিই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠ?

যাজ্ঞবল্ক্য করজোড়ে নিবেদন করেন, ব্রহ্মিষ্ঠের শ্রীচরণে শতকোটি নমস্কার! শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ হিসাবে আমি অগ্রসর হয়ে আসিনি; বাস্তবে আমার কিছু গোধনের প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন লক্ষ্য করে দেখলাম, সমবেত সকলেই নীরব। তাই অনুমান হল—আমি কিছু অস্পষ্ট দেখি বটে, কিন্তু সমবেত সকলে সম্ভবত ছুছুন্দরপ্রতিম দৃষ্টিহীন!

অশ্বল বলেন, ক্ষান্ত হোন ঋষিবর! প্রথমে প্রমাণ করুন—আপনিই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠ। আমাদের সবাইকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করুন। প্রথমে আমিই প্রশ্ন রাখি:

একের পর একজন পর্যায়ক্রমে প্রশ্ন করতে থাকেন। যাজ্ঞবল্ক্য প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ সদুত্তর দান করে যান। প্রথমে অশ্বল। 'অশ্বল-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ' বৃহদারণ্যকোপনিষদের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তারপর এলেন জরৎকারু-বংশীয় আর্তভাগ ঋষি। তৎপর ভূজ্যুঋষি।

অতঃপর চাক্রায়ণ উষস্ত, উষস্তের পরে কৌষীতকেয় কহোল। প্রত্যেকের উত্থাপিত প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর বা সমাধান দিলেন যাজ্ঞবল্ক্য।

সর্বশেষে উঠে দাঁড়ালেন মহাপণ্ডিতা গার্গী।

এই খণ্ড-কাহিনীর শেষ প্রশ্নকর্ত্রী সেই মহিলাটি।

বচক্রুতনয়া ব্রহ্মবাদিনী। তাঁর প্রশ্নগুলিই হল সর্বাপেক্ষা জটিল, সর্বোচ্চস্তরের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

উপনিষদকার যে পর্যায়ক্রমে প্রশ্নকর্তাদের সাজিয়েছেন তার সর্বশেষে গার্গীকে স্থান দেবার একটাই অর্থ। পরিচিত রচনাশৈলী! দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভায় অর্জুন অথবা জানকীর বিবাহসভায় শ্রীরামচন্দ্র যে কারণে সবার শেষে উপস্থাপিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ সেদিন জনকসভায় উপস্থিত ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে উত্তরদাতা যাজ্ঞবল্ক্য ব্যতিরেকে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন ঐ বচক্রুতনয়া গার্গী! বস্তুত তাঁর শেষ প্রশ্নটির প্রত্যুত্তর দিতে অশক্ত হয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলে উঠেছিলেন, "গার্গী মাতিপ্রাক্ষীর্মা তে মূর্ধবা ব্যপপ্তৎ।"[১]

বলা বাহুল্য, এই সতর্কবাণীর মধ্যে পরাজয় স্বীকারের একটি অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা অনস্বীকার্য! প্রকাশ্যে নারীর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়ে তিনি তির্যকপথে গার্গীকে অনুরোধ করছেন, ঐ জাতীয় অস্বস্তিকর প্রশ্ন করা থেকে বিরত হতে।

ভুললে চলবে না, বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্যের রচনা। লেখক অনায়াসে ঐ কথোপকথন অনুক্ত রাখতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা রাখেননি। লেখকের নিজস্ব ত্রুটির এই অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ভারতীয় সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—ঠিক যেভাবে অকুণ্ঠভাষায় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু-বিদুরের জন্মরহস্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সত্যাশ্রয়ী যাজ্ঞবল্ক্য তাই ঐ অনবদ্য শ্লোকটিও রচনা করেছেন—গার্গী, তুমি প্রশ্নসীমা অতিক্রমণে 'অতিপ্রশ্নের' নিষিদ্ধ রাজ্যে প্রবেশ করতে চলেছ। ক্ষান্ত হও!

গার্গী সে সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করে পুনরায় বললেন, ঋষিবর! এবার আমার শেষ প্রশ্ন: বলুন—এই যে দ্যুলোক, তার উপরে কী বর্তমান? এই যে ভূলোক, এর অতলেই বা কী আছে?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, তার নাম: সূত্রাত্মা! সূত্রের মতো এই তিন ভুবন গ্রথিত। সেই সূত্রটির অভিধা: ব্রহ্ম!

অতঃপর গার্গী সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী এবং জনকরাজকে সম্বোধন করে বললেন, আপনারা যাজ্ঞবল্ক্যকে নমস্কার করুন। বিদ্যায় আর ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁর সমকক্ষ এই ভূভারতে আর কেউ নাই!

সমগ্র রাজসভা এই শেষ নিদান এক কথায় মেনে নিলেন।

দীর্ঘ কাহিনীটি বিদ্যালঙ্কারকে বিবৃত করতে হয়নি। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বিচারসভায় উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে সুপরিচিত। তাই ইঙ্গিত দিয়েই তিনি প্রশ্ন রাখলেন, এবার আপনারা বলুন, সেই ব্রহ্মবাদিনী গার্গী—উপনিষদ্কার যাঁকে সাহিত্যরচনার শৈলীমাধ্যমে ইঙ্গিতে বলেছেন—যাজ্ঞবল্ক্য-ব্যতিরেকে তিনিই ছিলেন সর্বাগ্রগণ্যা, একমাত্র যিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে

---

[১] গার্গি! আর বেশী প্রশ্ন কর না, তোমার মাথা খসে পড়বে [বৃ·আ·উ·৩/৬/১]।

পরীক্ষা করে দেখাব মতো জ্ঞানের অধিকারিণী, যাঁর ঘোষণা সমগ্র পণ্ডিতসমাজ নতমস্তকে শেষবিচার বলে স্বীকার করে নিলেন—তিনি বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণের সময় কী বলতেন? 'ওঁ' এর পরিবর্তে 'নমঃ'?

পঞ্চপণ্ডিতের মধ্যে একজন বলে ওঠেন, গার্গী এক দুর্লভ ব্যতিক্রম।

—সে ক্ষেত্রে মৈত্রেয়ী? ঐ যাজ্ঞবল্ক্যের সহধর্মিণী? যিনি বলতে পেরেছিলেন, 'যেনাহম্ নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম?'[১] অথবা এই কাশীধামের পৌরাণিক মহারাজা অলর্কের জননী, মদালসা? অলর্ককে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য গুরুর আশ্রমে যেতে হয়নি, রাজান্তঃপুরে তত্ত্বদর্শিনী জননীর কাছে তা পেয়েছিলেন। কেমন করে? বাল্মীকির শিষ্যা আত্রেয়ী ছিলেন পণ্ডিতা—বিদর্ভ রাজকন্যা রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে কী করে স্বহস্তে গোপনপত্র লিখে পাঠান, যদি তাঁর অক্ষর-পরিচয় না হয়ে থাকে? উভয়ভারতী কোন অধিকারে আচার্য শঙ্কর এবং মণ্ডন মিশ্রের বিচারসভায় বিচারকরূপে নির্বাচিতা হন?

তর্কবাগীশ বললেন, আপনি উত্তেজিতা হবেন না! চিন্তা করে দেখুন, যুগযুগান্তরের ঐতিহ্যময় ব্রাহ্মণ্যধর্ম থেকে এ পর্যন্ত চার-পাঁচটি উদাহরণ আপনি পেশ করেছেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে এই কয়েক সহস্রাব্দে কয়েক লক্ষ পুরুষ শাস্ত্রজ্ঞ এসেছেন এবং গেছেন। ফলে ঐ মুষ্টিমেয় কয়েকজনকেই সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে ব্যতিক্রম বলা চলে।

বিদ্যালঙ্কার বলেন, না। চার-পাঁচটি মাত্র নয়। ঋগ্বেদের সূত্রকারদের ভিতর অন্যূন সাতাশজন মহিলার নাম পাওয়া যায়। গার্গী প্রণীত ঋগ্বেদের টীকা আজও প্রামাণ্য। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের অন্তর্গত অষ্টবিংশতি সূক্তটি আদ্যন্ত রচনা করেছিলেন বিশ্ববারা-নাম্নী একজন অত্রি বংশীয়া মহাপণ্ডিতা। এছাড়া সংখ্যাতত্ত্ব-বিচার ওভাবে করা যায় না। সংখ্যাতত্ত্বর বিচার তখনই গ্রাহ্য যখন দুটি তুলনীয় বিশেষ্যপদ একই পরিমণ্ডলে অবস্থিত। বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানলাভের বাতাবরণ যদি পুরুষ ও স্ত্রীর পক্ষে তুল্যমূল্য থাকত, তাহলেই আপনার ঐ কয়েক লক্ষ এবং মুষ্টিমেয় সংখ্যা দুটির বিচার গ্রাহ্য হত। দুর্ভাগ্যক্রমে দুটি বিচার্য বিষয়ের বাতাববণ দুই রকম ছিল। সমস্যাটির গভীরে প্রবেশ করুন, তার ধারাবাহিকতাটি বিচার করুন। তাহলেই প্রণিধান করবেন কেন বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে নারী সংখ্যালঘিষ্ঠ।

অতঃপর বিদ্যালঙ্কার তত্ত্বটির দীর্ঘ বিশ্লেষণে ব্রতী হলেন:

মনুর বিধান শাশ্বতকালের হতে পারে না। প্রত্যেকটি মনুর শাসনকালের অবসানে, অর্থাৎ প্রতিবার মন্বন্তরে কালকশাঘাতে সে বিধান জরাজীর্ণ হয়ে যায়, পরিবর্তনযোগ্য হয়ে পড়ে। অপরপক্ষে বৈদিক অনুশাসন অনাদ্যন্তকালের। তিনি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন—বৈদিকযুগের আদিম পর্যায়ে পুরুষের মতো ব্রহ্মবিদ্যার্থিনীদের ব্রহ্মচর্য পালন করতে হত। শিক্ষণীয় বিষয়ের তারতম্য অনুসারে ছাত্রীদের সে-কালে দুইটি প্রধান ধারায় বিভক্ত করা হত। যাঁরা আজীবন দর্শন ও ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনায় নিরত থাকার সঙ্কল্প করতেন, তাঁদের বলা হত: 'ব্রহ্মবাদিনী'। তাঁদের পক্ষে আশ্রমিক, চিরকুমারী বা বিগতভর্তা হবার কোনও আবশ্যিক

[১] যা (যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরাধিকারিণী হিসাবে পার্থিব ধনসম্পদ) পেলে আমি 'অমৃত'লাভ করব না, তা নিয়ে কী করব?

শর্ত ছিল না। অনেকেই সীমন্তিনী, ব্রহ্মচারিণী নন। সংসারধর্ম পালনের অবকাশে তাঁরা যোগসাধনা করতে পারতেন। রাজবৈভব যেমন রাজর্ষি জনকের সাধনমার্গে অন্তরায় সৃষ্টি করেনি তেমনি কাশীরাজ মহিষী মদালসাও স্বামী-সংসার পুত্র-কলত্র দাসদাসী পরিবেষ্টিতা হয়েও রাজান্তঃপুরে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারিণী হতে পেয়েছিলেন।

স্মর্তব্য—আদিমতম যুগে যাযাবরধর্মী পশুচারী আর্যরা যখন প্রথম উত্তরভারতে আসেন তার আগেই সেখানে ছিল কৃষিজীবী নগরসভ্যতাব একটি অপূর্ব নিদর্শন: 'সিন্ধুসভ্যতা'। তারা ছিল ব্রোঞ্জযুগের মানুষ—বলদে-টানা ব্রোঞ্জধাতুর লাঙ্গল ছিল তাদের অধিকারে, লৌহ-নির্মিত অস্ত্রধারী অশ্ববাহিত রথী তারা চিনত না। হয়তো লৌহ-নির্মিত তরবারি অথবা ভল্লই ছিল ইন্দ্রের বজ্র, যা নির্মাণ করেছিলেন দধীচি নামের কোনও অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ—হাপরে ফুঁ পাড়তে পাড়তে যাঁর পাঁজরা ঝাঁঝরা হয়ে যায়। প্রাগার্য সভ্যতার বীরদল—মহেন্ জো-দড়ো-হড়াপ্পার প্রতিবোধকারীরা তাদের ব্রোঞ্জনির্মিত অস্ত্র দিয়ে সে লৌহ-বজ্রকে প্রতিহত করতে পারেনি। তা সে যাই হোক, পঞ্চনদের উর্বর ভূখণ্ডে কুঠারধারী পরশুরাম হলেন হলধারী বলরাম। কাঠুরিয়া যাযাবর বৃত্তির মানুষ হল কৃষিজীবী। স্থায়ী হবার পরই এল জমি অধিকারের প্রশ্ন এবং তার অনিবার্য ফলশ্রুতি জমির উত্তরাধিকারের প্রশ্ন। যাযাবরধর্মীব গোষ্ঠী[১] ও কৌম[২] ভেঙে গড়ে উঠতে থাকে শস্যক্ষেত্র-ভিত্তিক কুল[৩] ও পরিবার[৪]—ক্রমে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা রূপান্তরিত হল পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়। দেখা দিল দুটি আবশ্যিক অনুষঙ্গ—'ভৃত্য' আর 'ভার্যা'! দুটিই এক 'ধাতু'তে গড়া = $\surd$ভৃ+য! অর্থাৎ ভরণীয় — যাকে খাওয়া পরা দিয়ে কাজ করাতে হয়। এমনকি 'ভৃত্য' শব্দের দুটি অর্থ — (১) দাসবর্গ, (২) "অবশ্যভরণীয়পুত্রদারাদি বর্গ"[৫]। কী কাজ? ভৃত্য করে শস্য উৎপাদন, গৃহস্বামীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানে নানান শ্রমের কাজ; ভার্যাও তা করে, উপরন্তু করে সন্তান উৎপাদন। দুজনের কর্মক্ষেত্রে একাংশে আছে মিল—উভয়েরই অবশ্য-কর্তব্য গৃহস্বামীর পদসেবা।

এই যে পুং-জাতির সেবক 'ভৃত্য' এবং 'ভার্যা', এরা ভরণীয় তো বুঝলাম, কিন্তু কীভাবে তাদের ভরণপোষণ করতে হবে? যাতে প্রথমজন কৃষিক্ষেত্রে শস্য এবং দ্বিতীয়া সংসার-ক্ষেত্রে পুত্রসন্তান উৎপন্ন করতে পারে? শাস্ত্রে কী কোনও নির্দেশ নাই? আছে। বৎস! অবধান কর: ভৃত্যকে প্রদান করবে ব্যবহৃত পোশাক, যা জীর্ণ হয়ে এসেছে এবং ভার্যাকে দেবে—"ভুক্তেবাচ্ছিষ্টংবধ্বৈ দদাৎ"[৬]।

এই যখন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে যাচ্ছে তখন যে 'ব্রহ্মবাদিনী' শিক্ষার্থী অপ্রতুল হয়ে আসবে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তখনো ছিল আর এক জাতির স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা—ঐ মানসিকতা থেকে—শুধু জান্তব ক্ষুন্নিবৃত্তিতেই মানুষ তৃপ্ত হতে পারে না। তাই আদিমযুগে বালিকা, কিশোরী এমনকি যুবতীদেরও কিছু কিছু শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। তারা ব্রহ্মবাদিনী হত না অন্তিমে— ব্রহ্মাস্বাদের বাসনা তাদের থাক না থাক, অভিভাবককুল চেয়েছিলেন তাদের অক্ষর পরিচয় দিতে। কিছুটা ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য। সচরাচর প্রাগবিবাহকালেই এই

---

[১] গোষ্ঠী = tribe, [২] কৌম = clan, [৩] কুল = sect, [৪] পরিবার = family, [৫] মনুসংহিতা ১১/১২

[৬] আহারান্তে যা খেতে পারলে না সেই ভুক্তাবশিষ্ট সমেত এঁটো পাতাখানা স্ত্রীকে ধরে দেবে [গৃহ্যসূত্র ১/৪/১১]।

বিদ্যাচর্চার আয়োজন হত বটে তবু প্রথম যুগে বিবাহিতা ও বিগতভর্তা অবস্থাতেও কেউ কেউ এ জাতীয় বিদ্যার্জনের সুযোগ পেতেন। তাঁদের বলে: 'সদ্যোদ্বাহা'।

বৈদিকযুগে স্বামীস্ত্রী যে একত্রে যজ্ঞে অংশগ্রহণ করতেন তার প্রমাণ রয়ে গেছে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের একশত একত্রিশতম সূক্তে।"বি ত্বা ততস্রে মিথুনা অবস্যবো ব্রজস্য সাতা..." ইত্যাদি সূক্তে যজমান-দম্পতি যৌথভাগে অগ্নিকে আহুতি দিচ্ছেন (১/১৩১/৩)। পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টবিংশতি সূক্তে অগ্নিদেবতাকে বলা হল, "সং জম্পত্যং সযমমা কৃণুষ্ব" (তুমি আমাদের দাম্পত্য-সম্পর্ক সুশৃঙ্খলাবদ্ধ কর—৫/২৮/৩)। অর্থাৎ গার্হস্থ্যধর্ম পালন করেও নারী যজ্ঞ করতে পারতেন। এই মন্ত্রটির দেবতা: অগ্নি, ছন্দ: গায়ত্রী এবং 'দ্রষ্টা' বা রচয়িতা হচ্ছেন অত্রি-গোত্রজা বিশ্ববারা-নাম্নী রমণী-ঋষি! শুধুমাত্র ঋগ্বেদেই পাচ্ছি একাধিক 'মহিলা-দ্রষ্টা'—অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা (১/১৭৯), ঋষি অত্রির কন্যা অপালা (৮/৯৬), ঋষি কক্ষিবৎ-তনয়া ঘোষা (১/১৭৭/৭ এবং ১০/৩৯-৪০), ঋষি অম্ভৃণাত্মজা বাক্ (১০/১২৫) এবং ইন্দ্রের সহধর্মিণী ইন্দ্রাণী (১০/১৪৫)। সেকালে কুমারী কন্যার উপনয়ন হত, তাদের সাবিত্রীমন্ত্র জপ এবং অধ্যাপনের অধিকার স্বীকৃত ("পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জী বন্ধনমিষ্যতে/অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা।।"—শব্দকল্পদ্রুম-মতে 'মৌঞ্জী' অর্থে 'উপনয়ন')। চিরকুমারী-সাধিকা ভ্রাতাদের সঙ্গে সমানভাগে পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণীও হতেন (২/১৭/৭)।

কীভাবে আদিম বৈদিকযুগের স্ত্রীশিক্ষার ঐ দ্বিধারা—ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোদ্বাহা—অবলুপ্ত হয়ে গেল তার একটি চুম্বকসার অতঃপর ব্যাখ্যা করে শোনালেন হটী বিদ্যালঙ্কার:

চতুর্বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ ছিল কর্মপ্রধান, আরণ্যক ও উপনিষদ্-অংশ জ্ঞানপ্রধান। মীমাংসকগণ আরও সূক্ষ্মভাবে বিচার করে শ্রুতিকে ছয়টি ভাগে বিভক্ত করলেন: বিধি, নিষেধ, অর্থবাদ, মন্ত্র, নামধেয় এবং উপনিষদ। যা যজমানের প্রবৃত্তিকে যাগাদি বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে তাই হচ্ছে প্রথম শ্রুতি: বিধি। যা শ্রবণে চিত্তে নিবৃত্তির উদয় ঘটায় তা হল: নিষেধ। "দেবস্য ত্বা ইত্যাদির দ্বারা অনুষ্ঠেয় বিষয়ের স্মরণ হয় বলে তা মন্ত্র"[১]। অর্থবাদ দুই প্রকার—প্রশংসা ও নিন্দা। "জ্যোতিষ্টোম—এই নামভাবনা করিবার জন্য নামধেয় এবং অবিদ্যানিরাসপূর্বক ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপদেশ উপনিষদে আছে।"[২]

বৈদিকযুগে কর্মবাদের আদর্শ ছিল গার্হস্থ্যধর্ম। সস্ত্রীক আচরিতব্য। নিত্য যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামীস্ত্রী বৈদিক বিধিগুলি স্বীকার করে ধর্মচর্চা করতেন যৌথভাবে। তখনও ভার্যাকে ভুক্তাবশিষ্ট দিয়ে 'ভরণীয়' মনে করা হত না। যজমানের স্ত্রী তখনো তার সহধর্মিণী, 'ভার্যা' নয়! ধর্মসূত্র, গৃহ্যসূত্রের প্রথম পর্যায়ে এইসব স্বামীস্ত্রীর যুগলে আচরিতব্য গার্হস্থ্য ধর্মাচরণের প্রণালী বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল।

তার পরবর্তী কালে উপস্থিত হল দুটি অন্তরায়।

এক: বেদবিরোধী কর্মবাদের প্রবক্তা গৌতম বুদ্ধের আর্বিভাব; দুই: শ্রুতিপথরোধী

---

[১]এবং[২]: 'বাঙলার সংস্কৃত সমাজের এক বিস্মৃত অধ্যায়', শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, 'দেশ' পত্রিকা, 20 জুন, 1987।

জ্ঞানবাদের ধ্বজাধারী জৈন তীর্থঙ্করের দল, তথা বর্ধমান মহাবীর ও প্রায় সমকালের চার্বাক প্রভৃতির লোকায়ত দর্শনের প্রভাব।

শ্রুতি তখন রূপান্তরিত হয়ে গেল স্মৃতিতে।

ব্রাহ্মণ্যধর্মে ক্রমে আবির্ভূত হল মনু প্রভৃতির রচিত ঊনবিংশতি সংহিতা।

মেধাতিথি, কুল্লুকভট্ট, ইত্যাদিরা রচনা করতে শুরু করলেন সংহিতার সটীক ব্যাখ্যা।

স্মার্তপণ্ডিতেরা নানান বিধান জারী করতে শুরু করলেন। ইতিপূর্বে প্রতিটি সিদ্ধান্তের পূর্বে হিতাহিতের ব্যাখ্যা দেওয়া হত—ভাল কেন ভাল, মন্দ কেন পরিহার্য। এখন সে জাতের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রবণতা লোপ পেল। স্মার্ত পণ্ডিতেরা 'আপ্তবাক্য' ধরনের হুকুমনামা জারী করতে শুরু করলেন।

বলা যায় এখনই শুরু হল অচলায়তনের সেই 'তট-তট-তট তোটয়'-র জমানা।

প্রাগ্বর্তী যুগে যদিচ বিবাহযোগ্যা কন্যার বয়স সচরাচর ধরা হত ষোলো-সতেরো, এই যুগে তা কমিয়ে আনা হল নয়-দশে। 'কেন', তার হেতু প্রদর্শন স্মার্ত-পণ্ডিতদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। ক্রমে প্রচলিত হল মারাত্মক গৌরীদানের ব্যবস্থা: 'অষ্টমবর্ষেতু ভবেৎ গৌরী।'

ফলে 'সদ্যোদ্বাহা'-র অনুপাত অনিবার্যভাবে হ্রাস পেতে থাকে।

মুসলমান যুগে স্ত্রীশিক্ষার পথে দেখা দিল আর একজাতের বাধা—

প্রথমত আগন্তুক বিজয়ীদের পর্দাপ্রথা হিন্দুসমাজে প্রভাব বিস্তার করল। দ্বিতীয়ত কিশোরী মেয়েদের পক্ষে পাঠশালায় যাতায়াত করার নিরাপত্তা আর রইল না। নারী বিদ্যাচর্চার প্রাঙ্গণে স্বতই সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে গেল।

ক্রমে ঐ স্মার্ত টুলো-পণ্ডিতদের প্রভাবে বিদ্যাশিক্ষার অধিকার থেকে নারীসমাজ সম্পূর্ণ বঞ্চিতা হয়ে গেল। কূপমণ্ডূকেরা নিদান হাঁকল: অক্ষর পরিচয় আর অকালবৈধব্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

তবু, ব্যতিক্রম হিসাবে প্রতিটি যুগেই মাথা খাড়া করে উঠে দাঁড়িয়েছেন গার্গী-মৈত্রেয়ীর উত্তরাধিকারিণীরা। অকালবৈধব্যের নিদারুণ সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করে তাঁরা সারস্বত আরাধনা করে গেছেন অকুতোভয়ে।

বিদ্যালঙ্কার তাঁর যুক্তির সমর্থনে দুএকটি উদাহরণ শোনালেন। বিগত দুই এক শতাব্দীর ভিতর থেকে—

প্রথমত—ফরিদপুর অঞ্চলের কোটালিপাড়া গ্রাম নিবাসিনী প্রিয়ম্বদা দেবী।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে তাঁর জন্ম। পিতা প্রখ্যাত পণ্ডিত শিবরাম সার্বভৌম। টুলো পণ্ডিত হলেও তিনি ছিলেন ধনীব্যক্তি। কন্যাকে শিশুকাল থেকেই শিক্ষাদান করেছিলেন। পশ্চিমদেশীয় একটি ছাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দান করে তিনি কন্যা ও জামাতা বাবাজীবনকে 'মাঝবাড়ি' গ্রামে অধিষ্ঠিত করেন। ভূসম্পত্তিদান ও চতুষ্পাঠী নির্মাণ করে দেন। "পিতার যত্ন ও শিক্ষাগুণে প্রতিভাশালিনী প্রিয়ম্বদা কাব্যে, সাহিত্যে, ও ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বালিকা বয়স থেকেই সংস্কৃত ভাষায় যেমন অনর্গল কথা বলতে পারতেন তেমনি কবিতা রচনায় পারদর্শিনী ছিলেন। কুলদেবতা শ্রীগোবিন্দদেবের উদ্দেশ্যে তাঁর রচিত সংস্কৃত কবিতাটি

ইংরেজীতেও অনূদিত হয়েছে।"[১] "শ্যামারহস্য" নামে সুবিখ্যাত তন্ত্রশাস্ত্রের গ্রন্থটি এই প্রিয়ম্বদা দেবীর রচনা। তাছাড়া মদালসা-উপাখ্যানের দার্শনিক টীকা আর মহাভারতের মোক্ষধর্মের একটি সুবিস্তৃত টীকার ইনিই রচয়িত্রী।

দ্বিতীয়ত—ঐ ফরিদপুরেরই ধান্কা গ্রামের জয়ন্তী দেবী। সপ্তদশ শতকে তাঁর জন্ম। মধ্যযুগের এক বিখ্যাত বিদুষী। স্বামী কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম। স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে তাঁরা রচনা করেছিলেন একটি চম্পূকাব্য, 'আনন্দলতিকা'(1652)। কাব্য,ব্যাকরণ, দর্শন, অলঙ্কারশাস্ত্রের অধিকারিণী এই মহিলাও বিশ্বাস করেননি ঐ অর্বাচীন যুক্তিতে — স্ত্রীলোক সাক্ষর হলে অকালবৈধব্য প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয়ত: দ্রবময়ী।[২]

সমকালীন পত্রিকায় সম্পাদক তাঁর পরিচয় দিচ্ছেন, "খানাকুল কৃষ্ণনগর সন্নিহিত বেড়াবাড়ি গ্রামনিবাসী ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত তর্কালঙ্কারের কন্যা শ্রীমতী দ্রবময়ী দেবী (প্রবন্ধ রচনাকালে দ্রবময়ী পঞ্চদশী বালিকামাত্র, তবু তর্কবাগীশ তাঁকে 'আপনি' বলে উল্লেখ করেছেন) বালিকা বয়সে বিধবা হইয়া পিতার টোলে পড়িতে আরম্ভ করেন। পুরাণ মহাভাগবতাদি সর্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা হয়েন মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে। পিতা তখন বৃদ্ধ। দ্রবময়ী কিঞ্চিৎ ব্যবধানে এক আসনে বসিয়া পিতার টোলে ১৫-১৬জন প্রায় সমবয়সী ছাত্রকে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার পড়াইতেন।"[৩] সম্পাদক বর্ণনা করেছেন, ঐ প্রায় নাবালিকা পণ্ডিতাকে পরীক্ষা করতে প্রায়ই বিভিন্ন গুরুকুলের পণ্ডিতেরা সমবেত হতেন। দ্রবময়ী তাঁদের সঙ্গে বিচার করতেন 'অনবগুণ্ঠিতা' অবস্থায়। 'পৃথগাসনে উপবিষ্টা' হয়ে, এবং 'অনর্গল সংস্কৃত ভাষায়'। যাঁরা তাঁকে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন তাঁরা স্বীকার করে যেতে বাধ্য হন যে, দ্রবময়ী পিতার চতুষ্পাঠী পরিচালনার উপযুক্ত পাত্রী!

পরিশেষে হটী বিদ্যালঙ্কার বিচারক-মণ্ডলী তথা কাশীধামের পণ্ডিতসমাজের নেতৃস্থানীয় মহামহোপাধ্যায়দের উদ্দেশ্যে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করলেন: নারীশিক্ষার এই রুদ্ধদ্বারটি আপনারা উন্মুক্ত করে দিন। নারী সমাজকে কূপমণ্ডূপ দৃষ্টিভঙ্গিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখলে সমাজের সামূহিক উন্নতি ব্যাহত হতে বাধ্য! অশিক্ষা, বাল্যবিবাহ, অবশ্য পরিত্যাজ্য। বালবৈধব্য আর সহমরণ প্রথার বীভৎসতায় হিন্দুসমাজ ক্রমশ মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ছে।

বিচারকত্রয়ী সর্ববাদীসম্মতভাবে বিধান দিলেন. শুধুমাত্র নারীজন্ম নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূতা হবার অপরাধে কারও বিদ্যার্জন ও বিদ্যাবিতরণের অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না!

বলাবাহুল্য জগমোহন তর্কবাগীশ আর তার দলবল এ পরাজয় শান্তচিত্তে গ্রহণ করতে পারল না। শুধু নব্যপণ্ডিতেরা নয়, প্রতিষ্ঠাবান কবিরাজেরাও। ক্রমে দেখা গেল—দ্বন্দ্বটা পুরুষ

---

[১] 'বাঙালী চরিতাভিধান', সংসদ। বলাবাহুল্য ইংরাজী অনুবাদটি হয়েছে অনেক পরবর্তী কালে।

[২] এটি লেখকের সজ্ঞান 'অ্যানাক্রনিজম'। দ্রবময়ীর জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে, হটী বিদ্যালঙ্কারের তিরোধানের পরে। কিন্তু দেরী করে আবির্ভূত হবার অপরাধে এই আশ্চর্য মহিয়সী মহিলার নামটি বাদ দিতে মন সরল না।

[৩] গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, সম্পাদক 'সম্বাদ প্রভাকর' (১৯ এপ্রিল, ১৮৫১)

ও স্ত্রীজাতির অধিকারভেদের সংগ্রামে পর্যবসিত হতে চলেছে। হয়তো হটী বিদ্যালঙ্কারের পক্ষে ছিল মুষ্টিমেয় আলোকপ্রাপ্তা রমণীকুলের সমর্থন—কিন্তু সেই অষ্টাদশ-শতাব্দীর শেষপাদে 'আলোকপ্রাপ্তা' শব্দটাই যে অশ্রুত! তাঁদের উচ্ছ্বাস ঐ একবারই শ্রুত হল—কুরুক্ষেত্র তালাও-এর বিচারসভায়—চিকের আড়াল থেকে। শঙ্খধ্বনিতে। অপরপক্ষে নব্যপণ্ডিতের দল মনে করল, এ প্রচেষ্টা শুধু অবমাননাকরই নয়, এ তাদের রুজি-রোজগারে হাত দেওয়া। ঐ কুলীনঘরের বালবিধবাটির কর্তব্য ছিল স্বামীর মস্তকটি ক্রোড়ে ধারণ করে সহমরণে যাওয়া। তাহলে সে ড্যাংডেঙিয়ে স্বর্গে যেতে পারত। তা সে যায়নি। তাই বলে যা-নাকি আবহমানকাল পুরুষের অধিকারে—তাতেও সে হাত বাড়াবে?

ওরা সিদ্ধান্তে এল—ঐ কয়জন স্থবির পণ্ডিতের এই বিধান মানা চলে না। সে বিচারসভায় শ্রীমন্ মহারাজ কাশীনরেশের পাতসাহীই তো ছিল না—আনুষ্ঠানিকভাবে রাজদণ্ডটি শুধু শোভা পাচ্ছিল সভাস্থলে। স্বীকার্য—কাশীনরেশ লোকান্তরিত, তাঁর পুত্রটি নাবালক—কিন্তু মহারাজের ভাগিনেয়টি তো সশরীরে বর্তমান। শোনা যাচ্ছে, সম্প্রতি তিনি এলাহাবাদ ক্যান্টনমেন্ট থেকে কাশীতে প্রত্যাবর্তনও করেছেন! ওরা সদলবলে তাঁরই দ্বারস্থ হল।

পুরন্দর ক্ষেত্রী এসব বৃত্তান্ত কিছুই জানত না। আদ্যন্ত শুনে সে ক্রোধে উন্মাদ হয়ে গেল! এ কী অনাচার! কুলীন ব্রাহ্মণের বিধবা—সহমরণে স্বর্গে যাবি, তা নয় কাশীধামে এসে বেলেল্লাপনা শুরু করে দিলি? মস্তকমুণ্ডন করে, শিখাধারণ করে, প্রকাশ্যে পুরুষের সঙ্গে পণ্ডিত্যেমি করছিস্।

কঠিন শাস্তি দিতে হবে সেই দুর্বিনীতাকে!

জনমতকে স্বমতে আনার সাধনা তার। পুরন্দর জানে, দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণব বা রামপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতিরা নিতান্তই সংখ্যালঘিষ্ঠ। সমগ্র কাশীর পণ্ডিতসমাজ বিদ্যালঙ্কারের বিপক্ষে। তদুপরি কবিরাজদল। সকলেই মনেপ্রাণে চাইছে, হয়তো মুখে স্বীকার করছে না—ঐ বিদ্রোহিনীকে শায়েস্তা করতে, অপমান করতে।

তাই করবে পুরন্দর। এমন পৈশাচিক পদ্ধতিতে বেইজ্জত করবে যাতে ভবিষ্যতে আর কোন পুরললনা এ দুঃসাহসের কথা স্বপ্নেও না চিন্তা করতে পারে।

পুরন্দর ধুরন্ধর। হঠকারিতা তার ধাতে নেই। অভিযোগ শুনেই সে ঐ ছুকরির চতুষ্পাঠীতে হানা দেয়নি। বিশ্বস্ত গুপ্তচরের মাধ্যমে সর্বপ্রথমে সংগ্রহ করল সংবাদের যাথার্থ্য। যখন জানতে পারল, জগু-পণ্ডিতের অভিযোগের মধ্যে অতিরঞ্জন কিছু নেই, তখন এক পৈশাচিক উল্লাসে সে মেতে ওঠে। এতদিন কামচরিতার্থতা করতে হচ্ছিল গোপনে। প্রজাদের অসন্তোষের আশঙ্কায়। এবার সে নির্ভয়। এবার জনসমর্থন আছে তার কামচরিতার্থতায়—কিন্তু সেটাতে এমন প্রলেপ দিতে হবে যাতে মনে হয় এ রাজকর্তব্য! সমাজের কলুষতা দূরীকরণের জন্যই তাকে এ জাতীয় শাস্তির বিধান দিতে হল!

পৈশাচিক শাস্তিদানের সবচেয়ে বড় জাতের নজির রেখে গেছেন দীনদুনিয়ার মালেক বাদশাহ জাহাঙ্গীর! শাহাজাদা খুরম্-এর বিদ্রোহ দমন করে পুত্রের দুই সেনাপতিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরিকল্পনাটি অভিনব। একটি মৃত গাধা ও একটি মৃত ষণ্ডের চামড়ার খোলের ভিতর জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল দুই সেনাপতিকে। তারপর চর্মশিল্পীরা ঐ

দুটি মৃত জন্তুর খোল সেলাই করে দেয়। এমন সুচারুভাবে তা করে, যাতে বায়ুর অভাবে দুই হতভাগ্য তৎক্ষণাৎ মারা না যেতে পারে। যাতে তারা আট-দশ ঘণ্টা ঐ মৃত জন্তুর পূতিগন্ধময় নিশ্বাসে জীবনের শেষকটি প্রহর জীবিত থাকে। তারপর ঐ দুটি মৃতপশুকে গো-শকটে উঠিয়ে সমগ্র শহর শোভাযাত্রা করে প্রদক্ষিণ করানো হয়। সমগ্র আগ্রা শহর শিহরিত হয়েছিল গো-শকটের উপর ঐ দুটি মৃত জন্তুকে ক্রমাগত ধড়ফড় করে উঠতে দেখে।

না, পুরন্দর সে জাতীয় কিছু করবে না। নারীহত্যা করবে না! তবে স্থির করেছিল শাস্তিদান সমাপ্ত করে সে ঐ অপরাধিনীকে বাধ্য করবে পদব্রজে সমগ্র কাশীনগরী পরিক্রমায়। সঙ্গে ঢাক-ঢোল-শিঙা বাজিয়ে মিছিল করে যাবে শোভাযাত্রীরা। প্রকাশ্য দিবালোকে। অপরাধিনী থাকবে সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা!

দশাশ্বমেধে সহস্রযাত্রীর দৃষ্টির সম্মুখে সেই বস্ত্রহীনা নগ্ন-স্নান করবে এবং তার পর শোভাযাত্রীদের সঙ্গে পদব্রজে উপনীত হবে তার বাকি জীবনের বন্দী আবাসে।

কাশীর রণ্ডিবাজার!

দুর্গাবাড়ির দিকে যাওয়ার পথে আম-জাম-কাঁঠাল গাছের ছায়া-সুনিবিড় একটি বিঘে-তিনেকের বাগান। এই ব্রহ্মোত্তর ভূখণ্ডেই দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণবের গুরুকুল-চতুষ্পাঠী। ছাত্রসংখ্যা এত বেশী যে, গৃহাভ্যন্তরে জ্ঞানচর্চা সম্ভবপর নয়। শুধু বর্ষাকালের কয়েক মাস বাগানে বসা যায় না। বৎসরের বাকি সময়কালে অধ্যয়ন-অধ্যাপনের আয়োজন উপনিষদী ঢঙে—গাছের ছায়ায়।

দুজন সুবেশ অশ্বারোহী রাজপুরুষ যে কঞ্চির বেড়া-দেওয়া বাগানের বাহিরে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করেছে এটা নজর হয়নি বিদ্যার্ণবের। ওরা 'কেন' এসেছে—এই সামান্য প্রশ্নটাকে অতিক্রম করে বোধকরি সে সময় উনি আর একটি অসামান্য 'কেন-'র উত্তর খুঁজছিলেন: 'কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ/কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।।' (কেন প্রাণ তার প্রথম বেগ নিয়ে পৃথিবীতে এল, ইত্যাদি)।

নজর হল একটি শ্যামবর্ণ কিশোর ছাত্রের। সে দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে এল যুগল অশ্বারোহীর সমীপে। যুক্তকরে অভিবাদন করে বললে, আপনারা নিশ্চয় পথশ্রমে ক্লান্ত, আসুন আমাদের গুরুকুল-আশ্রমের আতিথ্য গ্রহণ করুন।

আড্ডাধারী বলে ওঠে, না হে ছোকরা, আমরা আদৌ পথশ্রান্ত নই। একটা কথা বলতে পার? হটী বিদ্যালঙ্কারের চতুষ্পাঠী কোনটা?

—এটাই। আসুন, ভিতরে আসুন ...

—কিন্তু ঐ যে লোকটা ছাত্তরদের ঠেঙাচ্ছে ও তো বুড়ি নয়, বুড়ো!

ছেলেটি মর্মাহত হল। বুঝল, আগন্তুকের কোন শিক্ষাদীক্ষা নেই। 'ছাত্তর-ঠ্যাঙানো' একটা প্রাকৃতজনভাষ—যার অর্থ বিদ্যাদান করা। বললে উনি আমাদের গুরুদেব, মহামহোপাধ্যায় দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণব। মা আজ অনুপস্থিত। তাই গুরুদেব স্বয়ং…

অড্ডাধারী বললে, অ! তা তোমার ঐ গুরুঠাকুরকে বল একটু করুণা করতে। উনি তো আমাদের মতো চুনোপুঁটির দিকে চোখ তুলে নজরই করছেন না।

কিশোর আশ্রমিক বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি এই সময় একেবারে তন্ময় হয়ে যান। আসুন, আশ্রমের ভিতরে আসুন, পদপ্রক্ষালনের জন্য…

আড্ডাধারী খিঁচিয়ে ওঠে, ক্রমাগত একই কথা ঘ্যানর-ঘ্যানর কর না তো হে ছোকরা। তোমাকে যা বলছি কর। তোমার ঐ গুরুঠাকুরকে উঠে আসতে বল।

ছাত্রটি নতমস্তকে বিদ্যার্ণবের দিকে অগ্রসর হয়ে যায়।

ওরা দুজনও গুটিগুটি এগিয়ে আসে।

এতক্ষণে বিদ্যার্ণবের নজরে পড়ে। গাত্রোত্থান করে তিনি অগ্রসর হয়ে আসেন, এস, এস, বস' তোমরা।

পুরন্দর বুঝতে পারে বৃদ্ধ ওকে শনাক্ত করতে পারেনি। তাই বয়সের পার্থক্য বিচার করে এই 'তুমি' সম্বোধন। বললে, বসতে আমরা আসিনি পণ্ডিতমশাই। দু একটা কথা জানতে এসেছি শুধু। প্রথম কথা, এ চতুষ্পাঠীর মালিক কে? আপনি, না হটী বিদ্যালঙ্কার?

বিদ্যার্ণব প্রশান্ত হাসলেন। বললেন, মালিকানা স্বয়ং বাগ্‌দেবীর। আমি এতদিন ছিলাম তাঁর সেবায়েত। বর্তমানে আমার কন্যাটি সে দায়িত্ব নিয়ে আমাকে অবসর দিয়েছে।

—বটে! তা হলে সে কই? আপনি ক্লাস নিচ্ছেন কেন?

'ক্লাস নেওয়া' ক্রিয়াপদের অর্থ নিশ্চয় ছাত্রদের বিদ্যাদান। বৃদ্ধ বললেন, আজ একাদশী তিথি বাবা। মাসের এ দুটি দিন আমি তাকে—কী-বলে-ভাল 'ক্লাস' নিতে দিই না।

—কেন? ত্রয়োদশীতে অলাবুভক্ষণের মতো কি একাদশীতে ক্লাস নেওয়া বারণ?

বৃদ্ধ প্রণিধান করতে পারেন না এ জাতীয় ব্যঙ্গোক্তির অর্থ কী! গম্ভীর হয়ে বলেন, আজ যে সে নিরম্বু-উপবাস করছে।

—নাকি? তাহলে একাদশীটা অন্তত সে করে? তা পণ্ডিতমশাই, আপনি সম্ভবত আমাকে চিনতে পারেননি। আমার পিতৃদত্তনাম পুরন্দর ছেত্রী।

—কেন চিনব না বাবা? তুমি তো স্বনামধন্য…

খুশিয়াল হয়ে উঠতে শুরু করেছিল পুরন্দর। প্রদীপটা দপ করে নিভে গেল বাক্যটা সমাপ্ত হলে।

—স্বনামধন্য স্বর্গত কাশীনরেশের দেহান্তে নাবালকের তরফে রাজকার্য পরিচালনা করছ।

পুরন্দর গম্ভীর হয়ে বললে, হ্যাঁ, তাই করছি। জানেন নিশ্চয়, রাজার কর্তব্য হচ্ছে শিষ্টের পালন আর দুষ্টের দমন। এবার বলুন তো পণ্ডিতমশাই, এই বুড়ো বয়সে ঐ দুষ্টামির ধাষ্টামো কেন চাপলো আপনার ঘাড়ে?

বিদ্যার্ণব স্তম্ভিত! তিনি কাশীধামের একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায়, এই দুর্বিনীত লোকটা কি ভদ্রভাবে বাক্যালাপ করতেও শেখেনি?

কাশীধাম

—কী মশাই? ন্যাকা সাজতে চাইছেন মনে হচ্ছে! যেন বুঝতেই পারছেন না, আমি কী বলছি!

বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে বলেন, আমি সত্যই অনুধাবন করতে পারছি না···

—আপনার বুঝে কাজ নেই। আপনার পালিতা কন্যাটিকে পাঠিয়ে দিন। বোঝাপড়া তার সঙ্গেই হবে।

—এখনই তো বললাম সে কথা। আজ একাদশী·····

বাক্যটা সমাপ্ত হল না। নজরে পড়ে—পর্ণকুটিরের দ্বার উন্মোচন করে ধীরপদে অলিন্দে বাহির হয়ে এসেছেন তাঁর কন্যাটি। পরিধানে ধুতি, ঊর্ধ্বাঙ্গে গেরুয়া-রঙের আলখাল্লা ধরনের একটি পোশাক। তদুপরি উত্তরীয়। শান্তকণ্ঠে বলেন, কী চান আপনারা?

পুরন্দর মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। মহিলাটির বয়স ওর চেয়ে কিছু কম—অনুমান ত্রিংশতি বর্ষ! উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, আয়ত চক্ষু, বুদ্ধিদীপ্ত একটি আভা। সর্বোপরি যেটা নজরে পড়ে তা ওর ব্যক্তিত্ব। ওর ঐ অপ্সরী-বিনিন্দিত রূপকে ছাপিয়ে সেটা যেন হীরকখণ্ডের দ্যুতির মতো বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। পানগুবাক নিশ্চয় সেবন করে না—বিধবা সে, তাহলে ওর ওষ্ঠাধর কী করে হয় অমন রক্তিম বর্ণের? শুধু ব্যক্তিত্ব নয়, ওর সর্বাবয়ব ভেদ করে যেটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার সঙ্গে মিশে আছে কিছু দার্ঢ্যও। রাজাসাহেব নামক জীবটিকে সে যেন ভ্রুক্ষেপই করতে চাইছে না। একটা বিরক্তিকর মক্ষিকা যেন!

পুরন্দর ওকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে, চাই অনেক কিছুই। সর্বপ্রথমে চাই একটা কৈফিয়ৎ। তুমি সেই সুদূর বঙ্গদেশ থেকে এখানে মরতে এসেছ কেন?

'তুমি' সম্বোধনটা অবমাননাকর কিনা এ প্রশ্ন যেন জাগলই না বিদ্যালঙ্কারের মনে। মক্ষিকার ধর্মই তো ভ্যানভ্যান করা। মাথা খাড়া রেখেই বললেন, মরতে তো আসিনি। এসেছিলাম বাঁচতে। তবে অন্তিমে যখন মরতে হবেই তখন কাশীধামই তো সেক্ষেত্রে কাম্য!

'হটি'! 'হটি' মানে কী? পুরন্দর ভাবছে। প্রয়াগ ক্যান্টনমেন্ট-এ কয়েকটি ইংরাজ সৈনিকের সঙ্গে দোস্তি হয়েছে। অল্প-বিস্তর ইংরাজি শব্দ রপ্তও হয়েছে। ওর মনে পড়ল—ফেরঙ্গভাষায় 'হট' মানে উত্তপ্ত, গরম। তাহলে 'হটি' অর্থে—গরমাগরম! 'অমৃতে'র চাট যেমন বেগুনি-ফুলুরি। নামটা সার্থক! বললে, তুমি ধুতি পরে আছ কেন?

—আপনার তাতে আপত্তি আছে?

—আছে। আলবৎ আছে। লোকাচার ঠিক মতো পালিত হচ্ছে কিনা রাজাকেই দেখে নিতে হয়।

—'রাজাকে'! রাজা কে?

বিদ্যার্ণব তাড়াতাড়ি অন্বয়-ব্যাখ্যা দাখিল করতে তৎপর হয়ে ওঠেন, উনি পুরন্দর ক্ষেত্রী। স্বর্গত কাশীনরেশের ভাগিনেয়। নাবালকের তরফে···

—ও! 'তরফে'! তা বেশ, রাজসরকারের যদি আপত্তি থাকে তাহলে আমি স্ত্রীলোকের পোশাকই পরিধান করব অতঃপর।

পুরন্দর বিচিত্র হেসে বলে, অত সহজে তো মিটবে না সুন্দরি! চতুষ্পাঠীতে এই সব সমবয়সী পুরুষ ছাত্রদের নিয়ে রাসলীলাও চলবে না।

বিদ্যালঙ্কারের মুখে রক্তিমাভা। লোকটার 'তুমি' সম্বোধন তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন। কিন্তু এই 'সুন্দরি' সম্বোধন এবং ঐ অশ্লীল ইঙ্গিত কি প্রতিবাদযোগ্য নয়? কিন্তু তিনি কিছু বলার পূর্বেই বিদ্যার্ণব কথা বলে ওঠেন। ইতিমধ্যে নিজের অজ্ঞাতেই তিনি নিজে কিন্তু 'তুমি' থেকে 'আপনি'তে উঠে এসেছেন। বলেন, আপনি বোধহয় জানেন না, এ নিয়ে সম্প্রতি একটি বিচারসভা হয়েছিল। কাশীর পণ্ডিতসমাজ সর্ববাদীসম্মতভাবে—

হুঙ্কার দিয়ে ওঠে পুরন্দর, আপনি থামুন! মেলা পণ্ডিত্যেমি করতে আসবেন না! আপনিই তো যত নষ্টের গোড়া।

বিদ্যার্ণব স্তম্ভিত!

আশ্রমিক ছাত্ররা শ্রুতিসীমার বাহিরে। তারা নিজ নিজ পাঠাভ্যাসে মগ্ন। কিন্তু ঘনিয়ে এসেছে রমারঞ্জন ভট্টশালী—বিদ্যার্ণবের আর এক প্রিয়শিষ্য। প্রায় হটী বিদ্যালঙ্কারের সমবয়সী ও সহাধ্যায়ী। সে দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করে ওঠে, আপনি সংযতভাবে বাক্যালাপ করুন মহাশয়! বিস্মৃত হবেন না—যাঁর সঙ্গে কথা বলছেন তিনি কাশীধামের একজন মহামহোপাধ্যায়।

আড্ডাধারী একটা বিজৃম্ভণ বিতারণ করে বলে ওঠে, এই আর এক ভেজাল জুটল! নাও হে বয়স্য, তোমার যা কাজের কথা আছে চটপট সেরে নাও।

বিদ্যালঙ্কারের নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হয়ে ওঠে! অগ্নিবর্ষী দুটি চক্ষু ঐ রাজাসাহেবের দিকে মেলে বলে ওঠেন, আপনাদের দুজনের কোমরবন্ধে তরবারি আছে। আশ্রমিকেরা নিরস্ত্র। এটাই কি আপনাদের দুজনের স্বপক্ষে একমাত্র যুক্তি? ভুলে যাবেন না—কাশীর পণ্ডিতসমাজ বিধান দিলে ঐ নাবালকের 'তরফে' রাজাগিরি করার মেয়াদ কিন্তু আপনার ফুরিয়ে যাবে।

পুরন্দরের মনে পড়ে গেল মেজর কিলপ্যাট্রিকের কথা। প্রয়াগ ক্যান্টনমেন্টের সেই দুর্ধর্ষ সৈনিকটি। সে বলেছিল—দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার শাহ্‌র নাকি অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বন্য ঘোটকী বশে আনানোর ব্যাপারে। পুরন্দরের সে অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু বন্য ঘোটকীকে যদি রজ্জুবদ্ধ করে ফেলা যায়, তখন কি তার পিঠে সওয়ার হওয়া যায় না? পিরান চড়িয়ে আর মাথা কামিয়ে তো তোমার নারীত্বকে লোপ করতে পারনি সুন্দরি! নির্জন অর্গলবদ্ধ কক্ষে পুরুষের পরুষবাহুর নিষ্পেষণে দম যখন বন্ধ হয়ে আসবে তখনো কি বজায় থাকবে তোমার তেজ? দেখতে হবে!

পুরন্দর সংস্কৃতজ্ঞ নয়। তবে নিত্য শুনে শুনে চণ্ডীর দুচারটি শ্লোক তার আয়ত্তে। সহাস্যে বললে, 'গর্জ! গর্জ! ক্ষণং মূঢ়ঃ! যাবন্মধু পিবাম্যহম্!'

—তার অর্থ?

—অর্থ প্রাঞ্জল। অস্ত্র নয়, যুক্তিতর্কই করব, সুন্দরি! তুমি যতক্ষণ না দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমাকে পরাস্ত করতে পারছ ততক্ষণ তোমাকে আমার এই কাশীধামে টোল খোলার অনুমতি আমি দিতে পারি না। পাতসাহী মিলবে না!

বিদ্যালঙ্কার সবিস্ময়ে বলেন, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ? তর্কশাস্ত্রের রীতিনীতি জানেন?

—সেটা তোমার আমার দ্বৈরথসমরে প্রমাণিত হবে, সুন্দরি!

হটী বিদ্যালঙ্কার ঘৃণায় মুখ সরিয়ে নিলেন। অন্যদিকে ফিরে বলেন, বেশ। তাই যদি আপনার অভিরুচি, তাহলে আমি সম্মত। বলুন, কবে? কোথায়?

—আজ থেকে উনিশ দিন পরে। আগামী চৈতালী পূর্ণিমারাত্রে। অসিঘাটে আমার বাগানবাড়িতে।

—বাগানবাড়িতে!

—হ্যাঁ, দ্বৈরথ-সমরের পক্ষে স্থানটা মনোরম! আশেপাশে জনমানব নেই—যারা তোমার 'গর্জনে' অথবা আমার 'মধুপানে' বাধা সৃষ্টি করতে পারে। সে দ্বৈরথযুদ্ধে শ্রোতৃবৃন্দ বা দর্শক কেউ থাকবে না—শুধু তুমি আর আমি। বিচারক থাকবেন, তবে তাঁকে চর্মচক্ষুতে দেখা যাবে না। কারণ তিনি 'অনঙ্গ'!

হটী বিদ্যালঙ্কারের বাক্যস্ফূর্তি হল না।

—এবার বুঝতে পারছ, সুন্দরি? প্রতর্কের বিষয়: 'কুলীনঘরের ব্রাহ্মণের বিধবা সহমরণে যেতে ভীতা হলে তার কী অন্তিমগতি হয়!' একটা রাজাদেশ শুধু জানিয়ে যাই: এই উনিশ দিন তুমি মাথা কামাতে পারবে না। ন্যাড়ামণ্ডির সঙ্গে দ্বন্দযুদ্ধটা আমার না-পসন্দ্! ··· এস হে আড্ডাধারী। আমার যা বলার ছিল, তা বলা শেষ হয়ে গেছে।

ওরা দুজন ধীরপদে নির্গমন-দ্বারের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

শুধু বিদ্যালঙ্কার একা নন্, বিদ্যার্ণব এবং ভট্টশালীও বজ্রাহত!

উপবাসক্লিষ্টা কন্যাটির মুখের দিকে সমস্ত দিন চোখ তুলে তাকাতে পারেননি। এ কী হয়ে গেল! এমন আকাশভাঙা বিপর্যয়ের সম্মুখী হতে হবে এ যে তাঁর দুঃস্বপ্নের অগোচর! পুরন্দর ক্ষেত্রী দুঃশাসক—নানাবিধ অত্যাচার সে চালিয়ে যাচ্ছে এ দুঃসংবাদ যে না পান তা নয়। তার অত্যাচারে রাজপুরোহিত অবসর নিয়েছেন, মন্ত্রী অপসারিত। সেনাপতি বজ্রধর দেশত্যাগী—সে নাকি বর্তমানে শাহাবাদভুক্তির রোহিতাশ্ব দুর্গের দুর্গাধিপ। প্রাক্তন কাশী নরেশের একান্ত বিশ্বস্ত দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল ঈশান কৈবর্তের শাস্তির কথা কে না জানে? তার কুটিরে নাকি রাজাসাহেবের নির্দেশে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়—নিদ্রাগত ঈশানকে সপরিবারে হত্যা করতে। পুরন্দর লোকটা কামুক। তার অসিঘাটের বাগানবাড়িতে দেখা যায় নিত্য নূতন হুরী। শোনা যায়, তার ভিতর কিছু যবনীও আসে নাকি! এবং ভদ্রঘরের কুলনারীরাও! বলপ্রয়োগে! এদিকে অতিশয় ধূর্ত। প্রতিটি ঘাঁটিতে বসিয়েছে নিজের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। গুপ্তচরেরা রাজ্যের সর্বত্র সন্ধান করে বেড়ায়—প্রজাবিদ্রোহ সে কিছুতেই হতে দেবে না। শাসনের নামে কাশীরাজ্যকে শোষণ করার সুপরিকল্পিত বন্দোবস্ত। এসব তথ্য মোটামুটি জানাই ছিল। যেহেতু তিনি নিজে ভিন্ন পথের পথিক, তাই দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণব এইসব রাজনৈতিক বিপর্যয়ের বিষয়ে কোনদিন মাথা ঘামাননি।

আজ ঘামাতে হচ্ছে—যেহেতু শেলটা আজ এসে বিঁধেছে তাঁরই পাঁজর-সর্বস্ব বুকে!

লোকটা আজ বেপরোয়া। কারণ আছে। ঘটনাচক্রে আজ কাশীর বৃহত্তর জনসমাজ বিদ্যার্ণব আর তাঁর কন্যাটির বিপক্ষে। নারীর মুক্তি, নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা—সেইসব কথা এই কূপমণ্ডূকেরা চিন্তাই করতে পারে না। কন্যার পরামর্শে তিনি চতুষ্পাঠী উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন ছাত্রীদের জন্যও। 'ব্রহ্মবাদিনী' ছাত্রী নয় 'সদ্যোদ্বাহা'। অর্থাৎ যারা প্রাকবিবাহ-কালে বিদ্যাশিক্ষা করবে। সংস্কৃত কাব্য পড়তে শিখবে, সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারিত হলে তার অর্থ বুঝবে। এ ছাড়া সংসারী হবার পর পূজা অর্চনার জন্য পরমুখাপেক্ষী হতে হবে না। মদালসার মতো পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করতে না পারুক, অন্তত তার অক্ষর পরিচয়ের সহায়ক হবে। কিন্তু পিতাপুত্রীর যৌথপ্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কাশীবাসী কোন গৃহস্থ তাঁর কন্যাকে চতুষ্পাঠীতে প্রেরণ করেননি। এই কূপমণ্ডূক সমাজ কন্যাদের শিক্ষিত করতে ভয় পায়। বৈধব্যের ভীতি!

বিদ্যার্ণব এবং তাঁর পালিতা কন্যা যে সমাজে নারী-শিক্ষার দীপশিখাটি প্রজ্বলিত করতে চেয়েছিলেন সেই সমাজ সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নেই। থাকবে কোথা থেকে? তখন না ছিল কোন সংবাদপত্র না মাসিক পত্রপত্রিকা। বাঙলাভাষার তখন চর্চা হত সামান্য। দলিল-দস্তাবেজ সব ফার্সিতে। ভুললে চলবে না, আমাদের আখ্যায়িকার কালে রাজা রামমোহনের বয়স দুই বৎসর! উইলিয়াম কেরী—যাঁর উদ্যোগে পঞ্চানন কর্মকার শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ম্যাথু-লিখিত সুসমাচারের প্রথম পৃষ্ঠাটি বাঙলাভাষায় মুদ্রিত করেন—সেই কেরী-সাহেব তখনো ভারতবর্ষে আসেননি। তাই আমাদের আখ্যায়িকার ঘটনাকালের প্রায় সত্তর বছর পরের তিনটি উদ্ধৃতি পাঠকের দরবারে পেশ করি—তাহলে আন্দাজ পাবেন, আমাদের কাহিনীর কালে সমাজের কী অবস্থা ছিল—

১। "বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলে ব্যভিচার সংঘটনের আশঙ্কা আছে।" (সংবাদ প্রভাকর, 12.5.1849)

২। "স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে পতির প্রতি অশ্রদ্ধা করিবেন" (সংবাদ-প্রভাকর, 31.5.1849)

৩। "স্ত্রীলোকেরা বিদ্যারসিকা হইলে ব্যাপিকা হইবেন। ব্যভিচার করিবেন, রন্ধনাদি গৃহকর্ম করিতে চাহিবেন না, পতিসেবা এবং পুত্রকন্যাদির মলমূত্রাদি ধৌত করিবেন না, গরুকে যাব দিবেন না, পাকশালায় গোবর লেপন করিবেন না, বাসন মাজিবেন না, পতির উচ্ছিষ্ট খাইবেন না, শয্যা পাড়িবেন না, পান সাজিবেন না, স্বামীর পদতলে তৈল দিবেন না, পতির পাদোদক গ্রহণ করিবেন না।" (সংবাদ প্রভাকর, 19.6.1849)

তবু সেই অশীতিপর বৃদ্ধ বৈদান্তিক আব তাঁর পালিতা কন্যা দুর্গাবাড়ি অঞ্চলের গৃহস্থদের দ্বারে দ্বারে ফিরেছেন—কেউ স্বীকার করেননি। 'অষ্টমবর্ষে তু ভবেৎ গৌরী' নিয়ম তখনো চালু আছে; কিন্তু কৌলিন্য প্রথার প্রাদুর্ভাবে অনেক হতভাগিনীকে হয়তো আজন্ম কুমারীই থাকতে হত—পাত্রের অভাবে। কুলীনপাত্র কিছু মূল্য ধরে দিলে পিসী-ভাইঝিকে হয়তো একই লগ্নে উদ্ধার করে দিয়ে যায়—কিন্তু ত্রিরাত্রির বেশি শ্বশুরালয়ে থাকতে স্বীকৃত হয় না। বছরে যে মাত্র তিনশ পঁয়ষট্টির অধিক রাত্রি নাই! সেইসব স্বামীসুখবঞ্চিতাদের অভাব ছিল না—বালবিধবাদের দল তো ছিলই। তবু দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণবের চতুষ্পাঠীতে একটিও ছাত্রীর

শুভাগমন ঘটেনি।

তবু চলছিল। কিন্তু এ কী বিপর্যয়!

কী যেন বলে গেল পুরন্দর?

"কুলীন ব্রাহ্মণের বিধবা সহমরণে যেতে ভীতা হলে তার কী অন্তিম পরিণাম হয়!"

হ্যাঁ। সেটাই সমাজের বিধান!

স্বামীর মৃত্যুতে মরতে তোমাকে হবেই! এটা স্ত্রীজন্মের অনিবার্য নিয়তি। তবে কীভাবে মরতে চাও সেটা বেছে নেবার অধিকার সমাজ তোমাকে দিয়েছে। ইচ্ছা করলে স্বামীর দেহান্তে তার সঙ্গে চিতায় উঠে বসতে পার। তখন তোমার কী সম্মান! তোমার পায়ে ওরা আলতা পরিয়ে দেবে, সিঁদুরে সিঁদুরে ব্রহ্মতালুটা আগুনবরণ করে দেবে! অলক্তকরাগে রঞ্জিত করে তোমার রাতুল চরণদ্বয়ের ছাপ তুলে নিয়ে যাবে। তুমি যে মহাসতী! অবশ্য তোমার গায়ের গহনাগুলো সব খুলে নেবে। ওগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলার তো কোন অর্থ হয় না। পরের মেয়েটিকে তো পার করতে হবে! একবস্ত্রা হয়ে তুমি স্বামীর মাথা কোলে নিয়ে জ্বলন্ত চিতায় পতিসহ পুষ্পক রথে ড্যাংডেঙিয়ে স্বর্গপানে রওনা হতে পার।

তা যদি না চাও, তাহলেও আগুনে তোমাকে পুড়তে হবে। অন্য জাতের আগুন! সমাজ এ বিষয়ে উদার—কোন জাতের আগুনে পুড়বে তা তোমার ইচ্ছানুসারে। একেবারে প্রথম পর্যায়েই যদি আগুনে পুড়তে ভয় পাও তাহলে আমৃত্যু—অন্তত আযৌবন, দগ্ধে দগ্ধে মরতে পার। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সেবা করে। তাদের কাম চরিতার্থ করে। যা তোমার অভিরুচি। তোমার অন্তিমগতি বড় বড় শহরের লালবাতি-জ্বলা কোন এক স্বর্গে!

আগুন এবং স্বর্গ দুটোই পাবে। যে পথেই যাও!

কিন্তু ভদ্রভাবে কোন বিগতভর্তার প্রাণধারণের প্রচেষ্টা? সেটা আকাশকুসুম! মনু তেমন বিধান দিয়ে যাননি—অন্তত এটাই ওদের মনুসংহিতার ভাষ্য!

তা না হয় হল। কিন্তু এখন কী করবেন বিদ্যার্ণব? কীভাবে ধর্মরক্ষা হবে তাঁর আদরের পালিতা কন্যার? রাজমাতার দরবারে আর্জি পেশ করার প্রচেষ্টা বৃথা। সেই অন্তঃপুরে তিনি প্রবেশ করতেই পারবেন না। কন্যাটিকে সেখানে পাঠাতে পারেন—কিন্তু তাতেও ফল হবে না কিছু। রাজমাতা নিঃসহায়া। বস্তুত রাজাবরোধের ভিতর তিনি বন্দিনীমাত্র!

দ্বারকেশ্বর অকৃতদার। জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে নিতান্ত দৈবক্রমে তাঁর সংসারে এসেছে এই মা-জননী। তার ফেলে আসা বর্ধমানের জীবনের কথা প্রায় কিছুই জানেন না। বৃদ্ধ কোন কৌতূহল কখনো দেখাননি, মেয়েটিও স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে তা জানায়নি।

শুধু জানেন—সে এক পণ্ডিত পিতার আদরের দুলালী: রূপমঞ্জরী। গৌরীদান করেছিলেন পিতা কন্যার নবম বর্ষে। ত্রয়োদশে বিধবা। আর জানতেন—অসাধারণ মেধা ঐ বাল-বিধবার, অনন্যসাধারণ চারিত্রিক দৃঢ়তা।

প্রায় পাঁচ বছর আগেকার কথা। এক নিদাঘ প্রত্যূষে তার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন দশাশ্বমেধ ঘাটের একান্তে। তখনো পুব আকাশটা ফর্সা হতে শুরু করেনি। পথঘাট নির্জন। এই ব্রাহ্ম-মুহূর্তেই বিদ্যার্ণব গঙ্গাস্নান সেরে আসেন—কী শীত, কী বর্ষা। হঠাৎ নজরে পড়ে পথের ধারে বসে আছে একটি যুবতী মেয়ে। দু হাঁটুর মধ্যে মুখটা গুঁজে। ওর পিঠটা মাঝে মাঝে ফুলে-

1754

ফুলে উঠ্ছে। মেয়েটি যে কাঁদছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। কিন্তু বৈয়াকরণিক পণ্ডিতের মনে পড়ে গেল হেত্বর্থে পঞ্চমী-বিভক্তির সূত্রটা। অগ্নিকে চোখে না দেখেও শুধু ধূম দর্শনে যদি প্রমাণিত হয় 'পর্বতো বহ্নিমান'; তাহলে ওর পৃষ্ঠ-'আন্দোলনাৎ' সিদ্ধান্তে আসা যায়—অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে মেয়েটি কাঁদছে। ওঁর মনে হল—মেয়েটি পথ হারিয়েছে। ধীরপদে এগিয়ে এসে ওর পিঠে একটা হাত রাখলেন।

চমকে অশ্রুআর্দ্র মুখখানা মেলে ধরতেই বৃদ্ধ বললেন, কী হয়েছে মা? কাঁদছিস্ কেন? বাড়ির পথ খুঁজে পাচ্ছিস না?

মেয়েটি বললে, না বাবা, বাড়িই নেই, তার পথ হারাবো কী করে?

অনেক পীড়াপীড়ির পর শুনলেন, মেয়েটি গত রাত্রের মধ্যযামে এসে পৌঁচেছে এই ঘাটে। নৌকাযোগে। কে যে ওকে এভাবে মধ্যরাত্রে দশাশ্বমেধ ঘাটে নামিয়ে দিয়ে গেল তার নামটা কিছুতেই স্বীকার করল না। তবে এটুকু জানাল যে, সে নিজে কুলীন ব্রাহ্মণ বংশের বালবিধবা। তিনকুলে তার কেউ নেই। অগতির গতি বিশ্বনাথের চরণে আশ্রয় নিতে আসছিল। পথে বিপর্যয়। কী জাতের বিপর্যয় তাও স্বীকার করল না। ওর আদি নিবাস বঙ্গভূমে। বর্ধমান জিলার সোঞাই গ্রামে।

ইতিমধ্যে আলো ফুটেছে। স্নানার্থীদের ভিড় বাড়ছে। একটি পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়া রোরুদ্যমানা অনিন্দ্যকান্তি বিধবার সঙ্গে আলাপনরত বৃদ্ধকে দেখে অনেকে কৌতূহলী হয়ে ঘনিয়ে এল: কী হয়েছে পণ্ডিতমশাই?

বিদ্যার্ণব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মেয়েটির উপস্থিতবুদ্ধি দেখে। তার চেয়েও বেশি, ওর মুখে নির্ভুল দেবভাষা শুনে। মেয়েটি তার বক্তব্যের শেষাংশ পেশ করল সংস্কৃত ভাষায়! কৌতূহলী মানুষজন ও দুর্বোধ্য ভাষার নাগাল গেল না—যে যার পথ দেখল। বৃদ্ধ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, সংস্কৃতেই—এ দেবভাষা কার কাছে শিখেছিস?

—আমার পিতৃদেবের কাছে। তাঁরও ছিল চতুষ্পাঠী। তদুপরি তিনি ছিলেন প্রখ্যাত কবিরাজ। তিনিই আমাকে সহমরণে যেতে দেননি, তাই গ্রামে জাতিচ্যুত হয়ে বাস করতেন। তাঁর বৈকুণ্ঠলাভের পরে বাধ্য হয়ে আমি কাশীযাত্রা করেছিলাম—

বিদ্যার্ণব দৃঢ়মুষ্টিতে রূপমঞ্জরীর হাতটি ধরে বলেছিলেন, আয়।

—কোথায় বাবা?

—'বাবা' বলে ডেকেছিস, আবার বোকার মতো জানতে চাইছিস, 'কোথায়'? চল, আগে দুজনে গঙ্গাস্নানটা সেরে নিই—

—এগুলো?

এতক্ষণে বিদ্যার্ণবের নজর হল, মেয়েটির হাতে একটি পুঁটুলি। বললেন, ঘাটেই কারও কাছে জমা রেখে বাপবেটিতে স্নান সেরে নেব, আয়।

রূপমঞ্জরী স্বীকৃতা হল না। পুঁটুলি খুলে দেখাল তার সম্পদ। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দুটি দ্রব্য: একটি জীবন্ত কবুতর আর একটি দুর্লভ বামাবর্ত শঙ্খ।

গঙ্গাস্নান মাথায় উঠল। মেয়ের হাত ধরে ফিরে এলেন চতুষ্পাঠীতে। এগুলি ওঁর মা-জননী কোথায়, কেমন করে পেয়েছে তা আর জানতে চাননি।

জীবনযাত্রার ছকটাই গেল পালটে। চিরদিন একলাটি থেকেছেন। একবেলা স্বপাক আহার। এখন সংসারের সব দায়-ঝক্কি মা-জননীর। এত দীর্ঘদিনের অভ্যাসটা ছাড়তে প্রথমটা রাজি হননি — ঐ স্বপাক আহার। কিন্তু যখন বুঝলেন, সে অভ্যাসটা ত্যাগ করতে না পারলে কন্যাটিকেই ত্যাগ করতে হবে, তখন বাধ্য হয়ে মেনে নিলেন। তারপর পাঁচ-পাঁচটি বছর কেটে গেছে।

পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়া রূপমঞ্জরী আজ ত্রিশের কোঠায়। ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, ন্যায়, নব্যন্যায়, সমাপ্ত করে আজ মা-জননী কাশীর পণ্ডিত সমাজে বিদ্যালঙ্কার।

বাকি আছে শেষ জ্ঞান: ব্রহ্মবিদ্যা। সেটা উনি দেবেন না। না, মন্ত্রদীক্ষা দিতে স্বীকৃত হননি। বিদ্যার্ণব নিজে দীক্ষিত সন্ন্যাসী নন। তাই মা-জননীকে বলে রেখেছেন উপযুক্ত গুরুর ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন। সম্ভাব্য গুরু যে কে, তা জানাননি তাঁর কন্যাটিকে। কিন্তু নিজে মনে মনে তাঁকে নির্বাচন করে রেখেছেন। সেই মহাযোগীর বর্তমান অধিষ্ঠান এই কাশীধামেই—যাবৎ চন্দ্রার্কমেদিনী না হলেও অন্তত পূর্ববর্তী সপ্তদশ শতাব্দী থেকে! উনি অবশ্য কাউকে মন্ত্রদীক্ষা দিতে চান না—তবে একথাও ঠিক যে, তিনি নিতান্ত খেয়ালী। শিশুর মতো সরল। হঠাৎ রাজি হলেও হয়ে যেতে পারেন।

সবই পরিকল্পনা করা ছিল—ইতিমধ্যে এই বিনামেঘে বজ্রপাত!

নাঃ। পুরন্দরের ওটা ফাঁকা আওয়াজ নয়!

আশ্রমে নেমে এসেছে একটা মৃত্যুশীতল কুজ্ঝটিকা। পুরন্দরের কুৎসিত শাস্তিদানের প্রস্তাবটা ছিল যথেষ্ট সোচ্চার। আশ্রমিক ছাত্রদলের মধ্যে যারা কিশোর বা তরুণ তারা না-বুঝল তা নয়! তরুণ আশ্রমিক ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থীরা ক্ষাত্রধর্মের অভাবটা অনুভব করল যেন।

পরদিন রমারঞ্জন বললে, আপনাকে কখনো বলা হয়নি দিদি, আমার এক বড় ভগ্নী ছিলেন। আপনার চেয়ে কিছু বড়ই হবেন—এবং তিনি ছিলেন শ্যামবর্ণা। আমার কৈশোরে তাঁকে মণিকর্ণিকায় দাহ করে এসেছি। আপনাকে দেখলে আমার নিরন্তর তাঁর কথা মনে পড়ে যায়।

রূপমঞ্জরী বুদ্ধিমতী। সহজেই বুঝতে পারে রমা আজ অন্তরঙ্গ হতে চাইছে—ছোটভাইয়ের আসনটা দৃঢ়তর করতে চাইছে। সেই অশ্লীল বিপদটার কথা আলোচনা করার পূর্বপ্রস্তুতি। সে কথা সহাধ্যায়ীর সঙ্গে আলোচনা করতে সঙ্কোচ হয়, দিদির সঙ্গে নয়।

রমারঞ্জন প্রশ্ন করে, আপনার এমন নাম হল কেন? হটী?

—তোমার নাম রমারঞ্জন হল কেন?

—বাঃ। তার একটা অর্থ আছে। 'হটী'র মানে কী?

রূপমঞ্জরী বলেন, ওটা আমার নাম নয়, পিতৃদত্ত উপাধি। 'হট' শব্দের অর্থ সংস্কৃতে নানান প্রকার। যেমন: 'বিদ্রোহ-বুদ্ধি', উদাহরণ: "মনসার হটে সাধু ভিক্ষা মাগি খায়"—এটা মনসার ভাসান থেকে। আবার 'হট' মানে 'ক্রোধ'; যেমন ঘনরামের শ্রীধর্মমঙ্গলে আছে, "হটে হৈমবতী যবে হানিল তার শির"। অথবা 'জোর-জবরদস্তী', যেমন দুর্গাপঞ্চরাত্রিতে 'হট' শব্দের ব্যবহার—"আজি হবে এ সঙ্কট, তেঁই হর কৈলা হট।" 'হটী' নিঃসন্দেহে 'স্ত্রী-আম ঈপ'। আমি অবশ্য জানি না, পিতৃদেব আমার কোন গুণে মুগ্ধ হয়ে ঐ ডাকনামের উপাধি দিয়েছিলেন—বিদ্রোহবুদ্ধি, ক্রোধ অথবা জবরদস্তী।

—তাহলে আপনার নামটা কী দিদি?

—সেটা শুনলে তুমি হাসবে ভাই: রূপমঞ্জরী।

—কেন? হাসব কেন?

— আমার এই নেড়ামুণ্ডি ...

কথাটা শেষ করতে পারেন না। রমারঞ্জনও অধোবদন হয়। দুজনেরই মনে পড়ে যায় পুরন্দরের সেই অশ্লীল কদর্য ইঙ্গিত: ন্যাড়ামুণ্ডির সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধটা জমবে না।

রমারঞ্জন আর দ্বিধা করে না। সরাসরি নেমে পড়ে কাজের কথায়, নিশ্চয় বুঝতে পারছেন দিদি, আজ আপনার সঙ্গে খোশগল্প করতে আসিনি আমি। গুরুদেব তো বজ্রাহত তালগাছের মতো নিথর হয়ে আছেন। লক্ষ্য করেছিলেন কিনা জানি না, আজ তিনি গঙ্গাস্নানে যাননি—বোধকরি বিগত পঞ্চাশ বছরে এই প্রথম! এমন উদাসীনভাবে বসে থাকাটা তো কোন কাজের কথা নয়।

বিদ্যালঙ্কার ম্লান হাসলেন। বললেন, আমি তো উদাসীনের মতো বসে নেই রমা। সংসারের কাজ তো করে যাচ্ছি একই ভাবে—

— কিন্তু কী করে করছেন?

—সহজেই। যে হেতু আমি সমাধানে পৌঁছে গেছি। উদ্ধার পাবার পথ আমার 'হস্তামলকবৎ'!

উৎসাহে সোজা হয়ে বসে রমারঞ্জন, কী তা?

—তুমি রূপমতীর নাম শুনেছ রমারঞ্জন? মালোয়া রাজ্যের জনপদকল্যাণী 'রূপমতী'?

—না। আপনি তাঁর কথা কোথায় শুনলেন?

—আমার বাবামশায়ের কাছে। তিনি আরবী-ফার্সি দুটো ভাষাই জানতেন। রূপমতীর উপাখ্যান আছে আবুল-ফজলের আকবরনামায়। শোন, তোমাকে গল্পটা বলি আগে। নামসাযুজ্যে রূপমতীর কথাই আজ মনে পড়ে গেল আমার। শোন গল্পটা—

আকবর বাদশার ফৌজ নিয়ে বীরদর্পে সেনাপতি আধম খাঁ প্রবেশ করল পরাজিত মালোয়ার রাজধানীতে। আধম হুকুম জারি করে রেখেছিলে—মুগল সৈন্য মালোয়ার যৌবনবতীদের ইচ্ছামতো দখল করতে পারে। শুধুমাত্র যদি মালোয়ারাজ্যের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী রূপমতীকে ধরতে পারা যায় তাহলে কেউ তার গাত্র স্পর্শ করবে না। তাকে পৌঁছে দিতে হবে স্বয়ং সিপাহসালারের শিবিরে।

হত্যা-উৎসব শেষ হল রাত্রির তৃতীয় যামে। ক্লান্ত অবসন্ন রক্তমাখা আধম শয্যাগ্রহণের উপক্রম করছে। ঠিক তখনি এল জবর খবর: রূপমতীকে জিন্দা পাওয়া গেছে!

উৎসাহে চারপাইয়ের উপর উঠে বসল আধম: তব লাও বহ্ ছুকরিকো!

দুই মুগল সৈন্য দুই বাহুমূল ধরে নিয়ে এল বন্দিনীকে। রূপমতীর ঘাঘরা ছিন্নভিন্ন, ওড়না খসে গেছে, কঞ্চুলিকা স্থানচ্যুত। তার কপালে রক্তের ধারা। আধম অবাক বিস্ময়ে দেখছিল।

শিবির নির্জন হলে, প্রহরীরা নিষ্ক্রান্ত হলে, গোঁফে চাড়া দিয়ে আধম বললে, শোন বাঈজী! বেয়াদবী আমার বিলকুল না পসন্দ্। রাত্রে যাকে আমার বিছানায় উঠে বসার অধিকার দিই তার সতীপনা আমার বরদাস্ত হয় না। বেচাল দেখলে তোমার ঐ কাঁচলী-খসা বুকের উপত্যকায় এই

ছোরাখানা আমূল বিদ্ধ করে দিতে আমার হাত কাঁপবে না! কিছু বুঝলে?

চৌষট্টিকলায় পারঙ্গমা রূপমতী একটি কুর্নিশ করে বললে,

'বক্‌ৎল্‌-এ চুন মনীপর খাতিরৎ
খুশ্‌নূদ সী গরদদ্‌।
বজায়ঁ মিন্নৎ ওয়ালি টেঘ্‌-ই-তুদন্‌
আলুদ মী গরখুদ।।

কিছু বুঝলেন?

আধমের শিরস্ত্রাণ ভেদ করে কাব্যমাধুর্য আদৌ প্রবেশ করল না। বললে, সোজা ভাষায় কথা বল?

—সোজা ভাষায় তার অর্থ:

খুন- খারাবির রঙ-তামাশায় খেলতে হোলী চাও?
খুশ্‌ হবে কি গুপ্তিখানা বিঁধলে বুকে? দাও!
তোমার খুশেই হই খুশিয়াল, ভয় শুধু মোর দিলে
খুন কলঙ্কে লিপ্ত হবে তোমার ছোরাটাও।।

আরও সহজ ভাষায়—আমি বাঈজী, সুরৎ আর জওয়ানি নিয়েই আমার মহব্বতের বেসাতি। তাই জানতে চাইছি, মুগল সেনাপতির রুচিটা কী জাতের? আমার মঞ্জিলে আতিথ্য গ্রহণ করে আমাকে স্বমহিমায় দেখতে চান? না কি রক্তমাখা বিবস্ত্রা একটা নারীদেহ ধর্ষণ করেই আপনি তৃপ্ত?

আধম স্তম্ভিত হয়ে গেল। গ্রহণ করল বাঈজীর আমন্ত্রণ। পরদিন সন্ধ্যায় সেজে-গুজে আতর মেখে সে উপস্থিত হল রক্তস্নাত জনপদের শেষ প্রান্তে—বাঈজীর মঞ্জিলে। সেখানে শুয়ে আছে রূপমতী—অতিথির জন্য সাজানো আছে নানান উপকরণ: সিরাজি, চষক, ভৃঙ্গার, নানান বাদ্যযন্ত্র, তবক্‌-দেওয়া সুগন্ধী পান, রূপার রেকাবিতে গোড়ে মালা। আর তার মাঝখানে রেশমী চীনাংশুকে আবৃত রূপমতীর মৃতদেহ!

রমারঞ্জন আত্মবিস্মৃত হল। হঠাৎ দুই হাত চেপে ধরল রূপমঞ্জরীর। আর্তকণ্ঠে শুধু বললে, ন্‌—না!

পরক্ষণেই সে সম্বিত ফিরে পায়। সলজ্জে হাত ছেড়ে দেয়। এবার রূপমঞ্জরীই সেই হাত দুটি চেপে ধরে বলে, দিদির একটা মিনতি, রমা! আমার তো তিনকুলে কেউ নেই। মণিকর্ণিকাঘাটে এ দিদির মুখাগ্নিটাও তুই করিস!

রমারঞ্জন দিদির হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালিয়ে যায়।

পরদিন সে আবার এল। বললে, প্রণাম করতে এলাম দিদি। কাশীধামের বাইরে যাচ্ছি! কাল ফিরে আসব।

—কোথায় যাচ্ছ ভাই?

—সাসারামের পথে রোহিতাশ্ব দুর্গে। গুরুদেব একটি পত্র দিয়েছেন বজ্রধর মিশ্রকে। জবাব নিয়ে আসতে হবে।

1744

বিদ্যালঙ্কারের মনে পড়ল না তিনি কে। রমারঞ্জন বুঝিয়ে দিল—বজ্রধর মিশ্র হচ্ছেন প্রাক্তন কাশীরাজের প্রধান সেনাপতি। কাশীনরেশের মৃত্যুর পরে তাঁকে পদচ্যুত করেছে রাজাসাহেব। বর্তমানে তিনি শাহাবাদভুক্তির রোহিতাশ্ব কিল্লার দুর্গাধিপ। মহামহোপাধ্যায় দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণবকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেছেন গুরুদেব।

এবার বিদ্যালঙ্কার নিজেই আপত্তি তোলেন—এ হতে পারে না! একটি মেয়ের জন্য হয়তো অসংখ্য সৈনিকের মৃত্যু হবে! তা আমি হতে দেব না, দিতে পারি না।

রমারঞ্জন দৃঢ় প্রতিবাদ জানায়, এবার আপনিই ভুল বলছেন দিদি। একটি নারীর জন্য নয়, একটি আদর্শের জন্য।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ব্যর্থ হল রমারঞ্জনের পরিশ্রম। দুর্গাধিপ বজ্রধর মিশ্র রোহিতাশ্ব দুর্গে অনুপস্থিত। সৈন্যসংগ্রহ মানসে তিনি কোথায় কোথায় ঘুরছেন। পাটনা-শাহাবাদ অঞ্চলে যেসব দস্যুর দল বিচ্ছিন্নভাবে ডাকাতি করে সেইসব দুর্ধর্ষ ঘোড়সওয়ারদের নিজ সৈন্যদলে বেতনভুক সিপাহীতে রূপান্তরিত করার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা তাঁর। দুর্গরক্ষার জন্য যেসব অধীনস্থ সেনানায়কদেব রেখে গেছিলেন তারা এতবড় দায়িত্ব নিতে স্বীকৃত হল না। কাশীশ্বরের সৈন্য-বাহিনী সংখ্যায় বৃহত্তর। তদুপরি—জনশ্রুতি, কোম্পানির ফৌজ পুরন্দরের সহায়। লক্ষ্ণৌ-প্রয়াগ ক্যান্টনমেন্টের সঙ্গে রাজা-সাহেবের আঁতাত আছে!

রমারঞ্জন দ্বিতীয় একটা বিকল্প সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছিল—গোপনে দিদিকে নিয়ে সে কাশীরাজ্য ত্যাগ করে যাবে। রূপমঞ্জরী স্বীকৃতা হতে পারেনি। প্রথমত সে-ক্ষেত্রে অকথ্য অত্যাচার হবে রমারঞ্জনের পরিবারবর্গের উপর। সে কাশীরই বাসিন্দা। তার বাবা, মা এবং ভগ্নীরা কাশীর প্রজা। দ্বিতীয়ত সমাজ তো ওদেব ভাইবোনের সম্পর্কটা বুঝবে না—এই গৃহত্যাগের একটা কদর্য ইঙ্গিত করবে; সমাজে পতিত হবেন রমারঞ্জনের পিতৃদেব; মাথা হেঁট হয়ে যাবে দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণবের।

বিদ্যালঙ্কার কিন্তু বিচলিতা নন—সমাধান তো তাঁর মুঠায়—'হস্তামলকবৎ'!

রূপমঞ্জরীর আদর্শ—রূপমতী!

দেখতে দেখতে দশটা দিন কেটে গেল। সূর্যদেব কুম্ভরাশি ত্যাগ করে মীনরাশিতে সংক্রামিত হয়েছেন। কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়ার গাছগুলি ফুলের ভারে আনত। আম্রমুকুলের গন্ধে আকাশ-বাতাস আমোদিত। কোকিলের কণ্ঠে শোনা যায় বসন্তের পুনরাগমনবার্তা!

গঙ্গাবক্ষে ভেসে যায় বড় বড় মহাজনী নৌকা। কাশীর গঙ্গাঘাটের দৃশ্যে কোনও পরিবর্তন হয় না। পালোয়ানেরা প্রত্যুষে ডন-বৈঠক করে, সন্ন্যাসী অবধূতেরা ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে থাকেন। কুলরমণীর দল অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে টুপ-টুপ ডুব দেয়; আর কিশোর দল জলে ঝাঁপাই জোড়ে।

ঁকাশীধাম

খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র।

গোপন রাখার কোন চেষ্টাও করেনি রাজাসাহেব। সে চায় এ নিয়ে আলোচনা হক। লোকে জানুক, বুঝুক—সামাজিক বিধান অস্বীকার করলে সমাজ কী জাতের শাস্তি দেবে। সমাজ যদি সাহস না পায় তাহলে রাজশক্তি এসে কীভাবে সমাজপতিদের দায়িত্ব নিতে পারে।

পথেঘাটে এটাই আলোচ্য বিষয়। কেউ বলেনি খবরটা গোপন রাখতে। তবু সেটাকে গোপন রাখতে সবাই উৎসাহী। সবাই বলে, তোমাকেই শুধু বললাম ভাই, দেখ, পাঁচ-কান কর না।

একদিন জগমোহন পণ্ডিত গোপনে এসে দেখা করলেন বিদ্যার্ণবের সঙ্গে। তাঁর চরণদুটি ধরে বললেন, বিশ্বাস করুন পণ্ডিতমশাই। এ আমরা চাইনি, চাই না। এ কী বীভৎস অত্যাচার! এ কী হয়ে গেল! আমরা রাজাসাহেবের কাছে এ নিয়ে দরবার করতেও গিয়েছিলাম, তিনি কর্ণপাত করলেন না।

বিদ্যার্ণব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, পিশাচসিদ্ধ হতে চাইলে এ রকম পরিণামই হয় তর্কবাগীশ! তোমরা ন্যায়ধর্মকে অতিক্রম করতে চেয়েছিলে পিশাচের পাশবিক বৃত্তিকে উজ্জীবিত করে! এখন সেই তামসশক্তি তোমাদের ক্ষমতার বাইরে।

বিষয়টা নিয়ে অসিঘাটের বাগানবাড়িতেও আলোচনা হয়। আড্ডাধারী বলে, কাজটা তুমি ভালো করনি বয়স্য!

—ভালো করিনি? কী বলতে চাইছ তুমি?

—না, না,। সে কথা বলছি না! আমি বলতে চাইছি উনিশটা দিন ওকে সময় দেওয়াটা উচিত হয়নি। সেদিনই ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে আসা উচিত ছিল এই বাগানবাড়িতে!

রাজাসাহেব পানপাত্রটা পূর্ণ করার অবকাশে বলেন, তুমি মূর্খ! এই জন্যেই সারাটা জীবন শুধু মোসায়েব হয়েই কাটালে! কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে তোমাকে গদিয়াল করে দিতে পারলাম না!

—তার মানে?

—বুঝলে না? আমি যদি সেদিনই ঐ মাগীটাকে দড়িদড়া দিয়ে বেঁধে বাগানবাড়িতে নিয়ে আসতাম, সে রাত্রেই ওর ধর্মনষ্ট করতাম তাহলে সারা রাজ্যের লোক বলত—রাজাসাহেব কামোন্মত্ত হয়ে একাজ করেছে! ঠিক কি না?

—সে কথা বলতে পার!

—দ্বিতীয়ত, বাদশাহ জাহাঙ্গীরের কথা ভেবে দেখ। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন—মৃতপশুর দেহের খোলে ঐ দুই বিদ্রোহীকে এমনভাবে সেলাই করতে হবে যাতে তারা তৎক্ষণাৎ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা না যায়। যেন সমস্ত দিন গো-শকটের উপর ঐ দুটো মৃতপশু ধড়ফড় করতে থাকে! কেন? যাতে সমস্ত শহর সে দৃশ্যটা দেখতে পায়! যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ বিদ্রোহের কথা চিন্তাও করতে না পারে! আমিও তাই চাই—এই উনিশ দিন ধরে ঘরে ঘরে ঐ কথা আলোচনা হক। সে মাগীও পক্ষকাল ধরে ধড়ফড় করুক! শিরশ্ছেদ তো মুহূর্তে ঘটে যায়—শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়—মেয়াদটা দীর্ঘায়ত করে। এ অতি কঠিন কুটিল কৌটিল্য-নীতি, বয়স্য!

1754

কাব্যতীর্থ ফোড়ন কাটে, ন্যায্য কথা। একটা উপমা দিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যায়। ধর কৈ মাছ! বাজার থেকে কিনে এনে তাকে তৎক্ষণাৎ রন্ধন করলে সেই স্বাদ পাওয়া যায় না, যা পাওয়া যায় জিয়োনো কৈ-এ! কিন্তু একটা কথা রাজাসাহেব। মনে আছে নিশ্চয় শিবাজী-মহারাজের কথা! আফজল খাঁর সঙ্গে তাঁর সেই একান্ত সাক্ষাৎ? তুমি এই বাগানবাড়িতে বিদ্যালঙ্কারের সঙ্গে দ্বৈরথ-সংগ্রামে ব্রতী হতে চাও—ভাল কথা; কিন্তু তার পূর্বে আমাকে অনুমতি দিতে হবে। অর্গলবদ্ধ-কক্ষে মেয়েটিকে প্রবেশ করতে দেওয়ার পূর্বে আমি তার সর্বাঙ্গ তল্লাসী করে দেখব—তার কাঁচুলীর ভিতর বা ঘাঘরার নিচে কোনও অস্ত্র লুকানো আছে কিনা।

বটু বললে, তল্লাসীর কাজটা আমরা ভাগাভাগি করে সারতে পারি। আপনি লম্বা মানুষ—প্রথম দায়িত্বটা নিলে, দ্বিতীয়টা আমিই নিতে পারি।

রাজাসাহেব মনে মনে হাসলেও মুখে বিরক্তি প্রকাশ করলেন, তোমাদের সব তাতেই ঐ এক অশ্লীল রসিকতা! আমার উদ্দেশ্যটা তোমরা আদৌ বুঝতে পারনি। আমাকে এ কাজটা করতে হচ্ছে নিতান্ত কর্তব্য হিসাবে। সামাজিক দুর্নীতি দূরীকরণে দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাকে এ জাতীয় কর্তব্য পালন করতে হয় বলে। কখনো বা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

বয়স্যরাও মনে মনে হাসে। তবে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। রাজাসাহেব যদি নল্‌চের আড়াল দিয়ে তামাক সেবন করতে চান তাহলে তাঁর বেতনভুক মোসায়েব হিসাবে ওদের ভান করতে হবে যে, নল্‌চের আড়াল পড়ায় দৃশ্যটা দেখা যাচ্ছে না।

কাব্যতীর্থ বললে, সে-কথা ঠিক! কিন্তু আমি একটা খবর পেয়েছি রাজাসাহেব। আপনার রাজাদেশটা বিদ্যালঙ্কার মানছে না। সে নাকি এখনো তার মাথা কামিয়ে চলেছে! এটা মূল অপরাধের অতিরিক্ত। এ পাপের শাস্তিবিধানের দায়িত্বটুকু কি আপনি আমাদের ভাগাভাগি করে নিতে দেবেন? আমাকে আর বটুকে?

রাজাসাহেব বলেন, তোমাদের কিছু করতে হবে না। খবরটা আমার অগোচর নয়। ব্যবস্থা আমি নিয়েছি ইতিমধ্যে। কাশীশ্বরী যাত্রাপার্টির অধিকারীকে নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছি—চৈতালী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় সে আমাকে একটি সুদৃশ্য সুগন্ধী পরচুলা পাঠিয়ে দেবে। এই বাগানবাড়িতে।

আড্ডাধারী জানতে চায়, কিন্তু সেদিন সেই যে শোভাযাত্রার কথা বলেছিলেন তার তো কোনও উদ্যোগ দেখছি না? বিদ্যালঙ্কার—তোমার সঙ্গে দ্বৈরথসমরে জয়ী হোক আর পরাজিত হক—তাকে যে ঢাক-ঢোল-শিঙা বাজিয়ে রণ্ডিবাজারে পাঠিয়ে দেওয়া হবে তার কী আয়োজন হল?

রাজাসাহেব বললেন, না! সে সিদ্ধান্ত আমি পরিবর্তন করেছি। কুলীন ব্রাহ্মণের বিধবা সহমরণে যেতে ভয় পেলে তার কী অন্তিম পরিণতি হয় এটা সমাজকে বুঝিয়ে দেবার পর মেয়েটির মৃতদেহ গঙ্গাবক্ষেই নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি।

তিন বয়স্য নীরব থাকে। রসিকতা করতেও ভুলে যায়! স্তব্ধতা ঘনিয়ে আসে।

ওরা কিন্তু আদৌ বুঝতে পারেনি কেন এই পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত। সে প্রশ্নটা ওরা উত্থাপন করতেও ভুলে যায়। মৃত্যুর এমনই মহিমা।

পুরন্দর, আগেই বলেছি, ধুরন্ধর।

সে অনেক কিছু ভেবে দেখেছে।

তার আশঙ্কা হয়েছে—হয়তো ঐ পাশবিক শোভাযাত্রায় বিপরীত প্রতিক্রিয়া হবে। লোকচক্ষুর অন্তরালে একটি রমণীর ধর্ষিতা হওয়ার সংবাদ মানুষে সহজে ভুলে যায়; কিন্তু বিবস্ত্রা একটি যুবতীকে জনবহুল সড়ক দিয়ে পদব্রজে অগ্রসর হতে স্বচক্ষে দেখলে দৃশ্যটা মানুষে ভুলতে পারে না। কাশীর প্রজাসাধারণের মধ্যে শুধুমাত্র পাষণ্ডই নেই, আছেন মহামান্য অসংখ্য পণ্ডিত। হয়তো বিদ্রোহ ধূমায়িত হয়ে উঠবে ঐ জ্ঞানী মানুষগুলির অন্তরেই। ওদের তীরধনুক-বল্লম-তরবারী নাই—কিন্তু 'ব্রহ্মশাপ'-এর ব্রহ্মাস্ত্র আছে! তাঁরা যদি সমবেতভাবে নিদান হাঁকেন তাহলে রাজাসাহেবের গদিও হয়তো টলে উঠবে।

রাজাসাহেব বিকল্প ব্যবস্থা করেছে। বয়স্যদের কাছেও সংবাদটা গোপন রেখেছে। জানে ওর দুএকটি অত্যন্ত বিশ্বস্ত অনুচর—রামলগন, ভিখন আর ছেদীলাল। স্থির হয়েছে ঐ মেয়েটিকে এই বাগানবাড়ির একটি কক্ষে পক্ষকাল বন্দিনী করে রাখা হবে। নিত্য সন্ধ্যায় তাকে উপস্থিত করা হবে রাজাসাহেবের শয়নকক্ষে। পক্ষকালের নিত্যধর্ষণ!

'গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় যাবন্মধু পিবাম্যহম্'।

বিগতভর্তা যৌবনবতীর জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এই পক্ষকালকে 'ক্ষণ' বলা অযৌক্তিক নয়! অসহায় ধর্ষিতা নারীর গর্জন পাষাণ প্রাচীরের বাহিরে শোনা যাবে না—রাজাসাহেব নিশ্চিন্তে মধুপান করতে পারবে। তারপর, ওর মাথায় কিছু চুল গজালেই—না, গঙ্গাবক্ষে তার মৃতদেহটি নিক্ষিপ্ত হবে না; তাকে রাতারাতি বজরায় চাপিয়ে রওনা দেবে দক্ষ লাঠিয়াল রামলগন। পূর্ব মুখে। পৌঁছে দেবে এলাহাবাদ ক্যান্টনমেন্টে। মেজর কিল্‌প্যাট্রিকের খিদমতে।

কাশীরাজ একটি ক্রীতদাসীকে উপঢৌকন পাঠিয়েছেন। কিল্‌প্যাট্রিক একদিন শ্যাম্পেনের নেশার ঝোঁকে সক্ষেদে বলেছিল, এ দেশীয় ক্রীতদাসী, কস্‌বি অথবা উপপত্নীতে তার মন ভরে না—সব 'কালা ঔরৎ'!

রাজাসাহেব ওকে খুশি করে দেবে এতদিনে! দ্যাখ শালা! এ কালা-আদমির দেশেও পদ্মফুল ফোটে!

অবশেষে সিদ্ধান্তে এলেন অশীতিপর বৃদ্ধ বিদ্যার্ণব।

মেয়ের হাতদুটি টেনে নিয়ে বললেন, আমি সমাধানে পৌঁচেছি, মা জননী। শোন, বুঝিয়ে বলি—গত দশ দিন তুই আমি দুজনেই ঘরের বার হইনি। চতুষ্পাঠী পরিচালনা করেছে রমারঞ্জন। আমরা দুজন এ দশ দিন গঙ্গাস্নানও করিনি। কাল করব। পুব-আকাশে আলো ফোটার আগেই বাপ-বেটিতে বেরিয়ে যাব। বুঝলি?

—বেশ তো, যাব। এটা কী-এমন বড় জাতের সিদ্ধান্ত?

—না, সবটা বলা হয়নি। গঙ্গাস্নান একটা অছিলা। রমারঞ্জন ব্যবস্থা করেছে।

দশাশ্বমেধ ঘাটে ওর একজন বিশ্বস্ত মাঝি—নকুলেশ্বর কাহার—অপেক্ষা করবে। সে আমাদের ব্যাসকাশী পৌঁছে দেবে। সেখানে থেকে আমরা বাপ-বেটিতে বাদশাহী-সড়ক ধরে কাশীত্যাগ করব। পদব্রজে চলে যাব রোহিতাশ্ব।

—কাশীত্যাগ করবেন! এই বৃদ্ধ বয়সে! এই ভদ্রাসন? এই গুরুকুল-চতুষ্পাঠী!

—রমারঞ্জন দায়িত্ব নিয়েছে। সে সব কিছুর দায়িত্ব নেবে—যতদিন না আমরা বাপ-বেটিতে ফিরে আসি। তুই ঠিকই বলেছিলি—রমার সঙ্গে গৃহত্যাগ করলে তার নানান প্রতিক্রিয়া হত। আমার ক্ষেত্রে তা হবে না।

—কতদিন পরে আমরা ফিবে আসব?

—কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ সাবালক হলেই। পুরন্দরের হাত থেকে শাসনদণ্ডটা গ্রহণ করলেই।

—সে তো তিন-চার বছর, বাবা?

—হোক না! 'কালোহ্যয়ম্ নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বীঃ'। এখন আমাদের স্মরণে রাখতে হবে—কাল অনন্ত, পৃথ্বী বিপুলা। একদিন-না-একদিন ফিরে আসবই। কোথাও না কোথাও আশ্রয় জুটবেই। আর নেহাৎ নাই যদি জোটে তাতেই বা ক্ষতি কী? আত্মমর্যাদা তো খোয়াব না!

হটী বিদ্যালঙ্কার সম্মত হলেন। ঐ জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের বলিরেখাঙ্কিত হাতটি ধরে নিরুদ্দেশ যাত্রায় পুনরায় গৃহত্যাগ করতে।

পরদিন—না পবদিন নয়, সেই রাত্রেরই শেষ প্রহর। মাথার উপর তখনো এক-আকাশ তারা। শুক্লা সপ্তমী তিথি। চাঁদ অস্ত গেছে অনেক আগে। কিন্তু তারার দলের কৌতূহল মেটেনি। তারা ঝুঁকে পড়ে দেখছে এক বৃদ্ধ আর তার কন্যার আজব অভিসার। ওরা ঘর ছেড়ে পথে নামছে। রাজার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে প্রজা।

না, রাজা একা নয়—ভাবেন বিদ্যালঙ্কার। রাজা-সাহেব এই পুরুষশাসিত কূপমণ্ডূক সমাজের এক প্রতীক মাত্র। সমাজের সর্বস্তরে গ্লানি, ক্লেদ, পঙ্ক। বঙ্গভূমে দেখে এসেছেন কী প্রচণ্ড সামাজিক অবক্ষয়। ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যায় মঠে মঠে বীভৎস বামাচার। জায়গীরদারের দল বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়েছিল। প্রজার সঙ্গে একটিমাত্র সম্পর্ক—খাজনা আদায়। সমাজপতিরাও সেই পঙ্কস্রোতে গা ভাসালো। মুষ্টিমেয় যে কজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ প্রতিবাদ করতে রুখে দাঁড়ালো তাদের ওরা ফাঁসিকাঠ থেকে লটকালো। এই অবক্ষয়ের অনিবার্য ফল—বর্গীর আক্রমণ। সোনার বাঙলা শ্মশান হয়ে গেল! একজনও মাথা খাড়া করে দাঁড়াতে পারল না। তারপর এল বিদেশী বেনিয়ার দল। সহজেই দখল করে নিল দেশ-শাসনের অধিকার। শুধু বাঙলা নয়, সারা ভারতবর্ষে তখন ঐ অবক্ষয়ী অধঃপতনের যুগ। ভাগোয়া-ঝাণ্ডার ধারক স্বয়ং ভবানী মাতার বরপুত্র শিবাজী-মহারাজের উত্তরসূরীরা আজ লুটেরা ডাকাত; রাণা প্রতাপের ঐতিহ্যের ধারক আজ বাদশাহী-সড়কের ঠগী!

এবং তারপর ছিয়াত্তরের মন্বন্তর! তার ভিতরেই তিনি কাশীযাত্রা করেন।

কাশীনরেশের প্রয়াণে এই পুণ্যভূমিতে শাসনের নামে যে শোষণ করতে এসেছে সেই রাজাসাহেব ঐ অবক্ষয়ী পাশবিকতার এক মূর্ত প্রতীক মাত্র!

মা-জননীর হাতটি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে অতি সন্তর্পণে বিদ্যার্ণব গৃহদ্বার উন্মুক্ত করলেন।

কাশীধাম

চরাচর নিস্তব্ধ। পাখির কাকলি এখনো শুরু হয়নি। পথে দেখা দেয়নি প্রত্যূষ-স্নানার্থীর দল। দুইজনে পথে নামলেন।

ইষ্টনাম স্মরণ করার পূর্বেই বাধা।

—কে! কে ওখানে?

অন্ধকারের ভিতর থেকে অগ্রসর হয়ে এল এক দশাসই জোয়ান। মাথার ঝাঁকড়া চুল একটি গামছায় ফেট্টি দিয়ে বাঁধা। কটিবন্ধে তরবারী, হাতে দীর্ঘ বংশদণ্ড। বিদ্যার্ণবকে নত হয়ে প্রণাম করল। বললে, ডরিয়ে মৎ পণ্ডিত মোশা। হামি রামলগন আছি।

—রামলগন! কে তুমি বাবা, রামলগন? এখানে কী করছ?

অতি বিনীতভাবে লোকটা আত্মপরিচয় দিল। সে রাজসরকারের বেতনভুক্ত লাঠিয়াল। শহরের অনেক মানুষ নাকি আজ পণ্ডিতজী আর তাঁর কন্যা ঐ মাতাজীকে বিষ নজরে দেখে। যে কোন মুহূর্তে তারা নাকি এই চতুষ্পাঠী আক্রমণ করে মাতাজীকে অপহরণের চেষ্টা করতে পারে। তাই তাঁর নিরাপত্তাবিধানে সে রাজসরকার-নিয়োজিত প্রহরীমাত্র—যাবৎ পূর্ণমাসী!

বললে, গঙ্গাজীমে যাইবন নু? আসেন হমার সাথ। কৌন ঘাট? দশাশ্বমেধ সায়েদ?

মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেল যাবতীয় পরিকল্পনা!

প্রণিধান করলেন, তিনি সকন্যা গৃহবন্দীমাত্র। ওর ঐ 'যাবৎপূর্ণমাসী' শব্দটি বিশেষ অর্থপূর্ণ। অর্থাৎ, অনর্থবহ! চৈতালী পূর্ণিমায় কামাগ্নির চিতায় তাঁর আদরের কন্যাটিকে পূর্ণাহুতি দেওয়া হবে। চিতাভ্রষ্টার অন্তিম গতি—ব্যভিচারীর কামাগ্নিচিতা।

কী যেন বলেছিল রমারঞ্জন? সেই মালোয়া-জনপদকল্যাণীর নাম?

এতক্ষণে পুব-আকাশটা একটু একটু করে ফর্সা হচ্ছে। দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌঁছে রামলগন বসল পাষাণ-রানার একান্তে—যেখানে থেকে ঘাটের স্নানরতাদের নজর করা যায়। পাণ্ডাজীর গোলছাতির আড়াল থেকে। বিদ্যার্ণব আর বিদ্যালঙ্কার পায়ে পায়ে নেমে গেলেন গঙ্গার দিকে। ডাইনে পুরুষদের ঘাট, বামে স্ত্রীলোকদের। বিদ্যার্ণব পুরুষদের ঘাটের দিকে অগ্রসর হয়ে গেলেন। দশ-পনেরজন স্নানার্থী ইতিপূর্বেই এসেছে। তাদের মধ্যে একজন ওঁকে দেখে চিনতে পারেন। বলেন, প্রাতঃপ্রণাম ঠাকুরমশাই, কিছু সুরাহা হল?

বিদ্যালঙ্কারের মনটা বিষিয়ে ওঠে। সর্বত্র ঐ আলোচনা। দ্রুতপদে তিনি স্ত্রীলোকদের ঘাটের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তবু পরবর্তী কথাটাও কানে যায়, ঘোর কলি পণ্ডিতমশাই! কী করবেন বলুন? ঐ রাজাসাহেবের চরণদুটি আঁকড়ে ধরে ক্ষমা চান!

বিদ্যালঙ্কার শিহরিতা হয়ে ওঠেন। কে যেন সপাৎ করে একটা চাবুক মেরেছে ওঁর পৃষ্ঠদেশে। ওপাশ থেকে আবার একজন বলে ওঠে, কী বলছ বসুজা? মহামহোপাধ্যায় বিদ্যার্ণব ক্ষত্রিয়ের পদস্পর্শ করবেন?

বিদ্যালঙ্কার দুহাতে কর্ণমূল চেপে ধরে এ-ঘাটে দ্রুত প্রবেশ করেন। একজন বর্ষীয়সী মহিলা তাঁকে সম্বোধন করে বলে ওঠেন, এ ঘাটে নয় পণ্ডিতমশাই, এটা মেয়েদেব ঘাট।

বিদ্যালঙ্কার যেন দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন মা গঙ্গার বুকে। বৃদ্ধা চিৎকার করে প্রতিবাদ করতে যান; কিন্তু তার পূর্বেই একটি বধূ ওঁর কর্ণমূলে বলে ওঠে, কাকে কী বলছ

ঠাম্মা? উনি যে সেই আজব 'মেয়ে-পণ্ডিত'!

বিদ্যালঙ্কার এক ডুব দিয়ে তখন পুনরায় দাঁড়িয়ে উঠেছেন, কোমর জলে। তাঁর ঢিলেঢালা পিরান গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেছে। গৈরিক সিক্ত বসন ভেদ করে বিদ্যালঙ্কারের পরিচয় ততক্ষণে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তিনি আবার ডুব দিলেন।

ঘাটের উপরে পাষাণরানায় রামলগন বসে নজর রেখেছিল। বন্দিনীর জিম্মাদারী তার। নজরে রাখা তার রাজকর্তব্য; কিন্তু ধর্মভীরু লোকটা চোখ ফেরালো। সিক্তবসনা ঐ অনিন্দ্যকান্তি রমণীর রূপ থেকে মনটাকেও ফেরাবার চেষ্টা করল: জয় শিউজী! জয় বজরঙ্গবলী!

ওর মনে পড়ে গেল পূর্বদিনের সন্ধ্যার কথা। সিদ্ধির আসরে সুখিয়া ওকে জনান্তিকে প্রশ্ন করেছিল, এক বাৎ পুছুঁ লগনভাই?

—কা বাৎ?

সুখিয়া জানতে চেয়েছিল, শহরে যে গুজবটা মুখে মুখে ছড়াচ্ছে তা কি সত্যি? ঐ পণ্ডিত মহিলাটিকে শাস্তিদানের পর নাঙ্গা অবস্থায় শোভাযাত্রা করে পৌঁছে দেওয়া হবে রণ্ডিবাজারে?

রামলগন বলেছিল, ম্যায় কা জানতা?

স্বীকার করেনি। মন্ত্রগুপ্তির নির্দেশ ছিল—কথাটা তাই পাঁচকান করেনি। রামলগন জানত—না, ঐ মহিলাটিকে নগ্ন অবস্থায় ঢাল-ঢোল-শিঙ্গা বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে রণ্ডিবাজারে আদৌ পৌঁছে দেওয়া হবে না। তার অন্তিমগতি প্রয়াগ ক্যান্টনমেন্টে। যবন শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের কাম চরিতার্থ করতে করতেই মাতাজীর যৌবন বিকাবে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল রামলগনের।

—হে শিউজী! হে বজরঙ্গবলী! এ তোমাদের কেমন বিচার? কী পাপ করেছে ঐ পণ্ডিতমাঈ। সে তো কারও পাকাধানে মই দেয়নি? লিখা-পড়ি নিয়ে সে তো দিব্যি ছিল বড় পণ্ডিতজীর ডেরায়। কেন তাকে তোমরা বেইজ্জত করছ?

কেন পাঠিয়ে দিচ্ছ জঙ্গী ফিরিঙ্গিদের ছাউনিতে?

রাজাসাহেবের উপর এই ধর্মভীরু মানুষটি খুশি নয়। রাজাসাহেব মত্তাবস্থায় ভাঙের ভাণ্ড ওর মস্তক লক্ষ্য করে মেরেছিলেন একদিন—মাথা ফেটে রক্তপাত হয়েছিল—তা হোক; সে জন্য রামলগনের কোন ক্ষোভ নেই। রাজাসাহেব মালিক, সে নোকর—মত্তাবস্থায় রাজাসাহেব যদি ওর রক্তপাতের উপলক্ষ্য হন তাহলে জন্মদাস রামলগনের মতো মানুষরা ক্ষুব্ধ হয় না। ঐ ওদের সাতপুরুষের নিয়তি। মদ্যপান বা নিত্যনতুন নারীসঙ্গের জন্যও সে রাজাসাহেবের উপর বিরক্ত হয়নি—এমনটা তো হয়েই থাকে। বুড়োরাজার এসব দোষ ছিল না—কিন্তু তিনি তো ব্যতিক্রম। রামলগন জানে, এটাই বড়লোকের রেওয়াজ। তামাম হিন্দুস্থানে। রামজীর মতো প্রজা-পালক, জনকরাজার মতো রাজর্ষি এ যুগে দুর্লভ। রামলগন ক্ষুব্ধ—যেহেতু ঐ রাজাসাহেব লোকটা কসবি বা রণ্ডি নিয়ে খুশ থাকে না। তার নজর—ঘরানা-ঘরের বধূ, গৃহস্থ ঘরের কন্যা! তাদের মুখে ফেট্টি বেঁধে নিয়ে আসে বেতনভুক অপহারকের দল। দু-চার রাত ফুর্তি-ফার্তা করে রাজাসাহেব জানায়—সখ মিটে গেছে! তখন হয়তো হতভাগিনী আত্মহত্যা করে। অনেকে আশ্রয় নেয় রণ্ডিবাজারে। কেউ কেউ নিঃশব্দে পাল্‌কি চেপে ফিরে যায়

স্বগৃহে। কখনো বাড়ির লোক নিঃশব্দে মেনে নেয়। কখনো বা তার মৃতদেহ নিজেরাই সৎকার করে!

চমক ভেঙে রামলগন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

স্নানান্তে পণ্ডিতজী সকন্যা ফিরে আসছেন। বগলে সিক্তবসন। পরিধানে শুষ্ক পোশাক।

—চলিয়ে পণ্ডিতজী।

—না। আমি একবার ওপারে যাব। ব্যাসকাশী।

রামলগন অবাক হয়। বলে, ক্যোঁও?

বিদ্যার্ণব বিরক্ত। বলেন, আমার খুশি। তুমি এখন কী করবে?

—ম্যয় ভি যাউঙ্গা! ক্যা কর্কুঁ? চলিয়ে—

ঘাটে নির্দেশমতো অপেক্ষা করছিল নকুলেশ্বর। সে বিস্মিত হল। রমারঞ্জনের কাছ থেকে সে নির্দেশ পেয়েছিল—ভোররাত্রে পণ্ডিতজী আর মাতাজী ঘাটে আসবেন—সঙ্গে আর কেউ থাকবে না। নকুলেশ্বর কোন কথা বলবে না। শুধু দুজনকে ওপারে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে। আর কাকপক্ষীকেও সে-কথা বলবে না। রমারঞ্জনের নির্দেশটি ছিল প্রাঞ্জল। বুঝতে কিছু অসুবিধা হয়নি নকুলের। সে কাশীরই বাসিন্দা। সবাই যা জানে, তা তার অবিদিত নয়। সে সহজেই বুঝতে পেরেছিল—ওঁরা বাপবেটিতে কাশীত্যাগ করতে চাইছেন। আসন্ন মৃত্যুর মুখ থেকে অব্যাহতির শেষ চেষ্টা। নকুলেশ্বর রাজি হয়েছিল। বোধকরি এ জন্য পারিশ্রমিক না পেলেও সে রাজি হত। রাজাসাহেবকে সেও অত্যাচারী শাসক বলে মনে করে। ঐ নির্বিরোধী পণ্ডিতজী আর তাঁর সেই সাক্ষাৎ দুর্গাপ্রতিমার মতো কন্যাটিকে সে আন্তরিক শ্রদ্ধা করে—কিছু না বুঝেও। তাই সে অবাক হল, যখন দেখলো ওঁরা দুজনে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন সশস্ত্র দেহরক্ষীটিকে। রামলগনকে ভালভাবেই চিনত নকুলেশ্বর। জেনে-বুঝেও সে প্রশ্ন করে, কাঁহা যাইবন পণ্ডিতমোশা?

—ওপারে। ব্যাসকাশীতে।

নৌকায় তিনজনে উঠে বসলেন। ছোট্ট ডিঙি নৌকা। বাপবেটি বসলেন একদিকে, ঘেঁষাঘেষি করে। সামনের পাটাতনে লাঠিহাতে রামলগন। নৌকা ছাড়ল। রামলগন হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে প্রায় কানে-কানে বিদ্যার্ণবকে বললে, পণ্ডিতজী, এক বাৎ বাতাউ?

—কী?

—আপনি যা হিঙ্গা করছেন, উ হোবে না!

—কী বলতে চাইছো তুমি?

—আপনি হমার এক্তিয়ার থিকে ভাগতে পারবেন না। বেহুদ্দো ব্যাসকাশী যাচ্ছেন কেন?

বিদ্যার্ণব দাঁতে-দাঁত দিয়ে নীরব রইলেন।

বিদ্যালঙ্কার বুঝে উঠতে পারেন না, এই গঙ্গা পার হবার হেতুটা কী? নকুলেশ্বর নির্দেশ মতো উপস্থিত ছিলই। তারই নৌকায় ওঁরা গঙ্গা পার হচ্ছেন। কিন্তু এখন তো তার কোনও অর্থ হয় না। মূর্তিমান যমদূতের মতো সশস্ত্র বসে আছে রামলগন।

সূর্যোদয় হয়েছে ইতিমধ্যে। গঙ্গার ঘাট এখন লোকে লোকারণ্য। সে-আমলে কাশীর গঙ্গা ছিল হরিদ্বার-গঙ্গার মতোই নির্মল, নীল। 'কা শীতলবাহিনী গঙ্গা? —কাশীতলবাহিনী গঙ্গা।'

1৭-৭৭

নকুলেশ্বর ওপ্রান্তে বসে একভাবে দাঁড় টেনে চলেছে। লগিটাকে তুলে রেখেছে ঘাটের সীমা পার হবার পর। ছলাৎ-ছল, ছলাৎ-ছল। বহু লোক স্নান করছে—এঘাটে ওঘাটে। তারা চোখ তুলে দেখছে নৌকার যাত্রীদের। তারা জানে না, এই তিনটি ঘেঁষাঘেঁষি পারানির যাত্রীর দুজন বন্দী আর একজন পাহারাদার।

ক্রমে এপারের দৃশ্য আবছা হয়ে এল। এগিয়ে এল ওপারের দৃশ্য। দিগন্তজোড়া শুধু ধু-ধু বালির চড়া। জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। কিছু জলচর পাখি শুধু ভিড় করে আছে—কাদা-খোঁচা, জলপিপি, গাঙশালিক, চখাচখী—এমনকি কিছু শীতালী পাখি, যারা এখনও মানসযাত্রা শুরু করেনি।

রামলগন পুনরায় নিচু হয়ে একই কথা বলল, পণ্ডিতজী! এক বাৎ কহুঁ?

বিদ্যার্ণব রীতিমতো বিরক্ত। তিনি নিজের চিন্তায় বিভোর ছিলেন। বলেন, বার-বার একই কথা বলছ কেন, রামলগন?

—নেহি, নেহি পণ্ডিতজী। ইবার ম্যয় দুসরা বাৎ কহ্‌নে চাহতা।

—ক্যা বাৎ?

রামলগন নতনেত্রে তার প্রাকৃতভাষে যে কথা নিবেদন করল তা বেশ কিছুটা অপ্রত্যাশিত। হঠাৎ গঙ্গাজলে ডান হাতটা ডুবিয়ে দিয়ে অস্ফুটস্বরে বলে ওঠে, এই গঙ্গাজীমে হাঁথ দিয়ে বলছি পণ্ডিতজী! আপ্‌....আপনি মাতাজীকে নিয়ে ভেগে যেতে পারলে এই রামলগন হারামি ভি খুশি হোবে! লেকিন ক্যা কঁরু? ইয়ে হ্যয় মেরা নসিব!

বিদ্যার্ণব জবাব দিলেন না।

বিদ্যালঙ্কার হঠাৎ কিছুটা অভিভূত হয়ে পড়েন। যুক্তকরে অস্ফুটে উচ্চারণ করেন উপনিষদের মন্ত্র:

'মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তনিরাকরণং মেহস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু। তে ময়ি সন্তু।।'

বিদ্যার্ণবের কর্ণে প্রবেশ করল সে মন্ত্রধ্বনি। তিনি পাদপূরণ করলেন, ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ। শান্তিঃ।। হরিঃ ওঁ।।

বিদ্যালঙ্কারের মনে পড়ল এই কিছুক্ষণ আগেকার একটি ছোট্ট ঘটনা। দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নানান্তে তিনি যখন বস্ত্র পরিবর্তন করতে প্রাচীরের অন্তরালে যাচ্ছিলেন তখন পিছন থেকে কে যেন তাঁকে ডেকে উঠেছিল, বাবা! একটু দাঁড়িয়ে যাবেন?

বিস্মিতা হটী বিদ্যালঙ্কার দুরন্ত কৌতূহলে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন তিনি সদ্যস্নাতা। সিক্ত পিরানটি তাঁর দেহের সঙ্গে লেপ্‌টে সেঁটে আছে। তাছাড়া তিনি স্ত্রীলোকদের জন্য চিহ্নিত অন্তরালে যাচ্ছিলেন বস্ত্র পরিবর্তনের জন্য। এই সময়ে কে তাঁকে ডাকল 'বাবা' বলে?

ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন সেই বৃদ্ধা। যিনি ওঁকে বারণ করেছিলেন এ ঘাটে স্নান করতে। তাঁর পাঁজর-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বধূটি, অবগুণ্ঠন টেনে।

বিদ্যালঙ্কার বলেছিলেন, কিছু বলবেন?

—হ্যাঁ বাবা! আপনাকে একটি প্রণাম করতে চাই। না, না, আমরা বামুন নই, গন্ধ-বেনে! আপনি বয়সে ছোট বলে দোষ নেই।

বৃদ্ধা আর তাঁর নাতবৌ বিদ্যালঙ্কারকে প্রণাম করেছিলেন পদস্পর্শ করে। বিদ্যালঙ্কাব আপত্তি করেননি, আশীর্বাদ করেছিলেন। সহাস্যে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি এখনো আমাকে 'বাবা' বলে ডাকছেন কেন?

বৃদ্ধা নিদন্ত হাসি হেসে বলেছিলেন, তখন আপনারে চিনতে পারিনি, বাবা। আমার এই নাত-বউ বুঝিয়ে দিল—আপনিই সেদিন সেই কুরুক্ষেত্তর তালাও-এ ....

বাধা দিয়ে বিদ্যালঙ্কার বলেন, সে তো হল, কিন্তু 'বাবা' কেন? কেন নয় 'মা'?

বৃদ্ধা জোড়হস্তে বলেছিলেন, আপনি বেহ্মজ্ঞানী! 'বাবা-মা ডাকাডাকির' ওপারে!

বিদ্যালঙ্কারের চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল! তাঁর সাধনা তাহলে তো নিষ্ফলা নয়! এই গন্ধবণিক বৃদ্ধাটি তো তাঁর অশিক্ষা সত্ত্বেও প্রণিধান করতে পেরেছেন—ব্রহ্মবিদ্যা লাভের এক্তিয়ার শুধুমাত্র পুরুষজাতির দখলে নয়। মহাজ্ঞানের সেই শিখরচূড়ায় উপনীত হলে প্রকৃতি-পুরুষের ভেদাভেদ আর থাকে না!

আর এখন এই রামলগন!

রাজসরকারের বেতনভুক ভৃত্যমাত্র। তবু তার অন্তরে সঞ্চিত এক ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ! অন্যায়ের বিরুদ্ধে! অসত্যের বিরুদ্ধে! সে খুশি হবে যদি বিদ্যার্ণব তাঁর কন্যাটির ধর্মরক্ষা করতে পারেন। রামলগন আজ নিরুপায়। অন্নদাস ভীষ্মের মতো!

নৌকা ওপারে ভিড়ল।

নকুলেশ্বরকে অপেক্ষা করতে বলে বিদ্যার্ণব ব্যাসকাশীর পারে নামলেন। কন্যাকে আহ্বান করলেন, নেমে আয় মা।

বিদ্যালঙ্কার নৌকা থেকে অবতরণ করলেন। নকুলেশ্বর কোনও প্রশ্ন করল না। উদাস দৃষ্টি মেলে বসেই রইল। বিদ্যার্ণব ডানে-বাঁয়ে তাকালেন না। সোজা রওনা হলেন। বিদ্যালঙ্কার এতক্ষণ কোনও প্রশ্ন করেননি। লক্ষ্য করে দেখলেন রামলগনও তার লাঠিগাছখানা তুলে নিয়ে পিছন পিছন আসছে—শ্রুতিসীমার ভিতরেই সে। বিদ্যালঙ্কার তাই সংস্কৃতে প্রশ্ন করলেন, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণবের। বললেন, আর তো কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না, মা। এই আমার শেষ চেষ্টা। চল, তোকে বিশ্বনাথের চরণতলে ফেলে দিয়ে আসি। তারপর রাখেন তিনি, মারেন তিনি।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন হটী বিদ্যালঙ্কার! এ কী! বৃদ্ধ কি শোকের আঘাতে, আতঙ্কের তুঙ্গশীর্ষে উঠে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন? তিনি কি এখন উন্মাদ? কাশীধাম ছেড়ে নৌকায় ওপারে ব্যাসকাশীতে এসেছেন বিশ্বনাথের চরণজোড়ার সন্ধানে?

বিদ্যার্ণবের খেয়াল হয়নি অনুগামিনী থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। আপন মনে কথা বলতে বলতে তিনি বালিয়াড়ি ভাঙছেন। বিড়বিড় করে বলছেন, আমি তো সামান্য মানুষ, যাঁরা ব্রহ্মবিদ, বেদজ্ঞ মহামহোপাধ্যায়, তাঁরাও দিশেহারা হয়ে পড়লে ঐ বাবা বিশ্বনাথের চরণজোড়াই আঁকড়ে ধরেন।

হটী বিদ্যালঙ্কার ছুটে এসে পিছন থেকে ওঁর হাত দুটি ধরে ডেকে ওঠেন, বাবা?

—অ্যাঁ?

1394

—বিশ্বনাথের মন্দির তো ওপারে?

হাসলেন বৃদ্ধ। বলেন, না রে মা! আমি সেই অচল বিশ্বনাথের কথা বলছি না। তিনি তো পাষাণ!

—তা হলে? তবে কার কথা বলছেন?

—সচল বিশ্বনাথ!

দেহের সমস্ত রোমকূপে স্পন্দন জেগে ওঠে হটী বিদ্যালঙ্কারের। এ অভিধা অতি পরিচিত। কাশীবাসী কারও অন্বয় ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। নামটুকুই শোনা ছিল, স্বচক্ষে কখনো দেখেননি! সচল বিশ্বনাথ!

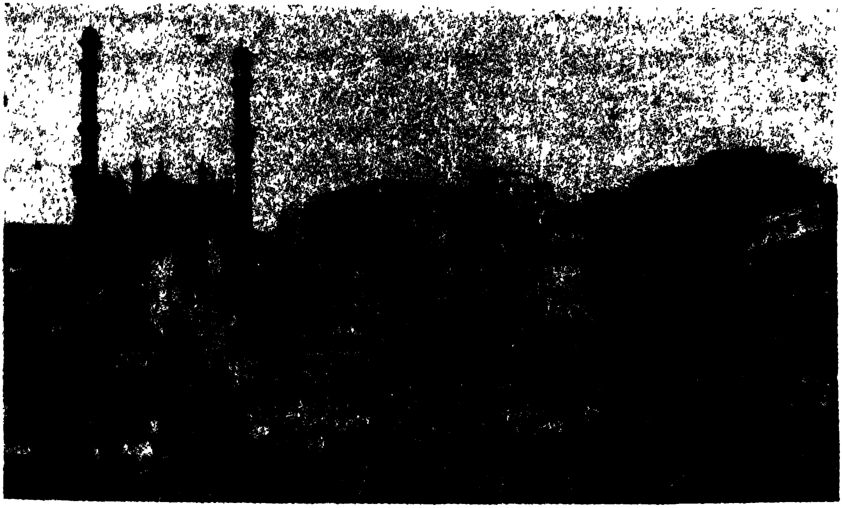

দশাশ্বমেধ-ঘাটের আলোকচিত্র — ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়পাদ

সচল বিশ্বনাথ! তাঁর দেখা পাওয়া কি সহজ?

কখন কোথায় থাকেন টেরই পাওয়া যায় না। এই শোনা গেল বাবা আছেন দশাশ্বমেধ ঘাটে। দৌড়ালো শত শত দর্শনার্থীর দল। গিয়ে শুনল, বাবা ভাসতে ভাসতে চলে গেছেন কেদারঘাটে। অসি থেকে বরুণা তিনি ক্রমাগত সাঁতার দিয়ে অতিক্রম করেন—ঘাট দিয়ে, হেঁটে নয়। তিনি যে দিগম্বর! সমস্ত রাত হয়তো আকণ্ঠ-গঙ্গাজলে নিমজ্জিত হয়ে বসে আছেন—কী শীত, কী গ্রীষ্ম। তারপর যেই গঙ্গার ঘাটে প্রথম স্নানার্থীর আবির্ভাব ঘটে অমনি বাবা সাঁতরে চলে যান ব্যাসকাশীতে। জনশ্রুতি—তিনি দাক্ষিণাত্যের সন্ন্যাসী। কাশীধামে প্রথম যখন আসেন তখনো বেণীমাধবের ধ্বজাটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুই তো হয়েছে 1707 খ্রীষ্টাব্দে। তার কত বছর পূর্বে ঐ মসজিদটা হয়েছিল তার আন্দাজ নেই বিদ্যালঙ্কারের।

প্রায় ঘন্টাখানেক বালিয়াড়ি ভাঙার পর দূর থেকে তাঁর দর্শন পাওয়া গেল। বসে আছেন

পদ্মাসনে। জনহীন প্রান্তরে, বালির উপর। চোখ দুটি নিমীলিত। ধ্যানস্থ। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। তবে ওঁর মধ্যদেশ এতই স্ফীত যে, মেদের মৈনাকে তাঁর—না, ভুল হল, তাঁর নয়, দর্শনার্থীর—লজ্জা নিবারণ হয়েছে। বিশালকায় পুরুষ। মুণ্ডিত মস্তক। দাড়ি-গোঁফের বালাই নেই।

একজন কাশীবাসী পরামানিকের কীর্তি সেটা।

জপ-তপ, পূজা-উজা সে কিছুই করে না। বিশ্বনাথ দর্শন বা গঙ্গাস্নানের প্রয়োজন নেই তার। সগর্বে বলে, 'দেখি কোন শালা যমদূত আমাকে মরার পর ছুঁতে আসে!' কারণ তার সাধনমার্গ অতি বিচিত্র। সপ্তাহে দুদিন—'বিফে ঔর এতোয়ার' সে ঝড়-ঝঞ্ঝা বজ্রপাতের বাধা মানে না। ব্যাসকাশীতে চলে আসে তার সরঞ্জাম নিয়ে। ধ্যানস্থ বাবাকে ক্ষৌরি করে দিয়ে যায়। বাবা টেরও পান না!

তবে এজন্য পরামানিককে পাড়ানির কড়ি গুণে দিতে হয় না। একজন পশ্চিমা মাঝি বিনা কড়িতে তাকে পারাপার করে দেয়। তারও বিশ্বাস মৃত্যুর পর তার অনন্ত বৈকুণ্ঠবাস ঠেকাতে পারবে না যমদূতের দল। শ্রমজলই ওদের গঙ্গোদক।

দূর থেকে দেখা গেল—কিছু কাক, গাঙ-শালিক আর শৃগাল বাবাকে ঘিরে আছে। লোকজনকে আসতে দেখে তারা স্থানত্যাগ করল। দৃষ্টিসীমার বাহিরে নয়, নিরাপদ দূরত্ব থেকে অপেক্ষা করে—কতক্ষণে এই উটকো আপদের দল বিদায় হয়।

ভক্তরা যা ফলমূল মিষ্টান্ন নিবেদন করে যায় তা পড়ে থাকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। পশুপাখি নির্দ্বিধায় তাতে উদরপূর্ণ করে যায়। ওদের দৃষ্টিতে সচল বিশ্বনাথ যে ধ্যানস্থ অচল বিশ্বনাথ। তাঁকে আর ভয় কী? বাবা বিশ্বনাথই জানেন ধ্যানভঙ্গ হলে বাবা সেই বায়স ও শিবাকুলের উচ্ছিষ্টে উদরপূর্তি করেন কিনা।

ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীকে ওঁরা তিনজনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। ততক্ষণে চৈতালী রৌদ্র চড়া হতে শুরু করছে। রামলগন মাজা থেকে খুলে গামছায় মাথাটা ঢাকল। এমন কত চৈতালী দিনে উদয়ভানু অস্তাচলে পৌঁছে দেখেছেন সমস্ত দুপুরের 'লূ'-এর ঝড়ে বাবার দেহ প্রায় ঢেকে যেতে বসেছে, কিন্তু তাঁব ধ্যানভঙ্গ হয়নি।

নিতান্ত সৌভাগ্য ওঁদের। বাবার ধ্যানভঙ্গ হল।

ঘোলাটে দুটি চোখ মেলে তিনি আগন্তুকদের দেখলেন। সবার আগে নজর পড়ল বৃদ্ধ বিদ্যার্ণবের দিকে। প্রশ্ন করলেন, ক্যা মাংতা হ্যায় রে বেটা?

'বেটা' সম্বোধন তো প্রত্যাশিত। বাবার বয়স ঐ অশীতিপর বৃদ্ধের প্রায় দ্বিগুণ!

শোনা যায়, তৈলঙ্গস্বামী জীবনের শেষ পর্যায়ে মৌনব্রত পালন করতেন। তা 'জীবনের শেষ পর্যায়' বলতে কী বোঝায়? সচল বিশ্বনাথের ক্ষেত্রে সাধাবণ গাণিতিক হিসাব অচল। কারণ, জনশ্রুতি—তিনি নাকি প্রায় আড়াই শত বৎসরকাল এই ধরাধামে লীলাময় হয়ে ছিলেন। না, 'গ্যিনেস-বুক-অব-রেকর্ডস্'-এ তথ্যটা লেখা নেই। তা সে যাই হোক, আমরা আছি 1774 খ্রীষ্টাব্দে—অর্থাৎ বাবার তিরোধান কাল থেকে একশ তেরো বছর পিছিয়ে। সে সময় তাঁর বয়স একশ সাতাশ। ত্রৈরাশিকের অঙ্ক সহজেই বলবে—বাবার তখন যৌবন শেষ হয়েছে, প্রৌঢ়ত্ব শুরু হয়নি। মোটকথা, মেনে নেওয়া যেতে পারে সেটা তাঁর জীবনের শেষ পর্যায় নয়। কাহিনীর অনুরোধে তাই ধরে নেওয়া হচ্ছে, তখন তিনি থোড়াকুছ বাৎচিৎ করে থাকেন।

বিদ্যার্ণব হিন্দিভাষাতে জিজ্ঞাসিত হয়েও প্রত্যুত্তর করলেন সংস্কৃতে—যাতে সেটা ঐ রামলগন লোকটার মাথার উপর দিয়ে যায়। বললেন, আমি কিছু চাই না, বাবা। এই মেয়েটি আমার পালিতা কন্যা। এর বড় বিপদ ....

বিদ্যার্ণবের তর্জনীসংকেতে বাবা এবার এদিকে ফিরে তাকালেন। তাঁর ঘোলাটে চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ল নতজানু ভঙ্গিতে যুক্তকরে বসে আছেন বিদ্যালঙ্কার। হয়তো প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায় পৌঁছেও, এই সওয়া শ বছর অতিক্রমণেও, তাঁর অক্ষিগোলকের সম্মুখস্থ 'লেন্স'-এ 'ক্যাটারাক্ট' দেখা দেয়নি। অন্তত তাঁর আধাবয়সী গন্ধবণিক বৃদ্ধা-গৃহিণীর অপেক্ষা তাঁর দৃষ্টি প্রখরতর। হিন্দিতেই প্রশ্ন করেন: শিউজী ঔর কালীমাঈ—কিষণজী ঔর রাধামাঈ, কোই ফারাক নহী! অ্যাঁ? সব ঝুট হ্যায়! ক্যা রে?

বিদ্যালঙ্কারের ওষ্ঠাধর থরথর করে কেঁপে উঠল। কী বলতে চাইছেন বাবা? এ কি প্রশ্ন, না তিরস্কার? নারীত্বকে তিনি অস্বীকার করেছেন বলেই কি উনি বিরক্ত? কিন্তু এসব তুচ্ছ জাগতিক অকিঞ্চনের দিকে তো ওঁর নজর পড়ে না? নিজের পোশাকের চিন্তা যার নেই সে কি অপরের পোশাক নজর করে?

তৈলঙ্গ স্বামী পুনরায় বলে ওঠেন, ক্যা মাংতা তু?

'বেটা' বা 'বেটি' সম্বোধন করেননি এবারও। কিন্তু 'মাংতি' নয়, 'মাংতা'!

এতক্ষণে বিদ্যালঙ্কারের কণ্ঠে স্বর ফুটল। বোধকরি সচেতনভাবে প্রত্যুত্তর করলেন না তিনি। অন্তরের অন্তস্তল থেকে একটা আকৃতি অজান্তেই বার হয়ে এল। সেই আদিমতমা নারীমুক্তির ধ্বজাধারিণী নিশ্চয় জানতেন না—ঐ একই প্রশ্ন শুনে একই জবাব দেবেন ভবিষ্যতে ভারত-আত্মার আর এক সিদ্ধপুরুষ—দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের গর্ভগৃহে দাঁড়িয়ে:

—ভক্তি চাই বাবা! অচলা-ভক্তি!

এতক্ষণে মৃদু হাস্যরেখা ফুটে উঠল মহাযোগীর ওষ্ঠাধরে। বললেন, দীক্ষা নিবি?

হটী বিদ্যালঙ্কারের সহসা মনে হল তাঁর নাভিকুণ্ডলী থেকে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ সুষুম্না নাড়ি বেয়ে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে পটাকাশে বিলীন হয়ে গেল!

—যা! পহিলে গঙ্গাজীমে নাহা লে।

বিদ্যালঙ্কার উঠে দাঁড়ালেন। ঘণ্টাখানেক পূর্বেই তিনি দশাশ্বমেধ-ঘাটে অবগাহন করেছেন; ব্যাসকাশীতে স্নানই হয়—গঙ্গাস্নান হয় না—এসব কথা তাঁর মনেই পড়ল না। চকিতে নজর পড়ল ওঁর শিক্ষাগুরুর দিকে। যুক্তকরে বসে আছেন তিনি; দুটি গালে বিগলিত ধারা। তাঁর বহুদিনের মনস্কামনা আজ সিদ্ধ হতে চলেছে। রূপমঞ্জরী গঙ্গার দিকে এক পদ অগ্রসর হতেই বাবা পিছন থেকে হেঁকে ওঠেন, আরে বুদ্ধু! ক্যা করতি হ্যয় রে তু? তেরা ধৌতি ঔর পিরান খোলকে রাখ পহিলে।

এবার কিন্তু 'করতা' নয় 'করতি'! চকিতে ঘুরে দাঁড়ালেন বিদ্যালঙ্কার: বাবা?

কৌতুক যেন উপচে উঠছে বাবার দুচোখ থেকে। তিনি খানদানি হিন্দিতে শুনিয়ে দিলেন এক লব্‌জ—ঈশ্বর জানেন, কে তার রচয়িতা—তুলসীদাসজী, কবীর না তুকারাম। বঙ্গানুবাদে যাঃ 'লজ্জা-ঘৃণা-ভয়/তিন থাকতে নয়।'

দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণব সম্বিত ফিরে পান। তাঁর আর্তকণ্ঠ থেকে শুধু বার হয়ে এল একটি

ধ্বনিঃ ন্—না!

বাবা ভ্রূক্ষেপ করলেন না। রূপমঞ্জরীকেই হিন্দিতে বললেন, প্রকৃতি-পুরুষ ভেদাভেদ তো তুই মানিস না। এই দেখ না আমাকে। মুক্তিকামী মানুষের আবার লজ্জা কী?

নারীর মুক্তিব্রত গ্রহণ করেছিলেন সোঞাই গ্রামের সেই আদিমতমা বিদ্রোহিণী। রাজা রামমোহন রায় তখন দুই বৎসরের শিশু! কিন্তু কী থেকে মুক্তি? শুধুই পুরুষ-শাষিত সমাজে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা? পুরুষ প্রতিযোগীর সঙ্গে সমানতালে চতুষ্পাঠী পরিচালনার অধিকার? হ্যাঁ, সেজন্যই মস্তক মুণ্ডন করেছেন, শিখা রেখেছেন, শাড়ি-বক্ষাবরণ পরিত্যাগ করে ধুতি-পিরানে লোকলজ্জার হাত থেকে আত্মরক্ষা করেছেন। কিন্তু সেটুকুই কি ছিল ওঁর চরম লক্ষ্য? কুম্ভমেলায় সহস্র সহস্র নাগা-সন্ন্যাসীর সমতলে উঠে না আসতে পারলে কেমন করে প্রতিষ্ঠিত হবে সম-অধিকারের দাবী? নাগা-সন্ন্যাসীরা তো পারেন! পুরুষ-প্রকৃতির ভেদাভেদ তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন! লোকলজ্জাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে নগ্ন শোভাযাত্রা করে এগিয়ে চলেন জনাকীর্ণ গঙ্গার ঘাটে—হর হর মহাদেও!

তাহলে তিনিই বা কেন পারবেন না?

দশাশ্বমেধ ঘাটের সেই বৃদ্ধা গন্ধবণিক না বলেছিলেন—উপপদতৎপুরুষ 'ব্রহ্মবাদিন্' শব্দের স্ত্রী-য়াম ঈপ্ 'ব্রহ্মবাদিনীর' এক্তিয়ার শুধুমাত্র ব্যাকরণের অন্দরমহলে?

মুক্তিকামীর কি লিঙ্গভেদ থাকতে পারে?

তৈলঙ্গস্বামী অন্তর্যামী! চর্মচক্ষে না দেখলেও তিনি অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে প্রণিধান করেছেন বিদ্যালঙ্কারের শেষ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব! তাই তাঁর সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন এমন একটি কঠিন পরীক্ষা!

এ পরীক্ষায় তাঁকে উত্তীর্ণ হতেই হবে!

গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। ধূ-ধূ বালির চড়া। জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই। বহুদূরে নৌকার গলুয়ে বসে আছে নকুলেশ্বর কাহার—বিন্দুবৎ। মাঝগঙ্গায় ভাসছে কিছু নৌকা। ওদের হাতে দূরবীন নেই নিশ্চয়। থাকে থাকুক! দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণব মর্মান্তিক প্রয়োজনে দুই জানুর মধ্যে মাথা গুঁজে নিথর নিস্পন্দ। তৈলঙ্গস্বামী অবশ্য তাকিয়ে আছেন। শিশুর সারল্যে মিটিমিটি হাসছেন, যেন মনে মনে বলছেন, কী? কেমন জব্দ?

হটী বিদ্যালঙ্কার তাতে ভ্রূক্ষেপ করবেন না। বাবা তাকিয়ে থাকেন তো থাকুন। সে তো ঐ শেয়ালগুলোও দূরে দাঁড়িয়ে ওঁর দিকেই তাকিয়ে আছে। উনি তো ওদের দলে! হ্যাঁ, ঐ শৃগালগুলোর সঙ্গে কোন প্রভেদ নেই তৈলঙ্গস্বামীর। নারীপুরুষ ভেদাভেদ-জ্ঞানের একপারে ঐ শিবাকুল, আর-পারে উনি। কেন নয়? ওরা সে ভেদাভেদজ্ঞানের সীমান্তে উপনীত হতে পারে না, আর উনি সে রাজ্যটা অতিক্রম করে এসেছেন—এই যা!

একমাত্র দর্শক ঐ রামলগন। বাবা কথা বলেছেন ঠেট হিন্দিতে; রামলগনের বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি। লোকটা উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠেছে। বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেছে তার ভাঙের নেশায় লাল চোখদুটো। না, কামনায় লালায়িত নয় তার অবাক চাহনি। সে চোখে শুধুই দুরন্ত বিস্ময়! হয়তো ভাবছে—যেকথা আন্দাজ করতে পারছে না রূপমঞ্জরী: তাহলে আর কী ফারাক তৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে রাজাসাহেবের? দুজনেই তো বাধ্য করছে ঐ মেয়েটিকে

প্রকাশ্যে উলঙ্গ হতে!

কিন্তু না—রূপমঞ্জরী ভাবে—একটু আগেই ঐ লোকটা বলেছিল—পণ্ডিতমাঈজীর বেইজ্জতির আশঙ্কায় সে মর্মাহত। আত্মগ্লানিতে সে নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে! গঙ্গাস্পর্শ করে স্বীকার করেছে সে-কথা। ও লোকটা কি এই কটা নির্মম মুহূর্তে পিছন ফিরে দাঁড়াবে না? চোখ দুটি বন্ধ করবে না? সাধারণ সৌজন্যবোধে? সে তো রূপমঞ্জরীকে মাতৃসম্বোধন করেছে।

না! এ প্রার্থনা নিরর্থক! হটী বিদ্যালঙ্কার ভ্রূক্ষেপ করবেন না। যদি তাকিয়ে থাকে তবু ওর চোখের সম্মুখেই তিনি নিরাবরণা হবেন। মহাযোগী ইদানীং কাউকে মন্ত্রদীক্ষা দেননি, দেন না—তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দীক্ষার প্রশ্নটা উত্থাপন করেছেন। বিদ্যালঙ্কারের এ এক জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি! এই দুর্লভপ্রাপ্তির মূল্য কড়াক্রান্তিতে মিটিয়ে দিতে হবে বইকি!

এ ওঁর গুরুদক্ষিণা!

রূপমঞ্জরী—নয় বছর বয়সে যে হতভাগিনী শুভদৃষ্টির ছাদনাতলায় তার হবু বরের দিকে অপরিসীম লজ্জায় চোখ তুলে তাকিয়ে দেখতে পারেনি—তের বছর বয়সে দ্বিরাগমনের পূর্বেই যার সিঁথির সিঁদূর মুছে গেছে—স্বামীকে বস্তুত যে কোনদিন চোখেই দেখেনি, সে শেষ সিদ্ধান্তে এল।

ঊর্ধ্বাঙ্গ থেকে পাক খুলে খুলে উত্তরীয়টি নামিয়ে রাখেন বালির উপর। পিরানের তলায় কোন অধোবাস নেই—ইদানীং পরিধান করেন না। এক এক করে বন্ধনমুক্ত কবে দিতে থাকেন পিরানের বোতাম।

রামলগন—ভাঙের নেশায় মাতাল সেই নোক্‌রির-খ্যাপলাজালে আবদ্ধ নিরক্ষর লাঠিয়াল, আত্মধিক্কারে দগ্ধ হয়ে তিক্তকণ্ঠে যে নিজের পরিচয় দিয়েছিল 'রামলগন-হারামি' বলে—সেই লোকটা আর স্থির থাকতে পারল না। আত্মবিস্মৃত হয়ে সে চিৎকার করে ওঠে, নেহী! নেহী! মাতাজী! রোখ্ যাইয়ে!

—আহ্! তুই পিছন ফিরে দাঁড়া না বাপু!

না! কথাটা শুধু ওঁর মনেব কোণে উদয় হল মাত্র। জিহ্বা উচ্চারণ করল না। শুধু রামলগনের কণ্ঠস্বরে তাঁর পুনরায় স্মরণ হল—এ কৌরবসভা দর্শকহীন নয়!

না হোক! লজ্জাহারী মধুসূদনকে স্মরণ করবেন না তিনি। শরণ নেবেন না।

'তস্মৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তম॥'

"দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের নিগ্রহরূপ তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযমরূপ দম, নিত্য ও নিষ্কাম কর্ম, ঋক প্রভৃতি বেদ, শিক্ষাশাস্ত্র প্রভৃতি বেদাঙ্গ"—সবই তো সেই পরমপ্রাপ্তির আশ্রয়!

দেহের এই লজ্জা, ইন্দ্রিয়ের এই গোপনতা, মনের এই সংশয়ই বড় হবে? ব্রহ্মবিদ্যালাভের চেয়েও বড়? পরমাত্মায় বিলীন হওয়ায় চেয়েও বড়?

একে একে পিরানের সব কটা বোতাম খুলে ফেলেন। যেন নারীদেহের গোপনীয়তার বন্ধন-মুক্তি ঘটছে। মাথার উপর দিয়ে পিরানটা খুলে ফেলার উপক্রম করতেই আকাশ কাঁপিয়ে অট্টহাস্য করে উঠলেন শিশু ভোলানাথ।

কাকের দল উঠে গেল আকাশে। শিবাকুল সচকিতে অন্তর্হিত হল কাশঝোপের আড়ালে।

থমকে গেলেন হটী বিদ্যালঙ্কার। ঊর্ধাঙ্গ নিরাবরণ করতে পারলেন না। তাকিয়ে দেখলেন

বাবার দিকে। ওঁর এই অহৈতুকী অট্টহাস্যের অর্থটা প্রণিধান করতে।

বাবা সস্নেহ তিরস্কার করেন: পাগ্‌লি কাঁহাকা!

বিদ্যালঙ্কার নির্বাক তাকিয়ে আছেন।

তৈলঙ্গস্বামী হাসতে হাসতে হিন্দিতে বললেন, জবর নাম রেখেছিল তোর বাবা—হটী! খুব বীরত্ব দেখিয়েছিস্‌! যা! ঘর লৌট যা!

বিদ্যার্ণব এতক্ষণে মুখ তুলে তাকিয়েছেন।

হটী বিদ্যালঙ্কার আকুলভাবে বলে ওঠেন, দীক্ষা দেবেন না আমাকে?

—কৈসে দুঁ? তুই তো এখনো দু-কুড়ি-সাতের খেলাটা সাঙ্গ করতে পারলি না? বেটির ঘাট পার হলে তবে তো বাপের ঘাট? না কী রে পাগলি?

—বেটির ঘাট?

—হাঁ রে বেটি! সরস্বতী মাঈকী! যা ভাগ! ঘর যা!

হটী বিদ্যালঙ্কার অধোবদন হলেন।

বিদ্যার্ণব বুঝে নিয়েছেন—মহাযোগী এতক্ষণ তাঁর আদরের কন্যাটিকে পরীক্ষা করছিলেন মাত্র। তিনি নিজেও মহামহোপাধ্যায়—সাধনমার্গের রীতিনীতি তাঁর নখদর্পণে। প্রণিধান করেন—মহাসন্ন্যাসীর মতে হটী বিদ্যালঙ্কারের মানসিক প্রস্তুতিপর্বের পর্যায়টা এখনো অতিক্রান্ত হয়নি। জমি 'তর' না হলে বীজবপন সার্থক হয় না। রূপমঞ্জরী—হটী! বিদ্রোহিণী! নিতান্ত জেদের বশে সে প্রকৃতি-পুরুষ ভেদাভেদ জ্ঞানের সীমারেখাটা অতিক্রম করতে চাইছিল। নারীত্বের সচেতনতা সে অস্বীকার করতে চাইছিল মনের জোরে! এভাবে হয় না! আরও, আরও প্রস্তুতির প্রয়োজন। বাবা প্রতিশ্রুত—নিশ্চয় সময় হলে স্বপ্নাদেশে আহ্বান জানাবেন তাঁর কন্যাকে। উপযুক্ত সময়ে তার কর্ণমূলে প্রদান করবেন: বীজমন্ত্র!

কিন্তু সেসব তো আধ্যাত্মিক জগতের কথা। তার পূর্বে যে ভৌতিক জগতের এক বিরাট অন্তরায়! সেই ক্লেদাক্ত পঙ্ককুণ্ড থেকে উত্তরণটা তো এখনো বাকি। তাই করজোড়ে নিবেদন করেন, বাবা! ওর বিপদের কথাটা তো···

বাক্যটা শেষ হল না। বজ্রনির্ঘোষে গর্জন করে ওঠেন সদাশিব: উল্লু! গিদ্‌ধর! মূর্‌খ্‌!

মহামহোপাধ্যায় নতমস্তকে স্বীকার করে নিলেন এ তিরস্কার। নীরবই রইলেন তিনি।

বাবা নিজে থেকেই বলে ওঠেন, ধুতি-পিরান পরে ও যে পুরুষ সেজেছে! ঔরৎ হয়ে তাই শাঁখ বাজানো ভুলে গেছে!

শাঁখ! শঙ্খ! তার অর্থ? এ অপ্রাসঙ্গিক কথা কেন? চকিতে মনে পড়ে গেল—হ্যাঁ, ওঁর কন্যাটির হেপাজতে একটি দুর্লভ বামাবর্ত শঙ্খ আছে বটে। সেটা সে কীভাবে পেয়েছে তা জানেন না, জানতে চাননি কোনদিন। তবে হ্যাঁ, কোনদিন সেটাকে বাজাতে শোনেননি। বাবার সে কথা জানার সম্ভাবনা নেই—অবশ্য তিনি নাকি অন্তর্যামী। হয়তো জেনেছেন। কিন্তু এ অহৈতুকী তিরস্কারের প্রাসঙ্গিকতা কোথায়?

চকিতে পাশ ফিরলেন। তাকিয়ে দেখলেন কন্যাটির দিকে। এ কী?

কার্যকারণসূত্র কিছু বোঝা গেল না। কিন্তু লক্ষ্য হল, হটি বিদ্যালঙ্কারের দুটি আয়ত চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেছে। যেন কী একটা বোধের উন্মেষ হচ্ছে তাঁর মস্তিষ্কে!

আবার তাকিয়ে দেখলেন তৈলঙ্গস্বামীর দিকে। দেখলেন, মিটিমিটি হাসছেন তিনি। সহাস্যে ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন বিদ্যালঙ্কারকে: জীবাত্মাকে বন্দী করে রাখতে নেই—মুক্ত নীলাকাশের দিকে, পরমাত্মার দিকে মিলিত হবার সাধনা তার! ক্যা রে বেটি? সমঝি?—বলেই ধ্যানস্থ। সমাধি!

সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন বিদ্যালঙ্কার বালিয়াড়ির উপর। তাঁর দু-গালে তখন দরবিগলিত ধারা।

প্রত্যাবর্তনের পথে কেউ কোন কথা বলেননি। যে-যার চিন্তায় বিভোর ছিলেন। বিদ্যার্ণব যে উদ্দেশ্যে ব্যাসকাশীতে ছুটে গিয়েছিলেন—মহাযোগীর অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে এই পার্থিব সঙ্কট থেকে উদ্ধারের পথ, তা পাননি; কিন্তু কী যেন একটা ব্যাপার ঘটেছে যা বুদ্ধি দিয়ে না বুঝলেও অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পেরেছেন। বাবার কথাগুলো যেন ছিল দ্ব্যর্থবোধক—জীবাত্মা-পরমাত্মার সদুপদেশ—তদুপরি ঐ শব্দটার উল্লেখ! কী যেন এক গূঢ় সংকেত ছিল সেই আপাত-অসঙ্গত কথার। সে ব্যাসকূট ভেদ করতে পারেননি; কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন বিদ্যালঙ্কারের চোখে-মুখে যেন অদ্ভুত একটা দীপ্তি। শুধু দীপ্তি নয়। তৃপ্তি। কেন?

তিনজন যখন গুরুকুল চতুষ্পাঠীতে ফিরে এলেন বেলা তখন দ্বিপ্রহর। আম্রকুঞ্জে রমারঞ্জন বিদ্যার্থীদের নিয়ে অধ্যাপনরত। সে এ সময় তার গুরুদেবের মত আত্ম-সমাহিত হতে পারে না। ত্রিমূর্তিকে উদ্যানের ফটক অতিক্রম করতে দেখে সে যেন ভূত দেখল!

এতক্ষণ সে মনশ্চক্ষে দেখছিল বৃদ্ধ গুরুদেব তার সহাধ্যায়িনীর হাতখানি ধরে বাদশাহী সড়ক বেয়ে এগিয়ে চলেছেন পুবমুখো। কথা ছিল ওঁরা সড়ক ধরে যাবেন না, পারতপক্ষে বাদশাহী সড়কের সমান্তরাল মেঠো পথে এগিয়ে যাবেন—পৌঁছাবেন সাসারাম। সেই যেখানে আছে বাদশাহ শের শাহ্‌র মক্‌বারা। সেখানে থেকে রোহিতাশ্ব দুর্গ এক দিনের পথ। এই তিনটি দিন যদি সংবাদটা গোপন রাখা যায় তাহলেই কার্যসিদ্ধি। রোহিতাশ্ব দুর্গে ওঁরা আশ্রয় পেলে আর ভয় নেই। শুধু দেখতে হবে এই তিনদিনের ভিতর রাজাসাহেবের অশ্বারোহী গুপ্তচর আর কোতোয়াল যেন পলাতকদের নাগাল না পায়।

কিন্তু এ কী! যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই যে ওঁরা ধরা পড়ে গেছেন! না হলে মূর্তিমান আপদের মতো রামলগন কেন ওঁদের দুজনকে নিরাপদে বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছে!

অর্গলবদ্ধ গৃহের নির্জনতায় দ্বারকেশ্বর ডাকলেন, মা! কাছে আয়। তুই কিছু বুঝতে পারলি!

রূপমঞ্জরী তার পোষা পাখিদের আহার্য বিতরণ করছিল। কাছে ঘনিয়ে এসে বললে, পেরেছি, বাবা!

—আমারও তাই মনে হল। বাবার কথার মধ্যে স্পষ্টতই কিছু একটা গূঢ় ইঙ্গিত ছিল। তাই নয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আশ্চর্য! আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনি।

—সেটাই যে স্বাভাবিক, বাবা। কাশীতে এসে আমি আমার পূর্বজীবনের কথা এ পাঁচ বছরে কাউকে যে বলিনি। আপনিও কোনদিন জানতে চাননি····

—আজ বলবি?

—বলব। কিন্তু তার পূর্বে আমার কৌতূহলটা চরিতার্থ করুন। আপনি আমাকে মন্ত্রদীক্ষা দিতে স্বীকৃত হননি। বলেছিলেন, আপনি দীক্ষিত সন্ন্যাসী নন, এটাই বাধা। ঐ সঙ্গে আরও বলেছিলেন, মনে মনে আপনি আমার মন্ত্রগুরুকে নির্বাচন করে রেখেছেন···

—না মা! নির্বাচন করার কী অধিকার আমার? উনি নিতান্ত খেয়ালী মানুষ। ইদানীং কাউকে দীক্ষা দেননি এটুকু জানি। তবে শিশু ভোলানাথ তো! আমার মনের ইচ্ছাটা নিজে থেকেই পূর্ণ করতে চাইলেন।

—কিন্তু মাঝপথে থেমেও গেলেন। আপনি কি মনে করেন সবটাই ওঁর শিশুসুলভ চপলতা?

—না, নিশ্চয় নয়। সময় হলেই তিনি তোকে স্বপ্নাদেশে আহ্বান জানাবেন। মন্ত্রদীক্ষা নিতে ডাকবেন।

—কিন্তু আজই কেন তা দিলেন না? কর্ণমূলে বীজমন্ত্র? তিনি তো নিজে থেকেই বলেছিলেন, 'গঙ্গাস্নান করে আয়।'

—সচল বিশ্বনাথের লীলা-খেলা অচল বিশ্বনাথের মতোই দুর্বোধ্য। ওঁর সব কথা, সব আচরণ আমরা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি মতে বুঝতে পারি না। তোকে তো স্পষ্টই বললেন—সারস্বত সাধনাতেই আরও অগ্রসর হতে হবে। তাই বললেন না? বাপের ঘাটে পাড়ি জমাবার আগে বেটির ঘাট পার হয়ে আয়?

বিদ্যালঙ্কার কোন কথা বললেন না। তিনি গভীরভাবে কী-যেন ভাবছেন।

—কী ভাবছিস রে মা?

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বিদ্যালঙ্কারের। বললেন আপনার কাছে কিছু স্বীকারোক্তি করার আছে, বাবা। আমি সজ্ঞানে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি।

ভ্রূকুঞ্চন হল বিদ্যার্ণবের। বললেন, পাপের স্বীকৃতি?

—পাপ? না, পাপ নয়! আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ যখন জড়িত নয়, ব্যক্তিগত ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত কর্মে পাপ কেন হবে? তবে সজ্ঞানে 'তথাকথিত' মিথ্যার আশ্রয়। আমার আশঙ্কা সেই অপরাধেই বাবা আমাকে মন্ত্র দিলেন না। আপনি আমাকে বুঝিয়ে বলুন: উদ্দেশ্য যদি 'শুভ' হয়, তাহলে অসত্যের পথে সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া অন্যায়, অপরাধ, পাপ?

দ্বারকেশ্বর প্রশান্ত হাসলেন। বললেন, প্রশ্নটাই অবৈধ মা। সত্য-শিব-সুন্দর পরস্পর সম্পৃক্ত! অসত্যের পথে 'শিব'-এ উপনীত হওয়া যায় না, অপিচ 'সত্য'-র পথ কখনো অশিবে সমাপ্ত হয় না। এ সংশয় তোর মনে কেন জাগল রে, বেটি?

—সেদিন ‘কুরুক্ষেত্র তালাও’-এর বিচার সভায় আমি সজ্ঞানে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি। আমার নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে।

—‘কুরুক্ষেত্র তালাও’-এর বিচার সভায়? কই? না! আমি তো সেখানে উপস্থিত ছিলাম। একবার মাত্র কিছু অসংযম লক্ষ্য হয়েছিল আমার, কিন্তু পরমুহূর্তেই তুই নিজেকে সংযত করেছিলি। সেই যুগাবতার শ্রীরামচন্দ্রের শম্বুক প্রসঙ্গে। সে কথাই কি বলছিস?

—সে কথাই বলছি, বাবা। কিন্তু আপনি যে অর্থে গ্রহণ করছেন সে-অর্থে নয়। ঐ মুহূর্ত থেকেই আমি মিথ্যাচারী হয়েছিলাম।

—না! অসংযত মুহূর্তে তুই বলে ফেলেছিলি—‘শম্বুক উপাখ্যানে বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের পূত চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেছেন’—কিন্তু পরমুহূর্তেই তুই নিজেকে সংশোধন করেছিলি।

—ঐ যেটাকে আপনি সংশোধন বলছেন, সেটাই আমার মিথ্যাভাষণ। উক্তিটা প্রত্যাহার করাই আমার অন্যায়, অসত্যাচরণ! আমার মূল লক্ষ্যটা ছিল শুভ—আমার মতো কোনও হতভাগিনী যদি ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হতে চায়, তাহলে সে যেন আমার মতো বাধার সম্মুখীন না হয়—এটাই ছিল আমার একমাত্র লক্ষ্য। বলুন—সেটা কি শুভপ্রচেষ্টা নয়?

বিদ্যার্ণব নতনেত্রে কী যেন চিন্তা করছিলেন। হঠাৎ প্রতিপ্রশ্ন করেন, ও কথা থাক। তার পূর্বে আমাকে বল্—ঐ কথাটা কেন বললি? শম্বুক উপাখ্যান প্রসঙ্গে। শ্রীরামচন্দ্র যদিও ঈশ্বরের অবতার তবু তিনি নরদেহধারীরূপে যখন অবতীর্ণ তখন তাঁকে দেশকালের বিধান মেনে চলতে হবে না? শ্রীচৈতন্যদেব যেভাবে যবন হরিদাসকে কোল দিয়েছিলেন সেটা ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

বিদ্যালঙ্কার বলেন, দেশকালের বিধান যে নতমস্তকে সর্বত্র মেনে চলে সে কথাসাহিত্য বা কাব্যের অন্যতম চরিত্র, মহাকাব্যের নায়কের কাছে পাঠকের প্রত্যাশা তিনি দেশকালের উর্ধ্বে উঠবেন। তা সে যাই হোক, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র মহাকাব্যের নায়িকার প্রতি যে ব্যবহার করলেন তাতে তো তিনি দেশকালের বিধান মেনেও নায়কোচিত পরিচয় রাখতে পারেননি! সেটাকে কীভাবে সমর্থন করবেন?

—কিসের কথা বলছিস্ তুই?

—সীতাদেবী মহাকাব্যের সার্থক নায়িকা। তাঁর মন্ত্র “ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা।”[১]

দশানন তার বৈভবে, পরাক্রমে, ত্রিভুবনজয়ী রাজসিক আড়ম্বরে যখন বন্দিনী সীতার হৃদয় জয় করতে চাইছে তখন পতিব্রতা অপরিসীম দার্ঢ্যে তিরস্কার করে বলছেন:

“যদন্তরং সিংহশৃগালয়োর্বনে···
যদন্তরং কাঞ্চনসীসলোহয়োঃ···
যদন্তরং বায়সবৈনতয়য়োঃ···”[২]

কতখানি মনোবল থাকলে, পাতিব্রত্যের অহঙ্কার কী পরিমাণ অভ্রংলেহী হলে, এ-কথা

---

[১] ইহজগতে বা পরলোকে সর্বদা পতিই হচ্ছে নারীর একমাত্র গতি (বা· ২/২৭/৬)।

[২] অবণ্যমধ্যে সিংহ ও শৃগালের যে পার্থক্য, সুবর্ণেব সঙ্গে সীসা-লৌহেব যে পার্থক্য, মহাগরুড়ের সঙ্গে কাকেব যে পার্থক্য তোমার সঙ্গে শ্রীবামচন্দ্রের সেটাই পার্থক্য [বা· ৩/৪৭/৪৫-৪৭]।

একটি বন্দিনী তার অপহারককে বলতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়! রাবণ ত্রিভুবন জয় করেছে, কিন্তু সীতার হৃদয় জয় করতে পারল না! সতীর দেহ স্পর্শ করতেও সাহসী হল না! এবার চিন্তা করে দেখুন, বাবা, রাবণ-নিধনের পরে সেই পাতিব্রত্যের মূর্ত প্রতীক সীতাকে প্রথম দর্শনে মহাকাব্যের নায়ক কী সম্ভাষণ করলেন—

"...ন ত্বদর্থং ময়া কৃতঃ।
প্রখ্যাতস্যাত্মবংশস্য ন্যঙ্গঞ্চ পরিমার্জতা।।"[১]

কী নিষ্ঠুর মিলন-সম্ভাষণ! কথাটা যদি সত্যই মনে হয়ে থাকে, তাহলেও দীর্ঘ বিরহের পর প্রথম সম্ভাষণেই কি তা উচ্চার্য? 'মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম' নীতি-বাক্যটাও কি জানা ছিল না শ্রীরামচন্দ্রের?

বিদ্যার্ণব ক্ষুণ্ণ হন। বলেন, প্রজানুরঞ্জন রাম যে নিরুপায় ছিলেন, মা!

—না বাবা! তা বললে মানব কেন! দীর্ঘ বিরহের পর এটা সীতা ও রামের প্রথম সাক্ষাৎ! প্রজারা তখনো কিছু বলেনি। বাল্মীকি-রামায়ণের বর্ণনায়।

—কিন্তু তিনি তো অন্তর্যামী, জানতেন এ আপত্তি উঠবেই। সীতাদেবী দীর্ঘ দিন রাবণের অবরোধে বন্দিনী ছিলেন। তাঁকে পুনরায় রাজমহিষী করা চলে না। তাতে রঘুবংশের অপবাদ। বাল্মীকি-সৃষ্ট মহানায়ক তা কীভাবে মেনে নেবেন?

—উত্তরে তিনটি কথা বলব, বাবা। প্রথম কথা: রাজসিংহাসনের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের অচ্ছেদ্যবন্ধন ছিল না, যেমন ছিল সীতার সঙ্গে। তিনি অযোধ্যার সিংহাসনলাভের মোহ ত্যাগ করতে পারলে ভরত তা সুশাসনে রাখতেন। দ্বিতীয় কথা: রঘুবংশের অপবাদের প্রশ্নটা গ্রাহ্য নয়, বাল্মীকি রচিত পরবর্তী শ্লোকে। রামচন্দ্র ধর্মপত্নীকে অনায়াসে বলতে পারলেন, "লক্ষ্মণে বাথ ভরতে কুরু বুদ্ধিং যথাসুখম।"[২] রাবণের অবরোধে বন্দিনী থাকার অপরাধে যদি সীতা বর্জনীয় হন, তাহলে ভরতকে বা লক্ষ্মণকে—যে লক্ষ্মণ দ্বাদশ বৎসরকাল সীতার চরণ ভিন্ন মুখের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি—তাদের স্কন্ধে সীতাকে অধিষ্ঠিত করতে চাইছেন কেন? তৃতীয় কথা: লোকাচার—যে যুক্তি আপনিই দেখিয়েছেন। সমকালীন লোকাচার—বশিষ্ঠর নির্দেশ—বলাৎকৃতা নারী প্রায়শ্চিত্তে শুচি হন। সে-কথা জানা ছিল বলেই রামচন্দ্র সীতাকে বলেছিলেন—লক্ষ্মণকে বিবাহ করতে! তাই শুধু শম্বুক উপাখ্যান, বা বালীবধের জন্যই নয়, রামচন্দ্রকে মহাকাব্যের উপযুক্ত নায়ক বলে স্বীকার করতে পারি না।

বিদ্যার্ণব নিরতিশয় আহত হলেন। শ্রীরামচন্দ্রকে তিনি মহাকাব্যের নায়ক রূপে চিহ্নিত করতেন না, শ্রীজয়দেবের নির্দেশে দশাবতারের অন্যতম অবতার বলেই পূজা করতেন। তবু আদরিণী কন্যার এ চপলতা ক্ষমা করে বলেন, ঠিক আছে মা, ও আলোচনা থাক বরং! বল্ 'কুরুক্ষেত্র তালাও'-এর বিচারসভায় কোন জাতের মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলি?

—যা আমি বিশ্বাস করি না, তাই বলেছি। যা বিশ্বাস করি, তা বলিনি। কারণ বিচারকমণ্ডলী তা গ্রহণ করতেন না। আমি লক্ষ্যে উপনীত হতে পারতাম না—পরাজিত হতাম!

---

[১] ভেব না, তোমাকে উদ্ধার করতে আমি এ যুদ্ধজয় করেছি। বাস্তবে নিজের বিখ্যাত বংশের কলঙ্কমোচনের জন্যই আমাকে এ যুদ্ধজয় করতে হয়েছে [রা ৬/১১৫/১৫-১৬]।

[২] লক্ষ্মণ বা ভরত যাতে তোমার সুখ হয়, তাকেই পতি হিসাবে বরণ কর [বা·৬/১১৫/২২]।

—কী তুই বিশ্বাস করিস? আর কী বিশ্বাস করিস না?

—আমি বিশ্বাস করি না সেই সব দেবনাগরী হরফে লেখা তথাকথিত শাস্ত্র-বাক্য, যা আমার বিবেক-নির্দেশের পরিপন্থী। আর বিশ্বাস করি সেই মহামানবের অন্তিম উপদেশ: আত্মদীপো ভব, আত্মশরণো ভব, অনন্যশরণো ভব[১]।

দ্বারকেশ্বর বললেন, শাক্যসিংহ শ্রীকৃষ্ণের নবম অবতার। ভগবান শঙ্করাচার্য তাঁর স্থান নির্দেশ করেছেন দশাবতার-স্তোত্রে। শ্রীজয়দেবও তা করেছেন।

—কিন্তু কবি জয়দেব ওটা খুশি মনে করেননি বাবা। না হলে 'নিন্দসি যজ্ঞবিধেঃ' লিখেই কেন আর্তনাদ করে উঠবেন: 'অহহ!'

—'অহহ' আর্তনাদ পরবর্তী পংক্তির শেষ শব্দটির উদ্দেশ্যে।[২]

—সম্ভবত তা নয়, বাবা। বৌদ্ধধর্মকে নিঃশেষিত করে, ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে আচার্য শঙ্কর গৌতম বুদ্ধকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন অন্য হেতুতে। কারণ তিনি জানতেন যে, ভারতবর্ষকে যদি আত্মদীপের আলোয় পথ চলতে দেওয়া হয় তাহলে তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

—কী পরিকল্পনা? উত্তর-মীমাংসা সম্ভূত অদ্বৈতবেদান্ত মত?

—আজ্ঞে না। তাঁর চার মঠের চার নবীন দেবতা! তাঁর দশনামী সম্প্রদায়। তাঁর একদেশদর্শী দর্শন!

—'একদেশদর্শী দর্শন'! আদি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের?

—হ্যাঁ, বাবা। তাই বলেছি আমি। আমাকে বিস্তারিত বলতে দিন। বলুন, কোথায় আমার সমীক্ষার ভ্রান্তি।

দীর্ঘ বিশ্লেষণ করলেন হটী বিদ্যালঙ্কার। এসব কথা কোনদিন বলেননি গুরুদেবকে। আজ কী-জানি-কী-করে রুদ্ধদ্বারটি উন্মোচিত হয়ে গেল। উত্তেজনায় হয়তো খেয়াল করেননি পিতৃদেবের সঙ্গে গুরুদেবের শিক্ষায় একটা মৌল পার্থক্য আছে। যা এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল। প্রকাশ হলে যে কী জাতের সর্বনাশ হবে বোধ করি তা প্রণিধান করেননি।

মগ্নচৈতন্য অবস্থায় তিনি যেন স্বগতোক্তি করে চলেছেন—আত্মদীপের আলোকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যে ক্রমাবনতি উপলব্ধি করেছেন তারই এক দীর্ঘ বিশ্লেষণ। নারীত্বের অবমানতা দেখে এককালে তাঁর পিতৃদেব, পরে তিনি নিজে, যেভাবে নিপীড়িত হয়েছেন,ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন:

উপনিষদের যুগে জ্ঞানপিপাসাই ছিল ঋষিদের একমাত্র প্রেরণা। ঐহিক বিপদ থেকে পরিত্রাণের কথা তাঁরা চিন্তা করেননি; বৈষয়িক উন্নতিবিধানে রচনা করেননি কোন মন্ত্র। তাঁদের তখন স্থিরলক্ষ্য—অন্ধকার থেকে আলোকে পদার্পণ, মৃত্যু থেকে অমৃতে উত্তরণ! বিশুদ্ধ

[১] "নিজেকে প্রদীপশিখা করে তোলো। সেই বিবেকদীপের আলোয় নিজের পথ খুঁজে নিও। অপরের শরণ নিও, না"—মৃত্যুশয্যায় শায়িত গৌতমবুদ্ধ শিষ্য আনন্দকে একথা বলেছিলেন। আনন্দ যখন প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার মহাপরিনির্বাণের পর আমরা কার কাছে যাব পথের সন্ধান জানতে?' তখন এই তাঁর শেষ বাণী।

[২] সুপরিচিত পংক্তিটি "নিন্দসি যজ্ঞবিধেবহহ শ্রুতিজাতম্/সদয়হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্।।"

জ্ঞানপিপাসাই একমাত্র লক্ষ্য—জানতে হবে সেই অবাঙ্‌মানসগোচরকে। প্রণিধান করতে হবে কোন উদ্দেশ্যে সেই 'একবর্ণা' 'বহুধা' হয়েছেন। ক্রমে উপনিষদের ঋষি উপনীত হলেন সেই সত্যে : এ শুধু অহৈতুকী আনন্দের এক উচ্ছ্বাস ! ব্রহ্মের উদ্দেশ্য-কারণত্ব হল : রসের আস্বাদন ! 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি[১]।" এই আনন্দতত্ত্বকে উপলব্ধি করে উপনিষদের ঋষি অমৃতের পুত্রগণকে সম্বোধন করে বলেছেন: "তোমরা শোন! সেই আদিত্যবর্ণের ওপারের তত্ত্ব আমি জেনেছি।" বললেন: "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।"[২]

এই নিত্যসত্য যেদিন জ্ঞানের আলোকে উপলব্ধি করলেন সেদিন উপনিষদের ঋষি প্রকৃতি-পুরুষের ভেদাভেদকে অস্বীকার করতে পেরেছিলেন। নারী সেই অমৃতময়ী যুগে নরকের দ্বার ছিল না, ছিল পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী—পরিপূরক। ব্রহ্মবাদীর পাশাপাশি ঠাঁই পেয়েছিলেন ব্রহ্মবাদিনীর দল। যাজ্ঞবল্ক্যের পাঁজর ঘেঁষে মৈত্রেয়ী !

তারপরেই এল ষড়দর্শনের যুগ।

হারিয়ে গেল উপনিষদের সেই অমৃতময়ী মন্ত্রটি—'আনন্দ'ই আছে, আর কিছু নাই ! এল নূতন চিন্তাধারা—মনুষ্যজীবন ঐকান্তিকভাবে 'দুঃখময়'। কর্মফলবন্ধনের সূত্রে আবদ্ধ মানুষ জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই দুঃখময় জীবনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত। পুরুষার্থ হল—ঐ দুঃখ থেকে উত্তরণ ! কী ভাবে ? ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সাধনমার্গে।

দ্বারকেশ্বর প্রশ্ন করেন, সেটাই কি পুরুষার্থ নয় ?

হাসলেন বিদ্যালঙ্কার। বললেন, সেটাই আমার প্রথম প্রশ্ন বাবা—ঐ শব্দটা: 'পুরুষার্থ' ! লিঙ্গে কিছু ভুল হল না কি ? মৈত্রেয়ী, গার্গী, লীলাবতী, মদালসার লক্ষ্য কী ছিল ? পুরুষার্থ না 'প্রকৃত্যর্থ' ? ঐ শেষোক্ত শব্দটার স্বীকৃতি ব্রাহ্মণ্য দর্শনে নাই ! শব্দটা অজ্ঞাত ! কিন্তু 'পুরুষার্থের' পরিবর্তে ষড়দর্শন কি 'মনুষ্যর্থ' শব্দটা ব্যবহার করতে পারত না ? না, সেই ষড়দর্শনের যুগ থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এসে গেল পুরুষের কব্জায় ! এর পর 'পুরাণ' আর 'সংহিতার' যুগ। আরও কোণঠাসা হয়ে গেল নারীজাতি। ষড়দর্শনের যুগে নারী-পুরুষের ভেদাভেদটা তত প্রকট নয়। তখন শুধু তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব। সাংখ্য আর যোগদর্শন প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বের উদ্গাতা। তাতে নারীকে নরকের দ্বার বলা হয়নি। ন্যায় ও বৈশেষিকের অন্য জাতের চিন্তা : কেন বলা হল ব্যক্তি-আত্মা আর জড়-জগৎ উভয়েই মৌলিক সত্তা। পূর্ব-মীমাংসা বৈদিক কর্মকাণ্ডের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি। উত্তর-মীমাংসা জন্ম দিল এমন এক মতবাদ যা সাধারণ নরনারীর নাগালের বাহিরে: অদ্বৈতবেদান্ত দর্শন !

কিন্তু ঠিক তার পরের ধাপে এসে উপনীত হলেন ষড়দর্শনের ভাষ্যকারের দল। উপনিষদ বলেছিলেন: সৃষ্টির মূলে আছে: 'আনন্দ' ! ষড়দর্শন বলেছিলেন, না! সৃষ্টির মূলে আছে কর্মফলবন্ধনের 'দুঃখ'। এ সব তাত্ত্বিক কচকচি। হিন্দু ভারতের সমাজে এর কোন প্রভাব পড়েনি। কিন্তু এবার যাঁরা এসে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির হাল ধরলেন, তাঁরা তাত্ত্বিক কচকচিতেই তাঁদের কর্মকাণ্ড সীমিত করলেন না। দিতে শুরু করলেন সামাজিক বিধান: কর্তব্য আর

[১] রসেই তিনি আছেন। 'রস'-এই তিনি আনন্দ লাভ করেন।

[২] আনন্দর উৎসমুখে এই জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি।

অকর্তব্যের তালিকা। স্বর্গ লাভের সরল প্রকরণ আর নরকবাসের শাস্তি। যদিচ 'নরক' শব্দটা বা ঐ ধারণাটা বেদ-এ কুত্রাপি নাই! এল নানান 'পুরাণ' আর 'সংহিতা'। এই চিন্তাধারার প্রভূত প্রভাব পড়ল সাধারণ নরনারীর উপর। শুরু হল, দ্বিসহস্রবর্ষব্যাপী ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের অবক্ষয়।

স্থির হল—ধর্ম শুধুমাত্র থাকবে পুরুষের কব্জায়।

—নারীর নয়—নারী হচ্ছে: নরকের দ্বার!

আশ্চর্য! পরম আশ্চর্য! এই আকাশজোড়া মিথ্যাটাকে সমগ্র ভারতবর্ষ বিনা প্রতিবাদে মেনে নিল! এমনকি, স্বয়ং আদি শঙ্করাচার্য! তাতেই তাঁকে বলেছি একদেশদর্শী!

দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণব ইন্দ্রিয়সংযমে অভ্যস্ত। তবু তাঁর নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হয়ে উঠল। বললেন, শব্দটা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করলে বিদ্যালঙ্কার—কিন্তু কোন উদাহরণ দিয়ে তা প্রতিষ্ঠা করনি এখনো।

মা নয়, বিদ্যালঙ্কার! সেটা খেয়াল করেছেন কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু প্রত্যুত্তরের সময় তাঁর সম্বোধনটাও পরিবর্তিত হয়ে গেল। বললেন, গুরুদেব! আচার্য শঙ্কর সারাজীবন শুধু পুরুষকেই নির্দেশ দিয়ে গেছেন। গৃহী পুরুষ, সন্ন্যাসী পুরুষ। হেতু?

নারী হচ্ছে নরকের দ্বার!

'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ'-র পরিপূরক 'কা তব ভর্তা'র কথা বলতে তাই তিনি ভুলেছেন। ভর্তাই যে নারীর শেষ 'মোক্ষ'! তাই তাঁর অনুশাসনে নারী হয় উপেক্ষিত, নয় নিগৃহীত! জ্যোষীমঠ-সংক্রান্ত তাঁর 'মঠানুশাসন অনুজ্ঞা'য় লক্ষ্য করে দেখুন, গুরুদেব, তিনি ভবিষ্যৎ শঙ্করাচার্যদের—তাঁর চারধামের মঠাধীশদের বলেছেন 'শুচিতাযুক্ত, জিতেন্দ্রিয়, বেদ-বেদাঙ্গাদি শাস্ত্র বিশারদ' হতে হবে। বেশ কথা! কিন্তু তাঁরা এ ধরাধামে আবির্ভূত হবেন কোন অলৌকিক প্রক্রিয়ায়? তা তো বলে গেলেন না? ঐ ভবিষ্যৎ-শঙ্করাচার্যের পিতৃদেবেরা যদি 'নরকের' দ্বারস্থ না হয়—যে 'নরক' শব্দটাই বেদ-এ অনুক্ত—তাহলে কীভাবে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হবে তাঁর চতুর্ধামের ধর্মপ্রচারের আয়োজন? আপনি আমাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিন গুরুদেব—কোথায় আমার ভ্রান্তি। এটা কি একদেশদর্শিতা নয়?

দ্বারকেশ্বর নিরুত্তর। মেদিনীনিবদ্ধদৃষ্টিতে চিন্তামগ্ন।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে হটী বিদ্যালঙ্কার বলে ওঠেন, অথচ আপনারা বলেন—আদি শঙ্করাচার্য পূর্ণ ভগবান! গৌতম বুদ্ধ নবম অবতারমাত্র! তুলনা করে দেখুন—শাক্যসিংহ পরমপুরুষ, কিন্তু প্রকৃতির ঋণ তিনি কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করে দিয়ে এসেছেন রাহুলমাতার মাতৃত্বধর্মকে সার্থক করে ! তাঁর সন্ন্যাসজীবনও ছিল স্ত্রী-সংসর্গবর্জিত। কিন্তু তার হেতু এ নয় যে, নারী নরকের দ্বার! তিনি জিতেন্দ্রিয়, কিন্তু 'ন চ পশ্যেৎ মুখং স্ত্রীণাং ন তিষ্ঠেৎ তৎসমীপতঃ'—নারীত্বের অবমাননাকর এই নির্দেশ তিনি মানতেন না। সন্ন্যাস জীবনে তিনি তাঁর গর্ভধারিণী জননীর সঙ্গে মুখোমুখি বসে সদ্ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন, প্রিয়শিষ্য 'যশ'-এর সহধর্মিণীকে ধর্মোপদেশ দিয়েছেন। কী অপরিসীম মহিমা তাঁর! বৈশালীরাজ ও নগর শ্রেষ্ঠীদের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে বারবনিতা আম্রপালীকে বলেছেন, 'তোমার সর্বতোভদ্রে একরাত্রের জন্য আমায় আশ্রয় দেবে, মা?' আম্রপালীর পতিতালয়ে নির্দ্বিধায় রাত্রিবাস করেছেন মহাকারুণিক। শেষ জীবনে সন্ন্যাসিনীদের পৃথক সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠার অনুমতিও দিয়েছিলেন। তাই 'থেরগাথার'

পাশাপাশি রচিত হয়েছে 'থেরীগাথা'! যার উদাহরণ, ব্যতিক্রম হিসাবেও, নেই দ্বিসহস্রবৎসরব্যাপী এই ব্রাহ্মণ্য-ধর্মে! বলুন, গুরুদেব, বৌদ্ধধর্মের এই সমদর্শনের অনুরূপ কোন কিছু কি আছে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুরাণে আর সংহিতায়?

অষ্টাদশ পুরাণের ভিতর একমাত্র মার্কণ্ডেয় পুরাণে পেয়েছি মদালসার কাহিনী—মদালসা অলর্কের উপাখ্যান। আর কোনও ব্রহ্মবাদিনীর সন্ধান পাইনি। সর্বত্র নারীর ধর্ম: স্বামীর চরণ সেবা, সন্তানের উৎপাদন! সংহিতাগুলিতে আরও অবক্ষয়ী চিন্তাধারা—বিষ্ণু সংহিতার ভার্যানিরূপণ, স্ত্রীধর্ম, দশবিধ সংস্কার নারীর পক্ষে অবমাননাকর। গার্গী-মৈত্রেয়ীর কোন উত্তরসূরিণী পুরাণ বা সংহিতা রচনা করেননি। পুরুষেরাই শুধু লিখে গেছেন, —'ভর্তানিরূপণ, পুরুষধর্ম'-এর বিবরণ! পরাশর সংহিতা 'অগম্যাগমন'-এর প্রায়শ্চিত্ত-বিধান বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন—কামের বশবর্তী হয়ে নিষিদ্ধ সম্পর্কের নারীতে উপগত হলে কী কী প্রায়শ্চিত্ত! আশ্চর্য! পরাশর ঋষির একবারও মনে পড়ল না—সেই হতভাগিনীটার কথা! যে ঐ পুরুষের পাশববৃত্তির শিকার হয়েছে। সেই ধর্ষিতা নারী কী ভাবে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা পাবে সে-কথা লিপিবদ্ধ করতে তিনি বেমালুম ভুলে গেছেন! শ্রীমদ্ভগবৎগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বললেন, শোন অর্জুন! 'স্ত্রীষু দুষ্টাষু' হলে 'বর্ণসঙ্কর' জন্মগ্রহণ করে। শুনে অর্জুন বললেন, 'বটেই তো!' তাঁর মনে এ প্রশ্ন আদৌ জাগ্রত হল না যে, এক লক্ষ দুষ্টা স্ত্রীলোককে এক কল্পকাল ঐ জরাসন্ধের কারাগারে বন্দী করে রাখলেও তারা সম্মিলিতভাবে একটি মাত্রও 'বর্ণসঙ্কর'কে জন্ম দিতে সক্ষমা হবে না! এ প্রশ্ন কেন জাগল না অর্জুনের মনে? কারণ তিনি ঐ একদেশদর্শী ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের চিন্তাধারায় অন্ধ। মানতে রাজি নন যে, পাপ একা নারী করতে পারে না—তার অধিকার শুধু অর্ধেক পাপের। বাকিটা পুরুষের! গুরুদেব! আমার মনে হয়েছে—এই একদেশদর্শিতার ফলেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এই অবক্ষয়ীরূপ! হিন্দু ভারত বারে বারে পদানত হয়েছে যবনের, মুসলমানের। অথচ এসব কথা সেদিন আমি বলিনি—সেই কুরুক্ষেত্র তালাও এর বিচার সভায়। শ্রীরামচন্দ্রের শম্বুকবধ উপাখ্যান উত্থাপন করেই সংযত হয়েছিলাম! বলিনি এজন্য যে, আমার বিচারকেরা এই সত্য প্রণিধান করতে পারতেন না। তাঁরা যা বোঝেন, যা মানেন, সেইসব পুরাণ আর সংহিতা থেকে ক্রমাগত উদ্ধৃতি শুনিয়ে গেছি। আমি অসত্যের পথে জয়লাভ করেছি।

দীর্ঘ বিশ্লেষণ করে হটী বিদ্যালঙ্কার নীরব হলেন। ক্ষুব্ধ দ্বারকেশ্বর বলে ওঠেন, তাহলে তুমি কেন তৈলঙ্গস্বামীর কাছে দীক্ষা নেবার জন্য অত উদগ্রীব হয়েছিলে? নাথপন্থী বৌদ্ধ গুরুর তো অভাব নেই?

—একই হেতুতে গুরুদেব! পুরাণ আর সংহিতা-প্রণেতার দল যেভাবে উপনিষদের মহাসত্যকে হত্যা করেছেন, ঠিক সেভাবেই গৌতম বুদ্ধের বিনয়পিটক আজ কলুষিত হয়েছে তাঁর অধস্তন শিষ্য-শিষ্যাদের দ্বারা। কী প্রভেদ আজ এই পঞ্চ-মকার আশ্রয়ী শক্তি-উপাসকদের সঙ্গে ঐ বজ্রযানী বৌদ্ধ-তান্ত্রিকের ব্যভিচারের? সর্বত্রই তো ধর্মের নামে ইন্দ্রিয়জ কামনাবাসনার তির্যক তৃপ্তির আয়োজন! বিবেকের নির্দেশে কেউ চলে না। ব্রাহ্মণ্যধর্ম যেমন অযৌক্তিকভাবে বিশ্বাস করে—বেদ অপৌরুষেয়, অভ্রান্ত···

জ্যামুক্ত ধনুকের মতো আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন মহামহোপাধ্যায় দ্বারকেশ্বর

1554

বিদ্যার্ণব। আর সংযমের আড়াল রইল না। বলেন, কী? কী বললে?

হটী বিদ্যালঙ্কারও দাঁড়িয়ে পড়েছেন। যুক্তকরে মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে তিনি নিস্পন্দ।

উদ্‌গীরণোন্মুখ আগ্নেয়গিরির মতো বৃদ্ধের সারা দেহ তখন থরথর করে কাঁপছে। বলেন, এতদূর তোমার ঔদ্ধত্য! চতুর্বেদের অপৌরুষেয়তা, অভ্রান্ততা বিষয়ে তোমার অন্তরে সংশয় জেগেছে?

এবারেও প্রত্যুত্তর করলেন না। নিবাতনিষ্কম্প দীপ-শিখার মতো যুক্তকরে মুদিত নেত্রে শাস্তির জন্য প্রতীক্ষা করছেন বিদ্যালঙ্কার।

—নীরব থেক না বিদ্যালঙ্কার! প্রশ্নের জবাব দাও!

শান্ত ধীর কণ্ঠে এবার বলেন, চতুর্বেদের মূল্যায়নও তো করতে হবে আত্মদীপের আলোকে···

—ব্যস্‌! থাক! আর কোন কথা নয়!

দুরন্ত ক্রোধে পরমুহূর্তেই কক্ষত্যাগ করে গেলেন। নিজের একান্ত সাধনকক্ষে প্রবেশ করে ভিতর থেকে অর্গলবদ্ধ করে দিলেন দ্বার। সমস্ত দিন বার হলেন না কক্ষ থেকে। উপবাসে অতিবাহিত হল একটি বেদনাদায়ক বিচ্ছেদের দিন। না গুরু, না শিষ্যা কেউই পরস্পরের দিকে এগিয়ে এলেন না।

এতবড় আঘাত দ্বারকেশ্বর তাঁর দীর্ঘজীবনে কখনো পাননি। পথের প্রান্তে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন শেষজীবনের একটি অবলম্বন। কন্যা-স্নেহে তাকে মানুষ করে তুলছিলেন। অধীত বিদ্যা তিল-তিল করে দান করে যাচ্ছিলেন ঐ প্রিয় শিষ্যাকে। আশা ছিল—এই সাত-পুরুষের গুরুকুল চতুষ্পাঠীর মর্যাদা সে রক্ষা করবে! হল না! কিছুই হল না! রূপমঞ্জরীর পূর্ব জীবন-কথাটাও শোনা হল না! কোন কৌতূহলই নেই আর! শেষ জীবনে এ কী জড়ভরত হয়ে পড়ছিলেন তিনি! স্নেহের বন্ধনে ইষ্ট-চিন্তাও যেন ব্যাহত হচ্ছিল ইদানীং। অন্তরে পেয়েছেন সুদূরের আহ্বান! রাত্রি প্রভাতেই সব কিছু ছেড়েছুড়ে তিনি যাত্রা করবেন!

বেদের অপৌরুষেয়তা···! না! আর চিন্তা করতে পারছেন না!

মা মা ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং!

পর দিন সকালে দেখা করতে এল রমারঞ্জন। নিবেদন করল একটি বেদনাদায়ক সংবাদ। যা রুদ্ধদ্বারকক্ষ থেকে রূপমঞ্জরী টের পায়নি।

গুরুদেব শেষরাত্রে একাকী একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করেছেন। উদ্দেশ্য: হরিদ্বারে অমৃত-কুম্ভযোগে স্নান। আগামী বৈশাখে, মেষরাশিস্থে ভাস্করে গঙ্গাদ্বারে পূর্ণকুম্ভযোগ:

"পদ্মিনীনায়কে মেষে কুম্ভরাশিগতে গুরৌ।
গঙ্গাদ্বারে ভবেৎ যোগঃ কুম্ভনামা তদোত্তমঃ॥"

সূর্য যখন বিষুবসংক্রান্তিতে, আর দেব-পুরোহিত বৃহস্পতি 'ঘট'-এ, অর্থাৎ কুম্ভরাশিতে,

তখনই হরিদ্বারে এই অমৃতকুম্ভযোগ।

বোধকরি প্রিয়শিষ্যার কণ্ঠে উচ্চারিত ঐ ঘৃণিত বাক্যটি শ্রবণের পাপ—যা নাকি গোহত্যা-ব্রহ্মহত্যার সমতুল্য—তা থেকে স্খালনের এ ছাড়া গত্যন্তর নাই!

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বিদ্যালঙ্কারের। হাত দুটি জোড় করে উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন।

এই ভাল হল! এই ভাল হল!

অপাপবিদ্ধ ঐ মহাজ্ঞানীটি মুক্তি পেয়েছেন। এক পক্ষকালের মধ্যেই অনিবার্যভাবে নেমে আসবে প্রলয়। এই পবিত্র গুরুকুল-মহাবিদ্যালয়ের একটি বিদ্যার্থীকে ওরা ছিনিয়ে নিয়ে যাবে; পৈশাচিক উল্লাসে এ আশ্রমের উপর নিক্ষেপ করবে পূতিগন্ধময় ক্লেদাক্ত পুরীষ! উপায় নেই! সে মহামৃত্যু সহ্য করতে হবে হটী বিদ্যালঙ্কারকে! কাশীধামের সমগ্র পণ্ডিত সমাজ নতমস্তকে সহ্য করতে বাধ্য হবে এই নারকীয় অত্যাচার!

ঈশ্বর করুণাময়! তখন দ্বারকেশ্বর গঙ্গাদ্বারে অমৃতকুম্ভযোগে স্নানরত।

রমারঞ্জন ইতস্তত করল না। জানতে চাইল, দিদি! এ কথা কি সত্য যে, আপনি গুরুদেবকে বলেছেন বেদের অভ্রান্ততা বিষয়ে আপনার সংশয় আছে?

বিদ্যালঙ্কার ম্লান হেসে জবাবে বললেন, না ভাই, সে-কথা আমি বলিনি। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম—বৈদিক অনুশাসনেব যে রূপ আমরা আজ দেখতে পাই তার অভ্রান্ততা নিজ-নিজ বিবেকের কষ্টিপাথরে যাচাই কবে নিতে হবে।

—কেন? এ সংশয় কেন জাগল আপনাব অন্তরে? বেদ যে অভ্রান্ত—এ তো স্বতঃসিদ্ধ!

—জবাব দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে আমার একটি প্রতিপ্রশ্নের জবাব দাও তো ভাই—তোমার- আমার গুরুদেব সজ্ঞানে মিথ্যাভাষণ করেন না, এটা তোমার কাছে একটা স্বতঃসিদ্ধান্ত?

—নিশ্চয়! তিনি কখনো অনৃতভাষণ করেন না। কিন্তু সে-কথা কেন?

—এবার আমাকে বুঝিয়ে বল দেখি, তা সত্ত্বেও তুমি কেন আমার কাছে ঐ প্রশ্নটা করলে?

রমারঞ্জন এত দুঃখেও হেসে ফেলে। বলে, দুটি স্বতঃসিদ্ধান্তের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল যে, দিদি! আপনি বেদের অভ্রান্ততা বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন—এই তথ্যটাও যে মেনে নিতে পারছিলাম না।

—তবেই দেখ! প্রতিমুহূর্তে আমরা আমাদের পূর্বকৃত ধ্যানধারণার সত্যতা যাচাই করতে চাই। নিজের বুদ্ধি-বিবেচনায় বিচার করে দেখতে চাই। তারপর বিবেকের নির্দেশে সিদ্ধান্তে আসি। ধর্মের পথ যে 'ক্ষুরস্য ধারা'! আত্মদীপের আলোক ব্যতিরেকে প্রতিটি পদক্ষেপে পদচ্যুতির আশঙ্কা। তুমি যে প্রশ্নটা করেছ তারও ঐ একই উত্তর। ভেবে দেখ, বেদ-এর মন্ত্রগুলি আমরা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির কণ্ঠে উচ্চারিত হতে শুনিনি। তার যে লিখিত রূপ দেখছি তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছে অযুত-নিযুত অনুকারকের হস্তাক্ষর। তাঁরা মহাপণ্ডিত, কিন্তু অপৌরুষেয় নন, তাঁরা নরমানব। অনুকরণের সময় তালপাতার পুঁথিতে ভুলভ্রান্তি এসে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত অনেক বৈদিক শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। পরবর্তীকালের

ভাষ্যকারেরা—এমনকি আদি শঙ্করাচার্য তার যে অর্থ বলেছেন তা স্বীকার করার পূর্বে যাচাই করতে হবে না? ধর একটা বাঙলা শব্দ: 'অপর্যাপ্ত'। বৈয়াকরণিক হয়তো বললেন তার অর্থ 'যা পর্যাপ্ত নয়'! অথচ ঠিক বিপরীত অর্থবোধকভাবে কি শব্দটির প্রয়োগ হয় না? অর্থাৎ যা 'পর্যাপ্তের অতিরিক্ত'! কোন অর্থটা গ্রহণ করব? কে বলবে? তোমার-আমার বিবেক ভিন্ন? 'বেদ অভ্রান্ত' কি না এই প্রশ্নের সঙ্গে যে ঐ প্রশ্নটিও সম্পৃক্ত—বেদ-এর কোন্ পাঠ, কোন্ ব্যাখ্যা, কোন্ ভাষ্য?

রমারঞ্জন সক্ষেদে বললে, গুরুদেব বোধহয় এসব কথা আপনার সঙ্গে আলোচনাই করেননি, তাই নয়?

—হ্যাঁ, তাই। আমরা সচরাচর সংস্কারের দ্বারা পরিচালিত হই। আমার মুখে ঐ কথাটা শ্রবণমাত্র তিনি এতদূর মর্মাহত হয়ে পড়লেন যে, তীর্থযাত্রার পূর্বে আমার প্রণামটাও নিয়ে গেলেন না। দুর্ভাগ্য আমার!

রমারঞ্জন প্রশ্ন করে, আপনি কি গুরুদেবকে এ-কথাও বলেছিলেন যে, হিন্দুধর্মে নারীর মর্যাদা স্বীকৃত হয়নি?

আবার হাসলেন বিদ্যালঙ্কার। বললেন, এই দেখ, কীভাবে শ্রুতিনির্ভর তথ্য বিকৃত হয়ে যায়! একটি রাত মাত্র কেটেছে, অথচ এর ভিতরেই আমার বক্তব্যটা বিকৃত হয়ে গেছে! আমি ওকথা আদৌ বলিনি। বলেছি, উপনিষদ্-উত্তর পুরাণ ও সংহিতার যুগ থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্মে নারীর মর্যাদা ক্রমঅবক্ষয়ের পথে চলেছে। গৌতম বুদ্ধ—যিনি হিন্দুধর্মের একজন মহাপুরুষ, ব্রাহ্মণ্যধর্মের নয়—তিনি কীভাবে বারবনিতা মাতা আম্রপালীর মর্যাদা মিটিয়ে দিয়েছিলেন সে-কথাও আমি সবিস্তারে বলেছিলাম।

—কিন্তু আপনার কি মনে পড়ে না মহাভারতের সেই খণ্ড-কাহিনীটি? গৃহস্থবধূর কাছে একজন তত্ত্বজ্ঞানী সন্ন্যাসীর অপদস্থ হওয়ার কথা?

—নারীর কাছে পুরুষের পরাজয়? কোন খণ্ডকাহিনীটির উল্লেখ করছ তুমি?

রমারঞ্জন কাহিনীটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে থাকে। একটু পরেই সে-কথা স্মরণ হল হটী বিদ্যালঙ্কারের। কিন্তু তিনি রমারঞ্জনের উচ্ছ্বাসকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন না। মহাভারতের সেই খণ্ড–কাহিনীটি এই রকম:

একজন সন্ন্যাসী দীর্ঘদিন এক নির্জন অরণ্যে তপস্যায় নিরত ছিলেন। তারপর একদিন একটি ক্রৌঞ্চবকের উপদ্রবে হঠাৎ তাঁর ধ্যানভঙ্গ হল। ওঁর মাথার উপর দিয়ে উড়বার সময় পাখিটি পুরীষত্যাগ করে এবং ঘটনাচক্রে তা পতিত হয় ধ্যানরত সন্ন্যাসীর মস্তকে। সন্ন্যাসী ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ঊর্ধ্বে দৃকপাত করা-মাত্র পাখিটি ভস্ম হয়ে গেল। সন্ন্যাসী প্রণিধান করলেন—তিনি অলৌকিক বিভূতি লাভ করেছেন। অর্থাৎ কেউ তাঁর বিরক্তি উৎপাদন করলে দৃকপাতে তাকে ভস্ম করে দেবার ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন! ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে এক গৃহস্থ বাড়িতে যখন তিনি ভিক্ষা চেয়েছেন তখন গৃহস্বামিনীর আসতে কিছু দেরী হয়েছিল। ক্ষুব্ধ সন্ন্যাসী সেই মহিলাটিকে বললেন, কী এমন রাজকার্য করছিলে যে, সন্ন্যাসীকে রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে অপেক্ষা করতে হয়?

গৃহিণী শান্তস্বরে বললেন, রাজকার্য নয়, বাবা, আমি স্বামী-পুত্রকে আহার্য পরিবেশন

করছিলাম।

সন্ন্যাসী বলেন, এতদূর স্পর্ধা তোমার! অভুক্ত সন্ন্যাসীর চেয়ে স্বামীপুত্রই বড় হল?

গৃহস্থ বধূটি শান্তস্বরে জবাব দিলেন, সন্ন্যাসীঠাকুর! আপনি আমার দিকে ওভাবে তাকাবেন না। আমি ক্রৌঞ্চবক নই! ভিক্ষা গ্রহণ করে নিজ পথে গমন করুন। আমার সংসারের অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে।

কাহিনীটি জানা ছিল। তবু ধৈর্য ধরে সবটা শুনলেন। তারপর বললেন, এই খণ্ডকাহিনীটি কিন্তু আমার যুক্তিকেই প্রতিষ্ঠা করছে। অর্থাৎ মহিলাটির মুক্তি—স্বামীপুত্রের সেবার মাধ্যমেই। সে যেন ঐ বেয়াড়া প্রশ্নটা পেশ না করে বসে: 'যেনাহম্ নামৃতাস্যাম তেনাহম্ কিম কুর্যাম?' কিন্তু ওটি তো খণ্ডকাহিনীমাত্র—মহাভারতের মূল কাহিনী অনুসারে নারী তার ভর্তার অস্থাবর সম্পত্তিমাত্র। স্বামী তাকে পণ রেখে পাশা খেলতে পারেন; পরাস্ত হলে সেই কুলনারীকে সর্বসমক্ষে বিবস্ত্রা করায় কোন ধর্মীয় আপত্তি নেই! শুধু মহাভারত নয় রমা—সর্বত্র দেখতে পাবে নারীর পৃথক সত্তা, তার আত্মমর্যাদা উপেক্ষিত। সে পুরুষের খেলার পুতুলমাত্র! ধর বৈষ্ণব ভক্তমাল গ্রন্থ বিল্বমঙ্গল। কাহিনীব নায়ক নদীতটে অহল্যা নাম্নী একটি রূপবতী পুরললনাকে দেখে মুগ্ধ হলেন। স্নানান্তে ঐ মহিলা যখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করছেন তখন দেখা গেল কাহিনীর নায়ক তাকে অনুসরণ করছেন। তিনি দেখলেন সেই সধবা মহিলাটি একজন বণিকের ধর্মপত্নী। কাহিনী অনুসারে ঐ ঘটনার পূর্বেই নায়ক বিল্বমঙ্গল সোমগিরির নিকট দীক্ষা নিয়েছেন। সেই দীক্ষিত নায়ক বণিকগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করলেন এবং বণিক পত্নীকে একরাত্রের জন্য প্রার্থনা করলেন। কিমাশ্চর্যমতঃপরম! স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যের চেয়ে বড় হয়ে উঠল কামুক অতিথির প্রতি অতিথি-বৎসলতা! তিনি সে রাত্রে স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন বিল্বমঙ্গলের শয়নকক্ষে! বিচার করে দেখ রমা, কাহিনীকাবেব একমাত্র উদ্দেশ্য ভক্তির সঞ্চার করা—'বিল্বমঙ্গল' একান্ত ভাবে ভক্তিমূলক গ্রন্থ! অথচ কেউ কখনো সেই অহল্যা নামের মেয়েটির দৃষ্টিকোণ থেকে এ ঘটনাটা যাচাই করল না! রাত্রিপ্রভাতে ধর্ষিতা সতীসাধ্বী কী করেছিল? সে যদি আত্মঘাতিনী না হয়ে থাকে তাহলে দ্বিচারিণী হওয়ার অপরাধে বণিক কি তাকে ত্যাগ করেছিল? কাহিনীকার সে কথা বলতে ভুলেছেন! হিন্দুশাস্ত্রে—পুরাণে-সংহিতায়-কাব্যে ক্রমাগত এই একই দৃষ্টিভঙ্গি—পুনরুক্তি দোষে ক্লান্তিকর! পরশুরাম পিতৃআজ্ঞায় নির্দ্বিধায় কুঠারাঘাতে জননীর শিরশ্ছেদ করলেন! কী যুক্তি? তাঁব মাতা তো পিতার অস্থাবর সম্পত্তিমাত্র! এবং সেই পরশুরাম আমাদের দশাবতারের একজন। লক্ষহীরা ব্যাধিগ্রস্ত স্বামীকে পিঠে করে বারবনিতার গৃহে পৌছে দিচ্ছে—কেন?[১] সেটাই যে তার সতীত্ব ধর্মের পরিচয়! কেন 'অগ্নিপরীক্ষা' দিতে হল সীতাকে? যদি তিনি রাবণকর্তৃক ধর্ষিতা হয়ে থাকেন, তাহলে সেটা কি তাঁর অপরাধ? আদিকবি সে প্রশ্ন আদৌ উত্থাপন করেননি। বরং দেখিয়েছেন, সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরেও শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বর্জন

---

[১] তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে রবিঠাকুরের কলম ধার করে মৃণাল তার স্বামীকে এই প্রসঙ্গে লিখেছিল "কুষ্ঠরোগীকে কোলে করে তার স্ত্রী বেশ্যার বাড়িতে নিজে পৌছে দিয়েছে, সতীসাধ্বীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল, জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার করে আসতে তোমাদের পুরুষেব মনে আজ পর্যন্ত একটুও সংকোচ বোধ হয়নি।" (স্ত্রীর পত্র)

করছেন। কেন? না, তিনি প্রজানুরঞ্জন। শ্রীরামচন্দ্রের একবারও মনে হল না রাজা-প্রজার বন্ধনটা অচ্ছেদ্য নয়, স্বামীস্ত্রীর মতো। রাজ্য ত্যাগ করলে ভরত বা লক্ষ্মণ প্রজাদের দায়িত্ব নিতে পারত—কিন্তু সীতার একমাত্র আশ্রয় দ্বিধাবিভক্ত ধরণী।

না রমারঞ্জন—আমার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত: নারীজাতির প্রতি এই অশ্রদ্ধা, অপমানই হিন্দু-সমাজের, হিন্দুসংস্কৃতির এই অধঃপতনের হেতু। বারে বারে তাই সে পদানত হয়েছে বহিরাগত বিধর্মীদের কাছে।

রমারঞ্জন এ অভিযোগের জবাব খুঁজে পায়নি।

সেরাত্রে বড় অদ্ভুত একটা স্বপ্নাদেশ পেলেন হটী বিদ্যালঙ্কার।

স্বপ্ন? না। স্বপ্ন কেন হবে? তখন তো তিনি জাগ্রত, সমংকায়শিরোগ্রীব ভঙ্গিতে। পদ্মাসনে। পূজার ঘরে।

বিদ্যালঙ্কার প্রত্যহ রাত্রে ধ্যানে বসতেন। এ বিদ্যাও তাঁকে শিখিয়েছেন তাঁর পিতৃদেব। কৈশোর অতিক্রমণে। বিধবা হওয়ার পরে। সহমরণের চিতা থেকে ফিরে আসার পরে। শৈশবকাল থেকেই বাবামশাইকে দেখেছেন ধ্যান করতে। জননীকে হারিয়েছেন জন্মলগ্নে। বাবামশাই ছিলেন ওঁর বাবা ও মা। বাবার দেখাদেখি উনিও শৈশবে চুপচাপ বসে থাকতেন পিতৃদেবের অদূরে—আর একটি কুশাসনের উপর। একটু বড় হয়ে জানতে চেয়েছিলেন—ধ্যানে আপনি কার কথা চিন্তা করেন বাবা?

রূপেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আমি মন্ত্র নিইনি রে হটী। আমার কোনও ইষ্ট দেবদেবী নাই। আমি 'ভূমা'কে ধ্যান করি।

অর্থগ্রহণ হয়নি সে বয়সে। পরে, বাবামশাই ওঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। শিখিয়ে দিয়েছিলেন। সে আজ প্রায় দুই দশক আগের কথা। আজ তাঁরও কোনও ইষ্ট দেবদেবী নাই। বীজমন্ত্র পাননি। কিন্তু এখন তিনি বুঝতে পারেন, নঙর্থক ধ্যান কীভাবে ইতিবাচক হয়ে উঠতে পারে। ধ্যানে উনি ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংযত করেন, সংহত করেন। জাগতিক যাবতীয় চিন্তাকে বিদূরিত করে নঙর্থক জগতে প্রবিষ্ট হবার চেষ্টা করেন। 'না'-য়ের জগতে। এ ঘর নাই। এ দেহ নাই। এ জগৎ নাই—আছেন জগত-প্রপঞ্চের সেই আদিভূত কারণ!

প্রথমে দীপশিখার উপর মনঃসংযোগ করতেন। ইদানিং তাও করতে হয় না। চোখ বুজলে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি দেহাতীত আত্মার স্বরূপ ভূমানন্দের স্বাদ পান।

সে রাত্রেও তাই করতে চেয়েছিলেন।

স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন—আর সপ্তাহখানেক তিনি আছেন এই ধরাধামে! চৈতালী পূর্ণিমা হচ্ছে চিহ্নিত তিথি। তার পূর্বেই তাঁকে বিদায় নিতে হবে এই রূপরসশব্দস্পর্শগন্ধময় পৃথিবী থেকে। ঘটাকাশ মিলিত হয়ে যাবে পটাকাশে।

মালোয়া রাজ্যের রূপোপজীবিনী রূপমতী ওঁর পথ প্রদর্শক। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে কী ভাবে বাঁচা যায় তা সেই শিখিয়ে দিয়ে গেছে।

সে রাত্রেও উনি ধ্যানস্থ হয়েছেন। রাত্রি গভীর। চরাচর নিস্তব্ধ। সহসা ঘ্রাণ উপলব্ধি করলেন এক অপূর্ব পদ্মগন্ধ। ধীরে ধীরে চোখদুটি খুলে গেল তাঁর। দেখতে পেলেন কক্ষের

ভিতর ঘনীভূত হয়েছে এক অলৌকিক আলোকচ্ছটা। সেই দীপ্তিময় আলোক-বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে ক্রমে প্রস্ফুটিত হল একটি পরিচিত আলেখ্য। চিনতে অসুবিধা হল না—তাঁর স্বর্গত পরমপূজ্য পিতৃদেব—রূপেন্দ্রনাথ ভেষগাচার্য । তিনি এসেছেন মৃত্যুতীর্থে উপনীত হবার মুহূর্তে কন্যাকে আশীর্বাদ করতে। কিন্তু তাঁর এ কী ভঙ্গি? পদ্মাসনে বসে আছেন—যেন তৈলঙ্গ স্বামী।

ঠিক তখনই যেন অন্তরীক্ষ্য থেকে দৈববাণী হল : এখনো 'রূপ'-এর মোহ? 'সত্য'কে চিনলি না?

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন হটী বিদ্যালঙ্কার। অর্থগ্রহণ হল না তাঁর। বললেন, কী বলছেন, বাবা? কোথায় রূপের মোহ? কখন প্রত্যাখ্যান করলাম সত্যকে?

—তবে 'রূপমতী' কেন রে হটী? কেন নয় 'সত্যবতী'?

—সত্যবতী! সে কে?

কোনও প্রত্যুত্তর হল না। বিদ্যালঙ্কার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আবার তাকিয়ে দেখলেন সেই অলৌকিক মূর্তির দিকে। না—উনি তৈলঙ্গ স্বামী নন, রূপেন্দ্রনাথও নন—উনি একজন রাজপুরুষ। হাতে রাজদণ্ড, মাথায় রত্নখচিত স্বর্ণমুকুট।

বিদ্যালঙ্কার আর্তকণ্ঠে বলে ওঠেন, কে? কে আপনি?

—চিনতে পারছিস না হটী? আমি তোর বাবা—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কাপুর।

মূর্ছিত হয়ে ভূশয্যায় লুটিয়ে পড়লেন হটী।

মূর্ছা ভাঙল অনেক অনেকক্ষণ পর। উঠে বসলেন। রাত তখন তৃতীয় যাম। শরীর দুর্বল। তা তো হতেই পারে। গুরুদেব গৃহত্যাগ করার পর থেকে বস্তুত তিনি অনাহারে আছেন। শরীর মানবে কেন?

আচ্ছন্নের মতো দেওয়ালে ঠেকা দিয়ে বসলেন। স্বপ্নের কথাগুলো মনে পড়ল একে একে। প্রতিটি দৃশ্য। প্রতিটি কথোপকথন। ধীরে ধীরে সমস্যাটার সমাধান হয়ে আসে। স্বপ্নাদেশের অর্থ প্রণিধান করতে অসুবিধা হল না আর। বর্ধমানের মেয়ে—রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উপাখ্যান কি ভোলা যায়? প্রায় দেড়শত বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে—তবু আজও কৃষ্ণসাগরের নিস্তরঙ্গ জলে যেন প্রতিবিম্বিত হয় সেই অনিন্দ্যকান্তির মুখখানি: রাজকুমারী সত্যবতী!

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপাদ। সুদূর লাহোর থেকে এক ক্ষত্রী কাপুর বংশের রাজপুরুষ এসেছিলেন পুরীধামে তীর্থ করতে। সঙ্গম রায় কাপুর। তীর্থ সেরে প্রত্যাবর্তনের পথে বর্ধমান শহরের কাছাকাছি একটি গ্রাম—তার নাম বৈকুণ্ঠপুর—তাঁর মনে ধরে গেল। স্বদেশে আর ফিরে গেলেন না। ছায়া-সুনিবিড় ঐ গ্রামেই একটি ভদ্রাসন নির্মাণ করে বসবাস শুরু করলেন। শুরু করলেন ব্যবসা। এক পুরুষেই প্রচুর ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করলেন তিনি। তাঁরই উত্তরাধিকারী কৃষ্ণ রায়। করিৎকর্মা পুরুষ। বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে নিয়ে এলেন ফরমান। হয়ে বসলেন ঐ অঞ্চলের জমিদার। বর্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। উপাধি পেলেন চৌধুরী। খেতাব পেলেন রাজা। নির্মিত হল বর্ধমান রাজবাটি। খনন করালেন এক বিরাট দীঘি—যা আজও কানায়-কানায় টলমল: কৃষ্ণসায়র।

সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হতে আর মাত্র চারটি বছর বাকি। সেই সময় চেতুয়া-বরদার জমিদার শোভা সিং আক্রমণ করল বর্ধমান রাজ্য। মুগল শাসনের বিরুদ্ধে রহিম খাঁ নামে এক বিদ্রোহী

আফগান সর্দার যোগ দিল শোভা সিং এর সঙ্গে। এই যৌথ আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সেনাদলকে পরিচালনা করে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা দিলেন রাজা কৃষ্ণরায়। সঙ্গে তাঁর যুবকপুত্র অম্বর রায়।

স্বামীর ও পুত্রের ললাটে রানী-মা এঁকে দিলেন রক্ত-তিলক। যাত্রার পূর্বমুহূর্তে রাজা কৃষ্ণরায় পুরললনাদের ডেকে বললেন, যুদ্ধে আমার এবং অম্বরের মৃত্যু হয়েছে সংবাদ পেলে বাবা বিশ্বনাথের এই প্রসাদ তোমরা মুখে দিও। ধর্মরক্ষা হবে!

রানী-মা বুঝলেন। তীব্র হলাহলটি চার ভাগ করে একটি রাখলেন নিজের জন্যে। এক ভাগ পুত্রবধূর, বাকি দুটি দুই কন্যার।

দিবসান্তে এল মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। রাজা এবং রাজপুত্র উভয়েই সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যু-বরণ করেছেন। যে কোন মুহূর্তে বিজয়ী সৈনাদল রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে পারে।

রানী-মা পূজা করছিলেন। পূজা অসমাপ্ত রেখে বার হয়ে এলেন মন্দির থেকে। দুই কন্যা আর পুত্রবধূ অপেক্ষা করছিল। তাদের বুকে টেনে নিলেন। বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ে মনটা হালকা করার সময় নেই। কেউ হারিয়েছে স্বামীকে, কেউ পিতাকে! হতভাগিনী বর্ধমান-মহিষী একই খণ্ডমুহূর্তে হারিয়েছেন স্বামী-পুত্র! কিন্তু কে কার চোখের জল মুছিয়ে দেবে? রাজ-প্রসাদের সিং-দরোজা ভেঙে পড়ার ভীমনাদ যে ভেসে এসেছে তার পূর্বেই। রানী-মা বললেন, নে মা! নিজের হাতে তোদের আগে খাইয়ে দিই। তোদের বাঁচাতে পেরেছি না জেনে গেলে যে মরেও আমি শান্তি পাব না।

ছেলেবেলায় যেমন করে ওদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে 'কাগের দলা-বগের দলা' খাইয়েছেন তেমনি করে দুই মেয়ের মুখে তুলে দিতে গেলেন তীব্র কালকূট!

পুত্রবধূ প্রসাদ মুখে দিয়ে লুটিয়ে পড়ল শাশুড়ীর পায়ের উপর। সদ্য-বিধবার সিঁথিতে জ্বলজ্বল করছে রাঙা-সিঁদুর।

বড় মেয়ে এগিয়ে এল: এবার আমাকে দাও মা!

রানী-মা তার কপালে একটি চুম্বন-চিহ্ন এঁকে দিয়ে বললেন, আয় মা! নে!

এব পর কনিষ্ঠা কন্যা। সত্যবতী। ষোড়শী রাজকন্যা। অপূর্ব সুন্দরী। বাবার নয়নের মণি। দাদার আদরের বোনটি।

মা ডাকলেন, আয়? —তাঁর দু চোখে শ্রাবণ ধারা। নিজে হাতে আজ মেয়েকে বিষ দিতে হচ্ছে।

মেয়ে এক-পা পিছিয়ে গেল। বললে, ন্-না!

—না? না কিরে? বাবা কী বলে গেল শুনিসনি?

—শুনেছি! বাবার কোন্ কথাটা কবে শুনেছি আমি? পারব না। আমি এখন মরতে পারব না।

সোপান বেয়ে ওদিকে উঠে আসছে শত্রু সৈন্য। আর একটি মাত্র রুদ্ধ কপাট। এঘরের। সময় নেই। মা ঝাপটে ধরল মেয়েকে। বললে. খেতেই হবে! নে! খা!

সত্যবতী ছিটকে সরে গেল। বললে, তুমি নিশ্চিন্ত মনে প্রসাদ মুখে দাও মা! আমি আসছি, এখনই আসছি। কিন্তু তার আগে আমাকে প্রতিশোধ নিতে দাও। যে শয়তান আমার দাদাকে,

আমার বাবাকে......

হতভাগিনীর কথাটা শেষ হল না। মড়মড়িয়ে ভেঙে গেল অন্দরমহলের রুদ্ধ দরওয়াজা। দুর্বিনীতা কন্যা! কথা শোনেনা! কী করবেন? বাবা বিশ্বনাথের চরণে মনে মনে তাকে সমর্পণ করে রানী-মা তাঁর অংশের প্রসাদটুকু মুখে ফেলে দিলেন।

জীয়ন্তে ধরা দিল সত্যবতী।

তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল শোভা সিং। সে একা নয়। রহিম খাঁও! দুই সহযোগী মুহূর্তে হয়ে ওঠে দুজনের দ্বন্দ্বী। শোভা সিং বললে, খাঁ – সাহেব! গোটা রাজকোষ তোমার। আমাকে বখ্‌রা দিতে হবে না। লেকিন এ 'জহর' আমার।

রহিম খাঁ মেনে নিল। বললে, খামোশ! মান্‌ লি!

মূর্খ শোভা সিং। সে চিনতে পারেনি। সে বুঝতে পারেনি। 'জহর' শব্দটার যে দুটো অর্থ আছে, তা ওর মনে পড়েনি!

সত্যবতী বন্দিনী হল স্বেচ্ছায়। কোন প্রতিবাদ করেনি সে। সুবেদার শোভা সিং-এর আদেশে মেয়েটিকে প্রহরীরা পৌঁছে দিল তার শয়নকক্ষে। তারা স্বপ্নেও ভাবেনি—মেয়েটি তার কঞ্চুলিকার অন্তরালে বুকের উপত্যকায় লুকিয়ে রেখেছে একটি ক্ষুদ্র, কিন্তু তীক্ষ্ণ ছুরিকা। বাবার দেওয়া একটা শৌখিন উপহার।

মেয়েটিকে শোভা সিংয়ের শয়নকক্ষে পৌঁছে দিয়ে প্রহরীরা কুর্নিশ করে বার হয়ে গেল ঘর ছেড়ে। শোভা এগিয়ে এল। রুদ্ধ করে দিল কবাট! কোন সোহাগের কথা বলল না। সে জানে, মেয়েটি সেদিনই তার বাবাকে হারিয়েছে, ভাইকে হারিয়েছে—মহব্বতের মিঠে মিঠে বুলি এখন তার বরদাস্ত হবে না। রানী মহলের আর পাঁচটা মেয়ে ধর্ষিতা হওয়ার আশঙ্কায় জান দিয়েছে। এ ছুকরি নিতান্ত ছেলেমানুষ—সাহস পায়নি আত্মহত্যা করতে। জান দেওয়ার বদলে ইজ্জৎ দেওয়াটাকে ও পসন্দ্‌ করেছে।

শোভা সিং এগিয়ে এল। পরুষ পেষণে নিষ্পেষিত করল সেই অনাঘ্রাতা যুবতীকে। তার বিম্বাধরে দেগে দিল এক হিংস্র চুম্বনচিহ্ন! ঠোঁটদুটো জ্বলে উঠল সত্যবতীর। কিন্তু সে ঠেলে সরিয়ে দিল না শোভা সিংকে।

ততক্ষণে পাশবসত্তা পূর্ণমাত্রায় জাগরিত। শোভা এক টানে খুলে নিল ওর ওর্না। আর এক টানে ছিঁড়ে ফেলল ওর ঘাঘরা। ভিতরে অধোবাস। দেহের সঙ্গে লেপ্‌টে থাকা চুড়িদার চুস্ত বা শেরওয়ানী-পাজামা। তা টেনে খোলা যায় না অথবা ছেঁড়া। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের এই বিচিত্র পোশাকে বঙ্গললনারা ততদিনে অভ্যস্তা। পূর্বযুগেই জীমূতবাহনের দায়ভাগ গ্রন্থে বর্ণনা আছে—"বঙ্গনারীরা, বিশেষ করে নর্তকীরা, পায়ের কণ্ঠা পর্যন্ত বিলম্বিত আঁটসাঁট পাজামা পরতেন।"[১] শোভা সিং সত্যবতীর নীবিবন্ধের ফাঁসটা খুঁজতে থাকে। কী বজ্র আঁটুনি গেরো! কামাবেগে পিশাচটার সন্দেহ হল না—এ জাতীয় গ্রন্থির অন্য কোনও উদ্দেশ্য থাকতে পারে। টানাটানি করে খুলতে না পেরে মেয়েটিকেই বললে, খুল্‌!

সত্যবতী পাথর-প্রতিমা।

---

১. 'বাঙালীর ইতিহাস'—নীহাররঞ্জন রায়

1764

টেনে এক চড় মারতে ইচ্ছা করছিল শোভা সিং এর। কিন্তু না, তাতে ছুকরির মেজাজটা খিচড়ে যাবে—জমবে না! দু-হাতে সে ঐ গিঁটটাকে খুলবার জন্য তৎপর হয়ে পড়ে।

এই মুহূর্তটির জন্যই এতক্ষণ দৈহিক নিগ্রহ সয়েছে কৃষ্ণ রায়ের আদরিণী আত্মজা। ধর্ষণকারী দুইহাতে গ্রন্থিমোচনে নিবিষ্ট হয়েছে দেখে অতি সন্তর্পণে সে তার ডান হাতখানা প্রবেশ করিয়ে দিল নিজ বুকের উপত্যকায়!

পরমুহূর্তেই রুদ্ধদ্বারের বাহিরে প্রহরীদ্বয় চমকে ওঠে। একটা গগনবিদারী আর্তনাদ! আর্তনাদ একটা প্রত্যাশিত—ঔরতের আর্তি! রমণ-শীৎকার! কিন্তু এ যে পুরুষকণ্ঠ! এ যে শোভা সিং-এর আর্তনাদ!

রুদ্ধদ্বার ভেঙে ওরা যখন ধর্ষণকক্ষে প্রবেশ করল তখন সত্যবতীর দেহে প্রাণ নেই। আর বর্ধমান রাজপ্রাসাদজয়ী শোভা সিং চিৎ হয়ে পড়ে আছে ভূশয্যায়। তার কণ্ঠে আমূল বিদ্ধ হয়ে আছে একটি ক্ষুদ্র কিন্তু মারাত্মক ছুরিকা।

শৌখিন একটা অস্ত্র। বাবা নাকি জন্মদিনে উপহার দিয়েছিল আদরের কন্যাকে!

পুব আকাশে আলো ফুটছে। চিহ্নিত সময়কালের আর একটি দিন শেষ হল। সমস্ত রাত্রি চিন্তা করেও শেষ সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি।

—রূপমতী বনাম সত্যবতী!

কে ওঁর আদর্শ? রূপমতীর পথ সহজ, সরল। যে মুক্তিপথকে এই দুদিন আগেও বলেছেন 'হস্তামলকবৎ'! সে মৃত্যু ওঁর হাতের মুঠোয়। চৈতালী পূর্ণিমার চন্দ্রোদয়ের আগে! রূপমতী পেরেছে, সত্যবতীর মা-দিদি-বৌদি পেরেছে! বর্গীর আক্রমণে কোন কোন গাঁয়ের আনপড় মেয়েরা দলে-দলে পেরেছে। এক এক পাতকুয়ায় দশ বিশটি যুবতী নারী। বর্গী দানবেরা তাদের ধর্মনষ্ট করতে পারেনি। সেই সহজ সরল পথটা বেছে নিয়েছিলেন বলে এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলেন।

কিন্তু আজ যে স্বপ্নাদেশে সব কিছু গুলিয়ে গেল।

ওঁর আদর্শ রূপমতী নয়—সত্যবতী।

সেটা কি পারবেন?

'বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্' জগৎনিয়ন্তা যুগে যুগে 'সম্ভব' হন। কখনো পুরুষের বেশে, কখনো প্রকৃতির। হিরণ্যকশিপুর উদর বিদীর্ণ করতে যেমন তিনি তীক্ষ্ণনখরলাঞ্ছিত নৃসিংহ, তেমনি মহিষাসুরকে বধ করতে তিনি আবির্ভূতা হয়েছিলেন অপরূপা মাতৃমূর্তিতে! কিন্তু সেসব সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগের কথা। কলিযুগে সে দৈবশক্তির আবির্ভাব হয় নরমানুষের শুভবুদ্ধিতে।

আজ তেমনই স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন! শহীদ হবার আহ্বান শুনেছেন। 'শহীদ' কে? যে দেশের জন্য, দশের জন্য, নিজের প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত। কিন্তু 'প্রাণ'ই কি নরমানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ? 'ধর্ম' কি তার চেয়েও বড় নয়? মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেশে দেশে, কালে কালে কত কত শহীদ তো প্রাণ দিয়েছে—কিন্তু পৃথিবীর ভার লাঘব করতে ধর্ম দিতে পেরেছে কজন?

কাশীধাম

অত বড় দানবীর, অমন মহান দাতাকর্ণও তা দান করতে প্রস্তুত ছিলেন না—সব কিছু তিনি প্রদান করতে প্রস্তুত—প্রাণ পর্যন্ত; কিন্তু ঠেকে গেলেন ঐখানে: 'আপন পৌরুষ আর ধর্ম'—তা তিনি দিতে অপারগ!

স্বপ্নাদেশে তাঁকে বলা হয়েছে—বেণীর সঙ্গে মাথা দেওয়া চলবে না। মাথা রেখে বেণীটুকু দিতে হবে!

কিন্তু কথাটা কি ঠিক?

সতীত্বই কি স্ত্রীলোকের সব চেয়ে বড় সম্পদ? 'ধর্ম' কি তার চেয়েও বড় নয়? 'ধর্ম' কি তাঁর এই নশ্বর নারীদেহের চৌহদ্দীতে সীমাবদ্ধ? কে বলে দেবে? কোন্ শাস্ত্র? কোন্ পুরাণ, সংহিতা, কোন্ মহাকাব্যের অনুশাসন?

মনে পড়ে গেল পিতৃদেবের বহুব্যবহৃত গৌতম বুদ্ধের সেই অন্তিম বাণী:

আত্মদীপো ভব
আত্মশরণো ভব
অনন্যশরণো ভব!

—নিজের বিবেকের নির্দেশে, আত্মদীপের আলোয় পথ খুঁজে নিও। পরের কথায় কান দিও না। তুমিই তোমার গুরু, তুমিই তোমার পথপ্রদর্শক!

কী দিচ্ছেন? কী পাচ্ছেন?

পাচ্ছেন স্বপ্নাদেশে প্রাপ্ত দৈব আদেশ পালনের তৃপ্তি। দেশের মঙ্গল, দশের মঙ্গল। সমগ্র কাশীধাম আজ চাইছে ঐ করাল রাহুগ্রাস হতে মুক্তি পেতে। তিনি স্বপ্নাদেশে আদিষ্ট হয়েছেন পৃথিবীর সেই পাপ স্খালন করতে।

কীসের বিনিময়ে?

নারীর 'তথাকথিত' সতীত্ব!

তিনি যদি সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় ধর্ষিতা হতে স্বীকৃতা হন, আর নিজ দেহে সেই যন্ত্রণা সহ্য করে সত্যবতীর মতো সাফল্য লাভ করেন, তবে শত শত মেয়ে রক্ষা পেয়ে যাবে। ঐ যাদের আগামী সপ্তাহে, আগামী মাসে, পরের বছরে মুখে ফেট্টি বেঁধে নিয়ে আসবে পুরন্দরের চেলা-চামুণ্ডার দল তার বাগানবাড়িতে। তাদের স্বামী আছে, পিতা আছে, সন্তান আছে, সংসার আছে। যার বিন্দুমাত্রও নাই হটী বিদ্যালঙ্কারের। তাদের সকলের হয়ে তিনি একা কেন পারবেন না ঐ মরণান্তিক দৈহিক যন্ত্রণা সহ্য করতে? তাদের বিনিময়ে ধর্ষিতা হতে? কেন পারবেন না সেই মরণান্তিক নিগ্রহ সহ্য করে ঐ পশুটাকে মায়ের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে?

সিদ্ধান্তে এলেন হটী বিদ্যালঙ্কার—স্বেচ্ছায় তিনি ধর্ষিতা হবেন!

কিন্তু দুরন্ত অভিমানে ঝরঝরিয়ে কেঁদেও ফেললেন। পুব আকাশে তখন উদয়ভানুর আভাস। সেদিকে মুখ তুলে হঠাৎ তিনি পিতৃসম্বোধন করলেন। বললেন, আপনি আমাকে এই আদেশ দিলেন, কিন্তু কই 'মা'কে তো তা বলেননি? তাহলে তাঁর আঁচলে বিষ বেঁধে দিয়েছিলেন কেন?

আমি ক্ষমা চাইছি।

1554

ভুল হয়ে গেল দিদিভাই! তোমাদের এখনো বলাই হয়নি হটী বিদ্যালঙ্কারের বাবার কথা, মায়ের কথা। তাঁর বাল্যকালের কথা!

ব্যাপারটা কী জান বোনটি? ওখানেই তোমাদের সঙ্গে আমার ফারাক। কথা-সাহিত্য একটা যোগের সাধনা—পাঠিকা-পাঠকের সঙ্গে লেখকের যোগ। তোমাদের সঙ্গে রাখীবন্ধনের উৎসবে যোগ দিতেই তো বসেছি। কিন্তু ঠিক এক সমতলে বসিনি। বসা যায় না। প্রথম পংক্তিতে কবি যখন বর্ণনা করতে বসেন—তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের চেহারা ভূতের মতন; সে অতি ঘোর নির্বোধ, কবিপত্নীর ধারণা সে ক্রমাগত চুরি করে যাচ্ছে, তখন সেই 'বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি'র কাণ্ড–কারখানায় আমরা হাসছি—কিন্তু সেই প্রথম পংক্তি রচনা-কালেও কবির চোখদুটি অশ্রুসজল! তিনি জানেন, ঐ পুরাতন ভৃত্যটি তাঁর জন্য অন্তিমে প্রাণ দেবে। সে তথ্যটা তুমি-আমি জানি না, কিন্তু তাঁর জানা!

এই যে 'হটী বিদ্যালঙ্কার'—না সোঞাই গ্রামের বাস্তব মহাপণ্ডিতা নয়, আমি অযোধ্যার শ্রীরামের কথা এখন বলছি না, বলছি আমার মনোভূমির রামের কথা—তাঁর সব কিছু যে আমার জানা। তিনি প্রাণ দেবেন, না সতীত্ব-ধর্ম, কী তাঁর পরিণাম—সব জেনে-বুঝে আমি লিখতে বসেছি। তোমরা আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছ, জান না এবার আমি তোমাদের পাতে কী পরিবেশন করব—নিম-বেগুন, না পরমান্ন!

কী বললে? আমি কেমন করে জানলাম?

না দিদিভাই, বাস্তব হটী বিদ্যালঙ্কারের সব কিছু জানতে পারিনি, জানি না তাঁর জন্ম তারিখ, বাবার বা মায়ের নাম। তাঁর তিরোধান 1810 — কাশীতে, প্রায় সত্তর বছর বয়সে—তাই আন্দাজে বলেছি তাঁর জন্ম 1742 এর কাছাকাছি। জন্মস্থান: বর্ধমান, সোঞাই।

ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা করেছি। তার মনে নেই।

জাতীয় গ্রন্থাগারকে প্রশ্ন করেছি। সে বলেছে খুঁজে নাও—এ গন্ধমাদনে তোমার বিশল্যকরণী আছে কি নেই তার আমি কী জানি!

জানতে চেয়েছি মহাকালের কাছে। উল্টে ধমক খেতে হয়েছে। সত্যই তো, তার জাবদা-খাতায় যে 'হোমো-স্যাপিয়ান'-এর আগের খবরও লিখতে হয়েছে। সে কেমন করে দেবে সোঞাই গাঁয়ের সেই ডাগরচোখো কিশোরীর সন্ধান?

না, মহামহিমময়ী সেই বাস্তব হটী বিদ্যালঙ্কারের কথা বলছি না। বলছি না হটু বিদ্যালঙ্কারের কথাও। তাঁরা দুজনেই তো আমার মা! বলছি আমার ছোট্ট পাগলি মেয়েটার কথা। আমার মনের কোণের এই সোঞাই গাঁয়ে নতুন করে যে জন্মেছে। তিল-তিল করে যে বর্ধমান, বেড়ে উঠছে, তার কথা বলছি। ঘুম–না–আসা রাতে যে এসে আমাকে ইতিমধ্যেই চুপিচুপি বলে গেছে তার সব কথা, স—ব কথা! তার আনন্দের কথা, বেদনার কথা, তার প্রাপ্তি আর বঞ্চনা। তোমাদের সে-কথাই তো শোনাতে বসেছি।

তাই এ জাতের ভুল হয়ে যাচ্ছে। তোমরা তো এখনো জানই না হটীর পিতৃদত্ত নামটা কেন 'রূপমঞ্জরী'!

বাপের দেওয়া নাম। বাবা মহাপণ্ডিত। চমৎকার নামটি বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর নিজের

নাম 'রূপেন্দ্রনাথ', স্ত্রীর নাম 'কুসুমমঞ্জরী'। দুজনে মিলে সৃষ্টি করেছিলেন ঐ মেয়েটিকে: 'রূপমঞ্জরী'।

না! আবার ভুল হল। হটী বিদ্যালঙ্কারের নামটা তাঁর পিতৃদেব দেননি। সে-কথা সবাই জানে না। আসলে নামকরণ করেছিলেন সেযুগের শ্রেষ্ঠ মহাকবি! সেসব কথা শুধু আমার মনেই আছে। আমাকে লিখতে হবে, এখনো তোমাদের বলা হয়নি!

গল্পের ধরতাইটা ধরতে হলে আপাতত নোঙর তোল, দিদিভাই! অনেক-অনেকটা পথ উজান ঠেলে যেতে হবে।

আমাদের কাহিনী শুরু হয়েছিল 1774 খ্রীষ্টাব্দে। পলাশীর যুদ্ধের সতের বছর পরে। প্রায় অর্ধ শতাব্দীর উজান ঠেলে আমাদের কেঁচে-গণ্ডূষ করতে হবে।

আমরা আবার নতুন করে শুরু করব রাঢ়খণ্ডে। রূপেন্দ্রনাথের জন্ম-বৎসর থেকে। সেটা 1717 খ্রীষ্টাব্দ।

সোঞাই
1742
দ্বিতীয় পর্ব

রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের পিছনে কী যেন একটা উপাধি ছিল; কিন্তু এখন তার কোন নিশানা নেই। রঘুনাথ শিরোমণি, বাসুদেব সার্বভৌম থেকে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অনেক পণ্ডিতই কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতজোড়া খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। রূপেন্দ্রনাথ সে জাতীয় বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন না নিশ্চয়। কিন্তু বর্ধমানের সেই সোঞাই গ্রামখানিকে কেন্দ্রবিন্দু করে মানচিত্রে পঁচিশ ক্রোশ ব্যাসের একটি বৃত্ত টানলে সে আমলে দেখা যেত ঐ বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলিতে তিনি অপরিচিত নন। তবে তাঁকে সবাই চিনত দুটি বিচিত্র নামে—'একবগ্গা ঠাকুর' অথবা 'ধন্বন্তরি'।

দ্বিতীয় উপাধিটা তাঁকে দান করেছিলেন স্থানীয় জমিদার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ভাদুড়ী। ভেবেচিন্তে নয়, তাৎক্ষণিক উচ্ছ্বাসের বশে। কিন্তু নামটা পাকাপোক্ত হয়ে গেল। শুধু তাই নয়। সোঞাই গাঁয়ে গেলে আজও দেখতে পাবে তাঁর নামে একটা দীঘি এখনো টিকে আছে। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের এঞ্জিনিয়ার পাকা সড়ক বানাবার সময় —এই তো সেদিন—তার চারধার চৌকশ করতে চেয়েছিল। গ্রামবাসী বাধা দেওয়ায় কাজটা করা যায়নি। ভালই হয়েছে। দীঘিটা সার্থকনাম হয়ে রইল। জ্যামিতিক বিচারে দীঘিটি: ট্র্যাপিজিয়াম। দুটি বাহু সমান কিন্তু সমান্তরাল নয়, বাকি দুটি সমান্তরাল, কিন্তু অসমান। তার নাম: 'একবগ্গা দীঘি'!

প্রথম উপাধিটা দিয়েছিল গাঁয়ের মানুষ—তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। কারণ সমকালের ধারণায় তিনি এক সুদুর্লভ ব্যতিক্রম! অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে যা নাকি অচিন্তনীয়—একজন আধুনিকমনা প্রগতিবাদী!

প্রতিটি শাস্ত্রীয় অনুশাসন তিনি নিজ বিবেকের বকযন্ত্রে চোলাই করে গ্রহণ করতেন। তা বেদবাক্য হলেও! যা ভাল বুঝতেন তাই করতেন। কারও পরোয়া না করে। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি নিজেও কম ভোগেননি, পরিবারবর্গকেও ভুগিয়েছেন। এমনকি ক্রমোজমের মাধ্যমে ভুগিয়েছেন আত্মজাকে। তাই হটী বিদ্যালঙ্কারের স্মৃতিতর্পণ করতে হলে আমাদের প্রথমেই চিনে নিতে হবে সেই 'একবগ্গা ঠাকুর'কে।

সোঞাই

জন্ম: সোঞাই, বর্ধমানভুক্তি।

সময়টা: ফেরঙ্গমতে 1717 খ্রীষ্টাব্দ।

অর্থাৎ শেষ গ্র্যান্ড-মোঘল আলমগীর বাদশাহর মৃত্যুর দশ বছর পরে।বাঙলার তদানীন্তন সুবেদার আজিম উসমানের সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলে পূর্বদশকে সম্রাটনিযুক্ত বঙ্গশাসক ঢাকা থেকে রাজধানী সরিয়ে এনেছেন মুখসুদাবাদে। নতুন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর নাম অনুসারে ভাগীরথী তীরের এই নতুন রাজধানীর নাম হয়েছে: মুর্শিদাবাদ। বস্তুত রূপেন্দ্রনাথের জন্ম-বৎসরে মুর্শিদকুলী পাকাপাকিভাবে বাঙলার সুবেদার হলেন—বাদশাহী-ফরমান মোতাবেক।

মুর্শিদকুলী লোভী ছিলেন না। নিজে সংযত জীবন যাপন করে গেছেন, যা নাকি সে-আমলে নবাব-বাদশাহদের ভিতর নিতান্ত অপ্রত্যাশিত। উপপত্নী তো নয়ই—এমনকি একটি মাত্র পত্নী নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন!

সুবেদার ও দেওয়ান একই ব্যক্তি। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তাঁকে নির্মম হতে হত, কিন্তু অতিরিক্ত আদায়ের লালসা ছিল না। আদিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ-সন্তান। তিনি ধর্মান্তরিত মুসলমান।

বালক বয়সেই রূপেন্দ্রনাথ ত্রিবেণীতে চলে যান। গুরুগৃহে বিদ্যার্জনমানসে। নবদ্বীপেই যাওয়ার কথা। নবদ্বীপ সেই কানভট্ট শিরোমণির কাল থেকে নব্যন্যায়ের পীঠস্থান। তার পূর্বযুগে বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতদের যেতে হত মিথিলা অথবা কাশীধাম। কিন্তু ত্রিবেণীর এক ক্ষণজন্মা পণ্ডিতের কথা শুনে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন সৌরীন্দ্রনাথ—রূপেন্দ্রনাথের পিতৃদেব। সেই আশ্চর্য নৈয়ায়িকের গুরুকুল চতুষ্পাঠীতে পাঠিয়েছিলেন পুত্রকে।

তিনি রূপেন্দ্রনাথ অপেক্ষা ত্রয়োবিংশতি বৎসরের বয়ঃজ্যেষ্ঠ। তখনো হয়তো তাঁর ভারতজোড়া খ্যাতি হয়নি, কিন্তু সেই আমলেই তিনি নবদ্বীপের গর্ব খর্ব করে নব্যন্যায়ের এক নতুন পীঠস্থান গড়ে তুলতে শুরু করেছেন ত্রিবেণীতে। ঠিক যেভাবে মিথিলার পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের পক্ষশাতন করে নবদ্বীপকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন পূর্বজমানায় কানভট্ট রঘুনাথ শিরোমণি।

রূপেন্দ্রনাথের সেই শিক্ষাগুরুর নাম: জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

সেই ক্ষণজন্মা পুরুষের কীর্তিকাহিনী সর্বজনবিদিত। অনেকানেক পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করতে এসে মাথা নত করে ফিরে গেছেন। তার ভিতর একটির নাম: অষ্টাদশ শতাব্দী।

শতাধিকবর্ষের আয়ুর কথা নিতান্ত বিরল। তবু তা ব্যতিক্রম হিসাবে হয়তো শোনা যায়। কিন্তু আমি তো 'বায়োগ্রাফিকাল ডিক্সনারী' ঘেঁটে দ্বিতীয় আর কোনও বিখ্যাত ব্যক্তির নাম খুঁজে পাইনি যাঁর চরণপ্রান্তে একটি গোটা খ্রীষ্টীয় শতাব্দী 'অজয়-পত্র' লিখে দিয়ে গেছে!

ওঁর জন্মতারিখ : 13. 9. 1694

তিরোধান দিবস : 19. 10. 1807

গোটা অষ্টাদশ শতাব্দী তাঁর প্রতিভার বিকাশ দেখতে দেখতে বুড়িয়ে, ফুরিয়ে গেছে!

এহেন গুরুর গৃহে রূপেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রায় দশবৎসর কাল। স্মৃতি অথবা নব্যন্যায়, কীসের উপর যেন তিনি উপাধিও লাভ করেন। তবে নিজের নামের সঙ্গে উপাধিটা সংযুক্ত করা তিনি পছন্দ করতেন না। গ্রামে তাঁকে কেউ তর্কালঙ্কার, ন্যায়তীর্থ বা ঐ জাতীয় কোন সম্বোধন

করলে ভর্ৎসিত হত। অব্যবহারে তরোয়ালের পর্যন্ত ধার ক্ষয়ে যায়, আর এ তো সামান্য উপাধি। ফলে, এতদিন পরে সঠিক তথ্যটা আর উদ্ধার করার সম্ভাবনা নাই। 'একবগ্গা ঠাকুর' উপাধিটাও সম্বোধনে ব্যবহৃত হত না, হত নেপথ্যে। 'ধন্বন্তরি' সম্বোধনটাও প্রায় তাই। গ্রামের মানুষ ওঁকে যে দুটি নামে সম্বোধন করত তার একটি 'কোবরেজ মশাই', দ্বিতীয়টি 'পণ্ডিতমশাই'।

প্রথমটি ওঁর বৃত্তি অনুসারে। দ্বিতীয়টি, যেহেতু ইচ্ছার বিরুদ্ধে এককালে তাঁকে একটি চতুষ্পাঠী খুলে বসতে হয়েছিল। কন্যাকে কোন চতুষ্পাঠীতে ভর্তি করতে না পেরে।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে কাজটা কবতে হয়েছিল বটে, কিন্তু সেটিই তাঁর কৌলিক বৃত্তি। পিতৃদেব এবং পিতামহ এই গ্রামে আজীবন অধ্যয়ন-অধ্যাপন নিয়েই কালাতিপাত করেছেন।

কিন্তু রূপেন্দ্রনাথকে ভিন্ন পথের পথিক করতে চেয়েছিলেন তাঁর টুলোপণ্ডিত পিতা। সোঞাই গ্রামের কাছে-পিঠে সে আমলে ভাল কবিরাজ ছিল না। মুশকিল এই—সেটা যে একটা অভাব এ বোধটাও ছিল না কারও। তার অর্থ কী? অসুখ-বিসুখ, আধিব্যাধি কি ছিল না? যথেষ্টই ছিল। ম্যালেরিয়া তো ব্যাপক। এ ছাড়া ঐ অঞ্চলে ঘরে ঘরে ছিল আন্ত্রিক রোগ। কিন্তু এইসব আধি-ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনে কোনও কবিরাজ বা ভেষগাচার্যের অভাব বোধ করত না পঞ্চগ্রামের মানুষ। কোন চণ্ডীমণ্ডপে কেউ কখনো প্রস্তাব রাখেনি—এ গ্রামে একঘর কবিরাজ এনে বসালে মন্দ হয় না। সকলেই ছিল ভিন্ন পথের পথিক, ভিন্ন অস্ত্রে বিশ্বাসী: ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র, তাবিজ-কবচ। অর্থবানদের জন্য যজ্ঞ, গ্রহশান্তি, অথবা ডাকিনী-যোগিনী বিদ্যা।

রূপেন্দ্রনাথের পিতৃদেব, সৌরীন্দ্রনাথ—যাঁর 'পাপে' রূপেন্দ্র হয়েছিলেন 'একবগ্গা ঠাকুর' আর রূপমঞ্জরী 'হটী'; —তিনি নিজে ছিলেন স্মার্ত-পণ্ডিত। কিন্তু পরিণত বয়সে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এসব ঝাড়ফুঁক-মন্ত্রতন্ত্র গ্রামজীবনকে বাঁচাতে পারবে না। তাই চেয়েছিলেন নিজের ছোট ভাইটিকে কবিরাজ করে তুলতে। বিধি বাম। ছোটভাই সমীরেন্দ্রনাথ একদিন গোপনে গৃহত্যাগ করল। সন্ন্যাস নিল সে। অগত্যা পুত্রটিকেই চেয়েছিলেন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে পারঙ্গম করে তুলতে।

চরক, সুশ্রুত, নিদান আয়ত্ত করতে হলে সংস্কৃত জ্ঞানটা আবশ্যিক। সে জ্ঞান নিজেই দিতে পারতেন, যেহেতু তিনি স্বয়ং একটি চতুষ্পাঠী পরিচালনা করেন। কিন্তু সে পথে যাননি। পুত্রটিকে রেখে এসেছিলেন ত্রিবেণীর নব্যপণ্ডিতের গুরুগৃহে।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ব্যবস্থাপনাতেই পরে আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে চলে যান সরগ্রামে। পরবর্তীকালের সরগ্রামনিবাসী স্বনামধন্য কবিরাজ আচার্য গোকুলানন্দের পিতামহর কাছে দীর্ঘ সাত বৎসর আয়ুর্বেদশাস্ত্র, চরক, সুশ্রুত ও নিদান আয়ত্ত করেন।

স্বগ্রামে যখন প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁর বয়ঃক্রম আনুমানিক পঞ্চবিংশতি বৎসর। দীর্ঘ পনের বৎসর পরে।

সেটা 1742 খ্রীষ্টাব্দ। ইতিমধ্যে বঙ্গদেশের ভাগ্যাকাশে অনেক উত্থান-পতন ঘটেছে। বাঙলার মসনদে মুর্শিদকুলীর জামাতা 'মতোমন-উল্-মুল্‌ক্ সুজাউদ্দীন বাহাদুর অসদ্ জঙ্গ' এসেছেন ও গেছেন। সুজাউদ্দীনের এন্তেকাল হলে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত

হয়েছিলেন সরফরাজ খাঁ বাহাদুর। কিন্তু সিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজকে পরাজিত করে বিহারের সুবাদার এসে বসেছেন বাঙলার মসনদে : 'সুজা-উল্-মুল্ক হেসামুদ্দৌলা মহাবৎ জঙ্গ্ বাহাদুর'। অতবড় নামটা তো মনে থাকে না, তাই ইতিহাস তাকে সংক্ষেপে বলে: আলিবর্দী

বঙ্গদেশের বিভিন্ন সামন্ততান্ত্রিক ঔদ্ধত্য মুর্শিদকুলির আমলেই অবদমিত হয়েছিল। এতদিনে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত। খাজনা আদায়ের অত্যাচার আছেই; কিন্তু সমগ্র রাজ্যে নিরঙ্কুশ শান্তি। চোর-ডাকাতেরা হয় তাদের বৃত্তি ত্যাগ করেছে অথবা প্রতিবেশী রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে। যারা দুটোর একটাও করেনি তাদের বাদশাহী সড়কের দু-পাশে ঝুলতে দেখা গেছে। মাঠে-মাঠে ধান, গোলায়-গোলায় শস্য। মুর্শিদাবাদের বাজারে তখন এক তঙ্কায় পাঁচ মণ চাউল। তন্তুজাত দ্রব্য, কাঁসার বাসন, লাক্ষার কাজ, লোহা-ঢালাই প্রভৃতি। এমনকি বীরভূমে লোহা ঢালাই করে কামান-বন্দুক পর্যন্ত নির্মিত হত। সুজাউদ্দীনের আমলেই সুবাদার দিল্লীর বাদশাহকে প্রায় সওয়া কোটি টাকা রাজস্ব পাঠাতেন। তার মানে এ নয় যে, রাজ্যে দারিদ্র্য না — ছিল। গ্রামবাসীর উপার্জনও অল্প, প্রয়োজনও অল্প। তার চেয়ে বড় কথা তাদের ছিল অভাব-বোধের অভাব। তারা উচ্চাভিলাষী হত কদাচিৎ। তাদের পার্থিব-কামনার শেষসীমান্ত "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।" সদ্যবিবাহিতা আত্মজাকে বিদায় দেওয়ার সময় জামাতা বাবাজীবনকে শাশুড়ী ঠাকরুণ অনুরোধ করতেন, "হাঁটু ঢাকি বস্ত্র দিহ, পেট ভরি ভাত।" ঢাকায় মসলিন পয়দা হয় কি হয় না সে খোঁজ কে রাখে? হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা শাড়ি পেলেই যখন লজ্জানিবারণ হয়।

ঘরে ঘরে তাঁত। রেশমের চাষও হয়! বিভিন্ন বৃত্তিতে মানুষ মোটামুটি সন্তুষ্ট। লেনদেন বিনিময় প্রথায়—কড়ি-কপর্দকও বাজারে চলে। সরকারী কর্মচারী বাজারে বাজারে ঘুরে নজর রাখে। তদারকি করে। অতিরিক্ত মুনাফার লোভে যারা পড়ে, তাদের ললাটে অশেষ দুর্গতি—মৃত্যু পর্যন্ত।

বর্গীর হাঙ্গামা যে আসন্ন তা কিন্তু তখনো কেউ টের পায়নি।

ততদিনে রূপেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ ঘটেছে। গুরুগৃহ থেকে স্বগ্রামে এসে পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপ্ত করে তিনি পুনরায় গুরুগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। জননীকে হারিয়েছেন তো শৈশবেই। স্বগ্রামে যখন প্রত্যাবর্তন করলেন তখন সংসারে মাত্র দুটি প্রাণী—বৃদ্ধা পিতৃস্বসা আর তাঁর কন্যা। পিসেমশায়ের জীবিত কালেই জগু-পিসিমা ভাইয়ের সংসারে ফিরে এসেছিলেন সকন্যা। এমনকি স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পেয়েও শ্বশুরালয়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দিতে যাননি। এ গ্রামেই শাঁখা-সিন্দুর ঘুচিয়ে থান পরে কন্যাটিকে দিয়ে পৃথক চতুর্থীশ্রাদ্ধ করিয়েছিলেন।

হেতুটি সামান্য এবং অসামান্য। পিতৃস্বসার এই বিদ্রোহের হেতু বৃদ্ধ বয়সে পিসেমশাই একটি পঞ্চদশীকে দ্বিতীয় পক্ষে ঘরে এনেছিলেন। সে আমলে এ হেতুটা হাস্যকর: ওমা, আমি কোথায় যাব! কুলীন বামুন—আড়াইকুড়ি বয়সে মাত্তর দ্বিতীয় পক্ষ করল আর তাও সইল না জগু ঠাক্‌রুণের? হেসে বাঁচিনে!

তা তোমরা হাস আর কাঁদ, এ অনাচার সহ্য হয়নি জগদ্ধাত্রী দেবীর। ঘরে-ঘরে কুলীন ব্রাহ্মণের প্রথমা ভার্যার দল যেটাকে অনিবার্য নিয়তি হিসাবে মেনে নেয়—বাৎসরিক কালবৈশাখী ঝড়ের মতো—বছরে বছরে সপত্নীসংখ্যার বৃদ্ধি, যৌবন-অবসানে যৌবনবতী

নবাগতার অঞ্চলপ্রান্তে সিন্দুকের চাবিগোছা বেঁধে দেওয়া আর নিজ অঞ্চলপ্রান্তের গিট খুলে স্বামীর অধিকার ত্যাগ করা, তা জগুঠাকরুণের মতে: অসৈরণ!

বিপর্যয়টা ছিল রক্তে। বাঁড়ুজ্জে বংশের শোণিতে! না হলে তাঁর ভাইপো কেন হবে 'একবগ্গা ঠাকুর', নাতনী: 'হটী'?

পিসতুতো বোনটি রূপেন্দ্রনাথের অপেক্ষা প্রায় দশ বৎসরের অনুজা। যথারীতি তারও হয়েছিল নবমবর্ষে গৌরীদান। আবছা মনে পড়ে কাত্যায়নীর। অঘ্রাণের এক শীতের রাত্রে নাকে নোলক, ললাটে চন্দনের ছাপ নিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল ছাদনাতলায়। কলকোলাহল, উলু-উলু, শঙ্খধ্বনি, অগ্নয়ে স্বাহা-অগ্নয়ে স্বাহা! বরের মুখটা ওর ভাল মনে নেই, তবে মনে পড়ে, গায়ে ছিল উড়ুনি, মাথায় টোপর আর গলায় গোড়ের মালা! সেই একটিবার মাত্র দেখেছে লোকটাকে, যার কল্যাণে আজও ওর সিঁথিতে সিন্দূর, হাতে খাড়ু শাঁখা।

গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপন করে রূপেন্দ্রনাথ যখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন কাত্যায়নী ষোড়শী। যৌবন তার ভরা দামোদরের মতো কানায়-কানায়। বিবাহের পর আর তার স্বামী-সন্দর্শন ঘটেনি। ভিন্ন গাঁয়ের যে নৈকষ্য কুলীনটি জগু ঠাকরুণকে কন্যাদায় থেকে মুক্তি দিয়ে ছিল, বরপণটি উত্তরীয়-প্রান্তে বেঁধে চলে গিয়েছিল, সে আর কোনদিন ফিরে আসেনি। তার পৈত্রিক ভদ্রাসন গো-আড়ি গ্রামে। বর্ধমানরাজের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। নবদ্বীপরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানীর সন্নিকটে। দূরের গ্রাম সন্দেহ নাই। এ জাতীয় ভ্রাম্যমাণ কুলীন বিবাহ-বিশারদেরা যজন, যাজন, পূজা পাঠ কিছুই করেন না। শাস্ত্রে নিষেধ! তাঁরা শুধু দু-এক বৎসর পর-পর শ্বশুরালয়ে শুভাগমন করে থাকেন। সেটাই প্রথা। বস্তুত স্বগৃহে নিত্য অরন্ধন। বৎসরের 'বারোমাস্যায়' বিভিন্ন ব্রাহ্মণবাড়িতে তাঁর পর্যায়ক্রমে জামাই আদর, এবং রাত্রে নিত্যনতুন শয্যাসঙ্গিনী—সবকয়টি সীমন্তিনীই ওঁর অগ্নিসাক্ষী সহধর্মিণী। সারাটি বছর স্বামী সন্দর্শনের তীব্র কামনা নিয়ে হতভাগিনীর দল অধীর প্রতীক্ষায় প্রহর গনে! পরদিন জামাই-বিদায় নগদে গ্রহণ করে গ্রামান্তরে চলে যায় সেই বিবাহ-বিশারদ নৈকষ্য কুলীন। উপায় কী? বৎসরে মাত্র তিনশত পঁয়ষট্টির অধিক রাত্রির ব্যবস্থা যে করেননি কৃপণ বিধাতা! ভাবছ, তাদের জীবন সুখের? কী বুঝবে তোমরা? বারোমাস্যায় লাভের অংশটাই শুধু দেখলে হে, কিন্তু লোকসানের খতিয়ানটা সমঝে নিলে না! নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই—প্রতিটি রজনীতে ক্ষুধিতা বাঘিনীর আক্রমণ! দুটো সুখ-দুঃখের কথা প্রাণ খুলে বলার অবকাশ নেই—দুজনেই দুজনের অপরিচিত-অপরিচিতা! ওদের বাসাই নেই, তার 'ভালোবাসা'! সাংসারিক চিন্তা নেই, সময় নেই, সন্তানের সান্নিধ্য নেই—শুধুই নিরঙ্কুশ জৈবিক আচরণ। একজনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা—একরাত্রির মেয়াদের, আরজনের নিদারুণ ক্লান্তি—নিত্য অবক্ষয়ের! কোন কোন শ্বশুরালয়ে অবশ্য একাধিক রাত্রি বাস করতে হয়—কখনো বা পুরো সপ্তাহ! সে আমলে কেউ পরিসংখ্যান রাখেনি, রাখলে দেখা যেত—সেই শ্বশুরালয়ের প্রোষিতভর্তিকাটির সৌন্দর্য বা যৌবন এভাবে বিবাহ-বিশারদকে বন্দী করত না—করত শ্বশুরমশায়ের আর্থিক সঙ্গতি! ওরা রাতপিছু দক্ষিণা পেত!

কাত্যায়নীর বিবাহ হয়েছে সাত বৎসর পূর্বে। জামাতা বাবাজীবনের সেই লালরঙের খেড়ো-খাতায় এই হতভাগিনীর নামধাম লেখা পৃষ্ঠাটি যদি ইতিমধ্যে কীটদষ্ট না হয়ে থাকে,

তাহলে তার এতদিনে অন্তত একবার আসা উচিত ছিল। এটুকু গণিতশাস্ত্রের অধিকার তার নিশ্চয় আছে। সাত বৎসর পূর্বে সে যে নোলকপরা বেনারসীর পুঁটুলীটিকে দেখে গিয়েছিল, এতদিনে তার যৌবন কানায়-কানায় টলমল! অথবা কে জানে, নিত্য-অবক্ষয়ে সেটাই ওর আতঙ্ক কি না! মোট কথা, সে আসেনি! কেন, কে জানে? রূপেন্দ্রনাথ ছোট বোনটির মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারেন! খোঁজ নিতে একবার গো-আড়ি গাঁয়ে যেতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু জগুঠাকরুণের প্রবল আপত্তি। হেতুটা তিনি স্পষ্টাক্ষরে জানাননি। সেটা অনুমানসাপেক্ষ! সেই বাঁড়ুজ্জে-বংশের অভিমান!

—আমার মেয়ে কি ফ্যালনা?

'ফ্যালনা' না হলেও খেলনা তো বটে! পুতুল-খেলার অধিকার নিয়ে সে কি দুনিয়াদারী করতে আসেনি? কিন্তু কে শোনে সে কথা! জগু ঠাকরুণ শেষ নিদান হেঁকে রেখেছিলেন, খবর্দার! জামাইয়ের তল্লাশে গো-আড়ি যেতে পারবি না। আমি এই দিব্যি দিয়ে রাখলাম, রুপো!

কাত্যায়নীর প্রতিক্রিয়া বোঝা যায় না। সে নীরবে তর্জনীতে অঞ্চলপ্রান্ত জড়াতে ব্যস্ত ছিল তখন।

পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকাটাই সে আমলে কোন কুলীন সুপাত্রের পক্ষে এক ভেল্কি। ঘটকীদের নিত্য শুভাগমন লেগেই থাকত। এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে। কুলীন রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কোন গ্রামে কয় ঘর তা ওদের নখদর্পণে। মায় তাদের কার ঘরে কয়টি অরক্ষণীয়া। আর কী আশ্চর্যের কথা—জগুঠাকরুণ যখন যে পাত্রীটির বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে পড়েন তখনি দেখা যায়, সেটিই তদানীন্তন বঙ্গদেশের সবচেয়ে রূপবতী, গুণবতী, লীলাবতী! পূর্ব-জমানায় স্বয়ম্বরার কাছে ভাট যেমন বিভিন্ন পাণিপ্রার্থীর গুণাবলী গড়গড় করে আউড়ে যেত, ঘটকীরা তেমনি অনর্গল বর্ণনা করে যেত সেই নেপথ্যনায়িকাদের।

মুশকিল এই যে, রূপেন্দ্রনাথ তাঁর পূজ্যপাদ পিসিমাতা ঠাকুরানীকে স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে রেখেছেন তাঁর সুদৃঢ় অভিমত: ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করবেন তিনি। আজীবন আর্তজনের সেবায় ব্রতী থাকবেন—দারপরিগ্রহ আদৌ করবেন না। এমনকি ভীতি প্রদর্শন পর্যন্ত করে রেখেছেন—বেশি বিরক্ত করলে খুড়ামশায়ের পদচিহ্ন-রেখা ধরে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন। জগুঠাকুরণের ছোটভাইটি সন্ন্যাসী হয়ে গেছে।

ভিনগাঁয়ের অরক্ষণীয়াদের কথা থাক, স্বগ্রামেই কি বিবাহযোগ্যা সুপাত্রীর অভাব ছিল? গাঁয়ে অন্তত পঁচিশ-ত্রিশ ঘর ব্রাহ্মণ। অধিকাংশই রাঢ়ী শ্রেণীর। সবাই যে কুলীন, তা নয়। কিন্তু কুলীনের ঘর থেকে শুধু জামাতাই সংগ্রহ করতে হয়। না-হলে কৌলিন্য থাকে না। কন্যা সংগ্রহ করায় আপত্তি নাই। তাতে কৌলিন্য খোয়া যায় না—কিন্তু সেটা অধর্ম! একজন কুলীনকন্যাকে বঞ্চিতা করা! নেহাৎ তেমন-তেমন কৌলিন্য-মর্যাদা না পেলে তাই শ্রোত্রিয়ের ঘর থেকে পাত্রী সংগ্রহ করার প্রথা নেই।

1742

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের যে আবর্তে এখন আমাদের কাহিনী পাক খাচ্ছে তাকে আর একটু ঘনিষ্ঠভাবে চিনে নেওয়া দরকার। সে-কালটাকে আমরা বিশেষ চিনি না।

সে আমলের রাজনৈতিক ইতিহাস শাঠ্য-ষড়যন্ত্রে আর নীচতায় কানায়-কানায় ভরা। গোটা রাজ্য কঙ্কালসার—অর্থনৈতিক শোষণে। শতাব্দীর প্রারম্ভে যে প্রাচুর্য ছিল —নিরন্ন কৃষিজীবীদের না হলেও, যাকে বলে 'জাতীয় আয়'—দিন দিন তা ক্ষয়িত হয়ে যাচ্ছে। এক দিকে মুসলমান সুবেদার, দেওয়ান আর তাদের উচ্ছিষ্টলোভী পরগাছার দল, অপর দিকে বিদেশী বণিক আর তাদের প্রসাদলোভীর আক্রমণে তিলেতিলে অবক্ষয়ের পথে ঢলে পড়ছে সুজলা সুফলা বঙ্গদেশ। অন্নপূর্ণা এতদিন ছিলেন যাঁর গৃহলক্ষ্মী, এবার তাঁকে বাঘছাল পরে ভিক্ষায় বের হতে হচ্ছে! তবু আমরা কাহিনীর যে মাঝদরিয়ায় আছি সেখানে এখনো এসে উপস্থিত হয়নি বাঙলার ভাগ্যাকাশে সেই শতাব্দীর সবচেয়ে সর্বনাশা বিভীষিকা: বর্গীর হাঙ্গামা!

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর তো তার পরের কথা!

কিন্তু বিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল, দুর্নীতিপরায়ণ মুসলমান শাসককুলের অর্থগৃধ্নুতা আর ঘৃণ্য আদর্শ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষক্রিয়া শুরু করেছে। বিদেশী বণিকদলের শোষণের পূর্বযুগ থেকেই বাঙলার ধনসম্পদ একমুখী স্রোতে ক্রমাগত চলেছে দিল্লীমুখো—রাজস্ব, নজরানা, আবওয়াব। পরিপূরণের কোনও আয়োজন নাই। ক্রমাগত অবক্ষয়ে কুবেরও হয়ে পড়েন কর্পদকহীন, অন্নপূর্ণার হাত ধরে শিবকে পথে নেমে পড়তে হয়—ভিক্ষায়।

মুর্শিদাবাদের বিলাসের স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এদিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে—শহর কলকাতা। ইংরাজ বণিকের নবীন আস্তানা। অষ্টাদশ শতাব্দীর উষাযুগে—আওরঙ্গজীবের মৃত্যুর কালে সেই সুতানুটি-গোবিন্দপুর অঞ্চলের লোক-সংখ্যা ছিল মাত্র পনের হাজার; আমাদের কাহিনীর কালে, পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে, তা বর্ধিত হয়েছে এক লক্ষে।

এই অর্ধশতাব্দীকালে শুধু অর্থনৈতিক আর সমাজনৈতিক অধঃপতনই নয়, সমান্তরালে সংঘটিত হচ্ছিল আর এক মর্মন্তুদ অবক্ষয়: সাংস্কৃতিক দেউলিয়াপনা!

প্রাগ্-মুসলমান যুগে ভারতবর্ষে যে সংস্কৃতির কাঠামো ভারতীয় সমাজ তথা ধর্মকে ধরে রেখেছিল তাকে বলি: ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। সে কালের জ্ঞানমার্গী ব্রাহ্মণ আচার্যের দল সমাজের কাছ থেকে যে খুদকুঁড়ো গ্রহণ করতেন, দান করতেন তার চেয়ে অনেক বেশী।

'তিন্তিড়ি-পল্লবের' ব্যঞ্জনেই তাঁদের তৃপ্তি—নিরলস নিষ্ঠায় সমাজের নানাবিধ 'অনুপপত্তি' বিদূরিত করতেন তাঁরা। তাঁদের ধর্মপত্নীরাও অশন-ব্যসনের প্রত্যাশী ছিলেন না—তাঁদের মাথার সিঁদুর আর হাতের শাঁখাই নবদ্বীপ-মহিষীর অলঙ্কার-প্রাচুর্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত!

সেই সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য ছিল—সামূহিক সামাজিক উন্নতি। আপামর জনসাধারণের শুধু

ইহলোক নয়, পরলোকের উন্নতিবিধান। মানুষের অভাববোধ ছিল অল্প। আত্মসন্তুষ্টি তাদের অন্তরের গভীরে। যে-যার বৃত্তিতে চতুর্বর্গের ফললাভের চেষ্টা করত—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

বঙ্গসংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল মুসলমান আধিপত্যের পরে। শাসিত সম্প্রদায়ের—অর্থাৎ সংখ্যাগুরু হিন্দুদের ইহলোকের উন্নতির আশা আর রইল না। হতাশার ধর্মই হচ্ছে অলৌকিকত্বে আস্থাশীল হয়ে পড়া। ফলে তারা পার্থিব কামনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীকে তো ছাড়লই তদুপরি সরস্বতীও তাদের ত্যাগ করে গেলেন।

ইহকাল পরকাল দুইই গেল।

ব্রাহ্মণ আচার্যের স্থলে বৃহত্তর বঙ্গসমাজে এসে আসর জমালেন টুলো-পণ্ডিতের দল। গুরু, কুলপুরোহিত, তান্ত্রিক, ডাকিনী-যোগিনী বিদ্যায় পারঙ্গমের দল। বিদ্যার স্থানে অবিদ্যা।

নগরকেন্দ্রিক সভ্যতায় আবার কিছুটা রকমফেরও হল—মুর্শিদাবাদ, শহর কলকাতায়, বর্ধমানে বা নবদ্বীপরাজের নূতন রাজধানী কৃষ্ণনগরে। এসব স্থলে প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করল—বৈশ্যসমাজ। বিশেষ করে কলকাতায়। সমাজপতি না হলেও সমাজের কর্ণধার হয়ে পড়ল এক কায়স্থ-সমাজ। টুলো-পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা কায়স্থসেব্য হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নৈবেদ্যচূড়ার সন্দেশটির মতো শোভা পেতে থাকেন। হিন্দু বণিক-কায়স্থরা হল সমাজের মেরুদণ্ড। বৈশ্য-সম্প্রদায়ের অপরাপর লোকেরা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এ-সমাজ পূর্বযুগের মতো বর্ণাশ্রম-ধর্মের কাঠামোয় গড়া নয়। আর্থিক সঙ্গতিই এই সমাজের জিয়নকাঠি-মরণকাঠি। কলকাতায় তা ছিল ইংরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, ঢাকা বা কৃষ্ণনগরে এই রূপান্তর পূর্বযুগ থেকেই ধীরে ধীরে দেখা গিয়েছিল ভিন্নতর হেতুতে—

মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁর মুসলমান রাজকর্মচারীদের উপর আস্থা রাখতে পারতেন না। সঙ্গত কারণে। মুসলমান কর্মচারীরা অনেকসময় আদায়ী রাজস্বের হিসাব দিতে পারত না। হেতু দ্বিবিধ—অশিক্ষা এবং অসাধুতা। মুর্শিদকুলী তাই গোটা বাঙলাদেশকে তেরটি প্রধান বিভাগে বা চাকলায় ভাগ করেছিলেন। তিনি বেছে বেছে বিশ্বস্ত হিন্দু কর্মচারীদের নিয়োগ করতেন—যারা হিসাব বোঝে, হিসাব দিতে জানে এবং পরস্বাপহারক নয়। এই জাতীয় লোক ক্রমাগত নিয়োগ হতে থাকে ইজারাদার বা দেওয়ানী বিভাগে। ঐ সব ইজারাদার রাজস্বের অতিরিক্ত যদি কিছু উপার্জন করত তাতে চোখ বুঁজে থাকলেই হল। এই ইজারাদার-প্রথা প্রবর্তনের পিছনে আরও একটি মর্মন্তুদ হেতু আছে। মর্মন্তুদ এজন্য যে, তার সুদূরপ্রসারী ফল সমাজের উপর পড়েছিল।

শাসকদল হঠাৎ বুঝে ফেললেন যে, এতাবৎকালের জমিদারবৃন্দ প্রকারান্তরে প্রজার মঙ্গল চাইতেন। কেন? অনেকগুলি হেতুতে। প্রথমত তাঁরা গ্রামেই বাস করতেন—প্রজাদের সুখ-দুঃখের ছিলেন ভাগিদার। অজন্মা-দুর্ভিক্ষ-বন্যা তাঁদের প্রত্যক্ষ সত্য। খাজনা মাপ করা তাঁদের একটা বাতিক! দ্বিতীয় কথা—যে হাঁস বছর বছর সোনার ডিম পাড়ে তার মাংস খেতে তাঁরা নারাজ। ভূস্বামীর সঙ্গে কৃষিজীবীর—মন্দিরচূড়া আর বনিয়াদ—একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ছিল। মূর্খ জমিদারগুলো কিছুতেই বুঝতে পারে না যে, এক ঝাঁক স্বর্ণডিম্বপ্রসূ হংসের বিলোপে আর এক ঝাঁক এসে হাজির হবে পরবর্তী প্রজন্মে!

তাই শাসকশ্রেণী প্রবর্তন করল 'ইজারাদারী' ব্যবস্থা। ইজারা যে নিচ্ছে সে যে গ্রামে থাকবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। নায়েব-গোমস্তা-পাইক পাঠিয়ে সে রাজস্ব আদায় করবে। রাজা-প্রজা সম্পর্কের সূত্রে মহানুভবতা দেখানোর বাতিক তাদের থাকবে না। দোল-দুর্গোৎসবে আপামর জনসাধারণকে ডেকে পাত পাড়তে বলবে না নিজ ভদ্রাসনে। গ্রাম্যজীবনের বাহিরে থেকে আদায় করে যাবে প্রাপ্য—দেখবে না, ওরা কিসের বিনিময়ে কী-ভাবে খাজনা দেয় 'আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে' না 'বুকের রক্ত দিয়ে!'

ধীরে ধীরে সে-কালীন ভূস্বামীদের অবসান হয়ে আসে। তার পরিপূরকরূপে আবির্ভূত হতে থাকে ইজারাদারেরা—পরবর্তীকালে বঙ্গভূমে অত্যাচারী 'জমিদার' নামক যে সমস্ত রক্ত-শোষকের আবির্ভাব হয়েছিল তারা এই অষ্টাদশ-শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইজারাদারদেরই বংশধর।

সোঞাই গ্রামখানি উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘায়ত। দামোদর নদের দক্ষিণ বরাবর। ভদ্রপল্লী সবই এই তটে। ও পারে—উত্তর পাড়ে, জল-অচল অচ্ছুৎদের বাস। উত্তরে অজয়, দক্ষিণে দামোদর। দুটিই পূর্বাভিমুখী। অচ্ছুতেরা পারানি-নৌকায় নিত্য এ পারে আসে রুজি-রোজগারের ধান্দায়। এক ক্রোশ উজানে একটি মুসলমান পল্লী—পীরপুর। এ পারে ঘননিবদ্ধ একটি ব্রাহ্মণ পল্লী। রাঢ়ী সম্প্রদায়ই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিছু দূরে কায়স্থ পাড়া, আর ভাটিতে বেশ কতকগুলি তন্তুবায় পরিবার। গ্রামের সীমানা—পশ্চিমে তেঁতুলবট, পূর্বে ভোলাবাবার মন্দির।

দামোদর—শুধু দামোদরই বা কেন, অজয় নদেরও তখন প্রকৃতি ছিল ভিন্নতর। 'হিরোসিমা' বা 'ক্র্যাকাটোয়া' জাতীয় ভৌগোলিক নামগুলি শুনলেই যেমন আমাদের চিন্তাজগতে উদয় হয় 'বিস্ফোরণ' শব্দটা, তেমনি সে-আমলে 'দামোদর', এই ভৌগোলিক নামটির সঙ্গে 'বন্যা' শব্দটা অঙ্গাঙ্গি-সম্পর্কে যুক্ত ছিল না। তার হেতুটা সহজবোধ্য। তখনো ঐ প্রাকৃতিক আশীর্বাদটিবে মানুষ শৃঙ্খলিত করেনি। বর্ষায় বন্যা হত না, হত—জলস্ফীতি। ভাদ্র-আশ্বিনে। দুই কূল ছাপিয়ে দামোদর প্রবেশ করত গ্রামে। আপাতদৃষ্টিতে আদিগন্ত সমুদ্র। কিন্তু জলের গভীরতা সামান্য। ঘরবাড়ি ডুবিয়ে, তালগাছ ছাপিয়ে নয়। দামোদর—ভুললে চলবে না, নদী নয়, নদ। অজয়ও তাই। তারা সে-আমলের নৈকষ্য কুলীন নদ! বৎসরান্তে শ্বশুরবাড়িতে আসত। আদিগন্ত কৃষিক্ষেত্র মাথায় সিঁদুর আর হাতে শাঁখা নিয়ে গোটা বছর তার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকত। পলিমাটির আশীর্বাদে সেই শবরীর-প্রতীক্ষারতাদের দামোদর আর অজয় সার্থক করে যেত। সন্তান জন্মাতো পাকা ধানের মাথায় মাথায়। বন্যার জল ভেঙে যখন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেত গ্রাম্যবধূরা তখন তাদের হাঁটুর উপর শাড়ি তুলতে হত না। দামোদরের আশীর্বাদে পেট ভরে তারা ভাতও খেতে পারত।

সে-আমলে নৈকষ্যকুলীন দামোদর রাঢ়-শাশুড়ী ঠাকরুনের সেই কন্যা-বিদায়কালীন মিনতিটুকুর মর্যাদা দিত: 'আঁটু ঢাকি বস্ত্র দিহ, পেট ভরি ভাত।'

ভৌগোলিক বিচারে সোঞাই পুব-পশ্চিমে দীর্ঘায়ত হলেও অর্থনৈতিক আর সামাজিক জ্যামিতির ছকটা ছিল ত্রিকোণাকৃতি। সমকোণী ত্রিভুজ। শীর্ষবিন্দুটি সাবেক জমিদার

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ভাদুড়ী, আর ত্রিকোণভূমির দুই প্রান্তের দুই কোণে দুটি 'হঠাৎ-নবাব'—নন্দ চাটুজ্জে আর দুর্গা গাঙ্গুলী।

আসুন, একে একে পরিচয় করিয়ে দিই: ব্রজেন্দ্রনারায়ণ সাবেক ভূম্যধিকারী। চার পুরুষে সোণ্ড়াই গ্রামের ভূস্বামী। ব্রজেন্দ্রের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ ঠিক কী হেতুতে তাঁর বরেন্দ্রভূমের সাবেক আবাস ছেড়ে এই রাঢ়খণ্ডে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেটা ইতিহাসের একটা অনুদ্ঘাটিত অধ্যায়। সাবেক জমিদারবাড়ি ঘিরে একটি বারেন্দ্রপাড়া। খোঁজ নিলে দেখা যাবে সেইসব ভদ্রাসনের আদি-পুরুষেরা এসেছিলেন ঘরজামাই হিসাবে। ক্রমে আর্থিক সঙ্গতি লাভের পর নিজ-নিজ ভদ্রাসন নির্মাণ করেছেন। ব্রজেন্দ্রনারায়ণের বৃহৎ পরিবার। দিনে, দুবেলায় অন্তত পঞ্চাশটি পাতা পড়ে। তাঁর গৃহে দোল-দুর্গোৎসব হয়। জমিদার বাড়ির ভিতরেই আছে একটি দেবালয়—শিবমন্দির। নিত্যপূজার ব্যবস্থা। ভাদুড়ীদের কীর্তি সোণ্ড়াই গ্রামের চতুর্দিকে ছড়ানো—নীল সায়র, পদ্মদীঘি, চতুষ্পাঠী এবং গ্রামপ্রান্তে সর্বসাধারণের জন্য ভোলাবাবার মন্দির।

নন্দ ও দুর্গা 'হঠাৎ-নবাব' হয়েছেন মাত্র এক-পুরুষে। সম্পত্তি তাঁদের স্বোপার্জিত। তাঁরা দুজনেই এ গ্রাম্য-সমাজের মাথা। তাঁদের যৌথ নিদানই ইদানীং গ্রামবাসীর কাছে বেদবাক্য। এক-পুরুষ আগেও ব্রজেন্দ্রনারায়ণের পিতৃদেব ছিলেন এ গ্রামের একজন সমাজপতি। ব্রজেন্দ্র সম্প্রতি স্বেচ্ছায় সে অধিকার ত্যাগ করেছেন। দুটি হেতুতে। প্রথমত তিনি নির্লিপ্ত থাকতে চান, দ্বিতীয়ত দুই 'হঠাৎ নবাব' উঠে পড়ে লেগেছেন প্রমাণ করতে যে, এই রাঢ়ভূমে ঐ কয়টি পরিবার বহিরাগত। ওদের লৌকিক আচার-বিচার ভিন্নতর। ওদের কুশণ্ডিকা পর্যন্ত হয় বরের বাড়িতে, কন্যাগৃহে নয়! এঁরা দুজনেই রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, এঁদের কৌলীন্য যাবৎচন্দ্রার্কমেদিনী না হলেও সেই বল্লাল সেন অথবা আদিশূরের আমল থেকে! বল্লাল আর আদিশূরের মধ্যে কে যে বয়োজ্যেষ্ঠ সেটা ওঁরা ঠিক মতো জানেন না—মোটকথা সেই প্রাচীনতর আমল থেকে। জমিদার যে 'বারিন্দির' এই সহজ কথাটা এতদিন বেমালুম ভুলে ছিল এই রাঢ়ভূমের ব্রাহ্মণ সমাজ। এতদিনে ওঁরা সে তত্ত্বটা বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু গেঁয়ো ভূতগুলো গাধারও অধম। বোঝে না, অর্থকৌলীন্যে ওঁরা দুজন একপুরুষেই ব্রজেন্দ্রর কাছাকাছি উন্নীত হয়ে পড়েছেন। ঐ দুই 'হঠাৎ-নবাব'কে দেখলে গাঁয়ের মানুষ ঘাড় নিচু করে 'পাতঃপেন্নাম' জানায়, আর দূর থেকে সাবেক জমিদার-মশায়ের পালকি আসতে দেখলে আজও সাষ্টাঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

নন্দ চাটুজ্জে উপ-ইজারাদার। অর্থাৎ বর্ধমান শহরের ধনকুবের নরেশ দত্তের তরফে রাজস্ব আদায় করে থাকেন। ক্রমে ক্রমে মাছের তেলে মাছ ভাজতে শুরু করেছেন। ব্রজেন্দ্র অনেকগুলি মহাল ছেড়ে দিয়েছেন—ক্রমশই যেন জমিদারী সঙ্কুচিত করে আনছেন। হয়তো এ গ্রাম ত্যাগ করে যাবারই একটা গোপন বাসনা আছে তাঁর। দুই নবীন প্রতিযোগীর আরও কিছু অর্থাগমের ব্যবস্থা আছে। নন্দ ইজারা নিয়েছেন দামোদরের পারানি-ঘাট ও বাজার। হাটে যা বিকি-কিনি হয় তার উপর খাজনা আদায় করেন, ধান-চালের উপর 'কোহালী' পান। গ্রামে কেউ স্থাবর সম্পত্তি কিনলে 'সেলামি' দিতে হয়। কোন বিয়ে-সাদি হলে ইজারাদারকে বরপক্ষ দেন দেড়টাকা, কন্যাপক্ষ তিনটাকা। এসবকিছুই আদায় হয় মূল ইজারাদার নরেশ দত্তের

নামে। নন্দ চাটুজ্জে একটি কমিশান পান মাত্র। তহ্‌শীলদার ইত্যাদির বেতন তাঁকে দিতে হয় না। সেটাও ইজারাদারের দেয়।

গাঙ্গুলীমশাই নিয়েছেন তন্তুবায়দের শোষণ-দায়িত্ব। পাঁচখানা গ্রামে যা কিছু উৎপন্ন হয় তার তুলোর যোগান থেকে উৎপন্ন-দ্রব্যের বিক্রি-ব্যবস্থা গাঙ্গুলীর। গো-গাড়ির সারি প্রথমে যায় উত্তর-মুখো। অজয়ের তীর পর্যন্ত। তারপর নৌকাযোগে পুবমুখো—ইলামবাজার, কাটোয়া, ফরাসডাঙা, মায় শহর কলকাতা। ফেরার পথে নৌকা নিয়ে আসে লবণ আর গঙ্গাজল। দুটিই এ গ্রাম্যজীবনে আবশ্যিক উপাদান। লবণ-এর মহাজনী নৌকা দু-দিন দেরি করে এলে তবু জীবনযাত্রা থেমে থাকবে না—কাঁচা ফলার বা আলুনিব্যঞ্জনে জীবনধারণ করা সম্ভব। কিন্তু এই নিগঙ্গার দেশে গঙ্গাজল না পেলে যে সূয্যি ঠাকুরও মাঝ-আকাশে থমকে দাঁড়িয়ে পড়বেন! ঠগ-জুয়াচোরের তো আকাল পড়েনি—তাই গাঙ্গুলী-মশায়ের গঙ্গাজলের কলসি গোটা এলাকায় বিক্রি হয়। বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া মায় জঙ্গলমহল। কলসির মুখ গামছা দিয়ে বাঁধা। দড়ির গ্রন্থির উপর গাঙ্গুলীমশায়ের 'আগমার্ক' ছাপ। সীলমোহর ছাপ দেন ইমানদার ব্রাহ্মণ!

ক্রমে ক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ছেন ব্রজেন্দ্রনারায়ণ। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' প্রবাদবাক্যটা সমঝে নিতে না পারায়।

পশ্চিমাকাশের দিকে একবার দৃক্‌পাত করে মৌলবী-সাহেব বললেন, শাম-ওয়ক্ত হয়ে গেল নাকি?

—না। সূর্য মেঘে ঢাকা পড়েছে। সূর্যাস্তের এখনও বাকি আছে। আপনার নামাজের সময় হয়নি।

—তা হোক। আজ এই পর্যন্তই থাক। আপনার গৃহে একজন মেহ্‌মান আসছেন, মনে হচ্ছে।

পুঁথিপত্র বেঁধে নিতে থাকেন মৌলভী-সাব।

কথা হচ্ছিল রূপেন্দ্রনাথের দাওয়ায়। প্রত্যেক দিন অপরাহ্নে মৌলবীসাহেব আসেন ওঁকে আরবী-ফার্সী শেখাতে। রূপেন্দ্রনাথ বর্ধমানের একজন প্রতিষ্ঠাবান মুসলমান ভেষগাচার্যের কাছে হাকিমী-বিদ্যা শিখতে ইচ্ছুক। তার পূর্বে ঐ দুটি ভাষা গ্রামে বসেই আয়ত্ত করতে চান। পীরপুরের মৌলভীসা'ব এ দায়িত্বটা গ্রহণ করেছেন। প্রত্যহ পড়ন্ত-বেলায় তিনি আসেন—জুম্মাবার বাদে—সূর্যাস্ত পর্যন্ত চলে ওঁদের ভাষাশিক্ষার আসর। তার পর জগুঠাকরুণ কিছু ফলমূল-বাতাসা নিয়ে আসেন, একগলা ঘোমটা টেনে। মৌলভীসাব পদ্মদীঘিতে অজু সেরে নামাজ পড়েন, তারপর ঐ দেবতার প্রসাদটুকু মুখে ফেলে বিদায় নেন। দামোদর পার হয়ে পীরপুরের দিকে।

মেহমানের উল্লেখে রূপেন্দ্রনাথ মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন। হ্যাঁ, ঠিকই। নন্দদুলাল চাটুজ্জে। বিচিত্র পোশাক তাঁর। পরিধানে যদিচ ধুতি, কাছা-কোঁচা দেওয়া, তবু তার উপর ঘাগরা জাতীয় একটি অতি সূক্ষ্ম আবরণ, মধ্যদেশে রজ্জুবদ্ধ। ঊর্ধ্বাঙ্গে পুরোহাতা বেনিয়ান। কণ্ঠে একটি মুক্তার মালা। মাথায় শামলা, যদিচ পশ্চাদ্দেশে শামলার বাইরে বার হয়ে আছে দীর্ঘ শিখার প্রান্তদেশ। তার শেষপ্রান্তে একটি অপরাজিতা অনুবিদ্ধ। তাঁর পিছন পিছন তালপাতার ছাতা ধরে আসছিল দোবেজি—ওঁর দেহরক্ষী-তথা-খিদমদ্‌গার। রোদ নেই এই সন্ধ্যাকাশে, বৃষ্টিও নেই। তবু আনুষ্ঠানিকভাবে ছত্রধারী অনুগমন করছে।

রূপেন্দ্রনাথ মাদুর ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। মৌলবীসাবও দ্রুতহস্তে মাদুরটা গুটিয়ে নেন। দাওয়া থেকে নিচে নেমে দাঁড়ান। রূপেন্দ্রনাথ সবিনয়ে যুক্তকরে বলেন, আসুন, আসুন, চাটুজ্জে কাকা। মৌলবী-সাবও মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন, আদাব।

দোবেজি ছাতা নিয়ে অন্তরালে সরে যায়।

নন্দ বলেন, 'আসুন, আসুন,' মুখে তো বলছ রূপেন, কিন্তু যাই কী করে?

তর্জনী-সঙ্কেতে দাওয়ার দিকে কী-যেন দেখালেন। রূপেন্দ্রনাথ বুঝে উঠতে পারেন না। তালপাতায় বোনা মাদুর—যা বিছিয়ে ওঁরা দুজনে এতক্ষণ বিদ্যাচর্চা করছিলেন, স্পর্শদোষ বাঁচাতে সেটা তো মৌলবী-সাব ইতিপূর্বেই অপসারণ করেছেন। তাহলে? রূপেন্দ্রনাথ না বুঝলেও মৌলবী-সাব বুঝে ফেলেছেন, 'মাফি কিয়া যায়' বলে তিনি একপাশে সরে গেলেন। তাঁর ছায়াটিও যেন লজ্জা পেল, অনুগমন করল কায়ার। গৃহস্বামীকে বললেন, কাল আবাব একই সময়ে আসব।

দুজনকেই আদাব জানিয়ে বড় বড় পা ফেলে তিনি ঘাটের দিকে রওনা হয়ে যান।

এতক্ষণে সমস্যাটার পূরণ হল। অস্তাচলগামী সূর্যের আলোয় ঐ যবনের ছায়াটা দীর্ঘায়ত হয়ে পড়েছিল দাওয়ায়।

পাদুকা ত্যাগ করে নন্দ চাটুজ্জে উঠে এলেন দাওয়ার উপর। রূপেন্দ্র প্রণাম করার উদ্যোগ করতেই এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলেন, দূর থেকেই পেন্নাম কর বাবাজি, এই অবেলায় আর ছান করতে পারব না।

রূপেন্দ্র যবনের সঙ্গে একাসনে বসেছিলেন এতক্ষণ। একটা চৌপায়া টেনে নিয়ে নন্দ বসলেন। রূপেন্দ্র বসে পড়েন নিকানো দাওয়ায়। বৃদ্ধ বললেন, তুমি মায়ের ইচ্ছায় গাঁয়ে ফিরে এসেছ। খুবই আনন্দের কথা। রোজই ভাবি এসে দেখা করে যাব, সময় করে উঠতে পারি না।

রূপেন্দ্র কুণ্ঠিত হয়ে বলেন, আমারই যাওয়া উচিত ছিল, কাকা, কিন্তু ..

নন্দ কথা ঘোরালেন। প্রশ্ন করেন, উটি কে এয়েছিল? পীরপুরের কলিম-মোল্লা নয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মৌলভী কলিমুদ্দীন। ওঁর কাছে আমি আরবী-ফারসী শিক্ষা করি।

—খুব ভাল কথা বাবা, খুবই আনন্দের কথা। এই অং-বং-ভাষার জমানা গেছে। এখন উন্নতি করতে হলে ম্লেচ্ছভাষা শিখতেই হবে। একটু রপ্ত করে নাও, তারপর বড়কর্তাকে ধরপাকড় করে তোমাকে আমি মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেব। নবাব সায়েবের দরবারে 'বড়কর্তা' যে নরেশ দত্ত এটুকু বুঝলেন রূপেন্দ্র। মুর্শিদাবাদের দরবারে রুজি-রোজগারেব বাসনা যে তাঁর আদৌ নাই, একথা জানানোর প্রয়োজন বোধ করলেন না। তিনিও প্রসঙ্গান্তরে

চলে এলেন, খুড়িমারা ভাল আছেন? বাড়ির আর সবাই?

—তা পরের মুখে ঝাল খাবে কেন বাবা? সে তো তোমার নিজের বাড়ি। সৌরীনদা ছিলেন আমার বড় ভাইয়ের মতো। বলতে গেলে একই পরিবার। তুমি বরাবর বিদেশে ছিলে বলেই ...

ইতিমধ্যে জগুঠাক্‌রুণ এসে দাঁড়িয়েছেন ভিতরের দরজার সামনে। পরনে থান, মাথায় আধো-ঘোমটা। সেখান থেকেই বলেন, কী সৌভাগ্য! চাটুজ্জে ঠাকুরপোর পদধূলি পড়ল আজ এ বাস্তুতে! বসুন, আমি একটু বেলের পানা আর নৈবেদ্যের কুচোকাচা কিছু নিয়ে আসি।

নন্দ হাত দুটি জোড় করে বলেন, ও-কথা বলবেন না জগু-দিদি। প্রসাদ গ্রহণ করতে পারছি না—এ-কথা মুখে উরুচ্চারণ করাও পাপ! কিন্তু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, মানে ...

জগুঠাকরুণ বলে ওঠেন, বুঝেছি! তা মতির মায়ের বাতের ব্যথাটা এখন কেমন আছে?

—ও তো তার বাকি জীবনের সাথী হয়ে রইল, দিদি। হরিমতি যদি মায়ের দায়িত্বটা নিতে না পারত তাহলে সংসারটা ভেসে যেত।

—মতি? সে তো নেহাৎ বাচ্ছা! কত বয়স হল তার?

নন্দ হাসলেন। বলেন, কুলীনের ঘরের অরক্ষণীয়ার বয়সের কেউ হিসাব রাখে, দিদি? তবে গৌরীদানের বয়স যে আর নেই তা তো আপনিও জানেন। একপক্ষে এ ভালই হয়েছ। আমার তো আরও তিনটি কন্যা আছে। গৌরীদানের পুণ্য পরেও অর্জন করতে পারব। কিন্তু হরিমতি আমার সংসারে না থাকলে সব ভেসে যেত! দারুণ বুদ্ধিমতী! সবদিকে তার নজর। জানেনেই তো, দৈনিক আমার বাড়িতে দু-বেলায় দেড়কুড়ি পাতা পড়ে। হরিমতির মা তো দেখা-শোনা করতে পারে না, সব ব্যবস্থা ঐ হরিমতির। এদিকে সংসার, ওদিকে মায়ের সেবা, আবার মায়ের নিত্যপূজার যোগান। আমি অবাক হয়ে ভাবি—কেমন করে মেয়েটা এমন দশভুজা হয়ে উঠল? সবই সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা! তারা—তারা—মা!

জগু-ঠাক্‌রুণ মনে মনে হাসছিলেন। চাটুজ্জে-বাড়ির হক হদিস্ তাঁর অজানা নয়। নন্দ-চাটুজ্জের তিন তিনটি পত্নী। সংসারের যাবতীয় দায়ঝক্কি ওঁর নিঃসন্তানা বড় বউয়ের। স্বামীর অধিকার হারিয়ে সেই সন্তানবঞ্চিতা সংসারটিকেই আঁকড়ে ধরেছেন। উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন—অথবা কে-জানে হয়তো বিবাহিতযুগের উষাকালের স্মৃতিচারণে তাঁর অবকাশ কাটে। মেজবৌ—হরিমতির মা—বাতে পঙ্গু। পড়ে আছে সংসারের একপ্রান্তে। নন্দ চাটুজ্জের নয়নের মণি এখন তৃতীয়পক্ষ। সে ঐ কাতুর চেয়ে দু-এক বছরের বড় হবে হয় তো। কী উদ্দেশ্যে বড় মেয়েটির গুণগানে আজ চাটুজ্জে মশাই চর্তুমুখ ব্রহ্মা সেজেছেন তা বুঝতে বাকি থাকে না। কথা ঘোরাতে বলেন, আপনি এসে পড়েছেন, ভালই হল, অমাবস্যার পারণ কি কাল না পরশু?

—কালই দিদি। আর সেজন্যই তো আসতে হল। মঙ্গলবারে অমাবস্যা পড়েছে; তাই মায়ের পূজার সামান্য আয়োজন করেছি। পূজা তো সারারাত ধরে, পর্শু রূপো-বাবা দ্বিপ্রহরে আমার ওখানে মহাপ্রসাদ পেয়ে আসবে। মাত্র দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ সেবা করব। তার ভিতর একজন আমাদের রূপেন। আপনাকে অনুমতি দিতে হল, দিদি।

জগুঠাকরুণ আড়-চোখে একবার ভাইপোকে দেখে নিয়ে বলেন, আমার অনুমতি আবার কিসের? ওকেই বলুন?

—ওকে তো বলবই। তবু আপনি যখন আছেন মাথার উপর...তা, বাবা রূপেন, তুমি আসবে। কেমন? 'গুন্‌তির বামুন', যেন অন্যথা না হয়।

রূপেন্দ্রনাথ যুক্তকরে বলে ওঠেন, আপনার ভদ্রাসনে পাত পাতব এ তো আমার সৌভাগ্য; কিন্তু এবার আমাকে মাপ করতে হবে, কাকা। অন্য কোন দিন...

ভ্রূকুঞ্চিত হল নন্দ চাটুজ্জের। প্রশ্ন করেন, কেন, বলত?

—সৎ শাক্ত ব্রাহ্মণ আপনি অনায়াসেই গ্রামে জোগাড় করতে পারবেন। আমি পেশায় কবিরাজ—কেউ ডাকতে এলে 'যাব না' বলতে পারব না তো। আপনি 'গুন্‌তির বামুন' বললেন কি না—

—বেশ, না হয় আমি তোমাকে 'গুন্‌তির বামুন' হওয়ার বিড়ম্বনা থেকে অব্যাহতি দিলাম। রুগী-পত্তরের ঝামেলা মিটিয়ে নিশ্চয় যাবে, কথা দাও?

রূপেন্দ্রনাথ তখনও যুক্তকর। বলেন, এবার থাক, কাকা।

পুনরায় ভ্রূকুঞ্চিত হল নন্দর। বললেন, তোমার বাবা, তোমার ঠাকুর্দা দুজনেই ছিলেন শাক্ত। তুমি কি বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছ?

—আজ্ঞে না। দীক্ষা আমি গ্রহণ করিনি।

—তাহলে? আপত্তিটা কিসের?

রূপেন্দ্র ইতস্তত করে বললেন, দেখতেই তো পেলেন, আমি আচার-বিচার ঠিক মতো মানি না। মায়ের পূজার আয়োজন করেছেন, সেখানে আমার না যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। কোথায় ছোঁওয়া-ছুঁয়ি হয়ে যাবে।

নন্দ দৃঢ়স্বরে বলেন, যাবে না। আমি গঙ্গা-জল ছিটিয়ে দেব তোমার মাথায়। তবে একথাও বলি, রূপেন—ঐ মোছলমানের সঙ্গে এক মাদুরে ভর সন্ধ্যেবেলায় তোমার ওভাবে বসাটা ঠিক নয়। মোছলমানদের ভাষা শিখছ ভাল কথা—ওটা না আয়ত্ত হলে নবার সরকারে পাত্তা পাবে না। দলিল দস্তাবেজ সবই ঐ যাবনিক ভাষায়। কিন্তু তাই বলে একাসনে বসা...তুমি এক কাজ কর। কলিম মোল্লা এলে ঐ তেঁতুলবটের ছায়ায় গিয়ে দুজনে বস। মহামতি বিদুর একবার ধম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন যে, ভূমিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আসন! বুঝলে না বাবা?

রূপেন্দ্রনাথ বুঝলেন। 'ধর্ম' শব্দটা 'উরুশ্চারণ' পর্যন্ত যিনি করতে পারেন না, মহাভারতটাও যিনি পড়েননি—ভাসা-ভাসা শুনেছেন, তিনিই আজ সমাজপতি!

—আজ, উঠি। কেষ্টপক্ষের রাত। এখনি সব আঁধার হয়ে যাবে। —তাহলে ঐ কথাই রইল। যত বেলাই হক, রুগীপত্তর সব মিটিয়ে তুমি দুপুরে আমার ওখানে আসবে। বিকাল হয়ে যায়, তাই সই! কেমন?

গাত্রোত্থান করলেন এবার। রূপেন্দ্রও উঠে দাঁড়ান। মৃদুভাবে বলেন, আমি তো আগেই বলেছি কাকা—কিছু বাধা আছে। পরে একদিন আপনার বাড়িতে অন্নগ্রহণ করে আসব।

নন্দ স্পষ্টতই বিরক্ত। ওর একগুঁয়েমিতে। কী ভেবেছে ছোকরা? ওঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ধন্য করে দিচ্ছে? সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, বাধা আছে তা বলেছ, কিন্তু 'বাধাটা' কী, তা তো বলনি। তুমি শাক্তবংশের সন্তান, মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে বোষ্টমও হওনি! তাহলে এই জেদাজেদির অর্থ কী?

জগুঠাকরুণ দাঁড়িয়ে আছেন তখনো। অন্দরমহলের দ্বারদেশে। ভ্রাতুষ্পুত্রের এই একগুঁয়েমির অর্থটা তিনিও প্রণিধান করতে পারছেন না। হতভাগাটা কী ভাবছে? চাটুজ্জে বাড়িতে নিমন্ত্রণ রাখতে গেলে ওরা জোর করে ঐ হরিমতিকে সাতপাক ঘুরিয়ে দেবে? সে এখনো নীরব আছে দেখে তিনি বলে ওঠেন, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যান ভাই। আমি ওকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে পাঠিয়ে দেব। আর নেহাৎ না যায় তো নাই গেল, ও তো আর 'গুনতির বামুন' থাকছে না!

নন্দদুলাল নিজেকে অপমানিত বোধ করেন। করার কথাও। ঐ একফোঁটা ছোকরা ভেবেছে কী? গম্ভীর হয়ে বলেন, না, দিদি। ব্যাপারটা অত সহজে মিটবে না। আমি এই সোঞাই গাঁয়ের সমাজপতি। আমাকে জেনে যেতে হবে। দু-পাতা সমস্কৃত পড়ে ও এমন দিগ্গজ পণ্ডিত হল কী করে যে, আমার বাড়ির নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে? মায়ের প্রসাদ মুখে দেব না বলে!

জগুঠাকরুণ শিহরিতা হয়ে ওঠেন। এ কোথা থেকে কী হতে বসেছে! নন্দ চাটুজ্জে এ গাঁয়ের মাথা। ইচ্ছে করলে হাতে মাথা কাটতে পারেন। সত্যই তো! এভাবে মানী লোকটাকে অপমান করার কী অর্থ? বজ্রগম্ভীর স্বরে ডাকেন, রুপো!

রূপেন্দ্রনাথ এখনো যুক্তকর! শান্তস্বরে বলেন, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন কাকা! আপনার নিমন্ত্রণ আমি প্রত্যাখান করিনি। কেন করব? আপনি আমার পরমপূজ্য—সোঞাই গ্রামের সমাজপতি। ভবিষ্যতে যেদিন ডাকবেন, আমি আপনার বাড়িতে পাত পেড়ে খেয়ে আসব।

—কেন? ভবিষ্যৎ কেন? কেন পর্শু নয়?

রূপেন্দ্রনাথ বলেন, সে-কথা থাক না, কাকা!

—না! থাকবে না! আমাকে জেনে যেতে হবে! আমার জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। কেন থাকবে?

—কথাটা অপ্রিয়। অহেতুক আপনাকে আঘাত দিতে চাই না বলে। আপনার ধর্ম আপনার, আমার ধর্ম আমার। কী প্রয়োজন বিরোধের সৃষ্টি করে?

নন্দ চাটুজ্জে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। তিক্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন, তোমার বাবা কিন্তু এমন মিন্‌মিন্ করতেন না রূপেন। সত্যিকথা মাথা খাড়া রেখে বলবার হিম্মৎ ছিল তাঁর। তোমার ঠাকুর্দাও ছিলেন স্পষ্টবক্তা। সেই বংশের ছেলে হয়ে তুমি যে সত্যিকথা বলতে ভির্মি খাও—সেই বাঁড়ুজ্জে-বংশের ভিটেয় দাঁড়িয়ে···

রূপেন্দ্রনাথের চোখ দুটি জ্বলে ওঠে। বলেন, থাক! 'মাব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্' নীতির নির্দেশেই এতক্ষণ আপনাকে দাগা দিতে চাইনি। কিন্তু আপনি আমাকে বাধ্য করলেন। তাই বলছি, আমি 'মহাপ্রসাদ' গ্রহণ করি না।

বজ্রাহত হয়ে গেলেন নন্দদুলাল!

বেশ কিছুটা সময় লাগল তাঁর স্বাভাবিক হতে। তারপর পাশে ফিরে দেখলেন জগুঠাকরুণও দারুমূর্তিতে রূপান্তরিতা। নন্দ তাঁকে বললেন, একটু আগে আপনার ভাইপোকে বলছিলুম, পায়ে হাত দে পেন্নামটা করিসনি রূপেন, এই অবেলায় ছান করলে শরীর খারাপ হবে। তা আপনার ভাইপো এই বুড়ো মানুষটাকে ভরসন্ধ্যে বেলায় ছানটা করিয়েই ছাড়ল। যে কথা

এইমাত্র শুনলুম, তারপর স্নান না করে তো বাড়ির চৌকাঠ মাড়াতে পারব না!

জগুঠাক্‌রুণ সে-কথার জবাব না দিয়ে ভাইপোকেই প্রশ্ন করেন, এত বড় কথাটা তুই বল্‌লি? শাক্ত বংশের সন্তান হয়ে? কিন্তু কেন, কেন, কেন?

রূপেন্দ্রনাথ এখনো যুক্তকর। শান্তকণ্ঠে বলেন, সময়মতো তা আপনাকে বুঝিয়ে বলব, পিসিমা। অনেক সময় লাগবে।

নন্দ চাটুজ্জে চৌপায়াটা আবার টেনে নেন। বসে পড়েন। ইতিমধ্যে পিলসুজের উপর প্রদীপটা বসিয়ে কাত্যায়নী এসেছিল একবার। হাওয়া বাঁচিয়ে কপাটের আড়ালে প্রদীপটা রেখে সেও কাঠ হয়ে অপেক্ষা করছে। দাদাকে সে ভালবাসে, শ্রদ্ধাও করে, কিছু না বুঝেও। কথোপকথন সব কিছুই কানে গেছে তার। নন্দ বললেন, যদি সারারাতও লাগে তবু ব্যাখ্যাটা আমাকে শুনে যেতে হবে। বল? তুমি আমিষ আহার কর না?

—করি। খাদ্য-খাদকের এই সম্পর্ক জীবজগতে অনস্বীকার্য! এমন একটা ব্যবস্থাপনা কেন যে করেছেন দিন-দুনিয়ার মালিক, তা জানি না। তাই মৎস্য ও মাংস দুইই আমি ভক্ষণ করে থাকি। তবে মাংসের ক্ষেত্রে ঐ যাকে আপনার বলেন 'বৃথা মাংস' শুধু তাই আহার করি। নৈতিক কারণে আপনারা যাকে বলেন 'মহাপ্রসাদ'......

—থাক! বারে বারে একই কথা বলতে হবে না। কিন্তু কেন?

রূপেন্দ্রও বসে পড়েছেন ভূশয্যায়। বলেন, বেশ, শুনুন। শক্তি উপাসনা এই ভারত ভূখণ্ডে অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। ত্রিবেণীতে থাকতেই আমি গুরুদেবের সংগ্রহে অনেক শাক্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি। মধ্যযুগে রচিত তারাতন্ত্র, তারা-রহস্য, রুদ্র-যামল-তন্ত্র, চীনাচার প্রয়োগবিধি ইত্যাদি পুঁথি রচনার বহু বহু পূর্বযুগ থেকেই শক্তিপূজার আয়োজন ছিল। আদিযুগে পশুবলির ব্যবস্থা ছিল না। আদিযুগের শক্তি উপাসকেরা নির্দেশ দিতেন, মায়ের বেদীর সম্মুখে যূপকাষ্ঠে বলি দিতে হবে অন্তরের ষড়রিপুকে—কাম, ক্রোধ লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য! ক্রমে ঐ ষড়রিপুকে বলিদানের প্রতীক হিসাবে একটি ছাগশিশুকে বলিদানের আয়োজন হল। চীনাচারের প্রভাবে ক্রমশ শাক্ত পণ্ডিতেরা বিস্মৃত হয়ে গেলেন—মূল উদ্দেশ্যটা কী ছিল! ষড়রিপুকে নয়, ঐ ছাগশিশুকে হত্যা করার মধ্যেই তাঁরা মুক্তির পথ খুঁজতে শুরু করলেন! পঞ্চ মকারের পঙ্ককুণ্ডে ভেসে গেল তাঁদের শুভবুদ্ধি—ব্যভিচারের বন্যায়...

—ব্যস! থাক! তোমার ঔদ্ধত্যেরও একটা সীমা থাকা উচিত! —উঠে দাঁড়ালেন নন্দ!

রূপেন্দ্রনাথ মনের আবেগে কথা বলে যাচ্ছিলেন। এতক্ষণে নজর হল, বৃদ্ধ দু-হাতে দুই কান চাপা দিয়ে ধর্মব্যাখ্যা শুনছিলেন!

ওঁরা দৃষ্টিসীমার বাহিরে চলে যাবার পর হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন জগুঠাক্‌রুণ, কী পেয়েছিস্ তুই! হতভাগা, বাঁদর। যা মুখে আসে তাই বলবি?

রূপেন্দ্রনাথ ম্লান হেসে বলেন, বলতে তো আমি চাইনি, পিসি। আপনিই তো বাধ্য করলেন। আর তাছাড়া এই ভাল হল! ওঁরাও যে দেখছেন! শুনছেন!

কৃষ্ণাচতুর্দশীর নৈশাকাশের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে দেখান। এই ভদ্রাসনের পূর্বপুরুষদের অবশ্য দেখা গেল না। তবে সন্ধ্যাকাশে ফুটে উঠেছে সপ্তর্ষি। অত্রি-অঙ্গিরা-পুলহ-পুলস্ত...

১৩৪২

নন্দ চাটুজ্জের ভদ্রাসনে মহাপ্রসাদ কিছু বেশি পরিমাণে সেবা করা হয়ে গেছে। দুর্গাচরণ তাই জানিয়ে রেখেছেন, রাত্রে এক কুচো প্রসাদ মুখে দেবেন মাত্র। সন্ধ্যাহ্নিক সেরে তিনি উঠে এলেন ভিতরবাড়িতে। এত সকাল-সকাল সচরাচর তিনি বৈঠকখানা ছেড়ে আসেন না। সন্ধ্যায় তাঁর কাছে আসতে থাকে নানান দর্শনার্থী। অধিকাংশই তন্তুবায় পরিবার। তাদের নানান আর্জি, নানান দাবী-দাওয়া। আজ কিন্তু উনি এক প্রহর রাত না হতেই শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন। মৃন্ময়ী ঘরে ঘরে ধুনো দিচ্ছিল—বিশেষ করে শয়নকক্ষে। মশা প্রচণ্ড! সন্ধ্যাবেলায় ধুনো না দিলে ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে ঢুকে পড়ে। বামুনবাড়ি বলে রেয়াৎ করে না। দুর্গা ওকে কাছে ডাকলেন, শোন। এখানে এসে বস দিনি। কতা আছে।

—রসুন, তেলের বাটিতে এট্টু তেল গরম করে আনি।

—থাক না, ছুটকি। একদিন পদসেবা না করলে তোমার সগ্যের বাতি কমতি হবে না। বসো দিনি। দুটো প্রাণের কতা কই! আজ একটা ভারি মজার কতা শুনে এলুম চাটুজ্জেবাড়ি। তোমারে বলি।

মৃন্ময়ীকে উনি সচরাচর 'ছোট গিন্নি' নামে ডাকেন। আবেগ উথলে উঠলে—'ছুটকি'!

মৃন্ময়ী ওঁর নাগালের মধ্যে একটা তালপাখা এগিয়ে দিয়ে বলে, কী শুরু করলেন আপনি! সনঝে রাতে প্রাণের কতা: ঠাকুরপোর আহ্নিক এখনো সারা হয়নি। ঠাকুরঘরে অংবং করছেন।

—করুন। তুমি ইদিকে এস দিনি।

মৃন্ময়ী ওঁর চতুর্থপক্ষ। এ সংসারে এসেছে সম্প্রতি। এখনো বছর পোরেনি। নববধূই বলা চলে। তখন সে ছিল পঞ্চদশী। এক বছরেই ষোলকলা পুরেছে। ভাগ্যবতী বলতে যা বোঝায়। এই ভরভরান্ত গাঙ্গুলী পরিবারে রাজ-রাজেশ্বরী হয়ে এসেছিল একেবারে অসপত্ন-অধিকারে! কটা এয়োতি মেয়ের সে ভাগ্য হয়? বড়-সতীন—যদি আজও বেঁচে থাকেন—তাহলে পঞ্চাশোর্ধ্বা—দীর্ঘদিন কাশীবাসী। একটিমাত্র সন্তান তাঁর—কন্যাসন্তান। মাঝের দুই সতীন অসময়ে সংসারের মায়া কাটিয়েছে। একটি সন্তান প্রসব করতে গিয়ে—আহা ছেলেই হত তার, হল না। দ্বিতীয় জন আন্ত্রিক রোগে। বৃদ্ধ বয়সে লুপ্ত-পিণ্ডোদক হবার আশঙ্কায় বাধ্য হয়ে বৃদ্ধকে চতুর্থপক্ষ করতে হল। তবে মৃন্ময়ীকে বিবাহ করতে প্রথমটা কিছুতেই স্বীকৃত হননি—তার একমাত্র অপরাধ, সে অত্যন্ত সুন্দরী! দৃঢ় আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, না, না, সে হয় না। আমি তো শুধু বংশধরের কামনায়......

কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ পীতু মুখুজ্জে ওঁর হাতদুটি ধরে বলেছিলেন, কী আবোলতাবোল বলছেন গাঙ্গুলী-মশাই! পুত্র কামনাতেই তো সবাই বিবাহ করে! শাস্ত্রেই আছে—'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'! আমি যে নিতান্ত গরিব! উপযুক্ত কুলীনের মর্যাদা দেবার সামর্থ্য কি আমার

আছে? কোথায় বিয়ে দেব?

দুর্গাচরণ শেষমেশ সম্মত হয়েছিলেন, কিন্তু এক কঠিন শর্তে! শুধু শাঁখা-সিঁদুর। আর মাত্র এক কপর্দক কৌলিন্য মর্যাদা!

ওটা নিতেই হয়। শাস্ত্রীয় নির্দেশ!

তা মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে গাঙ্গুলীমশায়ের। বছর না ঘুরতেই নববধূর গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ পরিস্ফুট! গৃহকর্তার আনন্দের আর সীমাপরিসীমা নাই! এই বাষট্টি বৎসর বয়সে যে নিয়োগপ্রথার সাহায্য নিতে হল না, এটাই পরম তৃপ্তি। বস্তুত সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা আদৌ আছে কি না এ বিষয়ে তাঁর নিজেরই সন্দেহ ছিল। ছয় দশক দুনিয়াদারী করে তিন-তিনটি সহধর্মিণীকে পার করার পরেও তাঁর ধর্মরক্ষা হয়নি—পুত্র সন্তান ছিল না এতদিন। কনিষ্ঠ দুটি ভ্রাতা আছে, তাদের সন্তানও আছে—কিন্তু পুত্রের হাতে পিণ্ডলাভের একটা আলাদা তৃপ্তি। প্রতিজ্ঞা করেছেন, এবার যদি পুত্রসন্তান লাভ করেন তাহলে আগামী বৎসর এ ভদ্রাসনে দুর্গোৎসব লাগিয়ে দেবেন। গ্রামে একটিই দুর্গা পূজা হয়—ভাদুড়ী বাড়ি—এবার 'বারিন্দির'দের কব্জা থেকে মুক্তি পেয়ে এই রাঢ়ভূমে পূজা পাবেন জগজ্জননী। সেই লোভে পড়েও কি মা দুর্গা ওঁকে একটি সোনার চাঁদ উপহার দেবেন না? কন্যা সন্তান আছে—বড় বৌয়ের। শোভারাণী। মৃন্ময়ীর চেয়ে মাত্তর বছর তিনেকের বড়। তার মা-মাগী কাশী যাবার আগে তাকে ওঁর স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে গেছে। পাষাণী যাকে বলে, আর কী!

মৃন্ময়ীকে চাটুজ্জে-বাড়ির কেচ্ছাটা না শোনানো পর্যন্ত ওঁর তৃপ্তি হচ্ছিল না। ব্যাপারটা ঠিক মতো সম্ঝে উঠতে পারেননি। দ্বিপ্রহরে প্রাগাহার পর্যায়ে দ্বাদশ ব্রাহ্মণ তামাকু সেবন করছিলেন। পংক্তিভোজনে বসবার আহ্বান শুনে নিতান্ত খোলা মনে বলেছিলেন, রুপো বাঁড়ুজ্জে এখনো আসেনি দেখছি?

অন্দরমহলের দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান ছিলেন গৃহস্বামী স্বয়ং, নন্দ চাটুজ্জে। তিনি তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন, রুপো গুনতির বামুন নয়। আপনারা বারো জন এসেছেন। আসুন......

—তা এসেছি। কিন্তু রুপো বাঁড়ুজ্জের ভিটে তো আর তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে নয়। কেউ আগ্ বাড়িয়ে তাকে ডেকে আনলে সবাই একসঙ্গে...

—না। তার দেরী হবে। সে ভিন্ গাঁয়ে গেছে রুগী দেখতে।

অতপর সবাই পংক্তি ভোজনে বসে পড়েন। বেণী চাটুজ্জে বসে ছিল ঠিক ওঁর পাশেই। নন্দের জ্ঞাতি ভাই—সরিক আর কী। দুর্গাচরণের কর্ণমূলে নিবেদন করেছিল, 'একবগ্গা' আসবে না গাঙ্গুলীদাদা। সে নেমন্তন্ন গ্রহণই করেনি।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন দুর্গাচরণ। পঞ্চদেবতার অন্যতম শেষ দেবতাটি হাপিত্যেসে গণ্ডূষ -জলের অপেক্ষায় আছেন। অস্ফুটে 'অপানায় স্বাহা'র বদলে বলে ফেলেন, বল কী হে? কেন?

—পরে বলব।

এই মর্মান্তিক সংবাদটা কি মধ্যাহ্ন আহারের পরে পরিবেশন করা চলত না? মন দিয়ে আর মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতেই পারেননি। ব্যাপার কী? এ যে অবিশ্বাস্য! যদ্দুর মনে পড়ে একবগ্গার ঘাড়ে তো একটাই মাথা দেখেছেন! তাহলে?

আহারান্তেও সমস্যাটার সমাধান হয়নি। নন্দ সবাইকে চোখে চোখে রেখেছেন সেবান্তিক তাম্বাকু সেবনের পর্যায়ে। ওরই ফাঁকে একবার সুযোগ পেয়ে বেণীকে একটা কনুইয়ের গোত্তা মারার সৌভাগ্য জুটেছিল, কী ব্যাপার হে? সৌদামিনী? অ্যাদ্দিন পরে?

—ঠিক জানি না দাদা। সদুর কেচ্ছা কি একবগ্না জানে? সে তো তখন ভিন গাঁয়ে। আপনার ভাদ্দর-বৌ বলছিল, নন্দদা নাকি জগুদিদির কাছে প্রস্তাব তুলেছিলেন—হরিমতির সঙ্গে...

—তা তো হতেই পারে; তার সঙ্গে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার কী সম্পর্ক?

বেণী জবাব দেবার সুযোগ পায়নি। হঠাৎ দেখে জগুঠাকরুণ সন্দিগ্ধ চোখে এগিয়ে আসছেন। বলে, আরে জগুদিদি! আপনি কখন এলেন?

জগুঠাকরুণ অনিমন্ত্রিত এসেছেন। মধ্যাহ্নে শুধু ব্রাহ্মণ-সেবার আয়োজন। তিনি বিধবা মানুষ। তাঁর আহারের প্রশ্ন তো নেই। তিনি না এসে পারেননি। সকাল থেকে দেখা-শোনা করছেন, তরকারি কুটে দিচ্ছেন। পাগল ভাইপোটার ঐ হিমালয়ান্তিক অপরাধের যদি সামান্য কিছুটা স্খালন হয়।

দুর্গাচরণ ভালমানুষটি সেজে বলেন, কখন এসেছেন মানে? এ তো জগুদিদির নিজের বাড়ি। জগুদিকে বাদ দিয়ে সোঞাই গাঁয়ে কোন যজ্ঞিবাড়ির কাজ কখনো হয়েছে, যে আজ নতুন করে হবে?

জগুঠাকরুণ কথা ঘোরান, মিনুটা এখন কেমন আছে? এ সময়ে খুব সাবধানে রাখবে ভাই। ঘরের বার হতে দেবে না। নজর-টজর না লাগে।

ছয়দশকের দুনিয়াদারীর অভিজ্ঞতা নিয়ে হবু পিতা বোধকরি লজ্জা পেলেন। নতমস্তকে বলেন, সেসব তো আপনাদেরই দেখার কথা, দিদি। আসবেন সুযোগ মতো। পায়ের ধুলো দেবেন, আশীর্বাদ করবেন, আর ঐ সঙ্গে দুটো সৎ পরামর্শও দেবেন! তা, ভাল কথা। রূপো কোন গাঁয়ে গেল চিকিচ্ছে করতে? এতটা বেলা হয়ে গেল......

নন্দ বৃদ্ধাকে মিথ্যাভাষণের হাত থেকে অব্যাহতি দিলেন। বলেন, না, আর খোশ গল্প নয়। জগুদি, আপনি এবার মেয়েদের ঠাঁই করতে বলুন।

দুর্গাচরণ মনে মনে হেসেছিলেন। বেণীটা তাহলে তো মিছে কথা বলেনি। একবগ্না বাঁড়ুজ্জে তাহলে নন্দ চাটুজ্জের নাকে সত্যিই ঝামা ঘষে দিয়েছে! কিন্তু কেন? একবগ্না ঠাকুর এভাবে ক্ষেপে গেল কেন?

একটু পরে সংসারের কাজ সেরে মৃন্ময়ী এসে বসল ওঁর শয্যাপ্রান্তে। তেল না হয় নাই দিল, পায়ে হাত বুলিয়ে দেওয়াটা বাদ দেবে কেন? বলে, এবার বলুন, কী বলছিলেন তখন?

এই এক যন্ত্রণা! মৃন্ময়ী ওঁর সন্তানকে গর্ভে ধারণ করতে পারল, কিন্তু 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি'তে নামতে পারল না। নিবিড়তম মুহূর্তেও!

দুর্গা গম্ভীর হয়ে বলেন, বামুনদি তো কাজ ছেড়ে দেননি, তাহলে তোমার এই হাল কেন ছোটগিন্নি?

জনান্তিকে 'ছুটকি' থেকে 'ছোটগিন্নি'তে যখন সম্বোধনটা সরে গেছে তখন বুঝে নিতে হবে কর্তা অসন্তুষ্ট। কারণটা বুঝে উঠতে পারে না। কাজলকালো দুটি চোখ মেলে বলে, মানে?

—যে রাঁধে, শুনেছি সে চুল বাঁধে না। তার একটা কৈফিয়ৎ থাকে। তা তোমার এ হাল কেন হল?

শোভারাণীর বিকালের দিকে তেড়ে জ্বর এসেছিল। মালোয়ারি। এ জ্বর ঘরে ঘরে। এই আসে এই যায়। ওর মাথায় জলপটি দিতে দিতে মৃন্ময়ী বিকালে চুল বাঁধার সময় পায়নি। স্বামীর প্রশ্নে ফিক্ করে হেসে বলে, আপনার সব দিকে নজর!

—মাথার পিছনেও এক জোড়া চোখ না থাকলে কি এত বড় সংসারটা চালাতে পারি ছোটগিন্নি? আর শুধু কি সংসার? এই পঞ্চগ্রামের গোটা সমাজটা। সে কতা নয়, কিন্তু ভরসন্ঝে বেলায় এলোচুলে থাকতে নেই—বিশেষ করে পোয়াতি মাগীর—এই কটা কতাও কি শিখিয়ে দেয়নি তোমার মা-আবাগি?

মৃন্ময়ী নিতান্ত গরিব ঘরের মেয়ে। শাঁখা-সিঁদুর সম্বল করে এ সংসারে এসেছিল। তার পিতৃকুলকে উদ্ধার করেছেন কুলীন কুলতিলক। প্রায় বছরখানেক সকাল-সন্ধ্যা শ্বশুরালয়ের নানান জনের মুখে বাপমায়ের সম্বন্ধে এজাতীয় মধুর বিশেষণ শুনে শুনে এখন সে অভ্যস্তা। কোন ভাবান্তর হয় না আর। পিঠভরা চুলের শেষপ্রান্তে একটা গ্রন্থি দিয়ে বলে, কী মজার কতা বলবেন বলছিলেন তখন?

দ্বিপ্রহরে সংগৃহীত মজাদার কেচ্ছাটা সবিস্তারে বর্ণনা করেন, যার উপসংহার: হেতু যাই হোক, নন্দ চাটুজ্জের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করেছে একবগ্গাটা!

নামটা শুনেই কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে মৃন্ময়ী।

একবগ্গা-ঠাকুর! রূপেন্দ্রনাথ! ওর প্রতিবেশী। পীতাম্বর চাটুজ্জের চালাখানা পদ্মদীঘির পুবপারে আর বাঁড়ুজ্জে বাড়ির ভদ্রাসন পশ্চিমপারে। মাঝখানে ঐ পদ্মদীঘি—রসি কয়েক ব্যবধান। রসি কয়েক, তবু অতলান্ত। রূপোদা ওর চেয়ে নয় বছরের বড়। তাঁর সান্নিধ্য ও অবশ্য খুব ঘনিষ্ঠভাবে পায়নি, পাশের বাড়ির বাসিন্দা হয়েও। তিনি তো মিনুর জ্ঞান হবার পর থেকেই গুরুগৃহে। তবে কাত্যায়নী ওর সমবয়সী, সখী। সকাল-সন্ধ্যা দেখা হত। প্রাণের কথা হত। তা হোক, রূপোদা বৎসরান্তে এক বার আসত। দেখা হত।

'নয়' একটা গাণিতিক সংখ্যা। গণিত বলে সেটা নির্গুণ। ঐ 'নয়' সংখ্যাটা। নয়টি আসরফি আর নয়টি কপর্দকের মূল্যমানে যা ফারাক তার জন্য 'নয়' দায়ী নয়। কিন্তু হিসাবটা কি ঠিক? সব 'নয়' কি এক জাতের?

স্মৃতি ভিড় করে আসছে। প্রায়-শৈশবের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। দামোদরের বাইচ প্রতিযোগিতা হচ্ছে। ভিড়ে-ভিড়। কিছুতেই দেখতে পাচ্ছিল না বেচারি। হঠাৎ রূপোদা ওকে কোলে তুলে নিয়ে বসিয়ে দিল কাঁধে। বললে, কী রে মিনু? এবার দেখতে পাচ্ছিস?

কাতু চিৎকার করে নিচে থেকে বলে, নেমে আয় বলছি! পাজি, বাঁদর। ও তো আমার দাদা! আমি ওর কাঁধে চড়ব। তুই চড়েছিস্ কোন আক্কেলে?

রূপোদা বোনকে ধমক দিয়েছিল, হিংসুটেমি করলে তোকে কোনদিন কোলে নেব না কিন্তু কাতু!

তখন মিনুর বয়স ছয়। তাহলে রূপোদার কত? নয়ে-ছয়ে পনের।

মনে পড়ে আরও একদিনের ঘটনা। পিতৃশ্রাদ্ধ করতে এসেছিল রূপেন্দ্রনাথ। কাচা গলায়

উদাস দৃষ্টি মেলে বসেছিল সামনের দাওয়ায়। মিনু তার কোল ঘেঁষে বসে পড়ে বলেছিল, তুমি কেঁদ না, সোনাদা। আমার তো বাবা আছেন, আমরা দুজন তাঁকে ভাগ করে নেব। কেমন?

সোনাদা সেদিন ম্লান হেসে ওর চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়েছিল শুধু। একজন পিতৃবিয়োগে মুহ্যমান, আর-জন তার ছোট্ট দুটি হাত দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে চায়। হিসাব কষে দেখ, একজন আট, আর জন সতের। ফারাক সেই সমান—নয় বছর।

সোনাদা! নামটা ওরই দেওয়া। মনে আছে, একদিন প্রশ্ন করেছিল, আচ্ছা তোমার নাম 'রুপোদা' কেন গো? 'সোনাদা' হলে আরও মানোতো।

রূপেন্দ্র ছদ্মগাম্ভীর্যে বলেছিল, তুই আমার দাম কমিয়ে দিতে চাইছিস, মিনু? জানিস না, সোনার চেয়ে রুপো দামী?

হঠাৎ হকচকিয়ে যায়। তাই নাকি? রুপোদা তো মিছে কথা বলে না। পরে বাবামশাইকে প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছিল। রুপোদার পিঠে গুম্‌গুম বসিয়ে বলেছিল: মিথ্যুক! তোমাকে আমি কী শাস্তি দিই দ্যাখ!

—কী শাস্তি দিবি? তোর কিলে আমার কিছুছু হয় না!

—শুধু কিল কেন? তোমাকে সবার সামনে আমি 'সোনাদা' বলে ডাকব।

তা কিন্তু পারেনি। কারণ পরের বছর দুর্গোৎসবে যখন রুপোদা ফিরে এল, তখন সে কেমন যেন তালঢ্যাঙা হয়ে গেছে। না ভুল হল, দুর্গোৎসবে সেবার আসতে পারেনি। প্রায় দেড় বছর পরের কথা। ততদিনে মিনুও মৃন্ময়ী হয়ে উঠতে শুরু করেছে। একাদশবর্ষীয়া কিশোরী। তার দেহেমনেও ভিতর থেকে পরিবর্তন শুরু হয়েছ। বুঝতে পেরেছিল সর্বসমক্ষে ওঁকে আর 'সোনাদা' ডাকা যায় না। সে বড় লজ্জার কথা! সেবার উনি ফিরে এসেছিলেন ফাল্গুন মাসে—দুর্গোৎসব পার করে। জগুপিসির 'মায়ের দয়া' হয়েছে খবর পেয়ে। রঙ-দোলের আগেই ভাল হয়েছিল পিসি। তখন দখিন থেকে বইতে শুরু করেছে একটা পাগলা হাওয়া। প্রতি বছরই হয় তো তা বয়। কিন্তু মৃন্ময়ী সেই কিশোরী বয়সে তখন প্রথম বুঝতে শিখছে—ওটা 'মন-কেমনের' হাওয়া। প্রতি বসন্তেই হয়তো নির্লজ্জ কোকিলটা অমন আকুলভাবে ডাকে। এ বছরই যেন সেটা প্রথম খেয়াল হল। কাতুকে রঙ দিতে গিয়েছিল বাঁড়ুজ্জে বাড়ি। কাতু কোথায় লুকিয়ে বসে আছে ঘাপটি মেরে। আনাচে-কানাচে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল তাঁর। রুপোদার হাতে একটা আবীরের পুঁটুলি। সেও বুঝি এতক্ষণ ছেলের দলে রঙ খেলছিল। দোর আগলে বললে, এবার?

বুকের মধ্যে ধড়াস্‌ করে উঠেছিল কিশোরী মেয়েটির। এ কে? ঐ তালঢ্যাঙা মানুষটা? আর ওর গলার স্বরও তো রুপোদার মতো নয়! আশেপাশে তাকিয়ে দেখে—ত্রিসীমানায় কেউ নেই! কী সর্বনাশ! এখন যদি ঐ লোকটা ওকে......

রুপোদা 'এবার'? বলে ওর দিকে এক পা এগিয়ে আসতেই কী যেন কিসের আশঙ্কায় ওর সারা দেহ থরথর করে কেঁপে উঠল। ওর মনে হল—এখনি দুই হাত বাড়িয়ে রুপোদা ওকে বুকে টেনে নেবে। আর তার পর ওর মুখে, বুকে, সর্বাঙ্গে.....

দুরন্ত লজ্জায় দু-হাতে মুখ ঢেকে বলে ওঠে, ন্‌-না!

রুপোদা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ওর আতঙ্কতাড়িত কচি মুখখানার দিকে অবাক দৃষ্টিতে

নির্নিমেষলোচনে শুধু তাকিয়ে দেখেছিল। তারপর কী ভেবে যেন অনুমতি ভিক্ষার সুরে জানতে চেয়েছিল, কী ব্যাপার রে মিনু?

মুখ থেকে হাত সরায়নি। আবীরমাখা লালে-লাল মাথাটা ঝাঁকিয়ে সে পুনরুক্তি করেছিল শুধু, ন্-না।

কী বুঝল তা সেই জানে। হাসতে হাসতে বললে, রঙ মাখতে এত ভয়? ঠিক আছে, আমি আল্‌তো করে একটা টিপ্ শুধু পরিয়ে দিই তোমার কপালে। কেমন? বোকা মেয়ে! তুমি এখনো খুকি!

বোকা! বোকা কে? আমি, না তুমি? কথা কটা শুধু মনেই ফুটেছিল, মুখে নয়। কপালে একটা টিপ নিয়ে এক ছুট্রে পালিয়ে গিয়েছিল। একটু দৌড়েই, থেমে, পিছন পানে তাকিয়ে দেখেছিল। না, রুপোদা ওকে তাড়া করে আসেনি!

আড়ালে গিয়ে ইচ্ছে করছিল নিজের গালেই ঠাস্ ঠাস্ করে চড় কষাতে। স্নানের সময় সেই এক বিন্দু আবীরের টিপটুকুও ধুয়ে গেল! যাক্। কিন্তু সোনাদা সেই প্রথম ওকে 'তুই-তোকারি' করতে পারেনি। চিরটা কাল যাকে 'তুই' বলেছে, তাকে সেদিন বলতে হয়েছিল, 'তুমি এখনো খুকি।'

কেন গো? এই বোকা মেয়েটাকে তুমি বুঝিয়ে দেবে গো পণ্ডিতমশাই? 'তুই' কেমন করে 'তুমি' হয়ে যায়?

—কেন গো? কারণটা কী হতে পারে?

রীতিমতো চমকে উঠেছে মৃন্ময়ী। তার নিজের মনের ঐ নিভৃত প্রশ্নটা এই নির্জন কক্ষে স্বামীর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠায়।

—কী হল? দেয়ালা দেখছ নাকি? অমন চম্‌কে উঠ্‌লে যে?

—কিছু নয়। কী জিজ্ঞেস্ করছিলেন যেন?

—মানে, কারণটা কী হতে পারে? কেন একবগ্গা এমন কাণ্ডটা করে বসল? সেই সৌদামিনীর কেচ্ছা?

এতক্ষণ স্মৃতিচারণে যে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর উজান পথে কৈশোর-বাল্যের গোমুখ গঙ্গোত্রীর নির্মল জলে অবগাহন করছিল তাতে এসে মিশল পূতিগন্ধময় নর্দমার ক্লেদাক্ত জল! মনটা বিষিয়ে ওঠে! টানা নথে অনুবিদ্ধ নাকটা কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। বলে, সদুপিসি! বাব্বা! পারেনও বটে আপনারা! মরেও সে হতভাগীর শান্তি নেই!

—আহাহা! আবার আমাকে টানছ কেন ছোটগিন্নি? আমি কী করেছি?

নন্দ চাটুজ্জে তার বালবিধবা শ্যালিকাটিকে আশ্রয় দিয়েছিল নিজ ভদ্রাসনে। যৌবনপ্রাপ্তির পর তার অপঘাত মৃত্যু হয়েছে বছর-পাঁচেক আগে। কেউ বলে আত্মহত্যা, কেউ বা—হত্যাই। অনেকেরই বিশ্বাস কীর্তিটা স্বয়ং নন্দেরই—মানে, অন্তিম মৃত্যুর আগের যে মৃত্যু—অর্থাৎ কে সেই বিধবাটির গর্ভসঞ্চার করেছিল তাও নাকি সবার জানা। তবে প্রকাশ্যে সবাই মেনে নিয়েছিল—খাদ্যে বিষক্রিয়া। কার্তিক ময়রার পচা পক্কান্নো খেয়ে। পঞ্চায়েত তাই কার্তিককে অর্থদণ্ডও করেছিল—মায়ের থানে একটি পাঁঠা দিতে হয়েছিল তাকে। অবশ্য কার্তিক আড়ালে

স্বীকার করে, তার দামটা নন্দ গোপনে ওকে মিটিয়ে দিয়েছিলেন। মৃন্ময়ী এ-গ্রামেরই মেয়ে। ফলে আর পাঁচজনের মতো এসব কেচ্ছা তার না-জানা নয়। এতদিন পরে সেই হতভাগিনীর নামটা উঠা পড়ায় তাই ও-কথাটা বলে ফেলেছে।

দুর্গাচরণ বলেন, বেণী আবার একটা উল্টো কতা শোনালো, বুয়েছ? তার বউয়ের খপর—নন্দ চাটুজ্জে নাকি হরিমতির সঙ্গে সুরোর বে-র কথা বলে। তাতেই ঐ একবগ্গা ঠাকুর ক্ষেপে গিয়ে—

—তা তো ক্ষেপবারই কথা বাপু! ওঁর সঙ্গে কি হরিমতিকে মানায়?

—তুমি যে অবাক করলে ছোটগিন্নি! কুলীন ঘরের আইবুড়ো ধেড়ে খোকা! কেউ বিয়ের কথা তুলতে এলে মায়ের পেসাদ প্রেত্যাখ্যান করবে?

মৃন্ময়ীকে স্বীকার করতেই হয়, সে-কথা ঠিক। এটা রূপোদার একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে।

দুর্গাচরণ হেসে ফেলেন, 'রূপোদা' কী গো! তুমি যে সম্পর্কে তার খুড়ি!

মৃন্ময়ী লজ্জা পায়। কথাটা তার খেয়াল ছিল না।

দুর্গা কৌতুক করে ওর তলপেটে আঙুল ছুঁইয়ে বলেন, একবগ্গাটাকে 'রূপোদা' যে ডাকবে সে তো এখানে ঘুমুচ্ছে গো!

মৃন্ময়ী দুহাতে মুখ ঢাকে।

কর্তা পাশ ফিরে শুলেন। বলেন, পিঠে এট্টু সুড়সুড়ি দিয়ে দাও দিনি।

স্বামীর পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে আর এক দিনের কথা মনে পড়ে গেল মৃন্ময়ীর। সেই তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ। গ্রামে ফিরে আসার পরে তাঁকে আর দেখেনি। তার পূর্বেই মৃন্ময়ী গাঙ্গুলীবাড়ির নববধূ হয়ে গেছে। ওর বিয়ে হয়েছিল মাঘে। সে বছর আশ্বিন মাসের কথা। সে বারও উনি গাঁয়ে এসেছিলেন দুর্গোৎসবে। তখনো কিন্তু দুজনের বয়সের ফারাক সেই নয় বৎসর। মিনু পনের, রূপেন্দ্রনাথ চব্বিশ।

বিজয়ার পরদিন সকালে মৃন্ময়ী এসেছে জগুপিসিকে প্রণাম করতে। কাতু বললে, দাদাকে পেন্নাম করবি না, মিনু?

মীনু হেসে বলেছিল, করব না! বলিস কীরে! সবাই বলে, তিনি দিগ্‌গজ পণ্ডিত হয়ে গেছেন। একটা পেন্নাম ঠুকে দিলে ভালমন্দ আশীর্বাদ পেয়ে যাব!

কাতু বলেছিল, দস্তুরি যদি দিস্, ভালোমত আশীর্বাদ পাইয়ে দেব। কী বর চাস বল্‌দিনি? শিবের মতো বর?

মিনু ফিস্‌ফিসিয়ে বলেছিল, শিবের মতো হোক-না-হোক। তোর মতো বেপাত্তা বর যেন না হয়!

তারপর লজ্জিত হয়ে কাত্যায়নীর হাতখানা টেনে নিয়ে বললে, ছি, ছি। বচ্ছরকার দিনে বেফাঁস কথাটা বলে তোকে মিছিমিছি দাগা দিলাম!

কাত্যায়নী ম্লান হেসে বলেছিল, কিন্তু কতাটা তো মিছে নয় রে মীনু! এ সব্বোনাশ যেন শত্তুরেরও না হয়। কোনদিন মানুষটাকে চোখেই দেখিনি!

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলেছিল, আয়।

—কোথায়? রূপোদা কী করছে?

—চিরটাকাল যা করেছে। পুঁথি পড়ছে।

পুবের জানালাটা খোলা। এক ঝলক প্রভাত-সূর্যালোক ঘরে ঢুকে পড়ে যেন থমকে গেছে। রূপেন্দ্রনাথ তন্ময় হয়ে কী একটা পুঁথি পড়ছিলেন। কাত্যায়নী তাঁকে ডাকতে গেল। মৃন্ময়ী হঠাৎ মুখ চেপে ধরল তার। কাতু সবিস্ময়ে চোখ দিয়ে প্রশ্ন করে, কী?

মৃন্ময়ী নিঃশব্দে ওষ্ঠাধরে আঙুল ছোঁওয়ায়।

ধ্যানমগ্ন বিদ্যার্থীর ঐ তন্ময় ভাবটা ছিন্ন করতে তার মন সরছিল না। ওর মনে পড়ে গেল—একবার ভাদুড়ী-বাড়ির নাটমঞ্চে 'নিমাই-সন্ন্যাস' পালা দেখেছিল। এক গাদা রঙ-চঙ মেখে, চোখে সুর্মা আর ঠোঁটে অলক্তক-হিঙ্গুলী লাগিয়েও সেই মেকি নিমাই পণ্ডিত এত সুন্দর হতে পারেনি! রূপেন্দ্রের ঊর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ, শুধু সামবেদী উপবীত। মস্তক মুণ্ডিত, শিখাপ্রান্তে কোনও পুষ্প অনুবিদ্ধ নেই। চোখ দুটি আয়ত, উন্নত নাসা,—ঠিক যেন নিমাই পণ্ডিত! সোনার গৌরাঙ্গ। সার্থক নাম: সোনাদা! কাত্যায়নীর কণ্ঠস্বরে ধ্যানভঙ্গ হল তাঁর।

—দাদা, মীনু তোমাকে পেন্নাম করতে এয়েছে!

ধ্যানস্থ সন্ন্যাসী চোখ তুলে চাইলেন যেন। তখনো তাঁর ঘোর কাটেনি। তারপর সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ান। কোঁচার খুঁটটা খুলে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে বলেন, তুমি আমাদের সেই মীনু?

—বিশ্বাস হচ্ছে না? —প্রশ্ন করে কাত্যায়নী।

রূপেন্দ্রনাথ বলেন, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয় কাতু—কিন্তু পথে-ঘাটে দেখলে ওকে আমি চিনতেই পারতাম না! কী সুন্দর মানিয়েছে তোমাকে এই শাড়িখানিতে!

কাতু মুখ টিপে হাসে, শুধু শাড়িখানাই নজরে পড়ল দাদা? দৃষ্টি বটে তোমার!

রূপেন্দ্রনাথ জবাবে কী-একটা কথা বললেন। উচ্ছ্বসিত শোনালো তাঁর কণ্ঠস্বর। বেচারী মৃন্ময়ী—উনি কথাটা বলেছেন বিশুদ্ধ সংস্কৃতে! অর্থ গ্রহণ হয়নি তার।

মৃন্ময়ী তার শান্তিপুরে ডুরে শাড়ির আঁচল গলায় জড়িয়ে ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে নামিয়ে রাখে একটি সলজ্জ প্রণাম। সাহস করে পদস্পর্শ করতে পারে না!

রূপেন্দ্রনাথ যুক্তকরে বললেন, ওঁ, নমঃ নারায়ণায়!

কাত্যায়নী বলে, এমন একটা জমকালো পেন্নামের ঐটুকু আশীর্বাদ?

হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, ওটা আশীর্বাদ নয় রে বোকা! আমি মীনুর প্রণামটা নারায়ণকে নিবেদন করলাম শুধু—

—তার মানে তুমি ওর পেন্নামটা নিলে না?

—পাগলি! তুই বুঝবি না!

কাত্যায়নী রীতিমতো জেদ করে, ওসব শুনছি না। ওকে আশীর্বাদ করতে হবে। কর বলছি!

—বেশ তাই করছি......

বলেই আবার একটি শ্লোক বললেন দেবভাষায়।

কাত্যায়নী রীতিমতো বিরক্ত! বলে, অং-বং নয়। সোজা কথায় মানেটা কী হল বলতে হবে! শ্লোকটা কি তুমি মুখে মুখে বানালে?

—না, এটা মহাকবি কালিদাসের। তিনি বলছেন, তোমার আখণ্ডলের মতো ভর্তা হৌক, জয়ন্তের মতো কীর্তিমান সুতঃ। তুমি পৌলমী হবে! তোমার মতো কল্যাণময়ীর আর কোন

1342

আশীর্বাদই যেন সুপ্রযুক্ত নয়!

এখনো মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়।

না, অন্বয়-ব্যাখা শুনেও সে কিছু বুঝতে পারেনি। কিন্তু কথাগুলো যেন ওর মনের পাষাণফলকে খোদাই করে লেখা হয়ে গিয়েছিল।

বাড়িতে ফিরে এসে সে পিতার কাছে প্রশ্ন করে বুঝে নিয়েছিল—'আখণ্ডল' মানে ইন্দ্র, 'সুত' মানে সন্তান। আর 'পৌলমী' হচ্ছে ইন্দ্রাণীর নাম।[1]

তখনই ওর সারা দেহ ফোটা-কদমের মতো কণ্টকিত হয়ে উঠেছিল!

হঠাৎ শয্যার উপর উঠে বসেন দুর্গাচরণ।

আবার চমকে ওঠে মৃন্ময়ী, কী হল?

—আমার মাথায় একটা জবর ফন্দি এয়েছে ছোটগিন্নি। তোমার ক্ষুধামান্দ্য তো লেগেই আছে। মাঝে মাঝে বমির বেগও আছে। পাগলাটাকে ডেকে পাঠাই—বদ্যি হিসাবে। সে তোমাকে একবার দেখে যাক। ঐ ফাঁকে জেনে নেওয়া যাবে, কেন সে জলে বাস করে স্বেচ্ছায় কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করতে চাইছে। কী বল?

মৃন্ময়ীর বুকের ভিতর গুড়গুড় করে মেঘ ডাকল। তিনি এ বাড়িতে আসবেন! আবার মুখোমুখি দেখা হবে! আবার গলায় আঁচল দিয়ে তাঁকে প্রণাম করার সৌভাগ্য হবে! কিন্তু.....

—ইতস্তত কিসের গো? তুমি তো তার পাড়ার মেয়ে। ন্যাংটো হয়ে হামা দিয়েছ তাদের বাড়িতে।

আঃ! কর্তার কথার কোন আড় নেই! সে তো বহু যুগ আগেকার কথা! মীনুর তখন এক, আর সোনাদার দশ—সেই 'নয়' কি আজকের 'নয়'? যখন রূপেন্দ্রনাথ পঁচিশ, আর মৃন্ময়ী পরস্ত্রী?

মুক্তকেশী এসে খবর দিয়ে গেল কর্তা আসছেন।

এটাই প্রথা। মানে, এটাও প্রথা নয়, তবে বিকল্পে এটাই চলছে। কোন বনেদী পরিবারে কর্তা-গিন্নিতে দিবাভাগে সাক্ষাৎ হওয়ার কানুন নেই। এটা যে কোন্ সংহিতায় কোন্ পুরাণকার লিখে গেছেন তা জানা নেই, তবে বনেদী বাড়িতে—যেখানে বার-মহল আর অন্দর-মহল আছে—হাড়-হাবাতে দুঃস্থর এক-কামরার পর্ণকুটির নয়, সেখানে ঐ অনাচারটা সহ্য করা হয় না। কর্তারা দিবা-নিদ্রা দেন বার-মহলে, গিন্নিরা পান-দোক্তার আসর বসান, ঘুটি, বাঘবন্দী,

মূল শ্লোকটি:

[1] আখণ্ডল সম ভর্তা জয়ন্ত প্রতিমোসুতঃ।
আশীরন্যাঃ ন তে যোগ্যাঃ পৌলমী মঙ্গলা ভব॥

ষোলঘর, দশ-পঁচিশ খেলেন অন্দর-মহলে। কখনও বা 'অড়ঢ' বা 'আঢ' অর্থাৎ বাজি রেখে খেলা। 'চোরে কামারে' দেখা হয় প্রথম প্রহরে শেয়াল ডাকার পর—তাও যদি পঞ্জিকায় শুভরাত্রির নির্দেশ থাকে। নচেৎ কর্তারা যান উপপত্নীর শয্যাকক্ষে, গিন্নিরা তাঁদের নিজ নিজ একক শয্যায়।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ এক ব্যতিক্রম। তিনি মধ্যাহ্নে প্রত্যহ অন্দর-মহলে আগমন করে থাকেন। তবে আসার পূর্বে যথারীতি দূতীর মুখে সংবাদ পাঠান। যাতে গা খুলে যেসব পুরললনা বিশ্রম্ভালাপ করছে বা নিদ্রা যাচ্ছে তারা বিড়ম্বিত না হয়।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ অনেক কারণেই ব্যতিক্রম। শুধু সোঞাই গ্রামেই নয়, বোধকরি এই রাঢ়খণ্ডে তাঁর কীর্তির নাগাল আর কেউ পায়নি।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ কুলীন ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্রশ্রেণীর—কাশ্যপ গোত্র, নিরাবিল পটি। বয়স তিনকুড়ি পার হয়েছে, প্রচুর ধনসম্পদ—অথচ তাঁর ধর্মপত্নী—একমেবাদ্বিতীয়ম: ব্রজসুন্দরী।

সেটা ওঁর পিতৃদত্ত নাম নয়। তিন-চার দশক পূর্বে নাকে নোলক, গলায় শতনরী, হাতে রতনচূড় পরে যে বালিকাটি নববধূরূপে এই জমিদারবাড়ি শুভাগমন করেছিলেন তখনই তাঁর নতুন নামকরণ হয়েছিল ব্রজেন্দ্রনারায়ণের ধর্মপত্নী: ব্রজসুন্দরী।

তারপর কেটে গেছে বহু বৎসর। দুটিমাত্র সন্তানের জননী—তারাপ্রসন্ন আর পটুরাণী, অর্থাৎ পটেশ্বরী। উত্তরবঙ্গ থেকে একাধিকবার লোভনীয় প্রস্তাব এসেছে, কিন্তু কর্তা-মশাই দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহে স্বীকৃত হননি। গ্রামে তাই ব্রজসুন্দরীর এক বিশেষ মর্যাদা। এমন সতী-লক্ষ্মী সুদুর্লভ—যিনি পাকা চুলে সিন্দুর পরেন অসপত্ন-অধিকারে।

লোকে তাই আড়ালে ব্রজেন্দ্রনারায়ণকে বলেঃ নবাব-সাহেব।

অর্থাৎ নবাব আলিবর্দী খাঁ সাহেব।

শোনা যায়, সেই আহাম্মক নবাবও একটি স্ত্রী নিয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে গেছেন—উপপত্নী পর্যন্ত ছিল না তাঁর। নবাবের এক বেগম! বিশ্বাস হতে চায় না। খোদাতালা কত বিচিত্র চিড়িয়াই না পয়দা করেন!

স্বভাবতই গ্রামের লোক মেনে নিয়েছিল জমিদার-মশাই কিঞ্চিৎ স্ত্রৈণ! তাই বনেদী প্রথা নস্যাৎ করে দ্বিপ্রহরে স্ত্রীর কক্ষে দিবানিদ্রা দিতে আসেন। রুদ্ধ কক্ষে নয়। কবাট খোলাই থাকে। না থাকলেও ক্ষতি ছিল না—জানতে কারও বাকি নেই।

সে ক্ষমতাই নেই যৌবনোত্তীর্ণার। না, শুধু যৌবন গেছে বলেই নয়—এক কালরোগে আজ দু বছর ধরে তিনি তিলতিল করে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলেছেন।

ঘরে ঘরে এ নিয়ে দাম্পত্য রসালাপ চলে, তাহলে বুড়ো কেন এমন আঁচলধরা? যে বউ 'ইয়েই' করতে পারে না তার কাছে ঘুরঘুর করা কেন বাওয়া? তোর তল্লায় তো ছাতা পড়ছে। নতুন বউ পোষার হিম্মৎ না থাকে তো দু-চারটে বাইজীই পোষ!

সেই মর্মন্তুদ হেতুতেই ব্রজেন্দ্র নিত্য আবির্ভূত হন সহধর্মিণীর শয্যাকক্ষে। দুজনেই জানেন—খোলাখুলি কথা হয় না—আর বড় জোর দুটি বছর। মানে প্রায় সাতশোটি দিন।

দুপুরগুলো নষ্ট করার মানে হয়? কত কথা বলা হয়নি! কত কথা আছে, যা বারে বারে বলেও তৃপ্তি হয় না।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ কক্ষের বাহিরে পাদুকা ত্যাগ করে ভিতরে এলেন। ঘরে বিরাট বড় একটা পালঙ্ক—দ্বৈত শয্যা। কিন্তু এখন, এই দিবাভাগে কর্তা-মশাই অর্ধশযান থাকেন একটি আরাম-কেদারায়। উরুনিটা মুক্তোকেশীর হাতে দিয়ে উনি বসলেন নির্দিষ্ট আসনে। ব্রজসুন্দরী আধশোয়া হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর পিঠের দিকে দু তিনটি কামদার উপাধান। তাব পাশে শুভ ঘুমাচ্ছে। শুভপ্রসন্ন ওঁর নাতি—তারাপ্রসন্নের একমাত্র সন্তান। বছর-চারেক বয়স।

কর্তা উর্ধ্বমুখ হয়ে কী-যেন দেখে নিয়ে বলেন, আবার জ্বর এল নাকি? শীত শীত করছে?

ব্রজ বলেন, না তো। শীত করবে কেন?

—তাহলে টানা-পাখা বন্ধ যে?

—এক নাগাড়ে টানতে টানতে ওরাও তো ক্লান্ত হয়ে পড়ে। —বলেন, কিন্তু শয্যাপার্শ্বে বিলম্বিত একটি রেশমী রজ্জুতে আকর্ষণও করেন। সেটি 'কল-বেল'। তৎক্ষণাৎ টানা-পাখা চালু হল। যে চালায় সে কক্ষান্তরে।

ব্রজ বলেন, নন্দ ঠাকুরপোর বাড়িতে মহাপ্রসাদ খেতে গেলে না কেন কাল?

—তাতে ক্ষতি হয়নি। লৌকিকতাই শুধু নয়, মায়ের পূজায় যাওয়াটা কর্তব্য। তারাপ্রসন্ন গিয়েছিল।

—জানি। ফিরে এসে বলেছে সে কথা। কিন্তু সে আরও একটা অদ্ভুত কথা বলল, শুনেছ?

—শুনেছি। এতবড় কথাটা সে তোমাকে বলবে আর আমাকে বলবে না? কিন্তু হেতুটা কী, সেটা সে আন্দাজ করতে পারেনি।

—তোমার কী মনে হয়?

—জানি না, গিন্নি। গাঁয়ে তার বদনাম—'একবগ্গা'! আমার যদিও তা মনে হয়নি কখনো।

—রুপো বাঁড়ুজ্জে 'একবগ্গা' নয়? আপন খেয়ালে থাকে না?

—কী 'একবগ্গামি' দেখলে তার?

—বামুনের ছেলে, একটা ও বিয়ে করল না?

ব্রজেন্দ্র হেসে ফেলেন। বলেন, তাহলে তো আদি শঙ্করাচার্যও 'একবগ্গা'। আর তোমার ঐ সংজ্ঞাটা সম্প্রসারিত করলে 'আলিবর্দী'ও তো 'একবগ্গা'! নয়? নবাব হয়ে একটিমাত্র বেগম?

ব্রজসুন্দরীও মৃদু হেসে বলেন,'পরস্মৈপদী' ধাতু কেন গো কুলীনকুলতিলক? 'আত্মনেপদী' ধাতু কী দোষ করল।

ব্রজসুন্দরী শিক্ষিতা! এও এক ব্যতিক্রম! ব্রজেন্দ্রনারায়ণ অত্যন্ত সুগোপনে তাঁকে সংস্কৃত শিখিয়েছিলেন। সুগোপনে—কারণ সমাজ সেটা সে-কালে মেনে নিত না!

কথা ঘোরাতে কর্তা-মশাই বলেন, তোমার প্রথম যুক্তিটা খাটল না। বিবাহ না-করাটা একবগ্গামি নয়। আর কিছু?

—রূপেন্দ্র তার বাপের চতুষ্পাঠীটা তুলে দিল—

—এটা ভুল বললে, গিন্নি। বাবা চেয়েছিল সে ছয়-নম্বর কবিরাজ হ'ক। তাই সে হয়েছে।

—'ছয়-নম্বর কবিরাজ' মানে?

—'মালাকারশ্চর্মকারঃ নাপিতো রজকস্তথা। বৃদ্ধারণ্ডা বিশেষেণ কলৌ পঞ্চ চিকিৎসকাঃ ।।'[১] এরাই এতদিন আয়ুর্বেদশাস্ত্রের চর্চা করত। সৌরীন বাঁড়ুজ্জের তা পছন্দ হয়নি। তাই ছেলেকে কবিরাজ করে তুলেছে, টোল খুলতে দেয়নি।

—কিন্তু এখানে কে তার চিকিৎসা করাবে?

—দোষটা রূপেন্দ্রের নয়। তোমার-আমার। তুমিও তো রাজি হওনি। বল, ঠিক কি না?

—আমার এ রোগ সারবার নয় গো! আর কী জন্য বেঁচে থাকব, বলো? সবাইকে রেখে ড্যাংডেঙিয়ে স্বর্গে যেতে পারলে আর কী চাই?

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তবু হেসেই বললেন —সেটাই তো মুশকিল গিন্নি! এ পোড়া দেশে স্ত্রীলোকের চিকিৎসা হতে পারে না। কুমারী অবস্থায় সে চায় বাপ-মায়ের গলগ্রহ হয়ে না থাকতে। বিধবার তো কথাই নেই, মায় সধবার দলও ড্যাংডেঙিয়ে স্বর্গে যেতে চায়!

রূপেন্দ্রনাথকে বৈঠকখানায় প্রবেশ করতে দেখে দুর্গাচরণ উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানান, এস, বাবাজীবন! কতকাল পরে তোমাকে দেখলাম। তুমি গাঁয়ে ফিরে আসার পর রোজই ভাবি·····

একই কথা সবিনয়ে নিবেদন করলেন আগন্তুক। আমারই আগে আসা উচিত ছিল, কাকা। কিন্তু নানান কাজে—

—জানি, জানি। তোমার তো এখন দারুণ পশার! ক্রমাগত রুগীবাড়ি থেকে ডাক আসছে।

রূপেন্দ্রনাথ বুঝে উঠতে পারেন না—এটা অজ্ঞানকৃত না ব্যঙ্গোক্তি। পীরপুর এবং অন্ত্যজ পরিবারগুলি ছাড়া চিকিৎসক হিসাবে তাঁকে ইতিপূর্বে খুব অল্প লোকেই ডেকেছে। সেদিক থেকে আজই তাঁর প্রথম অভিযান। একটি বনেদী পরিবারে কবিরাজ হিসাবে আহ্বান পেয়ে আসা।

দুর্গাচরণের বৈঠকখানায় কাজ সারা হয়নি। তিনি রূপেন্দ্রনাথকে সংলগ্ন একটি কক্ষে নিয়ে এলেন। বার-মহলেই—একটি জনান্তিক কক্ষ। তেমন-তেমন গোপন পরামর্শের প্রয়োজনে ঘরটি ব্যবহৃত হয়। এঘরে এসে দুজনে দুটি চৌ-পায়ায় বসলেন। ভূমিকা ছেড়ে সরাসরি নেমে আসেন কাজের কথায়, তুমি হয়তো শুনে থাকবে গত বৎসর আমি একটি দারপরিগ্রহ করেছি। তোমাদের পাড়ারই পীতাম্বর ঠাকুরের কন্যাটিকে—

—হ্যাঁ, গাঁয়ে ফিরে এসে শুনেছি।

---

[১] "বাগানের মালী, কর্মকার, নাপিত, ধোপা আর পাড়ার বৃদ্ধা বেশ্যা—কলিযুগে এই পাঁচজনই হচ্ছে চিকিৎসক।"

—তিনিই রুগী। তাকেই একটু দেখতে হবে।

—কী উপসর্গ তাঁর?

—ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণ এবং বারে বারে বমি করছে।

—ক্ষুধামান্দ্য এবং বমন! ওঁর কি ··· অর্থাৎ?

একগাল হাসলেন বৃদ্ধ, এ না হলে ভেষগাচার্য! ঠিকই ধরেছ, বাবাজীবন। হ্যাঁ, জন্মসার্থক হতে চলেছে তাঁর। অনুমান এটি তৃতীয় মাস। শিরোমণি মশাই শান্তি-সস্ত্যেন করে গেছেন। শনি বক্রী চলছে ওঁর। জনাই ওঝা এসে ঝাড়ফুঁকও করে গেছে। ওঁর জন্মপত্রিকা অনুসারে পুত্রসন্তানই হবার কথা—নির্বিঘ্নেই; অবশ্য একটি কবচ ধারণ করতে হবে। সে ব্যবস্থাও নিয়েছি ···

রূপেন্দ্রনাথ নতনেত্রে বলেন, আমাকে তা হলে কেন ডেকে পাঠিয়েছেন গাঙ্গুলীকাকা? ব্যবস্থা যা নেবার সবই তো নিয়েছেন দেখছি।

—না, বাবা তুমি অভিমান কর না। তোমরা আজকালকার ছেলে, এসব মানতে চাও না। আমি সবরকম আটঘাট বেঁধেই কাজ করতে চাই। খরচ করতেও কুণ্ঠিত নই আমি। শান্তি-সস্ত্যেন, ঝাড়ফুঁক, তাবিচ-কবচ, কোবরেজি ঔষধ সব এক যোগে চলবে। বুঝেছ না? লাগে তাক, না লাগে তুক। এই বোধহয় শেষ চেষ্টা। এবার পুত্রসন্তান আমাকে লাভ করতেই হবে। পুন্নাম নরক অতি ভয়াবহ!

রূপেন্দ্রনাথ নীরব রইলেন।

—তুমি তোমার খুড়িমাকে একটি বার দেখ বাবা। ওষুধ-পাঁচন যা বিধান দেবে সব মানা হবে।

—পারবেন তো? লোকলজ্জায় পিছিয়ে যাবেন না?

—পারব না মানে? দুর্গা গাঙ্গুলী কাকে পরোয়া করে? আর লোকলজ্জার কথাটা এখনই আসছে কেন?

—রুগী না দেখেই বলছি—দেখলে হয়তো মতটা বদলাতেও পারে—সাধারণভাবে আমাদের চিকিৎসা-শাস্ত্র বলে এসময় মুক্তবায়ুতে প্রত্যহ কিছুটা পদব্রজে ভ্রমণ করতে হয়। খুড়িমাকে তা অনুমতি দেবেন তো?

আকাশ থেকে পড়লেন গাঙ্গুলী! গ্রামের পথে একটি স্ফীতোদরা সীমন্তিনী পদব্রজে পায়চারি করছেন! ভাবা যায়? একবার ইচ্ছে হল প্রশ্ন করেন, তোমাদের শাস্ত্রের কী নির্দেশ বাবাজীবন? সেই আসন্ন জননীর পরিধানে অন্তত একটা বস্ত্র থাকবে তো? না কি তাতে হাওয়া-খাওয়ায় বাধা হবে? কুণ্ঠিত হয়ে প্রকাশ্যে বলেন, সেটা যে নিতান্ত অসম্ভব তা তো বুঝতেই পারছ বাবা। তবে আমার অন্দরমহলের প্রাঙ্গণটি ছোট নয়। সেখানে যদি পদব্রজে ···

—ঠিক আছে। আগে রুগী দেখি। আপনি ভিতরে খবর পাঠান।

অন্দরমহলে খবর দেওয়া হল। ইতিমধ্যে একটি রূপার থালায় কিছু জলযোগ নিয়ে উপস্থিত হল একটি পরিচারিকা। সঙ্গে শোভারানী। গৃহস্বামী বললেন, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা, শোভা।

শোভা ব্রাহ্মণের পদধূলি নিল। বাপের দেহের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে এতক্ষণ নির্নিমেষ নেত্রে দেখছিল ঐ কন্দর্পকান্তি নব্যপণ্ডিতকে। শোভা জানে—ঐ লোকটির সঙ্গে বাবামশাই তার

বিবাহ প্রস্তাব তুলেছিলেন, তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। না, শোভাকে দেখে তিনি অপছন্দ করেননি। বিবাহ করবেন না বলে স্থির করে রেখেছেন বলেই এ প্রত্যাখ্যান। আচ্ছা, সে-কথা ওঁর কি মনে আছে? শোভার দিকে চোখ তুলে যখন দেখলেন তখন কি তাঁর মনে হয়েছিল—ঐ মেয়েটি হলেও হতে পারত তাঁর জীবনসঙ্গিনী?

একটু পর ডাক এল ভিতর থেকে।

দুর্গাচরণ ওঁকে পথ দেখিয়ে নিজের শয়নকক্ষে নিয়ে এলেন। পিছন পিছন শোভারানী। দ্বারের সম্মুখে চৌকাঠের ফ্রেমে বাঁধানো যেন একটি দেবী প্রতিমা। রক্ত চীনাংশুক তার পরিধানে, মাথায় আধো ঘোমটা, সর্বাঙ্গে নানান অলঙ্কার—এ ভদ্রাসনের নববধূ সে। রূপেন্দ্রনাথ অবশ্য সেসব কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না—তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল অলক্তকরাগ-রঞ্জিত নূপুরশোভিত একজোড়া রাতুল চরণে। মৃন্ময়ীর কিন্তু কোন সঙ্কোচ নেই। কেন থাকবে? উনি তো ওর সোনাদা! কাল সারারাত যাঁকে স্বপ্ন দেখেছে, আজ সারা সকাল যাঁর আগমন প্রতীক্ষা করেছে। নির্নিমেষ দুটি কাজলকালো চোখ মেলে সে দেখছিল ঐ অদ্ভুত মানুষটাকে। তারপর গলায় আঁচল দিয়ে সেই সেবারের মতো নিচু হয়ে ওঁকে প্রণাম করার উপক্রম করল। কিন্তু তার পূর্বেই রূপেন্দ্রনাথ নত হলেন মৃন্ময়ীর পদধূলি নিতে।

শিউরে উঠল মেয়েটি। এক লাফে পিছিয়ে গেল কিছুটা। অস্ফুটে আর্তনাদ করে উঠল, আমি মৃন্ময়ী, মীনু!

এতক্ষণে মুখ তুললেন। কাব্যের ভাষায় যাকে বলে 'চারিচক্ষের মিলন হওয়া'—তাই ঘটল। ম্লান হেসে রূপেন্দ্রনাথ বললেন, জানি, জানি, খুড়িমা। ঠিক আছে, আপনি বয়ঃকনিষ্ঠা, আমার প্রণাম যদি না নেন, তো নাই নিলেন।

পিছন থেকে দুর্গাচরণ হঠাৎ ফোড়ন কাটেন, প্রথম পোয়াতি তো! বড়ই লজ্জা ওর! এমনকি পেন্নাম নিতেও।

রূপেন্দ্রনাথ পিছনে ফিরলেন। একটু কঠিন শোনালো তাঁর কণ্ঠস্বর। বৃদ্ধকে বললেন, আপনি বৈঠকখানায় গিয়ে অপেক্ষা করুন। রোগিণীকে দেখা শেষ হলে আপনার সঙ্গে কথা হবে।

দুর্গাচরণ ঘাবড়ে যান। যা ব্বাবা! এ আবার কি অসৈরণ কথা! 'সোয়ামি' বলে কতা! তাকেও খেদিয়ে দেবে! মৎলবখানা কী?

—না, তুমি যেও না। তুমি থাকবে।

শেষ নির্দেশটা শোভারানীকে।

বৃদ্ধকে বিতাড়িত করে তিনজনে কক্ষের ভিতরে এলেন। এটাই বড়কর্তার শয়নকক্ষ। এক প্রান্তে বিরাট পালঙ্ক। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দু-একটি চারপাই ও বেতে-বোনা মোড়া। একটি আরাম-কেদারা। দেওয়ালে দেবদেবীর পটে আঁকা ছবি। কুলুঙ্গিতে কালিমাচিহ্ন—প্রদীপ রাখা হয় সেখানে। রূপেন্দ্রনাথ এবার প্রশ্ন করেন, আপনার শারীরিক কষ্ট কী জাতীয়?

মৃন্ময়ী এখনো স্বাভাবিক হতে পারেনি। সেই 'নয়' এর হিসাবটা! যে মানুষটার কাঁধে চেপে এককালে দামোদরে নৌকায় বাইচ খেলা দেখেছে, সে ওর চেয়ে কত বড়? অথবা কত ছোট? 'তুই' থেকে যেদিন হঠাৎ 'তুমি'তে উঠেছিলেন—বলেছিলেন 'তুমি এখনো খুকি' তখন মনে মনে কী যেন একটা প্রশ্ন করেছিল না মৃন্ময়ী? আজ সেই 'তুমি' ছেড়ে 'আপনি'-তে ওঠায়

মনে-মনেও কোন প্রশ্ন করতে পারল না। বুকের মধ্যে একটা ব্যথা টনটনিয়ে উঠছে শুধু।

—বলুন খুড়িমা? কী কষ্ট হয় আপনার?

অজান্তে সত্য কথাটাই বার হয়ে এল মুখ দিয়ে, বুকে বড় ব্যথা!

—বুকে ব্যথা! ঠিক কোনখানটায়? আচ্ছা, আপনি বরং শুয়ে পড়ুন। চিৎ হয়ে।

একটু চমকে ওঠে! চিৎ হয়ে! লোকটা বলে কী?

শোভারানীও অবাক হয়েছিল। তবু মায়ের হাত ধরে নিয়ে এসে পালঙ্কে শুইয়ে দেয়। চাদরটা টেনে পা দুটি ঢেকে দেয়।

—আপনার হাতটা দিন? —নিজের হাতটি প্রসারিত করে দেন চিকিৎসক।

—হাত! কেন?

—বাঃ! নাড়ি দেখব না?

আপাদমস্তক শিউরে উঠল মৃন্ময়ীর। একদিন সাহসে ভর করে ওঁর চরণ ছুঁয়ে প্রণামটা পর্যন্ত করতে পারেনি। আজ সেই তিনিই বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর হাত—পরস্ত্রীর পাণি গ্রহণ করবেন বলে! কিন্তু শুধু সেটুকুই নয়—মৃন্ময়ীর মনে পরে গেল, কোথায় যেন শুনেছে: অভিজ্ঞ কবিরাজ নাড়ি ধরে রোগিণীর মনের ভিতরের কথাটা টের পেয়ে যান! উনি যদি বুঝে ফেলেন! ওর বুকের ভিতরটা কী ভাবে উথাল-পাতাল হচ্ছে! কেন হচ্ছে!!

মৃন্ময়ী নিজের হাতটা গুটিয়ে নিয়ে শুধু বললে, ন্-না!

হাসলেন রূপেন্দ্রনাথ। তাঁর মনে পড় গেল আর একদিনের কথা। মীনুর কী দোষ? সে তো স্বয়ম্বরা হয়ে রাজরাজেন্দ্রাণী হয়নি। সে তো ছাগশিশু মাত্র। সমাজ তার গলায় দড়ি বেঁধে এই যূপকাষ্ঠে এনে ফেলেছে! তাই হাসতে হাসতেই বলেন, 'না' কেন? আমি তো আপনার মুখে আবীর মাখিয়ে দিতে চাইছি না!

বুকের মধ্যে আবার মুচড়ে উঠেছে হতভাগিনীর। ইচ্ছা করছিল একটা জান্তব আর্তনাদ করে প্রতিবাদ করতে! সেই সুখস্মৃতিটুকু নিয়ে এ জাতীয় ব্যঙ্গ ও সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু মুখ ফুটে তা বলতে পারল না। একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে নীরব প্রতিবাদ জানাতে চায়। 'না'-য়ের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে।

উনি ভুল বুঝলেন। এটা যে নীরব প্রতিবাদের ভঙ্গি তা বুঝলেন না। ওর প্রসারিত কর গ্রহণ করে নাড়ি দেখতে শুরু করলেন। মৃন্ময়ী দাঁতে দাঁত দিয়ে তার আন্তর আকৃতিটাকে গোপন করবার চেষ্টা করতে থাকে।

দীর্ঘ সময় নাড়ির গতি পরীক্ষা করে রূপেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন, ভয়ের কিছু নাই। নাড়ির গতি দ্রুত—সম্ভবত উত্তেজনায়। হয়তো যে কথাটা গোপন করতে চাইছিল মীনু, তা বুঝে ফেলেছেন। নাড়ির স্পন্দনে নয়, ওর আচরণে, ওর মুখের রক্তিমাভায়। ওর সর্বাবয়বে সেই গোপনবার্তার অনুরণন। এ যে মানুষে কেমন করে বোঝে তা বোঝানো যায় না। বোধ করি একই তরঙ্গভঙ্গে যখন দুটি হৃদয় স্পন্দিত হতে থাকে তখন 'বে-তারে' ধরা পড়ে একের কাছে অপরের গোপন কথা!

হয়তো ওঁর গোপন কথাটাও বুঝে ফেলেছে ঐ বোকা মেয়েটা—কেন তিনি গ্রামে ফিরে আসার পর জগুঠাকরুণকে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর সিদ্ধান্ত: তিনি আজীবন কৌমার্যব্রত পালন

করে আর্তের সেবা করে যাবেন।

ধীরে ধীরে রোগিণীর হাতটা নামিয়ে রেখে বলেন, ভয়ের কিছু নাই। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ। বমনের যে বেগটা আছে ওটা স্বাভাবিক—জৈব বৃত্তি। নির্বিঘ্নেই সন্তান জন্মাবে।

এবার উনি 'আপনি তুমি' এড়িয়ে কথা বলেছেন।

শোভারানী হঠাৎ ফস্ করে প্রশ্ন করে বসে, ছেলে না মেয়ে?

রূপেন্দ্র ওর দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত হাসলেন। বলেন, সে কথা দৈবজ্ঞই শুধু বলতে পারেন, শোভা, চিকিৎসক পারে না।

নিজের অজান্তেই মীনুও হঠাৎ একটা কথা বলে বসেছে, কিন্তু ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ···

চোখে চোখ পড়তেই থেমে যায়।

রূপেন্দ্রনাথের মনে পড়ে যায়, 'জয়ন্তপ্রতিম সুতঃ'!

ম্লান হেসে বলেন, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ একালে অমোঘ নয়—'অমোঘ ব্রাহ্মণাশীষঃ' নীতিবাক্যটা শুধুমাত্র সত্যযুগের জন্য। কলির ব্রাহ্মণের সে ক্ষমতা নেই, মৃন্ময়ী।

মৃন্ময়ী! 'খুড়িমা' নয়! চোখ দুটি জলে ভরে আসে।

'পৌলমী' সে হতে চায়নি, পাকেচক্রে হয়ে গেছে। কিন্তু একটি পুত্রসন্তান যে তার চাই-ই! না হলে তাকে এ ইন্দ্রপুরী থেকে নেপথ্যে সরে যেতে হবে! তার অবমাননার শেষ থাকবে না!

রূপেন্দ্রনাথের পরবর্তী কথাটায় এ চিন্তার ছেদ পড়ল। কথাটা শুনে যেন বজ্রাহতা হয়ে গেল মৃন্ময়ী!

রূপেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, এবার বুকটা একবার দেখব, মীনু!

কথাটা বলে তিনি পুলিন্দা হাৎড়াতে থাকেন।

'স্টেথোস্কোপ' যন্ত্রটা তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু তার একটি আদিমরূপের ব্যবহার ছিল আরব-পারস্যে। মুঘলযুগে হাকিম-উল্-মুলুকদের মাধ্যমে সেটি এসে পৌঁচেছে ভারত-খণ্ডেও। দু-মুখো ক্ল্যারিওনেট জাতীয় একটা যন্ত্র। তার দুপ্রান্তে দুটি ভেক-চর্ম। এক প্রান্ত রোগীর বক্ষস্থলে স্থাপন করলে অপরপ্রান্তে চিকিৎসকের কর্ণমূলে হৃদস্পন্দনের শব্দ শ্রুত হয়। রূপেন্দ্রনাথের তেমন একটি যন্ত্র ছিল পুলিন্দায়। তিনি সেটি খুঁজে বার করতে নিচু হয়েছেন। তাই নজরে পড়েনি, তাঁর কথাটা শুনে কী জাতীয় প্রতিক্রিয়া হয়েছে কক্ষে উপস্থিত দুটি যুবতীর মুখাবয়বে। মৃন্ময়ীর মুখটা ক্ষণেকের জন্য আরক্তিম হয়ে উঠেছিল—পরমুহূর্তেই তা রক্তশূন্য। শোভারানীও বিচলিতা। বস্তুত 'কবিরাজ' জীবটিকে সে ইতিপূর্বে কখনো দেখেনি। চিকিৎসা-পদ্ধতি কী জাতীয় হয় কিছুই জানা নেই। তার মনে হল—হয় তো এটাই নিয়ম। নাড়ি দেখার পর বুক দেখা! নাড়ির স্পন্দনের পর বুকের স্পন্দন!

মৃন্ময়ী আর শায়িতা নয়। উঠে বসেছে। অস্ফুটে বলে, কী বললেন?

তখনও যন্ত্রটা খুঁজে পাননি। মুখ নিচু করেই পুনরুক্তি করেন, বুকটা একটু দেখব!

মৃন্ময়ী যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারল না।

যন্ত্রটা খুঁজে পেয়েছেন। সেটা হাতে নিয়ে সোজা হয়ে বসেই ওঁর নজর পড়ল রোগিণীর দিকে। প্রশ্ন করেন, কী হল?

—আপনি ··· আপনি ···

শোভারানী ওর বাহুমূল ধরে ফেলে।

অস্ফুটে বলে, এটাই নিয়ম ছোট মা। আমি কাঁচুলির বাঁধন খুলে দিচ্ছি। লজ্জা করবেন না। উনি এবার আপনার বুক দুটো দেখবেন।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন রূপেন্দ্রনাথ। কী সর্বনাশ! তাঁর উচ্চারিত 'বুক' শব্দটা সহসা দ্বিবচনে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ায় মুহূর্তমধ্যে প্রণিধান করেছেন—এদের কী মর্মান্তিক ভ্রান্তি হয়েছে।

কিন্তু প্রতিবাদে তিনি কোন কথা বলার পূর্বেই গৃহের দ্বার উন্মোচিত হল। বোঝা গেল, গৃহস্বামী দৃষ্টিসীমার বাহিরেই ছিলেন শুধু, শ্রুতিসীমার নয়। ধীর পদক্ষেপে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে এবার কন্যাকে বলেন, তুই ভিতরে যা!

শোভারানী তার বিমাতার পৃষ্ঠদেশে কঞ্চুলিকার ফাঁসটি সবেমাত্র উন্মোচিত করেছে। নিদারুণ আতঙ্কে, লজ্জায় আরক্ত আননে মৃন্ময়ী বাধা দিতে ভুলে গেছে যেন। বাবার আদেশে ঐ অবস্থাতেই শোভারানী শয়নকক্ষ থেকে নিস্ক্রান্ত হয়ে গেল। বৃদ্ধ বললেন, তোমার রুগী দেখা শেষ হয়ে গেছে, রূপেন্দ্রনাথ। এস, আমার সঙ্গে এ ঘরে এস।

রূপেন্দ্রনাথ আর্তকণ্ঠে বলে ওঠেন, না! আপনারা আমাকে ভুল বুঝেছেন! সে কথা বলতে চাইনি আমি।

দুর্গাচরণ দৃঢ়স্বরে বলেন, এ ভদ্রাসনটি আমার। আমিই গৃহস্বামী। আমি তোমাকে আদেশ করছি রূপেন্দ্রনাথ। বাইরে এস। তোমার যা কৈফিয়ৎ তা আমাকেই দিও। এস—

রূপেন্দ্রনাথ একবার পিছন ফিরে দেখলেন। ভয়ে, বিস্ময়ে, লজ্জায় এবং সম্ভবত আরও কোন অনুভূতিতে মৃন্ময়ী আর মানুষ নয়: মৃন্ময়ী!

বৈঠকখানার নির্জনে এসে গাঙ্গুলী বলেন, আমি তোমার কোন কৈফিয়ৎ শুনতে চাইনে—এ তোমার সাময়িক চিত্তচাঞ্চল্য, দুর্মতি না চিকিৎসাপদ্ধতির অঙ্গ তা জানবার কোন কৌতূহল নেই আমার। যদি চিকিচ্ছেই হয়, তাহলে বলব সেটি ···· থাক! শুনেছি, তোমরা প্রতিবেশী—নিতান্ত অল্পবয়সেই তোমাদের দুজনের মধ্যে ····

—কী বলছেন আপনি। শুনুন—

—না। তোমাকে বৈদ্যবিদায় হিসাবে কয় কপর্দক দিতে হবে তাই শুধু বল। এ পৈশাচিক চিকিৎসার কথা আমি কিছু শুনব না। তবে একটা কৌতূহল যদি মিটিয়ে যাও তাহলে খুশি হব—

—কী?

—যুবতী নারীর বুকজোড়া দেখার সখ যদি এতই প্রবল, তাহলে কুলীন বামুন হয়ে তুমি কেন ····

রূপেন্দ্রনাথ তাঁর পুলিন্দাটা তুলে নিয়ে বললেন, থামুন! আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ। সম্পর্কেও বড়। তবু আপনার সঙ্গে বাক্যালাপ করতে আমার আজ ঘৃণা হচ্ছে। আজ থেকে আপনার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই!

—বুঝলাম! তা বাবা সম্পর্কটা কার সঙ্গে রাখবে? দুর্গা গাঙ্গুলী তোমার শত্তুর, নন্দ

চাটুজ্জেও তাই। তোমার পরমাত্মীয় কি ঐ পীরপুরের কলিমুদ্দীন মোল্লা? সোঞাই গাঁয়ে তিষ্ঠুতে পারবে?

বিনা প্রত্যুত্তরে রূপেন্দ্রনাথ বার হয়ে গেলেন।

গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সংবাদটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল : ব্রজসুন্দরী অন্তর্জলিযাত্রায় যাচ্ছেন!

সোঞাইয়ের কাছে-পিঠে গঙ্গা নাই। গ্রামটি দামোদরের প্রসাদধন্য।গঙ্গাতীরে উপনীত হবার দুটি বিকল্প পথ। স্থলপথে অথবা জলপথে। ডুলি নিয়ে সড়ক ধরে যদি এগিয়ে যাও গলসি, বর্ধমান, মন্তেশ্বর হয়ে মহাতীর্থ নবদ্বীপধামে উপনীত হবে পাঁচদিনের মাথায়। দ্বিতীয়ত জলপথ। সময় হয়তো কিছুটা বেশি লাগবে। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রীর পক্ষে সেটা আরামদায়ক। নৌকায় ঝাঁকি কম। সে পথ প্রথমে সিধা উত্তরমুখো। দামোদর পার হয়ে উত্তর-মুখো চলতে থাকলে পৌঁছাবে অজয়ের তীরে। নৌকা পাবে সেখানে। চলতে থাক পূর্বাভিমুখে। পথে পড়বে ইলামবাজার। জয়দেব-কেন্দুবিল্বের কাছাকাছি। তারপর মঙ্গলকোট, কাটোয়া। এই কাটোয়াতে অজয় বিলীন হয়েছে গঙ্গায়। রোগীর অবস্থা যদি ইতিমধ্যে সঙ্গীন হয়ে উঠে থাকে, তাহলে নবদ্বীপে যাওয়ার চেষ্টা কর না। কাটোয়ার গঙ্গাতীরেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সব কিছু পাবে সেখানে—হরিসংকীর্তনের দল থেকে চন্দন কাঠ। আর তখনো যদি রোগীর পার্থিব বন্ধন ছিন্ন হবার মুহূর্তটি আসন্ন না হয়ে থাকে, তবে এবার গঙ্গা বেয়ে দক্ষিণাভিমুখে চলতে পার। অচিরেই উপনীত হবে শ্রীচৈতন্য-পদরজধন্য নবদ্বীপধামে।

স্থির হয়েছে ওঁরা নদীপথেই যাবেন। কাটোয়া অথবা নবদ্বীপ? সেটা—'ক্ষেত্রে কর্ম বিধিয়তে'। রোগীর অবস্থা বুঝে।

সেই মতো যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাড়ম্বরে শেষযাত্রার আয়োজনে সবাই ব্যস্ত। শুধুমাত্র রোগিণী একা গেলেই তো চলবে না—যেতে হবে বৃদ্ধার একমাত্র পুত্র তারাপ্রসন্নকে। না হলে, মুখাগ্নি করবে কে? এমনকি যেতে হবে স্বয়ং জমিদার-মশাইকেও। না হলে, অন্তিম মুহূর্তে সতীসাবিত্রীর ওষ্ঠাধরে পতিদেবতার পাদোদকটুকু দেওয়া যাবে কী ভাবে?

এল ডুলি, পালকি, সারি সারি গোযান। গো-গাড়িতে যাবে মালপত্র। অনেক আগেই রওনা হবে তারা স্থলপথে। পথে চোর-ডাকাতের ভয় নাই। নবাব আলিবর্দীর সুবন্দোবস্তে সমগ্র রাজ্যে শান্তি বিরাজিত। তবু আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনে সঙ্গে যাবে পাইক বরকন্দাজ। যাত্রা-মুহূর্তটি সুচিহ্নিত। রওনা হতে হবে কৃষ্ণা তৃতীয়ার সূর্যোদয়-মুহূর্তে। পঞ্জিকা দেখে যাত্রা-মুহূর্তটি নির্ধারণ করে দিয়েছেন স্বয়ং বাচস্পতি। কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি ভাদুড়ী মশায়ের কুলগুরু। প্রতিটি মোচ্ছবেই তাঁর শুভাগমন ঘটে। দোল, দুর্গোৎসব, পুণ্যাহে। এবারও সংবাদ পেয়ে এসেছেন। বিধানটা তাঁরই—ঐ অন্তর্জলিযাত্রা। গ্রহ সংস্থান ও কোষ্ঠি বিচার করে উনি সিদ্ধান্তে এসেছেন

তিন-চার সপ্তাহ পরে—ঐ পূর্ণিমার কাছাকাছি পটাকাশ-ঘটাকাশে আর ফারাক থাকবে না। পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্তি পাবেন ব্রজসুন্দরী। গুরুদেব অন্তর্জলিযাত্রার দলে যাচ্ছেন না। গৃহলক্ষ্মীকে রওনা করে দিয়ে তিনি যজ্ঞ করতে বসবেন। অনির্বাণ শিখায় জ্বলতে থাকবে হোমাগ্নি। যতদিন না সংবাদ আসে গঙ্গাতীরে জীবাত্মা বিলীন হয়ে গেছে পরমাত্মায়। এ জন্য গুরুদেব দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ শিষ্য সমভিব্যাহারে এসেছেন। যাতে অহোরাত্র যজ্ঞে কোনও ব্যত্যয় না হয়। অপরিসীম দার্ঢ্যে বাচস্পতি ঘোষণা করেছেন—এ মহাযজ্ঞ অমোঘ! অব্যর্থ! কোন যমদূতের পিতৃদেবেরও দুঃসাহস হবে না সতীলক্ষ্মীর পুষ্পকরথের সম্মুখে এসে পথ রুখতে। গঙ্গাতীর থেকে পুষ্পকরথ না থেমে সোজা চলে যাবে খাশ বৈকুণ্ঠলোক—

গোঘ্নোবাপি চ চণ্ডালো দুষ্টো দুষ্টচেতনঃ।
বালঘাতী তথাহবিদ্বান্ ম্রিয়তে তত্র বৈ যদা।।

গো-হত্যার পাপ, শিশু হত্যার পাপও এই হোমাগ্নিশিখায় পুড়ে খাক হয়ে যায় যে! চণ্ডাল, শঠ, দুষ্টচেতা, বিদ্বান, মূর্খ কোন বাছবিচার নেই—যজ্ঞান্তে পূর্ণাহুতির অবসানে যজমান লাভ করে বৈকুণ্ঠধামের অধিকার। ব্রজসুন্দরী এমনিতেই পুণ্যাত্মা, সতীলক্ষ্মী—তাঁর অক্ষয় বৈকুণ্ঠবাস ঠেকায় কোন 'ইয়ে'। জমিদার-বাড়ির 'মাচিঘর' অর্থাৎ ভাণ্ডার থেকে আড়াই মণ গব্যঘৃত বার করে দিয়েছে গোমস্তা। সোজা কথা! যমদূত তো ছাড়, তার চৌদ্দপুরুষ এ দিগড়ে ভিড়বে না! আড়াই মণ গব্য ঘৃত! সোজা 'কতা'?

শুধু সোঞাই বা পঞ্চগ্রামেই নয়, পুণ্যাত্মা মহিলা হিসাবে—দেবীর অংশ হিসাবে, ব্রজসুন্দরীর খ্যাতি দূর-দূরান্তে প্রসারিত। পাকা চুলে কুলীনের ঘরে অসপত্ন অধিকারে সংসার করে গেলেন দেড়কুড়ি বছর! সেটাই একটা দুর্লভ ব্যতিক্রম। তাছাড়া, তাঁর স্বামীর ঐশ্বর্য কুবেরেীর্ষিত, প্রতাপ ইন্দ্রের মতো আর দাম্পত্য জীবনের একমুখিনতা শ্রীরামচন্দ্রের মতো। এমন সৌভাগ্যশীলা ভাগ্যবতী কে কোথায় দেখেছে?

কিন্তু সেজন্যই শুধু নয়, ব্রজসুন্দরীর উপর দেবীত্ব আরোপিত হয়েছিল আর একটি অলৌকিক ঘটনায়। অবিশ্বাসীরা তার লৌকিক ব্যাখ্যা দেবার অপচেষ্টা যে না করে তা নয়—বলে, এ নিতান্তই কাকতালীয়। কিন্তু যারা ভগবৎ-বিশ্বাসী তারা বুঝতে পারে 'এহ বাহ্য, আগে কহ আর।'

সে অনেক-অনেক দিন আগেকার কথা। ব্রজসুন্দরী তখন পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়া। একটি মাত্র সন্তানের জননী—তারাপ্রসন্ন।

কৃষিনির্ভর অঞ্চল। আর কৃষকের ভাগ্য বৃষ্টির সময় ও পরিমাণের সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ। দু-পাঁচ-দশ বছর পর পর আসে 'আকাল'—অনাবৃষ্টি। অনাবৃষ্টি মানে অনাসৃষ্টি। মা ধরিত্রীর বুক চৌচির হয়ে যায়। দিগন্তজোড়া মাঠ খাঁ-খাঁ করতে থাকে। তৃণগুল্ম পর্যন্ত নিঃশেষিত। গোচারণ ভূমি সব ব্রহ্মডাঙার মাঠ। শুরু হয় প্রথমে গো-মড়ক! তাতে লাভবান হওয়ার কথা বায়েন পরিবারের; কিন্তু তারাও যুক্তকরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায়—এমন সৌভাগ্য যেন না আসে! সে দৃশ্য চোখ চেয়ে দেখা যায় না। আকাশের কোণে কোণে কালো মেঘের বদলে সঞ্চরমান শকুন! মাথায় হাত দিয়ে বসে চাষীভাই। ইলামবাজার, বর্ধমান, খাশ মুর্শিদাবাদে ক্রীতদাসের দাম হু-হু করে পড়তে থাকে। দলে দলে গ্রামের মানুষ চলতে থাকে

শহর গঞ্জের দিকে। এক ধামা মুড়ির বিনিময়ে তাদের পরিবার থেকে নির্বাচন করে নিতে পার যে কোন যৌবনবতীকে। যাকে মনে ধরে! ক্রীতদাসী! আমৃত্যু না হলেও, আযৌবন তারা নিত্য-সেবায় খাড়া থাকবে।

সেই আকালের বৎসরে গ্রামের মানুষ শিবের দোরে 'হত্যা' দেয়। মানত করে। মায়ের থানে জোড়া পাঁঠা বলি দেয়। শেষমেশ ব্যাঙের বিয়ে। তাতেও বৃষ্টি না নামলে অন্তিম প্রচেষ্টা—সার্বজনীন 'পর্যন্তদেবের' পূজা।

'পর্যন্তদেব' এক লৌকিক দেবতা। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে তাঁর নামটা যে কোন পুরাণে লেখা আছে তা এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি বটে, তবে শিরোমণি-মশাই বলেন আছে, নিশ্চয় আছে। না হলে আবহমানকাল ধরে আকালের বছর তাঁরে স্মরণ করা হয় কেন? আর মনে করে দেখ, বাবা-সকল—তাঁর কৃপাতেই শেষমেশ বর্ষা নামে।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থটাও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন শিরোমণি মশাই, নামটির অর্থ বুঝলি তো? ওনার বাস মানুষের শেষ সহ্য সীমান্তে। 'আকাল' মানে দেবতার রোষ। কোন কিছু অন্যায় হয়েছে—অজান্তে—মানে সবাই তা টের পায়নি। তাই এই অনাবৃষ্টির অনাসৃষ্টি। সহ্য কর তোমরা। তারপর শেষ সীমান্তে পৌঁছে দেবতাকে বল: আর পারবনি বাবা! আমাদের সইবার ক্ষ্যামতা এই পর্যন্ত! তখনই 'পর্যন্ত' দেবের পূজা করতে হয়। বৃষ্টি নামে। পর্যন্তদেবের গায়ের রঙটি নিকষ কালো— নীলের আভা। চতুর্ভুজ—বরাভয়, লক্ষ্মীর ঝাঁপি আর বজ্র।

দু-দশ বছর বাদে—আকালের বছরে—এ অঞ্চলে পর্যন্তদেবের সার্বজনীন পূজা হয়। রূপেন্দ্রনাথ তর্কপঞ্চাননকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: 'পর্যন্তদেব'-এর বর্ণনা কোন পুরাণে আছে। আদ্যোপান্ত শুনে সেই মহাপণ্ডিত বলেছিলেন, আমার মনে হয়, এই লৌকিক দেবতাটি অর্বাচীন নয়। সম্ভবত পুরাকালে তাঁর নাম ছিল : পর্জন্যদেব! শব্দটা লোক মুখে 'পর্যন্তদেব' হয়ে গেছে; পর্জন্য একজন বৈদিক দেবতা। তাঁর গাত্রবর্ণ ঘন নীল, হাতে বজ্র মেঘ দিয়ে তিনি অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করেন। ঋগ্বেদে তাঁর নামে তিনটি সূক্ত আছে।

পঞ্চম মণ্ডলের ত্র্যশীতিতম সূক্তের দ্রষ্টা অত্রিপুত্র ভৌম ঋষি, ছন্দ : ত্রিষ্টুপ এবং দেবতা: পর্জন্যদেব। গীতাতেও আছে: 'পর্জন্যাৎ অন্নসম্ভবঃ'!

যে বছরের কথা বলছি—প্রায় বিশ বছর আগে, সেবার কিন্তু 'পর্যন্তদেব' বা 'পর্জন্যদেব'-ও করুণা করলেন না। এমনটি কখনো হয়নি আতঙ্কে সবাই হিতাহিত জ্ঞান হারাতে বসল।

হঠাৎ একমুঠি-বাবা এসে বললে, ঐসিন নেহী হোগা! যবতক্ বড়ামাঈ নহী আয়েগি, পূজা নহী চড়ায়েগি, তব্তক বাবা খুশ নেহি হোগা!

একমুঠি-বাবা এক পাগল সন্ন্যাসী। ভোলাবাবার মন্দিরের গায়ে যে ভবানী মন্দির—সেখানেই আছে আবহমানকাল। কেউ বলে তার বয়স সওয়া শ, কেউ বলে দেড়শ। গ্রামের প্রাচীনতম অশীতিপর বৃদ্ধও বলেন, বাল্যকালে একমুঠি-বাবার চেহারা ঠিক একই রকম

দেখেছেন—এক মাথা জটা, একবুক দাড়ি, হাতে ত্রিশূল, কানে মাকড়ি আর ডান হাতের অনামিকায় একটা অষ্টধাতুর প্রকাণ্ড আংটি। বিদেশী নিশ্চয়—সেটা তাঁর বাচন-ভঙ্গিতেই বোঝা যায়। কিন্তু কোথা থেকে যেন এখানে এসে ঘাঁটি গেড়েছেন কেউ জানে না।

পাগল মানুষটার কথা মানাও চলে না, ফেলাও চলে না। তাঁর কথাটা অবশ্য সত্য। জমিদার গৃহিণী আজ মাসখানেক শয্যাশায়ী। তিনি বারোয়ারীতলায় আসেননি, আসতে পারেননি।

লোকমুখে একমুঠি-বাবার ঐ নিদান শুনে ব্রজসুন্দরী জিদ ধরলেন তাঁকে পূজাতলায় নিয়ে যেতে হবে। পাল্‌কি চেপে তিনি এলেন; কিন্তু বাবাকে অর্ঘ্য নিবেদন করার সময় তাঁর মাথা টলে উঠ্‌ল। তিনি মূর্ছিতা হয়ে পড়ে গেলেন বাবার সামনে। হস্তধৃত নৈবেদ্যের থালাটা ঠিকরে গিয়ে পড়ল মূর্তির চরণে।

ধরাধরি করে মূর্ছিতাকে সবাই বার করে আনল।

নিতান্ত কাকতালীয় ঘটনা! সেরাত্রেই প্রবল বর্ষণে মাঠঘাট ভেসে গেল!

সেই দিন থেকেই আপামর জনসাধারণের বিশ্বাস ব্রজসুন্দরী কোন শাপভ্রষ্টা স্বর্গের দেবী। জমিদারবাড়িতে এসে একটা নিষ্পাপ জীবন কাটিয়ে গেলেন। আজ মেয়াদ অন্তে শাপভ্রষ্টা স্বর্গে ফিরে যাচ্ছেন!

আর সেই জন্যেই খবরটা যখন গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হয়ে গেল তখন দূর-দূরান্তর থেকে গোযান আসতে শুরু করল সোঞাই অভিমুখে। ওরা 'বড়মা'কে শেষ প্রণাম করতে আসছে।

দুরন্ত অভিমানে জগুঠাকুরুণ বাক্যালাপ বন্ধ করেছেন তাঁর ভাইপোর সঙ্গে। দুর্গা গাঙ্গুলীর বাড়িতে ঠিক কী ঘটেছিল তা জানেন না, তবে উপসংহারে দুজনে যে দুজনার মুখ দেখাদেখি বন্ধ করেছেন এটুকু সংবাদ পাওয়া গেছে। ওর 'একবগ্গামির' একটা সীমা থাকবে তো!

জগু তাঁর কন্যাটিকে বলেন, তোর দাদাকে জিজ্ঞেস কর—ও কি যাবে আমাদের সাথে?

রূপেন্দ্রনাথ ছিলেন শ্রুতিসীমার মধ্যেই। প্রশ্ন করেন, কোথায় পিসি?

কিন্তু জগু তো কথা বলবেন না। তাই কাত্যায়নীকেই বলেন, বল না তোর দাদাকে সব বিত্তান্ত। জেনে নে—ওর শাস্তর কী বলে! জ্যেঠিকে পেন্নাম করাটা কি শাস্তর-সম্মত হবে? নাকি তার শাস্তরে মানা!

কাত্যায়নী অতি দ্রুত বাধা দিয়ে বলে, কাল সকালে বড়মা শেষ যাত্রা করবেন। মা আর আমি যাচ্ছি তাঁকে পেন্নাম করতে। তুমি আসবে?

রূপেন্দ্রনাথ বলেন, আপনি আমার উপর অহেতুক রাগ করে আছেন, পিসিমা। আমি অন্যায় কিছু করিনি···

জগুপিসি কাতুকেই নির্দেশ দেন, তোর দাদাকে বলে দে, আমরা এগুচ্ছি। তার মন চায় তবে সে যেন আসে, না চায় নেই! আমার সব সইবে!

ব্রজসুন্দরীকে নামিয়ে আনা হয়েছে পূজামণ্ডপে। বাড়িটি চক মেলানো। অর্থাৎ চারিদিকে সারি সারি ঘর। মাঝখানে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। সেটা পূজামণ্ডপ। এখানেই দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা হয়। আবার ঝুলনে রাধাকৃষ্ণের দোলনমঞ্চ। এই প্রাঙ্গণেই বসে যাত্রার

আসর। কীর্তনের আসর। বর্তমানে ঐ প্রাঙ্গণের কেন্দ্র-স্থলে একটি সুসজ্জিত পালঙ্কে গৃহস্বামিনী শায়িতা। তাঁর পরিধানে নিতান্ত বেমানান একটি অত্যন্ত মহার্ঘ বেনারসী শাড়ি। বেমানান এজন্য যে, বৃদ্ধার পরিধানে তা দৃষ্টিকটু। কিন্তু জগুঠাকুরুণ কোন কথা শোনেননি। বলেছিলেন, গঙ্গাজল, আর কোনদিন তো তোকে কিছু বলতে আসবনি। কতা শোন! এই বে-র বেনারসী পরেই ড্যাংডেঙিয়ে যাত্রা করতে হবে।

জগুঠাকুরুণ ব্রজসুন্দরীর 'গঙ্গাজল'। সখী। ব্রজসুন্দরী এই শেষ অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেননি। বড়বৌমা—তারাপ্রসন্নের স্ত্রী, তাই এই শাড়িখানিই পরিয়ে দিয়েছেন তাঁকে। বৃদ্ধার মাথায় অপর্যাপ্ত সিন্দূর, চরণদুটি অলক্তকরাগরঞ্জিত। তিনি শয্যালীন। কিন্তু পূর্ণ জ্ঞান আছে। বিহ্বল দটি চোখ মেলে তিনি সবাইকে দেখছিলেন। চিনতে পারছিলেন। শয্যালীন হলেও তাঁর মাথার পিছনে কয়েকটি উপাধান—শায়িত অবস্থায় প্রণাম করতে নেই—এমনকি অন্তর্জলিযাত্রার পথিককেও!

রূপেন্দ্রনাথ যখন এসে উপস্থিত হলেন তখনো অপরাহ্ণের আলো আছে। সন্ধ্যা হতে আরও দুদণ্ড বাকি। সমস্ত গ্রাম ভেঙে পড়েছে। প্রাঙ্গণে তিলধারণের ঠাঁই নাই। শয্যালীনাকে ঘিরে পুরললনার দল। পুরুষেরা প্রাচীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। বাহিরেও অনেক দর্শনার্থী। তারা সারিবদ্ধভাবে প্রবেশ করে প্রণাম করে অন্য নিক্রমণ দ্বার দিয়ে বহির্গত হয়ে যাচ্ছে। সারা দুপুর ধরে। রূপেন্দ্রনাথ অনেককেই চিনতে পারলেন, যদিও তিনি গ্রামের অনেককেই চেনেন না। বরাবর ভিনগাঁয়ে থাকায়। বৃদ্ধার চরণপ্রান্তে বসে আছেন বৌঠান—তারাপ্রসন্নের সহধর্মিণী। তার পাশে পুঁটু। ওপাশে নন্দখুড়োর দুই স্ত্রী, তার পরে শোভারাণী, মতি, মৃন্ময়ী। তার পাশে কাত্যায়নী। জগুপিসি বৃদ্ধার মাথার কাছে। রূপেন্দ্রনাথের লক্ষ্য হল বৃদ্ধা সজ্ঞানে আছেন। দু-চারটি কথাও বলছেন। কথোপকথন শুনতে পাচ্ছিলেন না তিনি। পেলে বুঝতে পারতেন—জগুঠাকুরুণ প্রশ্ন করেছিলেন, কীরে গঙ্গাজল? ভয় করছে?

বৃদ্ধা বলছিলেন, ওমা, ভয় করবে কেন রে? ভর-ভরান্ত সংসার রেখে যাচ্ছি—এতো আনন্দের যাওয়া। শুধু ঐ বুড়োটার জন্যে—ওকে একটু দেখিস্, গঙ্গাজল!

ঢেঁকি নাকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। রূপেন্দ্রনাথ রোগীবাড়ি এসেছিলেন তাঁর সেই বিচিত্র পুলিন্দাটি হাতে নিয়ে। এখন মনে হল ভুল করছেন তিনি। এ রোগের চিকিৎসা নেই। এই রোগীবাড়ি থেকে কেউ তাঁকে কোনদিন ডাকেনি—চিকিৎসক হিসাবে। কিন্তু এ বাড়ির দ্বার তাঁর কাছে অবারিত। বছর বছর দোল-দুর্গোৎসবে এসেছেন। সামাজিক নিমন্ত্রণ রাখতে তো কতবার। ব্রজসুন্দরী তাঁকে ভালও বাসতেন খুব। ব্রজেন্দ্রনারায়ণও। কিন্তু এখন তিনি অবাঞ্ছিত। যে রোগী মৃত্যুর কাছে দাসখৎ লিখে দিয়ে বসে আছে তার চিকিৎসা হয় না।

দাসখৎ? না, কথাটা ঠিক হল না। বরং বলা উচিত মৃত্যুই ওঁর কাছে দাসখৎ লিখে দিয়েছে। মৃত্যু তার মহিমা, তার ভয়াবহতা, তার আতঙ্ককে ত্যাগ করে রীতিমতো চোরের মতো এসে চুপটি করে দাঁড়িয়েছে ওঁর পদপ্রান্তে। নতনেত্রে। তার লজ্জার সীমা-পরিসীমা নেই। নেহাৎ অভ্যাসবশে প্রতীক্ষা করছে—কখন ঐ সীমন্তিনী ড্যাংডেঙিয়ে যাত্রা শুরু করবেন।

—রূপেন!

সম্বিত ফিরে পান রূপেন্দ্রনাথ; পাশে ফিরে দেখেন তারাপ্রসন্ন এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর

পাশটিতে। চোখাচোখি হতে বলেন, বাবামশাই তোমাকে একবার ডাকছেন।

—জেঠামশাই! কই কোথায় তিনি?

—এস আমার সঙ্গে।

তাই তো! গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিটা তো এতক্ষণ নজরে পড়েনি।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ বসেছিলেন পাশের ঘরে। একা। ঘরজোড়া তক্তাপোশে ফরাস বিছানো। উনি কিন্তু বসেছিলেন একটি আরাম-কেদারায়। ইঙ্গিতে বসতে বললেন রূপেন্দ্রনাথকে।

তারাপ্রসন্ন দাঁড়িয়েই রইলেন।

রাশভারী মানুষটি একবার তাকিয়ে দেখলেন পাশের দিকে। বললেন, তোমার বড়-মার এতবড় অসুখে তোমাকে একবারও ডাকিনি। তুমি অভিমান করতে পারো রূপেন্দ্র। কিন্তু কেন ডাকিনি জান?

রূপেন্দ্রনাথ নতনেত্রে নীরব রইলেন।

—এ পোড়া দেশে স্ত্রীলোকের চিকিৎসা হয় না বলে। স্ত্রীজাতির তিন অবস্থা—অধবা, সধবা আর বিধবা। বাকি দুজনের তো কথাই নেই, এমনকি সধবাও চায় ড্যাংডেঙিয়ে স্বর্গে যেতে। কী করে চিকিৎসা করবে তুমি?

এবারও রূপেন্দ্রনাথ জবাব দিলেন না।

—তোমাকে এখনি ডেকে পাঠিয়েছি কিন্তু চিকিৎসক হিসাবে পরামর্শ নিতেই।

এতক্ষণে চোখ তুলে তাকালেন, চিকিৎসক হিসাবে?

—হ্যাঁ, রূপেন্দ্র। তুমি একবার ওঁর নাড়িটা দেখ। দেখে বল—আমার কী কর্তব্য। ব্যবস্থা কাটোয়ায় করব না নবদ্বীপে? অর্থাৎ ওঁর মেয়াদ···

বাক্যটা অসমাপ্ত থাকলেও বুঝতে অসুবিধা হল না। রূপেন্দ্র তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ান।

—আর একটি কথা, বাবা। কী বুঝলে তা শুধু আমাকে জানিও। আগামী পূর্ণিমা পর্যন্ত কি উনি আছেন?

রূপেন্দ্রনাথ ফিরে এলেন প্রাঙ্গণে। তারাপ্রসন্ন ওঁকে পথ করে, ভিড় সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বসালেন রোগীর পাশটিতে। বড়মাকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, এসেছিস? এবার সত্যিই চললাম রে, রুপো!

—আপনার নাড়িটা দেখি।

—নাড়ি? কী হবে রে? ···ও বুঝেছি! গঙ্গা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব কিনা? পারব রে, পারব! ভুলিস না রুপো—'নিয়তি কেন বাধ্যতে'? প্রশ্নটার জবাব হচ্ছে: 'মনসা'! মনের জোর থাকলে মৃত্যুকেও—না, ফেরানো যায় না, কিন্তু তাকে অপেক্ষা করতে হয়!

রূপেন্দ্রনাথের ইচ্ছা হল পুনর্বার ঐ মৃত্যুপথযাত্রিণীর পদধূলি নিতে। পরিবর্তে ওঁর রোগজীর্ণ হাতটি তুলে নিয়ে নাড়ি ধরে বসলেন।

মনঃসংযোগ করতে পারলেন না কিন্তু। প্রাঙ্গণে তিন-চারশ লোক—পুরুষ ও স্ত্রী। একটা কলগুঞ্জনে ওঁর একাগ্রতা ব্যাহত হচ্ছিল। মুখ তুলে বললেন, তারাদা, সকলকে নীরব হতে

বলুন। কেউ কোন শব্দ করবেন না।

তারাপ্রসন্নকে সে কথা দ্বিতীয়বার বলতে হল না। রূপেন্দ্রনাথ যথেষ্ট উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন তাঁর নির্দেশ। সভাস্থল স্তব্ধ হয়ে গেল। সালঙ্কারা শীর্ণ হাতের মণিবন্ধে দুটি আঙুল স্পর্শ করে ভেষগাচার্য ধ্যানে বসলেন। নিমীলিত নেত্র। সমংকায়শিরোগ্রীব ভঙ্গি।

অষ্টোত্তর শতবার গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে যতটা সময় লাগে তাও যেন অতিবাহিত হয়ে গেল। তারপর যেন ধ্যানভঙ্গ হল। ধীরে ধীরে হাতটি নামিয়ে রাখলেন।

বৃদ্ধা এবার প্রশ্ন করেন, কী বুঝলি রে পাগলা ঠাকুর? তোর বড়মা নবদ্বীপ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে?

হাসলেন রূপেন্দ্রনাথ। প্রতিপ্রশ্ন করলেন, 'নিয়তি কেন বাধ্যতে'? বড়মা?

উঠে দাঁড়ালেন এবার। কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। সভাস্থ সকলের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। মৃন্ময়ী ঠিক ওঁর সামনেই অনিমেষ লোচনে তাকিয়ে আছে—নজর পড়ল সেদিকে। কী যেন মনে পড়ে গেল। আবার ধীরে ধীরে বসে পড়লেন। পুলিন্দা হাৎড়ে বার করলেন তাঁর সেই বিচিত্র যন্ত্রটি। বললেন, আপনার বুকটা একটু দেখব, বড়মা!

পাশেই খস্‌খস্ শব্দ। নজর পড়ল সেদিকে। বললেন, শব্দ করবেন না।

মৃন্ময়ী জড়সড় হয়ে চুপ করে বসে রইল। বৃদ্ধা বললেন, দেখ্।

যন্ত্রটার একপ্রান্ত বৃদ্ধার বুকে বসিয়ে অপর প্রান্তে কান লাগাতে গেলেন।

আঃ! আবার কিসের শব্দ!

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, একটি থেলো হুঁকো হাতে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন দুর্গাচরণ। তাঁরই গুড়ুক খাওয়ার শব্দ। রূপেন্দ্রনাথ পুনর্বার বলেন, তারাদা, যাঁরা তামাক খেতে চান, তাঁদের বাইরে যেতে বলুন। শব্দে আমার অসুবিধা হচ্ছে।

গাঙ্গুলীমশাই থেলো হুঁকোটা একজন খিদমদগারের হস্তে সমর্পণ করলেন।

রূপেন্দ্রনাথ যন্ত্রে কান লাগিয়ে বৃদ্ধার হৃদস্পন্দন শুনলেন দীর্ঘসময়। তারপর নিঃশব্দে উঠে চলে গেলেন। কেউ কোন প্রশ্ন করল না।

এ ঘরে একই ভঙ্গিতে বসে আছেন ব্রজেন্দ্রনারায়ণ। রূপেন্দ্রনাথ নিঃশব্দে গিয়ে বসলেন তাঁর পাশে। ব্রজেন্দ্র আড়চোখে সেদিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন। অভিজ্ঞ ভূয়োদর্শীর বুঝতে অসুবিধা হল না—রূপেন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিচলিত। যেন রোগিণীকে পরীক্ষা করে তিনি কী-একটা মর্মান্তিক সংবাদ জেনেছেন, বলতে সাহস পাচ্ছেন না। দীর্ঘসময় অপেক্ষা করেও ব্রজেন্দ্র দেখলেন নতনয়নে নবীন ভেষগাচার্য দারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তিনি এখনো নীরব।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বৃদ্ধের। বললেন, বুঝলাম।

রূপেন্দ্রনাথ চকিতে মুখ তুলে বলেন, কী? কী বুঝেছেন আপনি?

—কতটা সময় পাব? ডুলিতে যদি সরাসরি নবদ্বীপে নিয়ে যাই? পৌঁছানো যাবে না?

হঠাৎ আসন ছেড়ে এগিয়ে এলেন রূপেন্দ্র। আবেগের সঙ্গে বৃদ্ধের হাত দুটি ধরে বললেন, আপনার কাছে একটা ভিক্ষা চাইব, জেঠামশাই; দেবেন?

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রীতিমতো বিস্মিত। তারাপ্রসন্ন এখনো স্থানত্যাগ করেননি। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন দ্বারপথে। ঘটনার প্রবাহ লক্ষ্য করে তিনি কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করলেন। দ্বারের পাল্লা

দুটি নিঃশব্দে বন্ধ করে দিলেন ভিতর থেকে।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ কী বলবেন যেন ভেবে পাচ্ছেন না। এমন কথা বাঁড়ুজ্জে পরিবার তিন পুরুষে কখনো বলেনি। রূপেন্দ্রনাথের পিতামহকে কিছু ব্রহ্মোত্তর ভূখণ্ড দান করতে চেয়েছিলেন ওঁর পিতৃদেব। সেই সাগ্নিক ব্রাহ্মণ প্রত্যুত্তরে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, কেন ভাদুড়ীমশাই? আপনার রাজ্যে কি অগ্রদানী বামুনের আকাল পড়েছে? রূপেন্দ্রের পিতাও জমিদারের খরচে তাঁর চতুষ্পাঠী সম্প্রসারিত করতে স্বীকৃত হননি। সেই বংশের সন্তান রূপো বাঁড়ুজ্জে এই মর্মান্তিক সময়ে নিজে প্রার্থী হয়ে ভিক্ষা চাইছে!

—জেঠামশাই!

—তার পূর্বে আমাকে বল—তুমি কী বুঝেছ? গঙ্গা পর্যন্ত উনি পৌঁছাতে পারবেন!

—হ্যাঁ। তাঁকে নিয়ে গেলে তিনি শুধু সশরীরে কাটোয়া নয়, নবদ্বীপেই পৌঁছাবেন!

—তাহলে আমি আজ দাতাকর্ণ! বল, কী প্রার্থনা করছ আমার কাছে? সব কিছুই আজ এই আনন্দের দিনে তোমাকে দিতে প্রস্তুত! বল, কী চাইছো?

জিজ্ঞাসিত হয়ে বিড়ম্বনায় পড়লেন যেন। কীভাবে এই অবাস্তব প্রস্তাবটা পাড়বেন—কী ভাষায়—তা যেন প্রণিধান করে উঠতে পারছেন না। ওঁর নীরবতার সুযোগে বৃদ্ধ পুনর্বার বলে ওঠেন, আমার আশঙ্কা হয়েছিল, তুমি ওঁর নাড়ি দেখে বুঝেছ যে, তোমার বড়মার শেষ ইচ্ছাটা আমি পূরণ করতে পারব না। তা যদি না হয়··· কিন্তু একটা কথা রূপেন, কিছু মনে কর না বাবা, তোমার কথাটা আমার কানে একটু বেসুরো লেগেছে! এ তো বাঁড়ুজ্জে বংশের রেওয়াজ নয়!

—যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে, নাধমে লব্ধকামাঃ।[1]

—অধিগুণ তোমার জেঠার আছে কিনা জানি না, কিন্তু আগেই বলেছি—আজ আমি দাতাকর্ণ! আমার পৌরুষ আর ধর্ম ছাড়া তুমি আজ যা ইচ্ছা প্রার্থনা করে দেখতে পার।

রূপেন্দ্রনাথ বললেন, শুনুন জেঠামশাই, গুরুর আশীর্বাদে 'নিদান' যদি বিন্দুমাত্রও আয়ত্ত করে থাকি, তাহলে নিশ্চয় বুঝেছি, পক্ষকালের মধ্যে বড়মা আমাদের ছেড়ে যাবেন না। আপনি ওঁর যাত্রা স্থগিত রাখুন। একপক্ষ কালের জন্য। এই একপক্ষকাল আমাকে একবার শেষ চেষ্টা করতে দিন।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ব্রজেন্দ্র, এ কী বলছ রূপেন? কাল প্রভাতে আমরা যাত্রা করব! সব কিছু যে প্রস্তুত!

—আপনি কিন্তু সত্যবদ্ধ জেঠামশাই! আমি আপনার পৌরুষ বা ধর্মে হস্তক্ষেপ করিনি।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আসন ছেড়ে উঠে পড়েন। বারকতক কক্ষের ভিতরেই পদচারণা করে হঠাৎ থেমে বলেন, কিন্তু কী লাভ? আরও কয়েক মাস পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকার? এ যে ওঁর নিয়তি।

—পঙ্গু হয়েই যে থাকবেন একথা তো আমি বলিনি জেঠামশাই। আর 'নিয়তির' কথা বলছেন? 'নিয়তি কেন বাধ্যতে?'—এই প্রশ্নের জবাবটা কী, জানেন? —'মনসা'!

—কে বলেছেন?

—বড়মা!

---

[1] যাঁরা মহৎ তাঁদের কাছে প্রার্থনা করে বিফল হওয়াও ভাল, অধমের কাছে মনস্কামনা সিদ্ধ হওয়ার চেয়ে।

—কবে?

—এইমাত্র!

আবার পদচারণা শুরু করেন ব্রজেন্দ্র। তারাপ্রসন্ন আর স্থির থাকতে পারেন না। ডেকে ওঠেন, বাবা?

—কিন্তু গুরুদেব যে বিধান দিয়ে বসেছেন?

—তাঁকে ডাকুন। রূপেন তো তাঁর নির্দেশ অমান্য করার পরামর্শ দেয়নি। সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার পরামর্শ দিয়েছে শুধু। আপনি বরং গুরুদেবকে বলুন—আপনার বাসনা, যজ্ঞ সমাপ্তির ভস্মতিলক মাথায় নিয়েই পক্ষকাল পরে মা যাত্রা করবেন।

পুত্রের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন এবার। এ প্রস্তাবে হয় তো গুরুদেব স্বীকৃত হয়ে যাবেন। লোক-চক্ষুর আড়ালে যজ্ঞের কোনও মহিমা থাকবে না।

গুরুদেব রাজী হলেন।

রূপেন্দ্রনাথ পক্ষকালের মধ্যে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন না আদৌ। নিরলস নিষ্ঠায় বালু-ঘড়ি হাতে বসে রইল রোগিণীর শিয়রে। দণ্ড-দণ্ড ঔষধ প্রস্তুত করে সেবন করালেন। এমনকি পথ্যও প্রস্তুত করালেন নিজের তত্ত্বাবধানে। জগুঠাকরুণ আর কাত্যায়নী সকাল-সন্ধ্যা সংবাদ সংগ্রহ করে যেত। কাত্যায়নী একদিন সুযোগ মতো ওঁর কর্ণমূলে বলতে গেল, দাদা, আজ মিনু খুড়িমা এসেছিল, বললে···

রূপেন্দ্রনাথ একটি হাত তুলে শুধু বললেন, থাক। আমার একাগ্রতা ব্যাহত করে দিস্ না কাতু। বাড়ি যা—

বিচিত্র ঘটনাচক্র। পক্ষকাল পরে একদিন যজ্ঞ সমাপ্ত হল। গুরুদেব তাম্রপাত্রে ঘৃত-নিষিক্ত যজ্ঞভস্ম নিয়ে যেদিন রোগিণীর শিয়রে উপস্থিত হলেন সেদিন আর তিনি শয্যালীনা নন। উঠে বসেছেন।

ব্রজসুন্দরী মাঝে-মাঝে জিজ্ঞাসা করতেন, তুই আমার সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিলি কেন রে, পাগলা?

রূপেন্দ্রনাথ মিটিমিটি হেসে বলতেন, কী করব? জেঠামশাই যে আমাদের জন্য একটা নতুন জেঠিমা আনতে কিছুতেই রাজি হলেন না?

—জেঠা তো হলেন না। ভাইপো কেন অমন জিদ্দি ধরে বসে আছে?

পরবর্তী পূর্ণিমায় জমিদার বাড়িতে সাড়ম্বরে সত্যনারায়ণের পূজা হল। গোটা গ্রাম প্রসাদ পেয়ে গেল এসে। এমনকি ভিন-গাঁয়ের মানুষও। ব্রতকথার আসরে বড়মা আসন-পিঁড়ি হয়ে বসতে পেরেছিলেন। মানুষজন শুধু তাদের 'বড়মা'কে পেন্নাম করেই তৃপ্ত হতে পারে না—খোঁজ করে, আর সেই পাগ্‌লা কোবরেজ-মশাই কোনজনা গো?

গুরুদেব বললেন, কেমন? বলিনি? এ যজ্ঞ অমোঘ! অব্যর্থ! 'অশ্বমেধাসহস্রানি'র যে পুণ্যফল, 'লক্ষং প্রদক্ষিণাঃ পৃথ্যাঃ'-র যে ফল—এই মহাযজ্ঞে 'তদ্‌ফলম্‌'! বুঝলে না, বাবা, যমদূতেরা ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারেনি।

সকলেই সেটা সহজে বুঝে নিল। এই রকম একটা ভবিষ্যদ্বাণীই করেছিলেন বটে উনি।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণও তা স্বীকার করলেন, কিন্তু ঐখানেই থামলেন না তিনি। একবগ্গাঠাকুরকে অন্তরালে ডেকে জনান্তিকে যে নতুন নামে সম্বোধন করলেন কী-জানি কী-করে তা ছড়িয়ে পড়ল সারা গ্রামে। ব্রজেন্দ্র ওঁকে বললেন, ধন্বন্তরি! তোমাকে কী বৈদ্যবিদায় দেব, বল?

—বড়মা আমার নিজের মায়ের মতো, জেঠামশাই!

—বটেই তো! তুমিও আমার ছেলের মতো! তারাকে যদি একটা মহাল দান করতে পারি, তাহলে তোমাকেই বা কিছু ব্রহ্মোত্তর লিখে দিতে পারব না কেন?

রূপেন্দ্রনাথ যুক্তকরে নীরব রইলেন।

—কী হল? জবাব দাও? স্বীকার কর!

—স্বীকার করলে কথাটা যে আপনার কানে আবার বেসুরো লাগবে জেঠামশাই। আপনি নিজেই যে সেদিন বলেছিলেন—সেটা বাঁড়ুজ্জে বংশের রেওয়াজ নয়। বৈদ্যবিদায় হিসাবে আমি সকলের কাছ থেকে সমপরিমাণেই সম্মানমূল্য নিয়ে থাকি। অর্থাৎ যেখানে আমি বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করছি না।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ বলেন, কিন্তু 'অধিগুণ' আর 'অধম'-এর পার্থক্যের প্রসঙ্গ তো তুমি নিজে থেকেই তুলেছিলে?

এবারেও রূপেন্দ্রকে নীরব দেখে কেমন যেন বিচলিত হয়ে পড়েন বৃদ্ধ। হঠাৎ সেই সেদিন ও যেমন করে বৃদ্ধের হাতদুটি আবেগভরে টেনে নিয়েছিল সেইভাবে রূপেন্দ্রের হাতদুটি ধরে বললেন, আজ আমিই তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি রুপেন! বামনের দ্বারে আজ বলিরাজা ভিক্ষাদানের অধিকারটুকু প্রার্থনা করছে।

রূপেন্দ্রনাথ নিচু হয়ে বৃদ্ধের পদধূলি নিলেন। শান্তস্বরে বললেন, আপনি বিদ্বান, পণ্ডিত, বিবেচনা করে দেখুন,—আপনি যা চাইছেন তা আমার ধর্ম! আমার পৌরুষ! আমার বংশে কেউ কখনো যে ভিক্ষা নেয়নি, জেঠামশাই!

তৎক্ষণাৎ হাত দুটি ছেড়ে দিলেন। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো বারকতক পদচারণা করে নিলেন রুদ্ধদ্বার কক্ষে। তারপর ফিরে এসে আবার বসলেন তাঁর আরাম-কেদারায়। বললেন, শোন! আমি কখনো কারও কাছে পরাজয় স্বীকার করিনি। আজও করব না। আমার বিকল্প প্রস্তাবটি শোন। বল, এতে কি তুমি স্বীকৃত? এ প্রস্তাবে কি আমি তোমার পৌরুষ অথবা ধর্মে হস্তক্ষেপ করছি?

জমিদার মশায়ের বিকল্প প্রস্তাবটি বিচিত্র।

তিনি লক্ষ্য করেছেন, স্বগ্রামে প্রতিষ্ঠা না পেলেও চিকিৎসক হিসাবে ওঁর কাছে ভিন্‌গাঁয়ের মানুষ প্রায়ই আসে। এবার যে অলৌকিক প্রক্রিয়ায় তিনি অন্তর্জলিযাত্রার রোগিণীকে সংসারে ফিরিয়ে এনেছেন তাতে অচিরেই দূর-দূরান্তর থেকে বাঁড়ুজ্জে-বাড়িতে রোগীর দল আসতে শুরু করবে। হয়তো তাদের চিকিৎসা করতে দু-দশদিন সময় লাগবে। গাছের তলায় আশ্রয় নেওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর নাই। জমিদারের একটি অতিথিশালা অবশ্য আছে; কিন্তু সেটা গ্রামের অন্য প্রান্তে। তাছাড়া সেখানে রোগীকে আশ্রয় দেওয়ার নানান বাধা। ব্রজেন্দ্রনারায়ণের প্রস্তাব, ধন্বন্তরির ভদ্রাসনের দক্ষিণপূর্বে যে পুষ্করিণীটি আছে—পদ্মদীঘি—তার পাড়ে পাশাপাশি পাঁচটি কুটির নির্মিত হবে। সে জমি জমিদারের, কুটিরের মালিকও থাকবেন তিনি। শুধু তাতে আশ্রয়

নেবে গ্রামান্তরের রোগী বা তার পরিবারবর্গ—ধন্বন্তরির নির্দেশে। যারা আশ্রয় পাবে তাদের জন্য জমিদারের ব্যবস্থাপনায় 'সিধা' যাবে অথবা কাঁচা-ফলার। পরিকল্পনাটি পেশ করে বলেন, বল ধন্বন্তরি! আমি কি তোমার পৌরুষ বা ধর্মে হস্তক্ষেপ করেছি?

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ এই বিচিত্র ব্যবস্থা কেন করতে চাইছেন আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না। সেকালে কোন কোন জমিদার প্রজার মঙ্গলবিধানে, পিতৃমাতৃস্মৃতিতে এই জাতীয় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করতেন।

রূপেন্দ্রনাথ করজোড়ে বলেন, না, জেঠামশাই! আপনি নরনারায়ণের সেবা করতে চাইলে আমি অন্তরায় হব কেন? এ তো অতি শুভ প্রস্তাব। তবে সে-ক্ষেত্রে আমার দুটি বিকল্প-প্রস্তাব আছে।

—বল?

—আপনি পাঁচটির পরিবর্তে আপাতত তিনটি আশ্রয়গৃহ নির্মাণের আদেশ দিন। একটি পুরুষের, একটি স্ত্রীলোকের, এবং তৃতীয়টি বেশ কিছু দূরে, সংক্রামক রোগীর—নরনারী নির্বিশেষে।

বিস্মিত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ বলেন, কেন ধন্বন্তরি? তোমার জেঠামশাই 'অধিগুণ' হতে চাইলে তাঁকে 'অধম' করতে চাইছ কেন? পাঁচটি কমিয়ে তিনটি···

রূপেন্দ্রনাথ সহাস্যে বলেন, আজ্ঞে না। আপনার অর্থসাশ্রয় করতে এ-কথা বলিনি। যে অর্থ সাশ্রয় হবে তাই দিয়ে আপনি ঐ পদ্মপুকুরের চতুর্দিকে শক্ত একটা বেড়া দেবার ব্যবস্থা করুন। ঐ পুষ্করিণীতে অবগাহন স্নান, বস্ত্রাদি বা বাসনপত্র ধৌত করা নিষিদ্ধ করতে হবে। পদ্মপুকুর থেকে এখন শুধুমাত্র পানীয় জল সংগ্রহ করা যাবে।

বৃদ্ধ স্মিতহাস্যে বললেন, তোমার এই অদ্ভুত প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার মতামত জ্ঞাপন করার পূর্বে একটি প্রতিপ্রশ্ন করছি—বল তো, পদ্মপুকুরে একটিও পদ্ম নাই, তবু ওর নাম কেন 'পদ্মপুকুর'?

রূপেন্দ্র স্বীকার করেন, জানি না। বোধকরি এককালে ওতে পদ্ম ছিল, মানে যখন নামকরণ করা হয়।

—না। আমার প্রপিতামহীর নাম ছিল পদ্মরাণী। ঐ পুষ্করিণীটি আমার পিতামহ খনন করান মাতৃস্মৃতিতে। ওটি প্রতিষ্ঠিত জলাশয়। প্রতিষ্ঠাকালে আমার পূজ্যপাদ পিতামহ নারায়ণ সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—ঐ জলে জনসাধারণের অবগাহন স্নানের অধিকার যাবৎচন্দ্রার্কমেদিনী স্বীকৃত। তা ছাড়া ঐ প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণীতে 'করণ' হয়ে থাকে। 'করণ' বোঝ? কুলীন শ্রেণীর বারেন্দ্র পুত্রকন্যার বিবাহে সম্মত হবার পর অবগাহন স্নানান্তে পুষ্করিণীর জলে দাঁড়িয়ে বিবাহসূত্রে আত্মীয়তার বন্ধন স্বীকার করেন। প্রতিজ্ঞা করেন।

রূপেন্দ্র বলেন, প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণীর অভাব তো সোঞাই গ্রামে নেই জেঠামশাই। 'নীলসায়র' দীঘি তো মাত্র কয়েক রসি দূরে। অতঃপর সেখানেই 'করণ' হবে। পদ্মদীঘি সংরক্ষিত করা হলে অসুবিধা কারও হবে না।

—না, তা হয় না। অসুবিধা হয় তো হবে না। কিন্তু আমার পিতৃপুরুষেরা যে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা তো আমি ব্যত্যয় হতে দিতে পারি না···কিন্তু কেন এই অদ্ভুত শর্তটি আরোপ

করতে চাইছ তুমি?

—সে অনেক কথা। কিন্তু আপনি যদি এতে সম্মত না হন তাহলে আমিও আপনার প্রস্তাবে সম্মত হতে পারি না!

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ কয়েকটা মুহূর্ত জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন—যেন ভ্রাতুষ্পুত্র নয়, দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রতিপক্ষ! যেন দুই ইজারাদার নবাব সরকারে এসেছেন রাজস্বের নিলাম-ডাকে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে অধিকার অর্জনে!

হঠাৎ উঠে পড়েন ফের আসন ছেড়ে। একই ভঙ্গিতে বার কতক পদচারণা করে ফিরে এসে বলেন, আমি যদি ঐখানে একটি নূতন পুষ্করিণী খনন করাই?

—তাতে যে আপনার অনেক-অনেক বেশি খরচ হয়ে যাবে, জেঠামশাই?

এতক্ষণে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। গর্জন করে ওঠেন, সেটুকু বুঝবার মতো বৈষয়িক বুদ্ধি আছে তোমার জেঠামশায়ের। বাজে কথা থাক। সোজাসুজি বল, তাহলে কি তুমি স্বীকৃত?

রূপেন্দ্রনাথ আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ান। বলেন, সানন্দে।

—বস। কথা এখনো শেষ হয়নি।

—আবার কী?

—তুমি ভুলে গেছ। দুটি শর্তের কথা বলেছিলে তুমি। দ্বিতীয়টি?

—ও হ্যাঁ। আবার বসে পড়েন।

এবার দ্বিতীয় শর্তটি ব্যক্ত করেন। প্রয়োজনে রূপেন্দ্রনাথ কোন অহিন্দুকেও ওখানে আশ্রয় দিতে পারবেন। পীরপুরের কোন মুসলমান পরিবার যদি তাঁর কাছে দীর্ঘদিনের চিকিৎসার জন্য আসে, তাহলে তাদেরও তো একই জাতের সমস্যা হবে।

এক কথায় সম্মত হলেন ব্রজেন্দ্রনারায়ণ। বললেন, ঠিক কথা। আর্তের জাত নেই। সেক্ষেত্রে আমি সে গৃহের কলি ফিরিয়ে নেব। শাস্ত্রীয় নিয়মে গৃহশুদ্ধি করে নেব।

—এখানকার ব্রাহ্মণ সমাজ আপত্তি করবেন না?

—সম্ভবত করবেন। কিন্তু কাঞ্চনমূল্যও তো বড় কম কথা নয়।

—আরও একটা কথা জেঠামশাই। এটা আমার শর্ত নয়, আব্দার।

—বল?

—প্রতিষ্ঠানটির নাম হবে: 'ব্রজসুন্দরী আরোগ্য নিকেতন'।

ব্রজেন্দ্র স্মিত হাসলেন। বলেন, কিন্তু নামকরণ যে আমি মনে মনে আগেই স্থির করে রেখেছি রূপেন্দ্র: 'ধন্বন্তরী আরোগ্য নিকেতন'।

আবার উঠে দাঁড়াতে হল। বলেন, না। তাহলে ওটা আর আমার আব্দার নয়, শর্ত! ভেবে দেখুন, বড়মা যদি নিজের মনের জোরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে স্বীকৃত না হতেন, তাহলে আমার ঔষধে কোন ফলই হত না। আমার চেয়ে অভিজ্ঞ কবিরাজ এ রাঢ়খণ্ডে ভূরি ভূরি; কিন্তু বড়মার চেয়ে মহিয়সী নারী আপনি আর একটিও দেখাতে পারেন?

ব্রজেন্দ্র কৌতুক বোধ করেন। বলেন, কী মাহাত্ম্য দেখতে পেলে তাঁর? অনাবৃষ্টির বছরে বৃষ্টি নামানো?

—আজ্ঞে না। বড়মা কুসংস্কারকে জয় করেছেন বলে! স্ত্রীলোক বিদ্যাচর্চা করলে তার

বৈধব্যযোগ অনিবার্য—এতবড় কথাটাকে তিনি উড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন বলে! কোন সীমন্তিনী নারীর পক্ষে এ যে কতবড় কীর্তি, তা তো আপনার অজানা নেই জেঠামশাই।

ব্রজেন্দ্র হাসতে হাসতে বলেন, নাঃ! 'ধন্বন্তরী' নয়—তোমার ঐ বদনামটাই টিকে থাকবে: 'একবগ্গা ঠাকুর'।

জেঠামশায়ের পদধূলি নিয়ে এবার বিদায় নেন। বলেন, আশীর্বাদ করুন—ঐ বদনামটার মর্যাদা যেন কোনদিন ক্ষুণ্ণ না করি।

—কইরে, তোরা কোথা গেলি সব? খেঁদি, বুঁচকি, ছোটখুকি, শোভা-মা?

নন্দ চাটুজ্জে সটান অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছেন।

গাঙ্গুলীবাড়িতে অবশ্য তাঁর অবারিত দ্বার। মৃন্ময়ী রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে মোচা কুটছিল। তার মাথায় আধো-ঘোমটা, কারণ ঠাকুরপোরা কেউ বাড়ি নেই। হঠাৎ পুরুষকণ্ঠে ঐ বাজখাই আওয়াজ শুনে সে শশব্যস্তে কপাটের আড়ালে আত্মগোপন করে।

নন্দ একগাল হেসে বলেন, আমাকে দেখে আপনার অত সরম কিসের বোঠান? আর বঁটিটে যে খাড়া করা রইল, ভর সন্ধ্যেবেলা!

এটা অশাস্ত্রীয় কাজ। মৃন্ময়ী ইতস্তত করে। বঁটি ছেড়ে উঠে যাওয়ার সময় সেটাকে শুইয়ে রেখে যেতে হয়। নাহলে গৃহস্থের অকল্যাণ। কিন্তু নন্দ ঠাকুরপো যেভাবে ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন—

শোভা বুঝল। চট করে বঁটিটা শুইয়ে দিয়ে বললে, আসুন কাকা। বসবেন আসুন—

—তোর বাপ্ কি কচ্ছে রে শোভা?

—আহ্নিক করছেন। এই হয়ে এল।

—আহ্নিক! বলিস কী রে? আজ যে সায়ংসন্ধ্যা নাস্তি।

ঠাকুরঘর এমন কিছু তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে নয়। তাছাড়া দুর্গাচরণ যখন সন্ধ্যাহ্নিক সারেন তখন কান দুটি সজাগ রাখেন। নন্দভায়ার নিদান শুনেই 'শ্রীবিষ্ণু' বলে উঠে বাহিরে আসেন। পরিধানে পাটের কাপড়, বরাঙ্গে নামাবলী, শিখাপ্রান্তে একটি কল্কে ফুল। বলেন, চাটুজ্জে নাকি? এস, এস। কিন্তু ওটা কী বললে? আজ সায়ংসন্ধ্যা নাস্তি? কই, তিড়বিড়ে তো সকালে সেকথা বলে গেল না?

'তিড়বিড়ে' ওঁর পিতৃদত্ত নাম নয়। তবে নিত্যপূজার ব্যবস্থা যাঁর হেপাজতে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের হেতুতেই সবাই বলে তিড়বিড়ে-ঠাকুর। দুর্গার অভিযোগ, সেই তিড়বিড়ে-ঠাকুরের উচিত ছিল জানিয়ে যাওয়া যে, আজ সায়ংসন্ধ্যার প্রয়োজন নেই।

নন্দ বলেন, দুটো পাঁজিতে দু-রকম মত কিনা, তাই—

—সেক্ষেত্রে যজমানের যেটা সুবিধা সেই মতই তো বিধান দেবে! 'আস্তি-নাস্তি' বেছে

নিয়ে। আধঘণ্টা ধরে অহেতুক মশার কামড় খাচ্ছি!

নন্দভায়াকে নিয়ে এসে বসালেন তাঁর ঘরে। শোভারানীকে বললেন, বিশুকে বল, কুলীনহুঁকোয় তামাক দিয়ে যেতে।

বাঙলা দেশের গ্রামে তখন সচরাচর তিন জাতের হুঁকো: বামুন, কায়েৎ আর বেনে। বাদবাকিরা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। তবে এ গ্রামের নিষ্ঠাবান সমাজপতিরা কিছু উপবিভাগের বিধান দিয়েছেন। বামুন-হুকোঁও আবার তিন জাতের: কুলীন, কাপ আর ছুরিত্তির। আর কিছু না, তাতে কার কতটা কৌলীন্য-মর্যাদা সেটা বারে বারে ঝালিয়ে নেওয়া যায়। তাছাড়া কুলীনদের মনে রাখা দরকার—কৌলীন্য খোয়ালে, হুঁকা-শ্রেণীবিন্যাসেও সমাজে একধাপ নেমে যেতে হবে।

আলোচনার শুরুটা হয়েছিল ভালই—চাষবাস, ফলন, ইত্যাদি দিয়ে। ক্রমে অনিবার্যভাবে ইদানিং কালের আচারভ্রষ্টতা আর ছোটজাতের ঔদ্ধত্যে। পরে নন্দ বললেন, একটা খপর শুনেছ দাদা, দীঘির পাড়ে ঘর উঠছে?

দুর্গাচরণ বললেন, ওটা আমার শ্বশুরবাড়ির পাড়া চাটুজ্জে। খপর না পাবার কোন হেতু নেই। একবগ্গার রুগীপত্র নাকি গাছতলায় কষ্ট পাচ্ছে, তাই দানসাগর ঘর তুলে দিচ্ছেন।

—তা দিন। তাঁর জমি, তাঁর সম্পত্তি, আমাদের কী বলার আছে; কিন্তু বিশু বললে, ব্যবস্থা হচ্ছে একই ঘরে ওঁরা ছত্রিশ জাতকে ঠাঁই দেবেন। বলি, সেটা শুনেছ?

—শুনেছি। সে-কথার জবাবটাতো তুমিই দিলে। জমি তাঁর, সম্পত্তি তাঁর, কাকে থাকতে দেবেন তার বিধান কি তুমি-আমি দেব?

—এটা একটা কথা হল? আমি যদি গাঁয়ের পঞ্চজনাকে আমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে সাত জাতকে একপংক্তিতে বসাই, তাহলে তা মেনে নেবে দুর্গাদা? যেহেতু জমি আমার, ভূরিভোজের ব্যবস্থা আমার?

দুর্গা বললেন, কথাটা ভাববার। নেমন্তন্ন করার কথায় মনে পড়ে গেল, হ্যাঁ চাটুজ্জ্যে, একবগ্গা নাকি তোমার নেমন্তন্ন নেয়নি? কথাটা ঠিক?

—কে বললে?

—বলেনি কেউ। সেদিন মায়ের প্রসাদ নিতে সে তো এল না? কেমন যেন একটা কানাঘুষো শুনলাম।

—একবগ্গা বলেছে, সে 'মহাপ্রসাদ' ছোঁয় না! সে নাস্তিক!

দুর্গা আকাশ থেকে পড়লেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু শুনলেন। বলা বাহুল্য নন্দ চাটুজ্জে সেদিন সন্ধ্যার কথোপকথন যতখানি সম্ভব বিকৃত করে পেশ করলেন। উপসংহারে বললেন, একটা কিছু বিহিত কর গাঙ্গুলীদা! শুধু ধোপা-নাপিত বন্ধ করলেই চলবে না, গাঁ থেকে তাড়াতে হবে।

দুর্গাচরণ বললেন, হুঁ! ব্যবস্থা একটা কিছু করতে হচ্ছে। অঙ্কুরেই এসব পাপ বিনাশ করা উচিত! এতবড় দুঃসাহস!

নন্দ ঘনিয়ে এসে বলেন, আমিও একটা উড়ো খপর শুনলাম, কতাটা সত্যি?

—কী?

—বোঠানকে দেখতে এসে নাকি একবগ্গা কী এক কুপ্রস্তাব দিয়েছিল?

যেন প্রতিবর্তী প্রেরণা। দুর্গাও বলেন, কে বলশে?

—কে বললে, সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু কতাটা সত্যি?

দুর্গাচরণ ইতিমধ্যে উপলব্ধি করেছেন, একবগ্গার কোন কুমতলব সেদিন ছিল না। কথাটার মধ্যে অশ্লীল কিছু থাকলে সবার সমুখে সে জমিদার গিন্নিকে বলতে পারত না '—বড়মা, আপনার বুকটা একটু দেখব।' তাছাড়া জামা-কাপড়ের উপর দিয়ে বুক-দেখার সেই আজব যন্ত্রটাকেও এতদিনে চিনে নিয়েছেন। তাই কথাটা ঘুরিয়ে নিলেন, না হে, কু-প্রস্তাব কিছু নয়। সেখানে তো শোভা ছিল, আম্মো ছিলাম। তবে কতার ধরনধারণ ঠিক ভদ্রজনোচিত নয়। খুড়িকে বার দুই নাম ধরে ডেকে বসল। হোক তোর পাড়ার মেয়ে। তাই বলে, শোভার সমুখে তুই ওকে 'মীনু' বলে ডাকিস কোন আক্কেলে?

নন্দ সায় দিলেন, শিক্ষাদীক্ষা না থাকলে যা হয়। ছেলেবেলা থেকে বাউণ্ডুলের মতো এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে ঘুরেছে তো। কিন্তু কী করে ওকে কায়দা করা যায় বল তো?

—দেখছি! ছিদ্দির একটা বার করি আগে।

—ঐ তো ছিদ্দির! 'মহাপ্রসাদ খাব না' বলা!

দুর্গা ধমকে ওঠেন, বোকার মতো কথা বল না, চাটুজ্জে। সে ঘরের কোণে তোমাকে কী বলছে তাই নিয়ে ঘোঁট পাকানো কি ঠিক? টুঁটি টিপে ধরলে সে যদি বলে, কে বলেছে? বাজে কথা!

—জগুঠাকরুণ শুনেছে। কাতু ছিল।

—তারা তো তখন চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা। বলবে, 'কই না তো'! তখন? একবগ্গা যদি বলে বসে, নিয়ে আসুন গোটা পাঁঠা। বলি দিয়ে আমি একাই খাব—? তখন? তাছাড়া, বুয়েছ না, জমিদার গিন্নির ব্যাপারে এখন সবাই ওকে মাথায় করে নাচছে। ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে—

—'ঝড়ে কাক মরে'?

—মরে না? অতবড় তান্ত্রিক সাধক কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি যজ্ঞ করলেন, আড়াই মণ গব্য ঘৃত আহুতি দিলেন, সেসব কিছুই না?

—তা বটে! তাহলে?

—শোন ভায়া। এসব ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা ঠিক নয়। ঝোপ বুঝে কোপ মারতে হবে। যাতে এক কোপেই ধড় থেকে মাথাটা নেমে যায়। শাস্ত্রে বলেছে না—'মনসা চিন্তেৎ কম্মো, বচসা ন প্রকাশয়েৎ'।

—কথাটা আম্মো শুনেচি। মানেটা জানি না। কোন শাস্ত্রে আছে গো গাঙ্গুলীদা?

—মনসামঙ্গলে।

—অ! তা মানেটা কী?

—মা মনসা কখনো কারও সাথে বচসা করেন না, চরম মুহূর্তে একটি ছোবলেই কম্মো সারা! বুয়েচো না?

পরাজয় স্বীকার করে নেননি বৃদ্ধ জমিদার ঐ তরুণ ভেষগাচার্যের কাছে। খনন করা হল নূতন পুষ্করিণী। আজব তার আকৃতি। প্রথমটা সকলে ধরে নিয়েছিল এটা খননকারকদের একটা মারাত্মক ভ্রান্তি। দু-একজন বড় মিস্ত্রিকে সেটা দেখিয়ে দিতেও চেয়েছিল; কিন্তু বড় মিস্ত্রি বলে—না, বড় কর্তার ঐ রকমই হুকুম। পুষ্করিণীর উত্তর ও দক্ষিণ পাড় সমান্তরাল, পুব-পশ্চিম পাড় তা নয়। হেতুটা সহজবোধ্য। উত্তরপাড়ের দৈর্ঘ্য চারশ দশ হাত, দক্ষিণ পাড়ের তিনশ ষাট! অর্থাৎ পঞ্চাশ হাতের হেরফের। কারা বুঝি ব্রজেন্দ্র-নারায়ণের কাছে দরবার করতেও গিয়েছিল, তাঁর এমন অদ্ভুত নির্দেশ সত্যই আছে কিনা জানতে। অথবা মিস্ত্রি নিজের ভ্রান্তিটা কর্তার ঘাড়ে চাপাতে চাইছে।

শুনে ব্রজেন্দ্র শুধু গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, বল কী? দীঘিটাও অমন 'একবগ্গা' হয়ে গেল!

এবার ঠেকাতে পারেননি। আরোগ্য নিকেতনের সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করতে রাজি হননি। এবার পারলেন না। দীঘির নাম হয়ে গেল—অনিবার্যভাবে: 'একবগ্গা দীঘি!'

তার চারিদিকে উঠল প্রাচীর। না, বাঁশ বা শালখুঁটির বেড়া নয়। পাকা ইটের পাঁচিল। চুন-সুরকি মশলার। নির্মিত হল তিনটি আশ্রয়গৃহ। ধন্বন্তরির তত্ত্বাবধানে। গ্রামে ঢেঁড়া দেওয়া হল—ঐ পুষ্করিণী থেকে শুধুমাত্র পানীয় জলই সংগ্রহ করা যাবে, অবগাহন নিষিদ্ধ। এমনকি সংগ্রহকারী নিজ নিজ জলপাত্র ঐ পুষ্করিণীতে নিমজ্জিত করতে পারবে না। পানীয় জল সংগ্রহ করতে হবে বিচিত্র পদ্ধতিতে—একটি ঢেঁকিকলের রজ্জুর সঙ্গে আবদ্ধ নির্দিষ্ট জলপাত্রের সাহায্যে। বিচিত্র তার আকৃতি। সতীশ কামার রূপেন্দ্রনাথের নির্দেশ মোতাবেক এই অদ্ভুত পাত্রটি তৈরী করে বলেছিল, সারা জেবনভর কয়েক হাজার পাত্তর বানিয়েছি বাবু-মশাই, কিন্তুক্ এমন আজব পাত্তর বানাই নাই, যা মাটিতে থোওয়া যায় না।

তা সত্যি। পাত্রটির তলদেশ সূচালো। জমিতে তাকে রাখা যায় না। সেটি রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় ত্রিশঙ্কুর মতো আকাশমার্গে ঝুলতে থাকে। ঢেঁকিকলের মাধ্যমে পানীয় জলটা সংগ্রহ করে তা পাত্রান্তরে সঞ্চয় করতে হয়!

পাগলের খেয়াল যাকে বলে!

একবগ্গা-ঠাউরের উৎকট রসিকতা!

শিরোমণি মশাই একদিন মাঝ সড়কে পাকড়াও করলেন ওঁকে। বললেন, আমাকে বুঝিয়ে বল তো রূপেন, এমন অদ্ভুত একটা জলপাত্র তুমি কেন তৈরী করালে? আর অমন চমৎকার একটা পুষ্করিণী খনন করিয়ে তা 'প্রতিষ্ঠা' করতে দিলে না কেন?

রূপেন্দ্রনাথ জানেন, এইসব স্থবির কূপমণ্ডূকদের সংস্কারকে যুক্তিতর্ক দিয়ে দূর করা যায় না। এ বিষয়ে তাঁর দীর্ঘ দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা। পাঁজি পুঁথিতে দেবনাগরী হরফে যা লেখা আছে তাই হচ্ছে ধ্রুব সত্য। 'আয়ুর্বেদ' যদি 'বেদ' না হত, অথর্ববেদের অংশভাক্ বলে তাকে প্রচার না করা হত, তাহলে কেউ ওঁর ঔষধ মুখে তুলেই দেখত না। তাই তিনি 'মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্' নীতিবাক্যটাই সম্প্রসারিত করে নিয়েছেন। যাতে সাধারণের সামূহিক মঙ্গল তা তথ্যগতভাবে মিথ্যা হলেও তত্ত্বগতভাবে সত্য। তাই অনায়াসে বলতে পারেন, আমি যে স্বপ্নে ঐরকমই একটা প্রত্যাদেশ পেয়েছিলাম শিরোমণি-কাকা।

সহজ সরল কথা। বুঝতে কোন অসুবিধা হল না শিরোমণি-ঠাকুরের। বলেন, তাই বল!

বৃদ্ধ শিরোমণিকে যত সহজে নিবৃত্ত করতে পেরেছিলেন অত সহজে সন্তুষ্ট করা গেল না কিন্তু যুবক জমিদারতনয়কে। তারাপ্রসন্নও একদিন পাকড়াও করলেন ওঁকে, কী প্রত্যাদেশ পেয়েছ রূপেন্দ্র?

রূপেন্দ্রনাথ সেই সংক্ষিপ্ত আলাপচারী বিস্মৃত হয়ে গেছেন। সবিস্ময়ে জানতে চান, কী প্রত্যাদেশ? কে বলেছে।

—শিরোমণি ঠাকুরকে নাকি তুমি বলেছ যে, মায়ের প্রত্যাদেশেই ঐ একবগ্গা দীঘিকে তুমি প্রতিষ্ঠা করতে দাওনি।

রূপেন্দ্রনাথ মিটি-মিটি হাসতে থাকেন।

—না, না, হেসে পার পাবে না। বল, স্বপ্নে তুমি কী প্রত্যাদেশ পেয়েছিলে?

—কোন প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণী থেকে নয়, শুধু মাত্র সংরক্ষিত পুকুরের জলপান করলেই সোঞাই গাঁয়ের এই ব্যাপক আন্ত্রিক রোগ দূরীভূত হবে। একে একে প্রতিটি পাড়াতেই আমি এ-ভাবে দু-একটি পুষ্করিণীকে সংরক্ষিত করব।

কেন এ প্রচেষ্টা—এই প্রশ্নটা জাগাই স্বাভাবিক। কিন্তু তারাপ্রসন্ন সে দিক দিয়েও গেলেন না। তদানীন্তন চিন্তাধারায় তাঁর পরবর্তী প্রশ্নটি হল, কিন্তু মায়ের কোন মূর্তিকে স্বপ্নে দেখতে পেলে তুমি? কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী···

বিচিত্র মানুষের কৌতূহল।

রূপেন্দ্রনাথ বললেন, না, তারাদা, কোন দেবীমূর্তিকে আমি স্বপ্নে দেখিনি।

—তাহলে তোমাকে প্রত্যাদেশটা দিলেন কে?

এবার হেসে বলেছিলেন, তারাদা, তুমি বাবামশায়ের টোলে বেশ কিছুদিন ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেছিলে। বল দেখি, 'প্রত্যাদেশ' শব্দটির ব্যুৎপত্তি কী?

—সেসব কবে ভুলে মেরে দিয়েছি। এ-কথা কেন?

—প্রতি+আ+দিশ্‌+অ (ভো)!

—এই শুরু হল পণ্ডিত্যেমি! বেশ, না হয় তাই হল। তাতে কী? আমার প্রশ্নের জবাব কোথায়?

—'প্রত্যাদেশ' শব্দটির দুটি অর্থ। প্রথম অর্থ: 'দৈববাণী', যে অর্থ গ্রহণ করেছিলেন শিরোমণি-ঠাকুর, করেছ তুমি। কিন্তু ওর দ্বিতীয় আর একটি অর্থ আছে: 'পূর্বের আদেশ প্রত্যাহার করা'। আমি দ্বিতীয় অর্থে শব্দটা ব্যবহার করেছি। মিথ্যাভাষণ করিনি।

—কিন্তু কার আদেশ? কী আদেশ প্রত্যাহার করার কথা বলছ?

—কার আদেশ তা এখনি সঠিক বলতে পারছি না, তুমি এ গ্রামের কোন ঠাকুরমশাইকে প্রশ্ন করে জেনে নিতে পার। কোথাও না কোথাও এই শাস্ত্রীয় নির্দেশটি নিশ্চয় লেখা আছে দেবনাগরী হরফে—প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণীর দৈবমাহাত্ম্য এমন যে, তাতে আন্ত্রিক রোগাক্রান্ত রোগীর বস্ত্রাদি ধৌত করলে জল অপবিত্র হয় না।

তারাপ্রসন্ন বলেন, জিজ্ঞাসা করার কী আছে? এ কথা তো শিশুও জানে, প্রতিষ্ঠিত পুকুরের জল অপবিত্র হয় না।

—সেই দেবনাগরী হরফে লেখা আদেশটা 'প্রত্যাহার' করার একটা প্রত্যাদেশ

পেয়েছিলাম—স্বপ্নে নয়, শিক্ষায়। শাস্ত্রজ্ঞানে নয়, বিজ্ঞানের আশীর্বাদে।

তারাপ্রসন্ন স্বীকার করেন, বুঝলাম না।

—বসো। বুঝিয়ে বলি।

তারাপ্রসন্ন নব্যযুগের মানুষ। রূপেন্দ্রনাথের অপেক্ষা মাত্র বছর-পাঁচেকের বড়। ভবিষ্যৎ-জমিদার। তাঁকে স্বদলে আনতে হবে। রূপেন্দ্রনাথের অনেক-অনেক স্বপ্ন। এই সোঞাই গ্রামকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে আধুনিকতার একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করবেন। অন্ধ কূপমণ্ডূকগুলোকে বুঝিয়ে দিতে হবে—দেবনাগরী হরফে যেখানে যা কিছু লেখা আছে তাই অভ্রান্ত সত্য নয়! গ্রাম্য জীবনের নৌকার কাণ্ডারী হচ্ছেন ভূস্বামী। জমিদার নিজেই যদি কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয় তবে বিবেকবুদ্ধির বর্তিকায় নতুন করে পথ খোঁজা যাবে না। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ বার্ধক্যে উপনীত; তারাপ্রসন্ন নব্য যুবক। তাকে স্বদলে আনতে হবে।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তাঁকে বোঝাতে থাকেন।

শুধুমাত্র পুরুষকারে আস্থাশীল ছিলেন রূপেন্দ্রনাথ। নিয়তির অমোঘ বিধান মনের জোরে, বিবেকের নির্দেশে অতিক্রম করা যায় কিনা এটা পরীক্ষা করাই ছিল তাঁর সাধনা। বোধকরি তাই এক অলক্ষ্য নাট্যকার কৌতুক করে বারে বারে তাঁকে নাস্তানাবুদ করেন। ক্রমাগত দৈবনির্দেশে পালটে দিতে চেয়েছেন তাঁর জীবনের ছকটা। 'একবগ্গা পণ্ডিত' রাতারাতি 'ধন্বন্তরি' হয়েছিলেন নিতান্ত আকস্মিকভাবে। ব্রজেন্দ্র তাঁকে ঘটনাচক্রে নাড়ি দেখে নিদান হাঁকতে অনুরোধ করেছিলেন বলে। একবগ্গা সেটাকে দৈবঘটনা বলে স্বীকার করেন না। বড়মা মৃত্যুকামী ছিলেন না—মুখে তিনি যাই বলুন। তাঁর ইচ্ছাশক্তিই তির্যকপথে রূপেন্দ্রনাথকে সুযোগ এনে দিয়েছিল। এই তাঁর বিশ্বাস।

কিন্তু ওঁর সেই সঙ্কল্পটা—আমৃত্যু ব্রহ্মচারী হিসাবে আর্ত সেবার প্রতিজ্ঞাটা যে ভাবে বিলীন হয়ে গেল, সেটাও কি দৈবনির্দেশ নয়?

ব্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোত্থান করেন। সূর্যোদয়ের পূর্বেই প্রাতঃকৃত্যাদি ও সন্ধ্যাহ্নিক সারা। গৃহদেবতার প্রসাদটুকু মুখে দিয়ে রুগী দেখতে বার হয়ে যান অশ্বপৃষ্ঠে। ততক্ষণে সূর্যোদয় হয়েছে, কিন্তু গাছ-গাছালিতে পাখ-পাখালির কলরব থামেনি। ব্রজেন্দ্রনারায়ণের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। এ গ্রামে না হলেও আশপাশের গ্রামে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ছে। এ গাঁয়েও অসুখে-বিসুখে আজকাল তাঁর দু-একটি ডাক পড়ছে। রুগী দেখতে দেখতে পাঁচ-দশ ক্রোশ চলে যেতেন। ফিরে আসতেন কখনো দ্বিপ্রহরে কখনো বা পড়ন্ত বেলায়। একাহারী তিনি। আহারান্তে বসতেন স্তূপাকার পুঁথিপত্র নিয়ে। শুধু পড়া নয়। লেখাও। প্রতিদিন যে সব রোগের চিকিৎসা করেন তার বিবরণ লিখে রাখতেন। নিজের এবং ভবিষ্যতের জন্য। ইতিমধ্যেই একটি শিষ্য জুটেছে। স্বগ্রামের, কিন্তু কায়স্থ সন্তান—জীবনকৃষ্ণ দত্ত। প্রতিদিন ওঁর কাছে আসে। পাঠ

নেয়। অপরাহ্ণে আসেন মৌলবী সা'ব। সন্ধ্যার পর রুদ্ধদ্বারের ওপাশে রূপেন্দ্রনাথ একা বসে কী করেন সে বিষয়ে ধারণা নেই কাত্যায়নীর অথবা জগুপিসির।

ওঁদের দুজনেরই ধারণা তিনি ধ্যান করেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় উনি একা বসেছিলেন বাইরের দাওয়ায়। সূর্যাস্ত হয়েছে, সন্ধ্যা লাগেনি। পশ্চিমাকাশে অপূর্ব মেঘের সম্ভার। সারাটা পশ্চিম আকাশ যেন রঙদোলের নেশায় মেতেছে। পিসি আর কাতু গেছে বড়মার কাছে। প্রায়ই যায়। বিকালে। তাদের ফিরে আসার সময় হল। হঠাৎ নজর হল একটি ডুলি আসছে ওঁর বাড়ির দিকে। পিছন পিছন দুর্গা গাঙ্গুলী।

ডুলিটা ওঁর বাড়ির দিকেই আসছে কিনা তা স্থির-নিশ্চয় বুঝতে পারছিলেন না। সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ যখন আর থাকল না তখন যুক্তকরে এগিয়ে আসেন, আসুন, আসুন গাঙ্গুলীকাকা!

নত হয়ে প্রণাম করেন।

—হ্যাঁ, নিজেই চলে এলাম। কই গো, বেরিয়ে এস।

ডুলিটা নামিয়ে বাহকেরা পাগড়ি খুলে কপালের ঘাম মুছছে। দূরে সরে যাচ্ছে। একগলা ঘোমটা দিয়ে নেমে এল মৃন্ময়ী। পাশ কাটিয়ে ঢুকে গেল বাড়ির ভিতর। রূপেন্দ্র ভিতর-বাড়ির দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করেন, বাড়িতে কিন্তু এখন কেউ নেই।

দুর্গা প্রশ্ন করেন, দিদি নেই? কাতু?

—না, এখনি এসে পড়বেন। বসুন—

একটা চৌপায়া এগিয়ে দেন। দুর্গাচরণ পিছন ফিরে একবার দেখে নিলেন ডুলিবাহকেরা শ্রুতিসীমার বাহিরে কি না। নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, তোমাকে একটা উব্‌গার করতে হবে, বাবা।

—বলুন?

পিছনের দ্বারে মৃন্ময়ী এসে দাঁড়িয়েছে দেখে থমকে গেলেন। মৃন্ময়ী লজ্জা করল না, মাথার অবগুণ্ঠন কিছু কমিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করল, —কাকে, তা বোঝা গেল না—আমি কি একটা প্রদীপ জ্বেলে নিয়ে আসব?

রূপেন্দ্র বলেন, কিন্তু চক্‌মকি কোথায় আছে তা কি তুমি খুঁজে পাবে?

—পাব। জানি। ঠাকুরঘরের কুলুঙ্গিতে।

নিঃশব্দ চরণে আবার সে ভিতরে চলে যায়। দুর্গাচরণ বলেন, তুমি আর একবার তোমার খুড়িকে পরীক্ষা করে দেখ, বাবা।

—কেন? নতুন কোন উপসর্গ হয়েছে?

—না! তা নয়। মানে তোমার সেই যন্ত্রটা দিয়ে ওঁর তলপেটটা একবার বাজিয়ে দেখ।

—কেন? কী হয়েছে?

—হয়নি কিছু। মানে যন্ত্রটা দিয়ে দেখই না—ওর পেটে কী আছে—ছেলে না মেয়ে!

রূপেন্দ্রনাথ বিব্রত বোধ করেন। বলেন, যন্ত্র দিয়ে তা বোঝা যায় না। একটা হৃদস্পন্দন শুধু শুনতে পাব। অজাত ভ্রূণের। তার লিঙ্গ নির্ণয় ওভাবে করা যায় না। যদি ওঁর গর্ভে যমজ সন্তান না থাকে—

—না, না, তা নেই। রাসু দেখে বলেছে।

রাসমণি সোঞ্জাই গ্রামের একমাত্র ধাত্রী।

—তাহলে ওঁর গর্ভস্থ সন্তানের পুত্র হবার সম্ভাবনা শতকরা পঞ্চাশভাগ।

দুজনের কেউই খেয়াল করেননি। মৃন্ময়ী প্রদীপ না জ্বেলেই পুনরায় নিঃশব্দে ফিরে এসেছে। অন্দরের দিকে অপেক্ষা করছে। চকমকি নির্দিষ্ট স্থানে ছিল না।

বৃদ্ধ বলেন, তুমি আমার উপর রাগ করে আছ বাবা। তাই ওকে পরীক্ষা করতে চাইছ না।

রূপেন্দ্রনাথ বলেন, না। আমি রাগ করিনি। সেদিন যেভাবে আপনি আমাকে অপমান করে ছিলেন তাতে আমার আহত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু সেই রাগ পুষে রেখে মৃন্ময়ীর চিকিৎসা করব না···কিছু মনে করবেন না কাকা, ওকে হয়তো খুড়িমাই আমার বলার কথা, কিন্তু···

—না, না, মনে করব কেন? তুমি ওকে কোলেপিঠে করে ঘুরেছ। গ্রামসম্পর্কে খুড়ি হলেও ও তোমার চোখে ছোট বোনের মতো। তাহলে পরীক্ষা করতে চাইছো না কেন?

—ঐ তো বললাম। আপনি যে উদ্দেশ্যে ওকে পরীক্ষা করতে বলছেন তা আমার ক্ষমতার বাহিরে। ভ্রূণের হৃদস্পন্দন শুনে বোঝা যায় না, সে পুত্র অথবা কন্যা।

—চেষ্টা করেই দেখ না। খপরটা যে আমার নিতান্তই জানা দরকার।

হঠাৎ দুরন্ত ক্রোধ হয়ে গেল। বলেন, ধরুন আমি পরীক্ষা করে আপনাকে জানালাম, ওঁর গর্ভে কন্যা সন্তান আছে। তাহলে আপনি কী করতে চান?

—এই ভর সন্ধ্যাবেলায় অমন কথাটা বললে, বাবা?

—কী আশ্চর্য! আপনাকে কেমন করে বোঝাই? আমার কথায় ওর গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ পরিবর্তন হতে পারে না। যা হয়েছে, তাই হবে। আপনি আমার প্রশ্নের জবাবটা দেননি কিন্তু। যদি আমি বলি, ওর গর্ভে কন্যাসন্তানই আছে তাহলে কী করবেন?

—কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। আমার সময় কম।

—হ্যাঁ, খুড়ো। আমার তাই আশঙ্কা। আর কয়েক বছর পরেই সন্তান-উৎপাদনের ক্ষমতা আর আপনার থাকবে না।

—থাকবে না? কতদিন সময় আছে আমার?

— তা কি বলা যায়? বয়স বাড়ছে এটা তো জানেন?

—তা তো জানিই। তুমি কি পরামর্শ দাও?

—আমি কি পরামর্শ দেব? আপনি যা বিশ্বাস করেন তাই করুন—যাগ-যজ্ঞ, তুকতাক, কবচ-তাবিজ।

—তুমি ওসব বিশ্বাস কর না?

—আবার কেন ওসব অপ্রিয় আলোচনা তুলছেন?

—হুঁ। তুমি শুধু অপরাবিদ্যায় বিশ্বাসী! তোমার বিদ্যায় এ সমস্যা সমাধানের কোন পথ নেই?

তিক্ত কণ্ঠে রূপেন্দ্রনাথ বলেন, আছে। নিশ্চিত সমাধান নয়, সম্ভাব্যতার বিচারে আছে।

—কী তা?

—আপনি তো কুলীন। সময় থাকতে থাকতে গুটি-দশেক কুলীন কন্যাকে বিবাহ করে তাদের গর্ভ-সঞ্চার করুন। পুত্র জন্মানোর সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে!

—তুমি আমাকে ব্যঙ্গ করছ?

—না খুড়ো। আপনার প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত প্রত্যুত্তর করছি। এছাড়া এই অপরাবিদ্যায় আর কোন সমাধান আমার জানা নেই।

হঠাৎ নজর পড়ল ভিতর দ্বারে পাষাণপ্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে আছে মৃন্ময়ী।

বৃদ্ধ প্রশ্ন করেন, কী হল? প্রদীপ জ্বাললে না?

মৃন্ময়ী লোকাচার লঙ্ঘন করল। পরপুরুষের সম্মুখে স্বামী-সম্ভাষণ করে বলল, কই যে-কথা বলবেন বলে আমাকে ধরে নিয়ে এলেন, তা তো ওঁকে বললেন না?

—কী কথা? বাঃ! আমি আবার কী কথা বলব?

মৃন্ময়ী এবার রূপেন্দ্রনাথের দিকে ফিরে বললে, উনি আমাকে বলেছিলেন, আপনার কাছে ক্ষমা চাইতেই আমরা দুজন আসছি। তা উনি যখন বলছেন না, তখন আমিই বলি—সেদিন আমরা যে ব্যবহার করেছি সেজন্য আমরা অনুতপ্ত। আমরা ক্ষমা চাইতেই এসেছিলাম।

রূপেন্দ্রনাথ শশব্যস্তে বলেন, না, না, ভুল ভুলই। আমি কিছু মনে করিনি।

প্রায় একই সঙ্গে বৃদ্ধ বলে ওঠেন, দেখলে? রূপো কিছু মনে করেনি। আমি বলেছিলুম কিনা? যা'হোক। আমরা তাহলে চলি, কইরে তোরা কোথায় গেলি?

রূপেন্দ্রনাথ বাধা দিয়ে বলেন, শুনুন গাঙ্গুলীকাকা। ওর প্রসব-বেদনা উঠলে আমাকে সংবাদ দেবেন। না, না, আঁতুড় ঘরে আমি প্রবেশ করব না। বাইরে অপেক্ষা করব; যাতে প্রয়োজনবোধে রাসু-দাই আমার সাহায্য চাইতে পারে, ঔষধ হাতের কাছে পায়। প্রথমবার প্রসবকালে নানান ধরনের জটিলতা হওয়ার আশঙ্কা থাকে তো···

—নিশ্চয়, নিশ্চয় সে আর বলতে!

দুর্গাচরণ ঘর ছেড়ে বাইরের দাওয়ায় বার হয়ে যান। এতক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসছে, যেন মানুষের লোকলজ্জাকে আড়াল করে দিতে। গাঙ্গুলীমশাই দাওয়া থেকে নেমে পড়েন, ডুলিবাহকদের সন্ধানে।

প্রায়ান্ধকার নির্জন কক্ষ। দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। রূপেন্দ্র কেমন যেন অসোয়াস্তি বোধ করেন। তাঁর দৃষ্টি নেমে যায় সীমন্তিনীর অলক্তকরঞ্জিত চরণপ্রান্তে। মৃন্ময়ীর কিন্তু কোন সঙ্কোচ নেই। এই ঘর, এই ঘরের মানুষজন তার বাল্যস্মৃতিবিজড়িত। অনেকদিন পরে এ বাড়িতে এসেছে। এতক্ষণ ভিতর-বাড়িতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু আবার দেখছিল। পটের ছবি, লক্ষ্মীর ঝাঁপি, কাত্যায়নীর বিবাহের স্মারক মেঠো-দেওয়ালে বসুধারা চিহ্ন। এখন দেখছে গৃহস্বামীকে—সেও তার অতি পরিচিত। এই দুর্লভ মুহূর্তটিকে সে কিছুতেই ব্যর্থ হতে দিতে পারে না। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে অস্ফুটে বললে, সোনাদা। একটা কথা। শেষ সময়ে আমি যদি তোমার পায়ের ধুলো নিতে হাত বাড়াই, তুমি যেন পিছিয়ে যেও না।

রূপেন্দ্রনাথ চমকে ওঠেন। সোনাদা। এতক্ষণে চোখে চোখে তাকিয়ে দেখেন। মীনু এমন আবেগভরা গলায় তাঁকে কখনো কিছু বলেনি। বরাবর 'আপনি'-র দূরত্বে তাঁকে শ্রদ্ধা-সম্মান জানিয়ে এসেছে। ওর কাজলকালো চোখের তারায় যেন দেখতে পেলেন

1742

দৃশ্যটা—প্রসবাগারের প্রায়ান্ধকারে একটি সদ্যজননী একমুঠি প্রাণকে এ দুনিয়ায় পৌঁছে দিতে গিয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে বসেছে···একটা শাঁখাপরা হাত সেই অন্তিম মুহূর্তে অন্ধকারে খুঁজছে একমুঠি ধূলি···তার শেষপাড়ানির কড়ি!

রূপেন্দ্রনাথ সংযম হারালেন। দক্ষিণহস্তটা প্রসারিত করে দিলেন ওর অবগুণ্ঠনচ্যুত মাথায়। অস্ফুটে বললেন, ছিঃ! ও-কথা বলিস্ না মীনু! আঁতুড়ঘর থেকে সোনার চাঁদ ছেলে নিয়েই ফিরে আসবি তুই! তোর সোনাদার আশীর্বাদ ব্যর্থ হবে না।

উদ্গত অশ্রুর আবেগকে রুখতে মীনু চোখে আঁচলচাপা দিল।

বাইরে থেকে ভেসে এল, কই গো? এস। ওরা এসে গেছে।

দিনকতক পরের কথা। সূর্য এখন তুলারাশিতে। পিতৃপক্ষ চলছে। দামোদর এখন কানায়-কানায় ভরা। তার ভরাভাদ্রের জলস্ফীতি অবদমিত। মাঠে-ঘাটে থক্‌থকে কাদা এখনো শুকিয়ে ওঠেনি, তবে প্রখর মেঘভাঙা রৌদ্রে তা ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে পলিমাটির আস্তরণে। দামোদরের বার্ষিক দান। আকাশে মানসযাত্রী হংস বলাকার মতো সাদা মেঘের সম্ভার; তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দামোদরের পাড় ঘেঁষে কাশফুলের দিগন্ত ছোঁয়ার আকুলতা। সকালবেলায় শিউলীতলায় শিশিরবিন্দুর উপর হলুদ-সাদার নকশা।

আজকাল আরও প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হয় ওঁর। স্নানান্তে তর্পণে কিছুটা সময় যায়। পিতৃপুরুষকে জল দিয়ে রোগী দেখতে বের হন। সেদিনও গ্রামান্তরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সূর্যোদয় মুহূর্ত। হঠাৎ কাত্যায়নী এঘরে এসে বললে, একবার বাইরে এস দাদা। ভিন্‌গাঁ থেকে একটা গো-গাড়িতে করে কারা যেন এসেছেন। মনে হয়, ঘরানা-ঘরের রোগী। মহিলাই হবেন। ঘেরাটোপ পর্দা। সঙ্গে পাইক-বরকন্দাজ।

রূপেন্দ্র বাইরে এসে দেখেন, অদূরে একটি গো-শকট অপেক্ষা করছে। টাপর তোলা, পর্দা ঘেরা। বোধ করি পর্দানসীন কোন মহিলা। মুসলমান হওয়াই সম্ভব—পর্দার নিশ্ছিদ্রতা সে-রকমই ইঙ্গিত করছে। তবে সৌখিন লোকের গো-যান। বলদের শিং রঙ করা, গলায় কড়ির মালা, ঝকঝকে পিতলের ঘণ্টা। একজন অশ্বারোহীও রয়েছে তার কাছাকাছি। আরও দুজন বরকন্দাজ। ওঁকে বার হয়ে আসতে দেখে অশ্বারোহী অবতরণ করল। বলিষ্ঠগঠন সৈনিকশ্রেণীর লোক। তার সাজ-পোশাক হিন্দুর। খাটো কুর্তা, কোমরবন্ধে তরবারি, কিন্তু কপালে চন্দন-তিলক। লোকটা ওঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে নিবেদন করে, প্রাতঃপ্রণাম কবিরাজ মশাই। আমরা আসছি রূপনগর থেকে—মোহান্ত মহারাজের গড় থেকে।

—কোন্ মোহান্ত মহারাজ?

—রূপনগরে তো একজনই মোহন্ত মহারাজ আছেন, প্রভু—প্রভুপাদ শ্রীমন্ মহারাজ প্রেমদাস গোঁসাইজীর পাট থেকে।

নামটা সুপরিচিত। প্রেমদাস গোস্বামী গোটা রাঢ়খণ্ডে সুপরিচিত। রূপনগরের স্বনামধন্য

সিদ্ধপুরুষ। অসীম তাঁর ক্ষমতা—ইহলোক পরলোকে। বাক্‌সিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক। তাঁর পাট দামোদরের উত্তরে, বস্তুত অজয়ের তীরে। কেন্দুবিল্বের কাছাকাছি। রূপনগর বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের। আউল, বাউল, নেড়ানেড়ি প্রভৃতি। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীও আছে, তবে মুসলমান নেই। গ্রামটি বর্ধমান রাজসরকারের এক্তিয়ারভুক্ত ভূখণ্ডে নয়। সুবাদার হাতেম আলির রাজ্যে। প্রেমদাস গোঁসাই ও অঞ্চলের শুধু ধর্মীয় নেতা নন, রাজনৈতিক ক্ষমতাও তাঁর যথেষ্ট। তাঁর আখড়াটি বাস্তবে পরিখাবেষ্টিত একটি গড়। সচরাচর কোন ধর্মীয় নেতাকে এ জাতীয় গড় নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয় না—বিশেষ, হিন্দু ধর্মের কোন নেতাকে। হাতেম আলিও দিতেন না—দিতে বাধ্য হয়েছেন! সেদিক থেকে প্রেমদাস বাবাজী একটি ব্যতিক্রম। শুধু বেতনভুক লাঠিয়াল নয়, তাঁর বন্দুকধারী অশ্বারোহী সৈন্যও আছে।

রূপেন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন, গাড়িতে কে আছেন?

সৈনিকটি তার আঙরাখা থেকে একটি পত্র বাহির করে স্পর্শ বাঁচিয়ে সেটি নামিয়ে রাখে ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে।

পত্রলেখক স্বয়ং প্রেমদাস গোস্বামী।

বৈষ্ণবজনোচিত বিনয় প্রকাশ করে তিনি সোঞাই গ্রামনিবাসী মহামহিমার্ণব শ্রীল্ শ্রীযুক্ত রূপেন্দ্রনাথ ধন্বন্তরি মহাশয় বরাবর এই আর্জিটি পেশ করেছেন। দেবনাগরী হরফে, ব্রজভাষায়:

“রাধাগোবিন্দজী আপনার অশেষ মঙ্গল বিধান করুন। পরে জানাই, এক অনাথাকে আপনার পদপ্রান্তে প্রেরণ করিলাম। এস্থলে নানাবিধ পূজা অর্চনা যাগযজ্ঞাদি করিয়াও হতভাগিনীকে নিরাময় করা যায় নাই। অথচ ঐ হতভাগিনী ভাগ্যবতীই আগামী রাসপূর্ণিমায় রাইরানী হইবার জন্য দৈবনির্বাচিতা। তাহার মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা হইতেছে। হেতু নির্ধারণ করা যায় নাই। সময় নিতান্তই অল্প। এই সিদ্ধপীঠের আবহমানকালের প্রথায় যাহাতে ব্যত্যয় না হয় তাই আপনার শরণাপন্ন হইতেছি। পত্রবাহকের মাধ্যমে অবিলম্বে আমাকে জ্ঞাত করাইবেন এস্থলে বিকল্প ব্যবস্থার কোনও প্রয়োজন আছে কিনা।

বিনয়াবনম্র গোবিন্দচরণাশ্রিত ইতি প্রেমদাস গোঁসাই।”

পত্রটি বার দুই পাঠ করেও তার মর্মোদ্ধার করতে পারলেন না। ‘রাইরানী’ কাকে বলে, ওঁদের আবহমানকালের প্রথাটিই বা কী, জানা নেই। বিকল্প ব্যবস্থা বলতে কী ইঙ্গিত করা হয়েছে? সম্ভবত সৈনিকটি সে কথা জানে। কিন্তু তাকে সেসব প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয় না। মূল তথ্যটা অনুধাবন করতে অসুবিধা হল না। গোযানে একটি নারী আছে, সে অসুস্থা। সর্বাগ্রে তাঁকে দেখা দরকার।

তিনি ঘেরাটোপ গো-শকটের নিকটে অগ্রসর হয়ে এলেন। পর্দার বাহিরে দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, আমি চিকিৎসক। ভিতরে কে আছেন?

পর্দা সরিয়ে একটি প্রৌঢ়া নেমে এলেন। গৌরবর্ণ, নাকে রসকলি। ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে বললেন, আপনিই ধন্বন্তরিবাবা?

—আমার নাম রূপেন্দ্রনাথ দেবশর্মা। আমি পেশায় চিকিৎসক। রোগিণীকে দেখতে চাই।

—দেখুন বাবা, আসুন।

প্রৌঢ়া আচ্ছাদনের এক প্রান্ত তুলে ধরলেন।

ভিতরে একটি শয্যা পাতা। একটি তরুণী শায়িতা। তার চোখ দুটি নিমীলিত। হয় নিদ্রাগতা অথবা জ্ঞানহীনা। রূপেন্দ্রনাথ একটি ধাক্কা খেলেন মনে মনে। রোগপাণ্ডুর মুখ, ঘনকৃষ্ণ কেশপাশ ঈষৎ পিঙ্গল—বোধকরি দীর্ঘদিন রুক্ষ থাকায়। রক্তশূন্য। তবু অপরূপ সুন্দরী সে। শায়িতা দুর্গাপ্রতিমা! ওর ভ্রূমধ্যে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে থাকেন। চন্দ্রগ্রহণের পূর্বে যেমন একটি ধূসর ছায়াপাতের আসন্নতায় পূর্ণচন্দ্রের দীপ্তি ম্লান হয়ে যায়, এখানেও যেন তেমনি এক মৃত্যুশীতল সম্ভাবনা। অচৈতন্যার শীর্ণ দক্ষিণহস্তটি তুলে নিলেন। নিমীলত নেত্রে দীর্ঘ সময় তার নাড়ির গতি পরীক্ষা করলেন। জ্বরতাপে দেহ যেন পুড়ে যাচ্ছে। নাড়ির গতি অতি ক্ষীণ। মৃত্যু তিলতিল করে এগিয়ে আসতে চাইছে, সপ্তদশীর জীবনীশক্তি তাকে বাধা দিচ্ছে। কে হারে, কে জেতে!

অচৈতন্যার মণিবন্ধ ত্যাগ করে সেটি দেহের পাশে নামিয়ে রাখার পরে সৈনিকটি প্রশ্ন করল, কোন্ গৃহে ওকে স্থান দেওয়া হবে কবিরাজ মশাই? আপনি অনুমতি দিলে আমি পাঁজাকোলা করে শুইয়ে দিতে পারি।

রূপেন্দ্র বললেন, না। ওর সে সহ্যক্ষমতা বর্তমানে নাই। কোনক্রমেই ওকে এখন স্থানান্তরিতা করা যাবে না। তোমবা এক কাজ কর। বলদজোড়া খুলে দাও। ধীরে ধীরে গো-শকটটিকে ঐ তেতুঁলবটের ছায়ায় নিয়ে যাও। দুদিকে ঠেকো দিয়ে ওর শয্যাটি ভূমির সমান্তরালে রাখার ব্যবস্থা কর। এভাবেই ওকে সমস্ত দিন রাখতে হবে। দেখ, যেন রৌদ্রতাপ ওর গায়ে না লাগে।

প্রৌঢ়া আকুলভাবে প্রশ্ন করেন, বাঁচবে তো বাবা?

সে কথার জবাব না দিয়ে রূপেন্দ্রনাথ প্রতিপ্রশ্ন করেন, মেয়েটি আপনার কে হয়?

—আমাকে তুমিই বলবেন, বাবা। ওর সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক কিছু নেই। আমি মোহন্ত-মহারাজের সেবাদাসী ছিলাম।

—ছিলেন? এখন নন?

প্রৌঢ়া কী জানি কেন লজ্জা পেলেন। বলেন, তাঁর 'দাসী' তো বটেই, আর দাসীর ধম্মোই হচ্ছে 'সেবা' করা। কিন্তু ও বাঁচবে তো?

রূপেন্দ্রনাথ বলেন, আমি চিকিৎসক, দৈবজ্ঞ নই, মা। আমাদের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বাস রাখতে হয়—রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে। ঔষধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। তরল পানীয়। প্রতি আধঘণ্টা পর পর পাঁচ ফোঁটা করে ওর মুখে দেবেন।

—'আধঘণ্টা' কাকে বলে বাবা?

—ধরুন একদণ্ড কাল। আপনাকে একটি বালুকা ঘড়িও পাঠিয়ে দিচ্ছি। কীভাবে 'দণ্ডকাল' বিচার করতে হবে, তা আমার ভগিনী আপনাকে শিখিয়ে দেবে। সেও আপনাকে সাহায্য করবে।

গো-শকটটিকে বৃক্ষের ছায়ায় নিয়ে যাওয়া হল। কাত্যায়নী এল প্রৌঢ়া পরিচারিকাটিকে সাহায্য করতে। সিক্ত বস্ত্রখণ্ড রোগিণীর ললাটে বারে বারে দেওয়া হচ্ছিল—জ্বরতাপ খুব বেশি থাকায়। জ্ঞান ফিরে এলে রোগিণী মধুমিশ্রিত দুগ্ধ পান করতে পারে—আর কিছু নয়। প্রৌঢ়ার মধ্যাহ্ন আহারের আয়োজন হল ব্রাহ্মণবাড়িতে। রূপেন্দ্রনাথ সেই বরকন্দাজটিকে প্রশ্ন করলেন,

তোমরা কজন এখন কী করবে? এখানে মধ্যাহ্ন আহার সেরে রূপনগরে ফিরে যাবে?

লোকটা বললে, আপনি তো এখনো পত্রের উত্তর আমাকে দেননি, কবিরাজমশাই?

—দেখতেই তো পাচ্ছ রোগিণীর অবস্থা। ওর জ্ঞান হোক। তারপর পত্র লেখার প্রশ্ন উঠবে।

—তাহলে, এই সোঞাই গাঁয়েই আমাদের আপাতত থেকে যেতে হবে। যতদিন না ওর ভালোমন্দ কিছু হয়। তবে আপনার চিন্তার কিছু নাই! মোহন্ত-মহারাজ আপনাদের জমিদার-মশাইকেও একটি পত্র দিয়েছেন। আশা করি তাঁর অতিথিশালায় আমাদের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

রূপেন্দ্রনাথ স্পষ্টবক্তা। বললেন, 'মন্দ' অবশ্য যে কোন মুহূর্তেই হতে পারে; কিন্তু 'ভালো' হতে ওর পক্ষকাল সময় লাগবেই।

—তাহলে পক্ষকালই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে!

—তোমাদের ইচ্ছা।

যাবতীয় ব্যবস্থা করে তিনি রুগী দেখতে বার হয়ে গেলেন।

পার্শ্ববর্তী গ্রামে যে গৃহে গিয়েছিলেন সেখানেও ছিল একটি মৃত্যুপথযাত্রী রোগী। সারাটা দিন সেখানে থাকতে হল। সেটিও ব্রাহ্মণবাড়ি। বাধ্য হয়েই সেখানেই মধ্যাহ্ন-আহার সারতে হল। অপরাহ্ণ বেলায় রোগীর অবস্থা কিছু ভালোর দিকে পরিবর্তিত হওয়ায় ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করে গ্রামের দিকে ফিরতে থাকেন। চিকিৎসার প্রয়োজনে একটি অশ্ব ক্রয় করেছেন সম্প্রতি। সৈনগুপ্ত তার নাম। নিজেই তাকে দানাপানি দেন, পরিচর্যা করেন। জীবন দত্তও করে।

সমস্ত দিন একটি রোগপাণ্ডুর মুখের ছবি ভাসতে থাকে তাঁর মনের পটে। মেয়েটি 'অনাথা'। গোঁসাইজী লিখেছেন। 'নাথ' অর্থ কি স্বামী? অর্থাৎ বিধবা? কে জানে? সধবা যে নয়, এটুকু বোঝা যায়। কিন্তু একটি 'অনাথা' হতভাগিনীর বাবদে মোহন্ত-মহারাজ এত অর্থব্যয় করছেন কেন? সে কি ওঁর 'সেবাদাসী'? আবার লিখেছেন সে শুধু 'হতভাগিনী' নয়, 'ভাগ্যবতী'—'রাইরানী' হওয়ার জন্য দৈবনির্বাচিতা। মেয়েটিকে ঘিরে একটা রহস্যজাল গড়ে উঠছে বলেই কি ওঁর এই চিত্তচাঞ্চল্য? সে শুধু আর্ত নয়—সে বিশেষ!

গৃহে যখন প্রত্যাবর্তন করলেন তখনো সন্ধ্যা নামেনি। দেখলেন, গো-শকটটি বৃক্ষচ্ছায়ায় অপেক্ষারত। রোগিণীর এখনো জ্ঞান হয়নি। কাত্যায়নী বসে আসে তার শিয়রের কাছে। আর কোন জনমানব নেই।

—কেমন আছে রে? জ্ঞান হয়েছিল?

—পুরো জ্ঞান হয়নি। দুপুরে একবার চোখ মেলে তাকিয়েছিল।

—এরা সব কোথায়?

কাত্যায়নী জানায়, প্রৌঢ়া মধ্যাহ্ন আহারান্তে নিদ্রাগতা। এখনো ঘুমাচ্ছে।বোধ করি পূর্বরাত্রে

সম্পূর্ণ জাগরিত থাকতে হয়েছিল তাকে গো-যানে। সেপাইগুলো কে-কোথায় কাতু জানে না।

রোগিণীর জ্বরতাপ দেখলেন কপালে হাত দিয়ে। জ্বর অনেকটা কমেছে। নাড়ি দেখলেন—হ্যাঁ, ঔষধে কাজ হয়েছে। নাড়ির গতিবেগ উন্নতির দিকে।

বললেন, সারা রাত ওকে এখানে রাখা ঠিক নয়। কার্তিকের হিম সহ্য হবে না। তুই ঘরে একটা বিছানা পেতে দে।

কাত্যায়নী জানায় আরোগ্য নিকেতনের নবনির্মিত একটি কক্ষে সে বিছানা পেতে রেখেছে। কিন্তু সেপাইগুলো ফিরে না আসা পর্যন্ত কী করে রোগিণীকে স্থানান্তরিত করা সম্ভব?

রূপেন্দ্রনাথ বলেন: সে তোকে ভাবতে হবে না। তুই একটু দুধ গরম করে নিয়ে আয়। নড়াচড়ায় যদি ঘুম ভেঙে যায় তাহলে দুধটুকু খাইয়ে দেওয়া যাবে। আমিই ওকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাব।

সহজ সরল নির্দেশ, কিন্তু কাতুর বুঝি তা মাথায় ঢুকল না। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তার দাদার দিকে। ফলে ধমক খায়, কী বললাম মাথায় ঢুকল না? আমি তো সংস্কৃতে বলিনি কাতু।

থতমত খেয়ে কাত্যায়নী তৎক্ষণাৎ স্থানত্যাগ করে। রূপেন্দ্রনাথ এপাশে ফিরে এগিয়ে আসেন রোগীকে স্থানান্তরিত করতে। ঠিক তখনি পশ্চিমাকাশে অস্তসূর্য মুক্তি পেল মেঘের বন্ধন থেকে। এক মুঠি হলুদ-আবীর রোদ ছড়িয়ে দিলেন সূর্যদেব শেষ বিদায়ের পূর্বে। রূপেন্দ্রনাথের মনে পড়ে গেল আয়ুর্বেদশাস্ত্রের নির্দেশ: 'বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে সূর্য যেমন প্রকৃতির ললাটে শেষ চুম্বন চিহ্ন এঁকে দিয়ে যায় তেমনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে রোগীর ললাটে ফুটে ওঠে এক মহিমাময় দ্যুতি।'

এই অস্তসূর্যের 'কনে-দেখা' আলোয় রোগীর ভ্রূমধ্যে তেমন কোন দ্যুতি ফুটে উঠেছে কি না দেখবার জন্য ধন্বন্তরি মুখটা ওর অচৈতন্য আননের সন্নিকটে নিয়ে এলেন।

আর তৎক্ষণাৎ সত্যটা প্রণিধান করলেন: ও রোগী নয়, রোগিণী! পূর্ণযৌবনা একটি নারী!

বুঝতে পারেন, কেন কাতু অমন অবাক চোখে তখন তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল। তার জ্ঞানত দাদা কখনও কোন নারীদেহ এভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে বহন করে নিয়ে যায়নি।

নজর হল, অসাবধানে মেয়েটির বক্ষাবরণ কিছুটা অপসারিত। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে তার প্রাণধারণের প্রেরণা বক্ষের যুগ্মকামনায় ফুলে-ফুলে উঠছে। অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করলেন দৃশ্যটায়। ভ্রূমধ্যে নজর গেল না।

বরং স্মরণ হল আয়ুর্বেদশাস্ত্রের অপর একটি শ্লোক: 'তৃতীয়ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে যৌবনপ্রাপ্তা কোনও নারীদেহ কদাচ পরীক্ষা করিবে না। তার দেহস্পর্শ করিবে না।'

নির্দেশটির অর্থ, উদ্দেশ্য, প্রাঞ্জল। কিন্তু সে নির্দেশের কি ব্যতিক্রম নাই? নির্জন প্রান্তরে যদি কোন মুমূর্ষু যৌবনপ্রাপ্তার সন্ধান পান, তাহলে তাকে উপেক্ষা করে পলায়ন করতে হবে—যেহেতু তৃতীয় ব্যক্তি অনুপস্থিত? বিবেকের নির্দেশকে নস্যাৎ করতে হবে—যেহেতু শাস্ত্রীয় অনুশাসনটি দেবনাগরী হরফে সংস্কৃতে রচিত?

মনস্থির করলেন পণ্ডিত। না, এ অনুশাসন তিনি মানেন না, বর্তমান অবস্থায়-মানতে রাজি নন। প্রথমেই ঐ অচৈতন্যার আঁচলটি টেনে দিলেন বুকের উপর। একগুচ্ছ রুক্ষ কুন্তলচূর্ণ এসে পড়েছিল কপালের উপর—আঙুল দিয়ে সরিয়ে দিলেন তা। তারপর একটি হাত সাবধানে

স্থাপন করলেন ওর মাথার নিচে, দ্বিতীয় হাত জানুদ্বয়ের তলা দিয়ে। অনায়াসে মেয়েটিকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলেন বুকে।

কী হাল্কা। যেন একটি কবুতর।

অতি সাবধানে মূর্ছিতাকে বহন করে নিয়ে এলেন নির্দিষ্ট কক্ষে। সেখানে সদ্যরচিত শয্যাপার্শ্বে দুধের পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে কাত্যায়নী। পথের দিকে নজর থাকায় রূপেন্দ্রের খেয়াল হয়নি, কোলে তুলে নেওয়ার পরমুহূর্তেই মেয়েটি চোখ মেলে তাকিয়েছে। ওঁর বাহুবন্ধে এলায়িততনু মেয়েটি নির্নিমেষ নয়নে ওঁকেই দেখছিল এতক্ষণ। শয্যায় তার দেহটি স্থাপিত করার উপক্রম করতেই সে দুই বাহু দিয়ে সবলে ওঁর কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরল। তার দুটি চোখে ততক্ষণে আনন্দের জোয়ার। অস্ফুটে সে বললে, এসেছ? এত দেরী হল যে?

একটা বিদ্যুত-তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে গেল রূপেন্দ্রের সর্বদেহে। ভারমুক্ত হতে পেরেছেন, কিন্তু বন্ধনমুক্ত নয়। বুঝতে অসুবিধা হয়নি—এ ঘোর প্রলাপ। অসংলগ্ন উক্তি! কাকে কী বলছে, তা ও জানে না। কিন্তু রজ্জুতে সর্পভ্রম হলে ভ্রমাত্মক ব্যক্তির সর্পদর্শনজাত ভীতি যেমন নিখাদ, এই প্রলাপোক্তিও তেমন একটা মিথ্যা মোহের বাস্তব মাদকতা বিস্তার করতে চাইছে যেন।

নিরুপায় রূপেন্দ্র ভগিনীকে আদেশ দিলেন, পিছন থেকে ওর হাতের বাঁধন আল্‌গা করে দে।

দুধের পাত্রটা নামিয়ে রেখে কাত্যায়নী এগিয়ে এল। আদেশ পালন করল। রূপেন্দ্র বন্ধনমুক্ত হলেন। দেখলেন রোগিণী পুনরায় অচৈতন্য। কিন্তু তার পূর্বেই তিনি অনুভব করেছেন ঐ মৃত্যুপথ যাত্রিণীর আর্তি—যে বাঁচতে চায়! কিছুক্ষণ পূর্বে দৃষ্টির মাধ্যমে মনে হয়েছিল নিশ্বাস-প্রশ্বাসের তালে-তালে ওর যুগ্মবক্ষের স্ফীতি শুধুমাত্র প্রাণধারণের তাগিদে, এখন স্পর্শের মাধ্যমে বুক দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, অনুভব করেছেন—না, ও শুধু মানবশিশু হয়েই বাঁচতে চাইছে না—নারী হিসাবে বেঁচে উঠতে চাইছে।

রোগিণীর দিকে যেন আর তাকিয়ে দেখতে পারছেন না। নতমস্তকে আত্মস্থ হতে চাইছেন। কাতু বললে, ঐ কথাটা ও কেন বললে দাদা?

—প্রলাপ। বিকারের ঘোরে।

—তা বুঝেছি। কিন্তু ও তোমাকে ভুল করে কাকে ভেবেছিল?

—ওর কোন নিকট-আত্মীয়। দাদা-টাদা হবে।

—দাদা?

এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। ধমক দিয়ে ওঠেন, দাদা কি বাবা, কি পিসেমশাই তা কি আমার জানার কথা? তুই বড় বোকার মতো কথা বলিস কাতু। দে, পারিস তো দুধটুকু খাইয়ে দে।

স্থানত্যাগ করেন। পলায়নই বলা যায়। কারণ, কাত্যায়নীকে ধমক দিলেও বোঝেন—যেমন কাতু বুঝেছে—ঐ আকুলতা, ঐ সম্ভাষণ দাদা, বাবা, পিসেমশায়ের প্রতি প্রযুক্ত নয়। মেয়েটি নিঃসন্দেহে বিধবা। বিকারের ঘোরে সে তার মৃত জীবনমরণের সাথীকেই দেখতে পেয়েছিল খণ্ডমুহূর্তের জন্য।

এতক্ষণে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। বাড়ির দাওয়ায় এসে বসলেন। রোগিণীর কথা নয়,

নিজের কথাই চিন্তা করতে থাকেন। ন্যায়ের সেই সূত্রটিকেই বিচার করতে বসেন মনে মনে: ঠিক কথা। রজ্জুতে সর্পভ্রম হলে ভ্রমাত্মক ব্যক্তির ভীতির পরিমাপটা সমানই হওয়ার কথা; কিন্তু সে ব্যক্তির যদি পূর্বজ্ঞান থাকে যে, ওটা সর্প নয়, রজ্জু? তাহলে সে ভয় পাবে কেন? রূপেন্দ্রনাথ তো উচ্চারণ মাত্র বুঝতে পেরেছিলেন—মেয়েটির ঐ উক্তি নিতান্ত প্রলাপ। তাঁর দিকে দৃক্‌পাত করে শব্দকয়টি উচ্চারিত হলেও উদ্দিষ্ট ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তি! তাহলে? বিগতভর্তা যুবতীর প্রলাপোক্তিতে তিনি বিচলিত হলেন কেন? তার স্বামীর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত প্রেমসম্ভাষণে তিনি শিহরিততনু হন কোন অধিকারে? এ তো পরস্বাপহরণ!

—রূপেন আছ নাকি?

চমকিত হয়ে দেখেন তারাপ্রসন্ন এগিয়ে আসছেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। কৃষ্ণপক্ষের রাত। এক আকাশ তারা। পল্লীর বিভিন্ন কুটিরে শঙ্খধ্বনি নীরব হয়েছে। একটানা ঝিঁঝি পোকার ডাক। ঝোপেঝাড়ে শুধু মুঠো-মুঠো জোনাকি।

—তারাদা নাকি? এস, বস।

নিজে বসেছিলেন মেঠো দাওয়ায়। তারাপ্রসন্নের জন্য একটি চৌপায়া এগিয়ে দিলেন। তিনি সেটি সরিয়ে দিয়ে ঘনিয়ে এসে বসলেন। বললেন, মেয়েটি বাঁচবে?

—তুমি জানলে কী করে?

—মোহন্ত মহারাজ বাবামশাইকেও একটি পত্র লিখেছেন যে। কুসুমমঞ্জরীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তোমার কাছে। চিকিৎসা করাতে।

—কুসুমমঞ্জরী? মেয়েটির নাম?

—হ্যাঁ। তুমি জানতে না? ওর যে এ বছর রাইরানী হওয়ার কথা।

—'রাইরানী' কাকে বলে তারাদা?

—ও। তুমি বুঝি কিছুই জান না? শোন।

তারাপ্রসন্ন দীর্ঘ কাহিনী শোনালেন। এসব বৃত্তান্ত তাঁর ভাল ভাবে জানা। নিতান্ত ঘটনাচক্রে। তারাপ্রসন্নের প্রথমা পত্নী তারাসুন্দরী—ভাদুড়ী-বাড়ির ঐ রেওয়াজ, অর্থাৎ বিবাহের পর প্রথমা পত্নীর নাম হয়ে যায় স্বামীর নামে—রূপনগরের মেয়ে। তিনি কুলীন বারেন্দ্র ঘরের সুন্দরী বালিকা ছিলেন। তাঁর পিতৃদেবের উপাধি সান্যাল—বাৎস্যগোত্র। কন্যা সন্তানের ফুটফুটে রূপ দেখে শৈশবেই সান্যাল মশাই আত্মজাকে মামাবাড়ি পাঠিয়ে দেন। স্বগ্রামে আনয়ন করতেন না—পাছে কারও নজর পড়ে যায়। তারাপ্রসন্ন বিবাহ করতে যান স্ত্রীর মাতুলালয়ে, পিতৃগৃহে নয়!

—'কারও নজরে পড়ে যায়' মানে?

ধর্মপত্নীর কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যগুলিই এবার সবিস্তারে বর্ণনা করতে থাকেন: প্রেমদাস মোহান্ত একটি নববৃন্দাবন রচনা করেছেন। বৃন্দাবনে যেমন এক কৃষ্ণ আর ষোড়শ গোপিনী, রূপনগরেও তারই প্রতিচ্ছবি। মোহান্ত বাবাজীর অসংখ্য গোপিনী, কিন্তু 'রাইরানী' মাত্র একজনই। এক বৎসরের মেয়াদে। প্রতি বৎসর রাসপূর্ণিমার দিন নির্বাচিত হয়ে যায় পর বৎসর রাসপূর্ণিমায় কোন ষোড়শী 'রাইরানী' হবে। দ্বাদশমাসে দ্বাদশবার প্রতি-পূর্ণিমায় তার কাছে ভেট যায়—মুর্শিদাবাদী রেশমের শাড়ি, অলঙ্কার, গন্ধদ্রব্য, অগুরু-চন্দন। সেবাদাসীরা

তার অঙ্গমার্জনা করে, তাকে নানান আভরণে সাজায়। এই এক বৎসরকাল সে কিন্তু গোবিন্দদর্শনে বঞ্চিতা। মন্দিরে তার আসার অধিকার নেই। তখন তার বিরহের কাল। প্রতি পূর্ণিমায় আখড়ার ব্যবস্থাপনায় মন্দির-সংলগ্ন নাটমঞ্চে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রেমদাস বাবাজী এসে বসেন। আশীর্বাদ করেন। 'মাথুর পালা' গীত হয়। বিরহের গান। তারপর দ্বাদশ মাস বিরহযাপনান্তে রাসপূর্ণিমায় মেয়েটিকে 'রাইরানী' সাজানো হয়। হস্তিপৃষ্ঠে তাকে নগর প্রদক্ষিণ করানো হয়। মুহুর্মুহু পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকে। নগরবাসী হরিসংকীর্তন করতে করতে অনুগমন করে। সন্ধ্যায় শোভাযাত্রা এসে থামে গোবিন্দ মন্দিরে। সেদিন সান্ধ্য-আরতির অধিকার ঐ ভাগ্যবতীর। অতঃপর কীর্তন। এবার মিলনের গান। মধ্যরাত্রে আসর ভাঙে। বরমাল্য নিয়ে তখন রাইরানী প্রবেশ করেন গোবিন্দজীর শয়নকক্ষে—মন্দিরে নয়, মন্দির-সংলগ্ন একটি পুষ্পশোভিত ফুলশয্যাগৃহে। প্রেমদাস বাবাজী পট্টবস্ত্র পরিধান করে, চন্দন-তিলক সেবা-অন্তে গোবিন্দের তরফে তার পাণিগ্রহণ করেন। তাকে আশীর্বাদ করেন। রাইরানীর জীবনযৌবন ধন্য হয়ে যায়।

এক বৎসরের মেয়াদ। পরবর্তী রাসপূর্ণিমা পর্যন্ত। তখন আবির্ভূতা হন নতুনকালের নবীনা রাইরানী। বাসিফুলে কি দেবতার পূজা হয়? তবে নাকি দেবতাদের একটি দিবারাত্র মানবিক বিচারে এক বৎসর, তাই এই বৎসরান্তিক পালাবদলের পালা।

পুরাতনী? সে তখন আর রাইরানী নয়—সেবাদাসী। অসংখ্য সেবাদাসীর অন্যতমা। কখনো বা গোবিন্দের ঐ নির্মাল্যটি কাঞ্চনমূল্যে মাথায় করে গৃহে নিয়ে যায় রূপনগরের কোনও বিত্তশালী বৈষ্ণবসাধক—সেবাদাসী করে। তার প্রণামীতে স্ফীত হয় দেবতার তহবিল। গোবিন্দের ইচ্ছেয় যার অধিকার একমাত্র প্রেমদাস বাবাজীর।

একটা নিরুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়তে ইচ্ছা করছিল রূপেন্দ্রনাথের। আশ্চর্য! এই হচ্ছে হিন্দু সমাজ! এই হচ্ছে ধর্মের স্বরূপ! এতবড় একটা ক্লেদাক্ত অনাচারকে সারা দেশ মাথা পেতে মেনে নিয়েছে। কেউ রুখে দাঁড়ায় না। বরং দু-হাত তুলে হরিসংকীর্তন করতে করতে পাপাচারকে ধর্মীয় প্রলেপ দেয়।

—কী মনে হয়? মেয়েটি বাঁচবে?

রূপেন্দ্র বলেন, আয়ুর্বেদশাস্ত্রের নির্দেশ আজ লঙ্ঘন করতে ইচ্ছা করছে, তারাদা। মৃত্যুকে প্রতিহত করতে ওর পক্ষে একটিই ঔষধ—এক পুরিয়া বিষ!

তারাপ্রসন্ন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, কী করবে বল ভাই, রূপেন্দ্র? এই হচ্ছে হিন্দুধর্ম!

তিক্তকণ্ঠে রূপেন্দ্র বলেন, ওরা বলুক, কিন্তু তুমিও একথা বললে তারাদা? এই ধর্ম? ধর্ম কী? 'ধৃ'-ধাতুতে গড়া 'ধর্ম' হচ্ছে পিলসুজ, যা ধরে রাখে। কিন্তু কাকে ধরে রাখে? যারা তার বিকৃত ব্যাখ্যা করে কামচরিতার্থ করছে, তাদের? না! 'ধর্মং যো বাধতে ধর্মো ন স ধর্মঃ কুবর্ত্ত তৎ—' স্বয়ং বেদব্যাসের উক্তি। মঙ্গলকে, শিবকে যে ধারণ করে তাই ধর্ম—পাপকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ধর্ম নয়।

তারাপ্রসন্ন বলেন, কিন্তু আমরা যে নিরুপায় ভাই। এটাই যে সামাজিক নির্দেশ।

—সমাজ! হাঃ! 'সমাজ' শব্দটা পুংলিঙ্গ, তারাদা। ক্লীবলিঙ্গ নয়। তোমরা, বঙ্গদেশের ভূস্বামীরা রুখে দাঁড়াও, দেখি আমরা সমাজটাকে বদলাতে পারি কি না।

—আমি ভূস্বামী নই রূপেন্দ্র। তাই বাবামশায়ের তরফে তোমাকে ডাকতে এসেছি। তিনি অবিলম্বে তোমাকে একবার দেখা করতে বলেছেন।

—এখনই চল। ঐ মেয়েটির বিষয়ে আলোচনা?

—সম্ভবত না। বাবামশাই কাল প্রত্যুষে কাটোয়া যাচ্ছেন। আমাকে তো বললেন, পিতৃপক্ষে গঙ্গাতীরে তর্পণ করতে যাচ্ছেন; কিন্তু আমার মনে হল আরও কিছু গভীর উদ্দেশ্য আছে। কাল থেকে মনে হচ্ছে তিনি বেশ উত্তেজিত। ক্রমাগত পদচারণা করে চলেছেন। আমি এই একটু আগে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম ঐ কুসুমমঞ্জরীর বিষয়ে; তিনি এককথায় আমাকে থামিয়ে দিলেন।

—এককথায় থামিয়ে দিলেন! কী বললেন তিনি?

—বললেন, রূপনগরের মোহন্ত মহারাজ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। তাঁর বিরুদ্ধাচরণ কোনভাবেই করা উচিত হবে না। তাছাড়া রূপেন্দ্র চিকিৎসক—এসব বিষয়ে তার মাথা না ঘামালেও চলবে।

রূপেন্দ্রর একটা আঘাত লাগল। জেঠামশাই বৃদ্ধ, প্রাচীনপন্থী, কিন্তু তাঁকে সংস্কারাচ্ছন্ন কূপমণ্ডূক বলে মনে হয়নি কখনো। তাঁর এ সিদ্ধান্তে ব্যথা পাওয়ারই কথা। প্রশ্ন করেন, তুমি কী পরামর্শ দাও?

—আমি কী বলব? বাবামশাই যখন···

তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দেন, না! আমি তোমার ব্যক্তিগত মতামত জানতে চাইছি তারাদা। ধর, জেঠামশাই আগামীকালের বদলে যদি গতকাল কাটোয়া রওনা হয়ে যেতেন? তাহলে তাঁর অনুপস্থিতিতে সিদ্ধান্তটা তো তোমাকেই নিতে হত। তুমি সে ক্ষেত্রে কী করতে?

তারাপ্রসন্ন একটু চিন্তা করে বলেন, আমি সে ক্ষেত্রে গোঁসাই মহারাজকে জানিয়ে দিতাম, মেয়েটির সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা অল্প; তিনি যেন বিকল্প ব্যবস্থা করেন।

—অর্থাৎ ওর পরিবর্তে আর কোন ছাগশিশুকে যূপকাষ্ঠে প্রেরণ করতে!

—তাহলে তুমি কী করতে বল?

—শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। আমাদের ছলনার আশ্রয় নিতে হবে। আমরা জানিয়ে দেব, রাসপূর্ণিমার পূর্বেই মেয়েটি সুস্থ হয়ে যাবে। বিকল্প ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন নাই। তারপর একেবারে শেষ মুহূর্তে জানিয়ে দেব মেয়েটি সুস্থ হল না। এমনটা তো হতেই পারে।

—মিথ্যাচার? তঞ্চকতা?

—না! সত্যাচার! ধর্মরক্ষা।

—তাতে কী লাভ?

—অন্তত একটি বছর একটি মেয়ে রক্ষা পাবে। গতবৎসর যে মেয়েটি রাইরানী হয়েছে—তার তো যা সর্বনাশ হবার হয়েই গেছে—তার মেয়াদ এক বৎসর বৃদ্ধি পেয়ে যাবে, অজানা-অচেনা এক কামুক শ্রেষ্ঠীর অঙ্কশায়িনী হবার যন্ত্রণাটা পিছিয়ে যাবে।

তারাপ্রসন্নের ভ্রুকুঞ্চন হল। বললেন, রূপেন্দ্র, আমাকে খোলাখুলি বল তো, বাবামশাই যদি বারণ করেন তা সত্ত্বেও তুমি এই ছলনার আশ্রয় নিতে চাও?

মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে রূপেন্দ্র বলেন, আমিই রোগিণীর অভিভাবক। তার ভালমন্দ আমাকেই

দেখতে হবে।

তারাপ্রসন্ন ওর হাতখানা টেনে নিয়ে বলেন, তুমি আগুন নিয়ে খেলা করতে চাইছ রূপেন্দ্রনাথ। প্রেমদাস মোহন্তের গুপ্তচর সমস্ত রাঢ়খণ্ড ঘুরে বেড়ায়। অত্যন্ত কূটকৌশলী সে। অপরিসীম তার ক্ষমতা। তার নিজস্ব সৈন্যদল আছে। টের পেলে সোঞাই গ্রামখানাকে সে নিশ্চিহ্ন করে দেবে!

—মুসলমান রাজত্বে সে গোঁসাই মানুষ এতটা ক্ষমতা পেল কী করে? আর কোন সম্প্রদায়ের হিন্দু সাধকের নিজস্ব সৈন্যদল আছে বলে তো শুনিনি।

—না। প্রেমদাস বাবাজী সে দিক থেকে এক দুর্লভ ব্যতিক্রম। 'অঙ্গাঙ্গিভাবমজ্ঞাত্বা কথং সামর্থ্যনির্ণয়ঃ ?'[1] —বাবাজীর মুরুব্বির জোর আছে। তুমি জানতে না?

—না। কে মুরুব্বি?

—স্বয়ং ফতেচাঁদজী!

—বল কী! কিন্তু তিনি তো বৈষ্ণব নন?

—না। শোন বলি—

ফতেচাঁদজীর নাম শুনেই তাঁকে চিনতে পেরেছেন রূপেন্দ্রনাথ। আপনি-আমিও চিনব। তবে নামে নয়, কৌলীক উপাধিতে। আপাতত তারাপ্রসন্ন-কথিত কাহিনীটি শোনাই—

ফতেচাঁদ ছিলেন নিতান্ত গরিব পিতামাতার সন্তান। সুদূর রাজস্থান থেকে ভাগ্যান্বেষণে এসেছিলেন বঙ্গদেশে। কিশোর বয়সে। অত্যন্ত সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, উচ্চাভিলাষী ও বুদ্ধিমান। কৌতূহলী হয়ে রূপনগরে এসেছিলেন রাসের মেলা দেখতে। সেখানে খুব জমকালো রাসমেলা হয়। সে বৎসরের নির্বাচিতা রূপনগরের রূপবতীকে হস্তিপৃষ্ঠে নগর প্রদক্ষিণ করানো হয়। সন্ধ্যায় প্রেমদাস বাবাজীর রাসলীলার আসর। সে এক দুর্লভ দৃশ্য। রাসমঞ্চের কেন্দ্রবিন্দুতে রাইরানীকে পাশে নিয়ে সিদ্ধপুরুষ প্রেমদাস মোহন্ত—একমেবাদ্বিতীয়ম্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক। আর তাঁকে ঘিরে তালে তালে নৃত্যরতা বিশ-বাইশজন গোপিনী। ষোলো থেকে ছত্রিশ—যাঁরা প্রাক্তন রাইরানী, বর্তমানে গোপিনী। তাদের পরিধানে টাইট চোস্ত আর কাঁচুলি—মোগলাই কত্থক নর্তকীদের ঢঙে। নিম্নাঙ্গে ঘাঘরা এবং বরাঙ্গে ওড়না। ঢাকাই মসলিনের। এতই স্বচ্ছ যে, যৌবনপুষ্ট তনুদেহের স্বরূপ অনুধাবনে 'ভক্ত'দের কোন বাধা সৃষ্টি করে না। এমনকি ইতিমধ্যে যেসব গোপিনী অন্য কোন ধনীভক্তের সেবাদাসী হবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তারাও ঐ বার্ষিক উৎসবে যোগদান করতে আসে। নৃত্যগীতে অংশ গ্রহণ করে। ভক্তেরা দোহার দেয়। মাথা নাড়ে।

কিশোর ফতেচাঁদ সেই সুন্দরীদের হাট দেখতে এসেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের সভাতেও নাকি একযোগে এতগুলি সুন্দরীর সমাবেশ ঘটে না। একেবারে সামনের সারিতে বসেছিলেন তিনি।

প্রেমদাস বাবাজী নিজেও তখন তরুণ। তাঁর বিলক্ষণ নেশা হয়েছে। সিদ্ধি, না বড় কল্কে অথবা তরল পানীয় জানা নেই, কিন্তু ঘোর লেগেছে তাঁর। গোপিনীদের দেহ হিন্দোলের তালে-

---

[1] কার সঙ্গে কী জাতের খাতির আছে তা না জানা পর্যন্ত কারও প্রকৃত ক্ষমতা বোঝা যায় না।

তালে ঝাড় লণ্ঠনগুলোও যেন পাক খাচ্ছে। হঠাৎ তাঁর নজর হল, সামনের সারিতে বসে আছে এক বালকৃষ্ণ—নন্দকিশোর। অপূর্ব সুপুরুষ ছেলেটি। বাৎসল্যরস উথলে উঠল। তিনি হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকলেন। এক কদম কীর্তন তখন সবে থেমেছে। নূতন কীর্তনীয়া তান ধরেনি। বাদক তার বাঁধছে, সুর বাঁধছে। গোঁসাইজী প্রশ্ন করলেন, কী নাম রে তোর?

—আজ্ঞে, ফতেঁচাদ।

—বোষ্টম?

—না, প্রভু। আমি জৈন। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের।

—তবে মধুর লোভে এখানে ঘুরঘুর করছিস কেন? দ্যাখ্, এদের কাউকে মনে ধরে?

পাঁচ আঙুলে গ্রহবারণ পঞ্চরত্ন: মুক্তা, প্রবাল, নীলকান্ত, পদ্মরাগ ও হীরকখণ্ড। দক্ষিণ হস্তটি প্রসারিত করে গোপিনীদের দেখিয়ে দেন। তারা এতক্ষণ নৃত্যরতা ছিল। শ্রমজনিত শ্বাসপ্রশ্বাসে জোড়া-জোড়া স্বর্ণকলস উথালপাথাল করছে। তারা হেসে মুখে ওড়না চাপা দেয়। কারও বা কাজলকালো চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ঐ কন্দর্পকান্তিকে দেখে।

ফতেচাঁদ কৌতুক বোধ করেন। অনিন্দ্যকান্তি গোপিকাকুলের উপর চোখ বুলিয়ে বলেন, আমি নিতান্ত অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণ গোঁসাইজী। সাধিকা পুষব কী ভাবে?

হঠাৎ কী যেন হল সিদ্ধপুরুষের। দুই বাঘের থাবায় খামচে ধরলেন তরুণের দুই বাহুমূল। নিকটে আকর্ষণ করলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কী যেন দেখতে থাকেন তার ভ্রূমধ্যে। তারপর ধীরে ধীরে তাকে মুক্ত করে দেন। বলেন, মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। যাকে মন চায় তুলে নিয়ে যা। সূর্য উত্তরায়ণে যাত্রা করার পূর্বেই তুই লাখ্‌পতি হয়ে যাবি।

দু-একটি প্রগল্‌ভা সকৌতুকে বলে ওঠে, আমাকে, আমাকে শেঠজী।

ফতেচাঁদ দারুণ কৌতুক বোধ করেন। গোপিনীদের দিকে ফিরে বললেন, একটু দেরী হবে সুন্দরীরা। মকর-সংক্রান্তির এখনো এক পূর্ণিমা বাকি। আমি এখন শেঠজী নই, ফকিরজী।

সবাই খিল্‌খিলিয়ে হেসে ওঠে।

ফতেচাঁদ গোঁসাইজীর দিকে ফিরে যুক্তকরে নিবেদন করেন, প্রভু! মনে মনেই যখন খেতে দিচ্ছেন তখন দুধ কেন? ক্ষীরের বাটিই বরাদ্দ করুন। লাখ্‌পতির বদলে ক্রোড়পতি।

প্রেমদাস বৈষ্ণব। সদা সুনীচ—তৃণাদপি। রাগ করতে জানেন না। 'রাগ' বলতে বোঝেন 'অনুরাগ'। একগাল হেসে বললেন, কথাটা প্রত্যয় হল না, বাবা নন্দকিশোর? জানিস্ না, আমি বাক্‌সিদ্ধ?

—জানি প্রভু! তবে আমার নাম 'নন্দকিশোর' নয়, 'ফতেচাঁদ'। আমার পূর্বপুরুষ ছিলেন রাজস্থানী বণিক। আমি তাঁদের এক অযোগ্য পুত্র।

প্রেমদাস স্মিত হেসে বলেন, বুঝেছি। রাজস্থানী বণিক বংশের বেটা বলেই 'ক্ষীর' ছাড়া মুখে আর কিছু রোচে না। তা বেশ। ক্ষীরই বরাদ্দ করে দিলাম। একমাসের মধ্যেই তুই—না লাখপতি নয়, ক্রোড়পতি হয়ে যাবি। যা ভাগ। পালা!

ভক্ত অনুচরেরা ঐ রসভঙ্গকারী বিধর্মীকে সসম্মানে পথ দেখিয়ে রাসমঞ্চের বাইরে নিয়ে যায়। যেসব ভদ্রঘরের মেয়ে গোপিনীবৃত্তিতে পাকা হয়েছে তাদের কেউ কেউ পিছন থেকে বলে ওঠে—মাসখানেক পরে ফিরে এস ফকিরজী! আমাদের বিরহ যন্ত্রণার অবসান কর।

সোঞাই

আশ্চর্য ঘটনাচক্র। প্রায় অবিশ্বাস্য!

সিদ্ধপুরুষ প্রেমদাস গোঁসাই-এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। মকর-সংক্রান্তির পূর্বেই ফকির হয়ে গেল আমীর। এ যেন রূপকথার গল্প! অপুত্রক ধনকুবের মানিকচাঁদের নজর পড়ল ঐ অসামান্য রূপবান তরুণটির উপর। মানিকচাঁদও রাজস্থানী বণিক—শ্বেতাম্বর বণিক সম্প্রদায়ের। ফতেচাঁদকে দত্তক নিলেন তিনি। ফতেচাঁদ প্রণাম করতে এলেন প্রেমদাস বাবাজীকে।

মানিকচাঁদ বা ফতেচাঁদকে সে আমলে সবাই চিনত। দু'শ বছরের ব্যবধানে আপনি-আমি হয়তো ঠিক ধরতাইটা ধরতে পারছি না; কিন্তু উপাধিটা শুনলে আজও তাঁদের সনাক্ত করতে পারবেন। ওঁদের কৌলীক উপাধি—জগৎশেঠ।

'জগৎশেঠ' কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। পারিবারিক পরিচয়। মহাকালের স্রোতে আমরা যে ঘাটে বর্তমানে নৌকা ভিড়িয়েছি তার বছর পনের পরে পলাশীর আমবাগানে যিনি ক্যাপ্টেন ক্লাইভকে ইতিহাসের ভিড়ে ঠেলে-ঠুলে ঠাঁই করে দিলেন তিনি যেমন 'জগৎশেঠ মহতাপচাঁদ', তেমনি প্রেমদাস বাবাজীকে যিনি গড় গড়বার অনুমতি নবাব-সরকার থেকে পাইয়ে দিলেন তিনি—'জগৎশেঠ ফতেচাঁদ।' মহতাপের পূজ্যপাদ পিতামহ।

শুধু অর্থকৌলীন্য নয়, ফতেচাঁদ ছিলেন আলিবর্দীর প্রিয়পাত্র অন্য এক হেতুতেও। প্রাগ্বর্তী নবাব—সরফরাজ খাঁর—হাত থেকে আলিবর্দীর শাসনদণ্ড ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারেও তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

হাতেম আলী এতবড় মুরুব্বির জোরকে উপেক্ষা করতে পারেননি—প্রেমদাস বাবাজীকে গড় গড়তে দিতে হয়েছিল! প্রেমদাস তাই নিজস্ব বেতনভুক সৈন্যও রেখেছেন। তারাপ্রসন্ন যা বলেছেন তা বড় মিছে কথা নয়—'অঙ্গাঙ্গি ভাবমজ্জাত্ব'—। বাবাজী ইচ্ছা করলে সোঞাই গ্রামখানিকে রাঢ়খণ্ডের মানচিত্র থেকে মুছে দেবার ক্ষমতা রাখেন।

—বস, বাবা রূপেন্দ্র। তুমিও বস তারাপ্রসন্ন। তোমাদের সঙ্গে একটি অত্যন্ত গোপন এবং অত্যন্ত জরুরী আলোচনা আছে। শুনেছ বোধহয়, কাল প্রত্যুষে আমি কাটোয়া যাচ্ছি?

কথা হচ্ছিল ব্রজেন্দ্রনারায়ণের বৈঠকখানায়। ওঁরা দুজনেই আদিষ্ট হয়ে আসন গ্রহণ করেন। রূপেন্দ্র বলেন, হ্যাঁ, তারাদার কাছে এইমাত্র শুনলাম। পক্ষকালের জন্য আপনি কাটোয়া যাচ্ছেন। মহালয়ার তর্পণ সেরে ফিরে আসবেন।

—হ্যাঁ। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য দুটি। ঐ অবকাশে আমি দাঁইহাটিতে পণ্ডিত ভাস্কররাম পন্থের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করে আসব। তোমরা তাঁর নাম শুনেছ?

রূপেন্দ্র বলেন, শুনেছি। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। গত বৎসর তিনি যখন ঐ দাঁইহাটিতেই অকালবোধন করছিলেন তখন নবাব আলিবর্দী মহাষ্টমীর দিন তাঁকে অতর্কিতে আক্রমণ করেন।

অষ্টমীতে প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে ভাস্কর পণ্ডিত নাকি কোনক্রমে আত্মরক্ষা করে মহারাষ্ট্রে ফিরে যান।

—ঠিকই শুনেছ। কিন্তু পন্থজীর উদ্দেশ্য কী, কেন তিনি পুনর্বার ফিরে এসেছেন জান?

—আন্দাজ করতে পারি। যবনের উপর প্রতিশোধ নিতে।

—সেটা তো আপাত উদ্দেশ্য। মূল লক্ষ্যটা? কী নিয়ে বিরোধ? কী হতে পারে এর পরিণাম?

—না, সে বিষয়ে আমার কোন ধারণা নেই। তুমি কিছু জান, তারাদা?

তারাপ্রসন্ন নেতিবাচক গ্রীবাভঙ্গি করেন।

ব্রজেন্দ্র জানালেন পূর্বদিন তিনি বর্ধমানরাজ তিলকচাঁদের কাছ থেকে একটি গোপন নির্দেশ পেয়েছেন। বস্তুত রাজাদেশেই তিনি কাটোয়া যাচ্ছেন। দাঁইহাটি তার কাছেই। সেখানে বর্তমানে অধিষ্ঠান করছেন ঐ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। ব্রজেন্দ্র বর্ধমানরাজের দূত হিসাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন। জানতে—এ রাজ্য থেকে যবন-শাসন নির্মূল করতে যদি বর্ধমানরাজ তাঁর হস্তপ্রসারিত করে দেন তাহলে বিনিময়ে কী প্রতিশ্রুতি তাঁকে দেওয়া হবে।

রূপেন্দ্র প্রশ্ন করেন, আপনার কি ধারণা পন্থজী যবন শাসনের অবসান ঘটিয়ে বঙ্গদেশে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন?

ব্রজেন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, আমার ধারণা, ভাস্কর পণ্ডিতের উদ্দেশ্য তা আদৌ নয়। কী জবাব দেব? সে দিগ্বিজয়ী নয়, একজন লুটেরা, ডাকাত। অত্যন্ত কূটবুদ্ধি—কিন্তু লোভী ও নির্মম! রঘুজী ভোঁসলেও তাই।

—তিনি কে?

—সর্বাগ্রে ঐতিহাসিক পটভূমিকাটুকু জেনে নাও।

মহারাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থান ও তার তদানীন্তন স্বরূপ সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ একটি চুম্বকসার শোনালেন।

শিবাজী মহারাজের ছিল সেই উদ্দেশ্য—হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সেই মহানায়কের দেহাবসানের পর মারাঠা বাহিনী ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গেল। তারা ক্ষমতাদর্পী, স্বার্থপর, অর্থলোলুপ। চতুর্বর্গের শুধু মাঝের দুটির দিকেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। পরস্পরের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ। এদেরই একটির দলপতি হচ্ছেন নাগপুর অঞ্চলের মারাঠা দস্যু-সর্দার রঘুজী ভোঁসলে। আর তাঁর প্রধানমন্ত্রী ঐ কূটবুদ্ধি ব্রাহ্মণ: ভাস্কররাম পন্থ।

রঘুজী নবাব আলিবর্দীর কাছে 'চৌথ' দাবী করে দূত পাঠালেন। 'চৌথ' হচ্ছে রাজ্যের সম্পূর্ণ রাজস্বের চারভাগের এক ভাগ।

শিবাজীর জীবিতকালেই দিল্লীর বাদশাহ্ স্বীকার করে নিয়েছিলেন এই চৌথ সংগ্রহের অধিকার মারাঠাদের আছে। ভাস্কর পণ্ডিত রঘুজীর তরফে তাই নবাব আলিবর্দীর কাছে চৌথ চেয়ে পাঠালেন। অস্বীকার করলেন আলিবর্দী—না চৌথ, না সরদেশ মুখ।

সেটা অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক—অর্থাৎ আমাদের কাহিনীর কাল। নাগপুরের পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে অশ্বারোহী বর্গী সৈন্য নিয়ে ভাস্করপণ্ডিত রওনা হলেন বংগাল-মুলক্। তখন বাঙলা বলতে বিহার ও উড়িষ্যার অনেকখানি সমেত। বীরভূম-বিষ্ণুপুরের শালবন ডিঙিয়ে

সেপ্রাই

ছোট ছোট টাট্টু ঘোড়ায় চেপে এসে হাজির হল লুঠেরার দল। তাদের পিঠে ঢাল, মাথায় উষ্ণীষ, কোমরে তলোয়ার, হাতে বল্লম। বেশ কিছু বন্দুকধারীও।

ভাস্কর পণ্ডিত ইতিপূর্বেও একবার এসেছেন বঙ্গদেশে, সর্দার রঘুজীর তরফে চৌথ সংগ্রহ করতে। গত বৎসর দুর্গা পূজার মরশুমে। সেবার বর্গীরা খুব কিছু অত্যাচার করেনি। ওঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভয় দেখিয়ে চৌথ সংগ্রহ করে যাওয়া। অজয় নদ যেখানে গঙ্গায় মিশেছে সেই কাটোয়া-ঘাটের কাছাকাছি ঘাঁটি গেড়েছিলেন। তখন শারদীয়া দুর্গাপূজা আসন্ন। হিন্দুদের সহানুভূতি পাবেন আশা করে ভাস্কর সাড়ম্বরে দুর্গা পূজার আয়োজন করেছিলেন। তখন বঙ্গদেশে শাক্তরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ভাস্করপণ্ডিত নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজকে সামাজিক বিদায় পাঠিয়ে খুশি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেবার তিনি পূজা সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। মহাষ্টমীর দিন বৃদ্ধ আলিবর্দী খাঁ তাঁকে সসৈন্য আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করেছিলেন। প্রতিমা ফেলে ভাস্কর কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস! সে সময় অনেক হিন্দু বর্ধিষ্ণু জমিদার মনে-প্রাণে চেয়েছিলেন ভাস্কর পণ্ডিত পরের বছর ফিরে আসুন। অসমাপ্ত পূজা সাঙ্গ করুন। আর ঐ আলিবর্দী নামক মহিষাসুরটার শিরশ্ছেদ করুন।

ভাস্কর ফিরে এলেন, কিন্তু এবার নিজমূর্তি ধরে। লুটেরার মূর্তিতে। এবার তাঁর যাত্রা পথে যেসব গ্রাম পড়ল—হিন্দু অথবা মুসলমান গ্রাম—সেখানে অকথ্য অত্যাচার করতে করতে। সে অমানুষিক অত্যাচারের বর্ণনা সবার জানা। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যাঁরা ভাস্করকে হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারী ভেবেছিলেন তাঁরা অধোবদন হলেন।

নিয়তির সেটাই চূড়ান্ত পরিহাস নয়। কিছু সম্রান্ত মুসলমান আমীর ওমরাহ্‌ও ঐ কাফের পণ্ডিতকে গোপনে আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছিলেন! তাঁরা সবাই সরফরাজ খাঁর আত্মীয়বন্ধু ও অনুগ্রহভাক্‌।

সরফরাজ খাঁ প্রাগ্বর্তী বাঙলার নবাব। মুর্শিদকুলী খাঁর দৌহিত্র। মাত্র তের মাস তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন বাঙলার মসনদে। মুর্শিদাবাদের অনতিদূরে গিরিয়ার ময়দানে তাঁর নবাবী ফুরালো। আলিবর্দীর হাতে। সেটা 1740 খ্রীষ্টাব্দ।

সরফরাজ খাঁর আত্মীয়বন্ধুদের আরও একটি যুক্তি ছিল—আলিবর্দী যে শুধু বাঙালী নন তাই নয়, তিনি আদৌ হিন্দুস্থানী মুসলমান ছিলেন না। তাঁর বাপ আরবী, মা তুর্কিদেশের মেয়ে।

তা সে যাই হোক, ভাস্কর পণ্ডিত বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন—বলা যায়—হিন্দু-মুসলমানের যৌথ আমন্ত্রণে! নিয়তির পরিহাস ওটাই: আতিথ্য ধর্ম পালনের সময় ভাস্কর পণ্ডিত সমদর্শী! হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনও ফারাক রাখেননি। যে গ্রাম জ্বালিয়েছেন, যে নরনারীর শিরশ্ছেদ করেছেন, যে সমস্ত রমণীকে তাঁর সৈন্যদল যৌথ বলাৎকারে জীবন্মৃত করেছে—তারা কাফের এবং যবন। সে অত্যাচারের বীভৎসতা দুশ বছর পরেও মিলিয়ে যায়নি। আজও বাঙলার গ্রামে মায়েরা শিশুদের ঘুমপাড়ায় সেই একই সুরে—

'খোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বর্গী এল দেশে।'

সে-খোকা রামও হতে পারে, রহিমও হতে পারে।

সে আমলে দেশের একপ্রান্তের সংবাদ অপরপ্রান্তে পৌছাতে সময় লাগতো। তাছাড়া

অতিরঞ্জনের ভারে অধিকাংশ খবরই ভারাক্রান্ত। বর্ধমানরাজ তিলকচাঁদের তাই তখনো স্বপ্নভঙ্গ হয়নি। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতটির ভিতর তিনি তখনও শিবাজী মহারাজের ভাগোয়া-ঝাণ্ডার পতাকাধারীকে খুঁজতে ব্যস্ত। তিনি আশা করে আছেন—ভাস্কর পণ্ডিত তাঁর বর্গী সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করবেন মুর্শিদাবাদ ; বিধর্মীকে গদিচ্যুত করে প্রতিষ্ঠা করবেন হিন্দু রাজ্য। যার তিনটি স্তম্ভ—নাটোরের রানী ভবানী, নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র এবং বর্ধমানের তিলকচাঁদ।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ইমানদার লোক, তাই তাঁকে দূতরূপে প্রেরণ করতে চাইলেন দাঁইহাটি।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ বললেন, আমার কিন্তু মোহভঙ্গ হয়ে গেছে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি—ঐ ভাস্কর আর তার বর্গী সৈন্য এসেছে বাঙলাকে লুট করতে। চৌথ আদায় হোক আর না হোক ওরা নাগপুরে ফিরে যাবার পথে একইভাবে গ্রামের পর গ্রাম লুট করতে করতে যাবে। তাই আমাদের অবিলম্বে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

তারাপ্রসন্ন বলেন, কিন্তু কী নিয়ে লড়ব আমরা? আমাদের না আছে ঢাল-তলোয়ার, গোলাবারুদ, না শিক্ষিত সৈন্যদল। ফাঁকা মাঠে অশ্বারোহী সৈন্যদলকে আমরা রুখব কী করে?

ব্রজেন্দ্র বললেন, শোন বলি। দুটি যুক্তি আমাদের তরফে। দুটি বিষয়ে আমাদের স্থান বর্গীদলের উপরে। এক: সংখ্যাগরিষ্ঠতা; দুই: মরণপণ লড়াই করার প্রবণতা। বিচার করে দেখ—ওদের আছে বন্দুক। আমার লড়ব তীরধনুক দিয়ে। কিন্তু প্রতিটি বন্দুকধারীর মহড়া নিতে যদি হাজির থাকে পঞ্চাশজন মরণপণ তীরন্দাজ, তাহলে লড়াইয়ের ফল অন্যরকম হতে পারে। ওরা আসছে লুট করতে, মেয়েদের ইজ্জত বাঁচাতে নয়। তাই বাধা পেলেই তারা ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়ে যাবে।

সমস্ত পরিকল্পনাটি ব্যক্ত করলেন তিনি।

গ্রামবাসীর বন্দুক নেই, অসিচালনা বা অশ্বারোহণ তারা জানে না—যারাও বা জানে তাদের না আছে অসি, না অশ্ব। প্রতিরোধ করতে হবে তীরধনুকে। বর্গী আক্রমণের সূচনামাত্র গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রচারিত করতে হবে সেই বিপদবার্তা। হিন্দুগ্রামে শঙ্খধ্বনি—শঙ্খ প্রতিটি ঘরেই আছে। মুসলমান গ্রামে প্রস্তুত রাখতে হবে দামামা। তাছাড়া তৈরী করতে হবে ধনুক ও তীর। শত শত, সহস্র-সহস্র। তীরধনুকের ব্যবহার শিখতে সময় লাগে না। বিপদসঙ্কেত শ্রবণমাত্র হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জওয়ানরা উঠে বসবে পথপার্শ্বের অযুত-নিযুত বৃক্ষচূড়ায়। অশ্বারোহী বাহিনী নিকটবর্তী হলেই মুষলধারে বর্ষণ করতে হবে তীর।

বন্দুকধারীরা পরাজিত হবে না, মুখ ঘুরিয়ে নিতে বাধ্য হবে। তারা খুঁজে নিতে চাইবে অরক্ষিত গ্রাম। কিন্তু এই সোঞাই গ্রামের আদর্শে যদি রাঢ়খণ্ডের প্রতিটি জনপদ একইভাবে মরণপণ প্রতিরোধের আয়োজন গড়ে তোলে তাহলে বর্গীর দল এ রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র সরে যাবে, সহজ শিকারের সন্ধানে।

দীর্ঘ আলোচনা হল। ব্রজেন্দ্র বললেন, সব কিছুই এখন করতে হবে গোপনে। বর্ধমান-রাজ যেন অসন্তুষ্ট না হন। সংবাদটা জানাতে হবে আশপাশের গ্রামেও—হিন্দু-মুসলমান এবং অন্ত্যজ পল্লীতে। রূপেন্দ্র এবং তারাপ্রসন্ন সেইসব গ্রামের মাতব্বরদের যেন একইভাবে সতর্ক করে আসেন। সঙ্গোপনে প্রতিরোধ ব্যবস্থার উদ্যোগ করেন। বললেন, আমি খাজাঞ্চিকে বলেছি এক সহস্র মুদ্রা আপাতত তোমাদের হাতে দেবে। তোমরা লোহা সংগ্রহ কর।

কামারদের নিয়োজিত করে তীরের ফলা বানানোর কাজ এখনই শুরু করে দাও। বাঁশ ঝাড় কেটে ধনুক বানাও।

প্রথম প্রহর সমাপ্তির যাম ঘোষণা হল। ব্রজেন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। বললেন আজ এই পর্যন্তই। তোমাদের কোন প্রশ্ন আছে?

রূপেন্দ্রও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন । বলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। ঐ মেয়েটি, যাকে রূপনগরের মোহন্তবাবাজী—

ব্রজেন্দ্র একটি হাত তুলে ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন। বললেন, এ অঞ্চলে ঐ একটি মাত্র কেল্লা; মোহন্ত মহারাজের। তাঁর নিজস্ব সৈন্যদল আছে। বাদবাকি গোটা রাঢ়খণ্ড উন্মুক্ত প্রান্তর—যেখানে অশ্বারোহী সৈন্যদলকে রোখা যায় না। এমনকি, অজয়ের তীরে ইছাই ঘোষের পরিত্যক্ত শ্যামরূপার গড়টাকেও কেউ সংস্কার করা প্রয়োজন বোধ করেনি। না রূপেন্দ্র—বর্গী বিপর্যয়ের এই সন্ধিক্ষণে আমারা কিছুতেই রূপনগরের মোহন্ত মহারাজের বিরক্তি উৎপাদন করতে পারি না।

রূপেন্দ্র নতনেত্রে কিছুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করলেন। তারপর বললেন, আপনি এখনই বলছিলেন, মা-বোনের ইজ্জৎ বাঁচাতে আমাদের মরণপণ লড়াই করতে হবে, কিন্তু যে হতভাগিনীর বিলকুল কেউ নেই ....

কেমন যেন বেদনার্ত হয়ে ওঠে ব্রজেন্দ্রর মুখ।

বললেন, উপায় নেই! সেই হোক প্রথম শহীদ!

—শহীদ! এ তো শুধু বুকের রক্ত দেওয়া নয়, জেঠামশাই! এ যে ইজ্জৎ-কা-সওয়াল!

ব্রজেন্দ্র কক্ষান্তরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিলেন। এ কথায় ঘুরে দাঁড়ান। বলেন, তুমি তার চিকিৎসক রূপেন্দ্র—

—কিন্তু আপনি তার অভিভাবক, জেঠামশাই! আমাকে মোহন্ত মহারাজ চিঠি লিখেছেন তার চিকিৎসার জন্য, আপনাকে তার নিরাপত্তার জন্য—

ব্রজেন্দ্রনাথের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলেন, তোমার আয়ুর্বেদশাস্ত্রে যদি নিষেধ না থাকে তাহলে ফেরত পাঠানোর সময় সেই হতভাগিনীর আঁচলে এক পুরিয়া বিষ বেঁধে দিও। যাতে ইজ্জতের বদলে জান দিয়ে সে দেশ-মাতৃকার সেবা করতে পারে!

কালবৈশাখীর প্রভঞ্জন আসে ভৈরব-রভসে! বাতাস নেই, বিদ্যুৎ নেই, চরাচর স্তব্ধ। রৌদ্রতাপদগ্ধ অপরাহ্নের আকাশে নেমে আসে আতঙ্কতাড়িত সূর্যসাক্ষী চিলের আর্তনাদ। আসন্ন সর্বনাশের প্রতীক্ষায় প্রকৃতি প্রহর গনে।

সোঞাই গ্রামখানিরও সেই অবস্থা।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ সূর্যসাক্ষী চিলের মতো গ্রামকে একটি অমঙ্গলবার্তা শুনিয়ে মিলিয়ে গেছেন

আকাশের নিঃসীমায়। তারাপ্রসন্ন আর রূপেন্দ্র নিরলস নিষ্ঠায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চালিয়ে যাচ্ছেন প্রচারকার্য। বর্গী-প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলার কাজ। বর্ণহিন্দু সমাজপতিরা অধিকাংশই ব্যাপারটাকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। হাজার হোক, ভাস্কর পণ্ডিত লোকটা বামুন, তাঁর সৈন্য দলের কেউ যবন নয়। তাদের সম্বন্ধে লোকে যেসব গুজব ছড়াচ্ছে তা অতিরঞ্জিত বৈ কিছু নয়।

দুর্গাচরণ নন্দ চাটুজ্জেকে জনান্তিকে বলেন, বড়কর্তার তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, কতকগুলো ছেলে-ছোকরাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে নিজে ডুব মেরেছেন। আর 'হুপুই' এর গন্ধ পেলে এসব চ্যাঙড়ার দল তো একপায়ে খাড়া। বিশেষ যদি চাঁদা-তোলার ব্যবস্থা থাকে। তা সে ওলাবিবি, শীতলা মায়ের বারোয়ারী পুজোই হক আর বর্গী ঠেঙানোর হুজুগই হোক।

নন্দ বলেন, শুনলাম—বড়কর্তা নাকি হাজার তঙ্কা···

বাধা দিয়ে দুর্গা বলেন, ক্ষেপেছ! শুনে দেখেছ? ও সব ওরা রটাচ্ছে—যাতে তোমার আমার কাছ থেকে মোটা চাঁদা চাইতে পারে। এ একটা কতা হল? ভাস্কর পণ্ডিত নিষ্ঠাবান বামুন! ত্রিসন্ধ্যা জপ না করে জলস্পর্শ করেন না।

কিন্তু আপামর জনসাধারণের মধ্যে একটা সাড়া জেগেছে। কী হিন্দু,কী মুসলমান। তারা বিশ্বাস করেছে। না করে উপায় কী? ইতিমধ্যে বীরভূম বিষ্ণুপুর থেকে দলে দলে সর্বহারার দল যে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। তাবা অন্ধ, খঞ্জ—কারও খোয়া গেছে নাক, কারও কান—এখনো ঘা শুকাইনি। অনেকের মা-বোনকে চরম লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে। যে হতভাগিনীরা প্রাণে মরেনি, তাদের যে এখনো প্রাণ-ধারণের গ্লানি সইতে ভিক্ষায় বের হতে হয়েছে ভিন্ গাঁয়ে। ওদের পাকা ধানের ক্ষেত আর পর্ণকুটীর জ্বালিয়ে দিয়েছে বর্গী সৈন্য—ওরা আশ্রয়প্রার্থী, আহার্যসন্ধানী।

এ যে প্রত্যক্ষ সত্য! অস্বীকার করবে কে?

বিশেষ করে সাড়া জেগেছে অন্ত্যজ পল্লীতে। দামোদরের ওপারে তাদের সারি-সারি বস্তি—কৈবর্ত, নমঃশূদ্র, বাগদী, বায়েন পরিবার। এক দশক আগে—মুর্শিদকুলীর আমলে ওদের অনেকেই ছিল ডাকাত। কেউ কেউ এসেছে উত্তর অথবা পূর্ববঙ্গ থেকে। পদ্মার চরে জমিদারের তরফে তারা মারদাঙ্গা করত। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ তাদের ডেকে এনে জমি দিয়ে বসিয়েছিলেন। আলিবর্দীর আমলে চোরডাকাতের উপদ্রব অনেক কমে গেছে। মুর্গিচুরির অপরাধে তখন ফাঁসির ব্যবস্থা। ফলে ডাকাতেরা ভাদুড়ীমহাশয়ের পরামর্শ মেনে নিয়ে ঘর-গেরস্থালি করতে রাজী হয়েছে। দামোদরে মাছ ধরা, নৌকা বাওয়া, মহাজনের ক্ষেত-খামারে মুনিষ খাটায় মন দিয়েছিল। প্রতিরোধ-পরিষদের আহ্বানে তাদের রক্তে দোলা লাগল। ওদের মাতব্বর ভীমা বাগদী। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স—ইয়া বুকের ছাতি—ইয়া পাট্টা জোয়ান এখনও। তারাপ্রসন্নের দরবারে এসে যুক্ত করে নিবেদন করল, তাইলে মোদের যন্তরগুলান প্রিতিদানের আজ্ঞা' হোক হুজুর।

'প্রিতিদান' মানে 'প্রতিদান' নয়, 'প্রত্যর্পণ'। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে হলে ভীমা বাগদী এ জাতীয় ভদ্র ভাষা ব্যবহার করে থাকে। বুঝতে অসুবিধা হল না তারাপ্রসন্নের। তিনি বললেন, কিন্তু গঙ্গাজল হাতে নিয়ে প্রতিজ্ঞা কর, এই সব বর্গীর হাঙ্গামা মিটে গেলে আবার

আমার মালখানায় যন্ত্রগুলো 'প্রতিদান' দিবি!

একগাল হেসেছিল ভীমা বাগদী, কী যে বলেন কত্তা! হাঙ্গামা মিটে গেলে ও নিয়ে আমরা কী করব? না কি বলিস রে তোরা?

ভীমা এসেছিল সদলবলে। তার জোয়ান ভাইপো ঈশান সর্দার বলে, সে আর বলতি।

তারাপ্রসন্নের আদেশে মালখানা থেকে ওদের আটক করা অস্ত্রশস্ত্র সাময়িকভাবে ফিরিয়ে দেওয়া হল। তিনটি ফিরিঙ্গি গাদা-বন্দুক—পর্তুগীজ বোম্বেটেদের কাছ থেকে সংগৃহীত, একত্রিশটি ভীল ধনুক—রাজস্থানী ভীলদের কাছ থেকে ভীমার পূর্বপুরুষেরা কী জানি কী করে সংগ্রহ করেছিল। আর অসংখ্য মরিচাধরা তীর। ভীমার সাগরেদরা বসল সেগুলি শান দিতে।

ওরা সবাই লাঠিখেলায় ওস্তাদ। ভীম ভাল তীরন্দাজ। ভাইপো ঈশানের তো অব্যর্থ টিপ। বীরাষ্টমীর দিন শুধু একদিনের জন্য ওরা ফেরত পেত যন্ত্রগুলো। পূজামণ্ডপে খেল দেখিয়ে সবাইকে তাজ্জব করে দিত খুড়ো-ভাইপো। মহরমেও ওরা লাঠির কসরৎ দেখাতে যেত। সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ঐসব অন্ত্যজ পরিবারগুলির সঙ্গে নিরন্ন মুসলমান পল্লীর মনোমালিন্য ছিল না। যবনের ছায়া মাড়ালে নন্দ চাটুজ্জেকে অবেলায় স্নান করতে হত বটে কিন্তু ভীমা বাগদী বকর্-ঈদের দিনে ফিরনি খেত চেটেপুটে।

দুর্গা গাঙ্গুলীর একটা বড় বাঁশঝাড় আছে। ভীমা বাগদী জীবন দত্তকে মুখপাত্র করে তাঁর অনুমতি চাইতে গিয়েছিল। প্রতিরক্ষা পরিষদের নাকি ঐ গোটা ঝাড়টাই প্রয়োজন। দুর্গা আঁৎকে ওঠেন, কী হবে রে অত বাঁশে? ও ঝাড়ে না হোক একশ তল্‌তা বাঁশ। কত দাম জানিস্?

জীবন বলে, দরদাম পরে ঠিক করে নেবেন, প্রতিরোধ কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে। গোটা ঝাড়টাই লাগবে দাদু।

ঈশান-সর্দার হাঁকাড় পাড়ে, নে রে ভাই। দেরি করিস্ না।

কুঠার হাতে সাত-আটজন মহিষাসুর এগিয়ে আসে বাঁশ ঝাড়টার দিকে।

হাঁ-হাঁ করে বাধা দিয়েছিলেন গাঙ্গুলী। এমন আজব কতা তো বাপের জন্মে শুনিনি! কী দরে নিচ্ছিস্ সেটা আগে কবুল খা।

ভীমা এবার মহড়া নিতে এগিয়ে এল তার দশাসই দেহখানি যথাসম্ভব বিনয়াবনত করে। পেন্নাম করে বললে, ঠিগাছে ঠাউরমশাই! যা দাম ধরবেন তাই দেব নে! দরদাম আমরা করবনি। এক কতা! হক কতা!

—ইস! তোর যে বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা ফুটছে রে ভীমা! আমি যদি বলি, এক একখানা বাঁশের দাম এক আসরফি? দেবে তোর বাবুরা?

—মুই এককথার মুনিষ ঠাকুরমশাই। তাই দেবনে!

—তাই দিবি? বাঁশ-পিছু এক আসরফি?

—বিবেচনা করে দেখেন, নগদে তো আর দিতি হচ্ছে না! একশ বাঁশের দরুন এক শ আসরফি, এই ছুটবাবু আপনার নামে চাঁদার খাতায় নিকে নেবে নে। কী ছুটবাবু, নেবে তো? দ্যাখ, আমার কতার খেলাপ করনি বাবু।

জীবন কোনক্রমে হাসি লুকিয়ে বলে, নিশ্চয়। তুমি যখন জবান দিয়েছ, দরদাম করবে না।

দাদুর নামে একশ আসরফি লিখে নেব চাঁদার খাতায়।

এর চেয়ে যে বর্গীর অত্যাচারও ভাল ছিল। ভীমা বাগদীর হাড়-হারামজাদ চেলা-চামুণ্ডার দল এক বেলার মধ্যেই গোটা বাঁশঝাড়টা সাফা করে দিল। কী বলবেন উনি? এক ঝাঁক পরশুরাম। প্রত্যেকের হাতেই শাণিত কুঠার।

বিষ্ণু বায়েন আবার এক আজব পাগলামী জুড়ে দিয়েছে। কোথা থেকে কে জানে সে জোগাড় করেছে একটা তিন-ছ্যাদাওয়ালা শিঙা। এক-এক ছ্যাদা আঙুল দিয়ে বন্ধ করলে তার এক-এক বেসুর। বিষ্টুর মতে সে তিনটি—উদারা, মুদারা, তারা। পথে-ঘাটে, এখানে-সেখানে লোক জড়ো করে সে ক্রমাগত শিঙে ফুঁকে চলেছে, বোয়েছেন না, 'তারায়' সেই দিক্‌সীমায়, মাঠের ও-বাগে, 'মুদারায়' বেহ্মডাঙার মাঠের মাঝখানে, আর 'তারা' শোনলে বোঝবেন যে শিরে সংক্রান্তি। বোয়েছেন?

তালগাছে চড়ায় বেষ্টা-বায়েনের দারুণ কেরামতি। কাঠবিড়ালীদেরও লজ্জা হবে। সে সবাইকে জানিয়ে রেখেছে, শঙ্খধ্বনি বা দামামার শব্দ কানে গেলেই সে শিঙা-ট্যাকে তড়বড়িয়ে উঠে যাবে ব্রহ্মডাঙা মাঠের ঐ বড় তালগাছটায়। মা-বোনেরা তখন ঘরে আগড় দিও, জওয়ানেরা ধনুক নিয়ে চড়ে বসো যে-যার গাছে। বেষ্টা-বায়েনের উপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক। টের পাবে বর্গীসৈন্য কত দূরে। 'তারা'র তান শুন্‌লি পরে ধনুকে বাণ জুড়ে সুম্বুন্ধি-পোদের দিকে তাগ্ করবে। বোয়েছ না?

কুসুমমঞ্জরী অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। তার রুক্ষচুল এখন খোঁপা বাঁধা যায়। মূর্ছা আর হচ্ছে না। পথ্যি পেয়ে গায়ে তাগদও এসেছে। গোযানটা অপেক্ষা করছে। সেই প্রহরীটি ফিরে গেছে রূপনগরে। বোধকরি বারম্বার প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে সম্ঝে নিয়েছে, কবিরাজ-মশায়ের কু-মৎলব আছে। তা তো হতেই পারে—কুসুমকে দেখলে মুনিঋষিরও মতিভ্রম হয়ে যায়, আর ও তো সামান্য কবিরাজ। দূর থেকে সে লক্ষ্য করেছে সব কিছু। কুসুম মাঝে মাঝে বাইরের দাওয়ায় এসে নিশ্চুপ বসে থাকে। অথচ কবিরাজ মশায়ের সানাই-এ সেই এক পোঁ।

একদিন সুযোগমতো কুসুমমঞ্জরী বললে, শুনুন।

নাড়ি দেখে ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করে রূপেন্দ্র ফিরে যাচ্ছিলেন। ঘরে তখন কাত্যায়নীও আছে। পিছন থেকে ওর ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, কিছু বলবে?

—আমাকে আপনি বাঁচিয়ে তুললেন কেন?

প্রশ্নের অন্তর্নিহিত জ্বালাটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। বলেন, সেটাই যে চিকিৎসকের ধর্ম।

—ও, ধর্ম! আপনারা সবাই খুব ধার্মিক, নয়?

এ তিরস্কারের কী জবাব?

—কিন্তু আমি তো বাঁচতে চাইনি। বলুন, কেন তাহলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে এভাবে বাঁচালেন?

অপরাধীর মতো রূপেন্দ্র অধোবদন।

কাত্যায়নী তাঁকে নীরব দেখে বলে ওঠে, তুমি তো তখন অজ্ঞান অচৈতন্য ছিলে ভাই। দাদা

কেমন করে বুঝবে, তুমি কী চাও?

—কিন্তু এখন তো আমি সজ্ঞানে আছি। এখন তো উনি জানেন, আমি কী চাই।

রূপেন্দ্র অত্যন্ত অসহায় বোধ করেন। শান্ত স্বরে বলেন, কিন্তু আত্মহত্যা যে মহাপাপ, মঞ্জরী।

—ও! আত্মহত্যা করলে অনন্ত নরকবাস বুঝি? আপনাদের ধর্ম তাই বলে?

এবারও প্রত্যুত্তর করতে পারলেন না।

—আর সেই ধর্মগুরুর সেবাদাসী হলে? অনন্ত বৈকুণ্ঠ-লোক? কী? বলুন? জবাব দিচ্ছেন না কেন?

রূপেন্দ্র তাকিয়ে দেখলেন মেয়েটির দিকে। ওর চোখ দুটি জ্বলছে। বড় বড় নিশ্বাস পড়ছে। আর হাপরে ফুঁ পড়লে কামারের চুল্লিতে যেমন অঙ্গারখণ্ড জ্বলে-জ্বলে ওঠে তেমনি প্রতি শ্বাসে ওর চোখ দুটিতে আগুন জ্বলছে।

রূপেন্দ্র বলেন, তুমি কী চাও?

—মরতে। আমাকে এক পুরিয়া বিষ এনে দেবেন?

কাত্যায়নী স্তম্ভিত হয়ে গেল দাদার উত্তর শুনে। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বললেন, দেব। আজ নয়, যেদিন তুমি রূপনগরে ফিরে যাবে, সেদিন তোমার আঁচলে বেঁধে দেব। কিন্তু কথা দাও—একেবারে চরম মুহূর্তের আগে তা মুখে দেবে না?

অদ্ভুত হাসল মেয়েটি। উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। যুক্তকরে অসঙ্কোচে বললে, আপনি আমাকে মার্জনা করবেন, গৌর! মরতে আমি চাই না, কেই বা মরতে চায়?—মিছে কথা বলেছিলাম তখন। তাই কথা দিতে পারছি।

রূপেন্দ্রনাথ আর দাঁড়ালেন না। স্থানত্যাগ করেন তৎক্ষণাৎ।

না, মরতে কেউ চায় না—যে মর্মন্তুদ হেতুটা মানুষকে আত্মঘাতী হতে প্রেরণা যোগায় সেটা অপসারিত হলে কে মরতে চায়? পরমাত্মার মতো জীবাত্মাও শুধু আনন্দের অভিসারী—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। ঐ অজগরের নাগপাশ থেকে মেয়েটিকে যদি মুক্ত করা যেত, তাহলে ঐ কুসুমমঞ্জরীও ফুলে-ফুলে মুঞ্জরিত হয়ে উঠত। কিন্তু তা হবার নয়। স্বহস্তে তিনি ওর অঞ্চলপ্রান্তে বেঁধে দেবেন মুক্তিপথের চাবিকাঠি!

হ্যাঁ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রের নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন আজ। গুরুর আদেশ অমান্য করেছেন। 'মা প্রদেয়ম্' তালিকায় যে প্রাণহানিকর বিষ আছে তার থেকে বেছে নিয়ে একটি তীব্র কালকূট দিতে হবে ঐ মেয়েটিকে।

শাস্ত্রীয় নির্দেশ নয়, গুরুবাক্য নয়—সবার বড় তাঁর বিবেকের সঙ্কেত।

সত্যশিবসুন্দরকে খুঁজে পেতে হলে 'আত্মদীপ' হতে হবে।

গৌর!

সম্বোধনটা শুনে অবাক হননি—প্রতিবাদও করেননি। তত্ত্বটা ওঁর জানা। কাত্যায়নী বলেছে। মেয়েটি স্বীকার করেছিল কাত্যায়নীর কাছে। দুজনে প্রায় সমবয়সী। কদিনেই সখীত্ব

1742

গড়ে উঠেছে একটা। কাত্যায়নীর কাছে সে স্বীকার করেছে।

সে নাস্তিক!

না, জ্ঞান হবার পর থেকেই সে ঈশ্বরে বিশ্বাস হারায়নি। শৈশবেই হারিয়েছে বাবা-মাকে—কাকার কাছে মানুষ। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বাড়ি—নিত্যপূজার ব্যবস্থা ছিল। বাড়িতেই আছে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। বৃহস্পতিবারের লক্ষ্মীপূজো, শিবরাত্রির উপবাস, বৈশাখে 'পুণ্যিপুকুর' সব রকমই করেছে বাল্যে ও কৈশোরে। দেবতার উপর তার বিশ্বাস নষ্ট হয়েছে গত বৎসর রাসপূর্ণিমায়—যখন শুনল, আগামীবছর রূপনগরের সবচেয়ে সৌভাগ্যবতী হওয়ার জন্য সে নির্বাচিতা হয়েছে! এই একটি বছর সে সব দেবতার দ্বারে মাথা কুটেছে—কারও দয়া হয়নি! দেবদেবী, ঠাকুরঠুকুর সব ফক্কিকারী—সব মিথ্যা! ঠুঁটো জগন্নাথ আর্তের ডাকে সাড়া দেন না—ধনী যজমানের মালপো-ভোগের দিকে তাঁর দৃষ্টি! মা-কালী শুনতে পান না ছাগশিশুর আর্তনাদ! যূপকাষ্ঠে বৃথাই ধড়ফড় করে শান্ত হয় ছিন্নশির হতভাগ্য!

কাত্যায়নী আস্তিকের ঘরে লালিত। আজন্ম সংস্কারে আঘাত লাগায় শিউরে উঠেছিল সে—কিন্তু মেয়েটিকে ঘৃণা করতেও পারেনি। বোঝে—কী মর্মান্তিক যন্ত্রণায় হতভাগিনী নাস্তিক হয়ে যেতে বসেছে। আকুল হয়ে কাতু বলে উঠেছিল, কিন্তু শিব? আশুতোষ?

—না, আকাশের কোন দেবতাকে বিশ্বাস করি না আমি। আমার দেবতা মর-মানুষ! আমার ইষ্ট—শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। তাই সর্বজীবে গৌরকে খুঁজি আমি।

—কিন্তু তিনিও তো বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করেছিলেন?

—জানি। ত্যাগ দুজনেই করেছেন। মা বিষ্ণুপ্রিয়াও মহাসাধিকা। স্বামীর কোল থেকে সরে গেছিলেন যাতে তিনি সর্বজীবে কোল দিতে পারেন।

রীতিমতো অবাক হয় গিয়েছিলেন রূপেন্দ্রনাথ। কাতুর কাছ থেকে সব কিছু শুনে। ঐ মেয়েটি কে? ওর কি অক্ষর-পরিচয় আছে? না হলে এমন তত্ত্বজ্ঞান ওর হল কী করে?

বুঝতে পারেন—আর বুঝতে পেরে নিরতিশয় লজ্জায় মুখখানা কোথায় লুকোবেন ভেবে পান না—কেন সে সেদিন ঐ কথা বলেছিল! ওঁর অঙ্কশায়িনী সেই মেয়েটি সেদিন—ছি ছি, কী লজ্জা—ওঁর মুখে দেখতে পেয়েছিল তার প্রাণের ঠাকুরের প্রতিচ্ছবি! অচেতনের অন্ধকার রাজ্য থেকে চেতনার সীমান্তে পৌঁছে অত কাছে ওঁকে দেখতে পেয়ে ও ভুল করেছিল। ওঁর নয়, ওর প্রাণের ঠাকুরেরই কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরেছিল। বলেছিল, এসেছো এত দেরী হল যে?

ভেবেছিল, মৃত্যুদেবতার রূপ ধরে ওকে কোলে তুলে নিয়েছেন ওর সেই প্রাণের ঠাকুর, প্রেমের ঠাকুর—গৌর!

মহালয়ার আর মাত্র তিনদিন বাকি। কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী। মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত। তর্পণ সেরে

দ্বিপ্রাহরিক আহারে বসেছিলেন রূপেন্দ্রনাথ। জগুঠাকরুণ সামনে বসে আছেন তালপাখা হাতে।

কাত্যায়নী আর কুসুমমঞ্জরী বসে গল্প করছিল আরোগ্য নিকেতনের মেঠো দাওয়ায়। হঠাৎ ওদের নজর হল—দূর থেকে তিনজন অশ্বারোহী সৈনিক এগিয়ে আসছে। মাঠের ওপ্রান্তে দাঁড়িয়েছিল গো-গাড়িটা। তার গাড়োয়ানের সঙ্গে কী যেন কথা হল। গাড়োয়ানটা নত হয়ে প্রণাম করল, হাত তুলে দেখিয়ে দিল কুসুমমঞ্জরীদের দিকে।

অশ্বারোহী তিনজন এদিকে আগিয়ে আসে।

উঠে পড়ে ওরা দুজন। দ্রুতগতি কক্ষের ভিতর চলে যায়। কুসুম বলে, মাসি, কারা যেন আসছে।

প্রৌঢ়া সেবাদাসীটি এগিয়ে এল সদরের দিকে।

আগন্তুক তিনজন ততক্ষণে আরোগ্যশালার দোরগোড়ায়। মুখটা সাদা হয়ে গেল সেবাদাসীর। কৃত্রিম হাসি টেনে এনে বললে, কী সৌভাগ্য! ছোটহুজুর যে! আসুন, আসুন!

—যাক, তবু চিনতে পেরেছ।

সম্মুখস্থ অশ্বারোহী ঘোড়া থেকে নেমে আসে। বছরত্রিশেক বয়স, বলিষ্ঠ গঠন। তিনজনের মধ্যে তারই সাজ-পোশাকের ঘটা বেশী। রূপনগরের মোহান্ত মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং দক্ষিণহস্ত। ধর্মে বৈষ্ণব, কিন্তু মারদাঙ্গায় সিদ্ধহস্ত। বস্তুত সে হচ্ছে প্রেমদাস বাবাজীর সৈন্যদলের প্রধান। চোখ দুটি ছোট আর ক্রূরতা মেশানো। কথা বলে কেটে কেটে। বললে, মাসির শরীরগতিক তো ভালই দেখছি, খুব মালপো-টালপো সাঁটছ বোধহয়। তা তোমার বোনঝিটিও ভাল হয়ে গেছেন দেখলাম। ফেরায় মন নেই কেন?

প্রৌঢ়া জোড়হস্তে বললে, আমরা তো দাবাবোড়ের ঘুঁটি, ছোটহুজুর! যেমন চালাবে তেমনি চলব। আমাদের আবার মন হওয়া-হওয়ি কী?

—তাই নাকি? তাহলে এবার গতর নাড়াও। পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে নাও। রওনা হতে হবে। এখনই।

ঘরের ভিতর তখন কুসুম সবলে চেপে ধরেছে কাত্যায়নীর দুটি হাত। আগন্তুককে সে চেনে না, দেখেনি কোনদিন, কিন্তু মাসির ঐ 'ছোটহুজুর' সম্বোধনে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে। কাত্যায়নী নিজেকে বন্ধন-মুক্ত করে নিল। নিঃসাড়ে বার হয়ে গেল ঘর ছেড়ে। ছোটহুজুর নজর করল, বাধা দিল না।

'অশুভস্য কালহরণম্' নীতিবাক্যটা বোধকরি মাসির জানা। বললে, ওমা, সে কী গো? একটা ডুলি-টুলির ব্যবস্থা কর?

—ডুলি লাগবে না। যাতে এসেছে, তাতেই ফিরবে। নাও দেরী কর না অহেতুক।

—তা কোবরাজ-মশায়ের অনুমতি তো নিতে হবে?

এবার ধমকে ওঠে ছোটহুজুর, হবে না! খাঁচা খালি দেখলেই তোমার কোবরেজ-মশাই বুঝে নেবে পাখি উড়ে গেছে।

—তবু একটা খপর তো দেওয়া দরকার।

—খবর দিতে একজন যে ছুটে গেল তা তো স্বচক্ষেই দেখলে।

দাওয়ায় উঠে আসে। দ্বারপথে দাঁড়ায় দুই চৌকাঠে দু-হাত দিয়ে। আতঙ্কে পাষাণ প্রতিমার মতো কক্ষের দূরতম প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে কুসুমমঞ্জরী। ছোটহুজুর তাকে আপাদমস্তক দেখে নিল একবার। বললে, তোমার কাপড়-জামা পুঁটলি বেঁধে নাও। খাওয়া হয়েছে? এখনি রওনা হব আমরা।

যেন প্রতিবর্তী প্রেরণায় বলা কথা, আমি যাব না!

—যাবে না! —ঘরের ভিতর এতক্ষণে প্রবেশ করে ছোটহুজুর। এগিয়ে যায় মেয়েটির দিকে।

ততক্ষণে ছুটতে ছুটতে কাত্যায়নী পৌঁচেছে নিজের ভদ্রাসনে। মাঠের ও প্রান্তেই তাদের বাড়ি। রসি-খানেক দূরে। বলে, দাদা, শিগ্গির! কুসুমকে ধরে নিয়ে যেতে পাইক এসেছে!

—ধরে নিয়ে যেতে? কে?

আহারকালে রূপেন্দ্র বাক-সংযম করেন। অসতর্ক মুহূর্তে প্রশ্নটা করার পরেই অন্নপাত্র সরিয়ে দেন। গণ্ডূষ করে উঠে পড়েন। দ্রুত হস্তপ্রক্ষালন করে বলেন, চল তো দেখি।

দুজনে বেরিয়ে এলেন বাইরে। জগুঠাকরুণ কিন্তু সদরদ্বারের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। দৃষ্টি তাঁর ক্ষীণ, তবু দৃশ্যটা দেখতে পেলেন। মাঠের ও-প্রান্তে আরোগ্যশালার সম্মুখে দুজন অশ্বারোহী। তৃতীয় একটি অশ্ব আরোহীহীন। একজন বলিষ্ঠগঠন যুবাপুরুষ কুসুমমঞ্জরীকে হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে আসছে। মেয়েটি মাটিতে শুয়ে পড়েছে। জড়িয়ে ধরেছে দাওয়ার একটা বাঁশের খুঁটি। আর সেই প্রৌঢ়া দু-হাত শূন্যে তুলে আর্তকণ্ঠে বিলাপ করছে। জগু-ঠাকরুণ ঘর ছেড়ে পথে নামলেন না। দ্রুতগতি ফিরে গেলেন তাঁর ঠাকুরঘরে। তুলে নিলেন লক্ষ্মীর পায়ের কাছে পড়ে থাকা শঙ্খটিকে। আবার বেরিয়ে এলেন বাইরে। শাঁখে ফুঁ দিলেন। স্তব্ধ-মধ্যাহ্ন শিউরে উঠল! পদ্ম দীঘির ও-পাশে, পীতুঠাকুরের বাড়ির সামনেও মেয়েদের একটা জটলা। বোধকরি ঐ সেবাদাসীর আর্ত কণ্ঠের চিৎকার শুনে ওরাও বার হয়ে এসেছে কৌতূহলী হয়ে। তাদের মধ্যে থেকে কে একজন সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়ে দিল একটা শাঁখ।

এমন নির্দেশ দেওয়াই ছিল। বর্গীর আক্রমণ প্রতিহত করতে পুরললনাদের কী কী কর্তব্য।

মাঠের ও প্রান্তে ভীমা বাগদি আপন-মনে বিড়বিড় করতে করতে আল পথ ধরে কোথায় যাচ্ছিল। খরমধ্যাহ্নে পাশা-পাশি দুবাড়ি থেকে শাঁখ বেজে ওঠায় সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। দৃশ্যটা তার নজরে পড়ে। ছুটতে-ছুটতে সেও এসে পড়ে অকুস্থলে।

ততক্ষণে রূপেন্দ্রনাথও পৌঁছে গেছেন। কিন্তু তার পূর্বেই পৌঁচেছে ভীমা। সে নিরস্ত্র। তবু অকুতোভয়ে চেপে ধরে ঐ হাতিয়ারবন্দ্ মানুষটার কব্জি—বলে, অ্যাইও! কী করছিস্ তুই? হারামজাদা?

দুই অশ্বারোহী তৎক্ষণাৎ তার দুদিকে অশ্বকে পরিচালিত করে। হাতে তাদের কোষমুক্ত তরবারি। ছোটহুজুরের আদেশের অপেক্ষায় তারা ঐ বিশালকায় মানুষটার দু-পাশে অশ্বপৃষ্ঠে অপেক্ষা করে। মাথাটা ঘাড় থেকে নামিয়ে দেয় না।

ছোটহুজুর মেয়েটির হাত ছেড়ে দেন। এগিয়ে এসে ভীমার গালে কষিয়ে দেন ঠাশ্ করে একটা চড়। কুসুম তার স্খলিত অঞ্চলটা টেনে নিয়ে বুকটা ঢাকে। বাঁশের খুঁটির আলিঙ্গন কিন্তু

সে ছাড়েনি।

ভীমা তার গালে হাতটাও বোলায় না। তিনজনের দিকে পর্যায়ক্রমে সে তাকিয়ে দেখে নেয়। তিনজনের হাতেই নাঙ্গা তরোয়াল। ভীমা তিলতিল করে পাঁচটা পা পিছিয়ে যায়। তরোয়ালের কোপ থেকে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে সে যে কাণ্ডটা করল তা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত। হঠাৎ নিচু হয়ে মুখে হাতের তালু সঞ্চালনে 'কুক' দিয়ে উঠল। সে ধ্বনি অতিবিচিত্র: আ-বা-বা-বা-বা!

ছোটহুজুর এই রাঢ়খণ্ডেরই মানুষ। বাঙলা দেশের ছেলে—মারদাঙ্গাতে সে অভ্যস্ত। তৎক্ষণাৎ বুঝে নেয়—এ ধ্বনি যে ওভাবে বাজাতে পারে সে সামান্য চাষার ছেলে নয়—এ বাঙলার একটি বহু-বিখ্যাত যুদ্ধধ্বনি। লোকটা ডাকাত!

তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ প্রকৃতি যেন মুখর হয়ে উঠল। যেন হঠাৎ এসে পড়া কালবৈশাখীর ঝড়।

পল্লীর এপ্রান্তে-ওপ্রান্তে ক্রমান্বয়ে হতে থাকে শঙ্খধ্বনি। দামোদরের দিক থেকে ভেসে এল ঐ 'কুক' এর প্রতিধ্বনি: আ-বা-বা-বা-বা!

দামোদরের দুই তীরের মাঝি-মাল্লা—দুর্ধর্ষ নমঃশূদ্র, আর কৈবর্ত মাছমারার দল যেন জানিয়ে দিল: আমরা সজাগ আছি! আসছি! ভ—য় নে—ই!

আরও আশ্চর্য! দামোদরের ওপার থেকে—বোধকরি পীরপুর গ্রামের দিক থেকে ভেসে এল দামামার শব্দ: ডুম্-ডুম্, ডুম্-ডুম্, ডুম্-ডুম্।

ছোটহুজুর এদেশের ছেলে। তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলে—এরা চড় খেয়ে তা হজম করে নেবে না। কিন্তু ওদের সঙ্গে বন্দুক নেই। তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে বসে। যাতে প্রয়োজনে ঐ পদাতিক বাহিনীর মাঝখান দিয়ে তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে ঘোড়া ছোটানো যায়।

রূপেন্দ্র বলেন, কে আপনি? আমার বাড়ির মেয়েদের গায়ে হাত তোলেন কোন অধিকারে?

ছোটহুজুর ঘোড়াকে এক চক্কর টহল দিয়ে ঘুরে এসে বলে, আমি কে, তা ঐ মাসিকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন। আপনিই বরং বলুন, আমাদের গাঁয়ের মেয়েকে এভাবে আটকে রেখেছেন কোন অধিকারে?

—সে কৈফিয়ৎ আপনার মালিককে দেব। আপনি ওড়ে চড় মারলেন কেন?

—ও আমার হাত চেপে ধরেছিল! সে তো নিজে চোখেই দেখলেন!

রূপেন্দ্র নজর হল—মাঠের এপ্রান্তে-ওপ্রান্তে দু-চারজন ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে— ভীমা বাগদীর চেলা চামুণ্ডা। অধিকাংশের হাতেই তেলপাকা লাঠি, দু-একজন ভীল ধনুক হাতে।

—আপনি নেমে আসুন। ওর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

—ক্ষমা? —অট্টহাস্য করে ওঠে দুঃসাহসী ছোটহুজুর। চোখ বুলিয়ে সেও পরিস্থিতিটা সমঝে নেয়। যদিও ওরা পদাতিক, তবু ওদের অনেকের হাতে ধনুর্বাণ। সংখ্যাতেও এতক্ষণে দশ-পনেরজন। বলে, আজ আমি ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু আবার আসব। আপনি আগুন নিয়ে খেলা করছেন কোব্‌রেজ-মশাই। তারিখটা জানিয়ে যাচ্ছি: মহাষ্টমীর দিন! আপনার ঐ তীরন্দাজ ডাকাতদের জানিয়ে দেবেন—যারা আসবে তারা তীরধনুক নিয়ে 'যুদ্ধ-যুদ্ধ' খেলতে আসবে না, তারা বন্দুকধারী। হাতি আর কামানও আসবে। অহেতুক এ গ্রামে রক্তগঙ্গা বহাতে

চাই না।

তারপর ভীমার দিকে ফিরে প্রশ্ন করে, তোর নামটা কী রে হারামজাদা?

ভীমা এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসছিল। এ প্রশ্নে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। পাশে ফিরে বলে, অ-ঈশেন! বাবু মোর নামটো জিগাইছে রে। নবাব-ছরকারে শিকায়েত করবে।

যাকে প্রশ্নটা করেছে সে দাঁড়িয়ে আছে হাত-দশেক দূরে। তার হাতে একটা ভীল-ধনুক। আকর্ণ তার জ্যা টেনে ছোটহুজুরের দিকে স্থির লক্ষ্যে দাঁড়িয়ে আছে। যেন দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় মীনলক্ষ্যে অর্জুন! তার দৃষ্টি সরল না। জবাবে বললে, নাম জিগাইছে তো নামটো বলি দাও কেনে?

ভীমা আবার এগিয়ে এল কাছে। বললে, বাবুর হাতে চড় খায়ে তোর খুড়ো যে বাপের দেওয়া নামটো ভুলি গেল রে ঈশেন!

ঈশান একইভাবে জবাবে বললে, ও হারামজাদার বাপের দেওয়া নামটো যখন কীচক, তেখন তো অর আন্‌জাদ করা উচিত নামটো কী হতি পারে। ···শোনেন কীচক বাবুমশয়। খুড়োর নাম ভীমা বাগদী, অধমের নাম ঈশেন। বড় কোতোয়ালের খাতায় নামদুটি নেখা আছে। তাঁই পহ্‌ছান্তে পারবেন!

ভীমা এতক্ষণে অশ্বারোহীর পাঁজর ঘেঁষে। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই এক লাফ দিয়ে উঠল সে। তার ডান হাতটা শূন্যে একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করল। প্রচণ্ড একটা থাপ্পড় সে কষিয়ে দিল ঐ অশ্বারোহীর গণ্ডদেশে। টলে উঠল ছোটহুজুর। তৎক্ষণাৎ সে কোষমুক্ত করল তার ধারালো তলোয়ার, কোমরবন্ধের খাপ থেকে। আর একই মুহূর্তে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠল ঈশান সর্দার: খবরদার!

ছোটহুজুর টাল সামলে সোজা হয়ে বসল। ভীমা ততক্ষণে পাঁচ হাত দূরত্বে। অশ্বারোহী তিনজনেরই লক্ষ্য হল—চার পাঁচজন ধানুকী স্থিরলক্ষ্যে তাদের ঘিরে ফেলেছে। প্রত্যেকের ধনুকের জ্যা আকর্ণ-বিস্তৃত।

ঠিক তখনই দেখা গেল মাঠের ওপ্রান্ত থেকে মাঝিমাল্লার দল পিলপিল করে ছুটে আসছে এদিকে। কারও হাতে দাঁড়, কারও বা লগি! আকাশবাতাস মথিত করে ধ্বনিত হচ্ছে: আ-বা-বা-বা-বা—

গালটা জ্বালা করছে! উপায় নেই! এরা ডাকাত! ছোট সরকার তার সঙ্গী দুজনকে নিয়ে তীর বেগে বেরিয়ে গেল ভিড়ের মাঝখান দিয়ে।

দেবীপক্ষের পঞ্চমীতিথি।

আগামীকাল মহাপূজার শুরু। মহাষষ্ঠী। ঘরে ঘরে চঞ্চলতা। জমিদার-বাড়ির সম্মুখে প্রতি বছরের মতো এবারও মেলা বসেছে। শুধু এ গ্রামে নয়, এ-অঞ্চলেই ঐ একখানি মাত্র দুর্গাপূজা। গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষ তিন দিনের মধ্যে অন্তত একদিন এসে মায়ের চরণে প্রণাম করে যাবে। সমস্ত দিন দামোদরের সমান্তরালে চলতে থাকবে গো-গাড়ির সারি। ঐ চওড়া রাস্তাটাই দামোদরের বাঁধ। বাঁধ ঠিক নয়, রাস্তাটা জলস্ফীতির বাধা হয়ে কিছুটা মহড়া নেয়, এই

আর কী। মাঝে মাঝেই জমিদারবাড়ি থেকে পেল্লাদ আর কেষ্টা বায়েনের যুগলবন্দী ঢাকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে: গুড়-গুড়-গুড়—ধিতাং ধিতাং!

পুজো এখনো শুরু হয়নি। কিন্তু বায়েনদের যেন আর তর সইছে না। ছেলে-বুড়োর মনের তালে তালে তাদের ঢাকের কাঠি-জোড়াও খেয়ালে বে-খেয়ালে নেচে উঠছে।

রূপেন্দ্র এ-কদিন আর রুগী দেখতে যাবেন না, নেহাৎ প্রয়োজন না হলে। জগুঠাকরুণ আর কাত্যু সাত-সকালে উঠে ও-বাড়ি চলে গেছে। ও-বাড়ি বলতে জমিদার বাড়ি। কত কাজ! পুজার যোগান দেওয়া, গুড় জ্বাল দেওয়া, ভোগ, আনন্দ-নাড়ু পাকানো। পাঁচবাড়ির এয়োরা না করলে কে করবে?

রূপেন্দ্র দাওয়ায় বসে বসে প্রাকৃতিক শোভা দেখছেন। শারদীয়ার প্রাক্কালে পল্লীবাঙলার রূপ। শিউলি গাছ তলাটা ফুলে-ফুলে সাদা। সোনাগলানো রোদ। আকাশ নির্মেঘ। পুঞ্জ পুঞ্জ শুভ্র মেঘের দল আকাশে ভেসে চলেছে। সেকালে এই সময়েই রাজা মহারাজারা দিগ্বিজয়ে বার হয়ে পড়তেন। সওদাগরের দল যাত্রা করত সমুদ্রের পথে, 'বদর-বদর' বলে। দামোদরের কিনার বেয়ে—নদী আর শাহী সড়কের মাঝখানের অপ্রশস্ত কিন্তু অতি দীর্ঘ এলাকাটা এখন সাদায় সাদা—কাশফুলের ঘন জঙ্গলে।

নজর পড়ল সামনের চালাখানায়। যে ঘরখানায় আশ্রয় নিয়েছিল রূপনগরের সেই মেয়েটি আর তার পাতানো মাসি। তারা এখন নেই। নতুন কোন রুগী আসেনি। আরোগ্যশালার তিনখানি ঘরই খালি। না, কুসুমমঞ্জরী রূপনগরে ফিরে যায়নি। সে বর্তমানে আছে ভাদুড়ীবাড়ি। ঐ পুজোবাড়িতে।

কাটোয়া-ঘাটে পিতৃতর্পণ সেরে ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ফিরে এসেছেন দিন-চারেক আগে। মহালয়ার পরদিন এসেই সমস্ত বিবরণ শুনেছেন। বলেছিলেন, লোকটা সম্ভবত ফাঁকা হুমকি দিয়ে গেছে। রূপনগরের মোহন্ত মাহারাজের এখন শিরে সংক্রান্তি। এখন সে ঐ জাতের মূর্খামি করবে না। আগে দেখবে, ভাস্কর পণ্ডিতের ঘোড়াটা আড়াইচালে কোন দিকে যায়—মুর্শিদাবাদ না বর্ধমান। যতক্ষণ না ভাস্কর পণ্ডিত চাল দিচ্ছেন ততক্ষণ প্রেমদাস বাবাজীর দান নেই। তাঁকে প্রতীক্ষা করতে হবে। এই হচ্ছে খেলার আইন।

না, ভীম বা ঈশান সর্দারের ব্যবহারে তিনি ক্ষুব্ধ হননি। বলেছিলেন, তাঁর মোহভঙ্গ হয়ে গেছে। রূপনগরের মোহন্ত মহারাজকে স্বপক্ষে রাখার প্রচেষ্টা নিরর্থক। শুধু দাঁইহাটিতে ভাস্কর পণ্ডিত নয়, রূপনগরের মোহন্ত মহারাজের সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করে এসেছেন।

স্বচক্ষে দেখে পূর্বমত দৃঢ়তর হয়েছে ভাদুড়ী মহাশয়ের ভাস্কর পণ্ডিত লোকটা অতিশয় ধূর্ত, নির্মম, নীতিহীন ও অর্থলোলুপ। নিজে হয় তো কামুক নয়, কিন্তু সৈন্যদলের নারী নির্যাতনের বীভৎসতা তার জ্ঞাতসারে।

ব্রজেন্দ্রর অনুমান—ভাস্করের সৈন্য-সংখ্যা আন্দাজ বিশ সহস্র। তার ভিতর অন্তত এক হাজার বন্দুকধারী। বাদবাকির অস্ত্র—তরবারি ও ভল্লা। অশ্বপৃষ্ঠে যখন অগ্রসর হয় তখন পিঠে থাকে ঢাল, কোমরবন্দে তরবারি, বাম হাতে ঘোড়ার লাগাম, দক্ষিণ হস্তে ভল্ল। সৈন্যদলে হাতি নাই, কামানও নাই। তেমনি পদাতিকও নাই। বিশ হাজার সৈন্য তো বিশ হাজার অশ্ব। তাই ওরা প্রভঞ্জনগতি; তাই ওরা দুর্বার। আজ এখানে তো কাল সেখানে। তুলনায় নবাব

আলিবর্দীর সমর বাহিনী শ্লথগতি। একাধিক রণহস্তী। তারা দ্রুতগতি, কিন্তু গো-শকটে বাহিত হয় কামান। বহু সৈন্য অগ্রসর হয় পদব্রজে। ভাস্করের তেইশজন সেনা-নায়ক। প্রত্যেকের সৈন্যসংখ্যা নির্দিষ্ট, সুচিহ্নিত। মুহূর্ত মধ্যে নির্দেশ পেয়ে গোটা বাহিনী চার পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথে রওনা হয়ে পড়ে। আবার হয়তো দুদিন পরে নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হয়। নবাবী বাহিনী সেভাবে সুশৃঙ্খলবদ্ধ নয়। তারা স্থির করে উঠতে পারে না বর্গীদের সহসা-বিভক্ত কোন দলটিকে অনুসরণ করবে। তাই বৃদ্ধ নবাব গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বর্গী সৈন্যকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কোন ক্ষুদ্র দলে ভাস্কর স্বয়ং আছেন তা বুঝে উঠতে পারেন না।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ যখন ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান তখন সেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তাঁকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়ন করেন। বর্ধমানরাজের দূত যেন বর্ধমানরাজ স্বয়ং। কথাবার্তায় তিনি বোঝাতে চাইলেন যে, তিনি এসেছেন যবন নিধনের ব্রত নিয়ে। আলিবর্দী চৌথ প্রদানে স্বীকৃত হোন বা না হোন, ভাস্কর সংকল্পচ্যুত হবেন না—সে সংকল্প নবাব আলিবর্দীকে গদিচ্যুত করে কোনও উপযুক্ত হিন্দু রাজাকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা। যে দুরাত্মা মহাপূজায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে সদ্-ব্রাহ্মণকে অষ্টমীতে প্রতিমা বিসর্জন দিতে বাধ্য করে, তার কোন ক্ষমা নাই। পরবর্তী নবাব? যিনি ভাস্কর পণ্ডিতকে ঐ যবন-নিধন কার্যে সম্যক সহায়তা করবেন। তিনি কে, ভাস্কর জানেন না—মা ভবানীর ইচ্ছা। নদীয়ারাজ হতে পারেন, বর্ধমানরাজ তিলকচাঁদও হতে পারেন। ব্রজেন্দ্র জাত-'বারিন্দির'। বৈষয়িক বুদ্ধিতে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের কাছে হারবার পাত্র নন। তিনি বর্ধমান-মহারাজের তরফে ভাস্কররাম পন্থকে শ্রীকৃষ্ণের দশম অবতাররূপে নমস্কার করে এসেছেন। শ্রীজয়দেবকৃত দশাবতার স্তোত্রটি শুনিয়ে দিয়ে এসেছেন—যার দশম অবতার ম্লেচ্ছান মূর্ছয়তে' 'সম্ভবামি' হবেন বলে প্রতিশ্রুত। কথা দিয়েছিলেন পণ্ডিতজীর কী কী 'হিল্পা', কোন্ কোন্ উদ্যোগ, তা বর্ধমানরাজকে সবিস্তারে জানিয়ে দেবেন। তা তিনি দিয়েছেন। কাটোয়া থেকে ফেরার পথেই পড়ে শহর বর্ধমান। যেখানে তিলকচাঁদকে সব কথা জানিয়ে এসেছেন। এবং একথাও বলতে ভোলেননি যে, বাকচাতুর্যে তাঁকে আশ্বস্ত করে সেই ধূর্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে অতর্কিতে বর্ধমান রাজ্যটি আক্রমণ করা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। তার মূল লক্ষ্য—অর্থ সম্পদ।

ব্রজেন্দ্রর সন্দেহ হয়েছিল ভাস্করের শিবিরে কী যেন একটা কর্মচঞ্চলতা। শিবিরে কী যেন একটা কর্মচঞ্চলতা। দাঁইহাটির শিবির গুটিয়ে দুই একদিনের মধ্যেই তিনি কোথাও চলে যাবেন। আত্মগোপন না অতর্কিত আক্রমণ তা বুঝে উঠতে পারেননি। আক্রমণ হলে লক্ষ্যস্থল কোনটি? বর্ধমানরাজের রাজপ্রাসাদ, নদীয়ারাজের কৃষ্ণনগরের প্রাসাদ, অথবা খাশ মুর্শিদাবাদ? সম্ভবত কলকাতার দিকে অভিযান করবে না সে। সংবাদ পেয়েছে, ইংরাজ স্থপতি যাবতীয় ব্যবস্থা নিয়েছে—পরিখা খনন—'মারাঠা ডিচ' এবং প্রতিটি প্রবেশদ্বারে কামান সংস্থাপন। তবে প্রথমেই মুর্শিদাবাদ অভিযান করবে না। তার পূর্বে দু-একটি ছোট-খাট রাজভাণ্ডার তাকে লুটে নিতে হবে—বর্গী সৈন্যদলকে সন্তুষ্ট করতে, তাদের লোভের আগুনে ইন্ধন জোগাতে। যাতে নবাবী তোষাখানা আক্রমণের সময় সবাই মরণপণ লড়ে।

বর্ধমানে রাজকার্য সমাধা করে রওনা হয়েছিলেন উত্তর-পশ্চিম মুখো। পথে গুশকরা, আউসগ্রাম মৌজা। তারপর অজয়ের তীরে ইলামবাজার। অদূরে 'কবিরাজ' জয়দেবের

স্মৃতিবিজড়িত কেন্দুবিল্ব ও কদমখণ্ডির ঘাট। তার উত্তরে ধর্মমঙ্গলের কালের অসীম শক্তিশালী ইছাই ঘোষ-এর গড়। গোপভূমের মহা শক্তি উপাসক। আজ অরণ্যভূমির কাছে মাথা নত করেছে তাঁর শ্যামরূপার গড়—ইটের স্তূপ যেন পাহাড় হয়ে পড়ে আছে। 'ইছাই' সম্ভবত 'ঈশ্বর' শব্দের অপভ্রংশ। যেটাকে আজ সকলে শ্যামরূপার গড় বলে, ওটাই এককালে ছিল ঈশ্বর ঘোষের মহা সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ঢেক্কুর বা ঢেকুর। কোন কালে? পাল রাজাদের আমলে তো বটেই। হয়তো বিগ্রহপালের সময়ে। তার অর্থ সাত-সাতটি শতাব্দী পার হয়ে গেছে—রাঢ়খণ্ডের কোনও ভূস্বামী প্রয়োজন বোধ করেননি সেই স্তূপের ইট দিয়ে নতুন একটি গড় গড়ে তুলতে, অজয়ের কিনার ঘেঁষে—বৈদেশিক শত্রুকে প্রতিহত করতে। বৈদেশিক শত্রুরা যে মাঝে মাঝে অতর্কিতে আসে, ষাঁড়াষাঁড়ির বানের মতো—না, ভুল হল, ভাদ্রের বানের মতো তা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধান আসে না, আসে অনিয়মিত—ভূমিকম্পের মতো। কিন্তু আসে। শুধু হিন্দুস্থানের নয়, বাঙলার ইতিহাসেও পৌনঃপুনিকতায় এ ঐতিহাসিক সত্যটি ক্লান্তিকর! তবু সাত-শতাব্দীর ভিতর কোন ক্ষমতাশালী নৃপতি রাঢ়খণ্ডে আর দ্বিতীয় কেল্লা নির্মাণ করেননি। বোধকরি তাঁদের আশা ছিল—তাঁদের শাসনকালে এ দুর্দৈব ঘটবে না। ঘটলেও উৎকোচে বশীভূত করতে পারবেন বিদেশী দস্যুদের। সেই মূল্যই দিয়েছে বাঙালী সাম্প্রতিক মগ, পর্তুগীজ আর হার্মাদদের আক্রমণে, এখন দিচ্ছে বর্গীদের।

শুধু অর্থ নয়, দিতে হয়েছে ইমান আর ইজ্জৎ।

নৌকা থেকে শ্যামরূপার পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তূপ দেখতে দেখতে সে কথাই মনে হচ্ছিল ব্রজেন্দ্রনারায়ণের।

আরও দাগা পেলেন রূপনগরে উপনীত হয়ে।

বিদেশী মহারাষ্ট্রীয় দস্যুসর্দার তাঁকে যে সম্মানটুকু দিয়েছিল রূপনগরে মোহন্ত মহারাজ সেটুকুও দিলেন না। লোকটা স্থবির। স্থূলকায়—ব্রজেন্দ্র অপেক্ষা অন্তত দশ বৎসরের বড়। ব্যভিচারে বিকৃততনু। নারীসংসর্গের হয়তো ক্ষমতাই নাই—কিন্তু লালসার তৃপ্তি হয়নি আজও।

সর্বক্ষণ সে ঐ এক কথাই বলে গেল—কোন সাহসে ব্রজেন্দ্রনারায়ণের তালুকভুক্ত এক অকালপক্ক কবিরাজ তাঁর রাইরানীকে এভাবে আটকে রাখে? তিনি এক সপ্তাহমাত্র সময় দিচ্ছেন ভাদুড়ীমশাইকে। তার ভিতর যদি বন্দিনী ফিরে না আসে তাহলে সোঞাই গ্রামখানিকে রাঢ়ভূমের মানচিত্র থেকে মুছে ফেলা হবে!

বর্গীদের প্রসঙ্গ দু-তিনবার তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রেমদাস বাবাজী কর্ণপাত করেননি। বলেছেন, আপনারা নিজ নিজ ঘর সামলান ভাদুড়ীমশাই—আমাকে পরামর্শ দিতে আসবেন না। অপরিসীম দার্ঢ্যে বলেছিলেন, সেই মারাঠী ব্রাহ্মণকুলাঙ্গারটির সঙ্গে দেখা হতে বলবেন, রূপনগর অধিকার করার দুর্মতি হলে যেন তার পিতার নামটি একটি ভূর্জপত্রে লিখে নিয়ে আসে—জীবিত ফিরে যাবার সৌভাগ্য হলে সেটি তার প্রয়োজন হবে।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণের মনে পড়ে গিয়েছিল সেই অজ্ঞাত উর্দুকবির বয়েৎটি:

"ইধর গৌড় মেঁ হরতরফ অন্ধেরা।
কি থা গিয়ান গুণকা লড়াইয়াসে ডরা।"

—এদিকে যুদ্ধভীত বঙ্গভূমের চর্তুদিকে থেকে ঘনিয়ে এসেছে নীরন্ধ্র অন্ধকার।

বেলা তখন দ্বিপ্রহর। হঠাৎ মনে হল দূর—বহুদূর থেকে একটা শব্দ ভেসে আসছে: ডুম্-ডুম্, ডুম্-ডুম্, ডুম্-ডুম্!

উঠে পড়লেন রূপেন্দ্র। কান খাড়া করে শুনলেন। না, ভুল শোনেননি তিনি। শব্দটা আসছে ঈশান কোণ থেকে—অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব দিক থেকে। সম্ভবত দামোদরের ওপারে অবস্থিত পীরপুর গ্রামের দামামা। ছুটে বেরিয়ে এলেন বাইরে। ষষ্ঠীচরণ এড়োএড়ি ভাবে দৌড়ে মাঠটা পার হচ্ছিল। তাকে প্রশ্ন করলেন, কিসের শব্দ রে ষষ্ঠি?

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে লোকটা। বলে, বর্গীর হাঙ্গামা মনে লাগে। ঘাট পানে যাই, ঠাউর। আপনেও আসেন।

দামোদরের দক্ষিণপারে এই সোঞাই গ্রাম। বর্গীদের বর্তমান অবস্থান—যদি দাঁইহাটিই হয়—তাহলে দামোদরের ওপারে। নদীর ওপার থেকে তাদের আক্রমণের আশঙ্কাটা বেশি। সেজন্য প্রতিরোধ পরিষদ নদীতীরের দিকটাই অধিকতর সুরক্ষিত করেছে। শঙ্খধ্বনি বা দামামার সঙ্কেতমাত্র যে যার কাজে লেগে যাবে—বিনা নির্দেশে। অতর্কিত আক্রমণে যথাযথ আদেশ দেবার সময় থাকে না। তাই সবরকম দায়িত্ব বিভাগ আগেভাগে করা আছে।

রূপেন্দ্র উড়ুনিটা দড়ি থেকে টেনে নিয়ে নগ্ন গাত্র আবরিত করলেন। খড়ম-জোড়া খুলেই রাখলেন। প্রয়োজনে যাতে দৌড়াতে পারেন। নগ্নপদেই সুবিধা। সদরে শিকলটা তুলে দিয়ে দ্রুতপদে রওনা দিলেন দামোদরের ঘাটের দিকে। বাড়ির মেয়েরা পূজাবাড়ি।

ততক্ষণে দামোদরের কিনার-ঘেঁষা বিভিন্ন পল্লী থেকে ভেসে আসতে শুরু করেছে শঙ্খধ্বনি। মাঝে একবার শোনা গেল নদীর ওপার থেকে: আ-বা-বা-বা-বা!

—জেগে আছি। সবাই জেগে আছি। তোমরাও সজাগ হও!

লক্ষ্য হল, সদর দোরে শিকল তুলে দিয়ে এ-বাড়ি ও বাড়ির পুরললনার দল দ্রুতপদে মাঠ পাড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে ভাদুড়ী-বাড়ির দিকে। এটাও পূর্ব-পরিকল্পনা মতো। পূজা-মণ্ডপে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে চিড়া আর গুড়। তাছাড়া বিরাট চৌবাচ্চায় পানীয় জল। প্রয়োজনে দু-তিন দিন সারা গ্রামের শিশু-নারী ও বৃদ্ধরা সে বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেও তারা অনাহারে থাকবে না।

অধিকাংশ বাড়িই পর্ণকুটির—দাহ্য। বর্গীরা সবার আগে চালায় ধরিয়ে দেয় আগুন। আতঙ্কতাড়িত অর্ধদগ্ধ নরনারী বার হয়ে এলেই পড়ে বর্গী ডাকাতদের খপ্পরে। তারা বেছে নেবার সুযোগ পায়—কাকে হত্যা করবে, কাকে জিইয়ে রাখবে ভিন্নতর মৃত্যুর স্বাদ দিতে। জমিদারবাড়ি পাকা-ইটের। উচুঁ পাচিল দিয়ে ঘেরা। সৌধ শীর্ষে ইন্দ্রকোষের ব্যবস্থাপনা, যার আড়ালে আত্মগোপন করে ধানুকী সৈনিক আক্রমণকারীদের মহড়া নিতে পারে। অধিকাংশ গৃহস্থ তার মূল্যবান যা কিছু—অলঙ্কার বা নগদ সঞ্চয় আগেভাগেই মাটির ভিতর পুঁতে রেখেছে। মুহূর্তমধ্যে দোরে শিকল দিয়ে জমিদারবাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার ব্যবস্থা পাকা।

রূপেন্দ্র যখন দামোদরের তীরে এসে পৌঁছালেন তখন সেখানে অনেক মানুষের জটলা। তাঁর মতো কেউ খালি হাতে আসেনি। যা হোক একটা অস্ত্র এনেছে—নিদেন তেলপাকা লাঠিগাছ।

দামোদরের মূল স্রোত এখন এ-পাড় ঘেঁষে। এপাড় ভাঙছে, ওপারে চড়া পড়ছে। এদিকে

বরাবর খাড়া পাড়, শুধু পারানি ঘাটের কাছে প্রায় তিনশ হাত নদ-কিনার সমতল। সেখানেই নৌকা বাঁধার আয়োজন, পারানি ঘাট, স্নানঘাট। তুলনায় ওপাড়ে অনেকটা শুধু বালি আর বালি।

শোনা গেল, অনেকেই বর্গী বাহিনীকে দেখেছে। অশ্বারোহী—কিন্তু একটি রণহস্তীও আছে। ব্রজেন্দ্রের সংগৃহীত সংবাদ অনুসারে বর্গীদের এক্তিয়ারে হাতি ছিল না। সম্ভবত ইতিমধ্যে অন্য কোন যুদ্ধবাহিনীর কাছ থেকে সেটি ছিনিয়ে নিয়েছে। অথবা রণহস্তীসহ আরও কিছু বর্গী সৈন্য আবির্ভূত হয়েছে নাগপুরের দিক থেকে।

রূপেন্দ্র তাদের দেখতে পেলেন না। তারা নাকি পুব দিক থেকে নদের কিনার ঘেঁষে দল বেঁধে আসছিল। বীরপুর থেকে দামামার শব্দ হতেই ঘাটের মাঝি-মাল্লারা সচকিত হয়ে ওঠে। তারা 'কুক্' দিয়ে দুঃসংবাদটা জানিয়ে দেয় সবাইকে। তৎক্ষণাৎ সবাই নোঙর তুলে নৌকাগুলি জলে ভাসায়। সারিবদ্ধ নৌকা চলে আসে এ-পারে। অশ্বারোহী বাহিনী যখন ওদিকের পারানি-ঘাটে এসে পৌঁছায় তখন সে ঘাট জনমানবহীন। একখানিও নৌকা নাই। দামোদর এখনো টইটম্বুর। ওরা বাধ্য হয়ে ফিরে যায়—যে পথে এসেছিল, সেই পথে।

সমস্ত বিবরণটা শুনে লক্ষ্মণ বাগ্দী বললে, ই কথাটা তো মানতে লারলেম। শালারা সমুখবাগে না যায়ে পিছু হটলেক কেনে গো?

যুগী ডোম রুখে ওঠে, মুই কি মিছা কতা বলিছি? শুধাও কেনে রতনেরে, রহিমচাচারে, বড়খোকারে।

লক্ষ্মণ সর্দার বলে, সি কথাটো লয় রে যগন, মিছা কতা বুলার কতা বলি নাই। শুন কেনে—

লক্ষ্মণের বিশ্লেষণটা ভেবে দেখার:

বর্গী সৈন্যদল যে-পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে গেল কেন? ওরা পশ্চিমমুখো আসছিল—তাহলে তাদের লক্ষ্যস্থল সেদিকেই। নদের ওপার থেকে জমিদার বাড়ির দোতলা অংশটা অথবা মন্দিরচূড়া দেখতে পায়। নিশ্চয় তখন স্থির করে এপারে এসে এ গ্রামটা লুট করলে মন্দ হয় না। পাকা ইমারৎ আর মন্দির দেখে তারা বুঝতে পেরেছিল এটি একটি সমৃদ্ধশালী গ্রাম। লুট করলে মেহন্নত পোষাবে। তারপর ঘাটে এসে দেখে একখানিও নৌকা নাই। নদীতে এখন অনেক জল। হাতি না ডুবলেও ঘোড়ার পক্ষে ডুব জল। ঘোড়া অবশ্য সাঁতার দিতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী অনেকেই বলেছে বর্গী সৈন্যদের পিঠে বাধা ছিল বন্দুক। সাঁতরে নদী পার হতে হলে বারুদ ভিজে যাবে। ফলে তারা পার হবার কোন পথ দেখেনি। এ পর্যন্ত বোঝা শক্ত নয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবার কথা? যে পথে চলেছিল সে পথেই এগিয়ে যাওয়া। এ গ্রামটি লুট করার আশা ত্যাগ করে। তা তারা করেনি। তারা ফিরে গেছে। কেন?

হয়তো ভাঁটির দিকে, অর্থাৎ পুবদিকে—যেদিকে গেছে, সে দিকে কোন ঘাটে নৌকা দেখে এসেছে। ফুল্লরা গাঁয়ে, কিংবা রতনহাটি মৌজার কোন ঘাটে গেছে সেই নৌকাগুলি লুট করে আনতে। সোঞাই গাঁ-খানাকে অব্যাহতি দিতে ওদের মন চাইছে না।

ভীমা বাগ্দী বললে, লখাই, তু একটো ঘোড়া লিয়ে দেখি আয় পেরথমে। শালারা কোন

বাগে গেল।

আদেশমাত্র লক্ষ্মণ ডোম অশ্বপৃষ্ঠে জোরকদম পূর্বাভিমুখে ছুটে চলল। নদের এ পাড় বরাবর—দামোদরের বাঁধ ধরে।

প্রায় আধঘন্টা বাদে সে ফিরে এল। সংগৃহীত সংবাদ দাখিল করল সেনাপতিকে—ভীমাকে।

না, বর্গী সৈন্যদল রতনহাটী পর্যন্ত ফিরে যায়নি। ফুল্লরাঘাটেও কোনও নৌকা ছিল না। যে খানকয় জেলে ডিঙি ছিল তারাও দামামার শব্দ শুনে এপারে চলে এসেছিল। বর্গী সৈন্য থানা গেড়েছে ঐ ফুল্লরা গাঁয়ে। নিতান্ত নিঃস্ব অন্ত্যজপল্লী। বায়েনপল্লী। পাঁচ বাড়ি লুট করলেও হয়তো এক ধামা মুড়ি জুটবে না। তবে যৌবনবতী কিছু পাওয়া যেতে পারে। সে চেষ্টা তারা করেনি। হয়তো এ বিষয়ে তারা ক্লান্ত। ফুল্লরা গাঁয়ের কোন ঘরের চালায় আগুন দেয়নি। তারা ঝপাঝপ শুধু কলাগাছ কাটছে!

ফুল্লরা গাঁয়ে বিরাট বড় কলা-বাগান। কলা বিক্রয় করা ওদের বাড়তি রোজগারের ধান্দায়। সোঞাই গাঁয়ে কোনও উৎসব হলে কলাপাতার সন্ধানে যেতে হয় ফুল্লরায়। সেই গাছগুলি ওরা কেটে শুইয়ে দিচ্ছে। কেন গো? মানুষের মাথার বদলে কলাগাছ কাটা?

ওরা ভেলা বানাবে। ভেলায় চড়ে দামোদরে পাড়ি দেবে। সোঞাইকে ছেড়ে যেতে ওদের মন সরছে না। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে এল ওরা। নদের কিনার ধরে এগিয়ে গেল উজানে, সোঞাইয়ের পারানি ঘাট অতিক্রম করে। বড় বড় কলাগাছ বহন করে। উজান থেকে ভেলা ভাসাতে হবে। যাতে লগি মেরে অগ্রসর হবার সময় স্রোতের টানে ভেলা এসে ভেড়ে এপারের এই সমতল পারানি ঘাটে।

রূপেন্দ্র প্রশ্ন করেন, ওরা বর্গীই তো?

তারাপ্রসন্ন জবাব দেন, হ্যাঁ। নবাবী সৈন্য নয়। সবাই হিন্দু। দাড়িওয়ালা মুখ নজরে পড়ছে না বিশেষ। পোশাকও সব হিন্দুর।

ভীমা বাগ্‌দী তার দলবল নিয়ে এগিয়ে গেল এপার বরাবর—ঐ বর্গীদলের অনুসরণে। আরও ঘন্টাখানেক অতিক্রান্ত হল ওদের ভেলা বেঁধে তৈরী হতে। ইতিমধ্যে ব্রজেন্দ্র বার দুই দূত পাঠিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। প্রাণপ্রতিষ্ঠা যদিও হয়নি তবু দুর্গা গাঙ্গুলী পূজা মণ্ডপে ঐ মূর্তির সামনেই জপে বসেছেন। তাঁর ধর্মপত্নীটি আসন্নপ্রসবা—চিন্তা তো হওয়ার কথাই। শুধু দুর্গা আর নন্দেরই নয়। অধিকাংশ গৃহস্থের পুরললনার দল সাময়িক আশ্রয় নিয়েছেন জমিদার বাড়ি। প্রধান সিংহদরোজার মাথায় চওড়া প্রাচীরে পূর্বেই নির্মিত হয়ে আছে একটা প্রকাণ্ড উনান। জোগাড় করা আছে কাঠ, হাণ্ডায় জল। ঠিক প্রবেশদ্বারের মাথাতেই ফুটতে থাকবে গরম জল। আক্রমণকারীদের মস্তকে যাতে বর্ষণ করা যায় ফুটন্ত জল—অতিথিদের জন্য পাদোদকের পরিবর্তে 'মস্তকোদকের' আয়োজন।

ওপারে ওরা যেখানে ভেলা বাঁধার আয়োজন করছে তার বিপরীতে এপারে ঘন-কাশবন। সাদা সাদা ফুলে এখন আকীর্ণ। কাশ ঝোপের ঘন প্রাচীর এই পারানিঘাট তক্—প্রায় পাঁচশ হাত দৈর্ঘ্যের।

ভীমা তার প্রতিরোধের যে পরিকল্পনাটি মেলে ধরলো তাতে অবাক হয়ে গেলেন রূপেন্দ্র।

ঐ অন্ত্যজ বাগ্‌দী সর্দারের বংশে কারও অক্ষর পরিচয় নেই। দশ পনের বছর ধরে নিবারণ চক্কোতির খাশ জমিতে বেগার দিয়েও কেন যে তার ঋণমুক্তি হল না—এই সুদকষা অঙ্কটা তার মাথায় ঢোকে না। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তার মাথা যে কি পরিমাণ পাকা, তার একটা প্রমাণ দিল। তার বিচিত্র ভাষায় সে বুঝিয়ে দিল। ওরা দুটো কলার ভেলা বানাচ্ছে। এক একটায় দশজন করে অশ্বারোহী উঠতে পারবে। তার মানে জোড়া-ভেলা এপারে এলে এক কুড়ি 'সুম্বুন্দির পো এ পারে নামবে। শুভঙ্করী অঙ্ক না-জেনেও ভীমা বলে দিল—তার অর্থ, ওদের শতখানেক সৈন্য পার করতে 'আনজাদ' পাঁচ বার জোড়া-ভেলা পারাপার করতে হবে।। ভীমার অনুমান শত-খানেক বন্দুকধারী এপারে না আসা পর্যন্ত ওরা আক্রমণ করবে না। পারানি ঘাটে বন্দুক উচিয়ে প্রতীক্ষা করবে। কেষ্টা-বায়েন তার শাঙ্করভাষ্য দাখিল করে:

—বোয়েছেন। তার মানে হল গে, শালারা মোদের উপর ঝাঁপায়ে পড়বে সন্‌ঝে নাগাদ! জোড়া ভেলা পার করতি আন্‌জাদ এক দণ্ড সময় নাগবে। বোয়েছেন?

ঈশান-সর্দার বলে, ইটা তো ভাল ববস্থা খুড়ো। পেরথম ক্ষেপ নামলেই আমরা সেই এক কুড়ির উপর ঝাঁপায়ে পড়ব।

—না রে ঈশেন! ঐ গল্‌তিটি করবি না। মোদের হাতে তীরধনুক, সুম্বুন্দির পো-দের হাতে বন্দুক!

—থাইলে?

—বলি শুন্‌!

ভীমা বাঙলা হরফ চেনে না, কিন্তু দামোদরকে চেনে। ঐ নদে নৌকা বাওয়াই তার উপজীবিকা। বুঝিয়ে বলে, ভেলাগুলান শালারা উপারে ক্যামনে নে-যাবে তাই ক দিনি? একটিই উপায়। ভেলা দুটি ঐ বিশজন সৈনিককে নামিয়ে দেবার পর এপারের কিনার ঘেঁষে আধক্রোশ উজানে টেনে নিয়ে যেতে হবে। সেখান থেকে ভেলা ভাসালে তবেই ওরা পৌঁছাবে পরপারের নির্দিষ্ট ঘাটে। না হলে স্রোতের টানে ভেলা বহুদূর ভাটিতে ভেসে যাবে। ভীমার রণকৌশল—প্রথম খেপ সৈন্য অবতরণকালে কোনও বাধা দেওয়া হবে না। শুধু আড়াল থেকে অসহায় আর্তনাদ করে ওদের উৎসাহ যোগাতে হবে। যারা নৌকা থেকে নামবে তারা বন্দুক উঁচিয়ে প্রতীক্ষা করবে। জনমানবকে দেখতে পাবে না। কিন্তু তারা এগিয়েও আসবে না। এরপর নিশ্চয় পাঁচ-সাত জন গুণ টেনে ঐ ভেলা জোড়াকে টেনে নিয়ে যাবে উজানে। তারা ঐ প্রথম খেপ সৈন্যদলের দৃষ্টির আড়ালে এলেই আক্রান্ত হবে ভীমার ধানুকী সৈনিকদের বাণে! সম্মুখ যুদ্ধ নয়। কারণ গুণটানা মানুষগুলোও অনিবার্যভাবে হবে বন্দুকধারী। তাদের আক্রমণ করতে হবে কাশঝোপের আড়াল থেকে। তীরবিদ্ধ করে। গুণটানা ঐ পাঁচ-সাত জনকে ঘায়েল করতে পারলেই হাতে আসবে পাঁচ-সাতটা বন্দুক। তখন ঐ জোড়া ভেলাকে টেনে নিয়ে চুপটি করে বসে থাক।

—এপারে এককুড়ি স্যাঙাৎ, ও-পারে অনারা। এখন তোমাদের দান! দাও, কী চাল দিবে দাও!

লক্ষ্মণ বলে, ক্যান? ত্যাখন আমরা ই-পারের ঐ এককুড়ি সুম্বুন্দির উপর ঝাঁপায়ে পড়ব!

—কী দরকার? থাক না শালারা বইস্যা! তামাম রাত! প্যাটের ভিৎরি চুঁইচুঁইটে জমাট

বাঁধুক। কাল ভোরের কুঁকরো ডাকলি বুলব অনে: 'বাবারা। আইস্যা! ঘাটে বন্দুক র‍্যাখ্যা আগায়ে আস'—মুণ্ডুর উপর হাত তুইল্যা। আমরায় আনন্দ-লাড়ু বানায়ে রাখছি!

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঐ দুর্ধর্ষ লোকটার এই বেপরোয়া রসিকতায় সব কটা দৈত্য অট্টহাস্য করে ওঠে।

কিন্তু বর্গী সেনাপতিও দক্ষ-দাবাড়ু।

রণকৌশলের প্রথম চালেই ওঠ্‌সাই কিস্তির ফাঁদে পড়ে যাওয়া তাঁর ধাতে নেই। ভীমার নৌকার চালটা তিনি বুঝে ফেললেন। গজ দিয়ে সে পথে চাপা দিলেন।

প্রথম ভেলা-জোড়া যখন রওনা দিল—ঠিকই 'আনজাদ' করেছে ভীমা—দশদুকুনে বিশজন বন্দুকধারীকে নিয়ে, তখন গজরাজও ধীর গতিতে নেমে এলেন দামোদরের বুকে। প্রকাণ্ড রণহস্তী। দাঁতাল। মদ্দা। তার গজকুম্ভে মাহুত। হাওদায় মাত্র একজন যোদ্ধা। মাথায় মস্ত উষ্ণীষ—বোধকরি বর্গীসেনাপতি স্বয়ং!

অর্থাৎ এপারে পৌঁছে ভেলা-জোড়াকে উজানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ওরা করবে হাতি দিয়ে। কাশ ঝোপের আড়াল থেকে তীরবিদ্ধ করে ঐ গজদানবকে বিচলিত করা সম্ভব নয়। আর প্রয়োজনে মাহুত নির্মমভাবে চালিয়ে দেবে হাতিটাকে ঐ কাশঝোপের দিকে। বন্দুকের নিশানা থেকে কাশ ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করতে পার—কিন্তু হস্তিপদদলিত হওয়া রুখবে কী ভাবে?

ভীমার মুখটা কালো হয়ে গেল। বললে, শালারা বুড়বক নয় রে ঈশেন! ফন্দিটা বদলাতে হবেক!

—কী করবা কও?

তৎক্ষণাৎ ভীমা বাগদি তার সৈন্যদলকে সাজালো নতুন ছন্দে। জনা-পঞ্চাশ ধানুকীকে লুকিয়ে ফেলল কাশঝোপের একটা নির্দিষ্ট অংশে। এবার তার জ্যামিতি, গতিবিদ্যা আর ঔদস্থিতিবিদ্যার কঠিন অঙ্ক! এপারের কোন্ বিন্দু থেকে ভেলার দূরত্ব সর্বনিম্ন হবে—যখন সে দুটি এসে পৌঁছাবে তীরন্দাজদের নাগালের ভিতর! নির্দেশ দিল—ভেলা দুটি তিনপো জলপথ অতিক্রম করলেই সে 'কুক' দেবে। আর তৎক্ষণাৎ পঞ্চাশজন তীরন্দাজ এক যোগে ঐ ভাসমান ভেলার সৈনিকদের উপর তীরনিক্ষেপ করবে। ওরাও নিশ্চয় তৎক্ষণাৎ বন্দুক দাগবে। আগ্নেয়াস্ত্র বনাম তীরধনুক! অসম যুদ্ধ! তা হোক—এরা থাকবে শারদলক্ষ্মীর অঞ্চলের আড়ালে—কাশঝোপের অন্তরালে; আর ওরা ভরা দামোদরের উলঙ্গ উচ্ছ্বাসে টালমাটাল। ওরা আত্মগোপনের কোনও সুযোগ পাবে না। এই অসমযুদ্ধের ভাগ্য নির্ভর করবে এদের টিপ-এর উপর। এলেমের উপর!

ঈশান বললে, খুড়ো! সবারে বলি দাও—ঐ বড় সুমুন্দির এক্তিয়ার আমার! অরে টিপ করি বেহুদ্দো যান বাণ নষ্ট না করে!

ঈশান সর্দার গাঁয়ের শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। শুধু সোঞাই নয়, পঞ্চগ্রামের। বছর বছর বীরাষ্টমীতে সে নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে প্রতিযোগিতার আসরে। উড়ন্ত হংসপাতির যে-কোন একটাকে বলে বলে নামাতে পারে। তার দাবী সবাই এক কথায় মেনে নিল। গজারূঢ় সেনাপতির মাথা নেবার অধিকার ওর। মাঝখানে সন্তরণরত গজরাজ, দুপাশে দুটি ভেলা। ওরা তিল

তিল করে এগিয়ে আসছে।

থাবা-গাড়া চিতাবাঘের মতো দম ধরে বসে আছে ভীমা বাগদি। ঘন কাশঝোপের আড়ালে। নিঃসাড়ে লক্ষ্য করছে ভেলা দুটোকে। তিলতিল করে সে দুটো এগিয়ে আসছে এপারে। কোণাকুণি। উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণপুবে, দামোদরের স্রোতধারার সঙ্গে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ রচনা করে। দুটি ভেলায় প্রায় বিশজন বর্গী সৈনিক। কেউই অশ্বারূঢ় নয়। ঘোড়াগুলোর লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন। বাকিরা বন্দুক উঁচিয়ে নিশানা স্থির করেছে ঐ কাশঝোপটার দিকেই। ওরাও গতিবিদ্যা আর ঔদস্থিতিবিদ্যায় বোধকরি ওয়াকিবহাল। জানে, দিগন্তব্যাপী কাশঝোপের ঠিক কোন অংশটায় তীরন্দাজদের ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা। কাশঝোপ এতই নিস্পন্দ যে, তীরন্দাজদের প্রায় নাকের ডগায় এসে বসল একঝাঁক জলপিপি।

এসে গেছে! নাগালের মধ্যে! কিন্তু সবার সীমানা সমান নয়। ঈশানের বাণ যে দূরত্বে লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করতে পারে, অনেকের তীর অত দূরে পৌঁছাবেই না। জ্যা-আকর্ষণ করার দৈহিক ক্ষমতা তো সবার সমান নয়। এইবার....এইবার!

ভীমা মুখটা নিচু করে। জমি সই-সই। ডানহাতের তালুটা মুখে চাপা দিয়ে ধ্বনি দিতে গেল: আ-বা-বা-বা-বা!

দেওয়া হল না।

কারণ ঠিক সেই মুহূর্তেই স্তব্ধ দিগন্ত কাঁপিয়ে ধ্বনিত হল একটা বিকট শব্দ! জলের কিনাবে সব চেয়ে উঁচু তালগাছের মাথা থেকে! শিঙার শব্দ!

বেষ্টা-বায়েনের সাবধানবাণী!

উদারা-মুদারা নয়, বোধকরি 'তারা'-য়! সামাল ভাইসব! —শিরে সংক্রান্তি! বোয়েছেন?

তৎক্ষণাৎ ভেলার সৈনিকদের লক্ষ্যমুখ বদল হল। একসঙ্গে পাঁচসাতটা বন্দুক হয়ে গেল উর্ধ্বমুখ। তালগাছের মাথাটা তাদের লক্ষ্য! গর্জন করে উঠল বেশ কয়েকটি বন্দুক—প্রায় একসঙ্গে! .

অন্তত একটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি।

ভাদ্রের পাকাতালটির মতো বেষ্টা-বায়েনের মৃতদেহ ছুটে এল ধরিত্রীকে শেষ আলিঙ্গন করতে! আশ্চর্য! বাদক নিস্পন্দ—অথচ তার শিঙার শব্দটা তখনো থামেনি। গাছ-গাছালিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে তার শিঙার প্রতিধ্বনি!

জান দিয়ে বেষ্টা-বায়েন কিন্তু একাই এই অসম যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিল। কারণ একযোগে অতগুলি গাদা বন্দুকের প্রতিঘাতে ভেলা দুটি আবার টলোমলো। দ্রুতহস্তে সৈনিকেরা বন্দুকের নলে বারুদ ঠেশ্‌ছে। ভীমা বাগদি ফিরেও দেখল না বেষ্টা বায়েনের দিকে। পরমুহূর্তেই শুনিয়ে দিল সমরধ্বনি।

একঝাঁক তীর ছুটে গেল ভেলার দিকে!

দুটি ভেলায় মিলিয়ে জনা-সাতেক আহত! দু-একটি অশ্বও। তাদের দাপাদাপিতে দুটি ভেলাই কাত হয়ে গেল। প্রাণধারণের তাড়নায় লাগাম ছাড়িয়ে আতঙ্কিত আহত অশ্বগুলি ঝাঁপ খেয়ে পড়ল জলে। তবু দু-এক জন বন্দুক ছুঁড়ল। বেসামাল নৌকায় তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল।

আবার এক ঝাঁক তীর ছুটে গেল ভেলা দুটোর দিকে।

ঘুরে পড়ল আরও দুজন। বাকিরা দিশেহারা। ঝপাঝপ তারা লাফিয়ে পড়ল জলে। অশ্বগুলি, যে কটি তখনও খাড়া ছিল, তারাও।

তিনচারটি মৃতদেহকে দেখা গেল—স্রোতের টানে ভেসে চলেছে ভাঁটির দিকে। বাদবাকি সৈনিকেরা সাঁতার কেটে ফিরে যাচ্ছে ওপারে। অশ্বগুলি কিন্তু তাদের অনুসরণ করল না। প্রাণধারণের জৈবিক প্রবৃত্তি। এপার অনেক কাছে, ও পার বহুদূর। সব চেয়ে নিরাপদ স্থান ঐ পারানি ঘাট—বাদ বাকি খাড়া পাড়। ঘোড়াগুলো একে একে উঠে এল পারানি ঘাটে। সেটা জনমানবহীন।

হাতিটা?

সেটাও সাঁতার দিয়ে এসে উঠল এপারে। স্নানঘাটে। আর তার মাহুত? সেই সেনাপতি?

মাহুতটার কী হয়েছে কেউ দেখেনি। বোধকরি সেও সাঁতরে চলে গেছে ওপারের নিরাপদ আশ্রয়ে।

তাহলে সেই গজারূঢ় বর্গী সেনানায়ক?

ঈশান তার ডান হাতখানা বাড়িয়ে বললে, —হু-ই দেখ কেনে?

হ্যাঁ, এখনো দেখা যাচ্ছে। দামোদর তাকে নাচাতে নাচাতে নিয়ে চলেছে বঙ্গোপসাগরের দিকে। সেখানে একদিন ভোজ খাবে কামট-কুমির।

ভেলা দুটোও ভেসে চলেছে সেনানায়কের সাথে সাথে।

দুপারেই নেমে এল স্তব্ধতা। ঈশান এবার এগিয়ে এল। বলিষ্ঠ দুহাতে বেষ্টা বায়েনের মৃতদেহটা তুলে নিয়ে তাকে গালমন্দ করতে থাকে: তুর মাতা খারাপ হয়ি গেল কেনে বেষ্টাদা! কেনে বাজাই দিলি শিঙাটো? বুদ্ধু কাঁহাকা!

সে-কথার জবাব দিতে দৈত্যের মতো মানুষটার গলা কেঁপে গেল। ভীমা বললে, গালি দিস্ নারে ঈশেন! বেষ্টা শিঙা বাজাই দিলেক তুদের জান দিতে! নাইলে তুর-আমার লাশ পড়ি থাকত ইখানে!

মর্মান্তিক সত্য! শিঙার শব্দে সে সব কয়টা বন্দুকধারীকে বিচলিত করেছে। লক্ষ্যমুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে তাদের!

বেষ্টা আজ শহীদ!

দুপারেই নেমে এল স্তব্ধতা। ওরা দ্বিতীয়বার আর এই দুরন্ত দামোদরকে অতিক্রম করার দুঃসাহস দেখালো না। আর ভেলাই বা কোথায়? সমস্ত দিন দু-পারে দুই দল নিশ্চুপ বসে রইল। কেউ নতুন চাল দিল না।

সন্ধ্যার ঝোঁকে দেখা গেল পুবদিক থেকে ধুলো উড়িয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে আসছে একজনমাত্র ঘোড়সওয়ার। দামোদরের ওপার দিয়ে। সম্ভবত সংবাদবহ, মূল বাহিনীর বর্গী সর্দারের কোন জরুরী আদেশ-জারী করতে হয়তো। ওপারে একটা চঞ্চলতা—ছোট ছোট দলে উপদলে কী-যেন শলা পরামর্শ হচ্ছে। তারপর ওরা সিদ্ধান্তে এল। অশ্বারোহণ করল সবাই। একটি হাতি, কিছু ঘোড়া আর কিছু সৈনিককে হারিয়ে তারা নতমস্তকে ফিরে গেল পুবমুখো—যে পথ বেয়ে তারা সগৌরবে এসেছিল সকালবেলা।

ব্যাপারটা কিছুই বোঝা গেল না। আন্দাজে মনে হল, ওদের প্রত্যাবর্তনের নির্দেশই পাঠিয়েছেন মূল সেনাধ্যক্ষ—হয়তো স্বয়ং ভাস্কর-পণ্ডিত। ভীমা বাগদির চ্যালাচামুণ্ডার দল উল্লাসে জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে। সে কলরোল থামলে ভীমা বললে, শালাদের বিশ্বাস নাই রে, লখা। অখনই লাফাস না।

বাকিটা বলতে হল না। লক্ষ্মণ জবাবে বললে, হ, বোঝছি। দেইখ্যা আসি।

ঘোড়ায় উঠল সে। বর্গী-বাহিনীর সমান্তরালে সে এপাড়ের সড়ক ধরে পুবমুখো চলল—দেখে আসতে, ওরা সত্যিই ফিরে গেল, নাকি এ ওদের আর একটা চাল!

এক প্রহর রাতে সে ফিরে এসে জানালো, না ওরা সত্যিই ফিরে গেছে। তবু ভীমা রাত্রে নদীতীরে কিছু প্রহরার ব্যবস্থা করল। তাবপর তার নিজস্ব ডিঙি নৌকাটার বাঁধন খুলতে খুলতে ভাইপোকে বললে, ঈশেন, অরে নে আয়। ফুল্লরায় যাতি হবে। সে-আবাগী পথ চায়ি বসি আছে।

সে-আবাগী! যমুনা! বেষ্টা বায়েনের ঘর-ওয়ালী। তিনটি সন্তানের জননী। ওরা থাকে ঐ ফুল্লরা গাঁয়ে। সাত-সকালে বছ্ছরকার দিনে দুটো পান্তা মুখে দিয়ে তার সেই মরদ শিঙা বগলে গ্রাম ছেড়ে এ-পারে এসেছে। তারপর সারাটা দিন বোধকরি হতভাগিনী ঘর-বার করেছে—মরদটা এখনো ফেরে না কেনে?

বেষ্টাকে ওরা শুইয়ে দিল ভীমার ডিঙি নৌকায়। প্রহ্লাদ বায়েন—বায়েনপাড়ার মোড়ল—বসল তার মাথাটা কোলে নিয়ে। দশ-বিশটা মাঝি-মাল্লা শবানুগমন করল। সবার আগে বেষ্টাকে নিয়ে যেতে হবে ফুল্লরা গাঁয়ে। যার ধন তার কাছে পৌঁছে দিতে।

রূপেন্দ্র নতমস্তকে ফিরে এলেন বাড়িতে।

পরদিন সকাল। মহাষষ্ঠী। বৎসরের একটি চিহ্নিত শুভদিন।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বসে ছিলেন তাঁর আরাম-কেদারায়। প্রাতঃকৃত্যাদি সারা হয়েছে। পরনে পট্টবাস। উর্ধ্বাঙ্গে একটি উত্তরীয় শুধু। নিচে, পূজামণ্ডপে সকাল থেকে ঢাক বাজছে। মহাষষ্ঠীর পূজা একটু বেলায়।

ব্রজসুন্দরী প্রবেশ করলেন অন্দরমহল থেকে। পূজার নববস্ত্র তাঁর পরিধানে। লালপেড়ে তাঁতের কোরা শাড়ি, হাতে বাউটি পৈছেঁ, মকরমুখী সোনার ভারী বালা, লোহার খাড়ু ও শাঁখা। কপালে গিনি-মাপের টিপ, সিঁথিতে পাকাচুলের ঘের-দেওয়া লাল-সিঁদুর।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ অতি প্রত্যুষেই একটি বিচিত্র সংবাদ পেয়েছেন—অপ্রত্যাশিত সংবাদ। ঘুম ভাঙতেই তারাপ্রসন্ন সেটি জানিয়ে গেছে, বলেছে, সেই সংবাদবহ লোকটি সমস্ত রাত অশ্বারোহণে ক্লান্ত। সে নিদ্রাগত। সকালে সে এসে বিস্তারিত জানাবে বড় হুজুরকে। তবে সংক্ষিপ্তসার সে ইতিমধ্যেই নিবেদন করেছে তারাপ্রসন্নের কাছে। সেই বিচিত্র সংবাদের কথাই ভাবছিলেন বসে বসে।

ব্রজসুন্দরী সবার আগে সেই প্রশ্নটাই করলেন, ভোররাত্রে তারা এসে তোমাকে কী বলে গেল গো?

ব্রজেন্দ্র ফরসির নলটা সরিয়ে রেখে বললেন, বস। কথা আছে। ঐ মেয়েটি—কী যেন নাম?— ওর সম্বন্ধে কী করা যায় বল?

ব্রজসুন্দরীর বুঝতে অসুবিধা হল না। নাম না শুনেও। গতকাল হাঙ্গামা মিটে যাবার পর পুরললনার দল যে-যার ভিটেয় ফিরে গেছে, শুধু ব্রজেন্দ্রনারায়ণের নির্দেশে কুসুমমঞ্জরী আর তার মাসিকে যেতে দেওয়া হয়নি। কর্তার যুক্তিটা অকাট্য। প্রেমদাস বাবাজীর ভাইপো হুমকি দিয়ে গেছে মহাষ্টমীর দিন সে সদলবলে আসবে গাঁয়ের মেয়েকে গাঁয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু লোকটাকে বিশ্বাস নেই—যে কোন সময়েই সে অতর্কিতে ঐ আরোগ্য-নিকেতনে হানা দিতে পারে। সেদিন যেমন দিয়েছিল। সেবারকার মতো ভীমা বা তার ভাইপো ঈশেন কাছাকাছি না থাকলে ওরা দ্বিতীয় হানায় ব্যর্থ নাও হতে পারে। তাই এই ব্যবস্থা। এসব কথা জানা ছিল ব্রজসুন্দরীর। বললেন, আমি কী বলব বল, এসব বিষয়ে? তুমিই নাকি কাটোয়া যাবার আগে তারাকে বলে গেছিলে, রূপনগরের মোহন্ত মহারাজকে এসময় বিরূপ করা ঠিক হবে না—

বাধা দিয়ে ব্রজেন্দ্র বললেন, হ্যাঁ, তাই তখন বলেছিলাম। কিন্তু তারপর অনেক জল যে বয়ে গেছে দামোদর দিয়ে। বর্গীর হাঙ্গামা হলে রূপনগরের মোহন্ত মহারাজ শুধু নিজের এলাকাটাই রক্ষা করবেন, আর পাঁচটা গ্রামের কী হল তা ভ্রূক্ষেপ করেও দেখবেন না—এই নির্মম তথ্যটা বোঝা গেছে। তাছাড়া ঘটনাচক্রে ভীমা আর ঈশেন পরিস্থিতিটা আদ্যন্ত পালটে দিয়েছে—ঠিকই করেছে তারা। এখন ঐ অনাথা আশ্রিতাকে রক্ষা না করা যে আমার অধর্ম হবে, রানী।

রাঙিয়ে ওঠেন বৃদ্ধা। সম্বোধনটায়। বিশেষ আনন্দঘন নৈশ মুহূর্তে ছাড়া এ-নামে ব্রজেন্দ্র তাঁকে সম্বোধন করেন না। সামলে নিয়ে বলেন, তা যদি মনে কর, তাহলে ওকে রক্ষা কর, আশ্রয় দাও।

—তাই তো দিয়েছি। কিন্তু একটা খট্‌কাও যে লেগে রয়েছে। ওকে রক্ষা করার নৈতিক দায়িত্বটা আমার আছে, কিন্তু সামাজিক অধিকার তো নেই!

—সামাজিক অধিকার। তার মানে?

—সে একটি অনাথা কুমারী কন্যা। যদি বারেন্দ্রশ্রেণীর হত, তাহলে না হয় তারাপ্রসন্নকে বলতাম, আর একটি দারপরিগ্রহ করতে। কিন্তু ওরা রাঢ়ী শ্রেণীর। মেয়েটি যদি এ গাঁয়ের বধূ হয়ে যায়, শুধুমাত্র তখনই আমার সামাজিক অধিকার বর্তাবে। না হলে, তার সেই কাকা যদি স্বয়ং এসে দাবী করে তখন আমি তো তাকে ফেরাতে পারব না। আর তারপর যদি সে আবার হতভাগিনীকে ঐ প্রেমদাসের আখড়ায় পাঠায়···

ব্রজসুন্দরী যুক্তির সারবত্তা প্রণিধান করেন। বলেন, ওর সেই মাসি বললে, ওরা নৈকষ্য কুলীন, শাণ্ডিল্য গোত্র।-এ গ্রামে তেমন পাত্র কি তুমি পাবে না?

—পাব। নন্দ চাটুজ্জে আর দুর্গা গাঙ্গুলী দুজনেই সুপাত্র—কিন্তু তাঁরা কি সম্মত হবেন? দুজনের ঘরেই 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' মজুত।

ব্রজসুন্দরী রুখে ওঠেন, কেন? ঘাটের মড়া ছাড়া কি এ গাঁয়ে রাঢ়ী-শ্রেণীর কুলীন পাত্র নেই? নন্দ ঠাকুরপোর বড় ছেলেটি তো এখনো বিয়ে করেনি।

—তা করেনি। পত্নী না থাক তার উপপত্নী একাধিক। ছেলেটি বিকৃতরুচির। নানা রকম নেশা-ভাঙ করে। রাতের পর রাত থাকে ঐ অন্ত্যজ পল্লীতে। তার চেয়ে নন্দ সুপাত্র! তবে সুপাত্র যে নেই, তা বলব না। আছে। কিন্তু তাকে কি রাজী করাতে পারবে?

এবারও বুঝে নিতে অসুবিধা হল না। হাসলেন ব্রজসুন্দরী। বলেন, হলে কিন্তু দুর্দান্ত মানাবে! তবে আমার মনে হয়, একবগ্গা রাজী হবে না।

—হবে না? বলছ?

—পারলে একমাত্র তুমিই পার। তোমার অসাধ্য কাজ নেই। দেখবে চেষ্টা করে?

—দেখব। তবে তার আগে জমিটা তুমি একটু তৈরী করে রেখ। শোন বলি—

বলা হল না। নিচে, পুজো-দালানে একটা শোরগোল। ঢাকের বাদ্যিটা থেমে গেছে। অনেকে একসঙ্গে উত্তেজিত হয়ে কিছু আলোচনা করছে। ব্রজেন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। খড়মজোড়া পায়ে দিয়ে বার হয়ে এলেন। দ্বিতলের টানা-বারান্দার রেলিংটা দু-হাতে চেপে ধরে ঝুঁকে পড়লেন নিচের দিকে।

ইতিমধ্যেই অনেকে এসেছেন ঠাকুর দেখতে। ছেলে বুড়ো, অবগুণ্ঠনবতীও কিছু। সবারই অঙ্গে পুজোর নতুন পোশাক। নন্দ এসেছেন, দুর্গাচরণ, শিরোমণি-মশাই, বাচস্পতি, ঘোষপাড়ার অন্নদা ঘোষ, বিপিন দত্ত, রূপেন্দ্র আরও কে কে।

প্রহ্লাদ বায়েনের পিঠে ঢাক। বায়েনপাড়ার মোড়ল সে। বোধকরি এতক্ষণ বাজাচ্ছিল। তার ঢাকের বাদ্যি সদ্য থেমেছে। আর পূজা-মণ্ডপের বাহিরে—সিং দরোজার এক পাশে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছে একটি কিশোর। তার পিঠে ঢাক, হাতে ঢাকের কাঠি। খালি গা, তাতে একটা কাচায় বাঁধা একটা চাবি। মহাগুরুনিপাতের চিহ্নিত সজ্জা। চিনতে অসুবিধা হল না—বেষ্টা বায়েনের বড় ছেলে নবা, বছর পনের বয়স। মুখটা শুকিয়ে গেছে, চোখ দুটো রাঙা।

নন্দ চাটুজ্জে তাকে ধমকাচ্ছিলেন, এই জন্যেই তোদের ছোটলোক বলে, বুয়েছিস্! কোন আক্কেলে তুই ঢাক কাঁধে পুজোতলায় আসিস্? অশৌচ চলছে তোর, মহাগুরুনিপাত! শুভকাজে কি এখন আসতে আছে? আর শুভ কাজ মানে কী? মায়ের পূজা! মা আমার দশভুজা!

নবা বায়েন সম্ভবত সারারাত দুচোখের পাতা এক করার সময় পায়নি। ছোট দুটি বোনকে, মাকে সামলাতে সামলাতেই রাতটা কোথা দিয়ে কেটে গেছে। ভোর বেলা মা অজ্ঞান-অচৈতন্যের মতো শুয়ে পড়ার পর খুড়ির পরামর্শে ঢাক কাঁধে সে রওনা হয়েছিল। খুড়ি অর্থে প্রহ্লাদের বউ। পেল্লাদ আর বেষ্টা বছর বছর ঢাক বাজায়। মায়ের মণ্ডপে। খুড়ি বলেছিল, আমি অ্যারে দেখছি, টুক বাজায়ে আয় বাপ—নয়তো খাজাঞ্চি-বাবু তোরে পাব্বনি দিবেনি!

নন্দের দিকে ফিরে হাতদুটি জোড় করে নবা বায়েন কাতরকণ্ঠে বললে, ঠিগাছে ঠাউর! মুই ভিৎরি যাবনি। এই বাইরে ডাঁড়ায়ে বাজাব অনে।

—আবার মুখে মুখে তক্কো? কথা বললে শুনিস না কেন? অশৌচের মধ্যে মায়ের পুজায় ঢাক বাজাতে নেই। শাস্তরে বারণ—

—না বাজালি খাজাঞ্চিবাবু পাব্বনি দেবে না যে! বছরে তো দু-বার মাত্তর পাই।

তা বটে। শারদীয়া দুর্গোৎসবে আর গাজনের মেলায় প্রহ্লাদ আর বেষ্টা জুড়ি বেঁধে ঢাক বাজাতে আসে। বাৎসরিক পার্বণী বাঁধা—একখানি ধুতি, একটি লালপাড় শাড়ি, একটি গামছা। এছাড়া পাঁচ কুনকে চাল, তেল-সিঁদুর, পাঁচটা পান সুপারি আর পাঁচ-কপর্দক নগদ। বায়েন-বিদায়। এ ওদের বংশগত বৃত্তি—বংশানুক্রমিক অধিকার। কিশোরটির আশঙ্কা পুজো-মণ্ডপে গড়হাজির থাকলে, বাপের বদলে বেটা অনুপস্থিত হলে, সেই বংশানুক্রমিক অধিকারটা খোয়া যাবে।

নন্দ গর্জে ওঠেন, ছোটলোক একেই বলে! বাপটা দাঁত ছিরকুটে পড়ে আছে, তার মুখে এখনো আগুন ছোঁয়াসনি—সেসব দিকে খেয়াল নেই, শুধু আদায়-পত্রটা ঠিকমতো হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর!

রূপেন্দ্র দাঁড়িয়েছিলেন। বুঝে উঠতে পারেন-না—কেন নন্দ-খুড়ো এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারছেন না। কী চরম দরিদ্র ওরা! কী মর্মান্তিক প্রয়োজনে সদ্য-পিতৃহারা এভাবে এসে দাঁড়িয়েছে। বলেন, তুই বাড়ি যা, নবা। আমি কথা দিচ্ছি—ব্যবস্থা করে দেব—তোকে বাৎসরিক প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হবে না।

ছেলেটি মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, দিবে না ঠাউর। খাজাঞ্চিবাবু বুলবে—তু তো বাজাস নাই!

হঠাৎ যেন দৈববাণী হয়। সবাই ঊর্ধ্বমুখ হয়ে গেল।

দ্বিতলের বারান্দা থেকে ঝুঁকে ব্রজেন্দ্র বললেন, তোর পার্বণীটা পরে নিয়ে যাস্। তবে কাপড়ের পুঁটুলিটা এখনই নিয়ে যা নবা। কোরা কাপড় তোর এখনি লাগবে।

নবা ঊর্ধ্বমুখে তাকিয়ে হঠাৎ ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল। উদ্দেশ্যে গড় হয়ে পেন্নাম করল জমিদারমশাইকে।

ব্রজেন্দ্রর নির্দেশে খাজাঞ্চিবাবু তখনই পুঁটুলিটা বার করে আনলেন। স্পর্শ বাঁচিয়ে ঐ কিশোরটির প্রসারিত হস্তে ফেলে দিলেন।

প্রত্যেকের নাম-লেখা কাপড়ের বাণ্ডিল প্রতিমার পিছনে থাক দিয়ে রাখা থাকে—পুরোহিত, তন্ত্রধারক, কুমোর, মালাকার, ঢাকি, কাঁসি, সানাই—মায় একটি পুঁটুলিতে শুধু ঢেড়া-চিহ্ন। খাজাঞ্চিবাবু জানেন, সেটা কাকে পৌঁছে দিতে হবে। সেই পাপীয়সীর নামটা লিখতে নেই—কিন্তু তার জন্যেও বরাদ্দ করা আছে এই সামাজিক মর্যাদা। যার দ্বারপ্রান্ত থেকে কুমোরভায়া সংগ্রহ করে এনেছিল মূর্তি গড়ার মৃত্তিকা! প্রতিমা গড়ার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে।

পুঁটুলিটায় মুখ চেপে কাঁদতে কাঁদতে পুজো-মণ্ডপ ত্যাগ করে গেল নবা। কাঁধে ঢাক, গলায় কাচা, হ্যাঁ সত্যি কথাই বলেছিলেন নন্দ-ঠাউর! বাপের সৎকার হয়নি এখনো।

অপরাহ্ণে সাড়ম্বরে তাকে দাহ করা হবে সোঞাইয়ের শ্মশানঘাটে!

বায়েনের আবার দাহকার্য!

কপালে একটা টিপ দিবি, ব্রহ্মতালুতে এক ঘটি গঙ্গাজল, মুখে নুড়ো ছুঁইয়ে ত্যানায় জড়াবি। তারপর ঠেলে দিবি দামোদরের দিকে। ব্যস! বাকি দায়দায়িত্ব কামঠ, কুমির আর বোয়ালের। এই তো হল অন্তজ্য পরিবারের চিরাচরিত সৎকারের আয়োজন। তা নয়! চিতা জ্বেলে

বায়েনের দেহ দাহ করা। কী ভাগ্যি করেই জন্মেছিল বেষ্টা। জমিদারবাবু তার জন্য বরাদ্দ করেছেন—শুধু চিতার কাঠ নয়, চন্দন কাঠ। গব্য ঘৃত। হেসে বাঁচি না। কী? না, বেষ্টা বায়েন শহীদ।

তেলাপোকার পাখা আছে? বল কী। তবে তো তার জন্যে খাঁচা বানাতে হয়। পাখি হয়ে গেল যে সে। বেষ্টা বায়েন শিঙে ফুঁকছে। বল কী? তাহলে তার জন্যে....

যত্তসব আধিক্যেতা।

সেদিন অপরাহ্নবেলা।

রূপেন্দ্রনাথ অশ্বপৃষ্ঠে ফিরে আসছিলেন তিজলহাটি থেকে। তিন ক্রোশ দূরের গ্রাম। তিজলহাটির পাঁচকড়ি ঘোষালের জোয়ান ছেলেটাকে সাপে কামড়েছে শুনে তড়িঘড়ি ছুটে গিয়েছিলেন ভিন গাঁয়ে। ভাগ্য ভাল—সাপটি বিষাক্ত ছিল বটে, কিন্তু জুৎ করে কামড়াতে পারেনি। বিষ ঢালতে পারেনি ঠিক মতো। তাছাড়া স্থানীয় গুণিন ওঁর নির্দেশ মোতাবেক বাঁধনটা দিয়েছিল ভালই। নির্দেশ উনি আজ দেননি। দিয়েছিলেন অনেকদিন আগে।

এ অঞ্চলে সাপের উপদ্রব খুব বেশি। গোখরো, কেউটে, লাউডগা, খরিশ—নানান জাতের। প্রতি মাসেই এক-আধটা সর্পদংশনের রোগী জোটে। রূপেন্দ্র প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্থানীয় ওঝা-গুণিনদের শিখিয়ে দিয়ে আসেন 'টুর্নিকেট' বাঁধার কায়দাটা। ওঝাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বুঝিয়ে বলতেন, শোন্ বাবা, তোরা ঝাড়ফুঁক করিস, মা-মনসাকে স্তবস্তুতি করিস, ভাল কথা। তাতে আমি বাধা দিচ্ছি না। কিন্তু এই বাঁধনটা দিতে ভুলিস না।

সাপের বিষ কী-ভাবে শিরা-ধমনীর পথ বেয়ে আক্রান্তের মৃত্যু ঘটায়—কোথায় বাঁধন দিতে হবে, কতটা জোরে বাঁধতে হবে, কতক্ষণ পর-পর বাঁধন একটু আল্‌গা করে আক্রান্ত প্রত্যঙ্গে রক্তসঞ্চালন সচল রাখতে হবে, সব শিখিয়ে দিতেন। ওদের রুজি-রোজগারে হাত পড়ছে না দেখে অনেকেই ধন্বন্তরি বাবামশায়ের নির্দেশটা মেনে চল্‌ত।

দু-একটি ক্ষেত্রে এক আসুরিক পদ্ধতিতে তাঁকে সর্পদংশনের চিকিৎসাও করতে দেখেছে ওরা। দংশনের অনতিবিলম্বে উপস্থিত হতে পারলে তিনি অকুতোভয়ে দংশিত ক্ষতচিহ্নে মুখ লাগিয়ে বিষাক্ত রক্তটা শুষে নিতেন—থু-থু করে ফেলে মুখটা ধুয়ে ফেলতেন। তাজ্জব হয়ে যেত সবাই। উনি বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করতেন—এ কোন অলৌকিক ক্ষমতা নয়, সাপের বিষ যতই মারাত্মক হোক না কেন, রক্তের সঙ্গে না মিশলে, শুধু মুখে টেনে নিলে বিপদের কোনও আশঙ্কা নেই যদি না মুখে কোনো ক্ষত থাকে।

ওরা বিশ্বাস করত না। হাসত। বলত, জানি, জানি, ঠাউর। তুমি কবুল খাবে না। মা মনসা স্বয়ং এসে তোমাকে মন্ত্র দে গেছে।

পাঁচকড়ি ঘোষালের সন্তানটির জীবন রক্ষা পাওয়ায় মনটা খুশি। ঘোষাল মশাই সম্পন্ন গৃহস্থ। পঞ্চাশ বিঘে আউসের জমি আছে, তিন জোড়া হেলে-বলদ। পাঁচটি রজতখণ্ড ওঁর চরণমূলে নামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, খোকার জীবনের দামের তুলনায় এ কিছুই নয়, কিন্তু আপনার আরোগ্য নিকেতনে একটি ঘর তুলে দেবার মতো আর্থিক সঙ্গতি আমার নেই

কোবরেজ-মশাই! এই কয়টি মুদ্রা প্রত্যাখ্যান করলে খুবই মনঃকষ্ট হবে আমার।

রূপেন্দ্র ইঙ্গিতটা বুঝতে পারেন। বলেন, না ঘোষাল-মশাই। সে বাতিক আর নেই আমার। এখন যে যা দেয় আমি গ্রহণ করি।

পাঁচটি টাকা উঠিয়ে নেন। সত্যই প্রীত হলেন ঘোষাল। বলেন, আপনি বাঁচালেন আমাকে।

—বাতিকটা কীভাবে, কার নির্দেশ ত্যাগ করলাম জানেন?' একমুঠি-বাবার কথায়।

ভিন গাঁয়ের মানুষ হলেও ঘোষাল-মশাই চিনতে পারেন। বলেন, কী রকম? যদি আপত্তি না থাকে তো শুনি।

—না, বাধা আর কিসের, শুনুন।

একমুঠি-বাবা সোঞাই গাঁয়ের এক পাগলা সাধক। তাঁর বয়সের কোন গাছ-পাথর নেই। পাগলামোরও। সন্ন্যাসী মানুষ। ভিক্ষাজীবী। তবে তাঁর ভিক্ষাপদ্ধতি বড় বিচিত্র। দৈনিক তিনি একজনের কাছে থেকে মাত্র একমুঠি ভিক্ষা নিয়ে থাকেন। পাঁচবাড়ি প্রত্যাখ্যাত হলে ষষ্ঠ গৃহস্থের দ্বারে হানা দিতে সঙ্কোচ করেন না; কিন্তু প্রথম গৃহস্থ যদি মুষ্টিভিক্ষা দেয়, তাহলে সেদিন আর দ্বিতীয় বাড়িতে যান না। তাঁর বিশ্বাস দিনান্তে এক মুঠিতেই তাঁর অধিকার। প্রথম গৃহস্থ এক মুঠি ভিক্ষা দিলে মনে করেন—দিনটি সার্থক: কারণ সেদিন ভজন-পূজনের সময়টা বেশি পাওয়া যায়।

সেই একমুঠি-বাবা পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছেন। খবর পেয়ে রূপেন্দ্র গিয়েছিলেন চিকিৎসা করতে। ঔষধ আর মালিস দিয়ে নিদান হাঁকেন, সাতদিন তাঁকে শুয়ে থাকতে হবে। হাঁটা-চলা বারণ।

সন্ন্যাসী রুখে ওঠেন, বহ্ কৈসে হোগা? মুঝে ভিখ্ তো মাংনা চাহিয়ে!

রূপেন্দ্র বলেছিলেন, না! সাত দিনের সাতমুঠি ভিক্ষা আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি না হয়।

তাতেও রাজী নন্—বহ্ কৈসে হোগা?

সাতদিনের ভিক্ষা তিনি একদিনে কেমন করে নেবেন? তা হয় না! রূপেন্দ্র রুখে ওঠেন, আপনি তো আচ্ছা একবগ্না মানুষ।

হা-হা করে ঠারে ঠারে হেসেছিলেন সন্ন্যাসী। তুলসীদাসজী না কবীর কার যেন একটা দোঁহা আবৃত্তি করে শোনান। যার নির্গলিতার্থ: 'জীব মাত্রেই দর্পণ! সর্বজীবে সে নিজের প্রতিবিম্বই দেখতে পায়। সাধু দেখে সবার মধ্যেই আছেন শিউজী, পাপী দেখে সবার মধ্যেই আছে নরক!'

অর্থাৎ একবগ্নারই শুধু অধিকার অপরের মধ্যে ঐ একবগ্নামি দেখতে পাওয়া।

বুঝিয়ে বলেন, কেন তিনি ঐ বিচিত্র পদ্ধতিতে ভিক্ষা করেন। নিজের জন্য নয়, যে ভিক্ষা দিচ্ছে, তার স্বার্থে। লোকহিতার্থে। বারেবারে ভিন্ন ভিন্ন গৃহস্থকে হাত উবুড় করা শেখাতে।

রূপেন্দ্র প্রশ্ন করেন, তাহলে শুধু একমুঠি কেন? একজনই যদি পাঁচমুঠি দিতে চায় তাহলে তা নেন না কেন?

—কেমন করে নেব? শিউজী আমার জন্য সিরেফ এক মুঠি বরাদ্দ করেছেন যে। তবে শুধু চাউলই নয়। বিশ্ওয়াস না হলে তুই একমুঠি মোহর দিয়ে দেখ্! আমি নিয়ে নেব। একটা ভাঙিয়ে একমুঠো চাউল খরিদ করব। বাকিটা আবার দান করে দেব। ক্যোও-কি মুঝে তো কল ফিন নিকাল্না চাহিয়ে না?

জ্ঞানচক্ষু খুলে গিয়েছিল রূপেন্দ্রের। তাই তো! অর্থাভাবে তাঁর নানান পরিকল্পনা আটকে আছে। বাগদি পাড়ায় তিনটি পুষ্করিণীর মধ্যে একটিকে সংরক্ষিত করতে চান—ওরা রাজীও হয়েছে—কিন্তু সেটাকে বেড়া দিয়ে ঘিরতে হবে, ঢেঁকিকল আর বালতি বানাতে হবে। তিনি তো একই পদ্ধতিতে তাঁর সম্মানদক্ষিণা গ্রহণ করতে পারেন! ধনী গৃহস্থ যদি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ কিছু বেশী দিতে চায়, তাহলে নেবেন না কেন? তাঁর সংসারের প্রয়োজনের জন্য 'একমুঠি' সরিয়ে রেখে বাকিটা সৎকাজে ব্যয় করতে পারবেন। ক্যোঁও-কি কল্ তো ফিন নিকাল্না চাহিয়ে না?

তিজলহাটি থেকে সোঞাই ঘণ্টাখানেকের অশ্বপথ। গ্রামটা ছাড়িয়েই একটা বন। বন নয়, আগাছার জঙ্গল। পতিত জমি। সেটা পার হলেই পৌঁছাবেন দামোদরের তীরে। বাকি পথ দামোদরের বাঁধ বরাবর। অপরাহ্ণ বেলায় বার হয়েছিলেন। সন্ধ্যার পূর্বেই তাঁকে সোঞাই পৌঁছতে হবে। সূর্যাস্তের আগেই বেম্টা বায়েনের চিতায় আগুন দেওয়া হবে। ঐ সময় উপস্থিত থাকা চাই।

শরৎকালের পল্লীদৃশ্য। বাঁ-দিকে দিগন্তবিস্তৃত আউসের ক্ষেত—এখন নাড়া-মুড়ো ভরা। ফসল সব উঠেছে মড়াইয়ে। তিৎপল্লার হলুদ রঙের ফুলে-ফুলে বনলক্ষ্মীর আঁচলে হাজারবুটির নকশা। স্বর্ণলতা কণ্ঠবেষ্টন করে ধরেছে বাব্‌লা গাছটার। তালগাছের মাথায় বাবুইয়ের বাসা ঝুলছে। বনপথটা পাড়ি দিয়ে এবার এসে পৌঁছালেন দামোদরের কিনারে।

ঐ সেই বটগাছটা।

যাতায়াতের পথে এখানে এলে তিনি কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়ান। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন ঐ বিশাল বটগাছটার দিকে। অতি বিশাল, বয়ঃবৃদ্ধ। দীর্ঘ বাহু বিস্তার করে যেন মিলনপ্রয়াসী মহাপাদপ সবাইকে কাছে ডাকছে। অযুত-নিযুত ঝুড়ি নেমেছে তা থেকে। কত বিচিত্র পাখি যে বাসা বেঁধেছে তার আর ইয়ত্তা নেই। এমনকি যাযাবর পাখিরাও ঐ গাছের আকাশছোঁয়া ডালে দু-দণ্ড আশ্রয় নিয়ে যায়—সিল্লি, বেলে হাঁস, মরাল, শামকূট, সারস।

রূপেন্দ্র ঐ জ্ঞানবৃদ্ধ মহাপাদপের মধ্যে যেন একটি রূপককে খুঁজে পান!

ও যেন এই সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতীক।

ও কিছু চায় না, শুধু উন্মুখ, উদার আগ্রহে সে দুইহাতে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায়। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেয়। রৌদ্রতাপদগ্ধকে ছায়া।

বাল্যকালে, মনে আছে—বাবামশায়ের হাত ধরে একবার তিজলহাটিতে যেতে হয়েছিল—কী-যেন সামাজিক নিমন্ত্রণরক্ষা করতে। তখন প্রথম ঐ মহাপাদপকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। সেই প্রথম সাক্ষাৎ। দিগন্তচুম্বী মাঠের মাঝখানে নিঃসঙ্গ একান্তচারী—যেন কোন মুনিঋষি ধ্যান করছেন! নদী কিনার থেকে বহুদূরে, নির্জনে। তার ডালে ডালে ঢিল বাঁধা। নিচে তেল-সিঁদুর মাখানো একটি লৌকিক দেবতা—ষষ্ঠী ঠাকরুণ। সন্তানহীনার দল মানত করে ওর ডালে ঢিল বেঁধে দিয়ে যায়। এই দশ বছরে ফাঁকা মাঠ ছেড়ে কী-জানি কেন সন্ন্যাসী পায়ে পায়ে নদীর দিকে সরে এসেছেন। এখন তিনি দামোদরের কিনার সই-সই। না—মহীরূহ এগিয়ে আসেনি। স্থির, স্থবির তন্নিষ্ঠায় আত্মসমাহিত ঋষি বাল্মীকির মতো ধ্যানমগ্ন। বরং ক্রৌঞ্চ-মিথুনকে হত্যা করতে দামোদর ব্যাধই নাচতে নাচতে ওঁর কাছে এগিয়ে

1742

আসছে। তার শুধু ভাঙার মন্ত্র। প্রতি ভাদ্রেই দশ-বিশ হাত পাড় ভেঙে সে এগিয়ে আসছে ঐ ধ্যানস্তিমিত সন্ন্যাসীর কাছে। লঘুচিত্ত, প্রগল্‌ভ, অন্ধ কুসংস্কারের ফেনিল আবর্তে সে খলখল করে হাসছে! সে যেন এই অবক্ষয়ী হিন্দুসমাজের প্রতীক!

হয়তো আগামী বর্ষাতেই শেষ হয়ে যাবে মহাপাদপের যুগযুগান্তরের সাধনা! মুখ থুবড়ে পড়বে ঐ ফেনিল আবর্তে!

আজ ওঁর হাতে সময় নেই। বৃক্ষদেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন বাঁধ বরাবর। ফুল্লরা গাঁয়ের কাছাকাছি আসতেই কানে গেল একটি দূরাগত আহ্বান: ঠা-উর-মশাই!

অশ্বের গতিবেগ রুদ্ধ করলেন। কে ডাকে?

নজর হল মাঝ-দরিয়ায় ভাসছে একটি জেলে ডিঙি। তিনচারজন পারানি-যাত্রী। তাদেরই একজন ডাকছে তাঁকে।

একটু পরে নৌকাটা তীরে এসে ভিড়ল। ছুটতে ছুটতে ওঁর কাছে এগিয়ে এল প্রহ্লাদ বায়েন। বলে, পেন্নাম ঠাউরমশাই। আপনারে পিছু ডাকলম। কী করি? এই হতচ্ছাড়াকে টুক বুঝায়ে দেন কেনে! ও মুয়ে আগুন না দিলি বেষ্টার যে গতি নাই!

নজর হল দুজন শক্ত করে ধরে রেখেছে কিশোর বিদ্রোহীর দুটি হাত। তার পরনে একটা খেটো কোরা ধুতি। খালি গা। গলায় সেই সুতোটা—নবা বায়েন।

—কী হয়েছে? নবা বাপের মুখাগ্নি করবে না বলছে?

—হুঁ কর্তা! অরে টুক্ বুঝায়ে দেন কেনে!

কী বিড়ম্বনা। নবা বাগেন সারাদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বলেছে, সে বাপের মুখাগ্নি করবে না! কিছুতেই না।

রূপেন্দ্র ঘোড়া থেকে নেমে এলেন। লাগামটা ধরতে দিলেন প্রহ্লাদকে। তাঁর ইঙ্গিতে দুজন জোয়ান, যারা ওকে ধরে রেখেছিল তারা সরে দাঁড়ালো। রূপেন্দ্র দুই হাতে ধরলেন ওর বাহুমূল। সস্নেহে বললেন, কী পাগলামি শুরু করেছিস্ নবা! এ যে ছেলের কর্তব্য। তুই বাপের বড় ছেলে! তুই না করলে কে করবে বল? আয় বাবা, আর মাথা গরম করিস না!

নবা রুখে ওঠে, উয়ারা মায়েরে বিষ দিলেক কেনে?

—বিষ! কী বলছিস!' কে দিয়েছে? তোর মাকে?

—শুধাও কেনে ও-দিগে!

পীতম বায়েন করজোড়ে বললে, না ঠাউর, বিষ লয়। টুক ধুতরা, না ভাঙ কী-যেন উয়ারা খাওয়াই দিলেক!

—ধুতরা, না ভাঙ! যমুনাকে? কেন?

ওরা যে ব্যাখ্যাটা সবিনয়ে দাখিল করে তাতে বজ্রাহত হয়ে গেলেন। এটাই যে প্রথা! সম্পূর্ণ সজ্ঞানে কি কেউ জ্বলন্ত চিতায় উঠতে পারে? সতী হতে পারে?

সতী? যমুনা সহমরণে যাচ্ছে! কেন? কে এ বিধান দিল! যমুনা রাজি হয়েছে? হতেই পারে না। যমুনা তো জানে! যে গোপন তথ্যটা তিনি নিতান্ত ঘটনাচক্রে জানতে পেরেছেন তা তো যমুনারও জানা! যমুনার ক্রোড়ে একটি দেড় বছরের শিশুকন্যা; এবং সে আবার মা হতে

চলেছে! তার গর্ভে ভ্রূণের বয়স তিন মাস!

এপাশে ফিরে দেখলেন। সোঞাইয়ের শ্মশান ঘাটটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যদিও বহুদূরে, তবু ঘাটটা স্পষ্ট দেখা যায়। লোকে লোকারণ্য! ভিড়টা আগেই নজরে পড়েছিল। মনে মনে খুশি হয়েছিলেন—সারা গ্রাম এসেছে শ্মশানে। বেষ্টা অন্ত্যজ বলে উপেক্ষা করেনি। এখন বুঝতে পারেন—না, ওরা বায়েনকে শেষ-সম্মান জানাতে আসেনি, এসেছে সতীদাহ দেখতে। অনেকদিন পরে গাঁয়ে সতী হচ্ছে।

স্পষ্ট শুনতে পেলেন অন্তরীক্ষ থেকে বেষ্টা বায়েনের আর্তি—শালারা মজা লুটতে এয়েছে ঠাউর। পোয়াতি মাগীটা দাউ দাউ করি পুড়বে তাই দ্যাখতি আয়েছে অরা। বুয়েছেন না?

শিউরে উঠলেন রূপেন্দ্র।[১]

—যমুনা কোথায়? —জানতে চাইলেন রূপেন্দ্র।

—তারে অরা শ্মশানঘাটে নে-গেছে।

রূপেন্দ্রর মুষ্টি এবার দৃঢ়তর হল। সবলে ওর বাহুমূল ধরে চললেন, নবা! এ আমি হতে দেব না, কিছুতেই না। কিন্তু একা আমি পারব না রে। বুঝে দেখ—সারা গাঁ এককাট্টা, আর আমি একা! তুইও আয়। দুজনে মিলে···

চোখ দুটো জ্বলে উঠল কিশোরটির। বললে, তয় তুমার ঘোড়া ছুটাই দাও ঠাউর। মুই দৌড়ে তোমার নাগাল ধরব অনে!

বিদ্যুৎবেগে রূপেন্দ্র ছুটিয়ে দিলেন তাঁর অশ্বটিকে।

ঝড়ের বেগে ছুটে চলল নবা বায়েন। পিছন পিছন ওরাও।

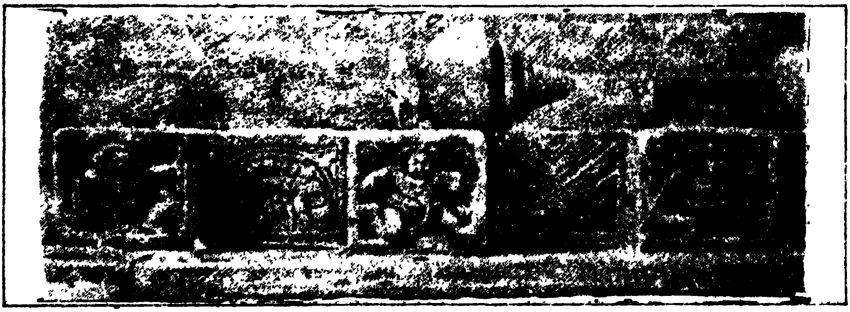

সতী-মন্দিরের ভাস্কর্য, ই· বি· হ্যাভেল সংগৃহীত

[১] অনেকের ধারণা আছে, সেকালে সতী হতেন শুধু বর্ণহিন্দুশ্রেণীর সদ্যোবিধবারা—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ পরিবারের। ধারণাটা ভ্রান্ত। অন্ত্যজ পরিবারের মধ্যেও অনেকে সতী হতেন। গবেষক বিনয়ভূষণ রায় (বাংলায় সতীদাহ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন, পৃ: 120) সংকলিত একটি তথ্যে দেখতে পাচ্ছি, লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী রেকর্ডস্ অনুসারে শুধুমাত্র বর্ধমান জেলাতেই 657টি সতীর ভিতর 455জন ছিলেন বর্ণহিন্দুশ্রেণীর—বাকি 202 জন বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত—জলচল ও জল-অচল: সদগোপ, বাগদি, কৈবর্ত, তাঁতি, তেলী, গোয়ালা, আগুরি, প্রভৃতি। এ পরিসংখ্যান অবশ্য কিছু পরের জমানার। অর্থাৎ আমাদের কাহিনীর নায়িকা—যাঁর কথা আমরা এতক্ষণে প্রায় ভুলতে বসেছি, সেই রূপমঞ্জরী বা হটী বিদ্যালঙ্কারের তিরোধানের পরের দশকের।

ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তকে বলেছিল, 'মড়ার কি জাত থাকে রে?'

বেচারি ইন্দ্রনাথ: দুর্জয় সাহস আর বুকভরা ভালবাসা নিয়ে সে এই বাঙলা দেশে জন্মেছিল শ'দেড়েক বছর পরে। সে আমলে এলে দেখত: মড়ার জাত থাকবে না? কী অসৈরন অশাস্ত্রীয় কতা গো!

শ্মশানঘাটের তিন-দিকে তিনটি চিহ্নিত স্থান। এ-প্রান্তে বামুনদের চিতা—তবে কুলীন-শ্রোত্রিয়-কাপ ছাই হয় একই চিতায়। ও-পাশে কায়স্থ, বৈদ্য, সদগোপ জাতীয় জলচল জাতের। তৃতীয় একটি ছোট্ট এলাকা জল-অচলদের।

ছোট্ট—কারণ চিতায় ওঠার সৌভাগ্য সচরাচর অন্ত্যজ পরিবারভুক্তদের হয় না। তাদের গতি দামোদর। তবে তাদের মধ্যেও ক্বচিৎ কখনো কেউ চিতায় চড়ে—যৌবনবতী চণ্ডাল-কন্যাকেও কখনো কখনো পুড়তে দেখা গেছে, বাবুদের খরচে। নেহাৎ কোনও সদ্য মৃতের সহধর্মিণী সহমরণে যেতে স্বীকৃত হলে তখন তাকে দাহ করার আয়োজনও হয়। এমনকি সে-ক্ষেত্রে সেই অচ্ছুৎ সতীকে সতীমন্দিরে প্রবেশ পর্যন্ত করতে দেওয়া হয়। জল-অচল জাত বলে সমাজ আপত্তি করে না। বুঝে দেখ তোমরা—হিন্দু সমাজ কত উদার! সতীর মাহাত্ম্য যদি লাভ করতে স্বীকৃত হও তাহলে তোমার জন্মদোষ পর্যন্ত ক্ষমা করা হবে।

সতীমন্দির একটি পাকা কোঠা। শ্মশানপ্রান্তে। সতীমায়ের একটা মূর্তি আছে, মূর্তি ঠিক নয়, তেল-সিঁদুরে রাঙা একটি প্রস্তরখণ্ড। চিতায় ওঠার আগে সতী-মা তাতে তেল-সিঁদুরের প্রলেপ দিয়ে যান। এ কক্ষটি সতীর শেষ বিশ্রামস্থল। স্নানান্তে এখানেই তাকে একবস্ত্রা করা হয়। চিতায় উঠতে হবে লালপাড় কোরা শাড়ি পরে। দ্বিতীয় বস্ত্রখণ্ড থাকবে না গায়ে। হাতে লোহার খাড়ু, আর শাঁখা। স্বর্ণালঙ্কারগুলি খুলে রাখা হয়। কপালে কনে-চন্দন, ব্রহ্মতালুটা সিঁদুরে মাখামাখি। গলায় গোড়ে-মালা। পায়ে আলতা। পায়ের পাতার কিনারা ঘেঁষে নয়, পায়ের পাতা দুটিও বারে বারে অলক্তকরাগরঞ্জিত। পাঁচ বাড়ির এয়ো আলতাছাপ সংগ্রহ করে নিয়ে যায় যে। লৌকিক কানুনে এ গৃহাভ্যন্তরে কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সতী-মন্দিরে যখন সদ্যোবিধবাকে নিয়ে আসা হয় তখন তিনি সজ্ঞানে থাকেন না। থাকেন একটা ঘোরের মধ্যে। তার পূর্বেই তাঁকে নানান জাতের 'মন্ত্রঃপূত পবিত্র পানীয়ে' তৈরী করে নেওয়া হয়।

ওঁরা যখন অকুস্থলে পৌঁছালেন তখন শ্মশান-ঘাটে তিলধারণের ঠাঁই নেই। বেষ্টা বায়েনের স্নান সারা। কোরা কাপড় পরে চিতায় শুয়ে আছে সে। যমুনারও স্নানপর্ব সমাপ্ত। এমনকি তাকে লালপাড় নতুন কাপড়খানা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আচ্ছন্নের মতো সে ভূশয্যালীন।

চিতা এতক্ষণ জ্বলে ওঠার কথা।

শিরোমণি মশাই পঞ্জিকা ঘেঁটে বলে রেখেছেন, বেলা চার ঘটিকা বত্রিশ মিনিট গতে শুভ লগ্ন—সূর্যাস্ত-তক্। তার পরেই ত্রিপাদ-দোষ বর্তাবে। শুভকার্য এখনো সম্পন্ন হয়নি, যেহেতু মৃতের জ্যেষ্ঠপুত্রটি ছিল না-পাত্তা। নবা বায়েনকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই একটা সোরগোল উঠল: ঐ তো! ঐ তো....

দু-একজন ছুটে এসে পাকড়াও করল তাকে।

রূপেন্দ্র ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন। জীবন দত্ত এগিয়ে এসে ঘোড়ার লাগামটা ধরল। তার

অপর হাতে কবিরাজ মশায়ের সেই ঔষধপত্রের পুলিন্দা। রূপেন্দ্র প্রশ্ন করেন, যমুনা কোথায়?

—সতীমন্দিরে। জ্ঞান নেই তার।

—জ্ঞান নেই? কী হয়েছে তার?

—ওরা কী যেন খাইয়ে দিয়েছে। মুখ দিয়ে গাঁজলা বার হচ্ছে।

—নাড়ি দেখেছিলে?

—ওরা আমাকে ঢুকতেই দেয়নি।

রূপেন্দ্র ওর হাত থেকে ঔষধের পুলিন্দাটা নিলেন। গট্‌গট্ করে এগিয়ে গেলেন সতীমন্দিরের দিকে। তিন চারটি সোপান পেরিয়ে মন্দিরের পোতায় পৌঁছাতে সবাই দেখতে পেল তাঁকে। মেয়েরা সসঙ্কোচে সরে দাঁড়ায়।

ভিড়ের ভিতর থেকে শিরোমণি হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন, ওটা কী হচ্ছে?

রূপেন্দ্র ঘুরে দাঁড়ালেন, আমাকে বলছেন?

—আবার কাকে? তোমার এতটা বয়স হল তবু জান না—সতী-মন্দিরে কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই! ওটা অন্দরমহল?

রূপেন্দ্রের চোখ দুটি জ্বলে উঠল। কিন্তু কণ্ঠস্বরে সে উত্তাপ সঞ্চারিত হল না। প্রশ্ন করলেন, কোন শাস্ত্রে লেখা আছে বলুন তো?

শিরোমণি অপমানিত বোধ করলেন। বলেন, ঔদ্ধত্যের একটা সীমা থাকা উচিত রূপেন্দ্রনাথ। এটা কোন শাস্ত্রে লেখা নেই—এ হচ্ছে লৌকিক আচার।

—তাহলে শাস্ত্রীয় বিধানটা আমার কাছে শুনে নিন, শিরোমণি কাকা! শাস্ত্রে এ বিষয়ে পরিষ্কার নির্দেশ আছে!

—কোন শাস্ত্র?

—অথর্ববেদ। যার একটি বেদাঙ্গ হচ্ছে আয়ুর্বেদশাস্ত্র। তাতে স্পষ্ট নির্দেশ আছে: কোন আর্ত রোগিণী যদি অন্দরমহলে অসুস্থা হয়ে পড়ে তাহলে একমাত্র ভেষগাচার্যের অধিকার আছে দ্বিতীয়া মহিলার উপস্থিতিতে সেখানে প্রবেশ করার। সতী-মায়ের মন্দিরে আমার অনেক মা এখন আছেন!

শিরোমণি একটি জুৎসই জবাব দেবার আগেই তিনি প্রবেশ করলেন সতীমন্দিরে।

যমুনা চিৎ হয়ে পড়ে আছে ভূশয্যায়। জ্ঞানহীনা। তার মুখ দিয়ে গাঁজলা বার হচ্ছে। একটি প্রৌঢ়া মহিলা—চিনতে পারলেন না উনি, প্রহ্লাদের বউ—মূর্ছিতার মাথাটি কোলে নিয়ে বসে আছেন। যমুনা একবস্ত্রা।

সে যে গর্ভিণী তা বোঝা যায় না। মাতৃত্ব লক্ষণ তার মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠেনি এখনো; কিন্তু ঊর্ধ্বাঙ্গে তা পরিস্ফুট। তার বুকের কাপড় সরানো। একটি শিশু তার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। অচৈতন্য মাতার অমৃতভাণ্ড থেকে অমৃতরস আহরণ করছে। ভেষগাচার্যকে দেখে প্রৌঢ়া তার বুকের উপর আঁচলটা টেনে দিলেন।

রূপেন্দ্র ওর মণিবন্ধে নাড়ির গতি লক্ষ্য করলেন। একটি ঔষধ নিয়ে প্রৌঢ়াকেই বললেন অধরোষ্ঠ উন্মুক্ত করে দিতে। পাঁচফোঁটা ওষুধ দিলেন তার মুখ-বিবরে। তারপর বার হয়ে এলেন।

ভিড়ের পিছন থেকে তারাপ্রসন্ন বলেন, কেমন আছে?

মন্দির-পোতায় দাঁড়িয়ে রূপেন্দ্র বললেন, না, মারাত্মক কিছু না। এখনি জ্ঞান হবে।

দুর্গাচরণ বলেন, হলেই ভাল। অজ্ঞান অবস্থায় সতীকে চিতায় তুলতে নেই। শাস্ত্রে মানা।

রূপেন্দ্র জানতে চাইলেন না: কোন শাস্ত্র।

শিরোমণি বলেন, কিন্তু সময় তো খুব বেশী নাই। সূর্যাস্তের পূর্বে চিতা প্রজ্জ্বলিত না হলে ত্রিপাদ দোষ বর্তাবে।

রূপেন্দ্র স্পষ্টাক্ষরে বলেন, তাহলে আর দেরি করবেন না শিরোমণি কাকা। এখনই দাহকার্য শুরু করে দিন।

—কিন্তু যমুনা.... ?

—না! যমুনা সহমরণে যাবে না।

প্রথমটা সকলে একটু হকচকিয়ে যায়। রূপেন্দ্র তখনো মন্দিরপোতার উপরে দাঁড়িয়ে। সবাই তাঁকে দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে তাঁর কথা।

নন্দ চাটুজ্জে বলেন, বটে! তা বিধানটি কোন পণ্ডিত দিচ্ছেন? তুমি? তোমার আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে লেখা আছে বুঝি?

রূপেন্দ্র তাঁর দিকে ফিরে বললেন, না খুড়ো। আয়ুর্বেদশাস্ত্র নয়। নারদীয় পুরাণের দ্বিতীয়খণ্ডে মহামুনি নারদ বলেছেন, স্বামীর মৃত্যু সময়ে জননীর ক্রোড়ে দুগ্ধপোষ্য শিশু থাকলে অথবা সে গর্ভবতী হয়ে থাকলে কোন সদ্য-বিগতভর্তা স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে পারে না।

শিরোমণি বলেন, এমন আজব কথা তো কখনো শুনিনি।

রূপেন্দ্র বলেন, আমার সংকলনেই নারদীয় পুরাণের পুঁথি আছে। আমি এখনি এনে দেখাচ্ছি।

বাচস্পতি বলেন, দেখাতে হবে না। আমরা জানি। ঋষি বৃহস্পতি নারদোক্ত ঐ সূত্রটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন—যদি অন্য কোনও রমণী ঐ দুগ্ধপোষ্য শিশুর দায়িত্ব গ্রহণ করে সে-ক্ষেত্রে সেই শিশুর জননী সহমরণে যেতে পারে। তুমি যদি চাও, তাহলে সেই নির্দেশটি আমিও দেখাতে পারি। পুঁথিটি আমার সংকলনে আছে। তবে দেবনাগরী হরফে। পড়তে পারবে তো, বাবা?

শিরোমণি এই মুখের মতো জবাবটি শুনে নিজের নাসারন্ধ্রে একটিপ নস্য চালিয়ে দিলেন।

রূপেন্দ্র এ ব্যঙ্গোক্তিতে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। বললেন, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন বাচস্পতি-কাকা। আমি যমুনার দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রসঙ্গ আদৌ তুলিনি।

—তা হলে?

—হেতুটা এই: যমুনা গর্ভবতী! তার জঠরে অজাত সন্তান। বৃহস্পতি ঋষিও কিন্তু গর্ভবতী রমণীকে সহমরণে যেতে নিষেধ করেছেন। তাই না? আপনার সংকলনেই তো পুঁথিটা আছে বললেন।

এ এক নতুন ফ্যাকড়া! নন্দ বলেন, একথা কে বলেছে?

—ঐ যে বললাম—নারদীয় পুরাণ এবং বৃহস্পতির টিকা-টিপ্পনি!

—আহাহা। তা বলছি না। যমুনা যে পোয়াতি সে কথা কে বলছে?

—আমি শ্রীরূপেন্দ্রনাথ দেবশর্মা। এ-কথা ঘটনাচক্রে আমি জানি, যেহেতু বেষ্টা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল তার স্ত্রীকে দেখাতে। জানতো বেষ্টা, আর জানে যমুনা নিজে।

নন্দ এবার রুখে ওঠেন, তাহলে কিছুই প্রমাণ হয় না। তুমি ওকে বাঁচাতে চাইছ—যা মন চায় তাই বলছ। যমুনা তো সজ্ঞানে ওকথা বলবেই—সত্য হোক, মিথ্যা হোক!

রূপেন্দ্রের চোখ দুটি জ্বলে উঠল। বলেন, আপনি আমাকে সর্বসমক্ষে মিথ্যাবাদী বললেন; কিন্তু বলুন তো নন্দ খুড়ো—এতে আপনার কী স্বার্থ? একটা নৃশংস দৃশ্য দেখার জন্য আপনারই বা এত আগ্রহ কিসের?

নন্দ গর্জে উঠেন, মুখ সামলে কথা বল রূপেন!

দুর্গা গাঙ্গুলী এগিয়ে আসেন এবার। বলেন, আহাহা! তুমি মেজাজ খারাপ করছ কেন চাটুজ্জেভায়া? রূপেন্দ্র তো কালকের ছেলে! ও কী জানে এই সনাতন ধর্মের মহিমা? আর ওর একার কতায় তো কিছু হবে না! বেষ্টা বায়েনের রাঁড় সতী হতে চায়, সমাজের কাছে অনুমতি চেয়েছে। সমাজ অনুমতি দিয়েছে, বিধান দিয়েছে। আমার মতো ক্ষুদ্র মনিষ্যির কতা না হয় ছেড়েই দাও, তুমি শিরোমণি-মশাই, বাচস্পতি-মশাই, তর্কালঙ্কার-ভায়া, স্বয়ং ভাদুড়ীমশাই···

রূপেন্দ্র চমকে ওঠেন, ভাদুড়ীমশাই! জেঠামশাই অনুমতি দিয়েছেন! অসম্ভব! তিনি তো চিরকাল সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে। তাঁর পরিবারে····

—সে তাঁর নিজের পরিবারে। যমুনার বেলা তিনি অনুমতি দিয়েছেন।

ভিড়ের পিছন থেকে তারাপ্রসন্ন বলে ওঠেন, না! ভুল বলছেন গাঙ্গুলীকাকা, বাবামশায়ের এতে ঘোরতর আপত্তি। তিনি বেষ্টার শ্মশান-বন্ধু হতে স্বয়ং আসছিলেন, কিন্তু তার স্ত্রী সহমরণে যাচ্ছে শুনে ফিরে গেছেন। তাঁর সম্মতি নিশ্চয় নেই।

দুর্গাচরণ কাষ্ঠ হাসি হেসে বলেন, ও-কথা বললে শুনব কেন বাবা তারাপ্রসন্ন? যমুনা এখন যে লালপাড় কোরা শাড়িখানা পরে আছে, সেটা সে পেল কোথায়? নবাকেই শুধিয়ে দেখ না একবার?

নবা বিহ্বলের মতো এদিকে ওদিকে তাকায়। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারে না।

দুর্গা হেসে বলেন, আমি যে তখন স্বয়ং উপস্থিত। রূপেন্দ্র এখন শাস্তর আওড়াচ্ছে, কিন্তু সেও স্বচক্ষে দেখেছে! ভাদুড়ীমশাই ঐ নবার হাতে লালপাড় শাড়িখানা দিয়ে বললেন, তোর মাকে পরতে দিস্। ঐ তো নবা দাঁড়িয়ে আছে। ওকেই জিজ্ঞেস কর তোমরা।

নন্দ উত্তেজনার বশে স্পর্শদোষের কথা বিস্মৃত হয়ে গেলেন। খপ্ করে চেপে ধরলেন কিশোরটির বাহুমূল। গর্জে ওঠেন, কী রে হতভাগা? বামুনের ঠেঞে মিছে কথা বললে জিব খসে যাবে! বল হারামজাদা—ঐ লালপাড় শাড়িখানা তোরে কে দিয়েল?

নবা ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলে। এই স্বীকৃতির মধ্যে কী আছে তা না বুঝেই!

তারাপ্রসন্ন ততক্ষণে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসেছেন। রোরুদ্যমান কিশোরটিকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলেন, ওকে দিয়ে কবুল করাতে হবে না নন্দকাকা। তখন আমিও সেখানে ছিলাম। শুনুন—বায়েন-বিদায়ের পুঁটিলিটা অনেক আগেই বেঁধে চালচিত্রের পিছনে রাখা হয়েছিল। আপনারা সবাই জানেন—তাই থাকে। বেষ্টা তখনো বেঁচে। না হলে সদ্যোবিধবাকে বাবামশাই অহেতুক কেন ঐ লালপাড় শাড়িখানা দেবেন বলুন?

—অহেতুক নয়, তারা। তার একটিমাত্র হেতু! তোমার বাবা আমাদের মতো অর্বাচীন নন। তিনি পাকামাথার মানুষ। সদ্যোবিধবাকে লালপাড় শাড়ি দান করার অর্থ একটিই—তিনি তির্যক-ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন তাঁর সম্মতি! সহমরণে যাবার নির্দেশ! এ-কথা যদি মেনে না-নাও তারাপ্রসন্ন, তাহলে তার পরিণাম যে সাঙ্ঘাতিক!

রূপেন্দ্র বুঝতে পারেন—দুর্গাচরণ কোন দিকে চলেছেন! নিরুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসতে থাকেন তিনি।

নন্দ ঐ শেষ শব্দটার প্রতিধ্বনি করলেন মাত্র: সাঙ্ঘাতিক?

—নয়? এ যে যারপরনাই সামাজিক অপরাধ! বিধবাকে লালপেড়ে শাড়ি দান করা! বাচস্পতি-মশাইকে জিজ্ঞেস কর, তর্কালঙ্কার-ভায়া জানে! প্রতিটি সমাজপতির পদস্পর্শ করে অপরাধীকে ক্ষমা চাইতে হয়! না, না—সে কিছুতেই হতে পারে না। ভাদুড়ী মশাই বয়োজ্যেষ্ঠ! মানী লোক! তাছাড়া অপরাধ তো তিনি কিছু করেননি যে প্রাচিত্তির করতে হবে! তারা ছেলেমানুষ—ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারেনি, এই যা?

নন্দ উচ্ছ্বসিত! এতো দারুণ একটা ফন্দি বার করেছে দুর্গাদা! দাবা ধরে ঘোড়ার কিস্তি! বাহারে বাহা! তিনি তারাপ্রসন্নের দিকে ফিরে বলেন, তুমি কী বলছ তারা? ভাদুড়ীমশাই বেষ্টার রাঁড়কে সহমরণে যাবার অনুমতি দেননি? সেজন্যই ফিরে গেছেন? তাই বলছ এখনো?

দুর্গা গাঙ্গুলী ধুরন্ধর—জানেন, লেবু কতটুকু কচলাতে হয়। দুর্গা ধমক দেন নন্দকে, তুমি থামতো নন্দভায়া! তিনি কীজন্যে ফিরে গেছেন, তা কি বোঝ না? তাঁর মনটা নরম! এই পুণ্যকর্মটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখার মতো মনের জোর নেই। তা তো আমারও থাকে না। বুকের মধ্যে হু-হু করে জ্বলতে থাকে! কিন্তু কী করব? সইতে হয়! সামাজিক দায়!

শিরোমণি বলেন, মোটমাট কী সিদ্ধান্ত হল তাইলে?

দুর্গা নিদেন হাঁকেন, ঐ তো বল্লাম! বেষ্টার রাঁড় সহমরণে যাবার অনুমতি চেয়েছে। সমাজ তা অনুমোদন করেছে। মায় স্বয়ং ভূস্বামী সমাজের তরফ থেকে তাকে সহমরণের বস্ত্রখণ্ডটি দান করেছেন। এখন শুভস্য শীঘ্রম! মেয়েটি গর্ভবতী বলে রূপেন একটা আষাঢ়ে আপত্তি তুলেছিল—পঞ্চজন সেটাও বিচার করে দেখেছেন। তার কোন প্রমাণ নেই, সাক্ষী নেই···

কোথাও কিছু নেই হঠাৎ মন্দির-পোতা থেকে শোনা গেল প্রতিবাদ: না! আছে! সকলেই সেদিকে ফেরে। কণ্ঠস্বর মহিলার। কাংসবিনিন্দিত। সবাই দেখতে পায় সতী-মন্দিরের পোতায় দাঁড়িয়ে আছেন জগু-ঠাকরুণ। মাথায় আধ-ঘোমটা। সকলে সেদিকে ফিরলে জগুঠাক্‌রুণ বলে ওঠেন, এর কথাটুকু শুনে আপনারা শেষ রায় দিন!

শিরোমণি বলেন 'এর কথা' মানে?

—এই যে আমাদের রেসো!

দেখা গেল, জগু-ঠাকুরুণের পাঁজর ঘেঁষে যুক্তকরে দাঁড়িয়ে আছে এক অবগুণ্ঠনবতী। ঘোমটা এতবড় যে, মুখখানা দেখা যাচ্ছে না।

নন্দ বলেন, রেসো! রেসো কে?

দুর্গাচরণ কিন্তু চিনতে পেরেছেন। ঐ মেয়েটি রেসো-দাই—রাসমণি। সোঞাই গাঁয়ের একমাত্র ধাত্রী। দিনসাতেক আগেও সে মৃন্ময়ীকে দেখে এসেছে। অতি বিচক্ষণ ধাত্রী। ধন্বন্তরি

পারেনি, কিন্তু সে মাগী মৃন্ময়ীর পেটে কান পেতে শুনে ওঁকে বলে দিয়েছে—ছেলেই আছে মৃন্ময়ীর গর্ভে, মেয়ে নয়। মৃন্ময়ী সহমরণ দেখতে আসেনি। পোয়াতি মেয়েদের দেখতে নেই। শাস্তরে মানা।

দুর্গা তাড়াতাড়ি বলেন, হচ্ছে সমাজের বিচার, তার ভিৎরি রাসু-দাই আবার কী বলবে?

জগু রাসমণিকে একটা খোঁচা মেরে বলেন, বল্ না মুখপুড়ি! আ-হাহা! তোর সরম দেখে বাঁচি না!

রাসমণি আরও কুঁকড়ে যায়। লজ্জায় নয়, ভয়ে। সোনার নাকছাবি খোয়াবার ভয়ে। গাঙ্গুলীমশাই যে তাকে খুশি হয়ে বলেছেন—সত্যিই যদি নিরাপদে ওর পেট থেকে ছেলে বার করতে পারিস....

রাসমণি বুঝে নিয়েছে, গোপন কথাটা বেমক্কা জগু-ঠাকুরুণকে বলে ফেলা বোকামি হয়ে গেছে তার। গাঙ্গুলীমশাই চটে যাবেন! গেল—নাকছাবিটে!

কিন্তু জগুঠাকুরুণ নাছোড়বান্দা। হাজার হোক একবগ্গার পিসি তো তিনি! তাই উচ্চকণ্ঠে বাঙ্ময় করে তোলেন রাসুর অনুক্ত এজাহারটা: রেসো বলছে, কতাটা সেও জানে—সেও অবাগীটারে দেকেছে! রুপো ভুল বলেনি কিছু! হ্যাঁ, যমুনা তিনমাসের পোয়াতি!

শিরোমণির মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে ওঠে। শুভকার্যে ক্রমাগত বাধা সৃষ্টি হলে কারই বা মাথার ঠিক থাকে! খিঁচিয়ে ওঠেন, ন্যাও ঠেলা! চোরের সাক্ষী এবার গাঁটকাটা!

একটা থমথমে ভাব! সুযোগ বুঝে যুক্তকরে এগিয়ে আসে পেল্লাদ বায়েন। সবিনয়ে বলে, পঞ্চজনা উপস্থিত আছেন। তাইলে এই অধমের কতাটুকুও নিবেদন করতি দেন আপনকার ছিচরণে—

গর্জে ওঠেন নন্দ। প্রহ্লাদ তাঁর খাতক। বলেন, তুই চুপ-যা, হারামজাদা! এবার কি বায়েন-পোর কাছে শাস্তর-ব্যাখ্যা শুনতে হবে নাকি?

প্রহ্লাদ সভয়ে একপা পিছিয়ে যায়। তার হঠাৎ মনে পড়ে যায়, শ্রাবণ-কিস্তির সুদটা এখনো দেওয়া হয়নি। কিন্তু পিছন থেকেও হুড়ো খেতে হল তাকে। কে যেন বজ্রমুষ্টিতে ওর গর্দানা পাকড়ে সামনের দিকে ঠেলে দেয়। পিছন ফিরে দেখে, ভীমা। প্রহ্লাদ হকচকিয়ে যায়—পিছুলি ভেড়োর ভেড়ো, এগুলি নিব্বংশের বেটা!

ভীমা ওকে ঠেলে সরিয়ে নিজেই এগিয়ে এল। বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠাউর! শাস্তর ব্যাক্খা টুক্ ঐ বায়েন-পোর কাছ থিকেই শুনতে হবে।

ভীমা বাগদিকে ধমকে থামানো যায় না—তা হোক না কেন সে জল-অচল।

নন্দ ঢোক গিলে বলেন, মানে?

ভীমা এবার শাঙ্করভাষ্য দাখিল করে: শোনেন! পেল্লাদ হতিছে বায়েনপাড়ার মাতব্বর! যারে পোড়ায়ে মারতি চান সেই আবাগী বামুন-কায়েত লয়, বায়েন! হক্ কতা কি না? তা, কুন বায়েন-মাগী সতী হবে-কি-হবেনি সি-কতাটো বলার হক আছে পেল্লাদের। বল রে, পেল্লাদ! তুর যা প্রাণ চায় তুই পঞ্চজনার ছিচরণে নিভ্যয়ে নিবেদন কর! মুই হেথা খাড়ায়ে আছি।

ভয়ে-কি-নির্ভয়ে বোঝা গেল না, কিন্তু প্রহ্লাদ যেন মরিয়া হয়ে এবার এক-দামোদর কথা হড়বড়িয়ে বলে গেল: ব্যাবারডা হতিছে অ্যাই—মোরা তো জানতম না যে, যমুনীর প্যাটে

বাচ্চা আছে? যম্‌নী রাজি হয়েল, হক কতা, ল্যায্য কতা! কিন্তুক বাচ্ছাডা? সে বেটা তো বেষ্টার ষাঁড় লয়! তাইলে? সে ক্যান পুড়ি মরবে! কতাটো বুঝায়ে দ্যান, আজ্ঞে। শাস্তরে কী বলিচে?

নীরন্ধ্র অন্ধকারে এবার আশার আলোক দেখতে পেলেন রূপেন্দ্র! বলে ওঠেন, তুমি ঠিক কথা বলেছ প্রহ্লাদ! বায়েন-পাড়ার মোড়লের মতো কথাটা বলেছ! শাস্তর যমুনাকে এ ক্ষেত্রে সতী হতে মানা করছে!

ভীমা বলে ওঠে, ব্যাস্ ব্যাস্! একবগ্গা ঠাউর বিধান দি-দিল! আর কুন কতা লয়! আয় রে লবা, বাপের মুখে নুড়োডা জ্বালি দে যা! আপনেও আসেন শিরোমণি ঠাউর। কীসব অং বং মন্তর আছে পড়ায়ে দে যান! যমুনা সতী হবেক নাই!

যেন মুর্শিদাবাদী নবাবী ফতোয়া নয়, খাশ দিল্লীর বাদশাহী ফর্মান!

শিরোমণি ইতস্তত করেন।

দুর্গা একবার শেষ চেষ্টা করেন : কাজটা ভাল করলি না ভীমা! চিতাভ্রষ্ট হলে তার কী দুর্গতি হয় জানিস?

ঈশেন ভুল বুঝল। উনি যে পারলৌকিক দুর্গতির কথা বলতে চাইছেন তা ওর মোটা মাথায় ঢোকেনি। পরলোক-ফরলোক ও বেটা বোঝে না—ছোটলোক তো?—চেনে শুধু ইহলোকের লেনদেনটুকু। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, কারে দুগ্যাতির ভয় দেখাইছেন ঠাউর? খুড়োরে? বলি, করবেনডা কী! ভীটে-মাটির থনে উচ্ছিদ? করেন, তাই করেন! খুড়ো-ভাইপো ফিরে-ফিত্তি ডাকাত হই যাব নে? ভুখা মরব না! দুজ্জনে বলে, আপনের সিন্দুকে নাকি রূপার ট্যাহা নাই—বেবাক মোহর! তা চান তো আপনের ভিটে থিকেই 'লতুন-খেল'-এর বউনিটা শুরু করব অনে!....আয় রে লবা!

দুর্গাচরণের হাত-পা পেটের ভিতর সেঁদিয়ে যাবার উপক্রম! এদিকে বর্গীর হাঙ্গামা, ওদিকে নবাবের নতুন 'আবওয়াব', তদুপরি মহাষ্টমীতে নাকি মোহান্ত-মহারাজের ফৌজ আসবে! তার উপর এই সর্বের মধ্যে যদি ভূতের কেত্তন শুরু হয়ে যায়, তাহলে তাঁর মতো সম্পন্ন গৃহস্থ দাঁড়ায় কোথায়?

ভিড়টা ততক্ষণে পাতলা হয়ে যেতে শুরু করেছে। সবাই বুঝে নিয়েছে ভাঙ-ধুতুরা খাইয়েও মেয়েটিকে কব্জা করা গেল না।

রূপেন্দ্র খুশিয়াল! মহাষষ্ঠীর দিনটি সার্থক। ধর্মরক্ষা করা গেছে। প্রহ্লাদ, ভীমা, ঈশেন সবাই যদি ওঁকে সাহায্য না করত, রুখে না দাঁড়াতো....

হঠাৎ যেন স্পষ্ট শুনতে পেলেন অলক্ষ্যলোক থেকে একটা প্রতিবাদ : ইটা কি বুলছেন ঠাউর! গোটা গাঁয়ের মহড়া নিল তো ঐ পুঁচকেটা! বোয়েচেন না?

বেষ্টা বায়েনের কণ্ঠস্বর! রূপেন্দ্র মনে মনে প্রতিপ্রশ্ন করেন, কার কথা বলছ বেষ্টা? —যম্‌নীর প্যাটে আমার বাচ্চাডা! বেটা না জম্মেই শিঙে ফুঁকি দিল! বোয়েচেন না?

* * *

মহাসপ্তমী। পরদিন। রূপেন্দ্র একা বসে আছেন তাঁর দাওয়ায়। ভোরবেলাতেই পিসি আর কাত্যু চলে গেছে পূজাবাড়িতে। সেখানে কত কাজ! পাঁচ-বাড়ির মেয়েরাই তা করে হাতে হাতে।

দাওয়ায় বসে রূপেন্দ্র গত দুদিনের কথাই চিন্তা করছিলেন। কী ঘটনাবহুল দুটি দিন! পঞ্চমীতে হল বর্গীর আক্রমণ—গাঁয়ের তরফে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ—একটি প্রাণ। আর গতকাল লড়াই করতে হল গ্রাম্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে—এবার রক্ষা পেল একটি প্রাণ। না, একটি নয়, দুটি! লাভক্ষতির হিসাব নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত।

নজর পড়ল সামনের আরোগ্যশালার নবনির্মিত কুটিরগুলির দিকে। তিনখানি ঘরই ফাঁকা। নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে জেঠামশাই কুসুমমঞ্জরীকে অপসারিত করেছেন তাঁর প্রাসাদে। তার সেই মাসিটিও গেছে। সেদিকে নজর পড়তেই মনে পড়ে গেল—'ছোট হুজুর' হুম্‌কি দিয়ে গেছে, মহাষ্টমীতে সে ফিরে আসবে। এবার সসৈন্য। বন্দুকধারী। বলে গেছে, এবার তার সঙ্গে থাকবে হাতি আর কামান। সাবধানবাণী শুনিয়ে গেছে: সোঞাই গ্রামে সে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে চায় না—যদি না ঐ গোঁয়ারগুলো তাদের তীরধনুক নিয়ে কেরামতি দেখাতে আসে! কথাটা নিয়ে ভীমা বা ঈশেনের সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি। সত্যই যদি মোহন্ত মহারাজ এ জাতীয় ব্যবস্থা নিতে চায়, তাহলে কী হবে ওঁদের রণকৌশল? জেঠামশাই অবশ্য বলেছেন, মোহন্ত-মহারাজের এ জাতীয় দুর্মতি হবে না। যতক্ষণ না ভাস্কর পণ্ডিত তার 'চাল' দিচ্ছে ততক্ষণ মোহান্তের 'দান' নেই। তাকে অপেক্ষা করতে হবে। সমঝে নিতে হবে, ভাস্কর পন্থ কোন দিকে যায়—বর্ধমান না মুর্শিদাবাদ। যে পথেই যাক বর্গীদের পথেই পড়বে রূপনগর। দাঁইহাট থেকে মুর্শিদাবাদ যেতে হলে ভাস্করের গতিমুখ উত্তরে। বর্ধমান আসতে হলে তার গতিমুখ দক্ষিণ-পশ্চিমে, মঙ্গলকোট ভাতার হয়ে। কিন্তু দুটি পথই কাটোয়াকে ছুঁয়ে—কেতুগ্রাম মৌজায়। সেই যেখানে অজয় নদ বিলীন হয়েছে ভাগীরথীতে। আর কাটোয়া থেকে রূপনগর তো আধ বেলার অশ্বপথ! সুতরাং ভাস্কর পন্থ-এর পরবর্তী পদক্ষেপের সঙ্গে মোহন্ত-মহারাজের আচরণ সম্পৃক্ত।

নবাব আলিবর্দী গলদঘর্ম। বয়স সত্তর ছুঁই-ছুঁই। বিহারের সহকারী সুবেদার আলিবর্দী যেদিন তাঁর আজিমাবাদ (পাটনা) প্রাসাদ ত্যাগ করে রাজমহলের পথে রওনা হয়েছিলেন সরফরাজ খাঁর হাত থেকে নবাবী ছিনিয়ে নিতে, সেদিন থেকেই তাঁর আর স্বস্তি নেই। গিরিয়া প্রান্তরে মুখোমুখি হয়েছিল দুই ভাগ্যান্বেষী—একদিকে বিহারের সহকারী সুবেদার আলিবর্দী, অপরদিকে সুবে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সরফরাজ খাঁ। বেচারি সরফরাজ—সুজাউদ্দীনের অযোগ্য পুত্র—সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দেওয়ার সৌভাগ্যও হল না তার। গভীর রাত্রে অতর্কিত আক্রমণে নিহত হল সরফরাজ। আলিবর্দী সগৌরবে এসে পৌঁছাল মুর্শিদাবাদে। চিহিল সাতুনে' সাড়ম্বরে সুবেদার হয়ে বসল।

কিন্তু সেদিন থেকেই নবাবী করার খেসারত দিতে শুরু করল সে। প্রথমেই দিল্লীর অপদার্থ বাদশাহ্ মহম্মদ শাহ্‌কে প্রচুর উৎকোচ দিয়ে সংগ্রহ করতে হল বাদশাহী ফরমান। তারপর সরফরাজের অনুতপ্ত পরিবারবর্গকে দিতে হল যথেষ্ট অর্থ-উপঢৌকন—প্রতিকূল শক্তিকে

করায়ত্ত করতে। আলিবর্দীও মুর্শিদকুলীর মতো একপত্নিক—সংযমী পুরুষ। তাঁর তিন কন্যা—পুত্রসন্তান নাই। তিন কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজি মহম্মদের তিন পুত্রের। বড় জামাই ঘসেটি বেগমের স্বামী হ'ল ঢাকার, মধ্যম জামাতা সৈয়দ আহম্মদ হল উড়িষ্যার আর কনিষ্ঠ জামাতা সিরাজদ্দৌলার পিতা জৈনউদ্দীন হল বিহারের শাসনকর্তা। তিন জামাইকে তিন খুঁটি বানিয়ে চুটিয়ে শুরু করলেন নবাবী।

শুরুতেই বিপত্তি। মধ্যম জামাতা বাবাজীবন গদি লাভ করেই শুরু করে দিল নানান জাতের অত্যাচার। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা বিদ্রোহ করল। জামাতা বাবাজীবন কটকে কারারুদ্ধ হল অচিরে।

দুঃসংবাদ পেয়ে বৃদ্ধ আলিবর্দীকে দৌড়াতে হল কলিঙ্গ দেশে। বিদ্রোহীদের শায়েস্তা ও দামাদকে কারামুক্ত করে তিনি ফিরে আসছিলেন মুর্শিদাবাদে। পথে, বালেশ্বরে পৌঁছে পেলেন অন্য এক দুঃসংবাদ। মারাঠা বর্গীর দল আবার ফিরে এসেছে। পূর্ববৎসর দাঁইহাটিতে যে কাফেরটাকে অতর্কিত আক্রমণে বিধ্বস্ত করেছিলেন, সেই ভাস্কর পণ্ডিতই প্রত্যাবর্তন করেছে—লুটতরাজ শুরু করেছে ভাগীরথীর পশ্চিম পারের নানান গ্রামে।

আলিবর্দী দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছেন মুর্শিদাবাদের দিকে।

যে মহাসপ্তমীর ঘাটে আমাদের কাহিনীর নৌকা এখন নোঙর গেড়েছে তখনো আলিবর্দী মুর্শিদাবাদ পৌঁছাতে পারেননি।

—সোনাদা!

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সোজা হয়ে উঠে বসেন। শুধু কণ্ঠস্বর নয়, সম্বোধনটিও যে একান্ত চিহ্নিত। নজর হল—মুক্তদ্বার পথে একটি অপূর্ব নারী মূর্তি। পরিধানে আকাশী-নীল মুর্শিদাবাদী, ভ্রূমধ্যে সিন্দূর বিন্দু, চরণপ্রান্তে অলক্তক-রেখা, চুড়ো করে বাঁধা খোঁপায় একটি লফুলের মালা, চোখে কজ্জল!

বলেন, মীনু! তুমি! এমন অসময়ে? কার সঙ্গে এসেছ?

মৃন্ময়ী হাসল। দেখা গেল তার সঙ্গে আছে একটি বালক। তাকে দেখিয়ে বললে, এই নিতুর সঙ্গে। নিতাই। আমার দেওর-পো। ভিতরে আসব?

মনে পড়ে গেল কবির বর্ণনা!

> "আদ্রার্দ্রচন্দন কুচার্পিত সূত্রহারঃ
> সীমন্তচুম্বিসিচয় স্ফূটবাহুমূলঃ।
> দূর্বাগ্রকাণ্ড রুচিবাস্তগুরূপভোগাদ্
> গৌড়াঙ্গনাসু চিরমেষ চকাস্ত বেষঃ।।"[১]

—কী দেখছেন অমন করে?

—কিছু নয়। মানে, কাতু তো বাড়িতে নেই। পিসিমাও নেই।

—জানি। আমি পূজাবাড়ি থেকে আসছি। তাঁদের সেখানে দেখে এলাম যে। তাই টুক্ করে পালিয়ে এসেছি। ভাবলাম, এখন এলে নির্জনে আপনার দেখা পাব!

---

[১] "বক্ষে আর্দ্র-চন্দন, কণ্ঠে সূত্রহার, সীমন্ত পর্যন্ত আনত অবগুণ্ঠন, অনাবৃত বাহুমূল, বরঅঙ্গে অগুরু প্রসাধনের সৌরভ, দেহ-বর্ণ যেন নবদূর্বাদলের মতো শ্যাম—ইহাই গৌড়দেশবাসিনীর সজ্জা।"

'নির্জনে দেখা পাব!' —রূপেন্দ্রনাথ ঘামতে শুরু করেন। মৃন্ময়ী সেটা লক্ষ্য করল। আবার হেসে বলে, আমি বাঘ না ভালুক? অনেকটা হেঁটে এসেছি। একটু বসব?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। বসবে বইকি! বস। —নিজে উঠে দাঁড়ান চৌকি ছেড়ে।

মৃন্ময়ী চৌকির তলা থেকে একটা কুশাসন টেনে নিয়ে বসে। মাটিতেই। বলে, না, না, আপনি উঠে দাঁড়ালেন কেন? আমি 'একাসনে' বসার কথা বলিনি, সোনাদা!

রূপেন্দ্র বুঝে উঠতে পারেন না, সেই লাজুক মেয়েটি হঠাৎ কী করে আজ এমন প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছে। পুনরায় উপবেশন করতে করতে বলেন, তুমি আমাকে 'সোনাদা' ডেক না!

মৃন্ময়ী সাত-সকালেই পান খেয়েছে। ঠোঁট দুটি রাঙা। সেই রাঙা ঠোঁটে ফুটে উঠল বিচিত্র হাসির আলিম্পন। বললে, নিতু সোনা-রূপার ফারাক বোঝে না! জানে না, কোনটা বেশি দামী। আমার মতই বোকা! সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেয়!

—নিতুর কথা বল্‌ছি না। কে কোথা থেকে শুনে ভুল বুঝবে।

—নিতু ছাড়া ঘরে তো শুধু আপনি! আপনি তো কখনো ভুল করেন না, ভুল বোঝেন না! তা বেশ। সাবেক নামে যদি না ডাকি, তাহলে নতুন কী নামে ডাকব, গৌর?

এতক্ষণে বুঝতে পারেন—কেন আজ মৃন্ময়ী এত প্রগল্‌ভ। কাতুর কাছ থেকে অনেক কিছু জেনেছে। অনেক মুখরোচক কেচ্ছা শুনেছে। নিজের মতো তার অর্থ বানিয়ে নিয়ে এসেছে তাঁকে খোঁচা দিতে। প্রসঙ্গটা বদলে তাই বলেন, তুমি কি বিশেষ কোন কথা বলতে এসেছ আমাকে?

—হ্যাঁ! একটা কথা জানতে এসেছি। আর সেই জন্যই এই নির্জন সাক্ষাৎ। বিশ্বাস করুন, আমার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই। বলুন তো—কেন আপনি এভাবে আমার সঙ্গে শত্রুতা করছেন?

—শত্রুতা করছি! আমি? তোমার সঙ্গে? মানে? কে বললে?

—কে আবার বলবে? আমি তো নিজের কানেই শুনলাম সেদিন। আপনি আপনার পূজ্যপাদ খুড়ো-মশাইকে বললেন না—রাতারাতি দশ-বিশটা খুড়িমা ঘরে আনতে?

রূপেন্দ্র একটু অবাক হয়ে যান। মেয়েটি কী চায়? এমন গায়ে-পড়ে ঝগড়া করতে এসেছে কেন? বলেন, বলেছি। কিন্তু কী কথার জবাবে, কেন বলেছি, তাও তো তুমি জান মৃন্ময়ী। এবং একথাও জান যে, আমার সে তিরস্কার শুনে গাঙ্গুলীখুড়ো তখনই এককুড়ি টোপর কিনতে ছোটেননি।

—কিন্তু একটা টোপর যে তিনি কিনতে ছুটেছেন তা কি আপনি জানেন না?

এবার রীতিমতো অবাক হয়ে যান। এসব কী বলছে ও! দুর্গা গাঙ্গুলী কি সত্যই বিবাহ করতে চাইছেন! এই বয়সে? চতুর্থা পত্নী যখন আসন্নপ্রসবা? না কি এটাও ঐ মৃন্ময়ীর মনগড়া একটা আশঙ্কা। বলেন, বিশ্বাস কর মৃন্ময়ী—আমি কিছুই জানি না। তুমি কী বলছ, তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। দুর্গাখুড়ো কি সত্যই আবার বিবাহ করার কথা ভাবছেন? পাত্রী কোথায়?

মৃন্ময়ী এতক্ষণে অধোবদন হল। প্রগল্‌ভতা ত্যাগ করে এক নিশ্বাসে অনেকগুলো কথা বলে গেল:

জেঠামশাই, অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রনারায়ণ নাকি বলেছেন—রূপনগরের ঐ মেয়েটির দায়িত্ব তিনি নিতে পারবেন না, যদি না সে এই সোঞাই গাঁয়ের কুলবধূ হয়। তা তিনি সত্যিই পারেন না। তার সেই কাকামশাই যদি রূপনগর থেকে ফিরে এসে ভাইঝিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তাহলে তাকে প্রত্যাখ্যান করার তাঁর না আছে নৈতিক অধিকার না সামাজিক। অথচ মেয়েটি তার কাকার কাছে ফিরে যেতে চায় না। জানে, তার অর্থ আবার ঐ পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত হওয়া। ভাদুড়ীমশাই তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেই রূপনগরী 'রাইরানী'কে অবিলম্বে সোঞাই গাঁয়ের বধূতে রূপান্তরিতা করতে হবে। রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীন সুপাত্র চাই—যে বিনাপণে ঐ অনাথাকে পায়ে ঠাঁই দেবে। মৃন্ময়ী নাকি এইমাত্র পূজাবাড়ির অন্দরমহলে শুনে এসেছে—জেঠামশায়ের দুটি সুপাত্রের কথা মনে হয়েছে—নন্দ চাটুজ্জে, অথবা দুর্গা গাঙ্গুলী। দুজনেই কুলীন, দুজনেই স্বগোত্র নন, এবং দুজনেই হয়তো বিনাপণে বিবাহে স্বীকৃত হবেন। যদিও নন্দ চাটুজ্জের বয়স কম, তবু জেঠামশায়ের মতে দুর্গা গাঙ্গুলী পাত্র হিসাবে অধিকতর বাঞ্ছনীয়। দুজনেরই তিন-চারটি ধর্মপত্নী। কিন্তু গাঙ্গুলী-মশায়ের মাত্র একটি পত্নীই বর্তমান, বাকি অতীত। নন্দের তিন ঘরণীই বর্তমান। তদুপরি তাঁর নামে সৌদামিনী সংক্রান্ত কিছু কলঙ্কও আছে। মৃন্ময়ীর আশঙ্কা—প্রস্তাব উত্থাপন মাত্র সেই ছয়-দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পাত্র সলজ্জে স্বীকৃত হয়ে যাবেন। এক: জনশ্রুতি—মেয়েটি অসামান্যা রূপবতী! রূপনগরের নির্বাচিতা 'রাইরানী'! দুই: গাঙ্গুলী-মশায়ের চিকিৎসক পরামর্শ দিয়েছেন—অবিলম্বে তিনি গোটাকতক বিবাহ করলে তাঁর অপুত্রক অবস্থায় তিরোহিত হওয়ার আশঙ্কাটা কমবে!

রূপেন্দ্রনাথ বজ্রাহত হয়ে গেলেন। সম্মুখে উপস্থিত মেয়েটিকে যেন আর দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁর মনের পটে ভেসে উঠেছে নেপথ্য নায়িকার আলেখ্য!

দুজনেই নিশ্চুপ বসে আছেন মুখোমুখি।

—জেঠিমা! বাড়ি যাবে না? —নিতু তাগাদা দেয়।

—যাব সোনা! না. ভুল হল! 'সোনা' বলতে নেই! আয়, মোয়া খাবি?

নিতুকে নিয়ে সে ভিতরে চলে যায়। ভাঁড়ার ঘরে কোন বেতের ঝাঁপিতে মুড়ির মোয়া থাকে তা ওর জানা। এ-বাড়ির প্রতিটি অন্ধিসন্ধি তার নখদর্পণে। রূপেন্দ্র নিশ্চুপ বসে থাকেন। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ! তাঁর মনে পড়ে যাচ্ছে কুসুমমঞ্জরীর সঙ্গে বিদায়কালীন সাক্ষাতের কথা। জমিদার-বাড়িতে রওনা হবার পূর্বে সে কাতুকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিল রূপেন্দ্রকে। পূজার 'পার্বণী' চেয়েছিল অসঙ্কোচে—তার প্রাপ্য যেটা—রূপেন্দ্র প্রতিশ্রুত। দিতে হয়েছিল তাঁকে—ওর হাতে: তীব্র কালকূট!

মৃন্ময়ী ফিরে এল নিতুকে নিয়ে। একটা রেকাবিতে কিছু মুড়ির মোয়া। নিতু থাপন জুড়ে বসে টুকিয়ে টুকিয়ে মোয়া খেতে থাকে। মৃন্ময়ী বলে, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব রুপোদা। সত্যি করে বলবেন?

রূপেন্দ্রনাথ নির্বাক ওর চোখের দিকে তাকালেন।

মৃন্ময়ী ম্লান হাসল। বললে, মাপ চাইছি! মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়। সংসারী মানুষ তো! আপনি যে মিছে কথা বলতে পারেন না, সেটা মনে থাকে না।

—কিন্তু প্রশ্নটা কী?

—ঐ কুসুমমঞ্জরী আপনার পরিচয় পাওয়ার আগেই, প্রথম দিনেই, আপনার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল—'এতক্ষণে এলে? এত দেরী হল যে!' বলেছিল?

বুঝতে পারেন। কাতুর কাছে শুনেছে। কিন্তু কাতু তো জানে, মেয়েটি নিতান্ত বিকারের ঘোরে ও-কথা বলেছে। সে-কথাটা কি বুঝিয়ে দেয়নি? নাকি, সব জেনে-বুঝেও মৃন্ময়ী এ-প্রশ্ন তুলেছে? অন্য কী একটা হেতুতে তার বুকটা টন্‌টনিয়ে উঠছে বলে! হয় তো ঠিক ঐ কটা কথাই সে নিজে বলতে চেয়েছিল—রূপেন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন গুরুগৃহে বাস করে যখন প্রথম গ্রামে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন—পাশের বাড়ির সেই এককোঁটা মেয়েটা—পীতুকাকার আদরের মীনু—হঠাৎ হয়ে গেছে তার পরমপূজ্য 'খুড়িমা'! আহা! তখন কেন ওর ঘোর বিকার হয়নি! কেন তখন সে প্রলাপ বকার সৌভাগ্য লাভ করেনি? তাহলে তা লোকলজ্জাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সেও তার সোনাদার গলাটা জড়িয়ে ধরে হু-হু করে উঠতে পারত: 'এতদিনে এলে? এত দেরী হল যে?'

—থাক! আপনাকে বলতে হবে না। আমি জবাব পেয়ে গেছি। কাতু মিছে কথা বলেনি!

রূপেন্দ্রনাথ বলেন, না, কাতু মিছে কথা বলেনি। কিন্তু এ-কথাও কি সে বলেনি যে, মঞ্জু সেদিন নিতান্ত বিকারের ঘোরে ...

—মঞ্জু! ওর নাম তো 'কুসুমমঞ্জরী'?

—হ্যাঁ, তাই! মানে ....

—থাক্ রূপেন্দ্রদা! এ কিছু সংস্কৃত শোলক নয় যে, অন্বয়-ব্যাখ্যা ছাড়া আমি 'মানে' বুঝব না। কিন্তু যে-কথা আমি জানতে এসেছি তার জবাব তো এখনো দিলেন না?

—তুমি তো কোন প্রশ্ন করনি মৃন্ময়ী। একটা তথ্য পরিবেশন করেছ মাত্র। হ্যাঁ, স্বীকার করছি, সেটা অতি বিচিত্র তথ্য—আমি তার বিন্দু-বিসর্গও জানতাম না। ও হ্যাঁ, সেই প্রসঙ্গে তুমি একটি প্রশ্নও পেশ করেছিলে—'কেন আমি জেনেশুনে তোমার শত্রুতা করছি'। তার জবাবটা তোমার জানা। এ অভিযোগ তোমার হতাশা থেকে, বেদনা থেকে—এ তোমার দুরন্ত অভিমানের তির্যক প্রকাশ! আমি জানি না, তুমি নিজেও হয়তো জান না—সে অভিমানের পাত্র কতটুকু আমি আর কতটুকু দুর্গা-খুড়ো। কিন্তু তুমি সন্দেহাতীতভাবে জান—তাঁকে আমি বিবাহ করার পরামর্শ সেদিন দিইনি। দিয়েছিলাম—ধিক্কার!

মৃন্ময়ী ধৈর্য ধরে সবটা শুনল। বলল, আমারই ভুল। না, প্রশ্নটা এখনো পেশ করিনি। এখন করছি—আপনি কি দয়া করে আমাকে উদ্ধার করবেন? 'দয়া করে'! আমার প্রতি 'দয়া'! তার প্রতি নয়।

রূপেন্দ্র বলেন, আমি তোমার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারছি না মৃন্ময়ী। কী চাইছ?

—খুবই দুর্বোধ্য ন্যায়ের সূত্র, নয়? আপনি কি পারেন না জেঠামশাইকে গিয়ে বলতে যে, এই সোঞাই গাঁয়ে ঐ দুই বুড়ো-হাবড়া ছাড়াও আর একটি কুলীন সুপাত্র আছে—আপনার ঐ 'মঞ্জু'র সঙ্গে যাকে দারুণ মানাবে! গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া!

রূপেন্দ্র উঠে দাঁড়ান। প্রস্তাবটা অকল্পনীয় নয়, ছিল না। তবে অবচেতনের কোন কোণায় যে লুকিয়েছিল তা টের পাননি এতদিন! মৃন্ময়ী, মীনু, সেই অন্তর্লীন ভাবনাটাকে টেনে বার করে নিয়ে এসেছে প্রকাশ্যে। কী তার মূল উদ্দেশ্য তা সে-ই জানে। হতে পারে, এ তার নিতান্ত

জৈবিক বৃত্তি—প্রাণধারণের তাগিদে। 'পৌলমী' তার ইন্দ্রলোকের অসপত্ন অধিকার রক্ষা করতে চায় বলে! অথবা কে জানে—মেয়েটি হয়তো বুঝে ফেলেছে—কোন্ সুগোপন হেতুতে রূপেন্দ্রনাথ আজীবন কৌমার্যব্রত গ্রহণ করে আর্তের সেবা করে যেতে চেয়েছিলেন। হয়তো সে নিজেকেই দায়ী করে সে জন্যে—হয়তো দায়ী করে এক অলক্ষ্য ভাগ্যদেবতাকে! কিন্তু সেই কাঁটাখানা খচখচ করে প্রতিনিয়ত ওকে বিদ্ধ করে বলেই ও সংসারে মন দিতে পারে না। হোক বুড়ো বর—তবু তাকে জড়িয়ে ধরেও শান্তি পায় না। বেচারির ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে যায়—তার 'সোনাদা' সংসারী হয়নি আজও!

রূপেন্দ্রনাথ নীরবে পদচারণা করছিলেন। মৃন্ময়ী কোনও কথা বলেনি। অপেক্ষা করছিল। বার-কয়েক পদচারণা করে ফিরে এসে চৌকির প্রান্তে উনি বসতেই আবার বলে, তোমার ঐ 'মঞ্জু'কে আমি দেখেছি, সোনাদা! শুধু সোঞাই গাঁয়ে নয়, এমন সুন্দরী আমি কখনো কোথাও দেখিনি!

রূপেন্দ্রনাথ হেসে ফেলেন। বলেন, তুই এমন ভাবে কথা বলছিস্ মীনু যেন, কাটোয়া, নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ, মায় শহর কলকাতা তোর চষে বেড়ানো!

মৃন্ময়ীও হেসে ফেলে। বলে, তা সত্যি! জীবনে সোঞাই গাঁয়ের বাইরে কখনো যাইনি। কিন্তু তুমি তো গেছ! বল? তুমি কখনো দেখেছ?

রূপেন্দ্র সে-কথার জবাব না দিয়ে বলেন, তুই সত্যিই তাই চাস? আমি রাজী হলে তুই খুশি হবি?

মৃন্ময়ী চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বলল, হব! হব! হব! 'তিন-সত্যি' করছি! সত্যিই খুশি হব!

—তাহলে বোকার মতো কাঁদছিস্ কেন রে?

মৃন্ময়ী লাফ দিয়ে উঠে পড়ে। ঘর ছেড়ে যাবার আগে বলে যায়, আনন্দে কাঁদছি, সোনাদা! এ তুমি বুঝবে না!

তা বটে! এ তো বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্য নয়! এ যে মেয়ে-মন! কী করে বুঝবেন রূপেন্দ্র? তিনি চুপচাপ বসে থাকেন।

বেশ কিছুটা সময় নিয়ে ফিরে এল মৃন্ময়ী। এখন তাকে কিন্তু দিব্যি প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। কে বলবে—একটু আগে ঐ মেয়েটি কাঁদছিল—হোক তা আনন্দাশ্রু। হাসি-হাসি মুখে বললে, তাহলে আবার যাই পুজোবাড়ি? বড়মাকে বলে আসি!

– না রে, মীনু! বড়মা নয়। তুই শুধু চুপিচুপি কাতুকে বলিস। সে আবার চুপিচুপি বলবে পিসিকে। প্রস্তাবটা পিসিই তুলবে। না হলে পিসি মনে দাগা পাবে। সে বেচারি তো কম চেষ্টা করেনি তার এই একবগ্গা ভাইপোটার নাকে দড়ি পরাতে! কাঁধে জোয়াল চাপাতে। তুই সরাসরি বড়-মাকে বললে পিসির অভিমান হবে।

মৃন্ময়ী স্বীকার করে। হেসে বলে, মাঝে-মাঝে তুমি এমন পাকা মাথার পরামর্শ দাও না সোনাদা, ঠিক মনে হয় পুঁথি-টুঁথি নয়, সারা জীবন তুমি যেন মনুষ্যচরিত্র ঘাঁটছ। আমি মেয়েমানুষ, আমারই তো বোঝার কথা যে, পরের মুখে এ-কথা শুনলে পিসির কেমন লাগবে! অথচ আমার সেটা খেয়াল হল না, আর তুমি—আজন্ম বই-পোকা—মেয়েদের দিকে কখনো

চোখ তুলে তাকাও না, তোমার মনে পড়ে গেল! 'সোনাদা' নয়, তোমাকে 'হীরেদা' বলব এর পর থেকে—তা বৌঠান শুনুক, না শুনুক।

—বৌঠান?

—ঐ তোমার আদরের 'মঞ্জু' গো!

নিতুর মোয়ার রেকাবি শূন্য হয়ে গেছে। সে আবার তাগাদা দেয়।

মৃন্ময়ীর মুখটা ততক্ষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সোনাদা সংসারী হতে রাজী হয়েছে। তার সঙ্গে আজ থেকে নতুন একটা সম্বন্ধ পাতানো গেল। বৌঠানকে উপলক্ষ্য করে সোনাদাকে উত্যক্ত করতে যখন-তখন এ বাড়ি এলে কেউ কিছু মনে করবে না! মৃন্ময়ী বলে, শোন, অঘ্রাণের সাত-তারিখ দিন আছে। মাসখানেক ধৈর্য ধরে থাক। আমি নিজে এসে বৌঠানকে বরণ করে ঘরে তুলব!

রূপেন্দ্র হেসে ওঠেন, ওরে ব্বাবা! তুই যে পাঁজিপুঁথি দেখে বসে আছিস্!

—থাকব না? গরজটা যে আমার! অঘ্রাণ ফস্‌কে গেলে আমি নিজেই যে ফেঁসে যাব। মাঘ-ফাল্গুনে আমি আটকা পড়ব আঁতুড়ঘরে। তোমাকে বরসাজে সাজাতে আসতে পারব না!

রূপেন্দ্র বলেন, তাহলে মাঘ-ফাল্গুনেই ব্যবস্থা করব। তোকে ঠিক জব্দ করা যাবে! শোধ তোলা যাবে। তোর বিয়েতে যেমন আমি ...

মাঝপথেই থেমে যান। ফুলে ফেঁপে ওঠা বেলুনটায় যেন বেমক্কা একটা সূচ বিদ্ধ করে দিয়েছেন। মৃন্ময়ীর প্রভাতী প্রফুল্লতার ঝল্‌মলে আলোর উপর ঘনিয়ে এল একখানা কালো মেঘ। মুখটি হঠাৎ বেদনার্ত হয়ে ওঠে। মুখটা নেমে আসে বুকের উপত্যকায়। যে 'আনন্দাশ্রু'কে এতক্ষণ কোনক্রমে ঠেকিয়ে রেখেছিল তা টপ্‌টপ্ করে ঝরে পড়ল মাটিতে। সোনাদার 'উদ্বাহন' থেকে মনটা হঠাৎ সরে গেছে নিজের 'উদ্বন্ধনে'। অস্ফুটে বলে, সে সময় গাঁয়ে থাকলে তুমি তোমার খুড়িমার বিয়েতে একপেট মণ্ডা-মিঠাই গিলতে পারতে, সোনাদা?

ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এ কী ভ্রান্তি! অজ্ঞান্তে এমন আনন্দঘন মুহূর্তে কেন হঠাৎ মাড়িয়ে দিলেন ওর বেদনার স্থলটি!

নিতু আবার তাগাদা দেয়, কই বাড়ি চল?

—চল যাই! আজও একটা প্রণাম করে যাব কিন্তু, সোনাদা! পুজোয় নতুন শাড়ি পরেছি তো। গুরুজনদের প্রণাম করতে হয়! আশা করি তুমি বাধা দেবে না তোমার খুড়িমাকে!

প্রতিবর্তী প্রেরণায় প্রণামগ্রহণ কালে যে অভ্যস্ত মন্ত্রটি উচ্চারণ করে ওঁর ওষ্ঠাধর, তা অনুক্ত রইল। এ প্রণাম 'নারায়ণকে নিবেদন করা যায় না।

এ যে খুড়িমার প্রণাম! পুজোর দিনে স্বামী-সোহাগী নতুন শাড়ি পরার অজুহাতে নিবেদন করছে ভাশুর-পো-কে!

এ কি 'নারায়ণকে নিবেদন করা যায়?

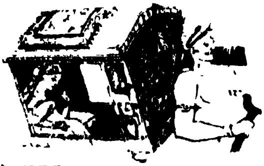

রূপেন্দ্র বজ্রাহত হয়ে গেলেন জেঠামশায়ের মুখে কথাটা শুনে—

—না রূপেন্দ্রনাথ! আমি এ বিবাহপ্রস্তাবে সম্মত হতে পারি না।

মহাষ্টমী অতিক্রান্ত। সন্ধিপুজোর ঢাকের বাদ্যি একটু আগে থেমেছে। ব্রজেন্দ্রনাথের খাশ কামরায় বসেছেন ওঁরা দুজন—রূপেন্দ্র আর ব্রজেন্দ্রনাথ। মাটিতে ফুলকাটা পশমের আসনে। সমস্ত দিন মহাষ্টমীর উপবাস গেছে। এখন প্রসাদ পেতে বসেছেন। সামনে দুটি পাথরের থালা। প্রসাদ গ্রহণ শেষ হয়েছে। একটু আগে ঐ দুটি থালায় সাজানো ছিল—নানান ফলমূল, লুচি, নিরামিষ তরকারি, পায়েস, পক্কান্ন, খেজুর গুড়, তিলেখাজা, চন্দ্রপুলি, মায় বর্ধমান থেকে আনানো সীতাভোগ। ভাদুড়ী-বাড়িতে 'বলি' হয় না। আগে হত। ব্রজেন্দ্রনারায়ণের পিতৃদেবের আমলে নাকি একবার বলি আটকে যায়। তার পর থেকে ও প্রথা উঠে গেছে। সামনে বসে আছেন বড়মা, তালপাখা হাতে। গরমও নেই, মাছিও নেই—পাখাটা হাতে আছে নিতান্ত অভ্যাসবশে। দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে একগলা ঘোমটা টেনে তারাসুন্দরী—কখন কী প্রয়োজন হয়।

সংবাদটা গোপন—এতদূর গোপন যে, জমিদারবাড়ির সব কয়টি পুরললনাই তা গোপনে জানে। প্রত্যেকেই ঐ মুখরোচক সংবাদটির উপসংহার হিসাবে শ্রোতার সাবধানবাণীটি শুনেছে: তোকেই শুধু বললাম, এখনি পাঁচকান করিস না।

জগুপিসি নাকি আজ দুপুরে তাঁর 'গঙ্গাজলে'র মাথাটা টেনে নিয়ে কানে কানে বলেছিলেন, তোরে একটা 'গোপন-কথা' বলতে এলাম, গঙ্গাজল! একটা বিয়ের-প্রস্তাব! তা আমি বলব্নি!

ব্রজেন্দ্রসুন্দরীর বুঝতে কোনও অসুবিধা হয়নি। তবু ন্যাকা সেজে বলে ছিলেন, এ আবার কী হেঁয়ালী? 'গোপন-কথা' বল্‌তে এসেছিস্—আবার বলছিস্—'বলবনি'?

—কেন বলব? আমার একটা মর্যাদা নেই! আমি হলাম গে বরের ঘরের পিসি! আমি কেন প্রস্তাব তুলব? তুই মেয়ের তরফের! তুই কথা তুলবি, আমার হাতে পায়ে ধরবি—আমি শুধু রাজী হব!

ব্রজসুন্দরী বলেছিলেন, ওসব আধিক্যেতা 'সম্বন্দ-করা' বিয়েতে হয়! এ কী তাই? এ তো ···

মনের উচ্ছ্বাসে তিনি ভুলে গেছিলেন শ্রোতা জগু ঠাকরুণ। কালিদাসের একটি সুবিখ্যাত শ্লোক শুনিয়ে দিয়েছিলেন তিনি—'যেখানে মদন পঞ্চশর স্বয়ং ব্যবস্থাপক সেখানে পুরোহিত নিষ্প্রয়োজন।'

জগুপিসি ঐ 'গোপন-কথাটা' জানেন—তাঁর দুঃসাহসিনী গঙ্গাজল ঐ অংবংভাষাটা আয়ত্ত করেছে—নিভ্যয়ে! কেন করবে না? দেবী অংশে জন্ম তার! সে জানে, কোন অলপ্পেয়ে যমদূত সে অপরাধে ওঁর সিঁথির দিকে হাত বাড়াতে সাহস পাবে না—ভস্ম হয়ে যাবার ভয়ে!

ধমকে উঠেছিলেন তিনি, ওসব অংবং-মন্ত্র রাত্তিরে শোনাস তোর বরকে! আমাকে যা বলবি তা সাদা-বাঙলায় বল্ দিনি?

—কী আর বল্‌ব বল? একবগ্গা আমাকে 'জীবন' দিল, আর আমি ওকে একটা 'জীবনসঙ্গিনী' দিতে পারব না?

সমস্ত দিনে গোপনে গোপনে এই রসঘন আনন্দবার্তাটা মহিলামহলে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এ কী অসৈরন নিদান হাঁকলেন বড়কর্তা! তিনি সম্মত নন!

প্রশ্নটা ব্রজসুন্দরীই পেশ করেন, এ কী বলছেন আপনি? কুসুমমঞ্জরীর সঙ্গে রূপেন্দ্রনাথের বিবাহপ্রস্তাবে আপনার সম্মতি নেই?

জনান্তিকে 'তুমি' সম্বোধন করলেও প্রকাশ্যে তিনি 'আপনি' বলেন!

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ বললেন, সেই কথাই বলেছি, গিন্নি! কারণ আমি জানি, তোমরা রূপেন্দ্রকে বাধ্য করেছ এ বিবাহে সম্মত হতে। তার মনোগত বাসনা—আজীবন কৌমার্যব্রত গ্রহণ করে আর্তের সেবা করে যাওয়া। সে তার সঙ্কল্পচ্যুত হতে স্বীকৃত হয়েছে—শুধু ঐ মেয়েটিকে উদ্ধার করতে!

ব্রজসুন্দরী রুখে ওঠেন, না হয় তাই হল! তাতেই বা আপনার আপত্তি কিসের?

—আপত্তি এজন্য যে, তোমাদের রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়েছে। কুসুমমঞ্জরীর যে বিপদের আশঙ্কা তোমরা করেছ সে বিপদ থেকে মেয়েটি ইতিমধ্যে উদ্ধার পেয়েছে। ওর 'রাইরানী' হওয়ার আশঙ্কা আর নেই!

—কেন?

—যেহেতু রূপনগরের মোহান্ত-মহারাজের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটেছে! পঞ্চমীর দিন।

রূপেন্দ্রনাথ এতক্ষণ অধোবদনে বসে ছিলেন। এ সংবাদে মুখ তুলে তাকালেন। বললেন, এ সংবাদ জানা ছিল না; কিন্তু আশঙ্কা তো তাতেও দূরীভূত হয়নি, জেঠামশাই! মোহন্ত মহারাজ গতায়ু—কিন্তু তাঁর গদীটা তো আছে! আবার কেউ উঠে বসবে তাতে। হয় তো সেই 'ছোটহুজুর'।

—না! সেও তীরবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে। তরুণ ঈশানের তীরে বিদ্ধ হয়ে।

—'ঈশেনের তীরে'! মানে, আমাদের ঈশেন?

—হ্যাঁ তাই! রূপনগরের মঠ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। সমস্ত গ্রামটা নিশ্চিহ্ন! মোহন্ত মহারাজের ধনাগার লুণ্ঠিত—তার সেই গোপিকার দল⋯আহ্!

আচমন করে উঠে পড়লেন তিনি।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ তারপর শোনালেন এক বিচিত্র সংবাদ। বিস্তারিতভাবে। এ সংবাদ তিনি পেয়েছেন বিশেষ সংবাদবহ মারফত। সম্পূর্ণ গোপন রেখেছেন। জানে, একমাত্র তারাপ্রসন্ন! সংক্ষেপে তা এই—

ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখে সংবাদটা শুনে হিতাহিতজ্ঞান লোপ পেয়ে গিয়েছিল মোহন্ত মহারাজের! ভাদুড়ী-মশাইকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল—অবিলম্বে রূপনগরের মেয়েকে ফেরত পাঠাতে। গো-গাড়িটা আজ প্রায় মাসখানেক অপেক্ষা করছে। স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও গাড়িটা ফিরে আসেনি। মোহন্ত মহারাজ তখন আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে—মেয়েটিকে ছিনিয়ে আনতে। দুই হাতিয়ারবন্দ্ সহচরকে নিয়ে 'ছোটহুজুর' মোহন্ত মহারাজের হুকুম তামিল করতে তখনই ঘোড়া ছুটিয়ে রওনা হয়েছিল। সোঞাই গাঁয়ের সেই অর্বাচীন কবিরাজটা তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। খালি হাতে। শুধু তাই নয়—সেই দুঃসাহসী কবিরাজটার চোখের সম্মুখে কে একটা বাগদির-পো মহামহিম মোহন্ত মহারাজের দূতের গালে চপেটাঘাত করেছে। ক্ষিপ্ত হয়ে যাবার কথাই! প্রেমদাস গোঁসাই তৎক্ষণাৎ আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে—অবিলম্বে সসৈন্য সোঞাই আক্রমণ করতে। শুধু মেয়েটিকে ছিনিয়ে আনলেই চলবে না—শূলে বিদ্ধ করে আনতে হবে সেই কবিরাজ আর তার বাগদি-চেলার ছিন্ন মুণ্ডু দুটো!

ছোট হুজুর জানিয়েছিল, সে মহাষ্টমীতে ফিরে আসবে বলে 'হুঁসিয়ার' জানিয়ে এসেছে।

হুঙ্কার করে উঠেছিলেন, না, এখনি! এই মুহূর্তে! কামান নিয়ে যেতে হবে না। তাহলে পৌঁছতেই তিন দিন লেগে যাবে। সঙ্গে নিয়ে যা এক শ বন্দুকধারী ঘোড়সওয়ার আর হেরম্বদাসকে।

'হেরম্বদাস' ওঁর রণহস্তীর পোষাকী নাম।

আদেশমাত্র সৈন্য সমাবেশ করে ওরা রওনা হয়েছিল।

নিয়তির পরিহাস! ভাস্কর পণ্ডিতও সেই সময় চলেছে মুর্শিদাবাদ-মুখো। দাঁইহাটি থেকে উত্তরমুখো, ভাগীরথীর পশ্চিম কিনার ধরে। তার গুপ্তচর এসে সংবাদ দিল সে স্বচক্ষে দেখেছে, রূপনগরের গড় থেকে শতাধিক অশ্বারোহী আর একটি রণহস্তী নিয়ে মোহন্ত-মহারাজের সৈন্যদল পশ্চিমমুখো কোথায় যেন চলেছে। ভাস্কর সাবধানী। সে কাটোয়ায় এক বেলা অপেক্ষা করল—বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ করল। অচিরেই জানতে পারল সঠিক সংবাদ। ঐ সৈন্যদল চলেছে বর্ধমানের কী একটা গাঁয়ে—স্থানীয় এক জমিদারকে সায়েস্তা করতে। ভাস্কর তৎক্ষণাৎ বুঝে নেয়—রূপনগরের গড় বস্তুত অরক্ষিত! জনশ্রুতি আগেই সংগ্রহ করা ছিল—মোহন্ত-মহারাজের রত্নভাণ্ডার কুবেরীর্ষিত! বর্গী সৈন্যদল মুখ ঘোরালো।

ছোট-হুজুর সোঞাই গাঁয়ের পারানি-ঘাটে যে দিনটি কলার ভেলায় দামোদর পার হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে, সেই সারাটি দিনে অজয়ের তীরে নির্মূল হয়ে গেছে রূপনগরের গড় ও গ্রাম! সন্ধ্যাবেলায় সেই দুঃসংবাদ দিতেই রূপনগর থেকে ছুটে এসেছিল অশ্বারোহী সংবাদবহ—ছোট-হুজুরকে মর্মান্তিক বার্তাটা পেশ করতে। বেচারি এসে শোনে, সেই ছোট-হুজুরও ভেসে গেছে দামোদরের স্রোতের টানে!

সহজ ভাষায় ভীমা আর ঈশান যাদের সঙ্গে সারাদিন কাজিয়া করেছে তারা বর্গী সৈন্য আদৌ নয়—রূপনগরের ফৌজ! এপার থেকে তাদের সনাক্ত করা যায়নি। শুধু বোঝা গিয়েছিল তারা হিন্দু।

ভাস্কর রূপনগরকে ধূলিসাৎ করে, মোহান্ত-মহারাজের দ্বিখণ্ডিত দেহটা অজয়ে নিক্ষেপ করে তারপর রওনা হয় উত্তরমুখো।

নিতান্ত সৌভাগ্য গঙ্গার পূর্ব-উপকূলের জনপদগুলির—কালীগঞ্জ, পলাশীপাড়া, রেজিনগর, বা বেলডাঙার। বর্গী সৈন্য ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূল ধরে চলেছিল উত্তরমুখো—কাটোয়া ঘাট থেকে মুর্শিদাবাদ। গঙ্গা পার হওয়ায় কোন বাধা ছিল না। কিন্তু ভাস্কর পন্থের হাতে সময় ছিল অল্প। তার গোপন খবর ছিল, নবাব আলিবর্দী বালেশ্বরে থাকতেই খবর পেয়েছেন—বর্গী সৈন্য তাঁর রাজধানী আক্রমণ করতে পারে। নবাবী সৈন্য বালেশ্বর-দাঁতন পার হয়েছে। তারাও দ্রুতপদে এগিয়ে আসছে মুর্শিদাবাদের দিকে। তাই শুধু ভাগীরথীর পূর্বপারের জনপদ নয়, পশ্চিমপারের গ্রামগুলিও সে-যাত্রা বর্গী-আক্রমণ থেকে রেহাই পেল—কেতুগ্রাম, ভরতপুর, কান্দি, খড়গ্রাম। বিদ্যুৎগতিতে বর্গী সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল খাশ মুর্শিদাবাদে—লালবাগ, আজিমগঞ্জে।

নবাবী দুর্গ অধিকার করতে পারল না তারা। আলিবর্দী ঐ রূপনগরের প্রেমদাস বাবাজীর মতো মূর্খ নয়—যুদ্ধযাত্রা করার পূর্বে নিজের প্রাসাদ ও তোষাখানা সুরক্ষিত করে রাখার কথা ভোলে না। কিন্তু বর্গী সৈন্য অনায়াসে দখল করে নিল জগৎশেঠের ধনাগার!

বর্গীরা আক্রমণ করতে আসছে শুনে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ সপরিবারে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে আত্মগোপন করেছিলেন। ভাস্করপন্থ তাঁর গদি লুট করে পেয়েছিলেন দু কোটি আর্কট মুদ্রা।

আজকের হিসাবে তা কত হাজার কোটি টাকা তা বলতে পারব না। শুধু মনে করিয়ে দিতে পারি—মুর্শিদাবাদের বাজারে তখন এক তঙ্কায় পাঁচ মণ চাউল পাওয়া যেত! সেটাও কিন্তু আমার কাহিনীর শেষ চমক নয়! এর পরে আমাকে বলতে হবে—ঐ ক্ষয়ক্ষতিতে বিশেষ বিব্রত হননি জগৎশেঠ ফতেচাঁদ।

বর্গীর হাঙ্গামা মিটে গেলে আবার গদিয়াল হয়ে বসে নাকি বলেছিলেন—ঐসিন তো হোতাই হ্যয়। থোড়া-বহুৎ নুকসান হো গ্যয়া! ক্যা কিয়া যায়?

পরবৎসরই নবাবকে উপহার দিয়েছিলেন এক কোটি আর্কট মুদ্রা!

সে যা হোক—বিস্তারিত ইতিহাস শুনিয়ে ভাদুড়ী-মশাই তাঁর ধর্মপত্নীর দিকে ফিরে বলেছিলেন, এখন তো বুঝলে, রূপেন্দ্রকে বিবাহ করতে বাধ্য করার কোন প্রয়োজন নেই! কুসুমমঞ্জরী আমার কন্যারূপে এ বাড়িতে অনায়াসে আশ্রয় পেতে পারে—সোঞাই গাঁয়ের কুলবধূ-না হলেও।

ব্রজসুন্দরী বললেন, আপনি আমাকে একটা কথা বুঝিয়ে বলুন দেখি। পুরুষ মানুষ বিবাহে সম্মতি দেয় কেন? অরক্ষণীয়া একটি কন্যাকে উদ্ধার করতে?

ব্রজেন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলেন, শাস্ত্র বলেছেন,—না। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা!'

—শাস্ত্রের বাক্য থাক! একবল্গা শাস্ত্রনির্দেশে চলে না, চলে বিবেকের নির্দেশে।

—তা ওর বিবেক কী নির্দেশ, কেন দিচ্ছে, তা আমি কেমন করে জানব?

রূপেন্দ্রনাথ বুড়োবুড়ির এ জাতীয় কথোপকথনের কোন অর্থ গ্রহণ করতে পারেন না। কী নিয়ে তর্ক? কিসের বিবাদ?

বৃদ্ধা বলেন, আপনি কি শুধু শাস্ত্রই পড়েছেন। কাব্য পড়েননি?

ব্রজেন্দ্র বললেন, তা কাব্য তো তুমিও যথেষ্ট পড়েছ, গিন্নি। বল, তোমার মুখ থেকেই শুনি—

—তাই শুনুন তবে। এই মাত্র যে শব্দটা উচ্চারণ করলেন—'গৃহিণী' সেটা 'গৃহ' শব্দের সমার্থক—'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে[১]।' একবল্গার গৃহ 'দ্বিবল্গা' না হলে 'অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যম্ তথা গৃহম[২]!' কিছু বুঝলেন?

ব্রজেন্দ্র বললেন, একটু একটু! পিকো বসন্তস্য গুণং ন বায়সঃ।'[৩]

'গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণো

—তা তো বটেই। সেক্ষেত্রে পিক-কুহু কী বলছে শুনুন,

"কবিতা বনিতা চৈব সুখদা স্বয়মাগতা

---

[১] যে গৃহে গৃহিণী অনুপস্থিত তাকে 'গৃহ' বলা চলে না। গৃহিণীই গহকে গৃহ-মর্যাদা প্রদান করে।

[২] তার পক্ষে বনে যাওয়াই ভাল; কারণ তার কাছে অরণ্যও যা, গৃহও তাই।

[৩] গুণীব্যক্তিই গুণীর সমাদর করতে পারে। যে নির্গুণ সে কী বুঝবে? বসন্তের মহিমা কোকিলই বোঝে, কাক বোঝে না।

বলদাকৃষ্যমানা চেৎ সহসা বিরসায়তে।"[১]

রূপেন্দ্রনাথ রীতিমতো স্তম্ভিত! এ কী শুরু করেছেন ওঁরা! যেন দুই কাব্যতীর্থ সংস্কৃতে কবির-লড়াই জুড়ে দিয়েছেন! পরমুহূর্তেই বুঝে ফেলেন এই কবির লড়াইয়ের মূল-উৎসটা কোথায়! ওঁরা দুজনে মিলে একটা কৌতুক করছিলেন এতক্ষণ! সমস্তটাই নিদারুণ রসঘন প্রমোদন! যদিও সম্পর্কটা 'জেঠা-জেঠি'. কিন্তু বয়সের ফারাকটা 'দাদু-দিদার'! আনন্দের আতিশয্যে বুড়োবুড়ি আজ উচ্ছ্বসিত! তাই এই প্রগল্‌ভতা। কিন্তু দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা করছে পুত্রবধূ—তাই তার বোধগম্য ভাষায় হৃদয়ের উচ্ছ্বাসটাকে ব্যক্ত করতে পারছেন না—দুজনেই ক্রমাগত সংস্কৃতে মনের আবেগকে মুক্তি দিচ্ছেন!

ব্রজেন্দ্রকে নীরব দেখে বড়মা বলে ওঠেন, এবার যে আমার 'চাপান'। আপনারই 'উতোর' দেবার কথা! কিছু বলছেন না যে?

—কী বলব? 'ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলদাগমে
দর্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্‌॥'[২]

হঠাৎ বড়-মার নজরে পড়ে দ্বারপ্রান্তে তারাসুন্দরীর চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হয়ে গেছে। মাথা থেকে তার যে ঘোমটা খসে গেছে, তাও সে টের পায়নি। বড়-মা লজ্জা পেলেন। তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংযত করে বলেন, একবগ্গা! শোন! এ তোমার বড়মার-আদেশ! সাতই অঘ্রাণ দিন স্থির হয়েছে! যাবতীয় ব্যবস্থা করে ফেল ইতিমধ্যে।

রূপেন্দ্রর আচমন শেষ হয়েছিল ইতিপূর্বেই। তিনি উভয়ের পদধূলি গ্রহণ করেলেন।

কথায় বলে, স্ত্রীভাগ্যে ধন। ওঁর ভাগ্যে এখনো স্ত্রীধন-লাভ ঘটেনি; সম্বন্ধটা পাকা হয়েছে মাত্র। তবু বড় জাতের একটা লাভের সূচনা হয়ে গেল আকস্মিকভাবে।

প্রস্তাবটা নিয়ে এসেছেন স্বয়ং দুর্গাচরণ। নন্দভায়া ইতিমধ্যে অনেকবার কান ভাঙাতে চেয়েছে, উনি নিজেও বিরক্ত এইসব ছেলে-ছোকরার অশাস্ত্রীয় আচার-বিচারে। তা হোক, মাথা গরম করার মানুষ উনি নন। নির্বিঘ্নে 'পুন্নাম' নরক থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা পাকা-হওয়া ইস্তক উনি কাউকে চটাবেন না—গ্রহাচার্য, গুণীন, রাসু দাই বা ধন্বন্তরি।

ঋষধ্বজ দত্ত নবদ্বীপের একজন প্রখ্যাত ব্যবসায়ী। টাকার কুমির। কী-একটা দুরারোধ্য ব্যাধিতে আজ বছরখানেক ভুগছেন। শান্তি-স্বস্ত্যেন, যজ্ঞ, এবং হাকিমী-কোবরেজি চিকিৎসা হয়েছে। উপশম তো হয়ইনি—ব্যাধির প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। ঋষধ্বজ তন্তুবায়জাত শিল্পের আড়তদার—মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতার বাজারে তাঁর প্রতিপত্তি। দুর্গাচরণের সঙ্গে ব্যবসায়িক সূত্রে আবদ্ধ। গাঙ্গুলী-মশায়ের কাছে সোঞাই গ্রামের ধন্বন্তরির অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে তিনি লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন। কবিরেজমশাই যদি অবিলম্বে

---

[১] কবিতা আর কবিপ্রিয়া যখন স্বেচ্ছায় সলজ্জচরণে এগিয়ে আসেন তখনই কবি সার্থক। জোর-জবরদস্তি করে ধরে আনলে—কী কবিতা, কী কবিপ্রিয়া—কেউই রসমণ্ডিতা হয় না। সরস হলেও তা শুকিয়ে যায়।

[২] সময়ে-সময়ে মৌন থাকাই ভদ্রতা। বর্ষাগমে যখন ভেকদল সরব হয় তখন কোকিলেরা নীরব থাকে।

নবদ্বীপে পদধূলি দিতে স্বীকৃত হন তাহলে তাঁর যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হবে!

গাঙ্গুলী-মশাই রূপেন্দ্রর কর্ণমূলে নিবেদন করলেন, শোন ভায়া! রাহাখরচ বাবদে পাঁচটি আকবরী মোহর দাবী করেছি আমি—তোমাকে না শুধিয়েই। আর যদি নিরাময় করে দিতে পার, তাহলে বৌমার জন্য একটি দশভরির রত্নহার! বল, কম করে বলেছি?

—বৌমা! বৌমা কে?

—আহাহা! খবরটা কি আমরা জানি না নাকি? আজ কার্তিকের সতের তারিখ। যাতায়াতে সাতদিন। ইদিকে বিয়ের ব্যবস্থা আমরাই করব। সৌরীনদা নেই, আমরাই তো তোমার পিতৃস্থানীয়, না কী বল?

নবদ্বীপ! ভাগীরথী-জলাঙ্গীর সঙ্গমস্থলে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে এই মহাতীর্থ! এখানেই বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেনের তীর্থাবাস আক্রমণ করেছিল বিধর্মী মহম্মদ বিন বক্তিয়ারের অশ্বারোহী বাহিনী। বঙ্গলক্ষ্মী অস্তমিত হয়েছিলেন ঐ নবদ্বীপের গঙ্গায়। সমগ্র ভারতাত্মার ধারক এই নবদ্বীপ। সেনযুগে নবদ্বীপ-বিদ্বৎসমাজের জ্যোতিষ্ক ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ জলায়ুধ, পশুপতি, শূলপাণি, উদয়নাচার্য, আব্দিহোধ যোগী। এখানেই আবির্ভূত হয়েছিলেন প্রাক্‌চৈতন্য যুগে—বাসুদেব সার্বভৌম, অদ্বৈতাচার্য, চিন্তামণি-দীধিতি প্রণেতা ও গৌতমসূত্রের ভাষ্যকার নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য। বঙ্গদেশের সাকারকালী মূর্তির প্রবর্তক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ এই নবদ্বীপে বসেই সচেষ্ট হয়েছিলেন তান্ত্রিক ব্যভিচার থেকে দেশকে রক্ষা করতে—রচনা করেছিলেন প্রামাণিক তান্ত্রিক নিবন্ধ-সংবলিত 'তন্ত্রসার' গ্রন্থ; যা পাঠ করে রূপেন্দ্র প্রণিধান করেছেন 'বলি'-র কী অর্থ! এখানেই জ্যোতিষ-শাস্ত্রজ্ঞ হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণব রচনা করেছিলেন 'জ্যোতিঃসারসংগ্রহ'। 'শব্দশক্তি-প্রকাশিকা' প্রণেতা 'জগদ্‌গুরু' জগদীশ তর্কালঙ্কার এই নবদ্বীপেই প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তারপর নিমাই পণ্ডিতের কীর্তিকাহিনীর তো কথাই নেই—

—কী হল রূপেন্দ্র? তুমি স্বীকৃত হলে তো? তাকে কী বলব? নাকি আর কিছু দরদস্তুর করব?

রূপেন্দ্র সহাস্যে বলেন, না, খুড়ো! নবদ্বীপ আমি স্বচক্ষে দেখিনি আজও। এ এক দুর্লভ সুযোগ হয়ে গেল। নিশ্চয় যাব।

মনে মনে বললেন—ঐ তামসিক বৃদ্ধ তার অর্থ বুঝবে না বলে—সংসার-জীবনে প্রবেশের উষালগ্নে নবদ্বীপের পদধূলি ললাটে লেপন করার এ সৌভাগ্য তাঁর দুর্লভ প্রাপ্তি।

শুনে বেজার হলেন জগুপিসি: এ আবার কী অসৈরন কতা! বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেলে আর যে নৌকায় চাপতে নেই! শাস্তরে বারণ।

রূপেন্দ্র পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধছিলেন। মুখ না তুলেই বললেন, আপনি কিছু চিন্তা করবেন না পিসিমা—নৌকায় আমি যাচ্ছি না—শাস্ত্রে বারণ আছে, তা জানি!

—তাহ'লে?

—মনুসংহিতায় আছে "ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া বিতর তানি সহে চতুরানন।"

—তার মানে?

—তার মানে, নৌকার পরিবর্তে চতুর ব্যক্তি অশ্বারোহণে যথেচ্ছা গমন করতে পারে

চতুরানন, মানে ব্রহ্মা তা 'সহে', অর্থাৎ সহ্য করেন। আমি ঘোড়ায় যাচ্ছি!

জগুপিসি বলেন, কী জানি বাপু! আমার কেমন সন্দ' হচ্ছে! শিরোমণি মশাইকে আগে একবার শুধিয়ে দেখি।

রূপেন্দ্র খাড়া হয়ে দাঁড়ান। বলেন, পিসিমা! কুটুম্ব বলতে আমার একজনই আছে। এই দুর্লভ সুযোগ যখন পেয়েছি তখন নিজে গিয়ে তাকে নিমন্ত্রণ করে আসব। সে জন্যই যাচ্ছি নবদ্বীপ।

জগুপিসি আকাশ থেকে পড়েন। বলেন, মানে? নবদ্বীপে কে তোর কুটুম?

—নবদ্বীপ থেকে গো-আড়ি গাঁ মাত্র ছয় ক্রোশ!

কাত্যায়নী দাঁড়িয়ে ছিল অদূরে। হাত বাড়িয়ে সে চৌকাঠটা ধরল।

মুহূর্ত বিলম্ব হল জগু ঠাকরুণের প্রত্যুত্তর করতে। কন্যা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের দিকে পর্যায়ক্রমে দেখে নিয়ে একটি মাত্র শব্দে নিদান হাঁকলেন: না!

—না? না কেন? এমন আনন্দের দিনেও তার খোঁজ নেব না?

জগুপিসি চোখে আঁচল দিলেন।

রূপেন্দ্র এগিয়ে এসে একখানি হাত রাখলেন তাঁর পিঠে: পিসিমা?

অশ্রুআর্দ্র মুখখানি তুলে জগু পিসি কথা বলতে গেলেন। ঠোঁট দুটি থরথর করে কেঁপে উঠল। তবু বলতে পারলেন কথাটা: আর ফিরে এসে যদি বলিস্ ঐ আবাগী বৌমারে বরণ করতে পারবেনি? ওর মাছভাত খাওয়া ঘুচেছে?

কাত্যায়নী আর সংযত করতে পারল না নিজেকে। একটা আর্ত শব্দ বার হয়ে এল তার কণ্ঠ থেকে। বোধহয় 'মা—' বলতে চেয়েছিল, শোনালো একটা জান্তব আর্তনাদের মতো: 'আঁ—!'

সে বসে পড়েছে ভূশয্যাতেই।

জগুপিসি হু-হু করে কেঁদে ফেললেন। তার মধ্যেই বলে ওঠেন, আমি দিব্যি দিয়ে রাখলাম রূপো! যাচ্ছিস যা—কিন্তু সে বাঁদরটার খোঁজ নিতে পারবিনি কিন্তু! আমার মাথার দিব্যি রইল!

রূপেন্দ্রনাথ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। এতদিন কেন যে পিসিমা ওঁকে গো-আড়ি গাঁয়ে খোঁজ নিতে নিষেধ করেছিলেন তা প্রণিধান করলেন। কথাটা মিথ্যা নয়! এমন মর্মান্তিক সম্ভাবনার কথা তাঁর মনে পড়েনি!

জগু ঠাক্‌রুণ পূজায় বসেছেন দেখে কাতু ঘনিয়ে এল। ওঁকে আড়ালে টেনে এনে বললে, না দাদা, তুমি যা মতলব করেছ, তা করতে যেও না!

—মতলব করেছি! কী মতলব করেছি আমি?

—আমি জানি। তুমি শাস্তর মান না, দিব্যি দিলেও মান না—তুমি একটা কালাপাহাড়! তুমি খোঁজ নিতে যেওনা গো-আড়ি গাঁয়ে। যা ভাবছ তা হবে না। তুমি ধরা পড়ে যাবে!

—ধরা পড়ে যাব! কার কাছে?

—আমার কাছে! তুমি ভেবেছ—জেনে আসবে, কিন্তু তেমন-তেমন খবর থাকলে তা চেপে যাবে! পারবে না। তোমার মুখ দেখেই আমি বুঝে ফেলব! কী দরকার খুঁচিয়ে ঘা

করার? যা হবার নয় তা হবে না! মা ঠিকই বলেছেন—এখন ও বিষয়ে কোন খোঁজ খবর নিতে যেও না। আমি এই তো বেশ আছি!

—ঠিক আছে। তাই যখন তোর ইচ্ছে!

কাতু এবার অন্য জাতের প্রশ্ন করে, আচ্ছা, এ লোকটার অমন অদ্ভুত নাম কেন? ঝষধ্বজ! এমন নাম বাপের জন্মে শুনিনি। তার মানে কী?

রূপেন্দ্র বললেন, 'ঝষ' মানে 'মীন', মাছ। শব্দটা বহুব্রীহি সমাস। তার অর্থ 'ঝষ ধ্বজ যাহার'।

—তারই বা মানে কী?

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল রূপেন্দ্রের। বললেন, কী করে তোকে বোঝাই! তুই যে কুলীন ব্রাহ্মণের জীবনকাব্যে উপেক্ষিতা! 'মীনধ্বজ'কে তুই যে চিনিস না!

কাত্যায়নী ভুল বুঝল। তার নিরক্ষরতার প্রতি এটা একটা ব্যঙ্গ মনে করে বলে, আমাদের তো হল না। বৌরানীকে বরং শিখিও—জেঠামশায়ের মতো!

বেচারী কাত্যায়নী!

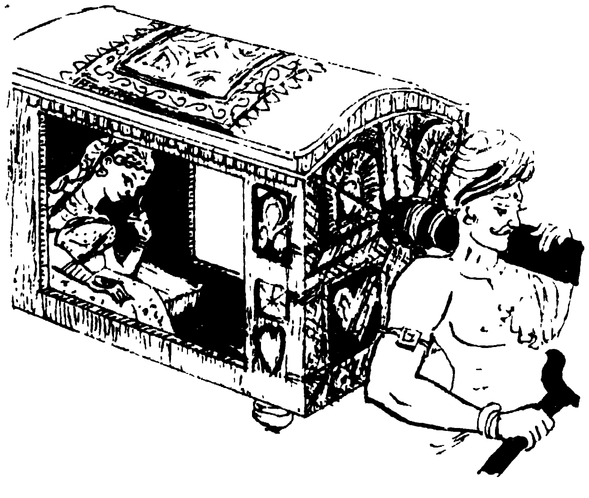

নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগর : 1742

তৃতীয় পর্ব

নবদ্বীপ।

জননী জাহ্নবীর দুই আত্মজা—ভাগীরথী আর জলাঙ্গীর বিয়ে হল ভিন্ন ভিন্ন গাঁয়ে। রাঙা চেলিতে কিশোরীতনু ঢেকে দুই চন্দন-চর্চিতা বালিকাবধূ গেল দু-মুখো, ঘর-সংসার করতে। তারপর যে-যার শ্বশুরঘরে গিন্নিপনা সেরে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরতে ঘুরতে একেবারে দুজনের মুখোমুখি!

'ওমা! মুখপুড়ি! তুই হেথায় এলি কোত্থেকে?' —বলে এ-ওর গলা জড়িয়ে ধরল। সেই যে কথায় বলে না—'গাঙে গাঙে দেখা হয়, তবু বোনে বোনে হয় না!' —এ যেন সেই বিত্তান্ত। দেখা হতেই দুই বোন দুজনকে বুকে জড়িয়ে ধরল। হাপুস-নয়নে কান্না! কত সুখ-দুঃখের গপ্পো। তারপর পানের বাটা খুলে বললে, নে, পান খা!

দুই বোনের সেই মিলনস্থলটির নামই হল গিয়ে—নবদ্বীপ!

কোন্ বিস্মৃত অতীতে এই জনপদটি গড়ে উঠেছিল তা বাপু ভুলে বসে আছে বুড়ো ইতিহাস। শুধালে বলে, কী জানি বাপু, জান্নে!

কেউ বলে, দুই নদীর মিলনস্থলে রাখা সেই সোনার পানের বাটার উপরে জেগে উঠেছিল একটা চরা বা দ্বীপ। নতুন গজানো দ্বীপ বলে তার নাম 'নবদ্বীপ'। আবার কেউ বলে, ছাই জান তোমরা—'নব' মানে 'নতুন' নয়; এ হল গিয়ে 'আটের-পরে-দশের-আগের' নয়। ঐ নতুন-জাগা চরে আশ্রয় নিয়েছিলেন এক মহান তন্ত্রসাধক। লোকচক্ষুর আড়ালে তিনি ওখানে বসে গুপ্ত সাধন-ভজন করতেন। সাঁজের বেলায় জ্বেলে দিতেন নয়টি প্রদীপ—নবগ্রহের উদ্দেশ্যে। সারারাত নদীকিনারে জ্বলত সেই নয়টি প্রদীপ। নদীপথে নৌকার যাত্রীরা ঘন আঁধারে তান্ত্রিককে তো দেখতে পেত না—দেখত শুধু অনির্বাণ শিখায় জ্বলছে নয়টি ঘৃতপ্রদীপ। তা থেকেই ঐ দ্বীপের নাম হয়ে গেল নব-দীপ, বা নবদ্বীপ।

সেন বংশীয় নৃপতি বল্লাল সেন এখানে বানিয়ে ছিলেন একটা জবর প্রাসাদ—একেবারে গাঙের কিনার সই-সই: 'গঙ্গাবাস'। সেটা দ্বাদশ শতাব্দীর ঘটনা। ঐ প্রাসাদ থেকেই পরে

নবদ্বীপ

মহম্মদ বক্‌তিয়ারের আক্রমণে বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন গঙ্গাযোগে পলায়ন করেন। তোমাদের যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে এখনো গিয়ে দেখে আসতে পার—সেই গঙ্গাবাসের দু-দশখানা ছোট মাপের পাতলা বাঙলা ইট—গাঙের পুবপারে। ঐ যে এখন জমজমাট মায়াপুর আশ্রম হয়েছে তার মাইল-খানেক উত্তরে—বামুনপুকুর গাঁয়ে। তবে আমার কথা শুনে অতদূরে গিয়ে যদি দেখ সবই ভোঁ—ভাঁ, তাহলে আমাকে দোষ দিও না বাপু! বিশ্বাস কর, আমাদের হাফ-প্যান্ট-পরা যুগে—বিশ-ত্রিশের দশকে তা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি!

এখন হয়তো কিছুই নেই, পরে একথা লোকে বিশ্বাস করবে না। তাই আমাদের শিশুকালে কী ছিল তাই বরং লিপিবদ্ধ করে যাই—

প্রাচীন মায়াপুর থেকে আধমাইলটাক উত্তরে বামুনপুকুর গাঁ। সেখানে কোন পুকুর দেখেছি কিনা মনে নেই, তবে চাঁদকাজীর সমাধি ছিল। আর সেই সমাধির ঠিক পাশে ছিল প্রকাণ্ড—অতি প্রকাণ্ড একটা গোলক-চাঁপার গাছ। আজও যদি সেটা বেঁচে থাকে, তবে চাঁদকাজীর সমাধিটা খুঁজে নিতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। এত বড় গোলকচাঁপার গাছ তোমার কখনো দেখনি। ভাল কথা, চাঁদকাজীকে চিনতে পারলে তো? তাঁর আসল নাম মৌলানা সিরাজউদ্দীন। তাও চিনতে পারলে না? বলি শোন, গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ্‌র নামটা শুনেছ তো? সেই যিনি ফতোয়া জারী করেছিলেন—শ্রীচৈতন্যদেব নগর সংকীর্তন করতে পারবেন না। এই চাঁদকাজী ছিলেন সেই হুসেন শাহ্‌র শিক্ষক। তাঁরই মোক্তবে পড়তে যেতেন হুসেন শাহ্‌। কী পড়তেন? শোন বলি: মোক্তবে তখন তিনজাতের শিক্ষা দেওয়া হত। প্রথমত 'তাবি', অর্থাৎ ভৌত-বিজ্ঞান, দ্বিতীয়ত 'রিয়াজি'—তার মানে হল গিয়ে অঙ্ক আর অলঙ্কার শাস্ত্র। শেষ 'ইলাহি'—ধর্মতত্ত্ব, অল্লাহ্‌র উপাসনা। এ তিন বিদ্যা আয়ত্ত না করলে মুসলমান সমাজে 'আলিম' হওয়া যেত না।

চাঁদকাজী 'মোছলমান', কিন্তু ভক্ত বৈষ্ণবেরা সে আমলে ঐ সমাধি প্রদক্ষিণ করে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করতেন, চিরাগ জ্বেলে দিয়ে যেতেন। ঐ চাঁদকাজীর শিক্ষার বনিয়াদ ছিল বলেই না হুসেন শাহ্‌ শেষ-মেশ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের মহিমা।

সমাধি মন্দিরের কিনার-ঘেঁষে মৌলানা সিরাজউদ্দীনের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

অদূরেই 'বল্লাল ঢিবি'।

প্রায় সওয়া শ মিটার দীর্ঘ আর তিনতলা সমান উঁচু। দূর থেকে মনে হয় একটা প্রাকৃতিক টিলা। আসলে তা গঙ্গাবাসের ধ্বংসস্তূপ। এখন এলাকাটা পুরাতত্ত্ব বিভাগের দায়িত্বে সংরক্ষিত। আমরা ওখানেই দুদশখানা পাতলা বাঙলা-ইট দেখেছি প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। তোমরা পথ চিনে চিনে অকুস্থলে পৌঁছে হয়তো এখন দেখতে পাবে শুধু সেই নীলরঙা বোর্ডে পরিচিত সাদা হরফের একটা বাঁধা বয়ান। ইংরাজী ভাষার 'নুটিশ'—যার বয়ান লর্ড কার্জনের:

এই স্থান সংরক্ষিত!

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রায় সমকাল থেকে বাঙালী মনীষার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে নবদ্বীপ। তার দুটি ধারা—যেন ভাগীরথী আর জলাঙ্গীর মিলন। জলাঙ্গী—নব্যন্যায়; আর ভাগীরথী চৈতন্যভাবধারা। দ্বিতীয় ভাবধারার সঙ্গে আমরা সুপরিচিত—তাই নব্যন্যায় চর্চার কথাই বলি—

প্রাক-চৈতন্যযুগ থেকেই বেদান্তের অনুশীলন হত—শঙ্করাচার্যের মায়াবাদকে খণ্ডনের একটা প্রবণতা দেখা যেত। এ অঞ্চলে ন্যায়-বৈশেষিকের প্রাধান্যের ফলে। আদি শঙ্করাচার্যের গুরু গোবিন্দপাদের গুরুদেবের নামই ছিল 'গৌড়পাদ'। নামেই হয়তো পরিচয়, তিনি ছিলেন—গৌড়জন। গৌড়ীয় নব্যন্যায়ের চর্চা যদিচ প্রাগ্‌বর্তীকাল থেকেই অন্তঃসলিল ধারায় প্রবাহিত ছিল, তবু তা ভীমনাদিনী হয়ে উঠল বাসুদেব সার্বভৌমের (জন্ম আনুমানিক: 1420) সময় থেকে। বাসুদেব এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণি (জ·আ: 1455) এ ধারার যুগ্ম-ভগীরথ। এবং স্মার্ত রঘুনন্দন।

ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থ মহর্ষি গৌতম বিরচিত ন্যায়সূত্র। পরে ঋষি বাৎস্যায়ন রচনা করেন তার ভাষ্য, আর তারও পরে উদ্দোতকর প্রণয়ন করেন ন্যায়ের টীকা-টিপ্পনী। নব্যন্যায়ের চর্চা প্রধানত সীমিত ছিল মিথিলায়। গৌড়ীয় বিদ্যার্থীকে ঐ জ্ঞান আহরণের জন্য মিথিলায় যেতে হত। কী-ভাবে সেই নব্যন্যায় মিথিলা থেকে নবদ্বীপে আসে তা নিয়ে কিছু কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীর নায়ক কোথাও বাসুদেব সার্বভৌম, কোথাও বা তাঁর শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণি। নায়ককে সনাক্ত নাই বা করলাম, গল্পটা শোন—

গৌড়ীয় পণ্ডিত নব্যন্যায় অধ্যয়ন করতে মিথিলায় এসেছেন। মিথিলার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের চতুষ্পাঠীতে দীর্ঘদিন অধ্যয়ন করে স্বহস্তে রচনা করলেন নানান টীকা-টিপ্পনী। শিক্ষা সমাপনান্তে যখন তিনি গুরুর কাছে বিদায় চাইলেন তখন পক্ষধর মিশ্র বললেন, ও কী বাবা! তোমার ঐ পুঁথিগুলি তো তুমি গৌড়ে নিয়ে যেতে পার না।

গৌড়ীয় পণ্ডিত সবিস্ময়ে বলেন, কেন গুরুদেব? এগুলি তো আমার স্বহস্ত-লিখিত পুঁথি! এ তো আমার নিজস্ব সম্পদ?

গুরু বললেন, সে-কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু এগুলি যদি তুমি গৌড়মণ্ডলে নিয়ে যাও তাহলে ভবিষ্যতে তো সেখান থেকে আর কোন শিক্ষার্থী মিথিলায় আসবে না। আমি কী ভাবে সজ্ঞানে আমার মাতৃভূমি মিথিলার সর্বনাশ করি?

শিষ্য বলেন, যুক্তিপূর্ণ কথা। সে-ক্ষেত্রে আমাকে এ গুরু-গৃহে আরও এক সপ্তাহকাল বসবাসের অনুমতি দিন।

গুরু সহাস্যে বলেন, এক সপ্তাহ কেন, বাবা? তুমি স্বীকৃত হলে মিথিলারাজের কাছ থেকে উপযুক্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তুমি আজীবন মিথিলাবাসী হয়ে থাকতে পার।

তরুণ পণ্ডিত স্মিত হেসে বলেন, তা কেমন করে হবে, গুরুদেব? আমিও তো সজ্ঞানে আমার মাতৃভূমি নবদ্বীপের সর্বনাশ করতে পারি না।

সপ্তদিবস-রজনী শিষ্য ঐ চতুষ্পাঠীর এক রুদ্ধদ্বার গৃহে তাঁর রচিত টীকা-টিপ্পনী আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করে ফেললেন। বিদায়কালে যখন রিক্তহস্তে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন নব্যন্যায়ের বিভিন্ন সূত্র ও ব্যাখ্যা তাঁর মস্তিষ্ক-মঞ্জুষায় থরে থরে সাজানো।

গৌড়ীয় বিদ্যার্থীকে অতঃপর নব্যন্যায় চর্চার জন্য মিথিলায় যেতে হত না।

এই প্রচলিত কাহিনীর অনুপ্রেরণাতেই সতেন্দ্রনাথ তাঁর 'বাঙালী' কবিতায় লিখেছিলেন,'...পক্ষধরের পক্ষশাতন করি/বাঙালীর ছেলে ফিরে এল ঘরে যশের মুকুট পরি।'

কারও মতে ঐ নবীন গৌড়ীয় পণ্ডিত স্বয়ং বাসুদেব সার্বভৌম। সেটি ভ্রান্ত হতে বাধ্য।

কারণ তিনি পক্ষধর মিশ্রের সমসাময়িক পণ্ডিত এবং পিতা নরহরি বিশারদের নিকটেই নব্যন্যায় শিক্ষা করেন—জীবনে কখনো মিথিলা যাননি। পুরী গেছেন, বারাণসী গেছেন, মথুরা-বৃন্দাবন পরিক্রমা করেছেন; কিন্তু মিথিলা নয়।

কারও মতে এ কাহিনীর নায়ক রঘুনাথ শিরোমণি, যাঁর আর এক নাম 'কাণভট্ট' শিরোমণি। তিনি বাসুদেব সার্বভৌমের শিষ্য; তাঁর একটি চোখে দৃষ্টি-শক্তি ছিল না বলেই ঐ নাম। তিনিও কিন্তু পক্ষধর মিশ্রের কাছে নব্যন্যায় শিখতে যাননি।

তার মানে কি সত্যেন দত্ত ওটা ভুল লিখেছেন? পক্ষধরের পক্ষশাতন কোন বাঙালী পণ্ডিত করেননি? না, সেটাও ঠিক নয়। করেছিলেন। অযোধ্যা নয়, বাল্মীকির মনোভূমিই যেমন শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান, ঠিক তেমনি ঐ খণ্ডকাহিনীটি প্রচলিত প্রবাদ হওয়া সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরিবেশিত কাব্যসত্য ঋত! সেই সত্যকাহিনীটি এবার বলি—

নব্যন্যায়ের এক জটিল তত্ত্বের সমাধান হচ্ছিল না। মৈথিলী পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে দ্বিমত। তখন মিথিলারাজ এক মহতী বিচার-সভার আয়োজন করলেন। একপক্ষে মৈথিলী বিদ্বৎসমাজের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্র, অপরপক্ষে নবদ্বীপপন্থী গৌড়ীয় পণ্ডিতেরা। মিথিলারাজের নিমন্ত্রণ এসে পৌছাল নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজের মধ্যমণি বাসুদেব সার্বভৌমের নিকট। বাসুদেব স্বয়ং সে বিচার-সভায় গমন করলেন না। পাঠিয়ে দিলেন নিজের প্রিয় শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণিকে। তাঁর সঙ্গে আর দুই পণ্ডিত—কুশদহ বিদ্বৎসমাজের জনৈক তর্কসিদ্ধান্ত—যাঁর পূর্ণ পরিচয় সংগ্রহ করতে পারিনি, আর নলদ্বীপ ভট্টাচার্য বংশীয় বিষ্ণুদাস সিদ্ধান্ত।

বিচার্য বিষয়টা যে কী, তা বুঝবার মতো বিদ্যে আমার নেই। একটি উদ্ধৃতি শুধু পরিবেশন করতে পারি, মহাপণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের "বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান (১ম)" গ্রন্থ থেকে। দেখুন, আপনারা ধরতাইটা ধরতে পারেন কি না—"বিচার্যের বিষয় ছিল সামান্য লক্ষণা-নামক ন্যায়শাস্ত্রসম্মত অলৌকিক সন্নিকর্ষ।"

ঘটনাটা 1480-85-এর ভিতর।

স্বয়ং বাসুদেব সার্বভৌমের পরিবর্তে গৌড়মণ্ডল থেকে তিন-তিনজন নব্যপণ্ডিত উপস্থিত হয়েছেন দেখে ক্ষুব্ধ হলেন মহাপণ্ডিত পক্ষধর মিশ্র। যদিচ তিনি পূর্বপক্ষের দলপতি, তবু তাঁর শিষ্যত্রয়ীকে ঐ গৌড়াগত উত্তরপক্ষের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বললেন। স্বয়ং নীরব শ্রোতার ভূমিকা অবলম্বন করলেন।

কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, মিথিলাপক্ষ বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছেন। বাধ্য হয়ে এর পর পক্ষধর মিশ্র স্বয়ং বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে শুরু করলেন। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণির ক্ষুরধার যুক্তিতে তাঁর সমস্ত যুক্তিই ভেসে গেল। পক্ষধর সংযম হারালেন। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি—শেষ পর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি রঘুনাথের উদ্দেশ্যে একটি শ্লেষাত্মক শ্লোক রচনা করে তাঁকে আক্রমণ করলেন—

> "বক্ষোজপানকৃৎ[১] কাণ[২]! সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটং।
> সামান্যলক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে।।"

---

[১] বক্ষোজপানকৃৎ= যে বুকের দুধ খায়, অর্থাৎ দুগ্ধপোষ্য শিশুমাত্র
[২] কাণ= কানা

তৎক্ষণাৎ ন্যায়াধিশ বিচারক তর্কযুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছে বলে ঘোষণা করলেন। বললেন, মৈথিলী বৃদ্ধ পণ্ডিত নিজ স্বীকৃতিমতে পরাজিত! কারণ তাঁর যুক্তিতর্ক আর নৈর্ব্যক্তিক নয়। তা তরুণ উত্তরপক্ষ অবলম্বনকারীদের প্রতি প্রযুক্ত অহৈতুক কটুভাষা মাত্র। ব্যক্তিগত আক্রমণ!

এটিই হল কবি সত্যেন্দ্রনাথের ঐ অনবদ্য পংক্তিটির যাথার্থ্য!

বাসুদেব সার্বভৌম পরে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্মের দ্বৈতবাদ স্বীকার করে নেন। তিনি তত্ত্বচিন্তামণির এক অনবদ্য টীকা রচনা করেন। রঘুনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'অনুমানদীধিতি'। পরবর্তীকালে জগদীশ তর্কালঙ্কার(জ:আ:1540) নব্যন্যায়ের আর এক স্তম্ভ। এঁর আর একটি কীর্তি: চৈতন্যদেবের প্রভাবে তিনি আচণ্ডালকে শিষ্যত্বদানে পরাঙ্মুখ হননি। বাস্তবে তাঁর কয়েকজন প্রখ্যাত শূদ্র শিষ্য ছিলেন। আরও অর্ধশতাব্দী পরে গদাধর ভট্টাচার্য, হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার, মথুরানাথ তর্কবাগীশ প্রভৃতি নবদ্বীপের উজ্জ্বল রত্ন। মধুসূদন সরস্বতী বোধ করি অদ্বৈতবাদের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ প্রচারক। তাঁর নামে একটি বহুল প্রচারিত শ্লোক আজও শোনা যায়—

"সরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি মধুসূদন সরস্বতীঃ।
মধুসূদন সরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতীঃ।। [১]

নবদ্বীপ-গৌরবের দ্বিতীয় ধারাটি চৈতন্য-আশ্রয়ী। সে তথ্য সর্বজনবিদিত।

শ্রীচৈতন্যের স্মৃতি-বিজড়িত কত-কী আছে নবদ্বীপে, মায়াপুরে, শান্তিপুরে।

চৈতন্যদেবের জন্মস্থান যে নবদ্বীপধাম, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। প্রশ্ন: সেটি কি গঙ্গার পশ্চিমপারে? অথবা পূর্বে, জলাঙ্গী নদীর উত্তরে? যুক্তিগ্রাহ্য মত—চৈতন্যদেবের জন্মস্থান ঐ মায়াপুর। এ মতের পিছনে বহু পণ্ডিত, ভক্ত এবং পুরাতত্ত্ববিদদের সমর্থন। প্রাচীন ইতিহাস আর বৈষ্ণব গ্রন্থমতে নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্বতটে অবস্থিত। গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থ জনপদকে মনে হয় প্রাচীন নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত কোলদ্বীপ বা 'কুলিয়া-পাহাড়পুর'। ভুললে চল্‌বে না ভাগীরথীর মূল জলধারা তখন ভিন্ন খাতে বইত—জলাঙ্গী, মাথাভাঙা, গড়াই, ইছামতি তখন ছিল দুর্বার। ক্রমে তা পদ্মার পথ খুঁজে নেয়। পরম বৈষ্ণব নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যাম দাস—যিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে, আর শ্রীরূপ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দজীর ভোগ নিজে হাতে রান্না করতেন—তিনি তাঁর সুবৃহৎ গ্রন্থ 'ভক্তি-রত্নাকরে' লিখে গেছেন—

"নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান।।
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর।।"

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কাশীর দণ্ডী সমাজের নেতা প্রকাশানন্দ সরস্বতী—যাঁকে মহাপ্রভু নতুন নাম দিয়েছিলেন 'প্রবোধানন্দ সরস্বতী'—তিনি তাঁর 'নবদ্বীপ শতক' গ্রন্থেও এই মায়াপুরের নাম উল্লেখ করেছেন।

---

[১] বাগ্‌দেবীর জ্ঞানের সীমান্তে যেমন উপনীত হতে পেরেছিলেন মধুসূদন সরস্বতী, তেমনি মধুসূদনের জ্ঞান-সীমার পরিমাপ একমাত্র বাগ্দেবীরই পক্ষে করা সম্ভব।

নবদ্বীপ

এই সব বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন রূপেন্দ্রনাথ। এই সব তীর্থ স্বচক্ষে দেখবেন, তাদের যাথার্থ্য বিচার করবেন—এমন মনোবাসনা নিয়ে তিনি চলেছেন নবদ্বীপে।

আমাদের কাহিনীর কালে নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বয়স বত্রিশ বৎসর। তখনো তিনি 'মহারাজ' হননি। সে খেতাব পেয়েছিলেন পরবর্তী দশকে, সিরাজ-বিতাড়ন নাটকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করায়। প্রজানুরঞ্জন, গুণগ্রাহী, নিজে সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত, শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী এবং বিদগ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ। কিন্তু কূটকৌশলী, প্রাচীনপন্থী, আর আদিরসের দিকে তাঁর ঝোঁক। নবদ্বীপ থেকে তাঁর রাজধানী প্রায় সাত ক্রোশ দূরে—'গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগর'। গোয়াড়ি গ্রামের নামটা যুক্ত করতে হয় 'খানাকুল-কৃষ্ণনগর' থেকে পৃথক করতে।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গুণগ্রাহী অতি ব্যাপক অর্থে। ন্যায় ও বেদান্তের পণ্ডিত, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, কুস্তিগীর, লাঠিয়াল, মৃৎশিল্পী, হাস্যরসিক—প্রভৃতি সকলেই তাঁর অনুগৃহীত। আকবর বাদশাহের মতো তাঁর সভাতেও নবরত্নের প্রভা! স্মার্ত রঘুনন্দনের বংশধর হরিরাম তর্কালঙ্কার, অদ্বৈতাচার্যের অধস্তন পুরুষ শান্তিপুর বিদ্বৎসমাজের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত গোস্বামীপাদ রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি, নবদ্বীপের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক শঙ্কর তর্কবাগীশ তাঁর রাজসভার তিন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। কালীভক্ত কবি রামপ্রসাদ সেন এক পদ্মরাজ মণি। আর পেঁড়ো-ভুরশুটের সেই বাণীর বরপুত্র—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র সে সভার কমলহীরে! আকবর-দরবারে বীরবলের প্রতিচ্ছায়া ঘূর্ণী গ্রাম নিবাসী হাস্যার্ণব গোপালচন্দ্র ভণ্ড!

এসব তথ্যই মোটামুটি জানা ছিল রূপেন্দ্রনাথের। এঁদের সকলের খ্যাতি তখন গোটা রাঢ়খণ্ডে বিস্তৃত। তিনি এসব কথা আরও বিস্তারিতভাবে শুনেছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু মহাপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কাছে। তিনিও ঐ কৃষ্ণচন্দ্রের বৃত্তিভোগী—যদিও তিনি কৃষ্ণনগর রাজসভায় কদাচিৎ পদধূলি দিতেন। বস্তুত তিনি ছাড়াও রাঢ়খণ্ডের অনেকানেক পণ্ডিত ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বৃত্তিভোগী। যেমন হুগলি গুপ্তিপাড়ার রামদেব তর্কবাগীশের সুযোগ্য পুত্র বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। তিনি প্রায়ই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আহ্বানে কৃষ্ণনগরে তাঁর সভা অলঙ্কৃত করতে আবির্ভূত হতেন। তিনি মুখে মুখে কবিত্বপূর্ণ সংস্কৃত শ্লোকে 'পাদপূরণ' করতে পারতেন। পরবর্তীকালে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর উদ্যোগে বাঙলাদেশের তদানীন্তন প্রধান কয়েকজন স্মার্ত পণ্ডিতের প্রচেষ্টায় যখন 'বিবাদার্ণবসেতু' সংকলন-গ্রন্থ রচিত হয়, তখন বাণেশ্বর তার প্রধান রূপকারের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

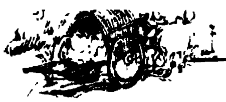

রূপেন্দ্র অশ্বারোহণে যখন শহর গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগরে এসে পৌঁছালেন তখন মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত। পথপ্রদর্শক তাঁকে প্রথমেই নিয়ে গেল ঋষধ্বজের অতিথিশালায়। খ'ড়ো আটচালা। মাটির দেওয়াল, মাটির মেজে; কিন্তু সুনিপুণভাবে নিকানো। বাহিরের দেওয়ালে

কিছু অর্ধোৎকীর্ণ পোড়ামাটির মূর্তি—স্থাপত্যের ভাষায় যাকে বলে 'অল্টো-রিলিভো'। শিল্পীর এলেম আছে—মূর্তিগুলি অতি অপরূপ; কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাতে কিছু স্থূলতার পরিচয়। রূপেন্দ্রনাথ পুরী-ভুবনেশ্বর-কোণার্ক দেখেননি। তাঁর কর্ণদ্বয় রক্তিম হয়ে ওঠে।

মাঝখানে একটিই বড় 'হল'-ঘর। আটটি শয্যা পাতা—কাঠের তক্তাপোষ। তার উপর শয্যা। সাতটি অধিকৃত, অষ্টম শয্যাটি নির্দেশ করে পথপ্রদর্শক সরকার-মশাই বললে, এটি আপনার।

রূপেন্দ্র তাঁর ধূলি-ধূসরিত পরিচ্ছদ খুলে চৌকির উপর রাখলেন। কক্ষস্থ সাতজন অতিথিই কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তাঁকে দেখছিল। কেউ কোন প্রশ্ন করেনি। একটু পরেই একটি মহিলা এসে সরকার-মশাইকে প্রশ্ন করে, ডাকছিলেন?

—হ্যাঁ, মতির-মা, এই ঠাকুরমশাই দিনকয়েক এ বিছানায় থাকবেন। সব ব্যবস্থা করে দিও। উনি মহাপণ্ডিত, ব্রাহ্মণ এবং ভেষগাচার্য। দেখ, যেন আমাদের বদনাম না হয়।

মেয়েটি মিষ্টি করে হাসল। বললে, বদনাম হবে কেনে গো, আমি আছি না?

তারপর রূপেন্দ্রের দিকে ফিরে বললে, ছান করবেন তো, বাবা?

—করব। নদী কি কাছে?

—খড়ে রসি-দুয়েক। চান তো কুয়োর জলও তুলে দিতে পারি।

—'খড়ে' মানে? খড়ে কী?

—জলাঙ্গী নদীর ডাক নাম।

—তা হলে খড়েতেই স্নান করে আসব। কুয়োর জল লাগবে না।

—বেশ কথা। আমি সঙ্গে নোক দিচ্ছি। কাপড় গামছা নে-যাবে আর পথ দেখাবে। ফলার কী হবে, কাঁচা না পাকা? অন্নসেবা করবেন তো?

রূপেন্দ্রকে জবাব দিতে হল না। সামনের চৌকিতে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ থেলো হুঁকা থেকে মুখটা সরিয়ে বললেন, না! তুমি কাঁচা-ফলারেব আয়োজনই করে দাও, মতির-মা!

মতির-মা তাঁর দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে দেখল। হেসে বললে, সবাই যে আপনার মতো ছুঁৎমার্গী হবেন এমন তো কতা নেই!

রূপেন্দ্র বুঝে উঠতে পারেন না, ব্যাপারটা কী। যা হোক প্রথমেই কক্ষবন্ধুর বিরাগভাজন হওয়াটা ঠিক নয়। বললেন, না, অবেলায় আর অন্নসেবা করব না। আপনি অনুগ্রহ করে কাঁচা ফলারের আয়োজনই করুন।

মেয়েটি জিহ্বা দংশন করল। পানদোক্তায় রাঙা টুক্‌টুকে ছোট্ট জিব। বললে, আমারে আবার 'আপনি' কিসের গোঁসাই ঠাকুর? আমি যে সেবাদাসী!

এতক্ষণ স্ত্রীলোকটির দিকে চোখ তুলে তাকাননি। এবার তাকাতে হল। সধবা। বয়স দেড়-কুড়ির কাছাকাছি। প্রসাধনের পারিপাট্য নজর কাড়ে। 'সেবাদাসী' শব্দটায় তার জাত নির্ণয় করা যায়।

মতির-মা নিষ্ক্রান্ত হতে বৃদ্ধ ঘনিয়ে আসেন। বলেন, মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় নেই। কিন্তু 'বামুন' শুনেই নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা মতো বিধান দিয়ে বসেছি। মহাশয় বিরক্ত হননি তো?

—না, না, মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত। এখন অন্নসেবা না করাই বিধেয়।

—সেজন্য নয়, মহাশয়! এখানে যারা অন্নপাক করে তাদের সব শালার গলায় পৈতে আছে, কিন্তু শালারা বামুন কিনা আমাদের সকলেরই সন্দেহ। বিশ্বাস না হয় ভট্টাচার্য-মশাইকে শুধিয়ে দেখুন—

ভট্টাচার্য-মশাই ও-প্রান্ত থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলে ওঠেন, বুয়েছেন, একদিন এক শালাকে পাকড়াও করেছিলাম। শালা গায়ত্রীমন্ত্রটাও উরুচ্চারণ করতে পারল না!

রূপেন্দ্রনাথের মনটা খারাপ হয়ে যায়। এইসব লোকের সঙ্গে তাঁকে একই গৃহে বাস করতে হবে। প্রতিটি বাক্যে যারা ঐ 'মধুর' আত্মীয় সম্বোধনে অভ্যস্ত। হুঁকো-হাতে বলেন, আমরা সবাই কাঁচা সিধা নিই, পালা করে স্বপাক রন্ধন করি। ও-বেলা সে ব্যবস্থাই করা যাবে। আসুন, একটু তামাক ইচ্ছা করুন। কড়ি-বাঁধা বামুনের হুঁকো।

রূপেন্দ্রনাথ জানালেন, তিনি তামাক-সেবায় অভ্যস্ত নন। বৃদ্ধ বলেন, আমার নাম নিবারণচন্দ্র, ঠাকুরের নাম ৺অনুকূলচন্দ্র ঘোষাল। আদি নিবাস গুপ্তিপাড়া; বর্তমানে এই শালা দপ্তর বৃত্তিভোগী। মশায়ের পরিচয়?

রূপেন্দ্রনাথ সংক্ষেপে নিজ পরিচয় দিলেন। জানালেন, তিনি মাত্র দু-একদিন থাকবেন। গৃহস্বামীর চিকিৎসা করতে এসেছেন।

নিবারণচন্দ্র আরও ঘনিয়ে এলেন। তাঁর মুখে দুর্গন্ধ! রূপেন্দ্রের কর্ণমূলে বললেন, শিবের অসাধ্য ব্যামো মশাই! কুষ্ঠ। চিকিচ্ছে নেই!

—কুষ্ঠ! আপনি কী করে জানলেন?

নিবারণচন্দ্র সরবে তাম্বাকু 'ইচ্ছা' করতে থাকেন। ভাগ্যক্রমে তখনই ফিরে এল মতির-মা। সঙ্গে একটি অল্পবয়সী ছেলে—যে ওঁর কাপড়-গামছা নিয়ে পথ দেখিয়ে ঘাটে যাবে।

দ্বিপ্রহরে নিবারণচন্দ্র তাঁর দুর্গন্ধযুক্ত নিশ্বাস নিয়ে পুনরায় ঘনিয়ে এসে বসলেন। অন্যেরা দিবানিদ্রায় মগ্ন। নিবারণ দিবাভাগে নিদ্রা দেন না—'দিবা মা শাপ্সি'—শাস্ত্রের বচন। উপায় নেই, ভদ্রতার খাতিরে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে সেই দুর্গন্ধযুক্ত সুখদুঃখের কথা কিছুক্ষণ শুনতে হল। সদ্‌ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। পিতৃদেবের সংস্কৃত টোল ছিল—গুপ্তিপাড়া গ্রামেই। নিবারণও প্রথমে পৈত্রিক বৃত্তিই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ওঁর গ্রামস্থ শ্যালকেরা শ্যালক-পুত্রদের নাকি 'সমোস্‌কৃত' শেখাতে চায় না। সবাই ফারসী শিখবে! নবাব সরকারে চাকরি নেবে। সমোস্‌কৃতের অং-বং মন্ত্র শিখে কী লাভ? চাল-কলা-নৈবেদ্যে কারও মন ওঠে না। নিবারণচন্দ্রের দুই বিবাহ, দুই স্ত্রীর সর্বসাকুল্যে সাতটি সন্তান। একটি মাত্র কন্যাকে পার করেছেন; 'পার' অর্থে সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়ার আয়োজন মাত্র। সে আবাগীও ওঁর অন্নধ্বংস করছে—জামাতা বাবাজীবন বিবাহ-বিশারদ। তাকেও দোষ দেওয়া যায় না। চারকুড়ি বৌ নিয়ে তো কেউ সংসার ধর্ম করতে পারে না! বছরে দুবার আসে। পার্বণী নিয়ে যায়। ভগবান রক্ষা করেছেন—সেই ঝাঁকি-দর্শনের ফলে কোন নাতি-নাতনি এসে সংসারের ভারবৃদ্ধি করেনি।

একনাগাড়ে বক্‌বক্‌ শুনতে ভাল লাগছিল না। রূপেন্দ্র প্রশ্ন করেন, এখানে আপনাকে কী-জাতীয় কাজ করতে হয়? দুপুরে বিশ্রাম নিচ্ছেন বলে জানতে চাইছি।

—আমার কাজ সাঝের ঘোরে। দত্তজা হুজুরকে 'সমোস্‌কৃত-খেউড়' শোনানো। 'সমোস্‌কৃত-খেউড' শব্দটির অর্থ অন্বয়-ব্যাখা করে বুঝিয়ে দেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁকে উপস্থিত হতে হয় ঋষধ্বজের প্রমোদকক্ষে। 'চৌরপঞ্চাশিকা' জাতীয় আদিরসাত্মক সংস্কৃত কাব্যপাঠ করে শোনাতে হয়। ঋষধ্বজ সংস্কৃত জানেন না; কিন্তু দেবভাষার ঐসব বিশেষ কেচ্ছার দিকে আকর্ষণ। শুধু পাঠ নয়, ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হয়। সক্ষেদে বলেন, বললে বিশ্বাস করবেন না বাঁড়ুজ্জেমশাই, পাষণ্ডটা জেনে বুঝে এই বুড়োটাকে নাকাল করে। সামনে মদের গেলাস, দুপাশে দুই ষণ্ডামার্ক যৌবনবতী উপপত্নী; আর শালা ন্যাকা সেজে বলে—ঐখানটা তো ঠিক বুঝলাম না পণ্ডিতমশাই! 'বিপরীত-রত্যাতুরা' শব্দটার মানে কি হল? তোমরা বুয়েছ?' আর দুই হারামজাদী সব জেনে-বুঝে নেকী সেজে বলে, 'না পণ্ডিতমশা, আমরাও বুঝিনি! ওর মানে কী?' বুঝুন কাণ্ড! আমার তিনকুড়ি বয়স হল—ঐ জোয়ান মাগী দুটোকে বুঝিয়ে বলতে হবে, 'বিপরীত রত্যাতুরা'র মানে! ওরা সব জানে, সব বোঝে—এ শুধু বুড়ো মানুষকে নাকাল করা।

রূপেন্দ্র বলেন, দু-দুটো! একসঙ্গে? কেন?

—ঐ যে শাস্ত্রে বলেছে—'নাল্পে সুখমস্তি'! টাকায় যার ছাতা ধরছে সে এক-কুড়ি এক সঙ্গে নিয়ে বসলেই বা ঠেকাচ্ছে কে? বললে পেত্যয় যাবেন না মশাই—দুটো মাগীকে নাকি দুই পাশবালিশ করে দু পাশে নিয়ে রাত্রে শোয়!

রূপেন্দ্র বলেন, থাক ঘোষাল মশাই। এ আলোচনা আমার ভাল লাগছে না।

—বলতে কি আমারই ভাল লাগছে বাঁড়ুজ্জেমশাই? আমারও তো দু-দুটি ধর্মপত্নী—কিন্তু দুটোকে নিয়ে এক বিছানায় কোনদিন শুইচি? বাৎস্যায়ন বলেছেন পর্যায়ক্রমে···

রূপেন্দ্র উঠে পড়েন। বলেন, আপনি বিশ্রাম করুন, আমি একটু ঘুরে আসি।

অশ্বটি প্রাঙ্গণে বাঁধা আছে। সৈনগুপ্ত। ইতিমধ্যে সেও দানাপানি পেয়েছে। প্রভুকে দেখেই হ্রেষাধ্বনি করল। রূপেন্দ্রনাথ ভেবে দেখলেন, ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দুগর্ন্ধযুক্ত—উভয়ার্থেই—অভিযোগ শোনার চেয়ে শহরটা এক চক্কর ঘুরে এলে মন্দ হয় না। নদীয়ায় অনেক অনেক দ্রষ্টব্য। তিনি দু চারদিন থাকবেন মাত্র। তাও বাসস্থানটা পরিবর্তন করে কোন পান্থশালায় আশ্রয় জুটিয়ে নিতে পারলে। একটি মধ্যাহ্নই বা অপব্যয় করেন কেন? বাজারের দিকে গিয়ে লাভ নেই। মধ্যদিনে দোকানপাঠ সম্ভবত সবই রুদ্ধদ্বার। কোথায় যাবেন? ঘূর্ণী গ্রামে মৃৎশিল্পীদের বাস। তাদের হাতের কাজ নাকি অপূর্ব। কিন্তু খরমধ্যাহ্নে সে সব বিপণীও সম্ভবত রুদ্ধদ্বার। মনে পড়ে গেল, এই কৃষ্ণনগরের এক ক্রোশ দক্ষিণে আছে দোগাছিয়া গ্রাম। সেখানে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মাথার উষ্ণীষটি সুরক্ষিত। একটা ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য—মহা পুণ্যতীর্থও। কিন্তু ঐ সঙ্গে মনে পড়ে গেল—সাধারণ দর্শক তা বৎসরের একটি চিহ্নিত দিনেই দেখবার সৌভাগ্যলাভ করে। সে দিনটির মাত্র এক পক্ষকাল বাকি: অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে দোগাছিয়ায় 'মূলী মহোৎসবে' একটি মেলা হয়। তখনই উষ্ণীষটি সর্বসাধারণকে দেখানো হয়। ফলে দোগাছিয়া যাওয়ার অর্থ হয় না।

দেবপল্লীর নৃসিংহ মন্দির দেখে এলে কেমন হয়? দেবপল্লী শহর কৃষ্ণনগর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে মাত্র দেড় ক্রোশ দূরত্বে। মন্দিরের দ্বার খোলা থাকতে পারে। পথের নির্দেশ জেনে

নিয়ে সেদিকেই রওনা দিলেন অশ্বপৃষ্ঠে।

দেবপল্লী বা দেপাড়া একটি প্রাচীন জনপদ। এ অঞ্চলের ঐ নৃসিংহদেবের মূর্তিটির অসীম মাহাত্ম্য। নদীয়া রাজার প্রদত্ত ভূসম্পত্তির আয় থেকে এই দেব-বিগ্রহের নিত্য সেবার ব্যবস্থা। জনশ্রুতি এ মূর্তি কেউ নির্মাণ করায়নি। ইনি অনাদি বা স্বয়ংপ্রকাশ। প্রতি বৎসর বৈশাখী শুক্লা চতুর্দশীতে এখানে অন্নোৎসব হয়। গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরের সদ্যোজাত সন্তানের পিতা-মাতা সারা বছর ধরেই এই দেপাড়ায় আসেন—নৃসিংহদেবের ভোগ দেন—আর ঐ দেবতার প্রসাদী অন্নেই নবজাত শিশুর অন্নারম্ভ অনুষ্ঠান হয়।

অনতিবিলম্বে উপনীত হলেন দেবপল্লীতে। পথের ধারে জঙ্গলাকীর্ণ উঁচু ঢিপির একাংশে নৃসিংহদেবের মন্দির। সুবৃহৎ মন্দির[1]। ঐ সুউচ্চ ঢিপি দেখে বোঝা যায়, এখানে পূর্বযুগে একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। পাশেই প্রকাণ্ড বিল। তার একাংশের নাম 'চামটার বিল'। এই বিল থেকে মৃত্তিকা সংগ্রহ করেই কি ঐ জনপদ গড়ে উঠেছিল? 'চামটার বিল' নামটি হয়েছে 'চামুণ্ডার বিল' শব্দ থেকে। এক কালে এই বিলের পাশে চামুণ্ডা দেবীর একটি মন্দির ছিল নিশ্চয়। হয়তো তারও পূর্বে ছিল এক বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম[2]।

সৌভাগ্য রূপেন্দ্রনাথের। মন্দিরের দ্বার খোলা ছিল। পুরোহিত ওঁকে চরণামৃত দিলেন। কষ্টিপাথরের প্রকাণ্ড দেবমূর্তি। বহুস্থানেই অঙ্গহানি হয়েছে। সাধারণত অঙ্গহীন হলে দেবতার পূজা বন্ধ হয়ে যায়। নৃসিংহদেবের তা হয়নি—যেহেতু তিনি অনাদি বিগ্রহ। জনশ্রুতি নৃসিংহদেবের ভ্রূমধ্যে একটি পরশমণি ছিল। সেটি অপহরণের উদ্দেশ্যেই ঐ অঙ্গহানি। যে তস্কর সেই পরশপাথরখানি খুলে নিয়েছিল সে তা ব্যবহার করতে পারেনি—এটাই তস্করের দুঃখ এবং সাধুর সান্ত্বনা! দেবতার ভ্রূ মধ্য থেকে বিচ্যুত হওয়ামাত্র স্পর্শমণি তার অলৌকিক গুণটি হারিয়ে ফেলে! যতদিন দেবতার ভ্রূমধ্য ছিল ততদিন নাকি এয়োস্ত্রীর দল ঐ পাথরে হাতের নোয়া ছুঁইয়ে সোনার বালা পরে ঘরে ফিরত। দেবতার অঙ্গচ্যুত হবার পর সেই পরশমণি হয়ে গেল মামুলি পাথর! দেবমূর্তির উচ্চতা দ্বি-হস্ত পরিমাণের অধিক। পদতলে প্রহ্লাদ, অঙ্কে হিরণ্যকশিপু।

রূপেন্দ্রনাথ যখন শহরে ফিরে এলেন তখন পড়ন্ত বেলা।

নিবারণচন্দ্র অপেক্ষা করছিলেন। প্রশ্ন করেন, কোথায় গেছিলেন?

—দেবপল্লী। নৃসিংহদেবের মন্দির দেখে এলাম।

—বড় জাগ্রত দেবতা। চলুন, এবার দত্তবাড়ি যাই!

বেশ বড় প্রাসাদ। দ্বিতল। সামনে লোহার সিং-দরোজা। খিলানের উপর থাবা-তোলা এক সিংহ মূর্তি। কার্নিশে অসংখ্য গোলা পায়রা। ওঁদের দেখতে পেয়েই দত্তজার সেই সরকারবাবু—যে ওঁকে সোঞাই থেকে নিয়ে এসেছে—সে এগিয়ে এল। নিবারণচন্দ্রকে বললে, আপনি আজ আসুন পণ্ডিতমশাই। আজ সন্ধ্যায় পাঠ হবে না। আপনার ছুটি।

---

[1] রূপেন্দ্রনাথ দৃষ্ট মন্দির বর্তমানে অবলুপ্ত। এখন—চল্লিশ বছর আগে দেখেছি—সেই আদিম মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ—ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কালো আর পিঙ্গল বর্ণের বালি-পাথর বা স্যান্ডস্টোন। এখনও তা দেখা যায় কিনা জানি না। পরে একটি ছোট মন্দির তৈরী করা হয়েছে বলে শুনেছি।

[2] চল্লিশের দশকে এখানে একটি ব্রোঞ্জধাতুর 'উগ্রতারা'র মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

রূপেন্দ্রকে বললে, আপনি ঐ বৈঠকখানায় গিয়ে বসুন। আমি হুজুরের কাছে এত্তেলা পাঠাচ্ছি।

নিবারণচন্দ্র বিদায় নিয়ে ফিরে গেলেন। সরকারবাবু অন্দরের দিকে এগিয়ে গেল। রূপেন্দ্রনাথ পায়ে পায়ে অগ্রসর হয়ে আসেন বৈঠকখানায় দিকে।

প্রকাণ্ড ঘরটি। একদিকে বিরাট বড় একটা তক্তাপোষ। তার উপরে জাজিম পাতা। তিনচারজন পণ্ডিত বসে তালপাতার পুঁথি নকল করছেন। অদূরে একটি আরাম-কেদারায় নির্লিপ্তভাবে বসেছিলেন একজন। বয়স ত্রিশের কোটায়। শ্যামবর্ণ। মাথায় বাবরি চুল। শুকচঞ্চু নাসা। চোখদুটি স্বপ্নালু। ভ্রূ মধ্যে একটি শ্বেতচন্দনের ফোঁটা। নগ্নগাত্রে উত্তরীয়—সামবেদী দীর্ঘ উপবীত। রূপেন্দ্র প্রবেশ করতেই দাঁড়ালেন। যুক্তকরে বললেন, নমস্কার। আপনি নিশ্চয় সেই ধন্বন্তরি! আপনি আজই পৌঁছাবেন; আমরা জানতাম।

অনুলেখকেরা চোখ তুলে ওঁকে দেখল। পুনরায় যে যার কাজে নিমগ্ন হল।

রূপেন্দ্র প্রতিনমস্কার করে বললেন, আপনি ঘটনাচক্রে আমার পরিচয় জানেন; কিন্তু আমি মহাশয়ের পরিচয় জানি না।

যুবক তখনও যুক্তকর। সহাস্যে বলেন, বিবৃত করার মতো পরিচয় যে নাই, কী বলব? আমি নদীয়াধিপতি শ্রীমন্ মহারাজের বৃত্তিভোগী এক সামান্য কবি!

রূপেন্দ্রের মনে পড়ে গেল গুরুদেবের বর্ণনা। হুবহু মিলে যাচ্ছে। তিনিও সহাস্যে বলেন, দর্শনমাত্র আপনি আমাকে সনাক্ত করেছেন। আমারও তাই করা কর্তব্য। ...আপনার আদিনিবাস পেঁড়ো, ভুরশুট! ঠিক হয়েছে?

যুবকের আয়ত স্বপ্নময় চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে গেল। বলেন, তাহলে আমি কি ভুল শুনেছি? আপনি চরক-সুশ্রুত নয়, 'ভৃগু' আয়ত্ত করেছেন? আমার আদিনিবাস জানলেন কী করে?

—সহজেই! আপনি বাকপ্রয়োগে 'অ'-প্রত্যয়টি বিনয়বশত পরিত্যাগ করায়।

—'অ'-প্রত্যয়? অস্যার্থ্য?

—নিজের পরিচয় দিলেন 'সামান্য কবি' বলে। 'অ'-প্রত্যয় বাদ গেছে কিনা তা আপনি বুঝবেন না, আপনার বঙ্গভাষায় অধিকার কম! বঙ্গ-সরস্বতীর বরপুত্র অসামান্য কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর এ স্থলে উপস্থিত থাকলে বুঝতেন!

বিস্ময়বিমূঢ় ভারতচন্দ্র এগিয়ে এসে ওঁর দুটি হাত ধরে বলেন, ইতিপূর্বে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে বলতে চান?

—না। এই আমাদের প্রথম পরিচয়। আপনি ইতিপূর্বে আমাকে দেখেননি, কিন্তু আমি আপনাকে চিনেছি। ঘনিষ্ঠভাবে!

—ঘনিষ্ঠভাবে! কোথায়?

—আপনার 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে। ত্রিবেণীতে। আমার গুরুদেবের সংকলনে আপনার সে কাব্যগ্রন্থের একটি অনুলিপি পুথি আছে।

—আপনার গুরুদেব...?

যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়ে রূপেন্দ্র বললেন, আমার শিক্ষাগুরু মহামহোপাধ্যায় জগন্নাথ তর্কালঙ্কার।

ভারতচন্দ্রও উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বলেন, এ তো বড় অদ্ভুত কথা শোনালেন আপনি! তাঁর সংকলনে এ দীন কবির গ্রন্থ!

দুজনে বসলেন পাশাপাশি। রূপেন্দ্র প্রশ্ন করেন, ঋষধ্বজ দত্তমশাই তাঁতের কাপড়ের কেনাবেচা করেন শুনেছি। তাঁর দরবারে আপনি?

একটু আগেই যে নির্মল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়েছিল কবিবরের মুখমণ্ডল তাতে যেন একটি ছায়াপাত ঘটল। বললেন, আমার পরবর্তী কাব্যের কিছু অংশের অনুলিপি করাচ্ছেন দত্ত-মশাই। মূল পাণ্ডুলিপি থেকে—ঐ যে ওঁরা করছেন। সমস্ত গ্রন্থটি নয়, অংশবিশেষ। প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠা। স্বয়ং উপস্থিত থেকে অনুলিপি হয়ে গেলে নিয়ে যাব বলে বসে আছি। মূল পাণ্ডুলিপি তো—খোয়া গেলে সর্বনাশ!

রূপেন্দ্র উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। বলেন, আপনার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ! কী নাম? কী বিষয়বস্তু?

—না, একে ঠিক 'পরবর্তী গ্রন্থ' বলা যায় না। 'অন্নদামঙ্গলের'ই পরবর্তী কিছু অংশ। পূর্ব অংশের সঙ্গে সংযোজন করা হবে।

—কেন? আমাব তো মনে হয়েছিল 'অন্নদামঙ্গল' সুসমাপ্ত।

ম্লান হাসলেন ভারতচন্দ্র। বললেন, অহো ভাগ্য! আপনি কেন একজন রাজাধিরাজ হলেন না? তাহলে আপনার সভাকবি হবার জন্য আর্জি পেশ করতাম।

এ বক্রোক্তির অর্থগ্রহণ হল না। রূপেন্দ্র বলেন, দু একটি পৃষ্ঠা দেখতে পারি?

—আপনার অভিরুচি এবং আমার সৌভাগ্য।

অনুলিপিকারকেরা যে পৃষ্ঠাগুলি অনুলেখন করে সরিয়ে রেখেছে তার একটি তুলে নিয়ে পড়তে থাকেন।

প্রথম পংক্তিটাতেই খটকা লাগল— 'গিরি অধোমুখে কাঁদে, চকোরি পাইয়া চাঁদে...'

কিসের বর্ণনা? পূর্বাপর-পারম্পর্য বুঝে নিতে আগের পৃষ্ঠাটি তুলে নিলেন। ইতিমধ্যে গৃহভৃত্য এসে রায়গুণাকরের হাতে একটি কড়িবাঁধা থেলো হুঁকো দিয়ে গেছে। তিনি গুড়ুক-গুড়ুক টানছিলেন, আর আড়চোখে পাঠককে লক্ষ্য করছিলেন—তার ভ্রূকুঞ্চন, তার ঔৎসুক্য, তার আগ্রহ। লক্ষ্য হল, পর পর সাত-আটখানি পৃষ্ঠা দ্রুত নিশ্বাসে পাঠ করে রূপেন্দ্রনাথ সেগুলি যথাস্থানে নামিয়ে রাখলেন। আরও অনেকগুলি পৃষ্ঠা অপঠিত থাক দেওয়া ছিল—কিন্তু রূপেন্দ্র সে দিকে হাত বাড়ালেন না। কেমন যেন বেদনার্ত হয়ে উঠেছে তাঁর মুখখানি।

রায় গুণাকর প্রখর বুদ্ধিমান। বুঝলেন। তবু প্রশ্নটা পেশ না করে থাকতে পারলেন না, কই, কেমন লাগল বললেন না যে?

রূপেন্দ্রনাথ স্পষ্টবক্তা। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' পাঠ করে এককালে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। সংস্কৃত নয়, সর্বজনবোধ্য সহজ বাঙলায় যে এমন সুললিত কাব্য রচনা করা সম্ভব, এটা যেন সেদিন স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস হয়নি তাঁর। বস্তুত নদীয়া রাজসভার ঐ মধ্যমণিকে প্রত্যক্ষ করার, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার দুরন্ত বাসনা নিয়েই এতটা পথ এসেছেন। মনের পটে কবির যে মূর্তি এঁকেছিলেন তার সঙ্গে বাস্তবের মিল দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তাই দর্শনমাত্র

তাঁকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। কিন্তু ঐ আট-দশটি পৃষ্ঠা পাঠান্তে তাঁর মোহভঙ্গ হয়ে গেছে! মহাকবির অবক্ষয়ে তাঁর অন্তর ক্ষতবিক্ষত। এ কী অশ্লীল রচনা—কী ক্লেদাক্ত দৈহিক মিলন-বর্ণনা! যেন কবি রায়গুণাকর তাঁর হৃদ্‌পদ্মের কোরকটি বাণীর পদতলে অর্ঘ্য দিতে গিয়ে ভুল করে বারবনিতার চরণতলে অঞ্জলি দিয়েছেন! সদ্যপরিচিত কবিকে একথা বলতে বাধল।

কবি হয়তো বুঝলেন, হয় তো বুঝলেন না। বললেন, বাঁড়ুজ্জেমশাই! কবির ভাগ্যে দু-জাতের বিড়ম্বনা। এক: অরসিককে রসনিবেদন; দুই: সুরসিকের উপেক্ষা! প্রশংসা না করতে পারেন তো তিরস্কারই করুন। নীরব কেন পাঠক?

রূপেন্দ্রের নাসাপুট স্ফীত হয়ে উঠল। বললেন, "সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ, মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্। অপ্রিয়ঞ্চাপৃতঞ্চাপি প্রিয়ায়াপি হিতং বদেৎ।।"

ভারতচন্দ্র অধোবদন হলেন। একটু ভেবে নিয়ে বললেন, দীর্ঘ এক বৎসর ধরে আমি যা রচনা করেছি তার মূল্যায়ন কি ঐ কয়খানি পৃষ্ঠা পাঠ করে করা যায়?

রূপেন্দ্র স্পষ্টবক্তা। বললেন, অন্ন সুপরিপক্ক হয়েছে কিনা সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দু একটি চাউলের বেশি পরীক্ষা করতে হয় না।

ভারতচন্দ্র একটু ঝুঁকে আসেন। প্রায় কানে কানে বলেন, কিন্তু আমি তো এক হাঁড়ি আদিরস রন্ধন করিনি, পাঠক! পঞ্চব্যঞ্জন পরিবেশনের বাসনা যে আমার! নবরসের পাকে প্রস্তুত সে আহার্যপাত্রের একটি প্রান্ত থেকে আপনি স্বাদ গ্রহণ করেছেন। ঘটনাচক্রে সেটি নিম-বেগুন! তা থেকেই আপনি বুঝে নেবেন, পরমান্নটা উৎরেছে কি না?

রূপেন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তর করলেন না। কথাটা ভাববার।

ভারতচন্দ্র পুনরায় প্রশ্ন করেন, আপনি ভেষগাচার্য! বিষস্ফোটক অস্ত্রোপচার করেছেন কখনো?

এই অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে পারেন না। বলেন, করেছি। সে-কথা কেন?

—সেই খণ্ডমুহূর্তে যদি আপনাকে আমি দেখতাম, আর এই ধারণা নিয়ে যেতাম যে, ঐ লোকটার দু হাতে শুধু রক্ত আর পুঁজ, তাহলে আমার সে সিদ্ধান্ত নির্ভুল?

রূপেন্দ্রনাথ চমকিত হন। কিন্তু প্রত্যুত্তর দেবার অবকাশ হল না। তার পূর্বেই সেই সরকার-মশাই ফিরে এলেন অন্দরমহল থেকে। রূপেন্দ্রকে বললেন, আজ তো রুগী দেখা হবে না, কবিরাজ-মশাই। উনি অসুস্থ। দেখা করতে পারছেন না। কাল সকালে আপনাকে খবর দেব।

রূপেন্দ্র সবিস্ময়ে বলেন, বুঝলাম না। তিনি যদি অসুস্থই হয়ে থাকেন তাহলে কবিরাজের প্রয়োজনই তো সর্বাগ্রে।

সরকারমশাই মাথা চুলকান। কী জবাব দেবেন বুঝে উঠতে পারেন না। তাঁকে রক্ষা কবেন কবি ভারতচন্দ্র। বলেন, প্রয়োজন হবে না। এ রোগের প্রতিষেধক ওঁদের জানা। হয়তো কিছু তেঁতুলগোলা জল খাওয়াবেন। বারকয়েক বমি হয়ে গেলেই সুস্থ বোধ করবেন উনি।

দিনের আলো কমে এসেছে ইতিমধ্যে। অনুকারকের দল মূল পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাগুলি রজ্জুবদ্ধ করে নমস্কারান্তে বিদায় নিয়েছে। ভারতচন্দ্র সেগুলি বগলদাবা করে রূপেন্দ্রের সঙ্গে ঘর থেকে বার হয়ে আসেন। জানতে চান, কোথায় উঠেছেন আপনি?

রূপেন্দ্র তা জানালেন। এ কথাও বললেন যে, সেই ক্লেদাক্ত পরিবেশটি তাঁর পছন্দ হয়নি। তিনি জানতে চাইলেন, এখানে অর্থমূল্যে কোন পান্থশালায় রাত্রিবাসের আয়োজন হতে পারে কি না।

কবি বললেন, পারে। তবে আমাকে যদি কুসঙ্গ বলে না মনে করেন, তাহলে আপনি আমার গৃহেও অতিথি হতে পারেন।

রূপেন্দ্র ওঁর হাত দুটি ধরে বলেন, এ কী বলছেন, কবি! বিশ্বাস করুন, আমি নদীয়ার এসেছি যে কটি বিস্ময় দেখব বলে তার ভিতরে ছিল 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা। না হলে দর্শনমাত্র কেমন করে আপনাকে চিনব বলুন? কিন্তু এই অবেলায় আমাকে আপনার ভদ্রাসনে নিয়ে গেলে কবিপত্নী অহেতুক বিব্রতা হয়ে পড়বেন।

ভারতচন্দ্র হেসে ফেলেন। বলেন, আপনার আশঙ্কা অমূলক। আমার ভার্যা আছে তার পিত্রালয়ে। আমি এখানে একটি ভৃত্যকে নিয়ে থাকি। আমাব আবাল্যসহচর পুরাতন ভৃত্য। কিছু দুর্মুখ। আমার সহে গেছে। আপনাকেও মেনে নিতে হবে। এ ছাড়া আর কোনও অসুবিধা নেই। বরং আমার কিছু স্বার্থ আছে।

—স্বার্থ! সেটা কী?

—তার পূর্বে বলুন, আমরা কি দত্তবাড়ি থেকে সাত পা পার হয়ে আসিনি।

—সাত-পা! অনেকক্ষণ। কিন্তু এ কথা কেন?

—শাস্ত্র বলেছেন, 'আহুঃ সপ্তপদী মৈত্রী'[১]। সুতরাং আর 'আপনি-আজ্ঞে' নয় রূপেন্দ্র! এবার তোমার প্রশ্নের উত্তরটা দিই। তুমি আমার ভদ্রাসনে আতিথ্য নিলে আমি পঞ্চব্যঞ্জনের পাত্রটি স্বহস্তে তোমাকে পরিবেশন করব। লেখক এবং কবির সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কী জান? একজন সুরসিক বোদ্ধা পাঠক—যে পাণ্ডুলিপি পাঠান্তে তার অকুণ্ঠ মতামত প্রকাশ করতে পারে। সপ্তপদ গমন করার পর যে ঐ উদ্ভট শ্লোকটার তোয়াক্কা করবে না: 'মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।' তুমি সে দায়িত্ব নেবে, বন্ধু? আমার 'বিদ্যাসুন্দর' পাঠ করে প্রয়োজনে আমাকে তিরস্কার করতে?

রূপেন্দ্রনাথ পথের মাঝেই জড়িয়ে ধরলেন ভারতচন্দ্রকে!

—কোবরেজমশাই, এট্টু ইদিকে আসুন দিনি?

রূপেন্দ্রের কর্ণকুহরে কথাটা প্রবেশ করে না। তিনি হীরামালিনীর জবানিতে বিদ্যার রূপবর্ণনায় তন্ময়— 'বিনোনিয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়/সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥ কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা/পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥ কি ছার মিছার কাম ধনু রাগে ফুলে/ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে॥' —এ বর্ণনা অতিশয় কৃত্রিম; কিন্তু অলঙ্কারমাত্রই তো কৃত্রিম! বাকসংযম ও বাকবিস্তারের পর্যায়ক্রমকেই তো বলে কাব্য! নাঃ! ভারতচন্দ্র বাস্তবসীমা লঙ্ঘন করলেও কাব্যসীমার স্বীকৃত সীমান্ত অতিক্রম করেননি!

[১] যার সঙ্গে সাত-পা একসঙ্গে হাঁটা যায়, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে যায়।

1742

—কোবরেজমশাই, শুস্তে পাচ্ছেন?

চম্‌কে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখেন, ভোলা প্রামাণিক দাঁড়িয়ে আছে দ্বারপ্রান্তে। ভারতচন্দ্রের গৃহে আশ্রয় নিয়েছেন। দু কামরার বাড়ি। পাশের ঘরে কবি বসে কাব্য রচনা করছেন। রূপেন্দ্র এঘরে একটি প্রদীপ জ্বেলে বিদ্যাসুন্দরের পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসেছেন। ভোলা কবির গৃহভৃত্য। দীর্ঘদিন সঙ্গে সঙ্গে আছে। রূপেন্দ্র বলেন, আমাকে বলছ?

—ন্যাও ঠেলা! এখানে কি দশ-বিশজন কোবরেজমশাই হাজির?

—কী বলছ?

—এট্টু পাকঘরে আসেন দিনি। ভাতটা ফুটে গেছে। নাবায়ে ফ্যানটা গালেন।

—তুমিই সেটা কর না বাপু? ডাল পাকালে, ব্যঞ্জন পাকালে, আর ভাত পাকাতে পার না?

তা পারুক না পারুক, ভোলা অন্তত চোখ পাকাতে পারে। বললে, ন্যাও ঠেলা! জেতে যে নাপিত! ভাত যতক্ষণ ফোটেনি ততক্ষণ ভোলার ফুটুনি, ফুটলেই ভোলা-নাপতের ফাটা কপাল —ফটাশ্‌!

কবির দীর্ঘ সাহচর্যে ভোলা নাপিতের বাক-প্রয়োগেও কিছু বৈচিত্র্য।

রূপেন্দ্র বলেন, তাহলে তোমার বাবুকে বলছ না কেন?

—এখন? বর্গীরা বাড়িতে আগুন দিলেও এখন ডাকা বারণ। তাহলে গরম ভাতের হাঁড়ি আমার মাথায় ঢেলে দেবেনে। আপনিই বা কী রাজ্জ কাজ্জ করছেন? আসেন, আসেন।

রূপেন্দ্র বিব্রত। বলেন, আমি যে ভাতের ফ্যান গালতে জানি না।

—ন্যাও ঠেলা! নিজির হাতে খাতি জানেন তো? না রান্নাবান্না সেরে শ্যাষে খাওয়ায়ে দিতি হবে?

পাশের ঘরে বোধকরি ভারতচন্দ্রের তন্ময়তা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি উঠে এসে বলেন, রূপেনকে দিক্‌ করছিস্‌ কেন রে হতভাগা? ও পড়ছে পড়ুক। নে চল!

ভোলা কপাল চাপড়ে বলে, ন্যাও ঠেলা। অ্যাদ্দিন শুনি আলাম ‘নিখছে নিখুক’! এখন নোতুন করে শিখতি হবে ‘পড়ছে-পড়ুক’! আমারই পোড়া কপাল!

প্রথম প্রহরের শিবাধ্বনি হতে ভোলা দুটি আসন পেতে দিল রান্নাঘরে। ভাত, ডাল, ব্যঞ্জন, জল-পাত্র, দুটি রেকাবিতে লবণ, গন্ধলেবু, পাপড় ভাজা, কিন্তু অন্নপাত্র দুটি শূন্য। রূপেন্দ্র আচমন করে আসনে বসলেন। ভারতচন্দ্র স্পর্শ বাঁচিয়ে উবুড়-করা অন্নপাত্রটি নিয়ে এসে দুজনের পাতে ভাত বেড়ে দিলেন। আসনে বসতে যাবেন, ধমক দিল ভোলা, উদের মতো চোখ নাকি গো তোমার? হাঁড়ির ভিৎরি আলুসেদ্ধ আছেন,তা বার করতি হবেনি?

ভারতচন্দ্র কথা বাড়ান না? হাঁড়ির তলদেশ হাৎড়ে হাতা দিয়ে তুলে আনলেন আলু সিদ্ধ।

আহারের শেষ পর্যায়ে দুটি রেকাবিতে এক জোড়া করে কী একটা বিচিত্র মিষ্টান্ন নামিয়ে রাখল ভোলা। রূপেন্দ্র দেখলেন তাকিয়ে—মিষ্টান্নের গড়নটি মৃদঙ্গের মতো, অচেনা—মুখে দিয়ে দেখলেন অতি সুস্বাদু। অনেকটা পানতুয়ার মতো; কিন্তু কিছু পার্থক্যও আছে।

আহারকালে তিনি বাকসংযম করেন। আচমনান্তে বলেন, মিষ্টান্নটি তো বড় অদ্ভুত। কী নাম এর?

ভারতচন্দ্র বলেন, সে কি! এ মিষ্টান্ন তোমার অপরিচিত? বর্ধমানে কখনো যাওনি?

—কেন যাব না? কতবার গেছি। সেখানকার বিখ্যাত মিষ্টান্ন তো সীতাভোগ আর মিহিদানা।

—সম্প্রতি এটিও যুক্ত হয়েছে। সে এক মজার গল্প। এর নাম: 'ল্যাংচা'!

—'ল্যাংচা'? এ যে কাব্য-নায়িকার নাম 'বিদ্যা'-র বদলে 'পাঁচি'! এমন অদ্ভুত নাম কেন?

—তাহলে সেই মজার কিস্‌সাটা শোন:

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পরিবারের একটি কন্যার বিবাহ হয়েছিল— কয়েক বছর আগে—বর্ধমান রাজার এক পুত্রের সঙ্গে। বিবাহের কয়েক বছর পরে মেয়েটি সন্তানসম্ভবা হয়। কিছুই তার মুখে রোচে না। তার শাশুড়ী—বর্ধমান মহিষী—নানান সুখাদ্য নিয়ে আসেন; কিন্তু পুত্রবধূ শুধু মাথা নাড়ে। একদিন তিনি জনান্তিকে বৌমাকে চেপে ধরেন, বল মা, তোমার কী খেতে ইচ্ছে করছে?

বালিকাবধূ নতনেত্রে বলেছিল: ল্যাংচা!

ল্যাংচা? খাদ্যদ্রব্য? রানীমা আকাশ থেকে পড়েন! জানতে চান, সেটা কী?

মুখ ফস্‌কে বলে ফেলেছে। বালিকাবধূ কিছুতেই আর কিছু বলে না। পরদিন তার স্বামী জনান্তিকে মাকে জানায় 'ল্যাংচা' কোন খাদ্যদ্রব্যের নাম নয়। তবে বাপের বাড়িতে থাকতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাসাদে ঐ বালিকাবধূ কী একটা মিষ্টান্ন খেয়েছে। তার নামটা ভুলে গেছে। যে তৈরী করত তার একটা পা খোঁড়া! সেই ল্যাংচা-মেঠাইওয়ালার সেই বিশেষ মিষ্টান্নটি আস্বাদনের সাধ হয়েছে আসন্নপ্রসবার। কথাটা সে মুখ ফস্‌কে বলে ফেলেছে। জানাজানি হলে বেচারি নিদারুণ লজ্জা পাবে।

রাজমহিষী গোপনে সংবাদটা জ্ঞাপন করলেন বর্ধমানরাজকে। তৎক্ষণাৎ এক বিশ্বস্ত অশ্বারোহী দ্রুতগতি ঘোড়া ছোটালেন নদীয়ার দিকে—রাজাবাহাদুরের জরুরী এবং গোপনপত্র নিয়ে। অনতিবিলম্বেই বন্দী করে আনা হল সেই খঞ্জ ময়রাকে! কৃষ্ণচন্দ্রের অনুমতিক্রমে বর্ধমানরাজ সেই খঞ্জকে শহর বর্ধমানের পুবে চারক্রোশ দূরে বড়শূল গ্রামে একটি ভূসম্পত্তি দান করলেন। ঘর ছাইয়ে দিলেন। লেংচা-বিশারদ প্রতিষ্ঠা পেল। দোকান দিল বাদশাহী সড়কের উপর শক্তিগড় গ্রামে—বড়শূল থেকে আধক্রোশ দূরত্বে। প্রত্যহ তার ভিয়েন থেকে একমণ করে সেই বিচিত্র মিষ্টান্ন সরবরাহ হতে থাকে বর্ধমান রাজপ্রাসাদে।

খঞ্জ মিষ্টান্ন-বিশারদ সবই পেল—জমি-জেরেত, ঘর-দোকান—খোয়ালো মাত্র একটি জিনিস— তার আবিষ্কৃত মিষ্টান্নের আদিম নামটা।

সেটা হয়ে গেল: ল্যাংচা!

এঁটো তুলে ভোলা এবার নৈশ আহার সারতে বসেছে। তার আগে তাম্বাক দিয়ে এসেছে কবিকে। দুই বন্ধু জমিয়ে বসেছেন আবার ভারতের ঘরে। সুযোগ বুঝে রূপেন্দ্রনাথ বলেন, আমার একটা সমস্যা আছে, কবি। কী কর্তব্য, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। ভেবে-চিন্তে একটা সমাধান বাৎলাও তো।

ভারত বলেন, সমস্যাটা আগে শুনি?

রূপেন্দ্র বিস্তারিতভাবে জানালেন কাত্যায়নী সংক্রান্ত সমস্যাটার কথা। নবমবর্ষে তাঁর ভগিনীটির গৌরীদান হয়েছিল। পাত্রের নাম গঙ্গাচরণ, পিতার নাম বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়। গোয়াড়ি-গাঁয়ের নেদের-পাড়ায়। তারপর এই দীর্ঘ সাত-আট বছর জামাতা বাবাজীবন না-পাত্তা। কৃষ্ণনগরে রুগী দেখতে আসার পূর্বে রূপেন্দ্র স্থির করেছিলেন জামাই-বাড়ির খোঁজ করে ব্যাপারটা জানবেন। কিন্তু কাতুর মা—ওঁর পিসিমা, যাত্রামূহূর্তে কঠিন দিব্যি দিয়ে বসেছেন। এসব দিব্যি-দিলেশ রূপেন্দ্র মানেন না—এগুলিকে কুসংস্কার বলেই গণ্য করেন। কিন্তু পিসিমা যখন হেতুটা জানালেন তখন থমকে যেতে হল তাঁকে। রূপেন্দ্র বুঝে উঠতে পারছেন না, এ ক্ষেত্রে কী তাঁর করণীয়।

আদ্যন্ত সব কথা শুনে ভারতচন্দ্র বললেন, আমি তোমার পিসিমাতা ঠাকুরানীর সঙ্গে একমত, রূপেন্দ্রনাথ। 'যঃ ধ্রুবানি পরিত্যাজ্য···'! তোমার ভগিনী, তার বয়স এখন ষোলো-সতের, সে রঙিন শাড়ি পরছে, মাছ-ভাত খাচ্ছে। স্বামীসুখ-বঞ্চিতা, কিন্তু সধবা। আমার আশঙ্কা—সংবাদ নিতে গেলে সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা এক-কড়া, দুঃসংবাদের উনিশ-কড়া! জীবিত থাকলে, সে ইতিমধ্যে নিশ্চয় পার্বণী আদায় করতে তোমার ভদ্রাসনে যেত।

রূপেন্দ্র চিন্তিতমুখে বলেন, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও কি আমার উচিত নয় ···

—না। ও কথাটা বল না!—সোজা হয়ে বসলেন কবি। হুঁকোটা নামিয়ে রেখে বলেন, যতক্ষণ খবর না পাচ্ছ ততক্ষণ ধরে নাও সে সন্ন্যাসী হয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরছে! দেখ রূপেন্দ্র—ঐ হতভাগীগুলোকে আমরা কী দিয়েছি? সমাজ কী দিয়েছে? কেন অহেতুক খুঁটিয়ে ঘা করছ?

রূপেন্দ্রর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলেন, তা ঠিক! কী জান ভারত? আমি এসব শাস্ত্র নির্দেশ-ফির্দেশ মানি না। বিবেকের নির্দেশে চলি। স্থির করেছিলাম—খবর নেব। যদি জানতে পারি খবর শুভ নয়, তাহলে স্রেফ্ গোপন করে যাব!

ভারতচন্দ্র সবিস্ময়ে বলেন, তুমি মনে কর না তাতে তোমার পাপ স্পর্শাবে?

—না! করি না! নয় বছর বয়সে গৌরীদান হয়েছিল হতভাগীর। স্বামীর চেহারাটা সে আদৌ মনে করতে পারে না। সেই অদেখা, অচেনা একটা মানুষ—যে স্বামীর কর্তব্য করেনি—একমুঠি খেতে দেওয়া তো দূরের কথা—সাত বছরের ভিতর একবার এসে জিজ্ঞেস্ করতে পারেনি—'কেমন আছ'?—সে ওর বাকি জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করবে? স্বামীসুখ না পাক, সে তো এয়োস্ত্রীর মর্যাদা পাচ্ছে!

অনেকক্ষণ ভারতচন্দ্র কোন কথা বললেন না। তাঁর মনে হল—রূপেন্দ্র যা বলছে তার ভিতর যুক্তি নেই একথা স্বীকার করতে বাধে, কিন্তু তা কি মেনে নেওয়া যায়? তিনি নিজে পারতেন? প্রশ্ন করেন, তাহলে সে পথেই কেন গেলে না ভাই?

—সাহস পেলাম না!

—তবেই দেখ! সংস্কার থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না!

—না, না, না! সে-কথা বলিনি! কাতু যে বুঝে ফেলেছিল আমার মতলব। সোজা বললে,

তুই পারবি না দাদা! তোর মুখ দেখেই আমি বুঝে ফেলব! তুই লুকাতে পারবি না! —কথাটা মিথ্যা নয় ভারত! বোনটাকে আমি সত্যিই বড় ভালবাসি! হয়তো ফিরে গিয়ে আমি চোখের জল রুখতে পারতাম না!

ভারতচন্দ্র উঠে পড়েন। বলেন, তোমার ভগিনীটি বুদ্ধিমতী! ঠিকই বলেছে সে! তুমি খোঁজ নিতে যেও না রূপেন্দ্র! শাস্ত্র বলেছেন—'অশুভস্য কালহরণম্।'

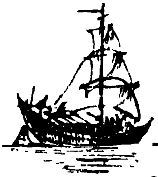

সে রাত্রে কবির ঘুম এল না। কাতু, কাত্যায়নীকে তিনি দেখেননি, চেনেন না। মনে মনে তার একটা আন্দাজী আলেখ্য আঁকতে পারেন শুধু। রূপেন্দ্র রূপবান—সম্ভবত তার ভগ্নীটিও রূপসী। বয়স তার ষোলো। হাতে শাঁখা, লোহার খাড়ু। সিঁথিতে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে সিন্দূর বিন্দু। শান্তিপুরে ডুরে শাড়ি পরে মেয়েটি প্রদীপ হাতে তুলসীমঞ্চে প্রদীপ নামিয়ে রেখে মৃত্তিকা বেদিকায় মাথাটা নামিয়েছে। গলায় আঁচল দিয়ে ....

কিন্তু এ কী? ও তো কাত্যায়নী নয়! ও যে—রাধা!

রাধা! এগারো বছর বয়সে তাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল একটি পনের বছরের শ্যামবর্ণ কিশোর—কবি হবার স্বপ্ন দেখত সে! কবি তার সিঁথিতে সিঁদুর আর হাতে শাঁখা ছাড়া আর কী দিতে পেরেছেন? না, দিয়েছেন! একটি পংক্তি—তাঁর কাব্যে:

"রাধানাথ তব দাস পূরাও মনের আশ
তব ঋণিচক্রে ঋণে তর গো॥"

ঐ কাব্যগ্রন্থের আদর যতদিন থাকবে—রসপিপাসু বাঙালী যতদিন ভারতচন্দ্রের কাব্যরস আহরণ করবে—ততদিন বেঁচে থাকবে ঐ বঞ্চিতা হতভাগিনী সীমন্তিনীর নামটা!

কবি ভারতচন্দ্র হচ্ছেন: 'রাধানাথ'![১]

নিদ্রাহীন রাত্রে অতীত জীবনের স্মৃতি যেন ভিড় করে আসছে। একের পর এক!

ধনী ভূস্বামী বংশে ভারতচন্দ্রের জন্ম। প্রাচীন বাঙলার সুবিখ্যাত সারস্বততীর্থ ভূরিশ্রেষ্ঠ এলাকায় পাণ্ডুয়া গ্রামে তাঁর জন্মভূমি ও শৈশব-লীলা। চতুরানন নামে এক ব্রাহ্মণ চতুর্দশ শতাব্দীতে ভুরসুট পরগণায় একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্র-সন্তান ছিল না। তাঁর জামাতা-শাখা ভুরশুটে প্রাধান্য পায়। ঐ রাজবংশের একটি শাখায় ভারতচন্দ্রের জন্ম। সেটা 1712 খ্রীষ্টাব্দ। অর্থাৎ উনি রূপেন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে পাঁচ বছরের বড়। পিতার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ রায়। বিরাট সম্পত্তি তাঁর। ভারত পিতার কনিষ্ঠ সন্তান। সম্পত্তির ব্যাপারে বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের সঙ্গে নরেন্দ্রনারায়ণের বিবাদ দেখা দেয়। বেগতিক দেখে কনিষ্ঠ পুত্রটিকে নরেন্দ্রনারায়ণ তার মাতুলালয়ে পাঠিয়ে দিলেন। মণ্ডলঘাট পরগণায় নওয়াপাড়া

[১] প্রসঙ্গত কুলীন ব্রাহ্মণকবি ভারতচন্দ্রও একপত্নিক।

গ্রামে। সেখানে চতুষ্পাঠীও আছে, মক্তবও আছে। অভিভাবকদের নির্দেশ ছিল, তিনি মাতুলালয়ে ফারসী শিখবেন, যাতে ভবিষ্যতে কোন রাজ-সরকারে কর্ম সংস্থান করতে পারেন। কিশোর ভারতচন্দ্র সে নির্দেশ তুচ্ছ করে ভর্তি হলেন চতুষ্পাঠীতে। তাঁর স্বপ্ন কবি হবার—সংস্কৃতটা তাই আবশ্যিক। চৌদ্দ-পনের বছর বয়সে তিনি সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ঠ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং শিক্ষাগুরুর প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন।

তাঁর বয়স যখন মাত্র পনের তখন একটা ঘটনা ঘটল—যে ঘটনা তাঁর জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। পাঠশালায় যাতায়াতের পথে পার্শ্ববর্তী গ্রাম তেজপুরের একটি পর্ণকুটীরের গবাক্ষে একটি বালিকাকে প্রায়ই লক্ষ্য করতেন। নির্দিষ্ট সময়ে—ওঁর যাতায়াতের নির্দিষ্টকালে মেয়েটি প্রতিদিন জানলায় এসে বসে থাকত আর ডাগর চোখে ওঁকে দেখত। ভারত কৌতূহলী হয়ে পড়েন। সন্ধান নিয়ে জানলেন, ঐ ভদ্রাসনটি কেশরকুনী আচার্যের। মেয়েটি তাঁরই কন্যা। বছর নয়-দশ বয়স তার। বালিকার এই বিচিত্র ব্যবহারে ভারত কৌতুক বোধ করেন। লক্ষ্য করে দেখেছেন, চোখাচোখি হলেই সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কী দেখে মেয়েটি? মাত্র পনের বছর বয়স হলেও কিশোরটি ভবিষ্যতে হতে চলেছে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর —হেতুটি প্রণিধান করতে অসুবিধা হয় না।

তাঁর হৃদয়ও কি ব্যাকুল হত না? হত। তবে তিনি তো ঐ নিরক্ষরা মেয়েটির মতো 'ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞা' সরলা বালিকা নন! মনে মনে বলতেন: "ভো ভো রাজন্ আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ!"

তারপর একদিন। তিথিটা মনে আছে। মাঘী শ্রীপঞ্চমী। চতুষ্পাঠীতে সেদিন পাঠ বন্ধ। বাগ্‌দেবীর আরাধনা হচ্ছে। ছুটির দিন—তবু কী জানি কিসের টানে উনি পার্শ্ববর্তী গ্রামের দিকে চলতে থাকেন। সেই সুচিহ্নিত গৃহটির সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেলেন শিউলি-বোঁটায় ছোপানো একটি শাড়ি পরা মেয়েটি বসে আছে জানলায়। চোখাচোখি হতে আজ সে মুখ ফিরিয়ে নিল না। যেন সে ওঁরই প্রতীক্ষায় বসে ছিল এতক্ষণ। ডাক দিল, শুনুন?

ভারতচন্দ্র নিজের পিছন দিকে তাকিয়ে দেখলেন। না, পথে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। তবু নিশ্চিন্ত হতে প্রশ্ন করেন, আমাকে বলছ?

—হ্যাঁ, একবারটি আসবেন? বাবা আপনাকে কিছু বলবেন।

দুরন্ত কৌতূহলে ভারতচন্দ্র আচার্যমশায়ের ভদ্রাসনের দিকে অগ্রসর হয়ে যান। গৃহাভ্যন্তর থেকে বার হয়ে এলেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। গৃহস্বামী নিশ্চয়। মুণ্ডিত মস্তক। দীর্ঘ অর্কফলা। গায়ে উত্তরীয়, পায়ে খড়ম।

ভারতচন্দ্র বলেন, আপনি কি আমাকে খুঁজছিলেন?

—হ্যাঁ, বাবা। আমার একটি উপকার করবে?

—বলুন?

—তুমি ব্রাহ্মণ তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার নাম ভারতচন্দ্র, ঠাকুরের নাম নরেন্দ্রনারায়ণ রায়। আমরা রাঢ়ী শ্রেণীর। কৌলীক উপাধি মুখোপাধ্যায়। কেন, ঠাকুর মশাই?

—তুমি কি প্রাতরাশ করেছ?

ভারতচন্দ্র রীতিমতো অবাক হয়ে যান। বলেন, আজ্ঞে না। চতুষ্পাঠীর দিকে যাচ্ছিলাম। অঞ্জলি দিয়ে প্রসাদ পাব।

—ও! তা বাবা আমার একটি উপকার করে যাও। প্রতি বৎসর আমার ভদ্রাসনে বাগ্‌দেবীর পূজা করি। মূর্তিপূজা নয়, গ্রন্থ পূজা। আমি নিজেই করি। সব ব্যবস্থাই হয়ে আছে। কিন্তু এই মাত্র একটি দুঃসংবাদ শুনলাম—আমার অতি দূর সম্পর্কের একটি জ্ঞাতি দুনিয়ার মায়া কাটিয়েছেন। দূর সম্পর্ক বটে, তবে দশরাত্রের জ্ঞাতি! তুমি বাবা দুটি ফুল ফেলে পূজাটা সেরে দিয়ে যাবে? তাহলে রাধা অঞ্জলি দিয়ে দুটি প্রসাদ মুখে দিতে পারে।

ভারতচন্দ্র যথারীতি ন্যাকা সাজলেন, রাধা! রাধা কে?

—আমার কন্যা। সেই তো বললে তুমি ব্রাহ্মণ। কই রে রা—ধে!

বাসন্তী রঙের ছোপানো শাড়ি পরে নোলক-পরা দশমবর্ষীয়া মেয়েটি এসে বাপের পাঁজর ঘেঁষে দাঁড়ায়। নত নেত্রে।

ভারতচন্দ্র মেয়েটিকে প্রশ্ন করেন, তুমি কেমন করে জানলে আমি ব্রাহ্মণ?

মেয়েটির কুমারী-সিঁথি দেখা যাচ্ছে এখন। সরমে মাথাটা প্রায় বুকের উপর।

ততক্ষণে মাথায় আধো-ঘোমটা টেনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন পণ্ডিতগৃহিণী। বললেন, আমিও অরে তাই জিগাই। তা রাধা কইল কি তোমারে উড়ুনী জড়ানো গায়ে দ্যাখ্‌ছে, পৈতাগাছখান কান্ধে আছিল।

প্রমাণিত হল, এক কালে আচার্যমশাই টোপর মাথায় গঙ্গার ওপারে গেছিলেন। পণ্ডিতগৃহিণীর 'সুমধুর ভাষাৎ'—হেত্বর্থে পঞ্চমী সূত্রে।

ভারতচন্দ্র পূজা করলেন। লৌকিক আচার অনুসারে রাধাও অঞ্জলি দিতে পারল না। তারও অশৌচ চলছে। তবে পূজান্তে টোপাকুল মুখে দিল মহানন্দে।

ভারতচন্দ্র মেয়েটিকে প্রশ্ন করেন, তুমি পড়াশুনা কর? সরস্বতীর পূজা তো খুব করছ ঘটা করে। বাঙলা পড়তে পার?

রাধা সলজ্জে মাথাটা নিচু করে। শিরশ্চালনে জানায়, না!

পণ্ডিতগৃহিণী বলেন, মাইয়া-মান্‌ষের নেখাপড়া শিখ্‌তি নাই! জান না?

ভারতচন্দ্র রাধার বাবাকে প্রশ্ন করেন, আপনারও তাই বিশ্বাস?

প্রৌঢ় পণ্ডিত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, কী করব বল বাবা? লোকাচার! মূর্খগুলো ভেবে দেখে না—স্বয়ং বাগেশ্বরী কী করে সাক্ষর!

পণ্ডিতগৃহিণী একটি রেকাবিতে ফল মিষ্টি প্রসাদ সাজিয়ে নিয়ে এলেন। স্বীকৃত হতে পারলেন না ভারতচন্দ্র। অজুহাত দেখালেন—তাঁদের চতুষ্পাঠীতে পূজা এখনো অসমাপ্ত।

রাধার মা বললেন, তাইলে একদিন মধ্যাহ্নে এই হানে আইস্যা দুটি অন্ন সেবা করি যেও! অশৌচ মিটলে। আইবে তো?

ভারতচন্দ্র স্বীকৃত হলেন। রাধার দিকে ফিরে বলেন, লেখাপড়া তো শেখনি, রান্না করতে শিখেছ?

রাধা নোলক নেড়ে বলেছিল, বলব না!

—বলবে না! কেন? বলবে না কেন?

—বলতে হবে আপনাকে!

—আমি রাঁধতে জানি কি না?

—তা নয় মশাই! যেদিন অন্নসেবা করতে আসবেন সেদিন খেয়ে বলতে হবে, কোন ব্যঞ্জন মায়ের হাতের, কোনটি মেয়ের।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। সহপাঠী বংশীলাল একদিন বললে, শুনেছিস ভারত, সেই মেয়েটার বে ঠিক হয়ে গেছে! কী কপাল! বরটা বুড়ো-হাবড়া! তিনকুড়ি বয়স তার!

—কোন্ মেয়েটা রে? —ভারত কৌতূহলী।

—সেই যাদের বাড়ি তুই সরস্বতী পূজা করে দিয়ে এসেছিলি। তেজপুরের আচায্যি বাড়ির। রাধা! তোর তো নিমন্ত্রণও ছিল! গেলি না কেন?

বুকের মধ্যে টন্‌টনিয়ে উঠেছিল। বংশীর হাতটা চেপে ধরে বলেছিল, তুই ঠিক জানিস? বুড়ো বর?

—ওমা, জানব না কেন? ললিত গাঙ্গুলীর বয়সের কি গাছ-পাথর আছে? মুখে একটা দাঁত নেই। এক মাথা পাকা চুল। তার বড় নাতিরও তো বে হয়ে গেছে!

পনের বছরের কিশোর! রক্তে তখন আগুন জ্বলে! হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়ে গেল তার। গোপনে গিয়ে সাক্ষাৎ করল কেশরকুনী আচার্যের সঙ্গে। বললে, এ আপনি কী করছেন পণ্ডিত মশাই! অমন লক্ষ্মীর প্রতিমাকে ভাসিয়ে দিচ্ছেন?

অরক্ষণীয়া কন্যার পিতা ম্লানমুখে বলেন, কী করব বাবা? কৌলিন্য মর্যাদা দেবার সামর্থ্য যে আমার নেই। উপযুক্ত পাত্র কোথায় পাব? গাঙ্গুলী-মশাই এক কপর্দক মাত্র কৌলিন্যমর্যাদা নিয়ে ...

অপরিসীম দার্ঢ্যে কিশোরটি বলেছিল, উপযুক্ত পাত্র কিনা জানি না, তবে আমার পিতামহের হাতি ছিল, আমাদের বাড়ি আজও দোল-দুর্গোৎসব হয় .....

পণ্ডিতমশাই আকাশ থেকে পড়েন, তুমি! তোমার মাতুল রাজী হবেন?

—সম্ভবত নয়। আপনার কন্যা যদি রাজী থাকে আর আপনার যদি হিম্মৎ থাকে তাহলে আমি স্বীকৃত! গোপনে! আমি কুলীন, এবং পাল্‌টি ঘর।

আচার্য ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, এ যে আমার স্বপ্নেরও অতীত বাবা! বেঁচে থাক তুমি। দীর্ঘজীবী হও! এমন হৃদয় তোমার! তুমি দেশের মুখোজ্জ্বল করবে।

ভবিষ্যদ্বাণীটি আধাআধি সার্থক করেছিলেন আচার্যের জামাতা বাবাজীবন।

দীর্ঘজীবী হতে পারেননি। কিন্তু স্বল্পজীবনের মধ্যেই দেশের মুখোজ্জ্বল করেছিলেন।

কিন্তু লক্ষ্মীর প্রতিমাকে ঘরে আনতে পারেননি।

সংবাদ পেয়ে ভারতের অভিভাবকেরা তাকে মাতুলালয় থেকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। ওদের সংসারে তখন প্রচণ্ড অশান্তি—বর্ধমানরাজের অত্যাচারে। তার উপর নাবালকটির ঐ হঠকারিতায় কবির লাঞ্ছনার আর অবধি রইল না। কিশোর-কবি ক্ষোভে অভিমানে গৃহত্যাগ করেন। আশ্রয় পান হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামের পশ্চিমে দেবানন্দপুর নিবাসী রামচন্দ্র মুন্সীর বাড়িতে। সেখানে থেকে বহু কষ্টে ফারসী ভাষা আয়ত্ত করেন। কবি ঈশ্বরগুপ্ত সে-আমলে ভারতচন্দ্রের কৃচ্ছ্রসাধন বর্ণনা করতে লিখছেন, "দিবসে একবার মাত্র রন্ধন করিয়া

সেই অন্ন দুই বেলা আহার করেন, প্রায় কোন দিবস ব্যঞ্জন পাক করেন নাই। একটা বেগুন পোড়ার অর্ধভাগ এ-বেলা এবং অর্ধভাগ ওবেলা আহার করিয়া তাহাতেই তৃপ্ত হইয়াছেন।" এখানে থাকতেই তিনি মুন্সীর বাড়িতে সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষ্যে একটি 'ব্রতকথা' রচনা করেন: কবির প্রথম রচনা।

ফারসী ভাষা আয়ত্ত করে কবি ফিরে এলেন স্বগৃহে। দাদারা তাঁর পুনর্বার বিবাহ দেবার আয়োজন করল। দৃঢ় প্রতিবাদ করলেন কবি। বললেন, আমার এক স্ত্রী বর্তমান। আপনারা তাকে গ্রহণ করেননি। উপার্জনক্ষম হলে আমি তাকে স্বগৃহে নিয়ে আসব। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ কদাচ করব না।

এই সময় কবিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল বর্ধমানে। বর্ধমানরাজ কর্তৃক অপহৃত সম্পত্তি উদ্ধার করতে। মোক্তার হিসাবে। রাজশক্তির অসীম ক্ষমতা! কবি মিথ্যা অজুহাতে গ্রেপ্তার হলেন। কারারুদ্ধ কবি কোনক্রমে পালিয়ে যান। এই পলায়নে তাঁকে সাহায্য করেছিল পারিবারিক পুরাতন ভৃত্য ভোলা নাপ্‌তে! দুজনে বনজঙ্গল দিয়ে পথ খুঁজে খুঁজে উপনীত হন কটকে। কবির পরিচয় ও জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে যান মহারাষ্ট্রীয় সুবেদার শিব ভট্ট। রঘুজী ভোঁসলের তরফে তিনি তখন কটকের শাসনকর্তা। তাঁর অনুগ্রহে পুরুষোত্তমধামে বাস করার অনুমতি পান। তখন তিনি প্রায় সন্ন্যাসী! কিন্তু ভোলা প্রামাণিক ছায়ার মতো তাঁর সঙ্গে লেগে আছে।

কী ভাবে ঐ ধূর্ত প্রামাণিকের চক্রান্তে কবি আবার সংসারে ফিরে আসতে বাধ্য হন তার প্রামাণিক ইতিহাস নাই; আছে শৈল্পিক ইতিকথা: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের—'অমাবস্যার গান'-এ। নারায়ণ গাঙ্গুলীর কল্পনা অনুসারে ঐ সময় রাধার সঙ্গে ভারতের পুনর্মিলন হয়—পুনর্মিলনই বা বলি কেন? বিবাহকালে রাধা ছিল এগারো বৎসরের বালিকা—এই তার প্রথম স্বামী সন্দর্শন![1]

অনতিবিলম্বেই কবি চলে যান ফরাসডাঙায়—দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয়ে, কর্মের অনুসন্ধানে। রাধাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান, মাথা-গোঁজার একটা ব্যবস্থা হলেই, দুবেলা দু-মুঠো অন্নের সংস্থান হলেই, তাকে নিজের কর্মস্থলে নিয়ে যাবেন। সুযোগ হয়নি। দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের সুপারিশে এসেছেন কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন, বৃত্তি দিয়েছেন; কিন্তু তাঁর উপার্জন এখনো এমন হয়নি যে, সেই সূর্যমুখী ফুলের চারাগাছটিকে গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগরের উদ্যানে এনে রোপণ করেন।

বিশ্বাস করতে মন চায় না, নয়? যে 'অন্নদামঙ্গল' আজ এম·এ·-র পাঠ্য—তা স্বীকৃতি পাওয়ার পরেও ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর সস্ত্রীক বসবাসের মতো সচ্ছলতার মুখ দেখতে পাননি। তাঁর আটচল্লিশ বছর জীবনের ত্রিশটি বছর কিন্তু ইতিমধ্যে কেটে গেছে!

রাজাদেশে কবি এখন অন্নদামঙ্গলের সম্প্রসারণ করছেন। বিদ্যাসুন্দরের আদিরসাত্মক পদগুলি রচনা করছেন। 'অমাবস্যার গান' গাইছেন।

---

[1] 'মিতে'-দার কল্পনা ছাড়া এ বিষয়ে পণ্ডিত গবেষকেরও সমর্থন আছে। যথা— ডঃ ভূদেব চৌধুরীর 'বাঙলা-সাহিত্যের ইতিকথা' প্রথম খণ্ড।

1742

তোমরা কি কবির জন্য দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলবে?

তোমরা ফেলবে কি না জানি না, কবি ফেলেছিলেন—সে রাত্রে। না, রাধার জন্য নয় সেই না-দেখা, না-চেনা কাত্যায়নীর উদ্দেশ্যে!

কবি জানেন, সেই উপেক্ষিতা যৌবনভারনম্রার অন্তর্লীন বেদনাটি কী তীব্র।

তিনি যে কবি!

পরদিন রূপেন্দ্রকে নিয়ে ভারতচন্দ্র উপস্থিত হলেন রাজসভায়।

সে এক অভিজ্ঞতা বটে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাতঃকালীন রাজসভার দুইটি পর্যায়। প্রথমাংশে তিনি শুধু রাজকার্য করেন। প্রজাদের অভাব-অভিযোগ শোনেন। প্রয়োজনে আদেশনামা জারী করেন, স্বাক্ষর দেন দলিলে। সে সময় সভায় উপস্থিত থাকেন শুধুমাত্র মন্ত্রী, দেওয়ান, সেনাপতি, বিভিন্ন গুপ্তচর এবং রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা। একটু বেলায় প্রায় একদণ্ডের মতো একটি বিরতি ঘটে। রাজা তখন সংলগ্ন কক্ষে প্রাতরাশ সেরে নেন। রাজসভার পালাবদল হয়। রাজকর্মচারীরা বিদায় নেয় আর আসর জমিয়ে বসেন পণ্ডিতের দল, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ। ভারতচন্দ্র সেই বুঝে একটু বেলাতেই এসেছেন।

রাজবাড়ির এই দরবারকক্ষটির নাম—বিষ্ণুমহল। প্রকাণ্ড দরবার গৃহ। চারমিনার-বিশিষ্ট তোরণপথ মুসলিম স্থাপত্যানুসারী: স্তম্ভ, খিলান, কালবুদ পঙ্খের কাজ করা, অতি মসৃণ। দুইসারি স্তম্ভের মাঝখান দিয়ে গালিচা-মোড়া প্রবেশ পথ। মাথার উপর সারি সারি সহস্রমুখ ঝাড়-বাতি। দু-পাশের দেওয়ালে প্রাক্তন রাজবর্গের তৈলচিত্র—ভবানন্দ, রাঘব, রুদ্র রায়, রঘুবীর!

ভূপেন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বসে আছেন সিংহাসনে। দু-পাশে পাত্রমিত্র। পিছনে দুজন ব্যাজন করছে। দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী। এক দিকে একটি উচ্চ বেদিকা। পণ্ডিতদের আসন। বিপরীত দিকে কিছু সঙ্গীতজ্ঞ নানান বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসে আছেন। তাঁরা সর্বক্ষণই অতি মৃদু শব্দ-ঝংকারে একটি আলাপ করে চলেছেন। পরিকল্পনাটি শাহজাহাঁর দরবারের সঙ্গে আকবরের রাজসভার এক বিচিত্র সংমিশ্রণ।

ভারতচন্দ্র রাজসমীপে অগ্রসর হয়ে এসে তাঁকে অভিবাদন করলেন। দেখাদেখি একই ভঙ্গিমায় রূপেন্দ্রনাথও রাজাকে অভিবাদন করেন। রাজা বললেন, স্বস্তি! আজ কবিবরের সপার্ষদ আগমন হল মনে হচ্ছে। তোমার ঐ কন্দর্পকান্তি বয়স্যটির পরিচয় দান কর, কবি।

—ইনি বর্ধমানভুক্তির সোঞাই গ্রামনিবাসী ভেষগাচার্য। নাম শ্রীরূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নৈকষ্য কুলীন। পিতার নাম সৌরীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ। উনি গতকাল কৃষ্ণনগরে এসেছেন ঝম্পধ্বজ দত্ত মশায়ের চিকিৎসা করতে।

রাজা বললেন, উনি সার্থকনামা! রূপেন্দ্র! নিতান্ত দুর্ভাগ্য আমার। আজ সভায়

উপস্থিত-কবি মহাপণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার অনুপস্থিত। থাকলে 'রূপেন্দ্র' শব্দের উপর তিনি নিশ্চয় একটি শ্লোক রচনা করে শোনাতেন।

বিদ্যাবাচস্পতি বলেন, মহারাজ! অধম স্বভাবকবি নয়। তবে এই রূপের ইন্দ্রটিকে দর্শন করে আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি মনে পড়ছে। আপনি অনুমতি করলে সেটি শোনাতে পারি। 'রূপ'-এর সংজ্ঞা।

রাজা বললেন, শাস্ত্র বলছেন, 'মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ'। তাই হোক তাহলে।

বিদ্যাবাচস্পতি বলেন, "অঙ্গান্যভূষিতান্যেব কেনচিদ্ ভূষণাদিনা। যেন ভূষিতং ভান্তি তদ্‌রূপমিতি কথ্যতে[১]।" রায় গুণাকরের বয়স্য দেখছি পুষ্পধনু ব্যতিরেকেই মীনকেতনের প্রতিদ্বন্দ্বী!

রূপেন্দ্র নিরতিশয় লজ্জিত হন। রাজনির্দেশে দুজনে উপবেশন করেন। ওপাশ থেকে একজন বৃদ্ধ হঠাৎ বলে ওঠেন, আমি কিন্তু কবিবরের ঐ শব্দটির অর্থগ্রহণ করতে পারিনি। 'ভেষগাচার্য' শব্দের অর্থ কী?

এই অর্বাচীন প্রশ্নে রূপেন্দ্রনাথ প্রশ্নকর্তার দিকে দৃক্‌পাত করলেন। এবং তৎক্ষণাৎ সনাক্ত করলেন তাঁকে। খর্বকায়, স্ফীতোদর। পরিধানে একটি খাটো ধুতি, ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন, শুধুমাত্র একটি উত্তরীয়। উপবীত নাই। মেদবহুল দেহ। নিঃসন্দেহে গোপাল ভাঁড়।

রাজা বললেন, কবি, অন্বয় ব্যাখ্যা দাখিল কর। গোপাল 'ভেষগাচার্য' শব্দের অর্থ বোঝেনি।

ভারতচন্দ্র বললেন, উপায় কি? হংসমধ্যে বক যখন উপস্থিত, তখন ব্যাখ্যা করতেই হবে। ভেষগাচার্য শব্দের অর্থ—চিকিৎসক, কবিরাজ, বদ্যি।

গোপাল বলে, এতক্ষণে বোঝা গেল! রায়গুণাকর তো দেবভাষায় কাব্য রচনা করেন না, তাই খট্‌কা লেগেছিল শব্দটায়। কবিরাজ! গোবদ্যি! এবার বুঝেছি। তা বাঁড়ুজেমশাই, আপনি যখন গো-আড়িগঞ্জে এসেই পড়েছেন, আমার বাড়িতে একবার পদধূলি দেবেন। আমার দুধেলা গাইটে বেমক্কা দুধ দেওয়া বন্ধ করেছে। গিন্নি বলেছেন, একটি ভাল গোবদ্যি ধরে নিয়ে যেতে!

ভারতচন্দ্র জবাবে কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রূপেন্দ্র তাঁর জানুতে হস্তস্পর্শ করায় থেমে গেলেন। অনুমান করেন, রূপেন্দ্র স্বয়ং এ বিদ্রূপের উত্তর দিতে চান। ঠিক তাই। রূপেন্দ্র বললেন, হাস্যার্ণব, এজন্য আমাকে আপনার ভদ্রাসনে নিয়ে যেতে হবে না—তাহলে আপনার কিছু অর্থদণ্ড হবে। আমি আপনার গো-মাতাকে না দেখেই এখান থেকে বিধান দিয়ে দিচ্ছি। গৃহিণীকে বাড়ি ফিরে বলবেন, তাঁর যেমন একটি দুধেলা গাই-গরু আছে তেমনি একটি পোষা অনডবানও তো আছে। সেটি ইদানীং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় আসন পাওয়াতে বিরহানলে দগ্ধ হয়েছে ঐ গাভিটি। তাই দুধ দেওয়া বন্ধ করেছে।

রাজা প্রাণখোলা হাসি হাসলেন। বললেন, নাও গোপাল! জবাব দাও!

গোপাল ইতস্তত করে বলেন, ইনিও যে সংস্কৃত শুরু করলেন মহারাজ! 'অনড্বানও' যে বড় ভারি শব্দ। অর্থ গ্রহণ হচ্ছে না।

রূপেন্দ্র তৎক্ষণাৎ বলেন, ওর আর অন্বয় ব্যাখ্যা-হয় না। আপনি তো পেশায় প্রামাণিক।

---

[১] ভূষণভূষিত দেহ না হওয়া সত্ত্বেও যাঁকে ভূষিতবৎ প্রতীয়মান হয়, তাকেই বলে রূপবান—তাই রূপ।

বাড়িতে দর্পণ নিশ্চয় আছে। তার ভিতরেই ওর অর্থ খুঁজে দেখবেন।

গোপাল বলে ওঠেন, ইনি যে দেখছি খাস্ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি! 'আত্মবন্মন্যতে জগৎ'।

রাজা বাধা দিয়ে বললেন, উ হুঁ হুঁ। হল না। গোপাল, হল না। তুমি ঢং ধরেছিলে সংস্কৃত জান না। এখন ঠাঁই বদলাতে পার না। একবার অক্রুর, একবার বিন্দে দূতী—এ তো চলবে না। তোমার হার হয়েছে বাপু!

গোপাল ব্যাজার হলেন। রাজা প্রশ্ন করেন রূপেন্দ্রকেই, তা ঋষধ্বজকে দেখে কী বুঝলেন? ওর অসুখটা সারবে তো?

প্রত্যুত্তরে রূপেন্দ্র বলেন, এখনো রুগী দেখা সম্ভবপর হয়নি। কারণ ....

মাঝপথেই থেমে যান।

রাজা বলেন, জানি! কারণ—'কারণ'! কালীপূজার ধাক্কা এখনো সামলে উঠ্তে পারেনি। ঐটাই ওর রোগ ভেষগাচার্য! যা হোক, কতদিন আছেন? কোথায় উঠেছেন? ঋষধ্বজের অতিথিশালায়?

—আজ্ঞে না মহারাজ। উঠেছি বন্ধুবর ভারতচন্দ্রের আবাসে। থাকব দিন-দুই-তিন।

রাজা বল্লেন, উহুঁহুঁ! তা হবে না। আজ শুক্লা তৃতীয়া। পাঁচ দিন পরে মায়ের পূজা। এ সময় তো আপনি স্বদেশে ফিরতে পারবেন না!

একজন মোসায়েব বলে উঠে, গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পূজা দেখলে জীবনে ভুলবেন না। ফরাসডাঙার দেওয়ান ইন্দ্র চৌধুরীর জগদ্ধাত্রী পুজার জৌলুস ...

কৃষ্ণচন্দ্র ধমক দিয়ে ওঠেন, তুমি চুপ কর মধু! মা—মা! তুলনামূলক আলোচনা করে তোমাকে খোসামোদি করতে হবে না। ছিঃ!

মধু নামের মোসায়েব ম্লান হয়ে যায়। মাথা নিচু করে।

রূপেন্দ্র বলেন, বেশ কথা। আপনি যখন আদেশ করছেন তখন মায়ের পূজা প্রত্যক্ষ করে দেশে ফিরব। সত্যই তো, এ এক দুর্লভ সৌভাগ্য।

রাজা ভারতচন্দ্রের দিকে দৃকপাত করে বলেন, উনি তোমার আতিথ্য স্বীকার করেছেন, আমার কিছু বলার নেই; কিন্তু যে-কয়দিন উনি কৃষ্ণনগরে থাকবেন ওঁর 'সিধা' রাজবাড়ি থেকে যাবে।

গোপাল যেন প্রতিবর্তী-প্রেরণায় তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন, দুজনের মতো মহারাজ! না হলে কবিরাজ মশায়ের হজম হবে না। কিছু মনে করবেন না রায় গুণাকর—আমি ন্যায্য কথাই বলেছি! অতিথি রাজভোগ কি হজম করতে পারবে যদি গৃহস্বামী পান্তা খায়?

এরপর শুরু হল মার্গ সঙ্গীত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন সঙ্গীত-বিশারদ।

এই সুযোগে ভারতচন্দ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর পরিচয় নিম্নস্বরে বিবৃত করতে থাকেন রূপেন্দ্রের কর্ণমূলে। রাজার বাম দিকে প্রথমেই বসে আছেন গোস্বামীপাদ রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি। শান্তিপুরের বৈষ্ণব ভক্ত-পণ্ডিত। যিনি উজ্জ্বলনীলকান্তমণি থেকে 'রূপ'-এর সংজ্ঞা-নির্ধারক শ্লোকটি শুনিয়েছিলেন। সৌমদর্শন বৃদ্ধ, মুণ্ডিতমস্তক, ললাটে শ্বেতচন্দনের তিলক।

তাঁর পাশে শঙ্কর তর্কবাগীশ। তদানীন্তন নদীয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক। তাঁর চতুষ্পাঠীতেই ছাত্রসংখ্যা সর্বাধিক। শুধু বিদ্বৎসমাজে নয়, তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি নিরক্ষর চাষী-মজুরেরাও

জানত। একবার তিনি শান্তিপুরে গঙ্গার পারানিঘাটে এসে দেখেন, খেয়াঘাটের নৌকাটি দাঁড়িয়ে আছে। যাত্রীর অপ্রতুলতায় মাঝি অপেক্ষা করছে। তর্কবাগীশ মশায়ের কিছু তাড়া ছিল। মাঝিকে বললেন, এবার নৌকাটা ছাড়বে মাঝি ভাই? আমার কিছু তাড়া আছে।

মাঝি তাঁকে ধমকে উঠেছিল, কেনে ঠাকুরমশাই? আপনি কি স্বয়ং শঙ্কর তক্কোবাগীশ এয়েচেন আমারে উদ্ধার করতি যে, নৌকা ভরতি না হতেই নুকশান দে ওপারে যাব?

শঙ্কর তর্কবাগীশ সহাস্যে বলেছিলেন, তা বটে!

পারানি-যাত্রীদের একজন নাকি তাঁকে চিনতে পারে। সে মাঝির কানে-কানে কী-যেন বলে। শুনে মাঝির চোখ কপালে ওঠে। দৌড়ে ছুটে এসে জলকাদার মধ্যেই ধ্রাশ করে লুটিয়ে পড়ল তর্কবাগীশের চরণজোড়া আঁকড়ে। মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে সে বলে চলেছে, এ আমি কী বল্লাম ঠাউর! নরকেও যে মোর ঠাঁই হবেনি!

নৈয়ায়িক বুঝে উঠতে পারেননি—লোকটা অমন করছে কেন? তার কথায় তো তিনি তৃপ্তিই পেয়েছিলেন—বুঝে নিয়েছিলেন, তাঁর সত্যানুসন্ধানের প্রভাব আজ পারানি-মাঝিদেরও প্রভাবান্বিত করছে।

শঙ্কর তর্কবাগীশের পাশের আসনটিতে যিনি বসে আছেন, শ্যামবর্ণ, মধ্যবয়সী, মাথাভরা টাক—উনি গোকুলানন্দ বিদ্যামণি। কাব্য-ন্যায় প্রভৃতির ধার ধারেন না। তিনি সমকালীন এক প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ্। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্ সুবুদ্ধি শিরোমণির প্রপৌত্র। জ্যোতির্বিদ্ শব্দের অর্থ না বুঝে কৃষ্ণনগর-শান্তিপুর-উলার অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি ওঁর কাছে ধমক খেয়েছে। তারা ওঁর দ্বারস্থ হয়েছিল কোষ্ঠিবিচার করাতে, জন্ম পত্রিকা বানিয়ে ভবিষ্যৎ জানতে। উনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন ঐ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূর্খগুলোকে বোঝাতে—ফলিত জ্যোতিষ নয়, তাঁর এলাকা গণিত জ্যোতিষ। আর্যভট্ট তাঁর আরাধ্য, খনার বচন নয়! মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বৃত্তিভোগী এই পণ্ডিত শুধু আকাশচারী গ্রহনক্ষত্রের সঙ্গে সৌহার্দ্য করেছেন! বৃত্তিভোগী পণ্ডিতের নানান কামনা—কেউ স্বপ্ন দেখেন কেদার-কৈলাসের, কেউ বা বৃন্দাবন। বিদ্যামণিরও অন্তরে অন্তর্লীন হয়ে আছে এক তীর্থদর্শনের কামনা—জয়পুরে সোয়াই জয়সিংহের মানমন্দির! সম্প্রতি তিনি একটি অদ্ভুত আবিষ্কার করে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন—বিদেশী ঘড়ি আবিষ্কৃত হবার পূর্বেই নিজ তত্ত্বাবধানে তিনি নির্মাণ করেছেন এক বালুকাঘড়ি। তার সাহায্যে শুধু দণ্ড, পল নয়, অনুপলও সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। অদ্ভুত প্রতিভা!

'কৃষ্ণনগর' নামটি কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নামানুসারে নয়।

নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার। তাঁর আদিনিবাস ছিল মাটিয়ারি গ্রাম। গ্রামটি অতি প্রাচীন। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে এই গ্রামটির উল্লেখ আছে—শ্রীমন্ত সওদাগরের সিংহল যাত্রার প্রসঙ্গে। বহু প্রাচীন কাল থেকেই এই গ্রামে উৎকৃষ্ট কাঁসার বাসন তৈরী হত। এখন হয় কিনা জানি না, আমাদের বাল্যকালে সে গ্রামে—না, তখন আর সেটা গ্রাম ছিল না, গঞ্জই,—সেখানে অসংখ্য কাঁসারিদের কাজ করতে দেখেছি। এই ভবানন্দ মজুমদারই কাশীর অন্নপূর্ণা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।

এই যে নদীয়া-রাজবংশ—যা কালে ফুলে-ফেঁপে বাঙলার ইতিহাসে চিহ্ন রেখে গেল, তার সূচনা কিন্তু একটি সামান্য ঘটনা থেকে। বালক ভবানন্দের সাহসিকতায়!

ভবানন্দ একদিন মাটিয়ারী গাঁয়ে গঙ্গাতীরে সমবয়সী কয়েকজন বালকের সঙ্গে খেলা করছে। হঠাৎ সবাই দেখতে পেল সৈন্য বোঝাই একটা নৌকা এসে ভিড়ল গঙ্গার ঘাটে। ওর বন্ধুবান্ধবেরা দুদ্দাড়িয়ে পালিয়ে গেল। চাণক্যবাক্য স্মরণ করে স্নানার্থীরাও তাড়াতাড়ি ঘাট ছেড়ে উঠে পালায়। দাঁড়িয়ে রইল একা ভবানন্দ। দ্বাদশবর্ষীয় বালক। বাহুবক্ষপাশ ভঙ্গিতে। যে ভঙ্গিতে তিনশ বছর পরে দেখা যাবে স্বামী বিবেকানন্দকে।

সৈন্যদলের সেনানায়ক ভাঙা ভাঙা বাঙলা বলতে পারে। সে বালকটিকে সকৌতুকে প্রশ্ন করে, কী হে? তুমি পালিয়ে গেলে না কেন?

—পালাব কেন? আপনারা বাঘ না রাক্ষস?

সেনাপতি জানতে চায়, বলতে পার খোকা, হুগলী বন্দর আর কত দূরে?

খোকা সেটুকু তো বলতে পারলও, ঐ সঙ্গে আরও কিছু প্রয়োজনীয় খবর সরবরাহ করল। ফৌজদার বালকের সাহস আর কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে তার অভিভাবকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। একটি পুরো দিন ওরা কাটিয়ে গেল মাটিয়ারিতে। তারপর অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে সেই বালকটিকে সঙ্গে করে নিয়ে চলল হুগলী। ভবানন্দ পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র। পিতা রামচন্দ্র ভট্টাচার্যের বংশকৌলিন্য ছিল যথেষ্ট—আদিশূর তাঁর যজ্ঞসম্পাদন করতে কান্যকুব্জ থেকে যে ভট্টনারায়ণ মহোপাধ্যায়কে এনেছিলেন সেই বংশেরই সন্তান। কিন্তু তখন অর্থকৌলিন্য ছিল না। জ্যেষ্ঠপুত্রটিকে তার ভাগ্যান্বেষণে ঐ ফৌজদারের সঙ্গে যেতে দিলেন।

ফৌজদার তাকে নিয়ে এল সপ্তগ্রামে। অপুত্রক সেনানায়ক সযত্নে ভবানন্দের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করল—শাস্ত্রশিক্ষা, শস্ত্রশিক্ষা, রাজকার্য, ফারসীভাষা। অত্যন্ত মেধাবী ভবানন্দ। অচিরে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠল সে।

কৈশোর-তারুণ্যের সন্ধিক্ষণে ঐ ফৌজদারের প্রচেষ্টায় ভবানন্দ লাভ করলেন বাঙলার নবাব সরকারে কানুনগোর পদ এবং পরে মজুমদার উপাধি।

উদ্যোগী পুরুষের ভাগ্যে এমনটিই ঘটে। আকবর বাদশাহর মুগল-বাহিনী নিয়ে রাজপুত সেনাপতি মানসিংহ এসেছেন বঙ্গদেশে। বিরাট বাহিনী নিয়ে চলেছেন কপোতাক্ষ তীরে যশোর। বারো ভুঁইয়ার সবচেয়ে দুর্ধর্ষ নেতা যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের শাসন-মানসে। পথে নামল প্রচণ্ড বর্ষা। রাজপুতানার মানুষ। বঙ্গদেশের এ ভয়াবহ নিম্নচাপের, এই ঝড়-ঝঞ্ঝা আর অবিচ্ছিন্ন ধারাপাতের বিষয়ে কোনও ধারণা নাই।

বাল্যকালের সেই নাটকটিই পুনরভিনীত হল। মুগল সৈন্য আসছে শুনে গ্রাম-গঞ্জের মানুষ প্রাণভয়ে আত্মগোপন করেছে। মানসিংহ ন্যায্য মূল্য দিতে প্রস্তুত—কিন্তু হাটে-বাজারে বিক্রেতার পাত্তা নেই। গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য। প্রচণ্ড বিপদ! সেই সময়ে মুগল শিবিরে এসে সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করল এক অকুতোভয় স্থানীয় যুবক। সে জানালো—অর্থমূল্যে সে ঐ বিরাট বাহিনীর খাদ্যপানীয় সরবরাহ করতে পারবে। পুরো একটি সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হল মানসিংহকে। কিন্তু ভবানন্দ মজুমদারের ব্যবস্থাপনায় তাঁর সেনাবাহিনী অভুক্ত রইল না। এমনকি অশ্ব ও হস্তিযূথের খাদ্যও সরবরাহ করল সে। প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করে

প্রত্যাবর্তনের পথে মানসিংহ ঐ যুবকটিকে সঙ্গে নিয়েই দিল্লীতে ফিরে গেলেন। তাঁরই সুপারিশে ভবানন্দ মজুমদার লাভ করলেন চতুর্দশ পরগণার শাসনাধিকার। সম্রাট জাহাঙ্গীরের ফর্মান। কারণ সেটা শাহেন-শাহ্ আকবরের দেহাবসানের পরের বৎসর—1606 খ্রীষ্টাব্দ।

ভবানন্দ ভট্টাচার্য হয়ে গেলেন, রাজা ভবানন্দ মজুমদার।

মাটিয়ারি গ্রামেই নির্মাণ করালেন রাজপ্রাসাদ।

তাঁর পৌত্র রাজা রাঘব মাটিয়ারি ছেড়ে গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগরে রাজধানী সরিয়ে আনেন। গ্রামটির পূর্বনাম: 'রেউই'। রাজা রাঘবের পুত্র রুদ্র এই নতুন রাজধানীর নামকরণ করেন 'কৃষ্ণনগর'। হেতুটি এই: রেউই-গ্রামে ছিল গোপদের বাস, তারা মহাসমারোহে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করত। রুদ্র রায়ের আমলে জমিদারী আরও বৃদ্ধি পায়; তিনি দিল্লীর বাদশাহকে সে আমলেই বিশ লক্ষ টাকা কর দিতেন। রুদ্রের পুত্র রঘুরাজ ছিলেন প্রখ্যাত ধনুর্ধর বীর। তখন মুর্শিদকুলি খাঁয়ের আমল। বারাকোটির যুদ্ধে নবাবপক্ষ অবলম্বন করে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দেন। রাজসাহীর বিদ্রোহী রাজা উদয়নারায়ণের সেনাপতি আলি মহম্মদকে যুদ্ধক্ষেত্রে স্বহস্তে নিহত করেন—তীরবিদ্ধ করে। সাধারণের কাছে তিনি 'রঘুবীর' নামে পরিচিত। সেই রঘুবীরের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বে আমরা কাহিনীর নৌকা ভিড়িয়েছি। বস্তুত এ রাজবংশ-সূর্য ঐ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলেই মধ্যগগনে। তাঁর পুত্র শিবচন্দ্রের আমল থেকে সে সূর্য পশ্চিমে ঢলেছে।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রও স্বাভাবিকভাবে দোষে-গুণে মানুষ। মনে আছে, ছেলেবেলায় কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে ক্লাইভের উপহার দেওয়া কামান দেখে আমরা নাক সিঁটকেছি। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-বিপক্ষে যোগ দেওয়ায় তিনি ঐ কামানগুলি উপঢৌকন পেয়েছিলেন—লাভ করেছিলেন 'মহারাজা' খেতাব। সে-আমলে 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের প্রভাবে বাঙলার ঐ শেষ নবাবটির প্রতি কিশোর মনে কিছু দুর্বলতা ছিল। তখনও বুঝবার বয়স হয়নি, কী মর্মান্তিক প্রয়োজনে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বা রানী ভবানী সিরাজপক্ষে যোগ দিতে পারেননি।

কৃষ্ণচন্দ্র গোঁড়া ছিলেন, এ-কথা মানতেই হবে। আর সেই গোঁড়ামি যে অপকৌশলে জিইয়ে রাখতেন তা নিশ্চয়ই নিন্দনীয়। যেমন রাজা রাজবল্লভের বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহের আয়োজন ব্যর্থ করে দেওয়া।

রাজা রাজবল্লভ বৈদ্য—ব্রাহ্মণ নন। তাঁর অষ্টমবর্ষীয়া বিধবা কন্যাটির পুনর্বিবাহের জন্য তিনি প্রাণপাত করেছিলেন। সমাজপতি ব্রাহ্মণরাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সম্মতিলাভের জন্য তিনি পত্র লেখেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে প্রত্যুত্তরে কিছু পণ্ডিতকে পাঠিয়ে দিতে বলেন কৃষ্ণনগরে—বিচারের জন্য। রাজবল্লভ উৎসাহিত হয়ে কয়েকজন পণ্ডিতকে কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় পাঠিয়ে দিলেন। বিচার্য বিষয়: 'অক্ষতযোনি বালবিধবার পুনর্বিবাহ শাস্ত্রসম্মত কিনা।'

কৃষ্ণচন্দ্রের অন্যতম সভাপণ্ডিত রামগোপাল তর্কালঙ্কার রাজবল্লভ-প্রেরিত পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হলেন। অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিত সে-সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অন্তিমে অপকৌশল প্রয়োগ করে ঐ সভাপণ্ডিত আরও কয়েকজন সহকারীর সাহায্যে প্রচার করলেন 'বিধবাবিবাহ' দেশাচারবিরুদ্ধ—শাস্ত্রে তার অনুমোদন নাই। মজার কথা, যে যুক্তিগুলি হেতু হিসাবে দেখানো হল, তা আদৌ 'অক্ষতযোনি বালবিধবা' সংক্রান্ত নয়, 'যৌবনপ্রাপ্তা বিধবার পুনর্বিবাহ'। এ দুটি বিষয়ের পার্থক্য বুঝে নেবার মতো

পাণ্ডিত্য নিঃসন্দেহে ছিল কৃষ্ণচন্দ্রের। কিন্তু তিনি জেনে-বুঝে সমাজপতি হিসাবে নিদান হাঁকলেন: বটেই তো! বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয়।

প্রশ্নটা ছিল: 'অক্ষতযোনি বালবিধবার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত কিনা'!

সমাজপতি জবাব দিলেন: যাবতীয় বিধবা বিবাহই অশাস্ত্রীয়!

যুক্তি হিসাবে দেখানো হল—পিতৃতন্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের ভিতর সম্পত্তি বণ্টন সম্ভবপর; 'বৈপিত্রেয়'-ভ্রাতার উদ্ভাবনে সামাজিক জটিলতা অবশ্যম্ভাবী!

স্বতই প্রতিপ্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে; বিচারক মহাশয়! আপনি কি দুগ্ধপোষ্য শিশু?

সাত-আট বছরের একটি রাঙা-চেলির পুঁটুলিকে কনে-চন্দন পরিয়ে একরাত্রে তার কর্ণমূলে কিছু অংবং মন্ত্র শোনানো হল; তারপর একদিন তাকে বলা হল—'তুই বিধবা হয়ে গেছিস!' —ব্যস! আজীবন বৈধব্যযন্ত্রণা! এই অনাচারকে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন রাজবল্লভ। কিন্তু তিনি বৈদ্য—ব্রাহ্মণ নন। তাই সমাজপতির অনুমতি চেয়েছিলেন। আর কৃষ্ণচন্দ্র সেটা প্রত্যাখ্যান করলেন এই অজুহাতে—'বৈপিত্রেয় ভ্রাতার উদ্ভাবনে জটিলতা অবশ্যম্ভাবী!'

স্বীকার্য—রাজা রাজবল্লভ স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে এই সমাজ-সংস্কারের আয়োজন করে ছিলেন। পরবর্তী শতাব্দীর সেই বীরসিংহের পাগলের মতো ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে চাননি; কিন্তু তাঁর আচরণে নিন্দনীয় কিছু নেই।

কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের?

দোষ যেমন ছিল, গুণও ছিল। অসাধারণ গুণগ্রাহী, বিদ্যোৎসাহী।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গভূমে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চা—বিশেষ করে গৌড়ীয় নব্যন্যায়ের বিকশন সম্ভবপর হয়েছিল একাধিক উদারমনা ভূস্বামীর অনুগ্রহে। ব্রাহ্মণকে সারস্বৎ আলোচনার সুযোগ দিয়েছেন তাঁরা অকুণ্ঠ বদান্যতায়—পুণ্যশ্লোক রানী ভবানী, উত্তরবঙ্গের একাধিক ভূস্বামী, বর্ধমান মহারাজ, রাজবল্লভ, শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেব। তার ভিতর একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিলেন—নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র।

সে আমলে একটি প্রবাদই চালু হয়ে গিয়েছিল: 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহলাভ যে করেনি তার ব্রাহ্মণত্বে সন্দেহ জাগে!'

একটিমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম! তাঁর কথাই বলব এবার: রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত।

—'বুনো' রামনাথ!

আশ্চর্য চরিত্র! অত্যন্ত দুঃখের কথা, তাঁর প্রামাণিক জীবনী নেই!

ধাত্রী গ্রামের গুরু ভট্টাচার্য বংশীয় পণ্ডিত। মনে হয়, সমকালীন নবদ্বীপের পণ্ডিতনিচয়ের মধ্যে বয়োজেষ্ঠ। পিতার নাম অভয়রাম তর্কভূষণ। পিতা তাঁকে ভর্তি করে দিয়ে গেলেন তৎকালীন নবদ্বীপের সর্বপ্রধান নৈয়ায়িক রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের গুরুকুল চতুষ্পাঠীতে।

এখানে বোধহয় 'চতুষ্পাঠী' শব্দটির কিছু পরিচয় দিয়ে রাখা ভাল। 'চতুঃ' শব্দটি চারি

বেদের দ্যোতক। অর্থাৎ যে বিদ্যায়তনে চতুর্বেদের চর্চা হয়। যে আমলের কথা, তখন যাবতীয় শাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনের ব্যবস্থা হত চতুষ্পাঠীতে বা টোলে। অর্থাৎ চতুর্বেদের অধ্যয়ন-প্রস্তুতি—ষড়ঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ) এবং ষড়দর্শন (সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, যোগ, পূর্ব ও উত্তর মীমাংসা)। ছাত্ররা গুরুগৃহেই বাস করত। এক-এক টোলে দু-চারটি ছাত্র। গুরুপত্নী তাদের জন্য রন্ধন করতেন। কোন কোন সম্পন্ন গুরু এজন্য শিষ্যদের কাছ থেকে 'সিধা' নিতেন না—তাঁরা বিদ্যাদানের পুণ্য সঞ্চয় করতেন। অধিকাংশই শিষ্যদের কাছ থেকে প্রণামী পেতেন। কখনো বা ভূস্বামী এই ব্যয়ভার বহন করেন। যেমন মহাপণ্ডিত শঙ্কর তর্কবাগীশের চতুষ্পাঠী। অতি বৃহৎ আয়োজন। প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ, আটচালা ঘর। চারি দিকে টানা বারান্দা। এক এক দিকে এক এক আয়োজন: ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায়। তর্কবাগীশের চতুষ্পাঠীর বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্ররা—যারা নব্যন্যায় বা বেদান্ত অধ্যয়ন করছে, তারা সেই বারান্দায় পঠন-পাঠনের তত্ত্বতালাশ নেয়। শঙ্কর স্বয়ং সেখানে গিয়ে তদারকি করেন। তিনি নিজে অধ্যাপনা করেন আটচালার ভিতরের ঘরখানিতে। নব্যন্যায় অথবা বেদান্ত। বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ঘিরে সারি সারি ছাত্রাবাস। কিছু দূরে রন্ধনশালা, ভাণ্ডারঘর। পাচক-ভৃত্য-দ্বারপাল। দৈনিক দুই-তিনশ কলাপাতার প্রয়োজন হয়। সে এক এলাহী কাণ্ড। ছোটমাপের আবাসিক মহাবিদ্যালয় যেন। সমস্ত ব্যয়ভার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের।

রামনাথ তাঁর সহাধ্যায়ীদলের মধ্যে ছিলেন সর্বাপেক্ষা মেধাবী। তিনিও গুরুর আশীর্বাদ আধা-আধি সফল করতে পেরেছিলেন। শেষ পরীক্ষায় আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখিয়ে পঞ্চানন-গুরুকুল থেকে উপাধি লাভ করলেন: 'তর্কসিদ্ধান্ত।' গুরুকে প্রণাম করার সময় তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: জ্ঞান ও সত্যনিষ্ঠায় তুমি বাগ্‌দেবীর আশীর্বাদ লাভ করবে: বিদ্যোৎসাহী রাজার অনুগ্রহে লক্ষ্মীর স্নেহধন্য হবে!

আশীর্বাদের শেষাংশ সার্থক করতে পারেননি 'বুনো রামনাথ'।

উপাধিলাভের পর সে-আমলে কর্মসন্ধানে শিক্ষিত বেকারদের পথে পথে ঘুরতে হত না। উপাধিপত্রটি বগলদাবা করে সরাসরি চলে যেত রাজার কাছে। লাভ করত নিষ্কর ভূমি, টোল-নির্মাণের ব্যয়ভার। খুলে বসত একটি নতুন চতুষ্পাঠী। নবদ্বীপের গণনাতীত টোলের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটত বিনা আয়াসে। রামনাথের সহাধ্যায়ীরা সেভাবে সহজে জীবন শুরু করে দিলেন। উপযুক্ত, উপার্জনক্ষম নব্যপণ্ডিতদলের অভিভাবক সমীপে আনাগোনা শুরু করল ঘটকের দল।

গোল বাধল রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের বেলায়। দুটি হেতুতে।

এক: তিনি রাজানুগ্রহ গ্রহণ করবেন না।

দুই: তিনি অকৃতদার নন, সংসারী!

ছাত্রাবস্থাতেই নিতান্ত কিশোর বয়সে একটি বালিকার পাণিগ্রহণ করেছিলেন।

তোমরা আমাকে মার্জনা কর, দিদিভাই! অক্ষমতার কথা অকপটে স্বীকার করছি। জানি, কথাশিল্পী হিসাবে দারুণ একটা রোমাণ্টিক খণ্ডকাহিনী পরিবেশনের সুযোগ হারাচ্ছি। কী করব? কল্পনায় ঐ অবিশ্বাস্য ঘটনাটি কিছুতেই ধরতে পারছি না। খুলেই বলি:

অনুরূপ 'পাপকার্যটি' করেছিলেন আলোচ্য শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

ছাত্রাবস্থায় অভিভাবকদের সম্মতি ব্যতিরেকে একটি নোলক-পরা বালিকার সিঁথিমূলে এঁকে দিয়েছিলেন সিন্দুরবিন্দু। ইতিহাস শুধু বলছে—ঘটনাটা তেজপুর নামক গ্রামে, বালিকাবধূর নাম: 'রাধা'; তার পিতৃদেবের নাম: 'কেশরকুনী আচার্য।' ব্যস্! এছাড়া আর কোন তথ্য ইতিহাসের স্মরণে নেই। কবি তাঁর কাব্যে নিজকে 'রাধানাথ' বলে উল্লেখ না করলে কবিপ্রিয়ার নামটাও আমরা জানতে পারতাম না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'অমাবস্যার গান'-এ কল্পনায় সে ঘটনার বিস্তার করেননি। কেন করেননি জানি না। তাই পাদপূরণ করতে আমি এখানে কিছু 'গপ্পো' ফেঁদেছি—ঐ বাগ্‌দেবীর যৌথ আরাধনার কল্পিত কাহিনী। কিন্তু এবার, রামনাথের বেলায় কোন উদ্ভট কল্পনার আঁকশি বাড়িয়ে ঐ অবিশ্বাস্য নিষিদ্ধ ফলটির নাগাল পাচ্ছি না। যে চরিত্রটির রেখাচিত্র আঁকতে বসেছি সেই আত্মভোলা, গ্রন্থকীট, ভিন্ন জগতের অ-রোমান্টিক পণ্ডিতটি যে কী-করে এমন একটা কেরামতি কিশোর বয়সে দেখিয়েছিলেন তা আমার আন্দাজের বাইরে। এ এমন একটা জটিল ব্যাপার যা কথাসাহিত্যিকের ধরাছোঁয়ার বাইরে। এসব কাণ্ড-কারখানা ঘটানোর হিম্মৎ শুধু সেই অলক্ষ্য নাট্যকারের—যিনি কারও তোয়াক্কা করেন না। যিনি অনায়াসে বলতে পারেন: গদাধরও সারদামণিকে বিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন!

আমি শুধু তোমাদের মেনে নিতে বলব—ইতিহাস-পরিবেশিত তথ্যটা। অষ্টাদশ বর্ষীয় কিশোর পণ্ডিত তাঁর চতুর্দশ বর্ষীয়া সহধর্মিণীকে নিয়ে সংসার পাতবেন। চতুষ্পাঠী খুলে বসবেন। কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি নাই। সহাধ্যায়ীরা যেভাবে সহজ সমাধান করল, তাও পারলেন না, অর্থাৎ রাজানুগ্রহ হাত পেতে গ্রহণ করতে।

তবু যাহোক ব্যবস্থা হল। কারণ তুরুপের টেক্কাখানা ছিল অজান্তেই ওঁর হাতে। যে দু-তিনটি মেধাবী ছাত্রকে নিয়ে শুরু করলেন তারাই হয়ে উঠল ওঁর স্বনির্বাচিত বিজ্ঞাপনদাতা: দারুণ পড়ান উনি! কাশী-মিথিলার কথা জানি না; কিন্তু নবদ্বীপে এমনটি নেই। বিশ্বাস না হয় একদিন আসিস। শুনে যাস্ তাঁর অধ্যাপন-পদ্ধতি।

গুটিগুটি অন্যান্য চতুষ্পাঠীর ছাত্রদল এসে বসত। চুপচাপ শুনত। তারা ভর্তি হতে চাইত ওঁর টোলে। রামনাথ স্বীকৃত হতে পারতেন না। আর্থিক অসচ্ছলতা। ছাত্রেরা বলত—আমরা প্রণামী দেব আপনাকে।

অর্কফলা সমেত ঘনঘন নড়ে উঠত পণ্ডিতের মুণ্ডিত মস্তক। তা কি হয়? বিদ্যা 'বিক্রয়' করতে নেই! শুধু 'দান' করতে হয়! তোমরা এস, বস, শোন। যদি কোন 'অনুপপত্তি' থাকে অসঙ্কোচে সমাধান জেনে নিও। কিন্তু কোনক্রমেই কোন প্রতিদান দেবার চেষ্টা কর না।

অনতিবিলম্বেই প্রখ্যাত হয়ে পড়েন রামনাথ—আদর্শ শিক্ষক হিসাবে।

যে দু-তিনটি ছাত্রকে আশ্রয় দিয়েছেন তাদের আহার্য-ব্যয় নিজেই বহন করেন। কী করে করেন তা ঈশ্বর জানেন!

ছাত্ররা বাধ্য হয়ে রাজী হয়। তারা নিজগৃহে আহারান্তে ছুটে আসে ওঁর কাছে। সারাদিন পঠন-পাঠন করে সন্ধ্যায় স্বগৃহে ফিরে যায়। তাতে আপত্তি নেই পণ্ডিতের।

এই আদর্শ শিক্ষকের চতুষ্পাঠীতে শিক্ষাদানের পদ্ধতিটি নানা কারণে বিচিত্র। একটি কথা তো আগেই বলেছি—অবৈতনিক শিক্ষা দান।

সেটা অভূতপূর্ব নয়। অনেক সঙ্গতিসম্পন্ন অধ্যাপক বিনাবেতনে নিজব্যয়ে গুরুগৃহে শিষ্যদের ভরণপোষণ করতেন। তাঁরা নির্লোভ এবং বিদ্যাদানকে পুণ্যকার্য মনে করতেন। সুতরাং রামনাথের সে কাজটা দুঃসাহসিক হতে পারে, অশ্রুতপূর্ব নয়।

অভূতপূর্ব যে কাণ্ডটা করলেন তা—দুর্বিনীত ছাত্রদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা।

তাহলে গোবিন্দ রায়ের বিচিত্র অভিজ্ঞতাটা শোনাই:

পরবর্তী জমানার—রাজা শিবচন্দ্রের আমলের প্রখ্যাত নৈয়ায়িক গোবিন্দচন্দ্র ন্যায়তীর্থের বাল্যকালের এক বিচিত্র স্মৃতিচারণ। কী নিদারুণ শাস্তি পেয়েছিলেন তিনি গুরু রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের কাছে।

সেটা চৈত্রমাসের শেষাশেষি। চৈত্র শুক্লা একাদশী তিথি। প্রায় মাসখানেকের জন্য কৃষ্ণনগরে একটি বিখ্যাত মেলা হয়, অন্তত হত: বারো দোল। নদীয়ারাজ্যের বিভিন্ন মন্দির থেকে দোলায় চাপিয়ে আনা হয় দ্বাদশটি কৃষ্ণ-রাধার মূর্তি। বারোটি বিগ্রহের এক সঙ্গে 'দোল' হয়। কেউ যুগলে, কেউ একাকী, কেউ বা নাড়ুগোপাল। তাঁর একটি বিগ্রহের বিষয়ে কৃষ্ণনগরে প্রচলিত আছে একটি অলৌকিক উপকথা: মদনমোহন! কিন্তু সে-কথা এখন থাক। পরে বলব, রাজা নবকৃষ্ণের প্রসঙ্গে। আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে মনে করিয়ে দিও, দিদি!

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম—বৃদ্ধ বয়সে গোবিন্দচন্দ্র ন্যায়তীর্থ তাঁর শিষ্যদের জানিয়েছিলেন, কীভাবে তিনি রামনাথের কাছে শাস্তি লাভ করেন।

'বারোদোল' উপলক্ষ্যে পরপর তিন দিন চতুষ্পাঠীতে অনধ্যায়। টোলে ছুটি থাকলে রামনাথ নির্দেশ দিতেন স্বগৃহে প্রতিটি ছাত্র কিছু কিছু পাঠাভ্যাস করবে। আজকের দিনের পরিভাষায় যাকে 'হোমটাস্ক' বলে আর কী। বারোদোলের মেলার হুল্লোড়ে বালক গোবিন্দ পড়ায় ফাঁকি দিয়েছিলেন। অবকাশ-অন্তে গুরু রামনাথ যখন পড়া ধরলেন তখন কিছুই বলতে পারলেন না। মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস নাই, জিজ্ঞাসিত হয়ে স্বীকার করলেন—তাঁর বাড়িতে কেউ অসুস্থ হয়নি। সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য যে পাঠাভ্যাসে মন দিতে পারেননি, তা নয়। স্বীকার করলেন, অন্যায় করেছেন। গুরু জানতে চাইলেন, তুমি তাহলে মেনে নিচ্ছ যে, তোমার শাস্তি প্রাপ্য?

গোবিন্দ নতমস্তকে সে কথা মেনে নিলেন। তখন রামনাথ বললেন, তাহলে তোমার গুরুপত্নীকে ডেকে নিয়ে এস, বাবা।

অনতিবিলম্বে পণ্ডিতগৃহিণী—তাঁর নামটা পাইনি—এসে দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মানা হলেন। রামনাথ বললেন, শোন। আজ আমার উপবাস। গোবিন্দের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আমাকে।

গৃহিণী জানতে চান, সমস্ত দিন?

—শুধু আজ নয়, হয়তো কালও। দেখি, ওর কতক্ষণ লাগে। যাও বাবা গোবিন্দ, বাড়ি যাও। পাঠাভ্যাস হয়ে গেলে এসে আমাকে জানিও!

গৃহিণী আবাসিক ছাত্র তিনজনকে বললেন, তোমরা কী করবে? কাঁচা ফলার? উনি উপবাস করবেন, ফলে আমারও উপবাস! তোমরা কাঁচা ফলার করলে আজ অরন্ধনের ব্যবস্থাই করি।

ওদের মুখপাত্র বললে, সে কী মা! আপনারা উপবাসী থাকবেন, আর আমরা কাঁচা ফলার করব? তা হয় না।

হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে গোবিন্দ বাড়ি ফিরে গেল। বলাবাহুল্য, সেদিন নাওয়া-খাওয়া হল না তার। সমস্ত দিন পাঠাভ্যাস করে তিনদিনের পড়া একদিনে আয়ত্ত করে সন্ধ্যায় ফিরে এল চতুষ্পাঠীতে। রামনাথ গৃহিণীকে ডেকে বললেন, উনুনে আগুন দাও। দু-মুঠো চাল বেশি নিও। গোবিন্দ বেচারির মুখখানাও শুকিয়ে গেছে! ও বোধহয় নাওযা-খাওয়ার সময় পায়নি। না কী রে?

গোবিন্দ মুখ লুকিয়ে হাসে। বাহুল্য বোধে প্রশ্নটার জবাব দেয় না।

বেত্রদণ্ড—যা নাকি সে-আমলে ছিল টোলের এক আবশ্যিক উপাদান, তার প্রয়োজন হয়নি কখনো এই চতুষ্পাঠীতে। পাছে গুরু-গুর্বী অনশন শুরু করে দেন তাই ছাত্রদল চোখে রেড়ির তেল দিয়ে রাত জেগে পাঠাভ্যাস করত।

ভৈরব মজুমদারের শাস্তিটা ছিল আরও নির্মম। তাকে বহিষ্কার দণ্ড দিয়েছিলেন! আজকের ভাষায় যাকে বলে 'রাসটিকেট' করা। আর কোনদিন মুখদর্শন করেননি প্রিয় ছাত্রের। বেচারী ভৈরব। তার উপাধিলাভ করা আর হয়নি। বিতাড়িত হয়ে অন্য কোন অধ্যাপকের চতুষ্পাঠীতে গিয়ে ভর্তি হতে পারেনি। ভৈরবের অপরাধটা ছিল হিমালয়ান্তিক। পাঠে অবহেলা তবু ক্ষমা করা যায়, কিন্তু চৌর্যাপরাধ? ব্রাহ্মণ সন্তান! গুরুগৃহে চুরি! না, তার ক্ষমা নাই!

ভৈরব ধনী গৃহের সন্তান। দুধ-ঘি-ননী তার নিত্যবরাদ্দ। আবাসিক তিনটি সহাধ্যায়ীকে বেগুনপোড়া অথবা শাকান্ন গ্রহণ করতে দেখে মনে দুঃখ হত। লক্ষ্য করে দেখত—তাদের উদরপূর্তি হয়নি, তবু 'ব্যাঘ্র-ঝম্পনে' গুরুপত্নীকে বাধা দিত: 'আর দেবেন না মা! পারব না!' তারা যে জানে, শিষ্যদের আহারান্তে গুরু-গুর্বী মধ্যাহ্নআহারে বসবেন—আর জানে, তাঁদের দুজনের জন্য হাঁড়িতে কতটুকু পড়ে আছে!

ভৈরব চুরি করতে শুরু করল!

লুকিয়ে পেট-কোঁচড়ে নিয়ে আসত চাউল। নিজেদের বাড়ি থেকে। গুরুপত্নী নদীতে জল আনতে গেলে নিপুণ হস্তলাঘবতায় তাঁর রান্নঘরে ঢুকে বেতের টুকরিতে মিশিয়ে দিত চুরি করে আনা চাউল।

গুরু-গুর্বী টের পেতেন না। বিস্মিত হতেন।

পণ্ডিতমশাই অন্নগ্রহণকালে বাক-সংযম করে থাকেন। আচমনের পরে গৃহিণীর সঙ্গে এ নিয়ে হয়তো কিছু আলাপচারিও হত। আড়াল থেকে শুনে ভৈরব মনে মনে হাসত।

ইতিপূর্বে রামনাথ পণ্ডিত-মশাইকে 'অ-রোমান্টিক' বলেছি। তা বলে তিনি 'অরসিক' ছিলেন না মোটেই। সময়-সময় দিব্যি রসিকতা করতেন। বলতেন, গুরুভোজনের পর মুখশুদ্ধি করা বিধেয়! কই গো করঙ্কধারিণী! পান-গুবাক-কর্পূরের খুঞ্চিটা নিয়ে এস!

পণ্ডিতজায়া মুখে আঁচলচাপা দিয়ে নারকেলের মালায় করে নিয়ে আসতেন তাঁর মুখশুদ্ধির সামান্য আয়োজন—দু-চার টুকরা হরীতকী! তিনিও হয়তো রসিকতা করে বলেন, খুব গুরুভোজন হয়ে গেল বুঝি আজ? হজমী দেব?

—হল না? সেই যাকে বলে—"ওগ্গরা ভত্তা রম্ভঅ পত্তা, গাইক ঘিত্তা, দুগ্ধ সজুক্তা/মৌইলি মচ্ছা নালিত গচ্ছা, দিজ্জই কান্তা খা (ই) পুনবন্তা।।"

পণ্ডিতগৃহিণী অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, কতদিন বলেছি যে, ঐ দেবভাষা বুঝি না?

—না, না গিন্নি! এ সংস্কৃত নয়—খাঁটি বাঙলা।

—বাঙলা? কিছু তো বোঝা যাচ্ছে না?

—বোঝ-না-বোঝ এ চলিত বাঙলা। চর্যাপদের। প্রাকৃত পৈঙ্গল। এ ভাষাতেই গৌড়জন কথা বলত চার-পাঁচ'শ বছর পূর্বে। শ্লোকটির অর্থ হল "কদলীপত্রে গরম ভাত, গাওয়া ঘি, সঙ্গে দুধ, মৌরলা মাছের ঝোল এবং নালিতা শাক যে গৃহিণী নিত্য পরিবেশনে সক্ষম তাঁর ভর্তা পুণ্যবান।—এতে আর সন্দেহ কী?

—আপনার গিন্নি বুঝি আপনাকে তাই নিত্যি পরিবেশন করে?

—না, তা নয়। তবে কী জান? মূল পদটি 'অন্ন'। অন্নের বর্ণনায় নৈষধচরিতের কবি বলছেন, "পরিবেশিত অন্ন হইতে ধূম নির্গত হইতেছে, তাহার প্রত্যেকটি দানা অভগ্ন, একটি হইতে অপরটি বিচ্ছিন্ন"—অর্থাৎ ঐ তোমরা যাকে বল, 'ঝরঝরে ভাত', —"সে-অন্ন সুসিদ্ধ, সুস্বাদু, সুশুভ্র, সুচিক্কণ এবং সৌরভ-গৌরবাশ্রিত"! বুঝলে? আমি হাট থেকে নিয়ে আসি বোরোধানের আঁকাড়া লাল-চাল, আর তোমার শাঁখাপরা হাতের পরশমণির ছোঁয়ায় তা থেকে নির্গত হয় গোবিন্দভোগ চাউলের সৌরভগৌরব!

ভৈরব মনে মনে হাসত। এঁরা বৈষ্ণব নন, নিরামিষাশী নন; কিন্তু বাড়িতে মাছ আসে মাসে দুদিন। কৃষ্ণপক্ষে এক দিন, শুক্লপক্ষে একদিন। পণ্ডিত গৃহিণীর এ বিলাসিতাটুকু বরদাস্ত করতে বাধ্য হয়েছেন। কী করা যাবে? স্ত্রীজাতীর সংস্কার! দুটি একাদশী তিথিতে মেধো-মালো যা-হোক দুটো মাছ ফেলে দিয়ে যায়: মৌরলা, খলিসা, সরপুঁটি, চাঁদা।

জীমূতবাহনের মতে শামুক, কাঁকড়া, হাঁস, দাত্যূহ পক্ষীর মতো বাণ-বোয়াল ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য। কিন্তু বৃহদ্ধর্মপুরাণ বলেছেন, সৎব্রাহ্মণও অন্নসেবাকালে গ্রহণ করতে পারেন, রোহিত, ইল্লিস, শফরী, কাতল ও সকুল-মৎস। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ রাজানুগ্রহ অথবা শিষ্যদের প্রণামী গ্রহণ করতে অক্ষম, তাঁর পক্ষে কী কী মৎস, কী উপায়ে ভক্ষ্য তা কোন সংহিতা বা পুরাণে লেখা নেই। ফলে ওঁরা ব্যয়-সঙ্কোচ আর সংস্কারের একটা মাঝামাঝি রক্ষা করেছেন: 'পক্ষে এক, ষণ্মাসে বারো/তারপর যত কমাতে পারো!'

তারপর একদিন।

তস্করের মানসিকতাও ক্রমবর্ধমানধর্মী: 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব'[১]। তার সাহস বেড়ে যায়। গুর্বীর টুকরিতে ছিল দুটি বেগুন। পরদিন সকালে দেখা গেল গণ্ডা পুরেছে। হংসীতে আণ্ডা দেয়, পাঠশালায় ছাত্ররা 'গণ্ডায় আণ্ডা' দেয় তা বলে বার্তাকু আণ্ডা পাড়বে টুকরিতে! ব্রাহ্মণী ওই অলৌকিক ঘটনাটি বিবৃত করলেন পাণ্ডিতকে। অধীত বিদ্যার বাহির-জগতের সংবাদ উনি তেমন কিছু রাখতেন না—কিন্তু উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধে এ সামান্য জ্ঞানটুকু ছিল: বেগুন গাছে ফলে। বেতের টুকরিতে তার বংশবৃদ্ধি অপ্রাকৃত ঘটনা! পণ্ডিত শিষ্যবর্গের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে বসলেন।

---

১ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন হয়।

'হস্তলাঘবতা' আয়ত্ত করতে শিখেছে আর 'অনৃতভাষণ' অভ্যাস করেনি! দোষ তো একা ভৈরবের নয়, গুরুও যে দায়ী। মিছেকথা বলা শেখাতে পারেননি। নতমস্তকে স্বীকার করল। তৎক্ষণাৎ বহিষ্কারদণ্ড!

ভৈরব মজুমদার কোন উপাধিলাভ করতে পারেনি। যে বেত্রদণ্ড চতুষ্পাঠীতে দেখেনি, তাই দেখল পিতৃদেবের হস্তে। না, নিজবাটিতে চুরি করার অপরাধে নয়—বহিষ্কারদণ্ড লাভের পর যখন সে প্রত্যাখ্যান করল দ্বিতীয় কোন চতুষ্পাঠীতে ভর্তি হতে! বাপ অভিশাপ দিল, থাক! বামুনের ছেলে, মুখ্যু হয়েই থাক!

তাও সে থাকেনি। উপাধি লাভ না করলেও পরবর্তী জমানার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভূস্বামী ভৈরব মজুমদার অশিক্ষিত ছিলেন না আদৌ। ভাগবৎ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। পড়াশুনা তিনি করেছিলেন। কোনও চতুষ্পাঠীতে নয়। একলব্যের একান্ত সাধনা!

গুরু রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের এক জোড়া বাতিল-খড়মকে সাক্ষী রেখে!

চোখের জলে ভাসতে ভাসতে অপুত্রক গুরুপত্নী সেটি উপহার দিয়েছিলেন হতভাগ্যকে।

চতুষ্পাঠী গৃহটি এতই ক্ষুদ্রায়তন যে বিদ্যাদানের আয়োজন করতে হয়েছিল সংলগ্ন উদ্যানে। সেটিও ক্ষুদ্র। ফলে সেখানেও স্থানাভাব দেখা দিল। তদ্ভিন্ন শহুরে পরিবেশে—ক্রমাগত কোলাহল-শোভাযাত্রা-সংকীর্তন—এতে বাগ্‌দেবীর আরাধনায় ব্যাঘাত ঘটে। শহরে খাদ্যদ্রব্যও দুর্মূল্য। রামনাথ সিদ্ধান্তে এলেন—সব তর্কের শেষ সিদ্ধান্ত: অরণ্যচারী হয়ে যাবেন সস্ত্রীক। বানপ্রস্থ! জলাঙ্গীর ধারে, অরণ্যপ্রান্তে শশক, হরিণ ক্রৌঞ্চবকদের প্রতিবেশী হয়ে যাবেন। সেখানে কোলাহল নাই—মৌনপাদপের অশ্রুত সামগান, বনফুলের স্নিগ্ধ সৌরভ—প্রকৃতির নিবিড় অঞ্চলের 'শান্তিনিকেতনে' আশ্রয় নেবেন এবার। উপনিষদের ঢঙে।

নবদ্বীপ-শহরপ্রান্তে, জলাঙ্গীর ধারে—সেই যেখানে আরণ্যক ধ্যানমগ্নতা থমকে দাঁড়িয়েছে শহুরে পরিবেশের জৌলুষ দেখে, সেই সীমান্ত-রেখাটা অতিক্রম করে নির্জনতার কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে একটি কুটির নির্মাণ করলেন। বাঁশ-দড়ি-খড়, মাটির দেওয়াল, মাটির নিকানো মেঝে। ঘরামি লাগানোর সঙ্গতি নাই। শিষ্যদের সাহায্যে স্বয়ং নির্মাণ করলেন একটি পর্ণকুটির। শহুরে টোল থেকে গো-গাড়িতে নিয়ে যেতে হল ঘর-গেরস্থালীর যাবতীয় সরঞ্জাম। তার বৃকোদর-অংশ শুধু হাতে লেখা পুঁথি। গৃহিণী নিত্য শোনেন—গৃহ শেষ হয়ে এসেছে। জানতে চান: কেমন বাড়ি হল গো?

পণ্ডিত কৌতুক করে বলেন, রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজপ্রাসাদের বর্ণনাটা মনে আছে, গিন্নি? কালিদাসের বর্ণনায়? শোন বলি:

"চলৎ কাষ্ঠং গলৎকুড্যমুত্তানতৃণ সঞ্চয়ম্।
গণ্ডুপদার্থিমণ্ডূকাকীর্ণং জীর্ণং মম।।"[১]

গৃহিণী বলেন, সাদা বাঙলায় তার মানে কী হল?

—সেটা স্বচক্ষে গিয়ে দেখতে হবে।

[১] কাঠের খুঁটি নড়বড় করে, মাটির দেওয়াল গলে-গলে পড়ে, চালের খড় একটু হাওয়াতেই উড়ে পালায়, আর কেঁচোর সন্ধানে উদগ্রীব ব্যাঙের সমাবেশে আমার জীর্ণ গৃহ আকীর্ণ।

শিষ্যরা প্রমাদ গনে। এতটা পথ তাদের প্রতিদিন যাতায়াত করতে হবে? উপায় নাই। গুরুগৃহে বাস করার প্রশ্নই ওঠে না; আবার ওঁকে ত্যাগ করে অন্য কোন চতুষ্পাঠীতে যেতে পারে না। কিন্তু একথা ওঁকে কে বোঝাবে?

কথাটা কানে গেল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের। খোঁজ খবর নিলেন তিনি। বিভিন্ন টোলের বিশ-পঞ্চাশটি ছাত্রের গোপন এজাহার নেওয়া হল। সর্ববাদীসম্মত মত: রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের সমতুল্য পণ্ডিত-তথা-শিক্ষক নবদ্বীপে দ্বিতীয় নাই। মহারাজ অতঃপর তাঁর কিশোর জ্যেষ্ঠপুত্রকে আদেশ দিলেন ঐ অরণ্যপ্রান্তে গিয়ে রামনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তাঁকে অনুরোধ করতে, তিনি যেন নবদ্বীপধামে এসে তাঁর চতুষ্পাঠী খুলে বসেন। যাবতীয় ব্যয়ভার রাজসরকারের। অযাচিত বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।

শঙ্কর তর্কবাগীশ তখন সেখানে উপস্থিত। বললেন, বাবা শিবচন্দ্র, মনে রেখ, উনি অত্যন্ত অভিমানী; সেজন্যই স্বয়ং উপযাচক হয়ে রাজদরবারে আসেননি।

কৃষ্ণচন্দ্র বলেন, সে তো বটেই! উপযাচক আমি। তাই তাঁর ভদ্রাসনে যুবরাজকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। গরজ আমার। নবদ্বীপরাজ্যে বিদ্যাচর্চার প্রসার।

শিবচন্দ্র উভয়কে প্রণাম করে বিদায় নিচ্ছিলেন। রাজা তাঁকে আবার ফিরে ডাকলেন। উপদেশ দিলেন, শোন বাবা, আর একটি কথা বলি। তর্কসিদ্ধান্ত অস্বীকৃত হলে গোপনে তাঁর ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁকে অনুরোধ কর।

শিবচন্দ্র প্রস্থান করার পর শঙ্কর তর্কবাগীশের দিকে ফিরে রাজা বাম চক্ষুটি মুদ্রিত করে বললেন, কোন কোন পণ্ডিতের কাছে রাজাদেশের অপেক্ষা অর্ধাঙ্গিনীর আদেশ অধিক পরিমাণে ফলপ্রসূ।

শঙ্কর সহাস্যে বলেন, জানি মহারাজ!

মহারাজও ফিরিয়ে দেন সহাস্য জবাব, —আপনি তো জানবেনই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে!

শিবচন্দ্র অশ্বপৃষ্ঠে উপনীত হলেন রামনাথের চতুষ্পাঠীতে।

আরণ্যক পরিবেশ। মহামৌন পাদপের সারি রুদ্ধশ্বাসে শোনে তর্কসিদ্ধান্তের তত্ত্বকথা। দশ-পনেরটি শিষ্য গুরুকে ঘিরে বসে আছে। অশ্বারোহী রাজপুরুষ কিছু দূরে অশ্ব থেকে অবতরণ করলেন। পদব্রজে এগিয়ে আসেন। প্রণাম করলেন তর্কসিদ্ধান্তকে। তিনি ভ্রূক্ষেপও করলেন না। প্রায় একদণ্ডকাল শিবচন্দ্র ছাত্রদলের পিছনে বসে শুনে গেলেন। বিন্দুবিসর্গ বোধগম্য হল না। পাঠ সমাপ্ত হলে শিষ্যদল তাঁকে প্রণাম করে একে একে বিদায় হল। শিবচন্দ্র পুনরায় অগ্রসর হয়ে আসেন। দ্বিতীয়বার প্রণাম করলেন ব্রাহ্মণকে। এতক্ষণে নজর হল। বললেন, কে বাবা তুমি? কী চাও?

—আজ্ঞে আমার নাম শ্রী শিবচন্দ্র। ঠাকুরের নাম শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র রায়। নদীয়াধিপতি তিনি।

শেষ শব্দটা বোধহয় কানে যায়নি। বলেন, কোন গুরুকুলের?

—আজ্ঞে আমার পিতৃদেব নবদ্বীপাধিপতি, স্বয়ং রাজা শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র রায়!

—অ! বুঝেছি। তা কী চাও বাবা?

শিবচন্দ্র বুঝে নিয়েছেন, এঁকে নবদ্বীপ বা কৃষ্ণনগরে সমূলে উৎপাটন করে নিয়ে যাওয়া

বোধহয় সম্ভবপর হবে না। সহজতর সমাধান, যদি পণ্ডিত স্বীকৃত হন, এই আরণ্যক পরিবেশেই একটা বৃহত্তর চতুষ্পাঠী নির্মাণে।যেমন বৃহৎ চতুষ্পাঠী আছে শঙ্কর তর্কবাগীশের। পাশাপাশি ছাত্রাবাস—প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ! আরণ্যক মহাবিদ্যালয়! বললেন, বাবামশাই আপনার কথা শুনেছেন। আপনি এই আরণ্যক পরিবেশেই সারস্বত-সাধনা করে যেতে চান। এ তো আনন্দের কথা। কিন্তু বহু শিষ্য আপনার চতুষ্পাঠীতে স্থান পেতে চায়। আমাকে তাই পাঠিয়েছেন আপনার অনুপপত্তি-বিদূরণ মানসে!

'অর্থসাহায্য' কথাটা স্থূল। শিবচন্দ্র তাই একটি গালভারি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন—'অনুপপত্তি' অর্থাৎ অভাব, আর্থিক অনটন।

দুর্ভাগ্যবশত ঐ নঞ্‌তৎপুরুষ সমাসটির দ্বিতীয় একটি অর্থ আছে: অসংগতি, অমীমাংসা, প্রমাণাভাব।

সরল ব্রাহ্মণ ঐ দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করে বললেন, না বাবা! আমি চারিখণ্ড চিন্তামণি শাস্ত্রের উৎপত্তি করেছি: এখন তো কোন অনুপপত্তি দেখছি না!

নানানভাবে চেষ্টা করেও ঐ মহাপণ্ডিতের 'নিরেট মাথায়' সহজ কথাটা প্রবেশ করানো গেল না। পণ্ডিত বুঝতেই পারলেন না, রাজপুত্র রাজাদেশে এসেছেন তাঁকে অর্থসাহায্য করতে। নিরুপায় শিবচন্দ্র তারপরে প্রণাম করতে গেলেন সেই মহিলাটিকে! তিনি সহজেই বুঝলেন। প্রত্যুত্তরে বললেন, মহারাজকে বল, তাঁর ধারণাটি ভ্রান্ত। আমাদের সত্যই কোনও অভাব নাই। এখানে খুব ভাল ওল হয়। তাছাড়া ঐ যে তেতুঁল গাছটি দেখছ বাবা, ওর তেঁতুল পর্যাপ্ত হয়। উনি ওল-ভাত অথবা তিন্তিড়ী পত্রের ব্যঞ্জন দিয়ে পরমানন্দে অন্নগ্রহণ করেন। মহারাজ অহেতুক মনঃকষ্টে আছেন। এ তো শহর নয়, এখানে সত্যই কোনও অভাব নাই!

পুত্রের মুখে এই বার্তা শুনে সেটা অবিশ্বাস্য মনে হল রাজমহিষীর—স্বামীস্ত্রীর মধ্যে একটা পাগল হয়। এ যে জোড়া-পাগল! নিজের হিত বোঝে না?

অভিমানে লেগেছিল কৃষ্ণচন্দ্রেরও। পরাজয় স্বীকার করা তাঁর ধাতে নেই। উপযাচক হয়ে রাজপুত্রকে প্রেরণ করলেন, অথচ ব্রাহ্মণ তা প্রত্যাখান করল! কীসের এত দম্ভ তার?

রানীকে প্রশ্ন করেন, যাবে? দেখতে?

—ওমা! এ কী বলছেন? আমি কেমন করে যাব?

—কেন? পাল্‌কিতে।

—আমি গিয়ে কী দেখব সেই এঁদো জঙ্গলে?

—জোড়া-পাগল বাস্তবে হয় কি না।

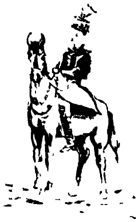

কৃষ্ণচন্দ্র এবার স্বয়ং এলেন আরণ্যক চতুষ্পাঠীতে। কিংখাবে-মোড়া পাল্‌কিতে রাজমহিষী। অশ্বপৃষ্ঠে মহারাজ। শহর-সীমার বাহিরে। কিছু খরগোশ আর বনতিতির ছোটাছুটি করছে। নাম-না-জানা হাজার পাখির রাজত্ব। তর্কসিদ্ধান্তের চতুষ্পাঠীর দ্বারে দুই অভ্রংভেদী প্রহরী—এক জোড়া শিশুগাছ!

মহারাজ কোন দ্ব্যর্থবোধক সংস্কৃত শব্দের ফাঁদে পা দিলেন না। সহজ সরল বঙ্গভাষে পেশ

করলেন তাঁর কুণ্ঠিত আবেদন। দেশের স্বার্থে, নবদ্বীপধামের সারস্বত-আরাধনাকে সার্থক করার প্রয়োজনে পণ্ডিতকে এ আরণ্যক পরিবেশ ত্যাগ করে যেতে হবে। নবদ্বীপ পণ্ডিত-সভার মধ্যমণির আসনটি অলঙ্কৃত করে নদীয়ারাজকে ধন্য করতে হবে।

সহজ সরল বঙ্গভাষেই প্রত্যাখ্যান করলেন সেই আদর্শ শিক্ষক: তা হয় না, মহারাজ!

রাজা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, আপনি মহাপণ্ডিত। আমার একটি 'অনুপপত্তি' নিরাকরণ করে দিন তাহলে?

—বলুন, মহারাজ?

—উপনিষদ্ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য কেমন করে হয়েছিলেন জনকরাজার বৃত্তিভোগী সভাপণ্ডিত?

স্মিতহাস্যে প্রশান্ত হয়ে উঠল মহাপণ্ডিতের মুখমণ্ডল। বললেন, এর সমাধান তো সহজ মহারাজ! তিনি ছিলেন ব্রহ্মবিদ, আমি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু। তিনি পেয়েছিলেন, আমি খুঁজছি। তিনি ঋষিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য, আমি সামান্য বুনো রামনাথ।

পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হলেন কৃষ্ণচন্দ্র। রাজমুকুটটি খুলে ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করলেন মাথায়।

কিন্তু অত সহজে হার স্বীকার করতে পারলেন না রাজমহিষী। একই সময়ে কক্ষান্তরে তিনি বসেছিলেন ঐ সীমান্তিনীর মুখোমুখি: কেন? কেন? কেন?

পণ্ডিত-গৃহিণী সহাস্যে বলেন, সে কথা তো আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না, রানীমা। এ যে ব্যাখ্যার অতীত—বোধের জগতে! এটাই যে ওঁর ধর্ম!

—ওঁর ধর্ম! আপনার কী? আপনি কেন পড়ে থাকবেন এই জঙ্গলে?

পুনরায় একই কথা বললেন পণ্ডিত গৃহিণী: একই প্রত্যুত্তর, রানীমা! সেটাও ব্যাখ্যার অতীত, বোধের জগতে। আমি যে ওঁর সহধর্মিণী!

রানী-মার শেষ সংযম ভেঙে পড়ল। অপমানিতা বোধ করলেন নিজেকে। স্বয়ং নদীয়াধিপতি সস্ত্রীক উপযাচক হয়ে এসেছেন—ভিক্ষা চাইছেন—আর তা প্রত্যাখ্যান করছেন এই ভিক্ষুকদম্পতি! কীসের এই দার্ঢ্য! কীসের এত অহঙ্কার?

কঠিনস্বরে বলেন, আপনার অভিরুচি। ইচ্ছা হয় এই জঙ্গলেই পড়ে থাকুন। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে একটা সত্যি কথা বলুন তো?

—'বুকে হাত দিয়ে' সত্যকথা! 'মিথ্যা' বলতে যাব কিসের ভয়ে?

রানী-মা সে-কথায় কান দিলেন না। বললেন, স্বামীর ইচ্ছায় এই জঙ্গলে জীবন-যৌবন কাটাতে চান। কিন্তু আপনার কি কখনো সাধ হয় না, এই আমার মতো অলঙ্কারভূষিতা হতে?

ব্রাহ্মণী এখনো সহাস্যবদনা। বলেন, অলঙ্কার! মহারানী! এ অরণ্যে আমার অঙ্গে আমার স্বামী যে-অলঙ্কার পরিয়ে দিয়েছেন তা যে সারা নবদ্বীপের আর কোনও ভাগ্যবতীর অঙ্গে নেই। আমি আপনাদের ঈর্ষা করতে যাব কেন?

রানী-মা সবিস্ময়ে বলেন, অলঙ্কার! আপনার অঙ্গে? পণ্ডিতমশায়ের দেওয়া উপহার?

সন্ধানীদৃষ্টিতে ঐ শাঁখা-সর্বস্ব বধূটির সর্বাঙ্গ দেখে নিলেন। রাজবাটিতে নানান ধনাঢ্য পরিবারের কুলললনাদের নিত্য শুভাগমন ঘটে। কে কোন কারুশিল্পময় স্বর্ণভূষণ পরিধান করে

1342

এসেছেন তা চকিত দৃক্‌পাতে দেখে নেওয়া একটা বিশেষ চারুকলা। অলঙ্কারগর্বিতা যাতে বুঝতে না পারে অথচ ভবিষ্যতে স্বর্ণকারকে তা বুঝিয়ে দেওয়া যায়! রাজমহিষী সে চারুকলায় পারদর্শিনী। কিন্তু কিছুই নজরে পড়ল না—হস্তে, কণ্ঠে, কর্ণে একরতি সোনাও নেই। মায়, অঙ্গুরীয় পর্যন্ত নাই অনামিকায়। বরং দেখলেন—লালপাড় ধনেখালি শাড়ির অঞ্চলপ্রান্তে সীবনচিহ্ন।

ব্রাহ্মণী বলেন, বৃথাই তল্লাস করছেন মহারানী। আপনার নজরে পড়বে না।

রাজমহিষী প্রণিধান করেন—'অলঙ্কার' শব্দটা 'আলঙ্কারিক' অর্থে ব্যবহার করেছেন পণ্ডিতজায়া—অর্থাৎ স্বামীর সোহাগের সোহাগায় গড়া ওঁর দার্ঢ্য-অলঙ্কার!

ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলেন, লোকে যা চোখে দেখে না, তাকে আপনি 'অলঙ্কার' বলেন?

—লোকে দেখে, আপনিই শুধু দেখতে পাচ্ছেন না রানী-মা!

—বটে! আমার দৃষ্টিহীনতার হেতু?

—'অহঙ্কারে' অন্ধ হলে 'অলঙ্কার' যে দেখা যায় না, মহারানী! এই দেখুন!

অনশনক্লিষ্টা অরণ্যচারিণী তাঁর শীর্ণ হাতখানি তুলে দেখান: এই শাঁখা! এটি যতক্ষণ এই সৌভাগ্যবতীর হাতে আছে ততক্ষণই নবদ্বীপের গৌরব! ততক্ষণই সমগ্র আর্যাবর্ত স্বীকার করবে—কাশী নয়, মিথিলা নয়, এই আরণ্যক পর্ণকুটিরেই বর্তমানে মা সরস্বতীর অধিষ্ঠান!

রানী-মার মাথাটা নিচু হয়ে গেল। নিদারুণ সত্য কথা! সমগ্র বঙ্গভূমের কোন রাজমহিষী, কোন নবাবের বেগম ও-কথা বলতে পারে না। স্বামীর নিজে হাতে পরিয়ে দেওয়া প্রণয়োপহার দেখিয়ে অমন একটা কথা বলতে।

তিনি নত হলেন চীরধারিণীর চরণপ্রান্তে।

দুশ বছর কেটে গেছে তারপর।

সারা ভারতের শিক্ষাব্রতীর আদর্শ—আজও—বুনো রামনাথ!

পরদিন সকালে উনি বললেন, আজ ভাবছি শান্তিপুর ঘুরে আসব। অদ্বৈতাচার্যের ভিটে···

ভারতচন্দ্র বলেন, না, রূপেন্দ্র। আজ তোমাকে উলো যেতে হবে।

—উলো! কোন গ্রামের নাম?

—গ্রাম নয়, শহর। অতি প্রাচীন জনপদ। সেখানে একটি রুগী দেখতে যেতে হবে তোমাকে। আমিও যাব। ভোলাকে বলেছি আর একটি অশ্ব ভাড়া করে আনতে।

রূপেন্দ্র জানতে চান—রুগীটি কে। ভারতচন্দ্র তাকে কতদিন চেনেন।

ভারত বলেন, সে আমার অপরিচিত। কিন্তু তোমার চেনা। দেখেছ, বছর সাত-আট আগে। তার নাম—গয়ারাম। একটি পা খোঁড়া, আনুষঙ্গিক আরও কী কী ব্যাধি আছে।

—আমি তাকে চিনি? গয়ারাম? সাত-আট বছর আগে দেখেছি?

প্রসঙ্গটি বেদনাবহ। কৌতুকের নয়। তাই রহস্যজাল ছিন্ন করে দেন এবার।

রুগী বস্তুত গঙ্গাচরণ, রূপেন্দ্রের ভগ্নিপতি, কাত্যায়নীর স্বামী।

রূপেন্দ্রকে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু ভারত নিজে গোপনে সন্ধান করেছিলেন। মহারাজের এক বিশ্বস্ত গুপ্তচরকে দিয়ে। প্রোষিতভর্তৃকা কাত্যায়নীর মর্মবেদনায় কবি স্থির থাকতে পারেননি। তাঁর কাছে কাত্যায়নী আর রাধারাণী বারে বারে একাত্ম হয়ে উঠেছিল। দুজনেই প্রত্যাশা করে দিন গুন্‌ছে শবরীর প্রতীক্ষায়। স্থির করেছিলেন, তেমন সংবাদ পেলে সে-কথা রূপেন্দ্রকে আদৌ জানাবেন না। সেই অদেখা-অচেনা মেয়েটিকে বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করতে দেবেন না। কিন্তু সংবাদ নিয়ে জানতে পারলেন—নেদেরপাড়া পল্লীর বিষ্ণুচরণ চাটুজ্জের পুত্র গঙ্গাচরণ জীবিত। বছর পাঁচ-ছয় পূর্বে সে দেশত্যাগ করে। একজন ধনবান ব্যবসায়ীর সঙ্গে। আদি সপ্তগ্রামের নৈকষ্য কুলীন। তাঁর পুত্রসন্তান ছিল না। একটিই কন্যা। তিনি গঙ্গাচরণকে প্রস্তাব দেন যে, জামাতা বাবাজীবন যদি ভ্রাম্যমাণ জীবন ত্যাগ করে ঘরবসত করতে স্বীকৃত হয়, তবে তাকেই দিয়ে যাবেন সম্পত্তি। তাঁর কন্যাটিও ডাগর। গঙ্গাচরণ এককথায় রাজী হয়ে যায়। বাড়ি বাড়ি ঘুরে পার্বণী আদায় করা আর সহ্য হচ্ছিল না তার। প্রণিধান করেছিল—ঐ 'নাল্পে সুখমস্তি' শ্লোকটা কোন কাজের কথা নয়। একটি স্থায়ী ঘর, একটি সালঙ্কারা যৌবনবতী নববধূ, তার কোলে একটা বক্‌বকে বাচ্চা! সকাল-সন্ধ্যা নিরুপার্জিত ভোজ্যদ্রব্য এবং অম্বুরী-তামাক! সে তো স্বর্গসুখ!

শ্বশুরমশাই বলেছিলেন, বহুদিনের সখ একবার তীর্থে যাব—কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন। একা সাহস পেতাম না এতদিন। ছেলে নেই। ভাইপোরা আছে, কিন্তু এক একটা পাষণ্ড! তুমি যদি ভরসা দাও তাহলে সপরিবারে তীর্থ করে আসি, বিয়েটা মিটে গেলেই। নিয়ে যাবে বাবা, আমাদের?

পরের পয়সায় তীর্থেই বা আপত্তি কী? রাজী হয়ে গেল। শ্বশুরমশাই বলেন, তাহলে দুটি কাজ করতে হবে, বাবাজীবন। তোমাকে দাড়ি রাখতে হবে, আর নামটা পালটাতে হবে।

—আপনি বললে, নিশ্চয় করব। কিন্তু হেতুটা?

—পথে ঘাটে তোমার আর কোন শালা-শ্বশুর-সম্বন্ধী যদি চিনতে পেরে তোমাকে ছিনিয়ে নেয়? তাহলে বিদেশ বিভুঁইয়ে আমি অথৈ জলে পড়ে যাব।

শ্বশুর-শাশুড়ী আর সদ্যবিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে গঙ্গাচরণ—না, এখন সে গয়ারাম—দীর্ঘ দিন উত্তরখণ্ডের বহু তীর্থ পরিক্রমা করেছে। মাস-কতক আগে কেন্দুবিল্বের কাছাকাছি ফেরার পথে ঘটে গেল বিপর্যয়। পড়ে গেল বর্গীর আক্রমণের সম্মুখে। ওর শ্বশুর-শাশুড়ী হত হলেন। ধর্ষিতা স্ত্রী আত্মঘাতী হল। গঙ্গাচরণের একখানা চরণের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটিয়ে দিয়ে গেল বর্গীরা। যা ছিল সঙ্গে, অর্থ ও অলঙ্কার, লুণ্ঠিত হল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে আদি সপ্তগ্রামে পৌঁছায়। ওর খুড়তুতো শ্যালকেরা ইতিমধ্যেই সম্পত্তির দখল নিয়েছে। তারা বুঝিয়ে দিল—একখানা গেছে, অবিলম্বে সপ্তগ্রামের সম্পত্তির আশা ত্যাগ না করলে দ্বিতীয় ঠ্যাঙখানাও যাবে। বর্গীরা যা লুট করেছে, আগুনে পুড়িয়েছে, তার ভিতর খোয়া গেছে ওর সেই লাল খেরো খাতাখানা। এ অঞ্চলে তার অনেক-অনেক শ্বশুরবাড়ি; কিন্তু ঠিকানা মনে নেই—শ্বশুরের নাম, পত্নীর নাম, কিছুই যদি বলতে না পারে তাহলে বাড়ি খুঁজে পেলেও কেউ কি খোঁড়া-জামাইকে বিশ্বাস করে আশ্রয় দেবে?

পাঁচ-সাত বছর দেশত্যাগী থাকায় নেদেরপাড়ার পৈত্রিক ভিটেখানার দখলও গেছে। খড়ো ঘরখানা দু-একটা বর্ষার কোপ সামলেছিল। তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে। সরিকেরা ভাঙা কোঠার আবর্জনা সাফা করে জমিটা দখল নিয়ে যে-যার বসতবাড়ি সম্প্রসারিত করে নিয়েছে।

ঘটনাচক্রে তাকে চিনতে পেরেছিলেন উলোর রসিকলাল রায়ের জননী *আনন্দময়ীতলায় পূজা দিয়ে ফিরে যাবার মুখে। *আনন্দময়ী কালীমূর্তি। একটি খড়ো চালাই মায়ের মন্দির*। বাজার দেবোত্তর। জনশ্রুতি স্বয়ং আগমবাগীশের প্রতিষ্ঠা করা। তারই প্রবেশদ্বারে ভিক্ষা করতে বসেছে একজন খঞ্জ ভিক্ষুক। একমাথা রুক্ষ চুল, একমুখ দাড়ি। তার আঁচলে একটা কপর্দক ফেলে দিতে গিয়ে কেমন যেন চমকে উঠলেন বৃদ্ধা। বলেন, তোমার নামটি কী, বাবা?

—নাম? আজ্ঞে গয়ারাম।

—গয়ারাম? ও! গঙ্গাচরণ তোমার কেউ হয়? মুখের আদলটা…

—কোন্ গঙ্গাচরণ, মা? *বিষ্টুচরণের সেই কুলাঙ্গার কুপুত্রটা? নেদেরপাড়ার বিবাহ-বিশারদ? তাকে চিনতেন বুঝি? সে মরেছে!

—মারা গেছে! আহা ষাট-ষাট! কতদিন?

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো একটা সম্ভাবনার কথা মনে হল ভিক্ষুকের। বললে, কেন বলুন তো?

—সে আমার জামাই ছিল।

একটা পায়ের উপরেই ভর দিয়ে সোজা হয়ে ওঠে গঙ্গাচরণ! চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার! বৃদ্ধাকে সে চিনতে পারেনি। কেমন করে পারবে? বৃদ্ধার একটিই জামাই! দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল ভেদ করে তাই দেখতে পেয়েছেন ওর মুখের আদলটা। কিন্তু গঙ্গাচরণের যে তিনকুড়ি শাশুড়ী! কেমন করে চিনবে?

—কী হয়েছিল তার? কতদিন আগে?

গঙ্গা সে কথার জবাব না দিয়ে বলে, আপনার মেয়ে? সে আসেনি?

—না বাবা। সে নেই। আজ বছর দুই!

আবার বসে পড়ে। দপ্ করে নিবে যায় আশার প্রদীপটা। মেয়েটির কথা ওর মনে নেই। নামটা জানে না। দুবছর আগেও সে ওর আয়ুষ্কামনা করে সীমন্তে সিঁদুর দিত! ঈস! কী বে-আক্কেলে মেয়েটা! পট করে মরে বসে আছিস্?

—কই বললে না, বাবা?

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল গঙ্গাচরণ।

বৃদ্ধা ওর পরিচয় জানতে পেরে ভৃত্যকে দিয়ে একখানা এক-ঘোড়ার পাল্কি-গাড়ি আনিয়ে নিলেন। কন্যাটি দুনিয়ার মায়া কাটিয়েছে, তাই বলে উলোর রায়বাড়ির জামাই *আনন্দময়ীতলায় বসে ভিক্ষা করবে! অসম্ভব!

রসিকলাল ধনী ব্যক্তি। উলোর একজন গণ্যমান্য ভূস্বামী। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে মায়ের উপর খাপ্পা হয়ে ওঠে। এ কী উট্‌কো আপদ! আনন্দময়ীতলায় বসে 'গয়ারাম' ভিক্ষা করছে তাতে মায়ের কী? সে তো আর 'গঙ্গাচরণ' নয়!

* যে সময়ের কথা, তখন আনন্দময়ী মায়ের মূর্তিটি ছিল খড়ো-চালায়। কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র তন্ত্রসাধক মহারাজ গিরীশচন্দ্র 1804 খ্রীষ্টাব্দে চারচালা পাকা মন্দিব নির্মাণ করেছিলেন। সে অনেক পরের যুগে।

গঙ্গাচরণের দিকে একটি নগদ সিক্কা টাকা বাড়িয়ে ধরে বলে, বুঝতেই পারছ, আমার ভগিনীটির পরলোকপ্রাপ্তি ঘটেছে। তোমাকে আমাদের আর কোন প্রয়োজন নেই। যেখানে বসে ভিক্ষা করছিলে সেখানেই ফিরে যাও। নাও ধর।

গঙ্গাচরণ হাতদুটি জোড় করে বললে, আর যে তা পারি না, বড়দা!

—বড়দা! একটি চড়ে তোমার নাম ভুলিয়ে দেব! হারামজাদা! আমি রায়মশাই! যা দূর হ!

কোণঠাসা হতে হতে এমন একটা অবস্থা আসে যখন নিরীহ অবোলা জীবও রুখে দাঁড়ায়। প্রত্যাঘাত করতে চায়। গঙ্গাচরণও বোধকরি সহ্যের সেই সীমান্তে পৌঁছেছিল। সারাজীবন সে জামাই-আদরে অভ্যস্ত—আজ মাস-কয়েক সে নিঃস্ব, ভিক্ষাজীবী, পঙ্গু। তাও মেনে নিয়েছিল। তারপর হঠাৎ ঐ বৃদ্ধার সস্নেহ সহানুভূতিতে সে বোধহয় আশার একটা ক্ষীণ রশ্মি দেখতে পেয়ে অন্য জাতের মানুষ হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। রসিকলালের কথাটা তাই তার সহ্য হল না। বললে, তাড়িয়ে দিলে আর কী করব? ফিরেই যাব—তবে আনন্দময়ীতলায় যে ফিরে গিয়ে বসবে সে নাম-ভুলে-যাওয়া গয়ারাম নয়! সাবেক গঙ্গাচরণ! রায়বাড়ির জামাই।

আর সহ্য হল না রসিকলালের। ছুটে এসে ঠাশ্ করে একটা প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দিল। একটা পায়ে দেহভার রক্ষা করতে হয়। গঙ্গাচরণ ভারসাম্য হারালো। হুমড়ি খেয়ে উল্টে পড়ল মার্বেলের মেঝেতে। রসিকলাল গর্জে ওঠে, হারামজাদা! তুই যা ভাব্‌ছিস্ তা হবে না। তার আগে তোকে কেটে খড়ের জলে ভাসিয়ে দেব।

পাঁচ আঙুলের দাগ ফুটে উঠেছে গালে। চোখ দুটো ভরে এসেছে জলে। ভূশয্যা থেকে উঠে বসে। যুক্তকরে এবার যে কথাটা বললে তাতে কোন শ্লেষ নেই, কোন প্রত্যাঘাত নেই—তা ওর অন্তর-নিঙরানো আর্তি: তাই দিন, বড়দা! বিশ্বাস করুন—আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে দেখেছি। পারিনি। সাহসে কুলায়নি! অন্তত সেটুকু উপ্গারই করুন! হাজার হোক, এক-কালে তো আপনার বোনাই ছিলাম!

রসিকলাল থমকে গেল! ওর কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিল, যাতে ঐ পাকামাথার বৈষয়িক মানুষটাও কোন জবাব খুঁজে পেল না।

মা বললেন, না! ও থাকবে। এ বাড়িতেই। ঐ আস্তাবলের একটেরে। গয়ারাম হিসাবেই। ওকে ভিক্ষা করতে দেব না আমি! কিছুই তো চায় না বেচারি! মাথার উপর ছাদ, আর দু বেলা দু-মুঠো...

—না! তা হয় না!—বৈষয়িক বুদ্ধি ফিরে এসেছে এতক্ষণে। বললে, তুমি বুঝতে পারছ না মা, তাতে নানান রকম বিপদ! কথাটা জানাজানি হয়ে যাবেই! হারামজাদাটাকে তাড়াতে হবে!

মা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, ছোটখুকি নেই বলেই এতবড় কথাটা তুই বলতে পারলি, বড়খোকা! কিন্তু আমার কথার নড়চড় হয় না, তা তো তুই জানিস! আমি ওকে আশ্রয় দেব। দেখি, তুই কী করতে পারিস!

সেই থেকে গঙ্গাচরণ—না, গঙ্গাচরণ নয়, গয়ারাম, বাড়ির আস্তাবলের এক কোণায় পড়ে আছে। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে সে। মায়ের মাথাটা হেঁট হতে দেয়নি। পরিচয় গোপন আছে তার—অন্তত তার নিজের তাই বিশ্বাস।

বাস্তবে তা নেই। অনেকেই জানে। গোপন রাখে। রসিকলাল উলোর এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ

ভূস্বামী। তেজারতি কারবার তার। হাতে মাথা কাটতে পারে। মুখরোচক কিস্‌সাটা তাই কেউ আলোচনা করে না। সুখে থাকতে কে আর ভূতের কিল খেতে চায়? খবরটা বাইরের লোক না জানলে ভারতচন্দ্র সে খবরটা সংগ্রহ করতে পারতেন না। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ঐ ধুরন্ধর গুপ্তচর দুদিনেই ওঁকে আসল খবরটা জানাতে পেরেছিল: নেদেরপাড়ার গঙ্গাচরণ এখন উলোয় থাকে—রায়মশায়ের আস্তাবলে। এখন তার নাম: গয়ারাম।

উলা একটি প্রাচীন জনপদ। গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগর থেকে দক্ষিণে, কয়েক ক্রোশ দূরত্বে। পাকা নবাবী সড়ক দুই জনপদকে যুক্ত করেছে। সড়কের শেষ সেখানেই নয়। ঐ পথরেখা ধরে চলতে থাক দক্ষিণবাগে—চূর্ণী পার হয়ে—পাবে একের পর এক প্রাচীন জনপদ। রণার ঘাট[১], চৌবেড়িয়া, কাঞ্চনপল্লী[২], কুমারহট্ট[৩], ভট্টপল্লী[৪], মূলাযোড়[৫]। কিন্তু সেসব কথা এখন নয়। আবার ঐ একই নবাবী সড়ক ধরে গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগর ছাড়িয়ে যদি উত্তরমুখো চলতে থাক, পাবে প্রথমেই জলাঙ্গীর খেয়াঘাট। পার হলে। পাবে বেলডাঙ্গা, দেবগ্রাম তারপর গঙ্গাতীরের লাখবাগ।

'লাখবাগ'কে তোমরা চেন না। নামটা অজানা। কেমন করে জানবে গো? 'লাখে এক'ও যে আজ নেই। এই পরগণার অনেকটা অংশ ছিল নাটোরের স্বনামধন্য রানী ভবানীর জমিদারীর অন্তর্গত। রানীমার নির্দেশে এখানে গুনে গুনে এক লক্ষ আমের কলম পোঁতা হয়। খানদানি সব গাছ! বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে হাজার হাজার গো-গাড়ি আর নৌকায় সেই সব হিমসাগর, ল্যাংড়া, বেগমখাশ, বাদ্‌শা-পসন্দ, কোহিতুর আমের পাহাড় চালান যেত—কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপে, মুখ্‌সুদাবাদ, ওদিকে রাজসাহী, নাটোর। শেষ আমগাছটি কালবৈশাখীর ঝড়ে ভূতলশায়ী হয় 1893 খ্রীষ্টাব্দে। ঐ শেষ রসালবৃক্ষের মৃতদেহের পাশেই ইংরাজ-সরকার বাহাদুর খাড়া করেছিল একটা গ্র্যানাইট পাথরের ছোট্ট ফলক। তাদের বঙ্গবিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন। তার ষোলো বছর পরে লর্ড কার্জন সেটা অপসারণ করে বসিয়েছিল একটা বড়মাপের মজবুত স্মৃতিচিহ্ন। 'লাখবাগে' গেলে সেটা আজও দেখতে পাবে। তবে তোমরা লাখবাগের খোঁজ কর না। ওর নাম পরের জমানায় যা হয়েছিল সেই নামেই আজ ওর পরিচয়: পলাশী।

সেটা পার হয়ে উত্তরমুখো গেলে পৌঁছাবে মুর্শিদাবাদে।

উলার কথায় ফিরে আসি।

চূর্ণীনদীর পশ্চিমপারের এই গ্রামটির নাম কেন অমন হল তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন, জ্ঞানী অর্থে ইরানীয় শব্দ 'আউল'—যা থেকে বাঙলায় প্রচলিত শব্দ 'আউল-বাউল'—তা থেকেই উলা নামটা এসেছে। আবার কেউ বলেন, তা নয়, গ্রাম পত্তনের আগে এখানে চূর্ণী নদীর কিনার ঘেঁষে ছিল দিগন্তবিস্তৃত উলুবনের জঙ্গল। 'উলু' ঘাস চেন তো? উলুখড় দিয়ে বাঙলা-চালা ছাওয়া হয়। ধানখড়ের চেয়ে তা অনেক অনেক বেশি

জনপদগুলির বর্তমান নাম

[১]রণার ঘাট = রাণাঘাট, [২]কাঞ্চনপল্লী = কাঁচড়াপাড়া, [৩]কুমারহট্ট = হালিশহর, [৪]ভট্টপল্লী = ভাটপাড়া = কাঁকিনাড়া, [৫]মূলাযোড় = শ্যামনগর।

উলো

টেঁকসই। ঐ জঙ্গলে বাস করত এক আদিম জাতি। সে অনেক অনেক কাল আগে। মানে, ধর্মাশোক তখনো চণ্ডাশোক। অর্থাৎ সম্রাট অশোক তখনো কলিঙ্গ-বিজয়ে আসেননি। আর্য সভ্যতা এসে পৌছায়নি বঙ্গভূমে। নৃতাত্ত্বিকেরা বলেন, সেই বিস্মৃত অতীতে গোটা বঙ্গভূমে বাস করত অস্ট্রিক-গোষ্ঠীর কিছু কৃষিজীবী আদিম জাতি। তাদেরই একটি শাখা বাস করত এই চূর্ণীতীরের ঘন জঙ্গলে। তাদের এক লৌকিক দেবতা আজও টিকে আছেন ওখানে: উলাইচণ্ডী দেবী।

দেবীসেবার বংশানুক্রমিক অগ্রাধিকার হাড়ী জাতীয় এক পূজারীব। এখন বোধহয় হয় না, কিন্তু আমাদের কাহিনীর কালে বৈশাখী পূর্ণিমায় এখানে মায়ের মন্দিরে শূকর-বলি হত।

চণ্ডী প্রাগার্য দেবী। মা মনসার মতো। পরবর্তী সহস্রকে আর্য-অনার্য-সংমিশ্রণে গৌড়মণ্ডলে জন্ম নিল একটি মিশ্র জাতি—বাঙালী; তখন ঐ দুই দেবীকে মার্জনা করে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা তাঁদের তেত্রিশ কোটির মধ্যে সামিল করে নিলেন। ঐ অনার্য ব্যাধের দেবী হলেন শিবের অর্ধাঙ্গিনী। বাঙালীর কবি-মন রচনা করতে শুরু করল—মনসামঙ্গল আর চণ্ডীমঙ্গল।

এক সময়ে ভাগীরথী বইত এই উলা-গ্রামের পাশ দিয়েই। উলা ছিল গঙ্গাতীরবর্তী গ্রাম। এখন যেন বিশ্বাস হতে চায় না—গঙ্গা কত দূরে সরে গেছে! গঙ্গার সেই আদিম মরা-খাত উলার নগর সীমান্তে আজও দেখা যায়। উলা যে গঙ্গাতীরবর্তী জনপদ তার একটি পরোক্ষ প্রমাণ রয়ে গেছে বাঙলা সাহিত্যে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে —

শ্রীমন্ত সওদাগর চলেছেন সিংহল-দ্বীপে—তাঁর সপ্তডিঙা-মধুকর ভাসিয়ে। ভাগীরথী বেয়ে উপনীত হতে হবে কপিলমুনির আশ্রমে—সেই 'দক্ষিণরায়ের' রাজ্যে, গঙ্গাসাগরে। তারপর সমুদ্রযাত্রা। নদীপথেই একদিন উঠল দারুণ ঝড়। শ্রীমন্ত নোঙর করলেন। শুনলেন, গ্রামটির নাম উলা। এমন নাম কেন গো? —জানতে চাইলেন শ্রীমন্ত সওদাগর। সর্দার-মাঝি বললে, সে কি হুজুর? আপনি জানেন না? এখানেই যে আছে মা উলাইচণ্ডীর মন্দির। তাঁর বরে কী না হয়? 'অপুত্রের পুত্র হয়, নির্ধনের ধন'। মোটকথা: 'যে যে-বর চায়, সে সে-বর পায়!'

শ্রীমন্ত বললেন, তাহলে আমিই বা তাঁর পূজা না করি কেন? বর চাইব—যাতে নির্বিঘ্নে বাণিজ্য করে ফিরে আসতে পারি।

তাই হল। শ্রীমন্ত সওদাগর সাড়ম্বরে উলাইচণ্ডীর পূজা করলেন।

কেউ কেউ বলেন, যেহেতু শ্রীমন্ত সওদাগর এই ঘাটে নৌকা থেকে 'উলা' করেছিলেন, তাই গ্রামটির নাম 'উলা'। 'উলা' ক্রিয়াপদের অর্থ জান তো? —অবতরণ করা, নামা।

আমার বাপু এ ব্যাখ্যায় মন মানেনি। এ যেন ঘোড়ার আগে গাড়ি যোতা! শ্রীমন্ত নৌকা থেকে উলা করার আগেই তো শুনলেন—গাঁয়ের নাম: 'উলা', যেহেতু সেখানে আছে মা উলাইচণ্ডীর দেউল।

মোটকথা, শ্রীমন্ত সওদাগরের আমলে উলা গ্রামখানি ছিল গঙ্গার কিনারে। এখন এ জনপদের নাম: বীরনগর।

উলাকে এ খেতাবটি দিয়েছিলেন ইংরাজ সরকার-বাহাদুরের তরফে কলকাতার এক ন্যায়াধীশ—কোর্ট অব সার্কিটের প্রধান বিচারপতি। কারণ ছিল। সেটা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ। সে সময় উলার কাছাকাছি—ঐ গঙ্গার মরাখাতের জঙ্গলে বাস করত একদল দুর্ধর্ষ

ডাকাত, যা থেকে ঐ বর্তমান নাম 'ডাকাতের খাল'। তাদের উপদ্রবে সরকার-বাহাদুরের কোতোয়াল হিমসিম। শেষমেষ উলার যুবশক্তি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ধরে ফেলল ডাকাত দলকে। কোতোয়াল পাঠিয়ে দিল সেই ডাকাতদের শহর কলকাতায়। জজবাহাদুর তাদের দিলেন শাস্তি আর উলাবাসীকে ঐ খেতাব। উলা হয়ে গেল: বীরনগর!

আমাদের কাহিনীর কালেও উলার যথেষ্ট খ্যাতি। শিল্প ও বিদ্যার্চর্চায়। অনেকগুলি টোল পরিচালিত হয়—অধিকাংশই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অর্থানুকূল্যে। এখান থেকেই বিভিন্ন যুগে স্বনামখ্যাত হয়েছিলেন—চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন, সদাশিব তর্কালঙ্কার, কৃষ্ণরাম ন্যায়পঞ্চানন, শিবশিব তর্করত্ন প্রভৃতি। এই জনপদের পণ্ডিত সারণ সিদ্ধান্ত তাঁর দুই আত্মজাকে সংস্কৃত শিক্ষায় পারদর্শিনী করে তোলেন। তবে সে ঘটনা যে ঠিক কোন আমলের তার হক-হদিশ জোগাড় করতে পারিনি। বীরনগরবাসী কোন পণ্ডিত কিছু হদিস দিতে পারেন?

দুই অশ্বারোহী বন্ধু শহর দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছেন। সড়কের দুধারে পাকা বাড়ি। পাতলা ইটের। মোটা দেওয়াল। কাদার গাঁথনি। স্থানে স্থানে দ্বিতল বাড়ি। মাঝে-মাঝে প্রতিষ্ঠিত জলাশয় এবং মন্দির। পথে পদাতিকেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। দু-একটি গো-গাড়ি বা অশ্বযান। ঘরানা-ঘরের মহিলারা চলেছেন পাল্‌কি চেপে। পদাতিক পুরুষদের অধোবাস ধুতি, হাঁটু পর্যন্ত। ঊর্ধাঙ্গে উত্তরীয়। সেলাই করা বস্ত্র—পিরান বা কুর্তার চল কলকাতা বা মুর্শিদাবাদে হয়েছে। বর্ধমান বা কৃষ্ণনগরেও উচ্চকোটি মহলে তা সুপরিচিত; কিন্তু এখানে তা বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। দু-একটি সীমন্তিনীকে দ্বিতলের বারান্দায় বা প্রাঙ্গণের ভিতরে চকিত দর্শনে দেখা যায়। তারাও একবস্ত্রা। গায়ে কামিজ নাই। তবে চর্যাপদের যুগে বক্ষযুগল অনাবৃত রাখায় যে বাধা ছিল না, এখন সে অবস্থা নয়। শাড়ির দৈর্ঘ্য সচরাচর কম, বহরেও ছোট। তার পরিপূরক হিসাবে যৌবনবতীরা ব্যবহার করেন একটি পৃথক ওড়না। তাতেই উর্ধ্বাঙ্গ আবরিত, তাতেই অবগুণ্ঠনের আয়োজন। কোন কোন সীমন্তিনী সন্তানবতী। তাদের ক্রোড়ে শিশু। অধিকাংশই উলঙ্গ, মাজায় ঘুন্সি, মাথায় 'কাকপক্ষগুচ্ছ'—অর্থাৎ চূড়ো-করে-বাঁধা চুলের তিনটি শিখর। রমণীকুলের অলঙ্কারের মধ্যে সবার আগে যেটা নজর পড়ে তা প্রৌঢ়াদের ক্ষেত্রে নথ এবং যুবতী ও কিশোরীদের নোলক।

ওঁদের দুজনকে বৈঠকখানায় বসিয়ে রসিকলালের কর্মচারী ভিতরে এত্তেলা দিতে গেল। যাবার আগে জানতে চায়, হুজুরকে কী বলব? কে দেখা করতে এসেছেন?

ভারতচন্দ্র বললেন, উদ্দেশ্যটা গোপন এবং বৈষয়িক।

এঁরা অশ্বারোহণে এসেছেন। বেশবাস সম্ভ্রান্ত। লোকটা দ্বিতীয় প্রশ্ন করেনি।

একটু পরে দ্বিতল থেকে নেমে এলেন গৃহস্বামী। কোঁচানো ফরাসডাঙার ধুতি। উর্ধ্বাঙ্গে রেশমী কামিজ, তদুপরি বেনিয়ান। জবরদস্ত কোমরবন্ধ। দক্ষিণ তর্জনীতে একটি পোষা বুলবুল। দু হাতের নখ অতি দীর্ঘ এবং অলক্তক রাগরঞ্জিত। এটি ঋষি বাৎস্যায়ন নির্দেশে: "নখক্ষত প্রদানেচ্ছু গৌড়ীয় নাগর সচরাচর হস্তশোভী ও চিত্তগ্রাহী দীর্ঘনখরলাঞ্ছিত হয়েন।" চোখ দুটি রক্তবর্ণ। বুঝতে অসুবিধা হয় না এই প্রত্যুষেই কিছু গৌড়ীয় মাধ্বী সেবন করেছেন। যুক্তকরে উভয়কে নমস্কার করে বললেন, অহোবত! কী সৌভাগ্য! আসুন, বসুন।

ওঁরা বসেই ছিলেন। প্রতিনমস্কার করলেন শুধু।

প্রথমেই ওঁদের পরিচয় লাভের বাসনাটা জাগাই স্বাভাবিক। মদ্যপ সে পথে গেলেন না। পর্যায়ক্রমে দুজনকে দেখে নিয়ে রূপেন্দ্রকে সম্বোধন করে বললেন, মহাশয়ের জেব-এ সিঁদকাঠি নাই, আশা করি?

—সিঁদকাঠি!—রূপেন্দ্র আঁৎকে ওঠেন।

—আপনার খানদানি বদনখানিতে যে 'মদন মুরছা যায়!' তা যাগ্‌ গে, মরুগ্যে! মদন-শালা মুচ্ছো গেল তো ভারি বয়েই গেল আমার! যত ইচ্ছা সিঁদ দিন। আমার ঘরে কোন 'বিদ্যা' নেই! তিনকড়ি-পণ্ডিতের বেতের চোটে বাল্যেই 'বিদ্যা'কে বাপের বাড়ি পাঠিয়েছি! বলুন, কী ভাবে আপনাদের সেবা করতে পারি?

ভারতচন্দ্র বলেন, আমার এই বন্ধুটি একজন কবিরাজ। উনি আপনার আস্তাবলে গিয়ে গয়ারামকে একবার দেখতে চান। আপনি অনুমতি দিলে···

রসিক একটা হেঁচকি সামলালেন। বলেন, এ তো আজব কথা শোনালেন মহাশয়! না ডাকতেই উনি গয়ারামের চিকিচ্ছে করতে এসেছেন! আপনাদের উদ্দেশ্যটা কী? কোত্থেকে আসছেন?

রূপেন্দ্র বলেন, আসছি সোঞাই গাঁ থেকে। বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত!

—সেই অদ্দূরের গাঁ থেকে গয়াতীর্থে আসছেন! মতলবটা কী?

—মতলব কিচ্ছু নেই। গয়ারামের সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করলে আপনার আপত্তি আছে?

—আলবাৎ আছে! তার আগে বলতে হবে, আপনাদের মতলবটা কী?

রূপেন্দ্র বুঝতে পারেন, রসিকলালের আপত্তির মূলটা কোথায়। গয়ারামের প্রসঙ্গ ওঠামাত্র উনি বদলে গেছেন। তাই প্রসঙ্গটার মোড় ঘোরান আপাতত। আর একটু ঘনিষ্ঠ না হয়ে সে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করা ঠিক হবে না। বলেন, আপনার যখন আপত্তি আছে, তখন গয়ারামের প্রসঙ্গ থাক, কিন্তু সিঁধকাঠির কথা বললেন কেন তখন?

আবার প্রফুল্ল দেখায় মদ্যপকে। ঘনিয়ে এসে বলেন, আপনি 'বিদ্যাসুন্দর' পড়েননি?

ভারতচন্দ্র উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। রূপেন্দ্র বলেন, না। কার লেখা?

—মহারাজ কেষ্টচন্দ্রের আমদানি-করা নয়া-চিড়িয়া! লোকটাকে এখনো দেখিনি। কিন্তু গোয়াড়ি-গঞ্জে এখন ঘরে-ঘরে তার নাম!

রূপেন্দ্র চকিতে তাঁর পার্শ্ববর্তী বয়স্যের দিকে দৃকপাত করেন। দেখেন, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কবির মুখখানি। বলেন, ঐ কাব্যগ্রন্থ লিখে এত খ্যাতি? আপনি পড়েছেন?

—সবটা পড়িনি। কিছু কিছু কেচ্ছা পড়েছি। আমার এক বয়স্য আছে। ঋষধ্বজ দত্ত। সে অনুলিপি করিয়েছে। অংশ-বিশেষ। পড়ে শুনিয়েছে! দারুণ লেখা, মহাশয়। মহারাজ সে-শালার উপাধি দিয়েছেন: 'রায়-গুণাকর'; আমি হলে উপাধি দিতাম: 'খেউড়-বিশারদ'।

ভারতচন্দ্র অধোবদন হলেন। যেন রসিকলাল একটি সূচ বিদ্ধ করে দিয়েছেন ওঁর পঞ্জরে। রসিক বলেই চলেন, ঢের-ঢের কবি দেখেছি মহাশয়, এমন কাঁচা-খিস্তি পদ্যের আকারে লেখার হিম্মৎ কারও নেই। সাঁঝের বেলা আসবেন, ঋষধ্বজের আড্ডায়। শুনিয়ে দেব! এ পুঁথির শত শত অনুলিপি হবে, বুয়েছেন, ঘরে ঘরে সবাই লুকিয়ে পড়বে।

রূপেন্দ্র নিরতিশয় লজ্জিত হন, প্রসঙ্গটা উত্থাপন করায়।

1742

ভারত মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে বসে আছেন। তাঁর কর্ণমূল রক্তিম হয়ে উঠেছে।

রসিকলাল পুনরায় বলেন, তার ফলাফল কী হবে আন্দাজ করতে পারছেন? কুমোরভায়াকে রণ্ডিবস্তিতে গিয়ে আর প্রতিমার মাটি সংগ্রহ করতে হবে না। ঐ পুঁথির সম্যক প্রচার হলে কুমোরভায়া যে-কোন গেরস্তবাড়ি থেকেই তুলে নিতে পারবে এক খাব্‌লা মাটি। শুরু করতে পারবে মূর্তি গড়ার কাজ। গেরস্তবাড়ি আর রণ্ডিবাজার একাকার করে ছেড়েছে শালা!

ধীর পায়ে ভারতচন্দ্র কক্ষ ত্যাগ করেন। যেতে যেতে শুনতে পান, রসিকলাল বলছেন, 'বিদ্যাসুন্দরের কিস্‌সা অমৃতের কথা/খেউড়ানন্দ কবি ভনে শুনে তার রাধা॥'

রূপেন্দ্র প্রতিবর্তী-প্রেরণায় যেন প্রতিধ্বনি করেন, রাধা!

—খেউড়ানন্দ নিজেকে 'রাধানাথ' বলেছে; খোদায় মালুম সে মাগী ওর বউ, অথবা···

দু-হাতে দুই কান ঢেকে ছুটতে ছুটতে প্রাঙ্গণটা অতিক্রম করে রাজপথে চলে আসেন।

প্রভাতী সূর্যের আলো গাছের পাতার ভিতর দিয়ে টাকা-টাকা ছোপ ফেলেছে বনভূমিতে। ভারতচন্দ্রের কিন্তু মনে হল—নীরন্ধ্র অন্ধকার! এ কী হয়ে গেল! এ কী করলেন তিনি! কে ঐ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র? কী প্রয়োজন তাঁর অনুগ্রহের? আজও কি নতুন করে শুরু করা যায় না? ঐ বুনো রামনাথের মতো? তিনি তো রাজানুগ্রহের প্রত্যাশা করেননি, প্রত্যাখ্যান করেছেন! আছে, ভারতচন্দ্রেরও আছে সেই হিম্মৎ! তিনিও পারেন ওল-সিদ্ধ আর তিন্তিড়ীপত্রের ব্যঞ্জনে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে। রাধাও পারে। পারবে। তিনি যদি তাকে হাত ধরে নিয়ে যান কোনও অরণ্যপ্রান্তের পর্ণকুটিরে। রাধাও গরিব ঘরের মেয়ে—দাসদাসী, অলঙ্কারের প্রত্যাশী সে নয়! সে শুধু চেয়েছিল অরুন্ধতীর মতো মহাবশিষ্ঠের চরণপ্রান্তে একটুকু ঠাঁই! ভারতচন্দ্রও লাভ করবেন বরদা বাণীর আশীর্বাদ! রাধাও সেদিন তার শাঁখা-পরা হাতখানি তুলে দেখাতে পারবে নবদ্বীপ রাজমহিষীকে! বলবে, আমার হাতে যতদিন এই শাঁখা আছে···

চোখ দুটি জলে ভরে এল কবির।

রূপেন্দ্র শেষমেশ অনুমতি আদায় করতে পেরেছেন। যখন বুঝিয়ে বলতে পারলেন, উনি গয়ারামকে সোঞাই গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। সেখানকার একজন ধনী গৃহস্থের কন্যাকে বিবাহ করেছিল ঐ গয়ারাম, অর্থাৎ গঙ্গাচরণ। সেই ধনী ভূস্বামীই সন্ধান পেয়ে রূপেন্দ্রকে গোয়াড়ি-গঞ্জে পাঠিয়েছে খরচপত্র দিয়ে—জামাতা বাবাজীবনকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

এক কথায় রাজী হয়ে গেল রসিকলাল। আপদ বিদায় হবে। নিজে থেকেই বলল আপনি ও-শালাকে রাজী করান। আমি নিজে ওকে নৌকায় তুলে দিয়ে আসব। নিজের খরচে বিদায় করব। নাম-ধাম ঠিকানা লিখে দিয়ে যান শুধু।

রূপেন্দ্র বাহিরে এসে ভারতচন্দ্রকে খুঁজে বার করলেন। কবি ততক্ষণে সামলেছেন। অপ্রিয় প্রসঙ্গটা দুজনেই এড়িয়ে গেলেন—অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দরের মূল্যায়ন।

বীরনগর

গঙ্গাচরণ চিনতে পারল না রূপেন্দ্রকে। চেনা সম্ভবপরও নয়। এমন কি দামোদর নদের তীরে সোঞাই গ্রামখানার কথাও তার স্মরণে এল না। স্বীকার করল, সে-আমলে কত কত গাঁয়ে গেছি, বে-করেছি। সে-সব লেখা ছিল আমার খেড়ো খাতায়। অত নামধাম কি মুখস্ত থাকে?

জানতে চাইল, সোঞাই গ্রামে তার শ্বশুরের ধাম। রূপেন্দ্র তা বললেন না। রসিকলালকে যে-কথা বলেছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি করলেন। জানালেন, ঐ সোঞাই গ্রামের একজন ধনী গৃহস্থ—ওর শ্বশুর মহাশয়—ওকে ফেরত নিয়ে যাবার জন্য রূপেন্দ্রকে পাঠিয়েছেন। গঙ্গাচরণ স্বীকৃত হলে তিনি ওকে নিয়ে যাবেন।

গঙ্গাচরণ আনন্দে আটখানা। বললে, রাজী হব না? কী বলছেন, মহাশয়? তিনি আমাকে জামাই-আদরে নিয়ে যেতে চাইছেন আর আমি এই আস্তাবলে পড়ে থাকব? যাওয়ার জন্যে আমি একপায়ে খাড়া··· মানে দু পা থাকলেও একপায়ে খাড়া হতাম!

রূপেন্দ্র বললেন, রায় মহাশয় দু-এক দিনের ভিতর তোমাকে নৌকাযোগে পাঠিয়ে দেবেন। তুমি তৈরী হয়ে নাও!

—আমি তো তৈরীই। কিন্তু আমার শ্বশুর মশায়ের নামটা? সোঞাই গাঁয়ে পৌছে কার বাড়ি খোঁজ করব?

রূপেন্দ্রকে থামিয়ে ভারত প্রত্যুত্তর করেন, সেটা এখনি তোমাকে বলতে পারছি না। তুমি গিয়ে উঠবে রূপেন্দ্রনাথ ভেষগাচার্যের আরোগ্যশালায়। সেখানে তোমার থাকার বন্দোবস্ত করে দেওয়া হবে, যতদিন না ইনি গিয়ে পৌছান।

গঙ্গাচরণ জানতে চায়, এই লুকোচুরির অর্থটা কী? এখনি বলতে বাধা কোথায়?

ভারত বলেন, আমরা প্রথমে আমাদের প্রাপ্যটা আদায় করি। জামাই পেয়ে শেষে ভদ্রলোক যদি আমাদের লবডঙ্কা দেখায়?

গঙ্গাচরণ বুঝতে পারে। এতো সহজ কথা! স্বীকৃত হয়।

প্রত্যাবর্তনের পথে রূপেন্দ্র প্রশ্ন করেন, গঙ্গাকে তার শ্বশুরালয়ের কথাটা কেন বললে না ভারত? এক গঙ্গা মিছে কথা বলে গেলে কেন?

ভারত বলেন, আমি কবি। বানিয়ে বানিয়ে কাহিনী রচনা করা আমার পেশা। তবু একটি বিশেষ কারণে ঐ মিথ্যাভাষণ করেছি। কিন্তু তুমি কেন মিথ্যা কথাটা বললে, রূপেন? তুমিও তো রসিকলালের কাছে স্বীকার করনি যে, ও তোমার ভগ্নিপতি! সত্য গোপন করলে কেন?

রূপেন্দ্র বলেন, দেখ ভারত, 'সত্য' শব্দটার লৌকিক অর্থ আমি মানি না। 'সত্য' তাই, যা 'শিব'-এর দিশারী। আমি যদি এখানেই স্বীকার করতাম যে, গঙ্গাচরণ আমার ভগ্নিপতি তাহলে নানান জটিলতার সৃষ্টি হত। নিজের পূর্ণ পরিচয় দিতে হত। গঙ্গাও হয়তো রাজী হওয়ার আগে মোটারকম পার্বণী চেয়ে বসত। রসিকলাল ধূর্ত ব্যবসায়ী মানুষ—আমি অন্য একজন ধনীব্যক্তির নির্দেশে কিছু প্রাপ্তিযোগের প্রত্যাশায় কাজ করছি—এ তথ্যটা সে সহজেই মেনে নিল। গঙ্গাও সেই অচেনা ধনী শ্বশুরের প্রত্যাশায় এককথায় রাজী হয়ে গেল। আমার মূল লক্ষ্য ছিল 'শিব', 'মঙ্গল'। কাত্যুর, গঙ্গার, রসিকলালের, তার মায়ের, সকলের সমস্যা সমাধান করে মঙ্গল বিধান করেছি। ফলে, 'মিথ্যাচার' করিনি আমি। 'সত্য' সৃজন করেছি—যে সত্য

1742

'শিব'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত!

ভারতচন্দ্র মৃদু হেসে বলেন, সুন্দর কথাটি বলেছ রূপেন—'আমি সত্য সৃজন করেছি।'

—এবার তুমি বল, তুমি কেন মিথ্যার আশ্রয় নিলে?

—আমি 'পাদপূরণ' করেছি মাত্র। আমি যে কবি। 'সত্য' তো শুধু 'শিব'-এর সঙ্গেই সম্পৃক্ত নয়, সে যে অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ 'সুন্দর'-এর সঙ্গেও! আমি সেই 'সুন্দর'-এর উপাসক। 'সুন্দর'-এর মুখ চেয়ে 'সত্য'কে সৃজন করেছি।

—বুঝলাম। তবু আর একটু ব্যাখ্যা শুনতে ইচ্ছে করছে।

—আমি যে কুহকটা রচনা করলাম—লৌকিক ব্যাখ্যায় যা 'মিথ্যা', আমার ধারণায় তা 'সত্য'। তার নানানরকম ফলাফল কল্পনা করতে পারছি। অনায়াসলব্ধ নায়িকার কদর নায়কে করে না। সোঞাই আরোগ্য-নিকেতনে পৌছে ঐ গঙ্গাচরণ খুঁজতে থাকুক—কে তার নিরুদ্দিষ্টা প্রিয়া। কোন্ সীমন্তিনী তার অজ্ঞাতে অথচ তারই আয়ুষ্কামনায় সিঁথিতে আঁকে সিঁদুরের রেখা, হাতে পরে খাড়ু-শাঁখা। সোঞাই গাঁয়ের যাবতীয় সীমন্তিনী তার মা-বোন—শুধু একটি ব্যতিক্রম! তাকে খুঁজে বার করতে হবে। তাকে সনাক্ত করতে হবে। সেই উদগ্রীব আগ্রহ, সেই ঐকান্তিক উৎসাহই ওর অন্তরে প্রেমের সঞ্চার করবে। মিলনমুহূর্তটিকে আনন্দঘন করে তুলবে। আবার ওদিক দিয়ে বিচার কর—কাত্যায়নী একটি রুগীর সেবা করছে। সম্পর্কটা আর্ত আর শুশ্রুষাকারিণীর। তবু মাঝে মাঝে কাত্যায়নীর মনে হবে—ও লোকটা অমন করে কী দেখে তার দিকে তাকিয়ে? বেচারী তো জানে না, গঙ্গাচরণ একটি বিশেষ সীমন্তিনীকে খুঁজছে সোঞাই গ্রামে পদার্পণের পর থেকেই!

রূপেন্দ্র অট্টহাস্য করে ওঠেন, ওরে ব্বাবা! তুমি যে 'কাতু-গঙ্গা'কে নিয়ে মনে মনে এক মহাকাব্য রচনা করে বসে আছ!

ভারতচন্দ্র ম্লান হাসেন, কী করব বল ভাই? 'খেউড়ানন্দ' হলেও আমি যে কবি!

রূপেন্দ্র তিরস্কার করেন, ছিঃ! ঐ অর্বাচীন মদ্যপটার কথায় তুমি কান দিয়েছ?

ভারত একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বলেন, ওর কথায় নয়, ভাই। আমার মনে এক আত্মজিজ্ঞাসা জেগেছে! ভাবছি, মহারাজকে সরাসরি প্রশ্ন করব—কেন তিনি আমাকে টেনে নামিয়ে আনলেন এই পঙ্ককুণ্ডে?

রূপেন্দ্র বয়স্যের হাতখানি চেপে ধরে বলেন, না! তুমি তা কর না। প্রশ্নটা আমাকেই করতে দাও। আমি জেনে নিয়ে তোমাকে জানাব। ঠিক যেভাবে আমাকে না জানিয়ে তুমি জেনে নিয়েছিলে গঙ্গাচরণের খবর।

—মহা ধুমধামে জগদ্ধাত্রী পূজা সমাপ্ত হয়ে গেল।

জগদ্ধাত্রী পূজা বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল না এতদিন। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই তার প্রবর্তক।

তাঁরই আমলে তা ছড়িয়ে পড়ে ফরাসডাঙায়। দু-আড়াইশ বছর পরে আজও শুধু ঐ দুটি জনপদে—কৃষ্ণনগর আর চন্দননগরে, জগদ্ধাত্রী পূজার ব্যাপক আয়োজন।

এ পূজার প্রবর্তন নিয়ে একটি কাহিনী প্রচলিত—

নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সাড়ম্বরে দুর্গা পূজা করতেন—বংশানুক্রমিক শারদীয়া দুর্গোৎসব। একবার তিনি নবাবের রাজস্ব, আবওয়াব প্রভৃতি সময় মতো দিতে পারেননি। তাতে নাকি নবাব আলিবর্দী কৃষ্ণচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করেন মহাপূজার ঠিক প্রাক্কালে। তাঁর আশা ছিল, বাৎসরিক পূজা থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কায় রাজা স্বীকৃত হবেন। বাস্তবে হলেনও তাই। ব্রাহ্মণের মৌখিক প্রতিশ্রুতি পেয়ে আলিবর্দী হুকুম দিলেন তাঁকে মুক্ত করে দিতে। বন্দী আবদ্ধ ছিলেন মুঙ্গেরের কারাগারে। নৌকাযোগে তিনি সময়মতো কৃষ্ণনগরের রাজবাটিতে উপনীত হতে পারলেন না। অগ্রদ্বীপের রুকুনপুর ঘাটে যখন পৌঁছালেন তখন দেখতে পেলেন নবমীর সন্ধ্যা নেমেছে। বিজয়া দশমীর ঢাকের বোল শোনা যাচ্ছে! অগ্রদ্বীপ প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্গত একটি পল্লী। এই সেই রুকুনপুরের অভিশপ্ত ঘাট, যেখানে শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন-যাত্রার সময় আহারান্তে সেবক গোবিন্দ ঘোষের কাছ থেকে মুখশুদ্ধি চেয়েছিলেন, আর গোবিন্দ পূর্বদিনের সঞ্চিত একখণ্ড হরিতকী তার প্রভুকে দেওয়ার অপরাধে বৃন্দাবনতীর্থে যাওয়ার অধিকার হারায়। আজ সেই ঘাটে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র হারালেন মাতৃপূজার অধিকার! কৃষ্ণনগর থেকে জলপথে মাত্র দশ-পনের ক্রোশ দূরে। নিদারুণ হতাশায় ভেঙে পড়লেন রাজা। অস্নাত অভুক্ত ব্রাহ্মণ নৈরাশ্যের অবসাদে নৌকার ভিতরেই ঘুমিয়ে পড়লেন। সেই রাত্রে তিনি এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখলেন—

একটি অপূর্ব সুন্দরী কিশোরী বালিকা এসে যেন দাঁড়িয়েছে তাঁর শিয়রের কাছে। বলছে, মহারাজ, অনশনে প্রাণ দিও না। ওঠ! গঙ্গাজল পান কর।

রাজা ঘুমের মধ্যেই যেন উঠে বসলেন। বললেন, তুমি কে? কেন বলছ আমাকে এই অনশন-ব্রত ভঙ্গ করতে?

কিশোরী বলে, আমাকে চিনতে পারলি না? আমার কথা ভাবতে ভাবতেই তো ঘুমিয়ে পড়েছিলি? আমি পৃথিবী—'পৃথিব্যহং জগদ্ধাত্রী মদ্রূপং মৃন্ময়াত্মিদম্'।

বিস্মিত রাজা বলেন, আমি তোমাকে চিনি না! না, আমি তোমার কথা চিন্তা করতে করতে শয়ন করিনি। তুমি তো আমার কন্যার মতো—তিনি আমার মা!

—তিনিই আমি, আমিই তিনি!

এ-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই কিশোরী পরিবর্তিতা হয়ে গেলেন অপরূপা এক মাতৃমূর্তিতে। দুর্গার মতো ইনিও সিংহস্কন্ধ-সমারূঢ়া, তাঁরই মতো দিব্য বিভা, হাস্যময়ী, নানালঙ্কার-ভূষিতা,—কিন্তু দশভুজা নন, চতুর্ভুজা। দুই বাম হস্তে শঙ্খ ও ধনুক এবং দুই দক্ষিণ করে চক্র ও পঞ্চবাণ। রক্তাম্বর পরিহিতা, তাঁর কণ্ঠে রত্নোপবীতের পরিবর্তে সর্পযজ্ঞোপবীত।

মা বললেন, শ্রীরামচন্দ্রের আহ্বানে অকালবোধনে স্বীকৃতা হয়েছিলাম। আজ তেমনি আবার তোর দুর্দশা দেখে স্বীকৃতা হচ্ছি—আগামী শুক্লা নবমী তিথিতে তুই পূজার আয়োজন কর। আমি আসব, এই রূপেই আসব! তোর হাত থেকে অঞ্জলি গ্রহণ করব।

তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভঙ্গ হল রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের। নৌকার গলুই থেকে বাহিরে বার হয়ে এসে

দেখলেন, ঘাটে দশভুজার বিসর্জন হচ্ছে। আজ বিজয়া দশমী।

সংস্কৃতজ্ঞ রাজার মনে পড়ে গেল: বিসর্জন = বি পূর্বক সৃজ্ ধাতু অনট।

'বিসর্জন' অর্থে বিশেষরূপে জন্ম গ্রহণ করা। ধাতুটা 'সৃজ্'! মা দশভুজা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—চতুর্ভুজারূপে তিনি আগামী শুক্লা নবমীতে তাঁর রাজবাটিতে আবির্ভূতা হবেন। ঐ যে ঘাটে প্রতিমা বিসর্জনের আয়োজন হচ্ছে ওর মন্ত্রটা: 'পুনরাগমনায় চ'!

প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করে পণ্ডিতদের আহ্বান করলেন। স্বপ্নদৃষ্ট মাতৃমূর্তির সবিশেষ বর্ণনা কাউকে বললেন না; শুধু জানতে চাইলেন 'জগদ্ধাত্রী'-দেবীর পূজাবিধি কী? কেমন সে মূর্তি? কোথায় তাঁর পূজা-প্রকরণ পাওয়া যাবে?

বড় বড় তান্ত্রিক পণ্ডিতেরা অধোবদন হলেন। শুধু শঙ্কর তর্কবাগীশ বললেন, মহারাজ! 'জগদ্ধাত্রী'-দেবীর উল্লেখ আমি 'কালিকাপুরাণ' পুঁথিতে পেয়েছি। ঐ মন্ত্রটি আছে সেই পুরাণে: 'পৃথিব্যাহং জগদ্ধাত্রী মদ্‌রূপং মৃন্ময়ত্বিদম্'। ঐ মূর্তিতে মা. সেবার আবির্ভূতা হয়েছিলেন স্বয়ং জনকরাজার কাছে। কিন্তু তাঁর ধ্যানমন্ত্র কী, তা আমি জানি না।

সে-সময় রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন এক দক্ষিণ দেশীয় পণ্ডিত। তিনি জানালেন, সিংহাধিরূঢ়া দেবীমূর্তির পূজা দাক্ষিণাত্যের কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে বটে কিন্তু তাঁর ধ্যানমন্ত্র কী—তা জানেন না। মহারাজ বললেন, দাক্ষিণাত্যে হোক বা না হোক, আমি ঐরূপেই মাতৃপূজা করব, আগামী শুক্লা নবমীতে।

ঘূর্ণীর মৃৎ-ভাস্কর বলে, কিন্তু আমরা যে অমন মূর্তি কখনো দেখিনি মহারাজ! নিখুঁত বর্ণনা না জানলে কেমন করে গড়ব?

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ধ্যানে-পাওয়া জগদ্ধাত্রী-মূর্তি

অগত্যা মহারাজকে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে হল শহরপ্রান্তে—সেই আরণ্যক পর্ণকুটীরে। জগদ্ধাত্রীর ধ্যানমন্ত্র কী হতে পারে? পারলে হয়তো ঐ অরণ্যচারীই বলতে পারবেন।

রাজার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনে রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত পদ্মাসনে ধ্যানে বসলেন। তারপর এক সময় নিমীলিতনেত্রে পণ্ডিত স্বগতোক্তির মতো মন্ত্রোচ্চারণ করলেন—সেটাই জগদ্ধাত্রীর ধ্যানমন্ত্র: 'সিংহস্কন্ধ সমারূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাং চতুর্ভুজাং মহাদেবীম্ নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্।'

আশ্চর্য! মায়ের যে রূপ তিনি স্বপ্নে দেখেছেন—যার বর্ণনা কারও কাছে করেননি, তর্কসিদ্ধান্তের কাছেও নয়, সেই দেবীর হুবহু রূপবর্ণনা ধ্যানযোগে লাভ করেছেন বুনো

রামনাথ: সিংহের পিঠে···নানা আভরণ ভূষিতা···চতুর্ভুজা···এই মহাদেবীর কণ্ঠে সর্পের যজ্ঞোপবীত।

ফরাসডাঙ্গার ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ছিল গভীর সৌহার্দ্য। ইন্দ্রনারায়ণ সকল বৃত্তান্ত শুনে তাঁর ফরাসডাঙাতেও পর বৎসর এই পূজায় আয়োজন করেন। কারও কারও মতে রাজা কৃষ্ণনগরের এই পূজা প্রবর্তন করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে। অর্থাৎ আমাদের কাহিনীর কিছু পরে। তা হোক, কাহিনীর অনুরোধে সে মত আমরা মানতে পারিনি।

রাজবাড়ির ঠাকুর-দালানে যে দেবীমূর্তি তাতে বাস্তবতা অপেক্ষা ভাবরূপের ব্যঞ্জনা অধিক। ঘূর্ণীর মৃৎশিল্পী বাস্তবতার হদ্দমুদ্দ করতে জানে। রেকাবিতে মাটির এলাচ-লবঙ্গ দিলে অতিথি ভুল করে মুখে ফেলে দেয়! কিন্তু এখানে সেই বাস্তবতা নাই। এমনকি পদতলের সিংহটিকে দেখেও মনে হয়—শিল্পী যখন 'ইউনিকর্ন' চেনে না, তখন কি সে সিংহ গড়তে গিয়ে ভুলে ঘোড়া গড়ে ফেলেছে?

জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে বিরাট মেলার আয়োজন হয় রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে। শত শত বিপণী। নানান অঞ্চলের ব্যাপারীরা আসে বেসাতি নিয়ে। একদিনের পূজা। পরদিন বিসর্জনেরই বা কী সমারোহ। পঞ্চাশ-জোড়া ঢাকি মায়ের শোভাযাত্রার সম্মুখে ঢাক বাজাতে বাজাতে ছুটে চলেঃ "গুড়্-গুড়-গুড়্ ড্যাং! ঐ আসছে/রাজার ঠাকুর/ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং/ড্যাং সু···"

পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে সেই বিচিত্র ধ্বনিটা এ বৃদ্ধের কানে লেগে আছে! তাই বিশ্বাস করতে মন চায়—দু-আড়াই শ বছর আগেও ঢাকির বোল ছিল ঐ রকমই।

রূপেন্দ্রনাথকে সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন ভারতচন্দ্র। তাঁর কানে-কানে বললেন, ভোলাকে দু-চার কপর্দক পার্বণী দাও! সেটাই প্রথা। আমিও দিয়েছি।

রূপেন্দ্রের জানা ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ ভোলাকে ডেকে নগদ একটি টাকাই পার্বণী দিলেন। ভোলা ওঁকে প্রণাম করল।

বিসর্জনের পরদিন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রূপেন্দ্রকে মধ্যাহ্ন-ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। জনান্তিকে বললেন, আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনার আছে, ভেষগাচার্য।

—বলুন মহারাজ?

—প্রথমে বলুন, ঋষধ্বজের রোগটা কী? কুষ্ঠ?

রূপেন্দ্র ইতিমধ্যে রুগীকে দেখেছেন। ঔষধপত্রের ব্যবস্থা দিয়েছেন। তিনি বললেন, না মহারাজ। এ একটি বিচিত্র মারাত্মক অসুখ। সাগরপারে এ রোগের প্রাদুর্ভাব। ইংরাজ-ফরাসী-পর্তুগীজদের দেশে আছে, চীনখণ্ডেও আছে। আমাদের দেশে এটি নতুন আমদানি। চিকিৎসাবিদ্যায় এর নাম রতিজ-রোগ।

—চিকিৎসা আছে? ভয়াবহ?

—না মহারাজ, এর চিকিৎসা আমার জানা নেই। আর ভয়াবহ তো বটেই। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—কতদিন ঠেকিয়ে রাখা যায় সেটাই দেখার।

—সংক্রামক?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে রোগজীবাণু বায়ু বা জলের দ্বারা সংক্রামিত হয় না। এ রোগের আক্রমণ জননেন্দ্রিয়ে। নিরোগ ব্যক্তি রোগাক্রান্তের সঙ্গে যৌন সহবাস করলেই শুধু আক্রান্ত হয়। মুশকিল এই যে, রোগটি বংশানুক্রমিক। সন্তান জন্মান্ধ হয়ে যায়, সেও অনুরূপ রোগজীবাণু নিয়ে জন্মগ্রহণ করে!

—এ তো বড় সর্বনাশের কথা শোনালেন! কী বিধান দিয়েছেন?

কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির পূজামণ্ডপে জগদ্ধাত্রী (বিংশ শতাব্দী)

—ঔষধপত্রের ব্যবস্থা দিয়েছি, আর দত্তমশাইকে বলেছি, প্রতিবার নারী-সহবাসে তাঁর এব বৎসর করে আয়ুক্ষয় হয়ে যাবে!

—তাই যায় বুঝি?

—আজ্ঞে না। লক্ষ্য করে দেখলাম, লোকটার মৃত্যুভয় প্রচণ্ড। এ মিথ্যা ভাষণে রোগে বিস্তার কম হবে মনে করেই ওটুকু মিথ্যাভাষণ করেছি!

—ভালই করেছেন। আমাকে কী পরামর্শ দেন?

—আমার অনুমান, ঝষধ্বজ বৎসরখানেকের ভিতরেই মারা যাবে। আপনি দেখবেন, তা

দুই উপপত্নী যেন দেহ-ব্যবসায়ী হয়ে রোগ বিস্তার করতে না পারে! তাহলে অনতিবিলম্বেই এই ভয়াবহ রোগ আপনার রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়বে।

রাজা চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলেন, আমি সে সম্ভাবনার মূলোৎপাটন এখনি করে ফেলতে চাই কবিরাজ মহাশয়। ঋষধ্বজকে এখনি গ্রেপ্তার করে আনছি। আমৃত্যু তাকে রাজবন্দী করে রাখব। তার উপপত্নী দুটিকেও বন্দিনী করে আনব। আপনি পরীক্ষা করে বলে দিতে পারবেন, তারা রোগাক্রান্ত কিনা?

—পারব। কিন্তু রোগাক্রান্ত হবার অপরাধে কি ঋষধ্বজকে বন্দী করা ঠিক হবে?

—আপনি জানেন না—জাল-জুয়াচুরি—তার বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ। তার মৃত্যুদণ্ডই হওয়া উচিত। সে যা হোক, আপনাকে আমার দ্বিতীয় একটি জিজ্ঞাস্য আছে।

—বলুন মহারাজ?

—আপনাকে যদি কৃষ্ণনগরে বা নবদ্বীপে কিছু নিষ্কর-ভূমি দান করা হয়, ভদ্রাসন নির্মাণ করিয়ে দেওয়া হয় এবং যথোপযুক্ত বৃত্তির ব্যবস্থাপনা করা হয়, তাহলে আপনি কি আপনার পৈত্রিক আবাস ত্যাগ করে নদীয়ায় এসে বসবাস করতে স্বীকৃত?

রূপেন্দ্র করজোড়ে বলেন, সে তো আমার পরম সৌভাগ্য হত মহারাজ। কিন্তু দুটি অন্তরায় আছে। আমার পিতৃদেবের চতুষ্পাঠী ছিল, কিন্তু তিনি আমাকে কৌলিক-বৃত্তি গ্রহণ করতে দেননি। চিকিৎসাবিজ্ঞানী করে তুলেছিলেন একটি বিশেষ হেতুতে—সোঞাই গ্রামের কাছেপিঠে কোনও কবিরাজ নাই। আমি লোভের বশবর্তী হয়ে আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করলে স্বর্গবাসে তিনি ব্যথিত হবেন।

—বুঝলাম। আর দ্বিতীয় হেতু।

—অপরাধ নেবেন না, মহারাজ! পূর্বপুরুষদের কথা জানি না, কিন্তু আমার পিতৃদেব বা পিতামহ কখনো কোন দান গ্রহণ করেননি।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র হাসলেন। বললেন, এ তথ্যটা কিন্তু আপনার ইতিপূর্বেই বলা উচিত ছিল।

রূপেন্দ্র একটু অপ্রস্তুত বোধ করেন এবং কেন যে অপ্রস্তুত বোধ করলেন তার হেতু নির্ণয় করতে পারেন না। জিজ্ঞাসিত হওয়ার পূর্বে সে-কথা কেন উনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলতে যাবেন? পরমুহূর্তেই মহারাজ রহস্যজাল ভেদ করে দেন—সবটাই কৌতুক। বললেন, সে কথা জানা থাকলে গৃহস্থের কিছু সাশ্রয় হত। পঞ্চ-ব্যঞ্জনের পরিবর্তে সেক্ষেত্রে অতিথির জন্য তিন্তিড়ী-পত্রের ব্যঞ্জনই যথেষ্ট হত।

এই সময় একটি সুদর্শনা কিশোরী দ্বারপ্রান্তে আবির্ভূতা হল যুক্তকরে। রত্নালঙ্কারভূষিতা। অবগুণ্ঠনবতী। এমনকি মাথায় সিঁথি, নাসিকায় টানা-নথ। মহারাজ তাকে আহ্বান করলেন, এস কস্তুরি....

কস্তুরী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে গলায় আঁচল দিয়ে দুই ব্রাহ্মণকে প্রণাম করল।

রাজা বললেন, এ হল কস্তুরীবাঈ, আমার অমাত্য শিবভট্টের কনিষ্ঠা কন্যা। ও আমাদের ডাকতে এসেছে। মধ্যাহ্ন-আহারে। তাই নয়, কস্তুরি?

মেয়েটি গ্রীবাভঙ্গিতে স্বীকার করে।

রাজা বলেন, চট করে বলে দাও তো মা, কোন পাঁচটি ব্যঞ্জন তোমার স্পর্শে ধন্য হয়েছে?

কস্তুরী জানে, রাশভারী মহারাজা অন্দরমহলে কৌতুকপ্রিয়। বললে, একি আপনাদের পুরুষদের চতুষ্পাঠী? রানী-মার টোলে ও-সব তঞ্চকতা চলে না।

রাজা প্রাণখোলা হাসি হাসলেন। বলেন ঠিক আছে, মা। তুমি যাও, আমরা এখনি আসছি।

কস্তুরী হাসতে হাসতেই প্রস্থান করল।

রাজা তখন রহস্যটা ভেদ করে দিলেন রূপেন্দ্রর কাছে।

ওঁরা দুজনে এতক্ষণ কথা বলছিলেন 'বার মহলে'। স্ত্রী-স্বাধীনতার বিষয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রাচীনপন্থী। মহিলারা গঙ্গাস্নান করেন পাল্কি থেকে অবতরণ না-করে। অর্থাৎ বাহকেরা পাল্কিসমেত স্নানার্থিনীকে গঙ্গাজলে নিমজ্জিত করে! রাজা কোনও বিশেষ অতিথিকে আহারে নিমন্ত্রণ করলে ভোজ্যদ্রব্য পরিবেশিত হয় এই 'বার-মহলে'। অন্দরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় না। আজ মহারাজ সে নিয়মের ব্যতিক্রম করতে চলেছেন একটি বিশেষ হেতুতে। বড় মহারানী কিছুদিন ধরে প্রায়শই শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাচ্ছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের দুই পত্নী। ইনি শিবচন্দ্রের মাতা। মহারাজের ইচ্ছা ভেষগাচার্যকে অন্দর-মহলে নিয়ে এসে তাঁকে একবার দেখানো। রূপেন্দ্র রোগের লক্ষণ জেনে নিয়ে স্বীকৃত হলেন। উপরন্তু জানতে চান, ঐ কস্তুরী কেন আছে তাঁর অন্দরমহলে। আর ঐ মহারাজের সঙ্গে তার কথোপকথনের অর্থটাই বা কী?

সে-কথাও মহারাজ বিস্তারিত জানালেন।

কৈশোরে পদার্পণ করার পূর্বেই বিশিষ্ট অমাত্যের আত্মজার দল সীমন্তিনী হয়ে যায়; কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বে স্বামীর ঘরে যায় না। তারা পর্যায়ক্রমে তখন কয়েক মাস রাজান্তঃপুরে এসে বাস করে। রাজা যেমন বিদ্যোৎসাহী, পুরুষদের জন্য ক্রমাগত চতুষ্পাঠী খুলে চলেছেন, বড় রানী-মাও তেমনি অন্দরমহলে একটি বিচিত্র চতুষ্পাঠী খুলেছেন। ঐসব শিক্ষানবীশ কিশোরীদের নিয়ে। তাদের নানান বিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থা—সীবন, গৃহকার্য, রন্ধন। তাদের পরীক্ষা আর উপাধিদানের ব্যবস্থাও আছে। আজ যেমন ঐ কস্তুরীর রন্ধনের পরীক্ষা। বিচিত্র সে ব্যবস্থাপনা—

মহারাজের জন্য যে দশ-বিশ পদ রান্না করা হয়েছে তার ভিতর মাত্র পাঁচটি পাক করেছে ঐ মেয়েটি, বাদবাকি রন্ধনশিল্পে অত্যন্ত অভিজ্ঞ পাচকবৃন্দ। আহারান্তে রাজা-মশাইকে বলতে হবে—কোন পাঁচটি 'পদ' সেই অভিজ্ঞ পাচকবৃন্দের দ্বারা প্রস্তুত নয়। সেটা যদি সনাক্ত করা না যায়, তাহলেই পরীক্ষার্থিনী উপাধি লাভ করবে। আহারের সময়ে ঐ মেয়েটি উপস্থিত থাকবে পরিবেশনের অছিলায়। রাজা মহাশয় তাকে নানান প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। জেনে নেবেন, রন্ধনবিদ্যায় মেয়েটির জ্ঞান কতদূর। স্বহস্তে যদিচ কখনো রন্ধন করেন না তবু মহারাজ একজন খাদ্য বিশারদ! মরিচ, অম্লাস্বাদ বা লবণাধিক্যের সামান্য হেরফের তো বটেই এমনকি 'ফোড়ন'-এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তারতম্য পর্যন্ত ধরতে পারেন রসনার অনুভূতিতে। আজ ঐ পরীক্ষার্থিনী যে কোন্ পাঁচটি ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেছে—সেগুলি আমিষ না নিরামিষ, ছেঁচকি-'কৌড়া'-ঘন্ট-কালিয়া না 'ক্রোকে' তা পর্যন্ত জানা নাই।

রূপেন্দ্র সহসা করজোড়ে বলে ওঠেন, একটা অপরাধ হয়ে গেছে মহারাজ! আমি বলতে ভুলে গেছি, আমি নিরামিষাশী।

রাজা হাসেন। বলেন মারাত্মক ভ্রান্তি! এখন আর উপায় কি? কিন্তু শুনেছিলাম আপনি শাক্ত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মৎস্য ও মাংস ত্যাগ করেছি সম্প্রতি।

—সম্প্রতি? কতদিন?

—ধরুন পক্ষকাল!

রাজার মুখভাব দেখে বোঝা গেল না তিনি কী ভাবছেন। বললেন, আসুন, অন্দরমহলে যাওয়া যাক। শুধু নিরামিষই আহার করবেন। 'পলাণ্ডু' সেবা করেন তো?

—আজ্ঞে না!

—তবে তো বড়ই বিপদে ফেললেন। তিন্তিড়ীপত্রের ব্যঞ্জন কি ওরা বানিয়েছে? দেখা যাক। আসুন।

যে কক্ষে ওঁদের মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন সেটিও বৃহৎ। এটি অন্দরমহলে। মর্মরমণ্ডিত কক্ষতল। প্রাচীর শুভ্রবর্ণের পঙ্খের কাজ করা। উপর থেকে ঝুলছে প্রকাণ্ড একটি সহস্রমুখী ঝাড়লণ্ঠন। কক্ষের একপ্রান্তে একটি শ্বেতপাথরের মেজ, তদুপরি পুষ্প পাত্রে কুসুমগুচ্ছ। এখানে প্রাচীরে কোন তৈলচিত্র নাই—একদিকে দেওয়াল-জোড়া প্রকাণ্ড একটি রঙিন রেশমচিত্র। মহাযানধর্মের কোন মাতৃমূর্তি—তারা, মঞ্জুশ্রী, ভৈরবী অথবা প্রজ্ঞাপারমিতা। তিব্বত অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। কক্ষকেন্দ্রে দুটি পশমের চতুষ্কোণ আসন, অপূর্ব নক্শাকাটা। দুটি প্রকাণ্ড অন্নপাত্র—রৌপ্যনির্মিত; আর সেদুটি ঘিরে তিনসারিতে কাঁসা অথবা রূপার কটোরা। সেগুলি সমকেন্দ্রিক বৃত্তের আকারে অন্নপাত্রকে বেষ্টন করে আছে। দু-একটি কষ্টিপাথরের পাত্র অথবা খঞ্চা—যাতে ফলমূল মিষ্টান্ন পরিবেশিত—মক্ষিকাবারণ সরপোশে আবৃত।

ওঁরা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করা মাত্র বিপরীত দিক থেকে অগ্রসর হয়ে এলেন রানী-মা। রূপেন্দ্রকে প্রণাম করার উদ্যোগ করতেই তিনি সসঙ্কোচে পেছিয়ে গেলেন। বলেন, না, না, মা। আপনি আমাকে প্রণাম করবেন না।

রানী-মা রূপেন্দ্রর প্রায় সমবয়সী, হয়তো সামান্য দু-চার বছরের ছোট।

মহারাজ বলেন, একটা কথা ভেষগাচার্য বলতে ভুলেছেন। উনি নিরামিষাশী! এখন কী করা যায়?

রানী-মা প্রথমটা বিস্মিতা। তারপরেই হেসে ফেলেন। বলেন, তাতে অসুবিধা কিছু হয়নি। কস্তুরী আজ শুধু নিরামিষ-ব্যঞ্জনই পরিবেশন করেছে।

মহারাজ কস্তুরীর দিকে ফিরে বলেন, কোন ব্যঞ্জনে 'পলাণ্ডু' দেওয়া আছে কি?

—না মহারাজ। আপনি তো পূর্বেই নিষেধ করেছিলেন!

—করেছিলাম, না? আজকাল আর কিছুই স্মরণে থাকে না। আসুন, বসা যাক।

রূপেন্দ্র রীতিমত বিস্মিত। বলেন, সে কী! এ ব্যবস্থা কেমন করে হল?

রাজা বললেন, শোনেননি—'রাজা কর্ণেন পশ্যতি!'

কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত বিচক্ষণ। ভারতচন্দ্রের নিকট পূর্বেই তথ্যটা সংগ্রহ করেছেন। রূপেন্দ্রের আহাররুচি বিষয়ে। কস্তুরীকে বললেন, ইনি আমার মতো কলির ব্রাহ্মণ নন, আহারকালে

বাকসংযম করে থাকেন। ফলে তুমি এখনই কিছু আভাস দিয়ে রাখ মা—কোন কটোরায় কী পরিবেশিত।

ওঁরা দুজনে আসনে উপবেশন করলেন। সম্মুখে মর্মর গৃহতলে বসল মেয়েটি। তার হাতে একটি রৌপ্যদণ্ড, তার শেষপ্রান্ত আঁকশির মতো বাঁকানো। ভোজনকারী উপবিষ্ট-অবস্থায় তৃতীয় সারির কাটোরার নাগাল পায় না। তাই এই ব্যবস্থা। রৌপ্যযষ্টির সাহায্যে কস্তুরী কটোরাগুলিকে আগিয়ে-পেছিয়ে দিতে পারবে। অনুরুদ্ধ হয়ে কস্তুরী মুখস্ত বলার মতো ভোজ্যদ্রব্যগুলির জাতনির্ণয় করে গেল।

বামদিক থেকে প্রথম সারিতে সর্বপ্রথম একটি ক্ষুদ্র সুবর্ণ-কটোরায় গব্য ঘৃত। তারপর কিছু ভাজা-সবজি—পনসবীজ ও চালকুমড়োর বুকো-বড়া, লাউডগার পোড়ে-ভাজা, শাপলা-ভেলার পাটভাজা। তিনরকম ডাইল—আমড়া-মুকুলের মটর-ডাল, কমলালেবু-ছানা সহ ঘন মুগ ডাল এবং ওলকপি মিশ্রিত ছোলার ডাল। দ্বিতীয় সারিতে কাঁচা-পেঁপের চাপরঘণ্ট, ছানার পাতুরি, বড়ি-সহযোগে পালং-ঝোল, লাউ-পোস্ত, কাঁচকলার ধোঁকা-ডালনা, জলপাইয়ের মাখা-চাটনি, পাঁপড় ভাজা। এরপর তৃতীয় সারি—ক্ষীর, দধি, ও নানান মিষ্টান্ন। যেগুলি সরপোশে ঢাকা[১]।

রূপেন্দ্র বলেন, এ তো আমার এক সপ্তাহের খাদ্য, মহারাজ, এত কি খাওয়া যায়?

—হয়তো যায়, হয়তো যায় না। আপনার যা অভিরুচি তাই গ্রহণ করুন। অপচয় হবে না কিছু। ব্রাহ্মণের সেবান্তিক অবশেষ গ্রহণের লোকের অভাব নেই।

রূপেন্দ্রর নজর হল, কর্পূর-মিশ্রিত পানীয় জল পরিবেশিত হয়েছে দুটি সুবর্ণ-পাত্রে। তার পাশে রাখা আছে মোরাদাবাদী-কাজ করা একটি অপূর্ব রৌপ্য-ভৃঙ্গার এবং একটি পিতলের বড় পাত্র। এ জাতীয় ভৃঙ্গারে সচরাচর মাধ্বী পরিবেশিত হয়। আহার-থালিকার পার্শ্বে সেটি কেন রাখা আছে বোধগম্য হল না। সে বিষয়ে প্রশ্ন করতেও সঙ্কোচ হল।

মহারাজ বললেন, কস্তুরি, তুমি তিন্তিড়ী-পত্রের ব্যঞ্জন করনি?

কস্তুরী অবাক মানে। জবাব জোগায় না। তার হয়ে রানী-মা বলে ওঠেন, না! এ তো আরণ্যক-আশ্রম নয়, এখানে তিন্তিড়ী-ব্যঞ্জনে নানান 'অনুপপত্তি'!

কস্তুরী বুঝল না। কিন্তু যাঁরা বোঝার তাঁরা বুঝলেন।

এবার মহারাজ বলেন, পেট ভরবে কী ভাবে? 'শাক, মোচাঘণ্ট, ভৃষ্ট-পটোল নিম্বপাত' কিছুই নাই…

এবারও কস্তুরী বিহ্বল এবং এবারও জবাব দিলেন রানী-মা; সে-সব সাত্ত্বিক আহার। রাজসিক নয়। ও আপনার পরিপাক হত না।

রূপেন্দ্র বুঝতে পারেন—রানী-মা নিরক্ষরা নন—কৃষ্ণদাস গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাঁর ভালভাবেই পড়া। অন্নপাত্রে নৈবেদ্যর মতো চূড়ো করে রাখা মূল ভোজ্যদ্রব্যটি অন্ন নয়,—ভার্জিত-অন্ন অর্থাৎ পলান্ন। তার এক-এক দিক এক-এক রঙের। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ

---

[১] হয়তো লক্ষ্য করেছেন, নিরামিষ রান্নায় 'আলু'র উল্লেখ নেই। মধ্যযুগে ডাল, আলু, টমেটো প্রভৃতি বাঙালীর খাদ্য ছিল না। আমাদের কাহিনীর কালে 'ডাইল'-এর শুভাগমন ঘটেছে। ওলকপিরও। আলুর আবির্ভাব হতে আরও অর্ধশতাব্দী বাকি।

ও সাদা। কীভাবে পলান্নের এই বর্ণ-পার্থক্য হয়েছে বুঝে উঠতে পারেন না। মহারাজ সে বিষয়েই প্রশ্ন করলেন কস্তুরীকে। মেয়েটি জানালো—কোচিনীল দিয়ে রক্তবর্ণ, জাফরান-সহযোগে হলুদ রঙ, সুপুরি মিহি গুঁড়ো করে তার সঙ্গে কালোজামের রস মিশিয়ে নীল রঙ করা হয়েছে। আর সবুজ রঙ তো হলুদ-নীলের সমাহার। মহারাজের প্রশ্নের জবাবে কস্তুরী জানালো এর মূল উপকরণ: গোবিন্দভোগ মিহি পুরাতন চাউল আড়াই পোয়া, গব্যঘৃত এক পোয়া, শর্করা দেড় ছটাক, পাতি লেবুর রস এক ছটাক। আন্দাজ মতো ঘন দুধের সর, তিনচারটি বাদাম বাটা। ছোট এলাচ আটটি। লবঙ্গ সাতটি। দারুচিনির ছোট টুকরো দশটি। সামান্য কালিজিরা ও চার-পাঁচটি তেজপাতা। 'আকনির' জন্য প্রয়োজন—সা-জিরে, ধনিয়া; তেজপাতা, আদ্রক ও দারুচিনি। এই বিচিত্র ভোজ্য দ্রব্যটি নাম: 'পঞ্চরঙ অপলান্ন'।

মহারাজ বললেন, 'পঞ্চরঙ' তো বুঝলাম, কিন্তু 'অপলান্ন' অর্থ কী?

—মহারাজ, পলান্ন হচ্ছে 'পল যুক্ত অন্ন'। 'পল' অর্থে মাংস। যেহেতু এটি নিরামিষ পদ তাই এর নাম 'অপলান্ন'।

মহারাজ গৃহিণীর দিকে দৃকপাত করে বলেন, তুমি একে উপাধি দিতে পার: পাকশিরোমণি!

রানী হেসে বলেন, এখনই কী? সেবা হোক। দেখি, পঞ্চ গুপ্তব্যঞ্জনকে সনাক্ত করতে পারেন কি না।

অতঃপর দুজনে পঞ্চদেবতাকে অন্নদান শুরু করলেন। দেখা গেল, অন্ন গ্রহণকালে মহারাজও বাকসংযম করে থাকেন, যদিচ পূর্বে তিনি নিজেকে 'কলির ব্রাহ্মণ' বলেছেন।

রূপেন্দ্র এবার বুঝতে পারেন—ঐ কারুকার্যমণ্ডিত রৌপ্যভৃঙ্গার এবং পিতলের গামলাটি কেন রাখা আছে। মহারাজ প্রত্যেকটি কটোরা থেকে সামান্য—কখনো কণিকামাত্র খাদ্য অন্নপাত্রে উঠিয়ে নিচ্ছেন এবং তার রসাস্বাদনান্তে ভৃঙ্গারের জলে মুখ প্রক্ষালন করে চলেছেন। না হলে, পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের স্বাদগন্ধ পরবর্তীতে অনুভূত হবে—খাদ্যবিচারে ভ্রান্তি হয়ে যেতে পারে।

রূপেন্দ্র বুঝতে পারেন—রন্ধন যেমন শিল্পকর্ম তেমনি তার প্রকৃত রসাস্বাদনও একটি চারুকলা। খাদ্যকে এতদিন উদরপূর্তির উপকরণ বলেই জানা ছিল। নদীয়া রাজের আতিথ্য গ্রহণ না করলে তিনি বুঝতে পারতেন না 'ভোজন'ও একটি চারু-শিল্প!

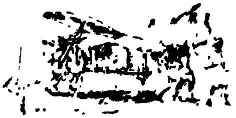

ভূরি-ভোজনান্তে দুজনে আবার এসে বসলেন বার-মহলের সেই কক্ষটিতে। রূপেন্দ্র ধূমপানে অভ্যস্ত নন। মহারাজ সুগন্ধী অম্বুরী-তামাক সেবন করার অবকাশে প্রশ্ন করেন, রানী-মার অসুখটা কী?

রূপেন্দ্র ইতিমধ্যে রানী-মাকে পরীক্ষা করেছেন। বললেন বিচলিত হবার মতো কিছু নয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুযায়ী উপসর্গ তিন জাতের: বায়ু, পিত্ত, কফ্। রানীমার শেষ দুটি উপসর্গ

নাই। বায়ু কিছু কুপিত। হেতু: রক্তচাপ বৃদ্ধি। আমি ঔষধ প্রেরণ করছি, সেবনবিধিও জানিয়ে দেব। কিন্তু আরও দুটি কাজ করলে ভাল হয়। প্রতিদিন রাত্রে একমুঠি 'কুলুত্থ কলাই' জলে ভিজিয়ে দেবেন। পরদিন প্রত্যুষে শুধু জলটুকু ছেঁকে খেতে হবে। তদ্ভিন্ন প্রত্যুষে—সূর্যোদয়ের পূর্বে, কিছু প্রাতর্ভ্রমণেও উপকার পাবেন। পদচারণা করতে হবে অন্দরমহলের তৃণাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে। নগ্নপদে। কচি থোড়-এর রসও উপকারী।

রাজা এবার প্রসঙ্গান্তরে এলেন, গঙ্গাচরণ যেতে রাজী হয়েছে?

রূপেন্দ্র চমকে ওঠেন। পরক্ষণেই বুঝে নেন, যে গুপ্তচরের মাধ্যমে ভারতচন্দ্র গঙ্গাচরণের সন্ধান পেয়েছেন সে রাজার বেতনভুক। তিনি স্বীকার করলেন, হয়েছে।

—কই আপনি তো আপনার বিবাহে আমাকে আমন্ত্রণ করলেন না?

এবার দুরন্ত বিস্ময়ে বলেন, আপনি সে-কথা কী করে জানলেন? ভারতের কাছে?

—না। কিন্তু, রূপনগরের মঠলুণ্ঠনের সংবাদ কি আমি জানব না? আর সেই সূত্রে কী হেতু সেদিন মঠ অরক্ষিত ছিল? রূপনগরের 'রাইরানীর' কথা এই নবদ্বীপেও এসে পৌঁচেছে। কবে বিবাহ? এই অগ্রহায়ণে?

রূপেন্দ্র স্বলজ্জে স্বীকার করলেন। জানালেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে সে বিবাহে নিমন্ত্রণ করার মতো সাহস বা সঙ্গতি তাঁর নাই।

মহারাজ বললেন, তৎ-সত্ত্বেও আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। স্বয়ং যেতে পারছি না। জগৎশেঠের গদী লুট হয়েছে। আলিবর্দী মুর্শিদাবাদে ফিরে এসেছেন। কখন কী হয় বলা যায় না। তবে 'কুসুমমঞ্জরীকে' রানী-মা এই সামান্য আশীর্বাদটি দিচ্ছেন। এটি বিবাহের উপহার—রাজানুগ্রহ বা বৈদ্যবিদায় নয়—আপনি গ্রহণ করুন।

রূপেন্দ্র বাধ্য হলেন উপহারটি গ্রহণ করতে। মুক্তাখচিত একটি শতনরী।

এবার তিনি বলেন, মহারাজ, আমারও একটি জিজ্ঞাস্য আছে। যদি অভয় দেন তো নিবেদন করি?

—বলুন?

—সাহিত্যরসিক হিসাবে কি আপনার মনে হয়নি 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' সুসমাপ্ত?

রাজা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। কুঞ্চিত-ভ্রূভঙ্গে প্রতিপ্রশ্ন করেন, জিজ্ঞাসাটি কার? আপনার, না আপনার বন্ধুবরের?

—সেও স্বতই কৌতূহলী, কিন্তু প্রশ্নটি নিতান্তই আমার।

—আপনার জিজ্ঞাস্যটি তো এই: 'অন্নদামঙ্গল'-এর কবিকে কেন রাজাদেশে 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করতে হল? তাই নয়?

রূপেন্দ্র যুক্তকরে বললেন, সরলভাষায় প্রশ্নটি সেইরকমই বটে।

—তার হেতু, আমি আপনার ঐ বন্ধুটির ভিতর একটি মহান সম্ভাবনাকে দেখতে পেয়েছি। আমার বাসনা, নদীয়ারাজের সভাকবির কাব্যের শতশত সহস্র-সহস্র অনুলিপি হোক। সমগ্র গৌড়মণ্ডলে তা ছড়িয়ে পড়ুক। যখন আমি থাকব না, আপনার বন্ধুও থাকবে না, তখনও যেন গৌড়বাসী রায়গুণাকরের গুণগান করে। আর সেই প্রসঙ্গে তারা বলে, এই কবি ছিলেন নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি।

রূপেন্দ্র নির্বাক শ্রোতা। ওঁর মনে হল মহারাজ কিছুটা উত্তেজিত। তিনি বললেন, আজ থেকে দু-চারশ বছর পরে এই বিষ্ণুমহল রাজসভার একখানি ইটও হয়তো থাকবে না। বল্লাল সেনের 'গঙ্গাবাস', ঢেক্কুড়ে ইছাই ঘোষের 'শ্যামরূপা'র গড়ের মতো তা হারিয়ে যাবে। কিন্তু জেনে রাখুন: তখনো থাকবে রায়গুণাকরের কাব্য। নবীন যুগের নবীন পাঠকের কাছে কাব্যমাধুর্যে ভরপুর। আমি সেই সূত্রে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে থাকতে চাই, বাঁড়ুজ্জেমশাই!

রূপেন্দ্র বলেন, কিন্তু ঐ চটুল দৈহিক-মিলন বর্ণনার মধ্যে ভারতের বেঁচে থাকার কী সার্থকতা? 'অন্নদামঙ্গলে' কবি নিরন্ন মানুষের সুখ-দুঃখের সার্থক চিত্র এঁকেছেন, 'বিদ্যাসুন্দরে' রাজা-রাজড়ার বিলাসবৈভব আর যৌন-মিলন বর্ণনা! অন্নদামঙ্গলই বা বেঁচে থাকবে না কেন?

—ভুলবেন না ভেষগাচার্য, বাল্মীকি-বেদব্যাস থেকে কালিদাস পর্যন্ত রাজা-রাজড়ার ছবিই এঁকেছেন, নিরন্ন ভিক্ষাজীবীর নয়। আর ঐ তথাকথিত 'যৌনমিলন-বর্ণনা' হচ্ছে নবরসের আদিরস। শিশুকে যখন তিক্ত ঔষধ প্রদান করেন তখন কি তাকে মিষ্টান্নের প্রলোভন দেখান না?

—দেখাই। সে শিশু বলে। প্রাপ্তবয়স্ক পাঠক শিশু নয়।

—ভুল বললেন। প্রাপ্তবয়স্ক পাঠক শিশুরও অধম। শিশুর সারল্য আছে, তার সেই গুণটুকুও নাই। সমকাল তাকেই কাঁধে তুলে নিয়ে নৃত্য করে, যার জয়গান করে সমকালীন সাহিত্যবাজারের ক্ষমতাশালীগোষ্ঠী। ভেষগাচার্য! আমার একটি নিদারুণ ভবিষ্যদ্বাণী শুনে রাখুন: আজ থেকে দুশ' বছর পরে যদি কেউ এইকালের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণীপণ্ডিতের জীবনী লিখতে বসে তখন একটিমাত্র লোকের সন্ধান সে পাবে না। কেউ তার জীবনের কথা লেখেনি। তাঁর জীবনবৃত্তান্ত হারিয়ে যাবে! তিনি কে জানেন? আমার কালের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত: বুনো রামনাথ!

—কিন্তু কেন?

—যেহেতু সমকাল তাঁকে স্বীকার করবে না, তাঁর সম্বন্ধে নীরব থাকবে।

—সেটাই বা কেন? শুনি তিনি নবদ্বীপধামের সর্বশ্রেষ্ঠ মহর্ষি!

—কিন্তু তিনি যে 'লাঙ্গুলহীন' শৃগাল হতে অস্বীকৃত! জীবনী লেখে কারা? ইতিহাস রচনা করে কারা? বৃত্তিভোগীর দল। রাজা-রাজড়ার অনুগ্রহভোগীর দল। তারা যে এক নিদারুণ হীনমন্যতায় ভুগছে—ঐ বদ্ধ উন্মাদটা তেঁতুল-পাতা সিদ্ধ খেয়ে জঙ্গলে পড়ে থাকবে তবু 'লাঙ্গুলহীন' হতে স্বীকৃত নয়! ঠিক একই কথা আপনার বন্ধুর বিষয়েও। সে ভালই সংস্কৃত জানে, তবু কাব্য রচনা করে সাদা বাঙলায়। কী নিদারুণ ধৃষ্টতা! কৃত্তিবাস-কাশীরামের মতো সে চতুর্দশাক্ষরা বৃত্তির পয়ারে সন্তুষ্ট থাকছে না! দ্বাদশাক্ষরা তোটক বা ভুজঙ্গ-প্রয়াত থেকে পঞ্চদশাক্ষরা তূণক, মালতী, চামর ছন্দে অনায়াসে যাতায়াত করছে—বাঙলায়, সংস্কৃতে নয়। এ কী সহ্য করা যায়? নবদ্বীপে পাড়ায় পাড়ায় কবি—কিন্তু সকলেই রচনা করেন সংস্কৃতে। সাদা বাঙলায় ঐ একজনই—

—কেন মহারাজ? আপনার সভার আর এক জ্যোতিষ্ক—রামপ্রসাদ?

—কবিরঞ্জনও বেঁচে থাকবে, কবি হিসাবে নয়—সুরস্রষ্টা হিসাবে, কালীভক্ত হিসাবে। রায় গুণাকরই বাঙলা-ভাষায় একমাত্র কবি। সমকাল তাই তাকে তার প্রাপ্য মর্যাদাটি কিছুতেই দিতে

চাইবে না। বেঁচে থাকতে হলে তাকে জীবনীশক্তি আহরণ করতে হবে পাঠকের ভালবাসায়। তাকে জনপ্রিয় হতে হবে।

—কিন্তু জনপ্রিয় হওয়ার মাশুল কি নিরাবরণ দৈহিক মিলন-বর্ণনা?

—যদি যত্ন নিয়ে পাঠ করেন, তাহলে প্রণিধান করবেন—নগ্ন মিলনবর্ণনাকে অতিক্রম করে প্রতিটি ছত্র কাব্যরসমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। আমি রাজসিক পাঠক, আমি তো সবটুকু থেকেই রসাস্বাদন করি, আপনি যদি সাত্ত্বিক হন—দৈহিক-মিলন বর্ণনায় যদি অসোয়াস্তি বোধ করেন, তবু আপনাকে স্বীকার করতে হবে, 'বিদ্যাসুন্দর'—'পয়ঃকুম্ভ বিষোমুখম্'! নয় কি?

রূপেন্দ্র নিরুত্তর থাকেন।

রাজা বলেন, বেশ, আমাকে আর একটা কথা বুঝিয়ে বলুন দেখি—রায় গুণাকরের 'বিদ্যাসুন্দর' তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ মাত্র। এখনো তিনি সম্যক প্রতিষ্ঠা পাননি। অথচ মহাকবি কালিদাস যখন তাঁর 'কুমারসম্ভবম্' রচনা করেন তখন তিনি খ্যাতির মধ্যগগনে। আশা করি স্বীকার করবেন, কাব্যবিচার সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান আপনার-আমার অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। অর্থাৎ তিনি জানতেন যে, সপ্তম সর্গেই তাঁর সে কাব্য সুসম্পূর্ণ। তাহলে কেন তিনি রচনা করেছিলেন: 'অথঃ অষ্টম সর্গঃ।। পাণিপীড়ণবিধেরনন্তরং শৈলরাজদুহিতুর্হরং প্রতি.....'

রূপেন্দ্রনাথ কী একটা প্রত্যুত্তর করতে গেলেন। তারপর সহসা নিজেই থেমে যান। রাজা অভয় দিয়েছেন, কিন্তু তাই বলে অমন একটা কথা কি তাঁকে বলা যায়?

তীক্ষ্ণধী নদীয়ারাজ সেটা লক্ষ্য করলেন। স্মিত হাসলেন। বলেন, হ্যাঁ! এবার আপনার অকথিত প্রশ্নের জবাবটা দিই—

রূপেন্দ্রনাথ বিস্মিত। স্তব্ধ।

—তার জবাব ভারতচন্দ্রকে আমি ভালবাসি। 'বন্ধু' বলে মনে করি। তাই সব জেনেবুঝেও বন্ধুকৃত্য করতে ওটুকু কলঙ্কতিলক ললাটে ধারণ করেছি। স্বেচ্ছায়!

—কীসের কথা বলছেন, মহারাজ? কী কলঙ্ক?

—আপনি তো বলতে চাইছেন—ভবিষ্যৎকাল এ-কথা বলবে যে, রাজাদেশেই ভারতচন্দ্র 'অমাবস্যার গান' গেয়েছেন? বলুক তা। স্বয়ং বিক্রমাদিত্যকেও তো আমরা একইভাবে দায়ী করি। বলি, রাজাদেশেই মহাকবি রচনা করেছিলেন: অষ্টম সর্গঃ। স্বেচ্ছায় নয়। তাই নয়?

রূপেন্দ্রনাথ বজ্রাহত হয়ে গেলেন। মনে হল, এ আলোচনাটুকু না হলে তিনি ঐ প্রাচীনপন্থী সংস্কারাচ্ছন্ন নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রকে ঠিক মতো চিনতে পারতেন না।

আজ রূপেন্দ্রনাথ স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করবেন।

ভারতচন্দ্র বলেছিলেন—সপ্তপদ একসঙ্গে হাঁটলে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। সপ্তরজনী একই কক্ষে যাপন করলে কী হয়, তা খোলাখুলি বলেননি। দুজনেই আদর্শবাদী, সাত্ত্বিক প্রকৃতির, কবিভাবাপন্ন। পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মেছে। দুজনেই দুজনের সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছেন। ভারতচন্দ্র বন্ধুকে শুনিয়েছেন তাঁর বিচিত্র জীবন কথা। নোলক-দোলানো এক রাধার আহ্বানে কিশোর কৃষ্ণ শুরু করেছিলেন বাগ্‌দেবীর আরাধনা।

বস্তুত সেটাই তাঁর জীবনে প্রথম সরস্বতী পূজা। তার পূর্বেও অঞ্জলি দিয়েছেন—কিন্তু পুরোহিত হিসাবে নয়। এও এক 'বিপরীত' কাণ্ড! কৃষ্ণের বাঁশরী শুনে রাধা ছুটে আসেননি—রাধার বাঁশরী-তানে কিশোর পণ্ডিত এলেন বাণীমন্দিরে, শুরু করলেন সারস্বত আরাধনা! সে জন্য ভর্ৎসিত হয়েছেন গুরুজনদের কাছে—দাদা, বাবা, কে নয়? তাঁরা যে চেয়েছিলেন উনি ফারসী শিখুন, সংস্কৃত নয়। তার উপর এই দুঃসাহসিক গোপন বিবাহ! তিরস্কৃত কিশোর গৃহত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছিলেন দেবানন্দপুরে। পরে বর্ধমানরাজের বন্দীশালা। সেখান থেকে পলায়ন, পুরীধামে সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা, প্রত্যাবর্তন, ফরাসডাঙ্গায় অন্নসংস্থানের প্রচেষ্টা। শেষমেশ নৌকা ভিড়িয়েছেন নদীয়ারাজের ঘাটে। রাজাদেশে আজ গাইছেন—'অমাবস্যার গান'। প্রোষিতভর্তৃকা রাধা আজও বিরহযন্ত্রণা ভোগ করছে পিত্রালয়ে। প্রায় অনাহারে।

রূপেন্দ্রও শুনিয়েছেন তাঁর অভিজ্ঞতা। মৃন্ময়ীর অনুরাগের কথা গোপন করেছেন, কিন্তু কুসুমমঞ্জরীর আদ্যন্ত ইতিহাসটি মেলে ধরেছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' সম্বন্ধে আলোচনার কথাও সবিস্তারে জানিয়েছেন। ভারত কোন প্রত্যুত্তর করেননি। নির্লিপ্ত উদাসীনতায় শুধু শুনে গেছেন।

ভারত বললেন, তোমার সময় কম। নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগরের অনেক-অনেক কিছু অদেখা রয়ে গেল। শান্তিপুরে যাওনি, মায়াপুরেও নয়....

বাধা দিয়ে রূপেন্দ্র বললেন, সেসব পরে আর একবার এসে দেখব। সস্ত্রীক। মঞ্জুর ইষ্টদেবতা হচ্ছেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। তাকে বঞ্চিত করে একা-একা সেই ঠাকুরের কীর্তি-কাহিনী দেখে যাওয়া কি ঠিক?

ভারত সকৌতুকে বলেন, একেই বলে 'নিকষিত হেম'! আদর্শ প্রেম!

রূপেন্দ্র রুখে ওঠেন, বটে! তাহলে তুমি মহারাজের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলে না কেন? মহারাজ তো আমাদের দুজনকেই মধ্যাহ্ন-আহারে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন? তুমি তোমার কী এক ব্রতের ছুতো করে বাড়িতে পড়ে রইলে! কেন?

—কেন? তুমি কী ভেবেছ? কেন আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিনি?

রূপেন্দ্র বলেন, ভারত, 'অন্নদামঙ্গলে' ভিক্ষাজীবী শিব একবার মনের দুঃখে মা অন্নপূর্ণাকে বলেছিলেন, 'সাধ হয় একদিন পেট ভরে খাই।' মনে আছে? সে সময় যদি কেউ একা শিবকে নিমন্ত্রণ করত তাহলে তিনি কী করতেন? 'পঞ্চরঙ অপলান্ন' ভোজ খেতে ছুটতেন? না! তাঁর মনে পড়ত, তেজপুর গাঁয়ে প্রোষিতভর্তৃকা সীমন্তিনী অন্নপূর্ণা হয়তো কন্দমূল চিবিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করছে।

ভারত ম্লান হেসে বলেন, তোমার কাছে অস্বীকার করব না, বন্ধু! তোমার কল্যাণে এ কয়দিন রাজবাড়ি থেকে কাঁচা-সিধে আসছে, ভোলা ভালমন্দ রান্নাও করছে। কিন্তু ঠিক ঐ কারণে তা আমার মুখে রোচে না। যা হোক, তাহলে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান দেখতে সস্ত্রীক কবে আবার আসবে?

—যবেই আসি, সেবার তো কবি ভারতচন্দ্রের অতিথি হব না, তোমার কী?

ভারতচন্দ্র একেবারে সাদা হয়ে যান। বলেন, মহারাজ বুঝি আগাম নিমন্ত্রণ করে রেখেছেন?

—না! কিন্তু সস্ত্রীক এলে তো কোনও প্রোষিতপত্নীকের ভদ্রাসনে আশ্রয় নিতে পারব না। তাই আশা করব, আমার অন্য এক বন্ধু তখন এখানে সস্ত্রীক বাস করবে—তার গৃহেই আতিথ্য নেব। আমার সেই বন্ধুটির নাম—শ্রীরাধানাথ রায় গুণাকর।

ভারত হেসে বললেন, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক! তোমার বিবাহে আমি উপস্থিত থাকতে পারছি না। কিন্তু আমি বয়োজ্যেষ্ঠ—বন্ধু হলেও। সেই অধিকারে আশীর্বাদ করি তোমাদের বিবাহিত জীবন সুখের হোক। তুমি যে পত্নীপ্রেম দেখালে····

বাধা দিয়ে রূপেন্দ্র বলেন, পত্নীপ্রেম! বিবাহ না হতেই আমার কী পত্নীপ্রেম দেখলে হে?

ভারত হেসে বলেন, এটুকুও যদি না বুঝি তবে বৃথাই আমার কবির অভিমান!

—এটুকুও! কোনটুকু?

—শাক্তবংশের সন্তান কেন তার আজীবনের অভ্যাস ত্যাগ করে আজ নিরামিষাশী হয়ে গেল। মাত্র পক্ষকাল পূর্বে!

এবার রূপেন্দ্রর স্বীকার করার পালা, বলেন তুমি ঠিকই বুঝেছ। আমি মনে করি, দাম্পত্য-জীবনে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার। স্ত্রী শুধু স্বামীর সহধর্মিণী নয়, স্বামীকেও হতে হবে স্ত্রীর সহধর্মী। তার পক্ষে এই বয়সে আমিষ খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হওয়ার চেয়ে সহজতর সমাধান আমার নিরামিষাশী হয়ে যাওয়া।

ভারত বলেন, দেখ রূপেন্দ্র, তুমি অবিলম্বে সস্ত্রীক নবদ্বীপধামে তীর্থ করতে আসবে বলেছ, কিন্তু ভাগ্যের কথা কিছুই বলা যায় না। রাষ্ট্রবিপ্লব আসন্ন। নবাব আলিবর্দীর বয়স হয়েছে, তিনি অপুত্রক। গদী নিয়ে যে কোন সময় লড়াই বাধতে পারে। হয়তো তোমাতে-আমাতে আর কখনো দেখাই হবে না। তাই—তুমি যদি অনুমতি দাও, আমি তোমার-আমার বন্ধুত্বের একটি স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন উপহার দিতে চাই। যাতে আমার কথা তোমার বারে বারে মনে পড়ে যায়। তোমার বিবাহে এই দীন কবি আর কী উপহার দিতে পারে বল?

—কী উপহার? শুনি আগে।

—মদনারিরিপুর আশীর্বাদে তোমাদের মিলন সার্থক হবেই। সেই অনাগত মানবশিশুটির নামকরণ আমি করে দেব। তাকে যতবার ডাকবে ততবারই আমার কথা মনে পড়ে যাবে।

—এ তো খুবই আনন্দের কথা। কবির দেওয়া নাম। বল? কী নাম?

—তোমার পুত্রের নাম দিও: 'আত্মদীপ'!

—আত্মদীপ?

—হ্যাঁ। তুমি বিবেকের নির্দেশে পথ খুঁজে এগিয়ে চলতে চাও। মহাকারুণিক গৌতম বুদ্ধের সেই শেষ নির্দেশটিই তোমার জীবনের মূলমন্ত্র—আত্মদীপো ভব!

রূপেন্দ্র হেসে বললেন, বন্ধু! তুমি অপূর্ব নামকরণটি করেছ। আমার পুত্রসন্তান হলে নিশ্চয় তার নাম দেব: 'আত্মদীপ'; কিন্তু তুমি কট্টর স্মার্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতো এ পরামর্শ দিলে; ঠিক কবির মতো নয়।

—কবির মতো নয়? কী ত্রুটি হল আমার?

—তুমি কবি হিসাবে বিস্মৃত হয়েছ—এই রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শময় জগতের অধিকার একা পুরুষের নয়। এ বিবাহ সার্থক হলে আমার কন্যা-সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা পঞ্চাশভাগ।

ভারত বললেন, ঠিক কথাই বলেছে বন্ধু! পুত্রের নাম করেছিল কট্টর পণ্ডিত; এবার কন্যার নামকরণ করবে—কবি। রূপেন্দ্রনারায়ণ আর কুসুমমঞ্জরীর যৌথ মনসিজ-সাধনার ফলশ্রুতি যদি কন্যারূপে আবির্ভূতা হয়, তবে তার নাম হোক: রূপমঞ্জরী।

—রূপমঞ্জরী! বাঃ! সুন্দর নামটি!

তীর্থের পথে

1742

চতুর্থ পর্ব

সূর্য এখন কুম্ভরাশিতে।

রূপেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক এসেছেন শহর বর্ধমানে। কুসুমমঞ্জরী এখনো নববধূই। মাত্র দুইমাস পূর্বে বিবাহ হয়েছে তাদের। যে আমলের কথা, তখন 'মধুচন্দ্রমা' শব্দটা অভিধানে ছিল না। বাঙলা ভাষার অভিধান তখনো জন্মায়নি, সংস্কৃততেও শব্দটার ব্যবহার নাই। বিবাহের অব্যবহিত পরে এই সস্ত্রীক দেশভ্রমণের তিনটি হেতু। কোনটি মুখ্য তা নির্ণয় করা কঠিন। যেটি স্বীকার করে নেওয়া শোভন, সেটিকেই সর্বাগ্রে লিপিবদ্ধ করি:

যেভাবে দুর্গাচরণ একদিন বিবাহের ঠিক পূর্বে রূপেন্দ্রের কাছে নিয়ে এসেছিলেন নবদ্বীপ পরিদর্শনের প্রস্তাব, প্রায় অনুরূপ প্রস্তাব নিয়ে একদিন হাজির হলেন নন্দদুলাল চাটুজ্জে। তাঁর বড়কর্তা, অর্থাৎ নগেন্দ্রনাথ দত্ত-মশাই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, ভেষগাচার্য যেন একবার তাঁর ভদ্রাসনে পদধূলি দেন। বর্ধমানে।

নগেন্দ্রনাথ বর্ধমানের একজন অত্যন্ত ধনী গৃহস্থ। বর্ধমানভুক্তির প্রধান ইজারাদার। রাজ-সরকার কর্তৃক নিয়োজিত রাজস্ব আদায়ের দালাল। বিশাল এলাকায় তাঁর কর্মক্ষেত্র। নন্দ-খুড়ো তাঁর তরফে সোঞাই গ্রাম-সংলগ্ন পঞ্চগ্রামের উপ-ইজারাদার। নগেন্দ্রের বয়স অনুমান পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন। সম্প্রতি তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীর মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। শহর বর্ধমানের কবিরাজ এবং হাকিমের দল হাল ছেড়ে দিয়েছেন। বলাবাহুল্য তার পূর্বে ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবচ, শান্তি-স্বস্ত্যয়নের যাবতীয় পর্যায় পাড়ি দেওয়া হয়েছে। তাঁর প্রথমা স্ত্রী স্বর্গলাভ করেছেন বছর-দুয়েক—তিন-চারটি সন্তান রেখে। ছোটটি নেহাৎ দুগ্ধপোষ্য না হলেও বালকমাত্র। তাই বাধ্য হয়ে দত্তমশাইকে এই দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করতে হয়েছে। কিন্তু কী দুর্দৈব, বৎসরখানেকের ভিতরেই নববধূর মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা গেল। দত্তজা নিতান্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত—খরচ করতে পিছপাও নন। নন্দখুড়োর মুখে ভেষগাচার্যের অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে এই প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।

রূপেন্দ্রনাথ এককথাতেই সম্মত হয়ে গেলেন।

তাঁর ইচ্ছা ছিলই—বিবাহের পর একবার ত্রিবেণী যাবেন। গুরুদেবকে সস্ত্রীক প্রণাম করে আসবেন। তাছাড়া মঞ্জুকে নিয়ে নবদ্বীপ, শান্তিপুরে তীর্থ সেরে আসবেন। ভারতচন্দ্রের কাছে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আরও একটা হেতু ছিল। সেটি বেদনাবহ এবং কৌতুকের।

রূপেন্দ্রনাথের ভদ্রাসনে একটিই শয়নকক্ষ। যে কক্ষে পূর্বযুগে শয়ন করতেন ওঁর পিতৃদেব—সৌরীন্দ্রনাথ। ইদানীং সেটি ছিল জগুঠাকরুণ আর কাতুর যৌথ অধিকারে। রূপেন্দ্র রাত্রিবাস করতেন বার-বাড়িতে, যা সেকালে ছিল চতুষ্পাঠী, বর্তমানে গৌরবে ওঁর বৈঠকখানা। এ-ছাড়া প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে আরও দুটি ছোট ছোট একচালা আছে—ঠাকুরঘর এবং পাকশালা। রূপেন্দ্রের বিবাহের প্রায় সমসময়েই কাতুর জন্য একটি পৃথক কামরার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। জগুঠাকরুণের সঙ্গে রাত্রিবাস করা আর তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। সম্ভবপর হয়তো, বাঞ্ছনীয় না। গঙ্গাচরণ রুগী হিসাবেই এসে আশ্রয় নিয়েছিল বটে, কিন্তু এতদিনে তাকে চিনে ফেলেছে সবাই। জগুঠাকরুণ বাস্তুচ্যুত হয়েও উচ্ছ্বসিত। মেয়ে-জামাইকে এক সাথে পাবেন, এ আশা ছিল না তাঁর।

তা যেন হল, কিন্তু এই 'ঠাঁই-নাই' ভদ্রাসনে দু-জোড়া নবদম্পতির রাত্রিযাপনের কী আয়োজন করা যায়? স্বীকার্য, কাত্যায়নীর বিবাহ হয়েছে পূর্বদশকে; কিন্তু নারীজন্ম যে তার সার্থক হয়েছে এই সপ্তাহেই। জগুপিসি একটা সহজ সমাধান দাখিল করতে গিয়ে ভাইপোর কাছে ধমক খেয়েছেন। আরোগ্য-নিকেতনের জনশূন্য কক্ষগুলির সঙ্গে এ সমস্যার সম্পর্ক নাকি বায়স ও পক্বশ্রীফলের।

বৈঠকখানা ঘরটি বার-মহলে, বে-আব্রু, ফলে সমস্যাটার সমাধান হয়নি।

তোমরা যদি বল,'বাপু হে লেখক! তোমার ঐ নলচের আড়াল দেওয়ায় কিছুই ঢাকা পড়ছে না। যা বোঝার তা আমরা ঠিকই বুঝতে পেরেছি! 'মধুচন্দ্রমা' শব্দটা অভিধানে থাক না থাক, যুগলে গুরুপ্রণাম করার অছিলাটা যতই তীব্র হোক, আমরা বুঝে নিয়েছি, কোনটা মুখ্য হেতু'—তাহলে আমি প্রতিবাদ করব। আমার বিরুদ্ধ-যুক্তিটাও শোন, তারপর রায় দিও। তাই যদি হবে, তবে রূপেন্দ্র কেন জগু-পিসিমাকে বলবেন, আপনিও চলুন না পিসিমা, তীর্থ-দর্শন করে আসবেন?

পিসিমাই রাজি হননি। বোধকরি তাঁর আশঙ্কা ছিল, গঙ্গাচরণ দুনিয়ার মায়া কাটিয়েছে। সে আর কোনদিন ফিরে আসবে না। কাতু মুখপুড়ির হাতে ঐ যে শাঁখা-খাড়ু বজায় আছে তার হেতু—নিদারুণ দুঃসংবাদটা এ গাঁয়ে এখনো এসে পৌছায়নি। মেয়ে-জামাই পেয়ে তাঁর তীর্থদর্শনের বাসনাটা উপে গেছে।

এবার তোমরাই বল: মধুচন্দ্রমায় কেউ বুড়ি পিসিকে সঙ্গী হতে ডাকে?

জীবন ওঁর রুগীদের দেখ্‌ভাল করার দায়িত্ব নিয়েছে।

রূপেন্দ্রর বিবাহও এক এলাহী কাণ্ড!

ভেষগাচার্য বৈদ্যবিদায় গ্রহণ করেননি। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আরোগ্যনিকেতন বানিয়ে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মন ভরেনি। এবার তাঁর পালিতা কন্যার বিবাহে তিনি যদি এলাহী

কাণ্ড করেন, তাহলে রূপেন্দ্রর কী বলার থাকতে পারে?

ফুলশয্যার রাত্রে ঘটল একটি কৌতুকের ঘটনা। এটাও বেদনাবহ!

রূপেন্দ্রর ভদ্রাসনে সেই একমাত্র শয়নকক্ষেই জোড়াপালঙ্কে ফুলশয্যার আয়োজন। কাত্যায়নী, মৃন্ময়ী আরও পাড়ার পাঁচ এয়ো এসে ফুলে-ফুলে সাজিয়েছে ঘরখানা। কনেকে সাজিয়েছে কাতু, বরকে মীনু। নির্দ্বিধায়। গালে-কপালে চন্দন-ফোঁটা নেব না বললে শুনছে কে? পাকস্পর্শ আর ফুলশয্যা একই দিনে। নিমন্ত্রিতদের বিদায় করতে করতে রাত প্রায় তৃতীয় যামের দিকে ঢলে পড়তে চলেছে।

সব মিটিয়ে রূপেন্দ্র যখন শয়ন করতে এলেন তখন বাঁড়ুজ্জেবাড়ি নিস্তব্ধ। নিমন্ত্রিতরা ফিরে গেছে যে-যার বাড়ি। জগু-পিসি শুয়ে পড়েছেন। গঙ্গাচরণও। কাতুকে কোথাও দেখতে পেলেন না। একাই প্রবেশ করলেন শয়নকক্ষে। পালঙ্কের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন।

বালার্ক-রক্তিম বিক্রমপুরী খাসা-মসলিন, ঊর্ধ্বাঙ্গের উচ্ছ্বাস দৃঢ়নিবদ্ধ কঞ্চুলিকায় সংহৃত, স্তবকিত জলদ-সম্ভারের মতো কবরীগুচ্ছে পুষ্পস্তবক অনুবিদ্ধ। সীমন্তের মধ্যভাগে সৌভাগ্যস্মারক রক্তিমাভা। অলক্তকরাগরঞ্জিত রাতুল চরণে কলহংসকণ্ঠনিঃস্বনমধুর নূপুর।

রূপেন্দ্র সেদিকে এক পদ অগ্রসর হতেই মেয়েটি মুখ তুলে তাকায়। চম্পকাঙ্গুলি স্পর্শ করায় ওষ্ঠাধরে। রূপেন্দ্র বিস্মিত। তখনই নজর হল, নববধূ তর্জনীসঙ্কেতে কী যেন দেখাচ্ছে। পরমুহূর্তেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কক্ষের অপরপ্রান্তে স্তূপাকার করা কিছু শয্যাদ্রব্য—লেপ-তোষক-কম্বল-বালিশ। তার একটি পুঁটুলি সন্দেহজনক। বোঝা গেল, কেন এতক্ষণ কাতুকে খুঁজে পাননি।

ধরা পড়ে বেচারি নিতান্ত অপ্রস্তুত। রূপেন্দ্র বলেন, তুই এখানে! ওদিকে গঙ্গা তোকে সারা বাড়ি গোরু-খোঁজা খুঁজছে।

কাতু বলে, বৌরানী ধরিয়ে না দিলে দেখতাম—

কী দেখত, তা আর বলে না।

রূপেন্দ্র ওকে বিতাড়িত করে ফিরে এলেন। কক্ষদ্বার অর্গলবদ্ধ করতে ভোলেননি। এবার পালঙ্ক থেকে অবতরণ করল নববধূ। গলায় আঁচল দিয়ে নামিয়ে রাখে একটি সলজ্জ প্রণাম। রূপেন্দ্র ওকে বাহুমূল ধরে তুলে ধরেন। বলেন, সারাদিন খুব ধকল গেছে, নয়? খুব ঘুম পেয়েছে তো?

নববধূ শিরশ্চালনে নেতিবাচক গ্রীবাভঙ্গি করে। আর তাতেই, কী জানি কেন, লজ্জায় রাঙা হয়ে যায়।

রূপেন্দ্র ওকে পালঙ্কে বসিয়ে দেন। বলেন, সেই জিনিসটা কোথায়? সেই সেদিন যেটা তোমাকে দিয়েছিলাম?

মঞ্জুরী নতমস্তকে বললে, সে কথা আজ নয়।

বটেই তো! আজ সব মধুময়। 'বিষ'-এর প্রসঙ্গ আজ নয়। এই 'মধুনক্তম্'-এ ও-কথা তোলাই উচিত হয়নি তাঁর। তবে নাকি পেশায় কবিরাজ, নিরাপত্তার কথাটা তুচ্ছ করতে পারেন না। এবার প্রসঙ্গান্তরে আসেন, এই একপক্ষকালে কী বিচিত্রভাবে বদলে গেল তোমার জীবনটা!

নববধূ নতনেত্রে বললে, সে তো আপনারও!

তা বটে! সংসারে জড়িয়ে পড়লেন। বলেন, সম্প্রতি নদীয়া গিয়েছিলাম। শুনেছ?

—শুনেছি! সোনার গৌরাঙ্গ দেখে এসেছেন?

রূপেন্দ্র তখনই জানালেন না যে, তা তিনি দেখেননি। যুগলে দেখবেন বলে। বরং বলেন, তুমি আমাকে 'আপনি' বলছ কেন? এতদিন যা বলেছ, বলেছ; কিন্তু অগ্নিসাক্ষী করে যখন তোমাকে সহধর্মিণী করেছি ....

—আপনি কতবড় পণ্ডিত!

—তোমার কাছে কি সেটাই আমার পরিচয়?

মুখটা লাল হয়ে ওঠে। মাথা নেড়ে নেতিবাচক ভঙ্গি করে।

—তাহলে? আমাকে 'তুমি'ই বলবে। অন্তত নির্জনে। বড়-মা যেমন বলেন।

হয়তো এটা ওর অজ্ঞাত তথ্য। রূপেন্দ্র সেটা কীভাবে জেনেছেন তাও জানতে চাইল না। দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বলে, সে আমি পারব না। কিছুতেই না! আপনি কত বড়!

—ও! কিছুতেই পারবেন না! তাহলে আর কী উপায়? আমি বিশ্বাস করি, সব বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর সমান অধিকার। ঠিক আছে, জোর-জবরদস্তি করা আমার স্বভাব নয়। আপনি আমাকে তাহলে 'আপনি' বলেই কথা বলবেন।

কুসুমমঞ্জরী অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ নির্বাক তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, আপনি অমন করছেন কেন? আমার কী দোষ হল?

—কেমন করছি? আপনার দোষ হয়েছে, তা তো বলিনি।

—না, মানে .... আপনি আমাকে 'আপনি' বলে কথা বলছেন কেন?

—সে কথাই তো বলছি এতক্ষণ। দাম্পত্যজীবনে স্বামী-স্ত্রীকে থাকতে হবে একই সমতলে। আপনি যখন আমার সমতলে নামতে পারছেন না, তখন আমিই আপনার সমতলে উঠে আসি।

এবার দৃঢ়ভাবে মেয়েটি বলল, ছি ছি! তা কিছুতেই হবে না! আপনি আমাকে 'আপনি' বললে .... না, না, সে কিছুতেই হবে না।

রূপেন্দ্র ছদ্ম গাম্ভীর্যে বলেন, তাহলে তো একটিই বিকল্প—বাক্যালাপ বন্ধ করা। আজকের এই শুভরাত্রে সেটাই কি আপনার প্রস্তাব?

কুসুমমঞ্জরীর প্রায় কেঁদে ফেলার উপক্রম। মাথা নিচু করে বলে, বেশ, আপনি যেভাবে বলতে বলছেন সেভাবেই বলব ....

—'আপনি যেভাবে বলতে বলছেন!' —আপনার পূজ্যপাদ পরমপতি কীভাবে বলতে আদেশ দিয়েছেন?

দুহাতে মুখ ঢেকে কুসুমমঞ্জরী বললে, তুমি ভারী 'ই—য়ে'!

—'কিয়ে'? —রূপেন্দ্র এবার ওকে দুই বাহুমূল ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করলেন। এটা বোধকরি প্রত্যাশিত। নববধূর দেহ কেমন যেন শিথিল হয়ে যায়, চোখ দুটি আবেশে মুদে আসে। রূপেন্দ্র ঐ চুম্বনতৃষিতার দিকে মুখটা নামিয়ে আনার মুহূর্তেই বাধা!

পালঙ্কের নিচে থেকে ভেসে এল এক অস্ফুট আর্তনাদ!

চমকিত রূপেন্দ্র এক লাফে নেমে পড়েন পালঙ্ক থেকে। ঘৃত-প্রদীপটা জ্বলছিল পিলসুজের উপর। সেটি হাতে তুলে নিয়ে পালঙ্কের নিচে দৃষ্টিপাত করলেন।

অপ্রত্যাশিত দৃশ্য! বাক্স-পেঁটরার অন্তরালে মৃন্ময়ী বসে ছিল ঘাড় গুঁজে, এতক্ষণে প্রায় শুয়েই পড়েছে।

দুজনে কোনক্রমে বার করে আনলেন উৎসবসজ্জিতা সীমন্তিনীকে। যন্ত্রণায় যেন বিকৃত হয়ে গেছে মীনু। রূপেন্দ্র ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করেন, কী হয়েছে মীনু? যন্ত্রণা হচ্ছে?

—হুঁ!

—কোথায়? পেটে?

গ্রীবাভঙ্গিতে স্বীকার করে।

কী অন্যায়! কী অপরিসীম অন্যায়! কৌতুকের একটা সীমা থাকবে তো? পূর্ণগর্ভা একটি রমণী—প্রথম সন্তানবতী হতে চলেছে—ঐ সঙ্কীর্ণ স্থানে ...

রূপেন্দ্র মুহূর্তে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। তিলমাত্র ইতস্তত করলেন না। এ মুহূর্তে তিনি বর নন, পুরুষ নন, ভেষগাচার্য! নির্দ্বিধায় একটি হাত রাখলেন ওর যূথিপুষ্পঅনুবিদ্ধ কবরীগুচ্ছে, অপর হাত জানুদ্বয়ের নিচে। অবলীলাক্রমে ভূশয্যা থেকে উঠিয়ে তাকে শুইয়ে দিলেন পালঙ্কে!

ছি, ছি, ছি! কেন মৃত্যু হল না সেই মুহূর্তে? যে ফুলশেয সে সারাটা দিন ধরে সাজিয়েছে তার উপরেই তাকে কোলপাঁজা করে শুইয়ে দিলেন সোনাদা। আর তাঁর মঞ্জু পালঙ্ক থেকে নেমে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। যেন বিতারিতা দুয়োরানী! মৃত্যু না হক, জ্ঞান হারালো না কেন? কিন্তু জ্ঞান হারালে কি প্রতিবর্তী প্রেরণায় সেও আলিঙ্গনাবদ্ধ করে ধরত ঐ সোনার গৌরাঙ্গকে!

কোনক্রমে বললে, না-না-না! আমাকে নামিয়ে দিন! এ বিছানায় আমার শুতে নেই!

—চুপ কর তুমি! কথা বল না।

কুসুম অস্ফুটে বলে, দোর খুলে দেখব? ঠাকুরঝিকে ডেকে আনব?

—না! আগে আমাকে বুঝে নিতে দাও!

এ কী! এ কী! এ কী করছে সোনাদা? ওর কি মায়া, মমতা, হায়া-কায়া কিচ্ছু নেই?

রূপেন্দ্র তিলমাত্র ইতস্তত করলেন না। রোগিণীকে শুইয়ে দিয়েছেন। সবার আগে জানতে হবে গর্ভস্থ ভ্রূণের হৃদ্স্পন্দন শোনা যাচ্ছে কি না—তার কিছু ক্ষতি হয়েছে কি না। তাঁর সেই আজব যন্ত্রটা এই মুহূর্তে কোথায় আছে জানেন না। উৎসবগৃহে সবকিছুই লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে।

দু-হাতের দশটি আঙুলে—যেন এ-কাজে কতই অভ্যস্ত—উন্মোচন করে দিলেন ঐ পরস্ত্রীর নীবিবন্ধের গ্রন্থী। অনায়াসে অনাবৃত করে দিলেন শায়িতা মেয়েটির উদরদেশ। শাড়িটা নামিয়ে দিলেন অনেকটা—কুসুমমঞ্জরীর দৃষ্টির সম্মুখে—প্রায় সেই সঙ্গোপন উপত্যকায়, যাকে কালিদাস বলেছেন, "নতনাভিরন্ধ্রং ররাজ তন্বী নবরোম রাজি। নীবীমতিক্রম্য সিতেতরস্য..."

মৃন্ময়ী বাধা দিতে পারল না। সে যেন পাথরপ্রতিমা! কণ্ঠে তার স্বর ফুটল না। রূপেন্দ্র সেই অনাবৃত নিম্ন-উদরে চেপে ধরলেন তাঁর কান। গাভীর গলকম্বলে হস্তস্পর্শ করলে তার দেহ যেভাবে থরথর করে কেঁপে ওঠে সেভাবেই কাঁপতে থাকে মৃন্ময়ীর রোমাঞ্চিত বিবশ তনুদেহ।

অনেক-অনেকক্ষণ পরে রূপেন্দ্র মাথাটা তুললেন। শাড়িটা টেনে দিলেন স্বস্থানে। বললেন, একদম নড়াচড়া করবে না। বাচ্চাটা ঠিক আছে।

হাসবে না কাঁদবে মৃন্ময়ী ভেবে পেল না। লজ্জা, বেদনা, আনন্দ কোন অনুভূতি কাকে ছাপিয়ে উঠেছে তা যেন ওর বোধসীমার বাহিরে! রূপেন্দ্র নববধূকে বললেন, ঐ কলসীতে জল আছে। ওর মুখে-চোখে ছিটিয়ে দাও। আমি দেখছি, কাতুকে ডেকে আনতে হবে।

রুদ্ধদ্বার খুলে দিয়েই দেখেন, সেখানে কাতু আর শোভারানী। ঘরের ভিতর তাকিয়ে দেখে কাত্যায়নী সশঙ্ক কণ্ঠে বলে, কী হয়েছে দাদা?

—তোরা খুব অন্যায় করেছিস! ওকে কি এখন ঐ ভাবে পালঙ্কের তলায় ঢুকিয়ে দিতে হয়? ভাগ্যক্রমে হয়নি কিছু, কিন্তু হতে পারত।

—মীনু কি .... ওকে কি .....

—না! ওকে ঠাইনাড়া করা চলবে না। যেমন আছে তেমনই থাক। মীনু আর মঞ্জু পালঙ্কে শোবে। আমার জন্য একটা মাদুর নিয়ে আয়।

কাতু মাথা ঝাঁকিয়ে দৃঢ়স্বরে বলে, তা হয় না! কিছুতেই না! মা টের পেলে ...

রূপেন্দ্রনাথ চাপা গর্জন করে ওঠেন, ধেড়ে বয়সে মার খাবি? যা বলছি কর। ওকে ঠাইনাড়া করা চলবেনা তিন-চার ঘণ্টা।

তারপর শোভারানীর দিকে ফিরে প্রশ্ন করেন, বাড়িতে কী বলে এসেছ? কতরাত্রে ফিরবে? পাল্‌কি আছে?

—না! বাবা-মশাই জানেন, আমরা কাল সকালে ফিরে যাব। তখনই পাল্‌কি আসবে।

—ঠিক আছে। শোন! তুইও শোন্ কাতু আজ রাত্রে এ ঘটনার কথা যেন কাকপক্ষীতে টের না পায়। আমরা তিনজনেই থাকব এ ঘরে। আমাকে একটা মাদুর এনে দে শুধু।

শোভা জানতে চায়, ছোট-মার কিছু হয়নি তো? ওঁর পেটের ...

—না। হতে পারত, হয়নি। হতে পারে, এখনো নড়াচড়া করলে——

মৃন্ময়ী দুটি হাত জোড় করে বললে, রূপোদা, আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দিন ... এ আমি পারব না, কিছুতেই পারব না!

রূপেন্দ্রকে প্রত্যুত্তর করতে হল না। তাঁর পাশ থেকে শোভারানীই তাঁর হয়ে জবাব দিল। সে জবাব ক্ষুরধার—কেটে কেটে বসে: পারবেন, ছোট-মা! এমন নরম ফুলশেযে একটা রাত কাটাতে পারবেন না? পারবেন। আর মাদুরেরই বা কী দরকার? এড়োএড়ি করে শুলে সোনাদা দুজনকে দুপাশে নিয়েই পালঙ্কে শুতে পারবেন।

সহজ-সরল সমাধান! অশোভন বা অশালীন কোন বক্রোক্তি নেই!

কিন্তু মৃন্ময়ী যেন একেবারে সাদা হয়ে গেল। বিকৃত হয়ে গেল মুখটা। দাঁত দিয়ে নিচেকার ঠোঁটটা এত জোরে কামড়ে ধরেছে যে, রক্ত ফুটে ওঠার উপক্রম।

রূপেন্দ্র বলেন, কী হল? আবার যন্ত্রণা শুরু হল? পেটে?

কী জবাব দেবে হতভাগী? উদরদেশে নয়, অপরিসীম যন্ত্রণাটা যে ওর বুকে। শোভারানী জেনে-বুঝে দু-পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে গেল ওর হৃৎপিণ্ডটা। সরল সমাধানের অছিলায় গরল উদ্গীরণ!

তা বটে! ভুলটা রূপেন্দ্রনাথের। ভুলের মাশুল দিতে হবে বৈকি! ফুলশেযের রাতে সবার আগে যে নববধূর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন একটি নিষিদ্ধ বস্তু! সেটাই এতক্ষণে ফেরত দিল শোভারানী।

কিন্তু কার বিরুদ্ধে এই বিষোদ্গার? কুলীনঘরের ঐ অরক্ষণীয়া কাকে দংশন করতে চায়? নববধূ না ছোট-মা? অথবা কে জানে, হয়তো তার মূল লক্ষ্য ছোট-মার ঐ আদরের 'সোনাদা'—সেই আগুনবরণ ছেলেটা যে, চোখে না দেখেই নাকচ করেছিল এক অরক্ষণীয়াকে, চিরকুমার থাকার অছিলায়!

নগেন দত্ত শহর-বর্ধমানের একজন অত্যন্ত ধনী-ব্যক্তি। প্রথম যুগে ছিলেন বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের অধীনস্থ নায়েব কাননগো, বর্তমানে ইজারাদার।

বোধকরি কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন—ঐ নতুন দুটি শব্দের: 'বঙ্গাধিপতি' আর 'কাননগো'।

চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বংগাল-বিহার মুল্‌ক-এর শের-এ-হিন্দ্ মুগলদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন শাসনদণ্ড। মাত্র পাঁচবছর তিনি ছিলেন দিল্লীশ্বর। তার ভিতরেই বানিয়েছিলেন—শাহী-সড়ক: গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড। শেরশাহ শূর! আর তার ভিতরেই প্রবর্তন করেছিলেন রাজস্ব আদায়ের মূল কাঠামোটা, অন্তত এই বঙ্গদেশে। আকবর বাদশাহ্ ক্ষমতায় ফিরে আসার পর সেই খসড়া-নক্‌শায় রঙতুলি বোলালেন। মূল রূপকার রাজা তোডরমল্ল। তিনি 1582 খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভূমের যাবতীয় ভূস্বামীদের সঙ্গে পরামর্শ করে গোটা রাজ্যের রাজস্ব আদায়ের একটা সুবন্দোবস্ত করলেন। সমগ্র বঙ্গদেশকে বিভক্ত করা হল উনিশটি 'সরকারে' এবং প্রায় পৌনে সাত শতটি 'পরগণায়'। বিভিন্ন ভূস্বামীর প্রদেয় রাজস্বের পরিমাণ সুচিহ্নিত হল। মোট পরিমাণ: এক কোটি সত্তর লক্ষ সিক্কা টাকা। জমির মাপ, নক্‌শা, পরিমাণ, মালিকানা চিহ্নিত করা হল। ঐ সঙ্গে প্রতিটি ভূখণ্ডের জন্য 'তোমরা-জমা, খালসা, আবওয়াব' প্রভৃতির পরিমাণ। সে নথীপত্র পর্বতপ্রমাণ। পরগণায় পরগণায় নিযুক্ত হল আমিন, নক্‌শানবীশ, কাননগো। এক এক 'সরকারে' সব কয়জন কাননগোর কাজ দেখভাল করার জন্য এক একজন নায়েব-কাননগো। আর সবার উপরে প্রধান কাননগো। অসীম প্রতিপত্তি তাঁর। সমগ্র রাজ্যের আদায়-তহশিল, মালিকানা তাঁর নখাগ্রে।

তোডরমল্ল স্বয়ং থাকতেন রাজধানীতে। তাঁর ওরফে গোটা বঙ্গদেশের হক-হিসাব যিনি দেখতেন, তাঁর নাম ভগবান রায়। বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে খাজুরডিহি গ্রামে তাঁর জন্ম। উত্তররাঢ়ী কায়স্থ, মিত্রবংশসম্ভূত। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তাঁর সুনিপুণ কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে রাজা তোডরমল্লের সুপারিশে তাঁকে 'বঙ্গাধিপতি' খেতাব দেন বাদশাহ্ আকবর। এই সময় তাঁর সদর দপ্তর ছিল মালদহ জেলার শিবগঞ্জ পুখুরিয়ায়। সেখানে নাকি সেই কাছারি-বাড়ির ধ্বংসস্তূপ এই শতাব্দীর প্রথম পাদেও দেখা যেত।

বর্ধমান

ভগবান রায় থেকে লক্ষ্মীনারায়ণ পাঁচ পুরুষের-ব্যবধান। আমাদের কাহিনীর কালে, অর্থাৎ আলিবর্দীর আমলে ভগবান রায়ের প্রপৌত্র শিবনারায়ণও স্বর্গলাভ করেছেন। লক্ষ্মীনারায়ণ ছিলেন শিবনারায়ণের পুত্র। তিনি ভট্টবাটীবংশীয় প্রধান কাননগো মহেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে দীর্ঘদিন যৌথভাবে এ দায়িত্ব পালন করে যান। ক্রমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এ ব্যবস্থাপনার যবনিকাপাত ঘটে। সম্মানের পর্যায়ক্রমে মুর্শিদাবাদে বঙ্গাধিপতির স্থান তৃতীয়—স্বয়ং নবাব এবং জগৎশেঠের পরেই।

নগেন্দ্র দত্ত ছিলেন ঐ লক্ষ্মীনারায়ণের অধীনে বর্ধমান-সরকারের নায়েব-কাননগো। কিন্তু সম্মান নিয়ে কি ধুয়ে খাবেন? অসার খলু সংসারে সারং রৌপ্য মুদ্রায়াম্! ইজারাদারের হাতে আসে কাঁচা সিক্কা-টাকা! বছর না ঘুরতেই হয়েছেন টাকার কুমির! বাগানবাড়িতে পাঁচ-ইয়ারের সঙ্গে মাঝে মাঝে রামপ্রসাদীর প্যারডি ভাঁজেন, "আমায় দে মা তবিলদারী/আমি নিমকহারাম 'হই' শঙ্করী!"

এখন যেখানে বর্ধমানরাজার পায়রাখানা প্রাসাদ, তার কিছু দূরে ছিল তাঁর ভদ্রাসন। বিশ বিঘের প্রাচীরবেষ্টিত প্রাসাদ। দ্বিতল পাকা বাড়ি, প্রকাণ্ড সিং-দরোজা। সামনের দিকে দফতর, অতিথিশালা, মন্দুরা, এমনকি পিলখানা। অতিথিশালায় পাশাপাশি চার-পাঁচটি কক্ষ। কার্যব্যপদেশে বিভিন্ন অতিথি আসেন, অধিকাংশই উপ-ইজারাদার। দু-চারদিন তাঁদের রাত্রিবাস করতে হয়। প্রতিটি কক্ষে চার-চারজনের শয়নব্যবস্থা।

এত বৃহৎ আয়োজন, তবু সমস্যা দেখা দিল রূপেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে। কোথায় তাঁকে থাকতে দেওয়া যায়? এতাবৎকাল যে-সব অতিথি-অভ্যাগত এসেছেন, প্রতিনিয়তই আসছেন, তাঁরা কখনো সস্ত্রীক আসেন না। পদমর্যাদা অনুযায়ী তাদের স্থান হয় অতিথিশালায়, কাউকে রাখা হয় একক-কক্ষে, কাউকে বা যৌথভাবে। কিন্তু সেটা পুরোপুরি পুরুষদের এলাকা। কোন মহিলাকে সে অতিথিশালায় আশ্রয়দান শোভন নয়। দত্তমশায়ের প্রাসাদটিও প্রকাণ্ড—পাঁচ-সাতখানা ঘর অন্দরমহলে অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু অন্দরমহলে কীভাবে ভেষগাচার্যকে স্থান দেওয়া যায়? তাতে পর্দানসীন মহিলাদের যে চূড়ান্ত অসুবিধা! সেটা শোভনও নয়। উপায় নেই—স্থির হল দুজনকে দুই মহলে স্থান দেওয়া হবে। ভেষগাচার্য থাকবেন অতিথিশালায়, তাঁর স্ত্রী অন্দরমহলে।

দোষ অতিথির! সামাজিক রীতিনীতি, কালের বিধান না মানলে উপায়-কী? 'পথি নারী বিবর্জিতা' শ্লোকটাও যে শোনেনি তার কপালে এ জাতীয় দুর্ভোগ তো প্রত্যাশিত!

এবার বোঝ! 'মধুচন্দ্রমা' শব্দটা যখন পয়দা হয়নি তখন সস্ত্রীক বিদেশভ্রমণের বাসনা জাগলে কী খোয়ার হয়!

অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হয়নি। আন্তরিকতায় না হলেও আড়ম্বরে। সোঞাই গাঁ থেকে এসেছেন দত্তজার সৌখীন বজরায়, দামোদর বেয়ে—সোজা পুবমুখো। তারপর দামোদরের শাখানদী বাঁকা ধরে বর্ধমানে। দত্তজার ভদ্রাসন একেবারে বাঁকা সই-সই। অর্থাৎ সদর দ্বার রাজপথে কিন্তু প্রাসাদের খিড়কি ঘেঁষে বহে চলেছে বাঁকা। প্রাচীরবেষ্টিত প্রাসাদে পাশাপাশি

দুটি ঘাট, পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের। অর্থাৎ অবগাহন স্নানের প্রয়োজনে কাউকে বাড়ির বাইরে যেতে হয় না।

বজরাটা ঘাটে এসে ভিড়ল সূর্যোদয়ের একটু পরে। মাস ফাল্গুন। ঘাটে এখনো স্নানার্থীরা কেউ নেই। নির্জন। বড় মাঝি গলুইয়ের মাথায় দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বমুখে একটি শাঁখ বাজিয়ে দিল। বোধহয় এটাই প্রথা—এভাবেই ঘাটের মাঝি গৃহস্থের শ্রুতি আকর্ষণ করে।

রূপেন্দ্র ঘাটে নামলেন। হাত ধরে সাবধানে নামিয়ে আনলেন মঞ্জুকে। মাঝিরা হাতে-হাতে নামিয়ে দিল পোঁটলা-পুঁটলি। শঙ্খধ্বনি হবার একটু পরেই সোপান বেয়ে নেমে এল একজন তরুণ, সঙ্গে এক অবগুণ্ঠনবতী। পিছন পিছন কিছু খিদ্‌মদগার। তরুণ-তরুণী দুজনেই প্রণাম করল এঁদের। মঞ্জরী সঙ্কোচে আপত্তি জানায়। তরুণ শুনল না, বললে, সে কী মা? আপনি ব্রাহ্মণী, প্রণাম নিতে হবে বইকি।

তারপর রূপেন্দ্রকে বলে, আমার নাম শিবতোষ, ঠাকুরের নাম শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত। আমি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র। বজরায় অসুবিধা হয়নি তো কিছু?

রূপেন্দ্র বলেন, কিছু না।

—আসুন, আমার সঙ্গে।

রূপেন্দ্রনাথ ঐ তরুণটির পিছন পিছন গোটা বাড়িটা প্রদক্ষিণ করে সামনের অতিথিশালার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। লক্ষ্য হল, অবগুণ্ঠনবতী মঞ্জুর হাত ধরে নিয়ে চলেছে অন্দরমহলে। পোঁটলা-পুঁটলি সবই তার পিছন-পিছন।

অতিথিশালায় নির্দিষ্ট কক্ষটি দেখিয়ে দিয়ে শিবতোষ প্রশ্ন করে, আপনার প্রাতরাশ পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি?

—না! আমি প্রথমে স্নান করব, তারপর সন্ধ্যাহ্নিক। তারপর ওসব হবে। দত্ত-মশাই কি শয্যাত্যাগ করেছেন?

শিবতোষ বক্রপন্থায় প্রত্যুত্তর করল, প্রথম সুযোগেই তাঁকে জানিয়ে দেব যে, আপনারা নিরাপদে উপস্থিত হয়েছেন।

তিনি গাত্রোত্থান করেছেন কিনা বোঝা গেল না।

দ্বারপ্রান্তে একটি গামছা-কাঁধে দাঁড়িয়েছিল। শিবতোষ বললে, এ হল কালী। আপনার খিদমদগার। জাতে উগ্রক্ষত্রিয়। জলচল। সর্বক্ষণ এখানেই থাকবে। যখন যা প্রয়োজন হবে, বলবেন। আপনি প্রস্তুত হয়ে নিন। পরে আসব।

কালী এসে প্রণাম করল ব্রাহ্মণকে। শিবতোষ প্রাসাদের দিকে ফিরে গেল।

পাকা ইটের গাঁথনি, কক্ষটি বেশ বড়। চারটি শয্যা চারপ্রান্তে। তিনটি শূন্য। উপরে টানা পাখা। দেওয়ালে হরিণের শিং। এক পাশে একটি মেজ, তদুপরি ভৃঙ্গার ও পানপাত্র—পানীয় জলের।

কালী বললে, তেল মাখবেন তো কোবরেজ-মশাই?

রূপেন্দ্র বলেন, সে ঘাটে গিয়ে। কিন্তু মার্জনা-অঙ্গবস্ত্র না হলে—

কালী মুখব্যাদন করল।

–মানে, গামছা আর কি। স্নান করে গা মুছতে হবে তো? তুমি এক কাজ কর,

কালি—অন্দরমহল থেকে তোমার গিন্নি-মায়ের কাছ থেকে ... মানে, আমার স্ত্রী আর কি, একখানা ধুতি আর একটা গামছা চেয়ে নিয়ে এস। পোঁটলা-পুঁটলি তো সব তাঁর কাছে।

কালী অত্যন্ত অপ্রস্তুতভাবে মুখ নিচু করে ঘাড় চুলকাতে থাকে!

—কী হল? কী বললাম বুঝতে পারলে না?

—বুঝবনি কেনে ঠাউর; কিন্তুক তাতে যে অনেক বখেড়া। একটি বেলা যাবে ...

রূপেন্দ্র বুঝে উঠতে পারেন না, সমস্যাটা কী? অন্দরমহল তো এক রশি দূরে।

কালী বুঝিয়ে দেয়। ওঁর আদেশ পালন করতে হলে ওকে মাঝমহলের গোমস্তা-মশায়ের কাছে আর্জি পেশ করতে হবে তাঁর এত্তেলা পেয়ে অন্দর মহল থেকে ক্ষান্তমণি বা নিভাননী বা আর কেউ—যার 'হাত-অপসর' আছে, সে মাঝমহলে এসে সংবাদটা শুনবে। তারপর সেই সংবাদটা জ্ঞাত করবে মাঠানের নির্বাচিতা খাশদাসীকে—'কল্যাণেশ্বরী জানেন, সে কে! এর পর সেই দাসীটি ঐ দুটি দ্রব্য সংগ্রহ করে এনে মাঝমহল পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। কালী তা নিয়ে ফিরে আসতে আসতে একদণ্ড পার হয়ে যাবার আশঙ্কা!

রূপেন্দ্র কী করবেন ভেবে পেলেন না। ভবিষ্যতে দুটি পৃথক গাঁটরি বানাতে হবে এটা বুঝতে পারেন। এ জাতীয় বিড়ম্বনা বারে-বারেই হবার আশঙ্কা। কিন্তু আপাতত কী করা যায়?

সমাধান বাৎলালো কালী নিজেই। তার হেপাজতে নতুন বস্ত্র এবং গামছা আছে। অনেক অতিথি অতর্কিতে নৈশবাসে বাধ্য হন। তখন তাঁদের যাতে কোন অসুবিধা না হয়, তাই অতিথিশালায় এ জাতীয় বিকল্প ব্যবস্থা রাখা থাকে। ঠাকুর-মশাইয়ের আপত্তি না থাকলে সে বার-মহলের গোমস্তামশায়ের অনুমতি নিয়ে এক প্রস্থ কাপড়-গামছা এখনি এনে দিতে পারে। রূপেন্দ্র ইতস্তত করছিলেন, কিন্তু কালীর পরবর্তী সংযোজনে তিনি সম্মত হয়ে যান—অতিথি যদি ঐ আনকোরা নতুন বস্ত্র ও গামছা সঙ্গে নিয়ে না যান তবে তা দ্বিতীয় অতিথিকে প্রদান করার হুকুম নেই। সেটি পরিচারকের প্রাপ্য হয়—অর্থাৎ এক্ষেত্রে কালীচরণের।

স্নানাহ্নিকের পর কালীচরণ পরিবেশন করল ঠাকুরের বাল্যভোগের প্রসাদ। ফল-মূল-মিষ্টান্ন। একটি পরিচিত মিষ্টান্ন নজরে পড়ল ওঁর: ল্যাংচা।

রূপেন্দ্র প্রশ্ন করলেন, দত্তমশায়ের জলযোগ হয়েছে?

কালী জবাবে বললে, এখনো তাঁই আসেননি।

—আসেননি! উনি কি বর্ধমানে নেই?

কালী ইতস্তত করল। তারপর স্বীকার করল, বদ্দমানেই আছেন। মানে, বাগানবাড়ির থনে এখনও আসেননি।

দত্তমশায়ের এ বিষয়ে কোনও লুকোচুরি নেই। তাই প্রথমে ইতস্তত করলেও স্বীকার করতে ওর বাধল না। অর্থকৌলিন্য যার আছে সে বাগানবাড়িতে রাত কাটাবে এর মধ্যে লুকোছাপার কী আছে?

এক প্রহর বেলায় শিবতোষ ওঁকে নিয়ে গেল বৈঠকখানায়। গৃহস্বামী প্রত্যাবর্তন করেছেন। প্রতীক্ষা করছিলেন। বয়স পঞ্চান্ন হতে পারে, কিন্তু শরীর মজবুত। বার্ধক্য তো দূরের কথা, প্রৌঢ়ত্বও যেন এখনো তাঁর নাগাল পায়নি। রূপেন্দ্রনাথকে সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করে বসালেন। নানান কুশল প্রশ্ন করলেন। রোগিণীর কথাও কিছু বললেন। স্থানীয় চিকিৎসক বলেছেন

ব্যাধিটার নাম : মৃগী!

অর্থাৎ মূর্ছারোগ আর কি। বিবাহের পর প্রথম ছয়মাস এ উপসর্গ ছিল না। কুমারী অবস্থায় কখনো হয়নি। প্রথম দিকে দু-তিন মাস পর পর হত ; ইদানীং প্রতি সপ্তাহেই দু-একবার হচ্ছে। রোগের আক্রমণ হলে হাত-পায়ের ক্ষেপণ হয়, জ্ঞান থাকে না, দাঁতে দাঁত লেগে যায়।

সমস্ত বিবরণ শুনে, কী-জাতের চিকিৎসা ইতিপূর্বে হয়েছে জেনে নিয়ে রূপেন্দ্র বললেন, অপরাহ্ণে আমি রোগিণীকে দেখব। তারপর কথা হবে আপনার সঙ্গে।

দত্তজা বলেন, এসে যখন পড়েছেন তখন দু-দশদিন বর্ধমানে থাকুন।

—না, আমি দিন-দুয়েক থাকব। তারপর যাব ত্রিবেণী। সেখান থেকে নবদ্বীপ

নগেন্দ্রনাথ ওঁর সস্ত্রীক তীর্থ পরিক্রমার মনোবাসনা কথা শুনে বললেন, আমার পরামর্শ—সবার আগে সিংহল দ্বীপে যান। সেখানে বাবাকে দেখে চলে যাবেন ভাগীরথীর কিনারে। দক্ষিণ দিক থেকে উজানে চলতে থাকুন—দুপাশে অসংখ্য মন্দির আর তীর্থ। ত্রিবেণী পাবেন, আরও উত্তরে এসে নবদ্বীপ।

রূপেন্দ্র অবাক হয়ে বলেন, সিংহল দ্বীপ! সে তো সাগর-পারে!

—না, না, আমি সেই বিজয়সিংহের সিংহল দ্বীপের কথা বলচিনি। এই দামোদর ধরেই এক রাত দক্ষিণবাগে যেতে হবে। ভোর ভোর পৌঁছাবেন এক বিজন বনে। সেখানে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে এক অনাদি শিবলিঙ্গ। ভারী জাগ্রত দেবতা। হুগলি জেলায়। শুনুন মশাই, একটা দারুণ সুযোগও হয়ে যাচ্ছে। পর্শু এখান থেকে একটা মহাজনী নৌকা যাবে ভারামলপুরে। মন্দির তৈরীর সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে। তাতেই যাতে যেতে পারেন তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

শোনা গেল, ঐ বিজন বনে এই অনাদিলিঙ্গ শিবকে খুঁজে বার করেছে একজন স্থানীয় গোপ. তার নাম মুকুন্দ ঘোষ। কী একটা অলৌকিক সূত্রে—বিস্তারিত জানা নেই নগেন্দ্রনাথের। তবে সেই স্বয়ম্ভূলিঙ্গ শিব নাকি হুগলির এক রাজা—বাহিরগড়ের ক্ষত্রিয় রাজবংশীয় রাজা বরামল্লকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন, বাবার জন্য মন্দির বানিয়ে দিতে। তাতেই এই মহাজনী নৌকায় বোঝাই হয়ে মন্দির নির্মাণের মালমশলা চলেছে সেই অরণ্যে। নগেন্দ্রনাথের মতে, এ এক দৈব যোগাযোগ—না হলে, পথঘাট কিছুই নাই, নবাবিষ্কৃত এই তীর্থ সাধারণ যাত্রীর পক্ষে দুরতিক্রম্য। রূপেন্দ্র স্বীকৃত হলেন।

নগেন্দ্রনাথ পুত্রকে ডেকে বলে দিলেন, ভেষগাচার্য মাত্র দুইদিন বর্ধমানে থাকবেন। ওঁদের দুজনকে যেন স্থানীয় দ্রষ্টব্য সব কিছু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়। পাল্‌কিতে নয়, হেরম্বদাসের পিঠে।

নন্দ চাটুজ্জের মাধ্যমে নগেন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্রনারায়ণের কাছ থেকে ঐ প্রকাণ্ড হাতিটা কিনে নিয়েছেন। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ বলেছিলেন, হাতির মালিক তিনি নন, সোঞাই গ্রামবাসী। তিনি অছি মাত্র—হস্তির খাদ্যের জোগান দেন এবং ব্যবহার করেন। ফলে নগেন্দ্রনাথ নিজ ব্যয়ে সোঞাই গাঁয়ের হাটতলাটি পাকা করে দিয়েছেন। বর্ষার সময় যাতে ব্যাপারী আর খরিদ্দারেরা ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে পারে। একটি সাঁকোও বানিয়ে দিয়েছেন।

সেই মতই ব্যবস্থা হল। হস্তিপৃষ্ঠে নগর পরিদর্শন।

বর্ধমান

বর্ধমান রাজবংশের কথা ইতিপূর্বেও কিছু বলেছি। সঙ্গম রায় কাপুর থেকে কৃষ্ণরায়ের আত্মজা সত্যবতীর আত্মদানের কথা। জনপদটি কিন্তু তার বহু যুগ আগে থেকেই ছিল। কেউ কেউ বলেছেন, এই নামটি জৈন তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীরের নামানুসারে। প্রাচীন জৈন ধর্মগ্রন্থ 'অঙ্গ'-পাঠে জানা যায় যে, ঐ ধর্মপ্রচারক এখানে তাঁর সদ্ধর্ম প্রচার মানসে আগমন করেছিলেন। তখন এখানে আর্যবসতি ছিল না। ঐ গ্রন্থে তাদের বলা হয়েছে 'চুয়াড়'। তারপর আড়াই হাজার বছর কেটে গেছে। বর্ধমান মহাবীরের ধর্মমত এ বঙ্গভূমি থেকে সরে গেছে অনেক অনেকটা দূরে ; কিন্তু 'চুয়াড়'-রা স্বধর্মচ্যুত হয়নি। তারা সমান দাপটে আজও বঙ্গভূমে মস্তানি করে চলেছে!

বর্ধমান মহাবীর ঐ ধর্মগ্রন্থ মতে প্রথমে চুয়াড়দের দ্বারা অপমানিত ও প্রহৃত হন, যদিও শেষে তারা তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করে। সেটা খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর ঘটনা।

কারও মতে গ্রীক ঐতিহাসিক বর্ণিত গঙ্গারিডি রাজ্যের রাজধানী 'পার্থোলিস্' বাস্তবে এই বর্ধমান শহর। সে রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল সপ্তগ্রাম। ইতিহাসে দেখছি, 1574 খ্রীষ্টাব্দে আকবরের সৈন্যদল বর্ধমান-শাসক দাউদ খাঁর পরিজনবর্গকে বন্দী করে আর 1606 খ্রীষ্টাব্দে, আকবরের মৃত্যুর পরের বছর নিহত হন শের আফকন, জগৎবিখ্যাতা সুন্দরী নূরজাহাঁর প্রথম স্বামী। ঐ শের অফকন ও তাঁর কন্যা লাডলি বেগমকে নিয়ে গোটা একটা উপন্যাসই ইতিপূর্বে লিখে ফেলেছি। ফলে সে-সব কথা যাক।

শিবতোষ পিতার আদেশে বর্ধমানের দ্রষ্টব্য সব কিছু ওঁদের ঘুরিয়ে দেখাল। কিন্তু সে-আমলে দেখার মতো ছিলই বা কী? মহারাজার প্রাসাদটাও আকারে অনেক ছোট। বর্তমানে যে প্রাসাদ দেখা যায়, তা পরবর্তীকালের মহারাজ মহাতাবচাঁদের নির্মিত। তিনিই গোলাপবাগে একটি পশুশালা নির্মাণ করেন। লর্ড কার্জনের সম্মানার্থ নির্মিত 'ভারতদ্বার' তোরণ তো আরও পরবর্তী জমানার। সে আমলে অবশ্য ছিল শ্যামসায়র আর কৃষ্ণসায়র দীঘি, আর বর্ধমান শহরের এক ক্রোশ পশ্চিমে, শাহী সড়কের ধারে আর একটি কীর্তি। নবাবহাট গ্রামে একটি দীর্ঘিকা, আর তাকে ঘিরে একশ আট শিবমন্দির। অদূরেই তালিতগড় দুর্গ। আমাদের কাহিনীর কালে বর্ধমানরাজ তিলকচাঁদ বারে বারে ঐ দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিতেন—বর্গীর দল এগিয়ে আসছে সংবাদ পেলেই।

একটা অবান্তর কথা বলি, কিছু মনে কর না:

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে ঐ নবাবহাটের একশ আট শিবমন্দিরে এ গ্রন্থের লেখক সস্ত্রীক কাটিয়ে এসেছিল একটি মধ্যাহ্ন। আমরা খিচুড়ি বানিয়ে খেয়েছিলাম। তখন দেখেছিলাম, ঐ দীঘির জলে স্নান করা মানা, বাসন-পত্র ধোয়া বারণ। দীঘি থেকে শুধু পানীয় জল সংগ্রহ করা যেত। এখন হয়তো নলকূপ বসেছে, পাইপ-লাইনও বসেছে ; কিন্তু এ গ্রন্থের লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সেখানে দেখে এসেছিল সেই ব্যবস্থাটি, যা রূপেন্দ্রনাথ করেছিলেন সোঞাই গাঁয়ে, আড়াইশ বছর আগে, তাঁর একবগ্গা দীঘিতে!

পরদিন সকালে রূপেন্দ্রনাথ বর্ধমান থেকে বিদায় নিলেন। রুগী দেখেছেন, রোগ নির্ণয়ও

১৩৪২

করেছেন। তা নিয়ে কিছু অপ্রিয় আলোচনাও হয়েছে।

নগেন্দ্রনাথ জানতে চেয়েছিলেন, কী বুঝলেন বলুন কোবরেজমশাই, এ অসুখ সারবে?

—সারবে। নিশ্চিত সারবে। ঠিক মতো চিকিৎসা করলে। কিন্তু আপনি কি পারবেন?

—কী বলছেন? পারব না? আমার অসাধ্য কিছু নেই! বলুন, কী করতে হবে?

তখন শিবতোষও উপস্থিত। রূপেন্দ্র তাকে বললেন, তুমি একটু অন্যত্র যাও শিবতোষ; আমি তোমার বাবার সঙ্গে কিছু কথা গোপনে আলোচনা করতে চাই।

শিবতোষ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ায়। নগেন্দ্রনাথ বলেন, না, না, তুই বস।

তারপর রূপেন্দ্রর দিকে ফিরে বলেন, শুনুন কোবরেজমশাই, আমার সময় হয় না আদৌ। সেবা-শুশ্রূষা, ঔষধপত্র দেওয়া, সব করে বধূমাতা আর এই শিবু। আপনার যা বলার আছে অসঙ্কোচে ওর সামনে বলতে পারেন। ওরাই তো সবকিছু করবে।

রূপেন্দ্র বলেন, গোপনীয়তার প্রয়োজনটা আপনার না থাকতে পারে, আমার আছে।

ভ্রূকুঞ্চিত হল নগেন্দ্রনাথের। তাঁর কথার প্রতিবাদ কেউ করে না, করতে সাহস পায় না। সামলে নিয়ে বললেন, ও, আচ্ছা। ঠিক আছে, তুই যা।

শিবতোষ কক্ষত্যাগ করার পর বলেন, এবার বলুন?

—আমি এইমাত্র বলেছি, ঠিক মতো চিকিৎসা করালে ওঁর রোগমুক্তি হবে; কিন্তু চিকিৎসার প্রয়োজন ওঁর নাই। প্রয়োজন আপনার। তাই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম—আপনি কি পারবেন?

নগেন্দ্রনাথ নির্বাক তাকিয়ে রইলেন কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর বললেন, বুঝলাম না।

—আপনার স্ত্রীর অসুখটা দৈহিক নয়, মানসিক। রোগের মূল হেতু—যেহেতু তিনি আপনার কাছে যথাযথ স্ত্রীর মর্যাদা পাচ্ছেন না!

—স্ত্রীর মর্যাদা পাচ্ছে না? কী বলছেন আপনি? সে তো যা চায়, তাই পায়।

—না, পান্ না। নিশ্চয় জানেন, ভেষগাচার্যের কাছে কোন কিছু গোপন করতে নেই। এবার বলুন তো দত্তমশাই—আপনি কতদিন পূর্বে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে এক শয্যায় রাত্রি-যাপন করেছেন? কবে তার স্ত্রীর মর্যাদা শেষ মিটিয়েছেন?

নগেন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করল। বললেন, আপনার স্পর্ধার একটা সীমা থাকবে তো, কোবরেজমশাই! কতদিন আগে আমি স্ত্রীকে নিয়ে এক শয্যায় শয়ন করেছি এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আপনার বাধল না?

—প্রশ্ন করতে আমার যে বাধেনি তা তো দেখতেই পাচ্ছেন, উত্তর দিতেই না বাধছে আপনার? শুনুন, ক্ষুৎপিপাসা-নিদ্রার মতো এও এক জৈবিক প্রবৃত্তি। আমি জানি না, কেন আপনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেছেন, কিন্তু আমার আশঙ্কা আপনার স্ত্রী অক্ষতযোনি!

—চোপরও বেয়াদপ! —গর্জন করে উঠে দাঁড়ান নগেন্দ্রনাথ। পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দুলের মত বার-কতক কক্ষ মধ্যে পায়চারি করে ফিরে এসে ওঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেন, আপনাকে ওর চিকিৎসা করতে হবে না। কী বৈদ্যবিদায় দিতে হবে শুধু বলুন?

রূপেন্দ্রনাথও উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, ভিতরবাড়িতে খবর পাঠান। আমার স্ত্রীকে জিনিসপত্র সমেত বাইরে চলে আসতে বলুন। আমি আপনার দেউড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি।

নগেন্দ্রনাথ হঠাৎ নিবে যান। ওঁর হাতটা ধরে বলেন, আমার অন্যায় হয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না। মানে, আত্মসংযম হারিয়ে.....

—না! কিছু মনে করিনি আমি। আপনি প্রচুর অর্থের মালিক, শিক্ষাদীক্ষা বোধকরি কিছু নেই। ভদ্রভাবে কথাবার্তা বল্‌তে পারবেন না, এ তো প্রত্যাশিত। যা হোক, ভিতরে খবর পাঠান।

—আমি আপনার হাত ধরে ক্ষমা চাইছি, ভেষগাচার্য! ঠিকই বলেছেন আপনি! শিক্ষাদীক্ষা আমার তেমন কিছু হয়নি! বলুন, ক্ষমা করেছেন?

—করেছি।

দুজনেই উপবেশন করেন অতঃপর। নগেন্দ্রনাথ বলেন, এবার বলুন, কী চিকিৎসা করতে চান? ঔষধপত্রের ব্যবস্থা...

—সে-কথা আমি আগেই বলেছি, দত্তমশাই। আপনি আপনার জীবনযাত্রায় পরিবর্তন না করলে আমি তাঁর চিকিৎসা করতে পারব না।

—বেশ বলুন, আমাকে কী করতে হবে?

—মদ্যপান ত্যাগ করতে বলছি না, কিন্তু সন্ধ্যার পর বাগানবাড়ি যাওয়া বন্ধ করতে হবে। সাত দিন ঐ ঔষধই চলবে, অষ্টম দিনে তাঁর কাছে গিয়ে বলতে হবে, এইমাত্র আমাকে যা বললেন—

—বুঝলাম না। কাকে কী বলতে হবে?

—আপনার ধর্মপত্নীকে গিয়ে বলবেন, যা আমাকে এইমাত্র বললেন: 'আমি তোমার হাত ধরে ক্ষমা চাইছি। বল, ক্ষমা করেছ?'

নগেন্দ্রনাথ নতনেত্রে অনেকক্ষণ বসে রইলেন চুপ করে। তারপর বললেন, তাহলেই ও ভাল হয়ে যাবে?

—খুবই সম্ভাবনা। মোট কথা—এটাই একমাত্র চিকিৎসা। আপনার সঙ্গে তাঁর বয়সের যথেষ্ট পার্থক্য। আপনার জীবনযাত্রার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় আছে। বাগানবাড়ি, বাইজী বা উপপত্নীকে আপনি একেবারে ত্যাগ করতে পারবেন বলে মনে হয় না; কিন্তু আপনার স্নেহ, প্রেম, সোহাগ পেলে খুব সম্ভব তাঁর এ মূর্ছা রোগ সেরে যাবে। গেল কি গেল না, আপনি আমাকে জানাবেন। না গেলে, আমি আবার তাঁকে দেখব।

নগেন্দ্রনাথ বললেন, আমি চেষ্টা করব। ক্ষমা যখন করেছেন এবার বলুন, কী বৈদ্যবিদায় দেব?

—না, দত্তমশাই! আমি কপর্দকমাত্র নিতে পারব না এখন।

—কেন?

—আমাকে বৈদ্যবিদায় দেবার অধিকার আপনাকে অর্জন করতে হবে। আমি যে ব্যবস্থা দিয়ে গেলাম তা যদি যথাযথ পালন করতে পারেন, আপনার ধর্মপত্নীকে সুস্থ করতে পারেন তখনই আমি আপনার কাছ থেকে হাত পেতে কিছু নিতে পারব!

—কিন্তু বৈদ্যের পরামর্শ নিয়ে বৈদ্যবিদায় না দিলে যে নরকদর্শন করতে হয়।

—জানি! অন্তত সেই ভয়েই যদি আপনি আপনার জীবনযাত্রার ছকটা পাল্টাতে পারেন

1742

তাহলেই আমি আনন্দিত। আমার বৈদ্যবিদায় প্রত্যাখ্যান করার সেটাও একটা হেতু।

নগেন্দ্রনাথ অধোবদন হলেন। একথার জবাব নেই।

ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন নগেন্দ্রনাথ। সন্ধ্যারাত্রে রওনা হয়ে ভোর-ভোর ওঁরা এসে পৌঁছালেন ভারামলপুরের রামীধোপানির ঘাটে। ইট-পাথরে বোঝাই মহাজনী নৌকা। মাঝি-মাল্লা ছাড়া যাত্রী ওঁরা মাত্র দুজনই। নৌকা যে ঘাটে ভিড়ল সেখানে জনমানব নেই। তখনও ভাল করে সকাল হয়নি। গাছ-গাছালিতে পাখ্-পাখালির কলরব। গাছ, গাছ আর গাছ, একখানা খড়োঘরও নজরে পড়ে না। এ অঞ্চলে যে মনুষ্যবসতি আছে তারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। পশ্চিমা মাঝি বললে, শিউজীকী দর্শন করনেকে লিয়ে যাইবন তো, ঠাকুর মোশা? বহ্ সড়ক পাকড়কে সিধা যাইয়ে। নজদিগই হ্যয়।

সড়ক কোথায়? ওড়কলমি, শেয়ালকাঁটা আর কচুঝোপের মাঝখান দিয়ে একটা পায়ে-চলা পথ। দুটি মানুষ পাশাপাশি হাঁটতে পারে না। আগুপিছু চলতে হয়। দুপাশে নাম-না-জানা হাজার গাছ। মাঝে-মাঝে কিছু-কিছু চেনা গাছ: বাব্‌লা, পালতে-মাদার, ছাতিম, পাকুড়। আগাছায় ভরা। সকালের রোদ এখনো সে বনভূমির কপালে সোনার জিওনকাঠি ছোঁয়ায়নি। ঘুম-কাতুরে বনানীর শীতের ঘুম এখনও ভাঙেনি। মাঝে মাঝে কুয়াশার গলাবন্ধ জড়ানো তার গলায়।

মঞ্জরী সভয়ে জিজ্ঞাসা করে, মানুষজনের বাস আছে তো এখানে?

প্রশ্নটা সে মাঝিকে করেনি, করেছিল রূপেন্দ্রনাথকে; কিন্তু বুড়ামাঝি শুনে ফেলেছে। সেই জবাব দিল, ডরিয়ে মৎ মা-জী, ইখানে চৌর-ডাকাত ইয়া শের না আছে।

তারপর রূপেন্দ্রনাথের দিকে ফিরে বললে, আপকো সামান হিঁয়া রহ্‌নে দিজিয়ে। বে-ফিকর রহিয়ে সমানকা বারে-মে। যাইয়ে, দর্শন তো কর্ লিজিয়ে পহিলে।

বুঝিয়ে বলল, সব মাল 'ঢোলাই' করতে, অর্থাৎ নৌকা থেকে নামিয়ে ঘাটে থাক দিয়ে সাজাতে ওদের একটি বেলা যাবে। তার ভিতর একজন যাবে গো-গাড়ি যোগাড় করতে। উল্‌টি-বখৎ গো-গাড়ির সারি বাবার থানে চলতে শুরু করবে।

সহধর্মিণীর হাত ধরে রূপেন্দ্রনাথ হিম-হিম ঘাটে নামলেন। বনপথ ধরে এগিয়ে চলেন। পাঁচকদম এগিয়েই প্রবেশ করলেন, যাকে বলে নিবিড়-অরণ্যে। শুধু গাছ আর গাছ। এবার বড় বড় গাছ। তবে কুমারী মেয়ের সিঁথির মতো বনপথের নিশানাটা বজায় আছে। জনবসতি নিশ্চয় আছে, এই বনপথই তো তার প্রমাণ। পথচলতি মানুষের নিত্যমার্জনা না থাকলে বনলক্ষ্মীর এই সিঁথিটি বজায় থাকত না। পাগলের উস্‌কো-খুস্‌কো চুলের মতো সে চিহ্নটি হারিয়ে যেত।

অদ্ভুত একটা গন্ধ—আরণ্যক-সৌরভ। গাছ-গাছালির। ডালে-ডালে অসংখ্য পাখির কিচ্‌কিচানি। ডালে মৌচাক। মৌমাছির একটানা ভোঁ-ওও! ফাল্গুন মাস। প্রকৃতিতে এখন

মিলনের মহোৎসব। মাঝে একজোড়া ধূসর রঙের খরগোশ আগাছা জঙ্গল ভেদ করে ছুটে বেরিয়ে এল বনপথে। ওঁদেব দুজনাকে দেখে হঠাৎ ভ্যাবাচাকা। তার পরেই ছুট-ছুট-ছুট।

ক্রোশখানেক পথ পাড়ি দেবার পর গাছের দৌরাত্ম্য কমে এল। একটু যেন ফাঁকা-ফাঁকা—বড় বড় উলুঘাসের বন। তারপর বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল দুচারটি খড়ো চালা। জনবসতির লক্ষণ। দূর থেকেই নজরে পড়ল, কোন কোন গৃহস্থ বাড়ির ভিতর থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরিয়ে এসেছে। এই সাত-সকালে কুয়াশার সঙ্গে জট পাকিয়ে ফেলেছে।

ছোট্ট একটি ঝিমন্ত গ্রাম। সবই খড়ো চালা। উলুখড়ের। বাঙলা-চালা। মানে, ছাদের ছাউনি ধনুকের আকারে নকশা রচনা করেছে বাঁশ বা নারকেল খুঁটির মাথায়। দু-একটি গরু নজরে পড়ল। গো-গাড়ির ভাঙা চাকা। বিচালির গাদা।

মেঠো দাওয়ায় নাকে-গামছা, উদাম-গা একজন প্রৌঢ় মানুষ ঝাঁটা বুলাচ্ছিল। ওঁদের আসতে দেখে ঝাঁটাগাছ নামিয়ে টান-টান হয়ে দাঁড়ায়। অবাক মানে। এ জাতীয় বেগানা লোক দেখতে অভ্যস্ত নয় মনে হল।

রূপেন্দ্রনাথ বলেন, বাবার থান আর কতদূরে?

মুণ্ডিতমস্তক আর শিখাতেই পরিচয়। প্রৌঢ় লোকটা ঝুঁকে পড়ে বললে, পেন্নাম ঠাউরমশাই, কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

—বর্ধমান। বাবার থান কতদূরে বলতে পারেন? এখানে সম্প্রতি যে অনাদি শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছে.....

প্রৌঢ় ওঁর ভ্রম সংশোধন করে দেয়, 'অনাদি' লয় বাবা, তাঁর নাম তারকেশ্বর। তা সেই তাঁরে দেখতি বধ্যমান থিকে আসিছেন। এ তো বড় আজব কতা!

রূপেন্দ্র বলেন, অনাদি শিবলিঙ্গ নয়? ভাস্কর নির্মিত?

গলকণ্ঠটা বারকতক ওঠা-নামা করল। যুক্তকরে নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল কয়েকটা মুহূর্ত। শেষে বললে, মুই মুখ্যু গোয়ালার পো—নেতাই ঘোষ, আজ্ঞে। আপনকার কতা মুই বুঝতে লারছি ঠাকুরমশা! তা ডেঁড়িয়ে কেন মা? অনেকটা পথ এয়েছেন, বসেন।

দাওয়ার সামনেই একটা বাঁশের মাচা। ভরাট-বাঁশের ছয়-খুঁটির উপর তলতা-বাঁশের ঘননিবদ্ধ সারি। প্রৌঢ় তার গামছাটা দিয়ে সেটা মুছে দিল। ধুলো ছিল না, কিন্তু হিমে ভিজে-ভিজে ছিল।

দুজনেই বসলেন। কথাটা সত্যি। রূপেন্দ্র অভ্যস্ত হলেও মঞ্জরীর পক্ষে একটু জিরিয়ে নিতে পারলে মন্দ হয় না। রূপেন্দ্র বলেন, আপনি এটাকে 'আজব কথা' বললেন কেন? তীর্থদর্শনে কি ভিন্‌দেশের মানুষজন আসে না?

—হক্কতা! আসে! নিয্যস আসে। কিন্তুক এই ভার্মালপুর কি তীর্থস্তান আজ্ঞে? এ তো মুকুন্দ-খুড়োর এক নিপাট খ্যাপামি! দিব্যি সংসারি মনিষ্যি, তিনজোড়া দুধেল গাই, দিনে আধমনটাক দুধ হতেন—দ্যাখ-না-দ্যাখ্ বদ্দ পাগল হই গেল!

—কার কথা বলছেন? মুকুন্দ কে?

—দ্যাখবান অখনই। এই বাবার থানেই পড়ি আছে। রাতেও ভিটেয় আসে না! গেল সনের বর্ষায় চালাটা হুমড়ি খায়ি পড়ি গ্যালো। ভুরুক্ষেপ নাই।

হয়তো লোকটা আরও কিছু বলত। বাধা পড়ল। ঘরের ভিতর থেকে এগিয়ে এল এক প্রৌঢ়া। লালপাড় মলিন শাড়ি। হাতে শাঁখা, নোয়া। মুখটা দেখা যায় না। ঘোমটায় ঢাকা। দু-হাতে ধরা আছে একটা কাঁসার থালা। তার উপর দু-ঘটি গরম দুধ। দুটি শালপাতায় দু-টুক্‌রো খেজুড় গুড়।

—এ আবার কী?

—গোয়ালা-মনিষ্যি আজ্ঞে। আর কী-করি বামুনসেবা করি কন?

প্রৌঢ়া ফিস্-ফিস্ করে মঞ্জরীকে প্রশ্ন করে, ইখান থনে কই যাবেন?

মঞ্জরী বলে, ত্রিবেণী।

নৌকাতেই গায়ত্রীজপ সেরে নিয়েছেন। রূপেন্দ্র ইতস্তত করলেন না। নিতাই ঘোষের ব্রাহ্মণসেবায় অন্তরায় হলেন না। এক হিসাবে ভালই হল। এখানে দোকানপাট তো কিছু নজরে পড়ছে না। সারা দিনে কী জুটবে, আদৌ জুটবে কিনা, তা বাবা তারকেশ্বরই জানেন।

প্রৌঢ়ের কাছে আরও কিছু সংবাদ পাওয়া গেল। শিবলিঙ্গটি আবিষ্কৃত হয়েছে কয়েক বছর আগে। আকৃতি শিবলিঙ্গের মতো নয়। ধরিত্রীর মাতৃগর্ভ থেকে শিশু ভোলানাথ হঠাৎ মাথা তুলে ঐ আরণ্যক শোভাকে দেখতে চেয়েছিলেন। বিজন অরণ্য তো? কেই বা ওঁকে লক্ষ্য করছে? ভেবেছিলেন টুক করে এক নজর দেখেই ধরিত্রীমায়ের পেট-কোঁচড়ে লুকিয়ে পড়বেন। কিন্তু তা হল না। জগৎটাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি! ব্যথিতও! তাঁর ভক্তদের কত দুঃখ, কত কষ্ট! বাবা বজ্রাহত হয়ে পাষাণ হয়ে গেলেন। নিটোল কষ্টিপাথর। না, নিটোল নয়, মাথায় একটা গর্ত মতো আছে। কেউ বলে, দশ-বিশ পুরুষ আগে জায়গাটা এমন বিজন অরণ্য ছিল না। এখানে ছিল এক গোপভূম। গাঁয়ের মেয়েরা ঐ পাথরখানির উপরে ধান ভানতো, গান গেয়ে-গেয়ে। তাতেই হয়েছে ঐ গর্ত।

মুকুন্দ খুড়ো অবশ্য সে কথা মানে না। বলে, সমুদ্রমন্থনকালে বাবা যখন দেবতাদের বাঁচাতে হলাহলের পাত্রটা এক চুমুকে খেয়ে ফেলেছিলেন—'সেই যে গ, যখন তেনার গলকণ্ঠটি নীলবরণ হয়ি গেল'—তখন বারেকের জন্য তাঁর মাথা ঘুরে ওঠে। টাল সামলাতে পারেন না। মন্দারের পাথরে—'মন্দার'বুঝলে তো হে? সেই যি পাহাড়টো মন্থনদণ্ড হইছিল, তারই গায়ে আছাড়ি পড়িছিলেন। ওটি সেই টক্করের দাগ! বুয়েছ?'

জঙ্গলের মাঝখানে অনেকটা জায়গা হাঁসিল করা হয়েছে। বড় বড় গাছ কেটে নামানো হয়েছে; আগাছা কেটে সাফা করা। প্রায় বিশ হাত চওড়া, পঞ্চাশ হাত লম্বা। তার মাঝখানে ঐ কালো পাথরের মেদিনীবিদীর্ণ কৌতূহল—ভূতাত্ত্বিকের ভাষায় 'আউটক্রপ'। পাথরখানির চারদিকে খুঁটি—বাঁশ আর আধলা তাল। তার উপর শুক্‌নো ডালপালার একটা আচ্ছাদন—রৌদ্রনিবারণ মানসে। অদূরে প্রকাণ্ড একটা বেল গাছ। পাথরটা ঘিরে আকন্দের জঙ্গল—অজস্র ফুল ফুটে আছে। বেলগাছতলায় বসে আছেন একজন সন্ন্যাসী। বয়স আন্দাজ করা শক্ত—তিন কুড়ি নির্ঘাৎ পাড়ি দিয়েছেন। উদাম গা—বুকের লোম পর্যন্ত সাদা, চুল-দাড়ি তো বটেই। নিম্নাঙ্গে একটি কৌপীন। আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছিলেন মাটিতে; দূর থেকে ওঁদের দেখতে পেয়েই চমকে উবু হয়ে উঠে বসেন। ডান হাতখানা ভ্রূর উপর রোদ্-আড়াল করা ভঙ্গিতে ধরে একদৃষ্টে লক্ষ্য করতে থাকেন। কাছাকাছি এসে রূপেন্দ্রনাথ যুক্তকরে কিছু বলার

আগেই সন্ন্যাসী বলে ওঠেন, আসুন রাজামশাই! এত দেরী হল যে?

ওঁরা স্বামীস্ত্রী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দেখেন। রূপেন্দ্রনাথের জীবনে এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে, কিন্তু সেবার প্রশ্নকর্ত্রী ছিল বিকারগ্রস্তা—এ তো তা নয়। বললেন, আমার কি আরও আগে আসার কথা ছিল?

—ছিল নি? এক মাস হয়ি গেল! বাবা বলিছিলেন,—হপ্তাখানেকের ভিৎরিই আসপেন!

এই বৃদ্ধের পিতৃদেব জীবিত? তিনি ওঁকে এমন একটা আজব প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন! বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ নাকি এটা?

বৃদ্ধ পুনরায় বলেন, আপ্নে বরা-আজা বটে তো?

—আজ্ঞে না, আমি আসছি বর্ধমান থেকে। আমার নাম শ্রী রূপেন্দ্রনাথ দেবশর্মা!

বৃদ্ধ নিরাশ হলেন। আবার পা-বিছিয়ে বসলেন। বললেন, অ! দামোদর বেয়ে আলেন নিচ্চয়—বাহিরগড়ের বরা-আজার নাওটা দেখিছেন গাঙে?

এবার বুঝতে পারেন—'বরা-আজা' বলতে উনি ভারামল্ল বা বরাহমল্ল রাজার কথা বলছেন। এবার জানান যে, সেই বরাহমল্ল রাজার একটি প্রকাণ্ড মহাজনী নৌকা আজ সকালেই এসে ভিড়েছে রামীধোপানির ঘাটে। সেটা ইট-পাথরে বোঝাই, উনি সেই নৌকাতেই এসেছেন বটে।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন। হঠাৎ ওঁদের দিকে পিছন ফিরে ঐ নিকষ-কালো পাথরখানাকে সম্বোধন করে বলে ওঠেন, তবে তো ছলনা করিস্‌নি বাবা! ইট-পাথর তো এয়েছে! এবার তোর মন্দির হয়ি যাবে!

তারপর হঠাৎ উবুড় হয়ে পাথরখানার কানে-কানে যেন বলেন, তা হ্যাঁরে, মন্দির হয়ি গেলি তার একটেরে মোরে ঠাঁই দিবি তো? আম্মো তো তোরই মতো রোদে জলে পড়ি আছি? বল্। হক কতা কি না?

প্রায় একটি বেলা গেল ঐ অর্ধোন্মাদের কাছ থেকে প্রকৃত তথ্যটা উদ্ধার করতে। উন্মাদ উনি নিশ্চয়ই, তবে ঐ—যাকে বলে 'ভাবের ঘরে পাগল'। সমকালীন আর এক 'মন-মাতাল' পাগলকে যেমন 'মদ-মাতালেরা' 'পাগল' বলে! উনি আদৌ সন্ন্যাসী নন, এই বিজন জঙ্গলে কে ওঁকে সন্ন্যাস দেবে, মন্ত্রদীক্ষা দেবে? তাই পূর্বাশ্রমের অভিধাতেই ওঁর পরিচয়: মুকুন্দরাম ঘোষ।

সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন একদিন। নিতাই ঘোষ ভুল বলেনি কিছু। তিন-জোড়া দুধেলা গাই—দৈনিক আধমনটাক দুধ 'হতেন'। একা মানুষের সংসার; স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে অনেক দিন। দুটি কন্যার বিবাহ দিয়েছেন। পুত্রটি ছিল লাঠি খেলায় ওস্তাদ—সে রাজসরকারের পাইক। তবু একদিন ছেলে ফিরে আসবে এই আশা বুকে নিয়েই বৃদ্ধ পড়েছিলেন ভিটে আঁকড়ে। দুধ বেচে কপর্দক সঞ্চয় করতেন। কড়ি-কড়ি-কপর্দক-সিক্কাটাকা! মাটির হাঁড়িতে পুঁতে রাখতেন ঘরের মেঝেতে গর্ত করে। দুটি রাখাল কিশোর গো-মাতাদের দেখভাল করত। বৃদ্ধ তখনো কর্মক্ষম। বাঁকে ঝুলিয়ে দুধটা বেচে দিয়ে আসতেন নিকটবর্তী ভারামলপুরের সম্পন্ন গৃহস্থবাড়িতে। তারপর একটা অদ্ভুত ঘটনা! রাতারাতি দুধের যোগান হয়ে গেল আধাআধি। কী ব্যাপার? রাখাল সহকারী দুজনে জানালো, কপিলার দুধ বেমক্কা 'থমকে গেছে'!

কপিলা ওঁর সবচেয়ে ভালো জাতের গাই। একাই দিনে দশসের দুধ দেয়। সদ্য সন্তানবতী সে। দেখ্-না-দেখ তার বাঁটের দুধ 'থমকে যাবে' কেন? মুকুন্দরাম প্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে এলেন—রাখাল কিশোর দুটি দুধ চুরি করছে। গোপনে বেচে দিয়ে আসছে অন্য কোনও ঘোষের-পোকে। কিন্তু ছেলে দুটি দীর্ঘদিন আছে ওঁর কাছে। এ জাতীয় তঞ্চকতা কখনো করেনি। বিশ্বাস করতে মন চায় না। সরেজমিন তদন্ত করবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

গাঙের কিনার ঘেঁষে বিস্তীর্ণ গোচারণভূমি। জমিদারের খাশ লাখেরাজ। চাষ করা বারণ। গো-চারণ ক্ষেত্র। পাঁচ ঘোষের-পো তাদের গো-মাতাগুলিকে সকাল বেলা ছেড়ে দিয়ে আসে সেই গোচারণ ভূমিতে। বাছুরদের মুখে জাল-বাঁধা। শাঁখে-ফুঁ-পড়া সন্ধ্যায় সার বেঁধে নিজে-নিজেই ফিরে আসে গরুর পাল—ঐ যাকে বলে গোধূলি লগ্নে। এ জঙ্গলে শেয়াল আছে, খটাশ আছে, কিন্তু দিনের বেলা যূথবদ্ধ গরুর পালকে তারা আক্রমণ করতে সাহস পায় না।

মুকুন্দরাম সেদিন তক্কে-তক্কে থাকলেন। দেখলেন, সূর্য পশ্চিম দিগ্বলয়ের দিকে ঢলে পড়তেই কপিলা দলছুট হয়ে গেল। ঢুকে পড়ল জঙ্গলের ভিতর। প্রায় পঞ্চাশ হাত ব্যবধানে মুকুন্দও অনুসরণ করলেন তাকে। কাঠুরিয়াদের যাতায়াতে যে বনপথের সৃষ্টি হয়েছে সে পথ ধরে কপিলা বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়ে গেল। কিন্তু তারপর হঠাৎ বেমক্কা ঢুকে পড়ল এক নিবিড় অরণ্যে। গিয়ে থামল একখানা কালো কষ্টিপাথরের উপর। স্থির হয়ে দাঁড়ালো। তারপর ঊর্ধ্বমুখে ডাক দিল: হা—ম্বা—!

ঠিক যে স্বরে সে ডাকে তার বাছুরকে। কিন্তু কী আশ্চর্য? কপিলার বক্না-বাছুর মুংলি তো এ দিগড়ে নেই। 'তাইলে ও ডাকে কারে'? প্রায় বিশ হাত দূরে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে চুপিসারে লক্ষ্য করছিলেন মুকুন্দরাম: দ্যাখাই যাক্, ব্যাবারডা কোন বাগে ডাঁড়ায়!

যা 'ডাঁড়ালো' তাতে তাঁর সারাদেহের রোমকূপও 'ডাঁড়িয়ে' ওঠে।

কপিলের ঐ স্তনভারনম্র আহ্বান শুনে বেল গাছের মগডাল থেকে নেমে এল এক-জোড়া গোক্ষুর সাপ। ফণায় তাদের খড়মের চিহ্ন। লিক্লিক করছে চেরা জিব! মুকুন্দরাম ঘোষের পো; গোরুর হক্-হদিস তাঁর নখদর্পণে। অথচ কী আশ্চর্য! কপিলা না দিল দৌড়, না করল ফোঁস-ফোঁস।

একটা কালনাগ পাকে-পাকে জড়িয়ে ধরল তার পিছনের ঠ্যাঙ জোড়া, বাঙলা '৪'-অঙ্কের নক্শা ছকে। কপিলা কোন প্রতিবাদ করল না, স্থির হয়ে রইল। আর নাগিনী পাকে-পাকে জড়িয়ে ধরে তার পালান। নিষ্পেষণ করতে থাকে ওর অমৃতরসভাণ্ডার। ফিন্‌কি দিয়ে দুধ বার হয়ে এল বাঁট থেকে, যেন পিচকারি! কালো কষ্টিপাথরখানা হয়ে গেল শ্বেতপাথর।

দুগ্ধভাণ্ডার নিঃশেষিত হয়ে যাবার পর নাগদম্পতি মুক্তি দিল কপিলাকে। রুদ্ধশ্বাসে কপিলা দৌড়ালো তার বাথানপানে। মুকুন্দরাম অপেক্ষা করলেন, সম্ঝে নিতে চান—নাগদম্পতি এরপর কী করে।

দেখলেন, শ্রাবণের ধারার মতো দুগ্ধস্রোত সর্পিল গতিতে এসে সঞ্চিত হল একটি প্রাকৃতিক গর্তে। নাগ-নাগিনী সেই ডোবা থেকে মুখ ডুবিয়ে যেন বাবার চরণামৃত পান করল।

মুকুন্দরাম ফিরে এলেন ভিটেতে। তখন আঁধার ঘনিয়েছে। প্রত্যক্ষ সত্যকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। এমনটা কী করে হয়?

তারকেশ্বর

সে-রাত্রেই স্বপ্নাদেশ পেলেন। বাবা ওকে ডাকছেন। সেই বিচিত্র আহ্বান, যা কয়েক দশক বাদে শুনবেন লালাবাবু—পাইকপাড়ার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ: 'বেলা যে যায় রে! বাস্‌নায় আগুন দিবি না?'

যদি বল—'পাগল', তবে তাই। মুকুন্দরাম ঘোষ সন্ন্যাস নেননি। তবে সংসার ত্যাগ করেছিলেন। কপনিসার সাধক বাকি জীবন কাটিয়ে গেছেন সেই বেলগাছ তলায়। কী শীত, কী গ্রীষ্ম, কী বর্ষা। শুরু করে দিলেন নির্জন সাধনা। গুরু? ঐ তো—ঐ কালো পাথরখানা। ধরিত্রীর গর্ভ থেকে মুখ-বার-করা ঐ শিশু ভোলানাথ। তিনি যা স্বপ্নাদেশ দেন তাই শোনেন, যেভাবে চালান সেভাবেই চলেন। এক হাতে বনজঙ্গল সাফা করে বাবার মাথায় বেঁধে দিলেন লতাপাতার একচালা: আহা! রোদে-জলে তোর বড় কষ্ট।

বাবা স্বপ্নে দেখা দিলেন। বলেন, তোরও তো বড় কষ্ট যাচ্ছে, মুকুন্দ! র, বরা-রাজাকে বলে দিচ্ছি, একখান পাকা ঘর বানিয়ে দিতে। বাপ-বেটায় থাকব।

সত্যই স্বপ্নাদেশ পেলেন হুগলীজেলার বাহিরগড়ের ক্ষত্রিয় নৃপতি বরাহমল্ল। লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখতে চাইলেন—স্বপ্নে যা প্রত্যক্ষ করেছেন তা কি বাস্তব? এল রাজার লোক, খোঁজ-খবর নিয়ে ফিরে গিয়ে জানালো রামীধোপানির ঘাটের কয়েক রসি দূরে সত্যই বসে আছে এক নেংটিসার পাগলা সাধু। বেলগাছ তলায়। আর একখণ্ড কালো-পাথরের উপর বেঁধেছে লতাপাতার এক চালা।

রাজার প্রতিভূ এসে মুকুন্দরামকে জানিয়ে গেল অচিরেই মন্দির বানানো হবে; রাজামশাই রানীমাকে নিয়ে স্বয়ং আসবেন তীর্থদর্শনে। তাই রূপেন্দ্র আর মঞ্জরীকে দেখে ওঁর ধারণা হয়েছিল—ওঁরাই বুঝি সেই রাজারানী।

'আজা-আনির মতোই সোন্দর তো! তাই ভেরম হই গেল, আজ্ঞে!'

• •

আড়াই শ বছর কেটে গেছে তারপর। সহস্রাব্দীর এক পাদ। আমূল বদলে গেছে সব কিছু। শুধু বাস্তবে নয়, মানচিত্রেও আজ খুঁজে পাবে না ভারামলপুর গাঁ-খানি। এখন ওর নাম তারকেশ্বর। নিবিড় অরণ্যানী নিশ্চিহ্ন। রামীধোপানি ঘাটও এক গলা ঘোমটা টেনে সরে গেছে অন্যত্র। গাঙই যে দেশান্তরী, তা ঘাট পড়ে থাকবে কোন সুবাদে? দামোদর-নদের সাথেই না বাঁধা ছিল ঘাট, অচ্ছেদ্যবন্ধনে? কানা-দামোদর—তার যে ক্ষীণ রেখাটুকু ঐ অভিধা বহন করে—তা সরে গেছে ভিন্‌-দেশে। মরাগাঙের অশ্বখুর দহগুলো ভরাট হয়ে গেছে; সেখানে উঠেছে শালখুঁটির বনিয়াদ-নির্ভর দ্বিতল-ত্রিতল মোকাম। খুঁজলে এখন সেখানে সন্ধান পাবে ভি· ডি· ও ক্যাসেট পার্লার।

বাঙলা মায়ের আঁচলের খুঁট খুলে আচমকা ভেসে গেল—চন্দ্রনাথ; একমুঠো ধুতরো ফুলের মতো। আজ তাই মায়ের এই পুব-আঁচলে তারকেশ্বরই শ্রেষ্ঠ শৈবতীর্থ।

কিন্তু সব কিছু হারায়নি। হারায় না। খোঁজ নিলে দেখতে পাবে মন্দিরের গা-সইসই সেই পাগলা সাধুর সমাধি: 'মুকুন্দ ঘোষের থান'। দুধ-পুকুরটাও আছে—এখন তাতে বাঁধানো ঘাট—সেই যে ডোবাটায় সেকালে সঞ্চিত হত কপিলার স্বতঃ-উৎসারিত অমৃতরস। তাই তো ওর নাম—'দুধপুকুর'।

আরও একটি জিনিস খোয়া যায়নি এই আড়াই শ' বছরে—মানুষের ধর্মবিশ্বাস। মুকুন্দ ঘোষের মতোই কাঁধ থেকে বাঁকে ঝুলিয়ে বিশ্বাসবারি নিয়ে চলেছে নিরন্ন মানুষের মিছিল: 'ভোলেবাবা পার করে গা'।

তোমাদের 'গপ্পো' শুনিয়েছি, কিন্তু আপনাদের কাছে কিছু কৈফিয়ৎ দেবার আছে।

হুগলী জেলার প্রামাণিক ইতিহাস রচয়িতা সুধীরকুমার মিত্র মশায়ের মতে তারকেশ্বরের মঠের প্রতিষ্ঠা হয় 1729 খ্রীষ্টাব্দে। তার পূর্বেও হয়তো এখানে কোন শৈবমন্দির ছিল; কারণ তারকনাথের মন্দিরের ভিতর একটি প্রস্তরখণ্ডে খোদাই করা আছে—'শুভমস্তু শকাব্দ ১৫৪৩'—অর্থাৎ 1621 খ্রীষ্টাব্দ। সম্ভবত নিকটবর্তী কোন মন্দির থেকে ঐ পাথরটি সংগৃহীত। মিত্র-মশাই বলছেন, 'মুকুন্দ ঘোষ হতেই তারকনাথের প্রথম প্রকাশ'; 'বালিগড়ি পরগণার রাজা ভারামল্ল তারকনাথের প্রথম মন্দির নির্মাণ করে দেন এবং দেবতাব সেবাব জন্য এক হাজার তেইশ বিঘা জমি দান করেন।'

ভূসম্পত্তি! ভক্তদের দান! অন্নদামঙ্গলের সেই ভিক্ষাজীবী ভবঘুরেটা না তার সঙ্গিনীকে বলেছিল—'সাধ হয় একদিন পেট পুরে খাই'? সেই সর্বত্যাগী শিবের সম্পত্তি ক্রমে হয়ে উঠল কুবের-ঈর্ষিত। গুটি গুটি এসে জুটলেন মোহান্ত বাবাজীরা। মুকুন্দ ঘোষের দেহান্তের পরে এসে জাঁকিয়ে বসলেন দশনামী সম্প্রদায়ের গিরি উপাধিকারী সন্ন্যাসীরা। তাঁদের 'শৈবমঠ' বিবরণে আছে—'স্থাপিত প্রধান গদী শ্রীতারকেশ্বরে। মল্লের ভূভাগ রাজ্য খণ্ড খণ্ড করে।।'

লেখা নেই, 'প্রধান গদী' প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেই ভারতচন্দ্র-বর্ণিত ভবঘুরেটা তার জীবনসঙ্গিনী 'অন্নরিক্তা'র হাত ধরে কোন পথে নিরুদ্দেশ যাত্রা করল ভিক্ষার সন্ধানে।

সহদেব গোস্বামী বিরচিত 'ধর্মমঙ্গল' পুঁথিতে আছে আর একটি কৌতুককর বার্তা। রাজ বরাহমল্ল প্রথমবার স্বপ্নাদেশ পেয়ে এবং সরেজমিনে তদন্ত করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ঐ কষ্টিপাথরখানি এই বিজন অরণ্য থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবেন। নিজ রাজধানী রামনগরে তাঁবে প্রতিষ্ঠা করে এক মন্দির নির্মাণ করবেন। রাজাদেশে এল শ্রমিকদল। পঞ্চাশ হাত মাটি খুঁড়েও তারা বাবার তলদেশের সন্ধান পায়নি। কেন পায়নি তার যে ব্যাখ্যা সহদেব গোস্বামী দিয়েছেন—তার সঙ্গে ভূতত্ত্ববিজ্ঞান-এর সম্পর্ক নেই। 'জিওলজিকাল আউট-ক্রপের তলদেশের সন্ধান যে ওভাবে পাওয়ার নয় এ-কথা বলেননি। বরং বলেছেন—রাজা বরাহমল্ল পুনরায় স্বপ্নাদেশ পেলেন।' বাবা বলছেনঃ

তারকেশ্বর শিব আমি কাননে বসতি।
অবনী ভেদিয়া বাছা আমার উৎপতি।।
অকারণ দুঃখ পায়া মোরে কেন খোঁড়?
গয়া-গঙ্গা-বারাণসী আদি মোর জড়।।

রাজা বরাহমল্লের আদিম মন্দির ভগ্ন হলে বর্ধমানের মহারাজা সে মন্দির পুনর্নির্মাণ কে দেন। কিন্তু সে মন্দিরটিও আয়তনে ছোট বলে যাত্রীদের অসুবিধা হত। তাই অষ্টাদশ শতাব্দী শেষার্ধে তারকনাথের স্বপ্নাদেশ পেয়ে পাতুল সন্ধিপুর নিবাসী গোবর্ধন রক্ষিত বর্তমান আটচাল শৈলীর' বৃহদায়তন মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন।

মন্দিরের প্রবেশ পথের স্তম্ভ এবং খিলনত্রয়ী অলঙ্কৃত—নানান পৌরাণিক দৃশ্য, পুষ্পস্তবক ও নক্‌শা। আটচালা মন্দিরের কমনীয় বক্রাকৃতি নয়নাভিরাম। কিন্তু সংস্কারের নামে মাঝে মাঝে আধুনিক প্রয়োগকৌশলের প্রবণতা এ-কালীন স্থপতিবিদদের বিপথে পরিচালিত করেছে। মন্দিরের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে চুনবালির আস্তরের উপর ফুল-ফোটানোর প্রচেষ্টায় আদিম পোড়ামাটি-অলঙ্করণের মুখখানি ম্লান হয়ে গেছে। সব চেয়ে দাগা দেয় মন্দিরের নিচের অংশে মানুষভর উচ্চতায় চীনামাটির রঙিন টালি। এই 'বেলবটম' পোশাকে মন্দিরের সৌন্দর্যহানি হয়েছে। বালুচরী শাড়ির সঙ্গে 'ম্যাচ' করেনা 'স্লিভলেস জ্যাকেট'! এ যেন রতনচূড়ের গা-ঘেঁষে ডিজিটাল ঘড়ি অথবা নবরত্নের টায়রা-পরা সীমন্তিনীর 'বয়েজকাট' কেশবিন্যাস!

মন্দিরের সমুখে নাটমন্দিরটি তৈরী করে দেন চিন্তামণি দে—1801 খ্রীষ্টাব্দে। ইতিমধ্যে শিবের পাশাপাশি নির্মিত হয়েছে প্রত্যাশিত শক্তিমন্দির: দশভুজা, চতুর্ভুজা। কায়েমী স্বার্থ ততদিনে সব কিছু কব্জা করে ফেলেছে। বিশ্বাসপ্রবণ যাত্রীদের মাথায় হাত বুলিয়ে এবং সেই মস্তকেই পনস বিদীর্ণ করে লুটে-পুটে খাবার আয়োজন: 'এখানে পেন্নাম কর—পয়সা দাও; ওখানে ফুল ফেল,—পয়সা দাও; সেখানে চরণামৃত পান কর—পয়সা দাও।' পূজাবিধি নানান প্রকার, ভক্তি-সঙ্গীতে নানান সুর-তান-লয়; কিন্তু মূল ধুয়োটা অপরিবর্তিত: 'পয়সা দাও'!

এল অর্থলোলুপতার অনিবার্য অনুষঙ্গ: কামবিকার! মোহান্ত মহারাজদের কৃপায় অবলুপ্ত হল মুকুন্দ ঘোষের সেই আদিম স্বপ্নটা। এক সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা মহাসন্ন্যাসী প্রণবানন্দ মহারাজজীর কাছে। গৃহী ও সন্ন্যাসী 'পরস্পরং ভাবয়ন্ত মন্ত্রে' দীক্ষিত হয়ে সে পাপ মোচন করেছিলেন।

তারকেশ্বর মন্দিরে যদি যাও—আমার পরামর্শ—হাতে একটা ছোট টর্চ রেখ। টিপবাতি জ্বাললে আজও একটা জিনিস দেখতে পাবে। মেঝের তল থেকে এক হাত নিচে বাবার মাথায় আজও দেখতে পাবে সেই ক্ষতচিহ্নটা।

: ভুলি গ্যালে নাকি হে? গরল পান করি'বাবা যে টলি পড়িছিলেন মন্দার পাহাড়ের গায়ে, সেই টক্করের দাগটো গ!

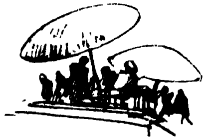

স্নামীধোপানি ঘাটে নৌকায় রাত্রিবাস করে পরদিন ভোর-ভোর পদব্রজে রওনা দিলেন। আপাতত গন্তব্যস্থল দিনেমারদের ফ্রেড্‌রিক নগর। তারকেশ্বর থেকে প্রায় বারো ক্রোশ পূর্বদিকে। সড়ক বা পথ বলতে কিছু নাই। মাঝে মাঝে বনপথ, কখনো বা ধানক্ষেতের দিগন্ত-অনুসারী প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে বিসর্পিল গতিতে আলপথ। দিগভ্রান্ত হবার আশঙ্কা নাই। লক্ষ্য বরাবর পূর্বাভিমুখী। পথে বড় নদীও নাই। বারো-চৌদ্দ ক্রোশ পথ একদিনে পাড়ি দেওয়া যাবে না, বিশেষ রূপেন্দ্র 'পথি নারী বিবর্জিতা' শ্লোকের নির্দেশ মানেননি। তা হোক, অসুবিধা নাই কিছু। পথে পড়বে দুটি বর্ধিষ্ণু জনপদ: হরিপাল ও সিংহপুর। মোট দূরত্বের প্রায়

এক-তৃতীয়াংশ পথ পাড়ি দিলে। স্থির করেছেন, দৈনিক প্রায় চার ক্রোশ পথ অতিক্রম করবেন। হরিপাল এবং সিংহপুরে এক এক রাত্রি অতিবাহিত করে তৃতীয় দিনে উপনীত হবেন ফ্রেডরিক নগরে। বস্তুত ঐ ফেরঙ্গ-জনপদটিও তাঁর লক্ষ্যস্থল নয়, তিনি যাবেন রাধাবল্লভপুরে ঐ ফেরঙ্গ-শহরের উপকণ্ঠে।

চিহ্নিত পথরেখা যেমন নাই তেমনি চিহ্নহারা আলপথে বিপদও কিছু নাই। পথে মাঝে হয়তো কিছু জঙ্গল পড়বে, কিন্তু হিংস্র শ্বাপদের আশঙ্কা নাই। আর চোর-ডাকাতের উপদ্রবও নাই।

রূপেন্দ্র তাঁর সহধর্মিণীর হাত ধরে যে চিহ্নহারা পথে যাত্রা করলেন সেই পথেই আজ বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসে শত শত তীর্থযাত্রী। তাদের সম্বল বাঁকে ফুলের মালা, ঘটে গঙ্গাজল, কপালে স্বেদবিন্দু, আর মুখে ধর্মবিশ্বাসের লোকায়তধ্বনি: ভোলেবাবা পার করে গা!

তারকেশ্বর ত্যাগ করে গাছ-গাছালির অন্তরাল অতিক্রম করে ফাঁকা মাঠে পড়েই নজর হল সামনের দিকে একদল যাত্রী। প্রায় আধক্রোশ দূরে। তারাও চলেছে পূর্বাভিমুখে। বোধ করি একই লক্ষ্যমুখে। এতদূর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে দলে পনের-বিশজন পুরুষ-স্ত্রী; কিছু অল্পবয়সীও আছে। পুরুষদের অনেকের কাঁধে বাঁক। তাতে মালপত্র। দুটি মালবাহী অশ্বতরও আছে। অনুমান হয়—ওরা সদলবলে চলেছে নূতন আশ্রয়ের সন্ধানে—পশ্চিম থেকে পুবে—বোধকরি ভাগীরথীর পূর্বপারে। বর্গীর হাঙ্গামা শুরু হওয়ার পর থেকে এ দৃশ্য পৌনঃপুনিকতায় ক্লান্তিকর।

ব্যবধান ক্রমে কমে আসছে। সম্মুখবর্তী দলে আছে বৃদ্ধ ও শিশু; পুরুষেরা মালবাহী। এতক্ষণে বোঝা যাচ্ছে ওরা বাউল। কিন্তু বাউলদের মতো পুরুষেরা প্রকৃতিদত্ত শ্মশ্রু ও ওষ্ঠলোম রাখেনি, যদিও মাথার চুল উঁচু করে চুড়ো বেঁধেছে—যাকে বাউলেরা বলে 'ধম্মিল্ল'। অনেকের ঊর্ধ্বাঙ্গে খেল্কা, কাঁধে ঝুলি, হাতে লাঠি। তাদের সঙ্গিনীদের চুলও চুড়ো করে বাঁধা, কারও বা পরনে গিরিমাটিতে ছোপানো শাড়ি।

দ্বিপ্রহরে দূর থেকে নজর হল দলটি একটি দীর্ঘিকার পাড়ে জমিয়ে বসেছে, প্রকাণ্ড একটা বটগাছের ছায়ায়। রূপেন্দ্র বললেন, মনে হচ্ছে ওরাও গঙ্গার দিকে চলেছে, তীর্থযাত্রী। চল, গিয়ে আলাপ করা যাক। অজানা পথে বড় দলে একসাথে যাওয়াই সুবিধাজনক।

আপত্তি জানালো মঞ্জরী, না! দেখছ না, ওরা ফলারের আয়োজন করছে। এখন আমরা গিয়ে উপস্থিত হলে ওরা বিব্রত হবে। ঐ তো কাছেই গ্রাম। আমরা বরং সেদিকেই এগিয়ে যাই। গাঁয়ে হয় তো দোকানে কিছু খাবার কিনতে পাওয়া যাবে। একই দিকে গেলে পথে আবার নিশ্চয় দেখা হবে।

কথা ঠিক। দলপতি বৃক্ষতলে একটি কিলিঞ্জকে এলিয়ে পড়েছেন—শরকাঠির মাদুর আর কি। ওরা পোঁটলা-পুঁটলি খুলে মধ্যাহ্ন-আহারের আয়োজনে ব্যস্ত। চক্ষুলজ্জা এড়াতে সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে ওঁরা দলটিকে অতিক্রম করে যেতে চাইলেন; কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। হঠাৎ একটি মেয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসে। বাধ্য হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। মেয়েটির বয়স রূপেন্দ্ররই কাছাকাছি, হয়তো কিছু কম—রীতিমতো সুন্দরী, সুঠাম শরীর,

মেদবর্জিত, নাকে রসকলি, ধম্মিল্লর চারপাশে একটা রঞ্জনফুলের মালা জড়ানো। গেরুয়া রঙের শাটিকা, ঊর্ধ্বাঙ্গে ঘননিবদ্ধ কঞ্চুলিকা। কাছাকাছি এসে সে যুক্তকরে দণ্ডবৎ হল রূপেন্দ্রর সম্মুখে, কিন্তু প্রশ্ন করল তাঁর সঙ্গিনীকে, তুমি কুসুম না?

মঞ্জরীও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বলে, হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তো ...

যুবতী সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তার ডাগর চোখদুটি মেলে রূপেন্দ্রর দিকে অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাকায়। বলে, আপনিই তাহলে সেই ধন্বন্তরি?

রূপেন্দ্র বলেন, আমার নাম শ্রী রূপেন্দ্রনাথ দেবশর্মা ...

দেখ্-না-দেখ্ মেয়েটি পথের উপরেই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করল। রূপেন্দ্র বিব্রত; কিন্তু বিড়ম্বনার তখনো বাকি। পরমুহূর্তেই মেয়েটি উঠে দাঁড়ায় আর অনায়াসে রূপেন্দ্রর দক্ষিণ মণিবন্ধ চেপে ধরে বলে, এমন আড়াল দিয়ে পালিয়ে গেলে তো চলবে না। আপনি আমার বোনাই! এস কুসুম—কর্তামশায়ের সঙ্গে আলাপ করবে—

গোটা দলটাই উন্মুখ আগ্রহে লক্ষ্য করছে। দলপতিও উঠে বসেছেন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বেশবাস অন্য সকলেরই মতো, শুধু ঊর্ধ্বাঙ্গে পিরানের পরিবর্তে 'চিন্ত-কন্থা'—অর্থাৎ নানারঙের কার্পাসখণ্ড শেলাই করে বানানো আলখাল্লা ধরনের একটি পোশাক—বোধকরি দলপতির শনাক্তিচিহ্ন।

মেয়েটি বললে, কর্তামশাই! এই দেখুন, কাদের ধরে এনেছি। এ হচ্ছে আমার বোন—রূপনগরের সেই রাইরানী, আর ইনি সেই সোঞাই গাঁয়ের ধন্বন্তরি!

দলপতি উৎফুল্ল হয়ে সাদর অভ্যর্থনা করেন, কী সৌভাগ্য আমাদের! আসুন, বসুন।

অগত্যা বসতে হল। মেয়েটি এতক্ষণে কুসুমমঞ্জরীকে বলে, তুমি আমাকে চিনবে না। আমিও রূপনগরের মেয়ে। তোমাকে বারে বারে দেখেছি। তোমাদের কথা আমার সব জানা। কোথায় চলেছ তোমরা?

প্রত্যুত্তর করলেন রূপেন্দ্র, দলপতির দিকে ফিরে। বলেন, আপাতত চলেছি হরিপাল। সেখান থেকে সিঙ্গুর হয়ে গঙ্গাতীরে, ত্রিবেণী।

—বাঃ! বাঃ! আমরাও তাই। তাহলে এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হয়? বিশ্রাম করুন। সেবা করুন। তারপর এক সঙ্গে রওনা দেওয়া যাবে। সন্ধ্যার পূর্বেই হরিপালে পৌঁছে যাব।

রূপেন্দ্র বলেন, এ তো আনন্দের কথা। তবে একটি শর্ত আছে গোঁসাইজী, তীর্থের পথে প্রতিগ্রহ গ্রহণ করতে নেই। আপনি যদি স্বীকৃত হন ...

হাত তুলে বৃদ্ধ ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, তিন-চার দিন একসাথে চলতে হবে। বেশ তো, এর পর না হয় তাই হবে। কিন্তু প্রথমবার ও কথা ওঠে না। আপনি অতিথি। আমাদের ব্রাহ্মণ সেবার পুণ্যফল থেকেই বা কেন বঞ্চিত করেন? আর আয়োজন আমাদের সামান্যই—কাঁচা ফলার। দ্বিতীয়ত আমি 'গোঁসাই' নই···

—বাউল সম্প্রদায়ের দলপতিকে 'গোঁসাইজী' সম্বোধন করাই তো প্রথা,···

—তা ঠিক। তবে আমরা বাউল নই, আউল।

—বাউল নন, আউল! উভয়ের কী পার্থক্য?

—ব্যাকুলতা আর আকুলতার মধ্যে যা। ওঁরা 'অচিন পাখির' সন্ধানে ব্যাকুল, আর আমরা

'মনের মানুষের' সন্ধানে আকুল। তা সেসব তত্ত্বকথা পরে হবে, আপাতত ঐ দীঘিতে হাত-মুখ ধুয়ে আসুন।

আয়োজন সত্যই সামান্য—সিক্ত চিপিটক, ইক্ষুগুড়, কদলী এবং খুরমো।

আহারান্তে সামান্য বিশ্রাম। সেই অবকাশে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা গেল।

ঐ মেয়েটি—রাধারানী—এ দলে আছে মাত্র কয়েক মাস। রূপনগরেরই মেয়ে। বন্দিনী ছিল মোহন্ত মহারাজের কুঞ্জে। চার পাঁচ বছর। প্রাক্তন রাইরানী! বর্গীরা যখন রূপনগর বিধ্বস্ত করে তখন সে প্রাণভয়ে অজয়ে ঝাঁপ দেয়। অনেক ঘাটে জল খেয়ে এখন এই দলে এসে মিশেছে। তারও সংসারে ফিরে যাবার পথ নেই—অবশ্য সংসার বলতে কিছু আছে কি না, তাও জানে না মেয়েটি।

এঁরা 'বাউল' নন, 'আউল'। এই সম্প্রদায়ের কথাও কিছু শোনা গেল।

এ মতের—অন্তত এই দলের—আদি প্রবক্তার নাম: আউলেচাঁদ।

নদীয়ার উলা-গ্রামে—ঐ যার নাম পরবর্তীকালে হয়েছিল বীরনগর—সেখানেই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে আউলেচাঁদের আবির্ভাব। তাঁর পিতামাতার পরিচয় জানা যায় না। পবম্পরায় জনশ্রুতি ১৬১৬ শকে (1694 খ্রীঃ) ফাল্গুন মাসের প্রথম শুক্রবার তাঁকে আবিষ্কার কবেন উলাগ্রামের এক বারুজীবী—নিজের পর্ণক্ষেত্রে। অজ্ঞাতকুলশীলটিকে পুত্রস্নেহে পালন কবতে থাকেন। ঐ বারুজীবীর নাম—মহাদেব। দ্বাদশ বৎসর বয়সে আউলেচাঁদ ঐ পালক পিতার গৃহত্যাগ করেন, কিছুদিন এক গন্ধবণিকের গৃহে অবস্থান করেন। পরে এক ভূস্বামীর ভদ্রাসনে কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু সংসারে আবদ্ধ থাকার জন্য তিনি ধবা-ধামে আসেননি। পুনরায় গৃহত্যাগ। বঙ্গদেশের নানা অঞ্চল পরিভ্রমণ করে সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে বেজরা গ্রামে প্রকট হন। অনতিবিলম্বে তাঁর বাইশজন শিষ্য হয়। তার মধ্যে হটু ঘোষ, কৃষ্ণদাস হরি ঘোষ, রায়পাল প্রভৃতি প্রধান। ঐ বাইশজন শিষ্য নিয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করতেন। নিম্নাঙ্গে কৌপীন, ঊর্ধ্বাঙ্গে খেল্কা—আউলেচাঁদ একটি সহজ সরল ধর্মমত প্রচার কবে গিয়েছেন। তাঁর মতে হিন্দু, মুসলমান, ম্লেচ্ছ সবাই সমান—সকলের অন্নই গ্রহণ করতেন নির্বিবাদে। তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত গান:

"এ ভাবের মানুষ কোথা হতে এলো?
এর নাইকো রোষ, সদাই তোষ, মুখে সত্য কথা বলো।
এর সঙ্গে বাইশজন, সবার একটি মন,
জয়কর্তা বলি, বাহু তুলি, করে প্রেমে ঢলোঢল।
এ যে হাবা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়, এর হুকুমে গঙ্গা শুকালো॥
এ ভাবের মানুষ কোথা থেকে এলো?"

আউলেচাঁদ দেহ রাখেন আমাদের কাহিনীকালের অনেক পরে, ১৬৯১ শকে (1770 খ্রীঃ): কিন্তু তাঁর জীবিতকালেই আদিম শিষ্যদলের এক একজন এক-এক মতের প্রতিষ্ঠা করে ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন করেন। কেউ কেউ অবশ্য গৃহাশ্রমেও প্রত্যাবর্তন করেন। আউলেচাঁদের দেহাবসানের পর ঘোষপাড়ার সদ্গোপ রামশরণ পাল যে দলটি গড়েন তাই পরবর্তীকালে সবচেয়ে প্রতিষ্ঠা পায়। সে দলের নাম: কর্তাভজা।

হরিপালে

এই সম্প্রদায়ে গুরুকে বলা হয় 'মহাশয়' আর শিষ্যের নাম 'বরাতি'। আউলেচাঁদ হচ্ছেন 'আদি-মহাশয়'। তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্য—যিনি আমাদের কাহিনীবর্ণিত দলটির প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর নামটা জানা যায় না; কারণ দলে তাঁর নাম 'প্রথম মহাশয়'। রূপেন্দ্রকে যিনি আপ্যায়ন করে বসালেন তিনি তাঁরই প্রত্যক্ষ শিষ্য—'দ্বিতীয় মহাশয়' সংক্ষেপে এখন 'কর্তামশাই'।

রূপেন্দ্র এঁদের ধর্মমত এবং আচরণবিধি বিষয়ে কৌতূহল দেখালে কর্তামশাই করজোড়ে বললেন, "আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা তথা, আপনাকে হইবে আপনি সাবধান।"

রূপেন্দ্র লজ্জিত হয়ে বলেন, মার্জনা করবেন। সত্যই তো, আমি বহিরাগত; আমার কৌতূহলী হওয়া ঠিক হয়নি।

কর্তামশাই রূপেন্দ্রর হাতদুটি ধরে বলেছিলেন, না—না—না! আপনাকে বলব। সব কথা খুলে বলব। বিশেষ হেতুতে। তবে এখন নয়। সুযোগ মতো।

রূপেন্দ্র জানতে চান, নবদ্বীপে আরও কয়েকটি সাধক-সম্প্রদায়কে দেখেছি, যাঁদের দেখলে বাইরে থেকে মনে হয় তাঁরা বাউল—কিন্তু তাঁরা বলেছিলেন যে, তাঁরা বাউল নন। কেউ দরবেশ, কেউ ন্যাড়া। তাঁরাও কি আউলেচাঁদের শিষ্য?

কর্তামশাই বললেন, না, না। সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যে নানান সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে। 'আউল' শব্দটা সহজবোধ্য বলে আমি সেই পরিচয়ই আপনাকে দিয়েছি। বাস্তবে আমরা 'আউল'ও নই—তার একটি বিশেষ শাখা—যার নাম 'সহজিয়া' বা 'সহজী'। এই মতটি সদ্যপ্রসূত। আপনি যাঁদের কথা বললেন, তাঁরা আউলেচাঁদের প্রবর্তিত সাধক সম্প্রদায়ভুক্ত নন। 'দরবেশ' অথবা 'সাঁই' সম্প্রদায়ের প্রবর্তক প্রভুপাদ সনাতন গোস্বামী। তারা নামে 'উদাসীন' হলেও প্রত্যেকের এক-একজন প্রকৃতি-সাধিকা থাকে। তবে তারাও হিন্দু-মুসলমানের ফারাক মানে না। বলে, "ক্যা হিন্দু, ক্যা মুসলমান। মিল্‌জুলকে কর সাঁইজীকা নাম।" আর ঐ ন্যাড়া সম্প্রদায়ও আউলেচাঁদ প্রবর্তিত নয়। তার আদি গুরু হচ্ছেন—প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র। শোনা যায়, প্রভু নিত্যানন্দ তাঁকে স্বমত-বহির্ভূত দেখে ত্যাজ্যপুত্র করেন। আর বীরভদ্র এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এঁরাও বাউলদের মতো বিশ্বাস করেন, মানবদেহের মধ্যেই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান। কিশোরীসাধন ও প্রকৃতিভজনের পথেই পরমাত্মাকে পাওয়া যায়!

রূপেন্দ্রের দুরন্ত কৌতূহল হচ্ছিল জানতে—ও বিষয়ে 'কর্তামশাই' কী সিদ্ধান্তে এসেছেন—ঐ প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব বিষয়ে। দলে জনা-দশেক পুরুষ এবং প্রায় সাত জন রমণী—কিশোরী থেকে প্রৌঢ়া। দলপতির সাধনসঙ্গিনী আছে বলে মনে হল না—অন্তত বয়সের দিক বিচার করে। এরা কি 'উদাসীন'? ইন্দ্রিয়-সংযম করে থাকেন? 'সহজী' নামটিরই বা তাৎপর্য কী? কিন্তু সে বিষয়ে কোনও কৌতূহল দেখালেন না।

হরিপালে এসে দলটি পৌঁছাল পড়ন্ত বেলায়। অপরাহ্ণকালে। ওঁরা আশ্রয় নিলেন গ্রামপ্রান্তের হাটতলায়। হরিপাল একটি অতি প্রাচীন এবং এখনো বর্ধিষ্ণু গণ্ডগ্রাম। ব্রাহ্মণ. কায়স্থ, গোপ, জল-অচল—নানান জাতির বাস, বিভিন্ন পল্লীতে। গ্রামের ঠিক বাহিরে প্রশস্ত মাঠের মাঝখানে হাটতলা—এখন সম্পূর্ণ জনহীন। সপ্তাহে মাত্র একদিন এখানে জমায়েত হয়

পঞ্চগ্রামের মানুষ—ব্যাপারি আর হাটুরে। সকাল থেকেই সার বেঁধে আসে গো-গাড়ির মিছিল। মধ্যাহ্নকালে প্রচুর জনসমাগম। হাটতলায় বাঁশের খুঁটির উপর উলুখড়ের দোচালা—প্রায় শতহস্ত পরিমাণ দৈর্ঘ্যের; কিন্তু প্রস্থে অত্যন্ত অল্প। দুজন ব্যাপারি পিঠোপিঠি বসতে পারে মাত্র। হাটুরেদের সচরাচর কেনাবেচা করতে হয় খোলা আকাশের নিচে। হাটবারে অপরাহ্ণকাল পর্যন্ত চিৎকার চেঁচামেচিতে হাটতলা সরগরম; তারপর সন্ধ্যার আগেই সব ভোঁ-ভাঁ। পুরো ছয়দিন তা জনশূন্য।

দেখা গেল দলের সবাই করিৎকর্মা। ভ্রাম্যমাণ দলটির সকলে যে-যার কর্তব্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। জনা-ছয়েক বরাতি অশ্বতরের পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে সাজিয়ে ফেলল। দলপতির জন্য পেতে দিল মাদুর। দু-জন গেল জল আনতে, আরও দু-তিনজন কাঠের উনানে রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। ও-বেলা কাঁচা ফলার হয়েছে, এ-বেলা অন্নসেবার আয়োজন। বাদবাকি সবাই একতারা, ক্ষমক, খঞ্জনী নিয়ে গ্রামের দিকে রওনা হয়ে গেল—নামগান শোনাতে আর ভিক্ষা করতে। কুসুমমঞ্জরীও রাধারানীর সঙ্গে রান্নার জোগাড়ে গেল।

হাটতলা নির্জন দেখে কর্তামশাই রূপেন্দ্রর কাছে ঘনিয়ে এসে বললেন, তখন যে কথাটা বলা হয়নি এবার তাই বলে নিতে চাই—আউল-বাউলদের অন্তরঙ্গ কথা।

এবার কিন্তু রূপেন্দ্র নিজেই আপত্তি তোলেন, থাক না কর্তামশাই। আমি বহিরাগত, পথ-চলতি সঙ্গীমাত্র। আপনি নিজেই তখন বললেন, এই সাধনমার্গের কথা যথা-তথা বলা বারণ—

কর্তা-মশাই ওঁকে বাধা দেন, 'যথা-তথা' তো বলছি না ধন্বন্তরি মশাই! যতই নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করুন, আমি সব জানি, স—ব জানি!

—কী জানেন?

কর্তা-মশাই এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলেন, আপনি একজন শাপভ্রষ্ট সিদ্ধপুরুষ!

রূপেন্দ্র স্তম্ভিত। এমন আজব কথাটা শুনতে হবে তা আন্দাজ কবতে পারেননি।

—কেন্দুবিল্বের মেলায় আমি সমস্ত বিবরণ শুনেছি! রূপনগরের অশ্বারোহী ফৌজ কী-ভাবে দামোদরে ভেসে গেল!

—কী ভাবে?

—ওরা যখন দামোদর অতিক্রমণ করছিল তখন আপনি মন্ত্রোচ্চারণ করেন! তৎক্ষণাৎ দামোদরে এসে যায় অকাল ষাঁড়াষাঁড়ির বান! গোটা ফৌজ ভেসে গেল। শুধুমাত্র সেনাপতির রণহস্তী নলগিরি এসে লুটিয়ে পড়ল আপনার শ্রীচরণে!

বজ্রাহত হয়ে গেলেন রূপেন্দ্রনাথ! লোকগাথার কী অপরিসীম মহিমা। লৌকিক ক্রিয়াকলাপকে অলৌকিকত্ব দানের কী বিচিত্র প্রবণতা! বছর ঘোরেনি, অথচ তিনি উপকথার নায়ক হয়ে গেছেন মুখে-মুখে! এমনকি 'হেরম্বদাস'-এর নামটাও পরিবর্তিত হয়ে গেছে বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী অনুসারে।

তিনি যতই দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করতে যান ততই কর্তামশাই সকৌতুকে মাথা নেড়ে বলতে থাকেন, জানি, জানি, এটাই যে সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ! তাঁরা কিছুতেই স্বীকার করতে চান না

তাঁদের অলৌকিক বিভূতির কথা!

উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিতে হল। কর্তা-মশাই এর পর নিম্নস্বরে বলে গেলেন তাঁদের সাধনমার্গের গুপ্ত কথা। তাঁর অন্তরে যে সংশয় জেগেছে, যে সন্দেহের দোলায় দুলছেন—তার নিরাকরণের পথটি উনি খুঁজে পেতে চান এই সিদ্ধপুরুষের নির্দেশে। দৈবাৎ যখন সাক্ষাৎ পেয়েছেন তখন তিনি কিছুতেই এ সুযোগ ছাড়বেন না। সব কথাই তিনি খুলে বললেন— বাউল-তত্ত্ব আর 'সহজী'-পন্থীদের মতপার্থক্যের কথা, কী তাঁর সংশয়, কোন বিষয়ে তিনি পরামর্শ চাইছেন:

'বাউল'-তত্ত্বের মতো 'বাউল' শব্দটির উৎপত্তিও রহস্যাবৃত। ক্ষিতিমোহন সেন-মশায়ের মতে বায়ুগ্রস্ত অর্থাৎ পাগ্‌লাটে ধরনের মানুষকে লোকে বাউল বলত, অথচ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সিদ্ধান্ত 'আউয়াল' শব্দ থেকে প্রথমে 'আউল' এবং পরে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি। সুনীতিকুমার বলেছিলেন, দেশজ শব্দ 'বাউল্যা' এর গঙ্গোত্রী। আবার ইদানীং কোন কোন পণ্ডিতের মতে 'ব'-সাধনায় 'উল' বা সিদ্ধিলাভ যে করেছে সেই হচ্ছে 'বাউল'। তা এসব তো আজকালের কথা। আমাদের কাহিনীর কালে কোথায় বা ব্রজেন শীল আর কোথায় বা সুনীতি চাটুজ্জে!

তা হোক, তবু তখনও বাউল সাধকেরা জানতেন 'ব'-সাধনার কথা, এবং সেপথে কী-ভাবে 'উল' হতে হয়!

বাউল কোন ধর্মসম্প্রদায় নয়, গুহ্যমার্গের এক বিশিষ্ট সাধনার স্তরে সিদ্ধিলাভই তাঁদের লক্ষ্য। ত্রিকোণাকৃতি ঐ ব'-অক্ষরটি প্রকৃতির দ্যোতক — ত্রিবেণীর ঘাট! সেই ঘাটে জোয়ানের গোনে মীনের প্রত্যাশায় প্রহর গোণা! রজ-বীজ, নীর-ক্ষীর, রূপ-স্বরূপের ক্রিয়াচারে রসের ভেয়ানে সহজ মানুষ সেখানে মনের মানুষ খোঁজে। ব্রহ্মাণ্ড সেখানে ধরা দেয় ভাণ্ডে! ভাণ্ড কোথায় পাব? কেন? এই তো নবদ্বারী মানবদেহ! পুরুষ-প্রকৃতি দমের কাজে, রসের ভেয়ানে, অটল বীজরূপী পরমাত্মার সঙ্গজনিত মহানন্দের আস্বাদ পায়। তা, এসব হল গিয়ে তত্ত্ব কথা! তুমি-আমি বুঝব না—বুঝবে রসিকজন। সহজ ভাষায়: পরমদেবতা শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ মানবদেহে নিত্য বিরাজমান। তাঁকে খুঁজে দেখ, পাবে। নরদেহ পরিত্যাগ করে বেহুদ্দো তাকে বাইরে খুঁজতে যেও না। এ যেন কপালে চশমা তুলে,অন্ধ হয়ে চশমা খোঁজা.

"কারে বলবো কে করবে বা প্রত্যয়।
আছে এই মানুষে সত্য নিত্য চিদানন্দময়॥"

বাউল সচরাচর একটি মাত্র সাধনসঙ্গিনীকে নির্বাচন করে; তারই সঙ্গে জীবন বিকায়। সাধনপদ্ধতি অতি গুহ্য ব্যাপার। তার ভিতর এমন সব ক্রিয়াকলাপ আছে যা সাধারণ মানুষের কাছে রীতিমতো বীভৎস, ন্যক্কারজনক মনে হতে পারে, যেমন 'চারিচন্দ্রভেদ' ক্রিয়া। কিন্তু বাউল তাকেও পবিত্র পুরুষার্থ-সাধন বলে বিশ্বাস করেন। অক্ষয়কুমার দত্ত বলছেন, "সকল কথা অন্যের জানিবার উপায় নেই; জানিলেও পুস্তকে সবিশেষ বিবরণ প্রদান সঙ্গত নহে।" মোটকথা, বাউল বিশ্বাস করেন—ঐ ঐকান্তিক প্রেম যখন পরিপক্ক হয়, তখন আর স্ত্রী-পুরুষে

ভেদাভেদ থাকে না—আত্মবিস্মৃত যুগল সাধকসাধিকা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পবিত্রলীলায় বিলীন হয়ে যান:

'তখন আপনি পুরুষ কি প্রকৃতি
নাইকো জ্ঞান কিছুই স্থিতি
অকৈতব ঠিক যেন ক্ষিতি—বাক্য নাই।।"

আউলেচাঁদের প্রত্যক্ষ শিষ্য 'প্রথম কর্তা-মশাই' এই পথেই সাধনমার্গে যাত্রা শুরু করেছিলেন। তারপর তাঁর সাধনসঙ্গিনীর দেহান্তে তাঁর এক বিচিত্র উপলব্ধি হল। তাঁর মনে হল—'বাউল'-তত্ত্ব অত্যন্ত জটিল। রাধাতত্ত্বের সঙ্গে পরকীয়া-তত্ত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাউল যদি তার একমাত্র ঐ সাধনসঙ্গিনীর দেহমন্দিরে 'রাধা'কে খোঁজে, তবে সে পরকীয়া-তত্ত্বকে অস্বীকার করতে বাধ্য হয়। একমুখী সেই প্রেমের সঙ্গে গৃহস্থ-মানুষের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের কী প্রভেদ? দ্বিতীয়ত ঐ 'চারিচন্দ্রভেদ' ক্রিয়াটিকেও তিনি তত্ত্বগতভাবে স্বীকার করতে পারছিলেন না। তাঁর প্রতীতি হল—এই বিশ্বপ্রপঞ্চে তো একমুখী প্রেম স্বীকৃত নয়। পশুপক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্য, কীটপতঙ্গ তো প্রকৃতি-পুরুষের লীলাখেলায় এই প্রাণহীন পৃথিবীকে অনায়াসে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। তাদের কাছে তো স্বকীয়-পরকীয়ার প্রভেদ নেই। এই ধারণাটা শুধুমাত্র মানুষের—সামাজিক বিধানে এই বাধা। এ বাধা উত্তরণই পুরুষার্থ!

তিনি নতুন বিধান দিলেন। সহজ সমাধান—'সহজী' পন্থা।

বরাতিদের অর্থাৎ শিষ্য-শিষ্যাদের প্রেম একমুখীন হতে পারবে না। সবাই কৃষ্ণ, সবাই রাধা।

বললেন, গুরু দুই প্রকার—দীক্ষা গুরু ও শিক্ষা গুরু। বিপত্নীক দলনেতা হলেন স্বয়ং দীক্ষাগুরু। তিনি শিষ্য শিষ্যাদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন—বুঝিয়ে দেন সাধনমার্গের আচরণবিধি। কিন্তু নিজে তিনি ইন্দ্রিয় সংযমে অভ্যস্ত। প্রকৃতি সাধনে বিরত। কিন্তু প্রতিটি শিষ্য-শিষ্যার একাধিক শিক্ষাগুরু—এক এক রাত্রে এক এক জন। পর্যায়ক্রমে। দলভুক্ত প্রতিটি পুরুষের ভিতর সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান করবে শিষ্যারা; যেমন প্রতিটি বরাতি প্রতিটি দলভুক্তা প্রকৃতির তনু-মন্দিরে খুঁজবে শ্রীরাধিকাকে। মন্ত্র হল:

"গুরু করব শত শত মন্ত্র কর্‌বো সার।
যার সঙ্গে মন মিল্‌বে দায় দিব তার।।"

শিষ্য-শিষ্যা জোটাতে অসুবিধা হল না। অন্যান্য সম্প্রদায়ের পুরুষ কিসের টানে এসে জুটল তা অনুমান করা শক্ত নয়। পুরুষ স্বভাবতই বৈচিত্র্যসন্ধানী—'নাল্পে সুখমস্তি' মন্ত্রটা জানুক না জানুক, তারা গুটিগুটি এসে জুটল। শিষ্যারা এল নানান ঘাট থেকে—অধিকাংশই সমাজত্যক্তা। উপায়ান্তরবিহীন! পতিতালয়ের চেয়ে এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আশ্রয়লাভই বাঞ্ছনীয় মনে করল তারা।

দ্বিতীয় কর্তা-মশাইও এসে যোগদান করেছিলেন প্রথম যৌবনে।

দীর্ঘদিন সহজী-পন্থায় সাধনভজন করে পৃথক আখড়ায় এখন গদিয়াল হয়েছেন।

'কর্তা-মশাই' পদলাভ করেছেন প্রৌঢ়ত্বের সীমান্তে। অসুবিধা হয়নি কিছু। যৌবন তখন অস্তমিত। প্রথম সমস্যা দেখা দিল বছর-পাঁচেক আগে। মনে সংশয় জাগল—পথটা কি ঠিক? এ সন্দেহ জাগল একটি সদ্য আগত দম্পতিকে কেন্দ্র করে। তারা স্বামীস্ত্রী—যুগলে এসে

যোগদান করল সম্প্রদায়ে, বিচিত্র হেতুতে: শীতলচন্দ্র আর রুক্মিণী।

শীতলচন্দ্র সম্পন্ন গৃহস্থের সন্তান। ব্রাহ্মণ, কিন্তু সব ছেড়ে-ছুড়ে সংসার ত্যাগ করে স্ত্রীর হাত ধরে পথে বার হয়েছিল। এ-ঘাট সে-ঘাট সেরে এসে পৌঁছালো ওঁদের আখড়ায়।

শীতলের বিবাহ হয়েছিল তের বছর বয়সে, ভিন্‌গাঁয়ের এক নোলক-দোলানো নবমবর্ষীয়ার সঙ্গে। প্রচলিত প্রথা অনুসারে গৌরীদানের পর রুক্মিণীর পিতৃদেব তাকে স্বগৃহেই মানুষ করেছিলেন। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হলে বৈবাহিককে সংবাদ পাঠালেন—এবার দ্বিরাগমনের আয়োজন করতে। বিবাহের অব্যবহিত পরে যদি দ্বিরাগমন হয়, তাহলে দিনক্ষণ দেখতে হয় না। অন্যথায় বৈশাখ, অগ্রহায়ণ অথবা ফাল্গুন মাসে—রবি, চন্দ্র ও বৃহস্পতি শুদ্ধ থাকলে—যাত্রোক্ত শুভলগ্নে দ্বিরাগমন প্রশস্ত। শীতলের পিতৃদেব দিনক্ষণ বিচার করে পুত্রকে পাঠিয়ে দিলেন শ্বশুরালয়ে। প্রত্যাগমন দিবসের এক সপ্তাহ পূর্বেই। অনুরোধটা সেই জাতেরই ছিল বৈবাহিক মহাশয়ের—নতুন জামাইকে কিছু আদর-আপ্যায়ন করতে চায় পুরললনার দল। শীতল তখন বিংশতিবর্ষীয় তরুণ, রুক্মিণীর যৌবনভারনম্র দেহে ষোলকলা পুরেছে। মাত্র সাতটি দিবসরজনীর সাধনা—কিন্তু তার ভিতরেই শীতলচন্দ্র তার সহধর্মিণীর মধ্যে উদ্ধার করল: শ্রীরাধাকে।

শীতলের পূজ্যপাদ পিতৃদেবের জ্যোতিষগণনায় বোধকরি কিছু ভ্রান্তি হয়ে থাকবে। দ্বিরাগমন নির্বিঘ্নে হল না। প্রত্যাবর্তনের পথে নববধূর পাল্কি রুখল একদল ডাকাত। বাধা দিতে গিয়ে শীতল মারাত্মকভাবে আহত হল। সালঙ্কারা ষোড়শী অপহৃতা হল ডাকাতের হাতে। সে আমলে জমিদারের হাতি বুড়ো হয়নি, তার গলায় ঢনঢনিয়ে ঘণ্টা বাজতো না—কিন্তু ঢাকিরা তখনো খালে-বিলে ঢাক বাজাতো! এ ঢাকের বাদ্যি যে সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে শেষ প্রলয় তক্। মারাত্মকভাবে আহত শীতলচন্দ্র তার সহধর্মিণীকে অবশ্য খুঁজে পেয়েছিল বনমধ্যে। না, তাকে খুঁজতে হয়নি, খুঁজে পেয়েছিল মেয়েটিই। নববধূর যাবতীয় স্বর্ণালঙ্কার অপহরণ করে নিয়ে গেছে ডাকাতদল। তার সঙ্গে আরও কিছু। শাঁখা-সর্বস্ব একবস্ত্রা ধর্ষিতাকে অরণ্যেই অচৈতন্য অবস্থায় ফেলে রেখে গেছে। জ্ঞান ফিরে আসার পর টলতে টলতে সে ফিরে আসে দুর্ঘটনার স্থলে। শীতল তখনো অচৈতন্য। তার মাথা ফেটে গেছে। রক্ত ঝরছে। রক্তক্ষরণ অবশ্য ঐ হতভাগিনীরও হচ্ছে তখনো—মাথা থেকে নয়, ঊর্ধ্বাঙ্গ থেকেই নয়। তবু পার্বত্য ঝরনায় শাড়ির আঁচল ভিজিয়ে সে বারে বারে মুছিয়ে দিল স্বামীর ক্ষতস্থানটা। ক্রমে তারও জ্ঞান হল।

হতভাগ্য দম্পতি পদব্রজে ফিরে এল তাদের ভিটেতে, বহু কষ্টে।

তখনই শুনল মর্মান্তিক দুঃসংবাদটা! নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ঐ অপবিত্রা পুত্রবধূকে ঠাঁই দিতে পারবেন না তাঁর ভদ্রাসনে। বাপের বাড়িতেও মেয়েটিকে রেখে আসার পথ নাই। রুক্মিণীর একটি অনূঢ়া অনুজা আছে। নিগৃহীতা আত্মজাকে আশ্রয় দিলে ব্রাহ্মণকে অনিবার্যভাবে জাতিচ্যুত হতে হবে।

হতভাগিনীর সামনে তখন তিনটি খোলা পথ: পতিতালয়, ধর্মান্তরগ্রহণ অথবা আত্মহত্যা।

শীতলচন্দ্র দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিল: চতুর্থপথ!

স্ত্রীর হাত ধরে পথে নামল সে।

অনেক ঘাটে জল খেয়ে শেষ-মেশ কর্তামশায়ের স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় পেল। তখন তাদের অবস্থা ভারতচন্দ্র বর্ণিত শিব-অন্নপূর্ণার মতো। সহজী-মতের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় মন দেবার অবকাশ নাই। বর্ষাকাল—সবার আগে চাই মাথার উপর একটা আচ্ছাদন, দু-বেলা দু-মুঠো অন্ন!

সমস্যা দেখা দিল। অন্য জাতের। অচিরেই কর্তামশাই অনুভব করলেন—'সহজীতত্ত্ব' ওরা মনেপ্রাণে গ্রহণ করেনি, করতে পারছে না। বিচক্ষণ লোক, আন্দাজ করলেন, সমাধান নিজে থেকেই হয়ে যাবে। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া জীবমাত্রের ধর্ম। মানিয়ে নিয়েছিল বলে মনেও হল। তারপর সন্দেহ জাগল। নানান সূত্রে। বুঝলেন—ওদের একমুখী প্রেম বহুধা হয়নি, হচ্ছে না। না শীতল, না রুক্মিণী। তার চেয়েও অবাক করা খবর—আখড়ার আর সব বরাতি ওদের ঐ অদ্ভুত তত্ত্বটাই মেনে নিয়েছে। নিতান্ত গোপনে। পর্যায়ক্রমে শীতল যাকে নিয়ে শয়ন করে সে যেন তার ভগিনী ; রুক্মিণী যার কক্ষে রাত্রিবাস করে সে যেন তার অগ্রজ! আশ্রমিকেরা আপত্তি করে না! ঐ ধর্ষিতা মেয়েটির করুণ কাহিনী শুনে তারা কী-জানি-কেমন করে ওদের তত্ত্বটাই মেনে নিয়েছে! রুক্মিণী 'রাধিকা' নয়, ওদের বৌ-ঠাকরুণ!

এ কী অনাচার! আখড়ায় পাপ প্রবেশ করেছে! বিশ্বজনীন কৃষ্ণরাধা তত্ত্ব ওরা মানছে না—ঐ ওদের দুজনের ক্ষেত্রে। কর্তা-মশাই ভয় পেলেন! প্রকাশ্যে প্রশ্নটা পেশ করতে সাহস পেলেন না। যদি ওরাও প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে! আশঙ্কাটা অমূলক কিনা সেটা সবার আগে যাচাই হওয়া দরকার।

আশ্রমে কর্তামশায়ের জন্যে আছে একটি নির্দিষ্ট পর্ণকুটীর, বাদবাকি সকলের জন্য একটা প্রকাণ্ড দোচালায় ছোট ছোট খুপরি। যে গৃহটির দেওয়াল নাই।

বাঁশখুঁটির উপর দো-চালা আর গবাক্ষের নিম্নতল পর্যন্ত বুকা-মুলি তল্‌তা বাঁশের বরফি-জাফরি। জানলার বালাই নেই। যেহেতু দাম্পত্যজীবনের গোপনতা নিষ্প্রয়োজন তাই গৃহনির্মাণে এই ব্যয়সঙ্কোচ। নৈশ-আহারান্তে বরাতিরা যখন সাধনসঙ্গিনীদের হাত ধরে জোড়ায়-জোড়ায় নিজ নিজ কক্ষে চলে যায় তখন বিনিদ্রনয়নে জেগে বসে থাকেন কর্তামশাই। তাঁকে দেখতে হবে, জানতে হবে—আখড়ায় অনাচার প্রবেশ করেছে কিনা। গুরুর নির্দেশ—প্রকৃতি-পুরুষের অনাবিল সাধনা অব্যাহত আছে কিনা। কৃষ্ণপক্ষের ঘনান্ধকারে ধ্বনিনির্ভর সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু শুক্লপক্ষে কিছুই গোপন থাকে না।

ঘরে ঘরে সাধনরত প্রেমিকযুগল প্রকৃতি-পুরুষের সেই আদিম সংস্কারে কৈবল্যানন্দ লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব আর বৃদ্ধ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সারারাত ঘুরে মরেন অতৃপ্ত প্রেতের মানসিকতায় বক্ষপদ সরীসৃপের ভঙ্গিতে। কোন কক্ষে কীজাতের ক্রিয়াকলাপ হচ্ছে! শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলা যেমন ক্রমশ পূর্ণতার পথে অভিসারী, ওঁর প্রত্যক্ষজ্ঞানও তেমনি তিল তিল করে পরিণত হতে চলেছে। ক্রমে দৃঢ় প্রতীতি জন্মালো—তাঁর আশঙ্কা অমূলক নয়। রুক্মিণীকে একরাতেও দেখতে পেলেন না আশ্রমিক কোন বরাতির বাহুবন্ধে পরম তৃপ্তিতে নিদ্রা দিতে। তেমনি আশ্রমের অন্য কোন নারীকেও বারেকের তরে দেখতে পেলেন না শীতলচন্দ্রের বক্ষলীনারূপে! এ কী অনাচার! এ কী পাপ!

তারপর এক রাত্রি। সেটা পূর্ণিমার কাছাকাছি। ফিন্‌কি দিয়ে শুক্লজোৎস্না ফুটেছে। বৃদ্ধ

জানতেন পালা-বদলের পালায় পর্যায়ক্রমে সে রাত্রে শীতলচন্দ্র আর রুক্মিণী একই সাধন কক্ষে। রাত্রি তৃতীয় প্রহর। চরাচর নিস্তব্ধ। নিঃশব্দসঞ্চারী উরগের মতো চার হাতে-পায়ে এগিয়ে এলেন সেই নির্দিষ্ট কক্ষটির নিকটে। অতি সন্তর্পণে কক্ষমধ্যে দৃক্‌পাত করেই বৃদ্ধ যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়েন। হ্যাঁ, সাধনতত্ত্বের গৌরীশৃঙ্গে উন্নীত হয়েছে, ওরা—"তখন আপনি পুরুষ কি প্রকৃতি/নাইকো জ্ঞান কিছুই স্থিতি—"

ওরা বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত। কিন্তু তিনি? যা জানবার তা তো জেনেছেন, তাহলে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছেন না কেন? সরে যেতে পারছেন না কেন অন্তরালে? প্রচণ্ড আত্মধিক্কারে মনটা বিষিয়ে গেল! কোনক্রমে টলতে টলতে ফিরে এলেন নিজের কক্ষে। আত্মদর্শন হল যেন! এই যে পক্ষকাল ধরে একটি বৃদ্ধ অতৃপ্ত প্রেতের মতো ঘরে ঘরে উঁকি দিয়ে ফিরেছে সে কি সত্যই আশ্রমের হিতার্থে সরেজমিন তদন্ত করছিল? নাকি সেই হতভাগ্য ছিল যৌবনোত্তীর্ণ এক সঙ্গিনীহীন দর্শনকামী? তত্ত্বদর্শন নয়, চর্মচক্ষুর দর্শন! না হলে কেন স্বেদবিন্দু ফুটে উঠেছে তাঁর ললাটে, দ্রুততর হয়েছে নাড়ির গতি, উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে সর্বদেহ।

ছি—ছি—ছি! এ কী দেখলেন! তার চেয়েও বড় কথা—দর্শনজনিত এ কী অসংযমী অধঃপতন!

শীতল আর রুক্মিণীকে পরদিন বিতাড়ন করলেন আশ্রম থেকে। নিজে চান্দ্রায়ণ ব্রতে প্রায়শ্চিত্ত করলেন একমাস কাল।

রূপেন্দ্র বলেন, তাহলে আপনার সমস্যা তো মিটেই গেছে। নিজেও প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, অপরাধীরাও বিতাড়িত হয়েছে।

চক্ষুমার্জনা করে কর্তা-মশাই বললেন, না, ধন্বন্তরি-মশাই। সমস্যা মেটেনি। আবার নতুন জাতের সমস্যা দেখা দিয়েছে। সে বিষয়েই আপনার পরামর্শ নিতে চাই। কিন্তু তার পূর্বে আমাকে বলুন—আমাদের এই সহজিয়া সাধনমার্গের মূলেই কি কোনও ভ্রান্তি আছে? বারে বারে কেন এ জাতীয় প্রত্যবায় হচ্ছে?

রূপেন্দ্রনাথ মেদিনীবদ্ধ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। যারা ভিক্ষায় গিয়েছিল তারা এখনো প্রত্যাবর্তন করেনি। বরাতিরা দূরে দূরে নিজ-নিজ কাজে ব্যস্ত। কুসুমমঞ্জরী আর রাধা রন্ধনকার্যে ব্যাপৃতা। ওঁর মনে হয়—ঐ সরল জিজ্ঞাসুকে প্রত্যাখ্যান করা অন্যায় হবে। বললেন, কর্তা-মশাই, আপনার জ্ঞান গুরুমুখীবিদ্যায়। আমার গ্রন্থমুখী শিক্ষায়। বাউল-তত্ত্ব নিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে চর্চা করার সুযোগ কখনো হয়নি। তবু নানান গ্রন্থপাঠে যেটুকু জেনেছি, বুঝেছি, তা আপনাকে জানাতে পারি একটি শর্তে—যদি আপনি আমার এই বিশ্লেষণটিকে কোন সিদ্ধপুরুষের আপ্তবাক্য বলে গ্রহণ না করেন। আমি সত্যই তা নই, তবে এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের চরণতলে শিক্ষালাভের সুযোগ আমার হয়েছে। তাই আমার এ-বিষয়ে যা সিদ্ধান্ত তা শুধুমাত্র আমার বিবেক-নির্দেশিত। আপনি বিচার করে নিজ সিদ্ধান্তে আসবেন।

—বেশ, তাই বলুন। প্রথমে আমাকে বলুন ঐ রাধাতত্ত্বের কথা!

—প্রথমেই বলে রাখি 'রাধাতত্ত্ব'টি আমার মতে: অর্বাচীন।

—অর্বাচীন—শিহরিত হয়ে ওঠেন! —কী বলছেন আপনি! রাধাতত্ত্ব!

—না—না—না! সে অর্থে বলিনি। 'অবাচীন' বা 'অধোগত' বলিনি আমি। অবার্চ্ শব্দের ঈন ভাবার্থে 'অর্বাচীন' বলেছি।

কর্তা-মশাই করজোড়ে বললেন, আমি সংস্কৃত জানি না, ধন্বন্তরি-মশাই!

—মানে, অপ্রবীণ, আধুনিক, নবীন। কোন প্রাচীন শাস্ত্রে শ্রীরাধিকার উল্লেখ নাই। শ্রীকৃষ্ণের প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থ হচ্ছে শ্রীমদ্‌ভাগবত—সেখানে কৃষ্ণপ্রেমিকা এক সখীর উল্লেখ আছে বটে, 'রাধা' নাম নাই। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, দেবী ভাগবত, পদ্মপুরাণ এবং নারদপঞ্চরাত্রে 'রাধার' উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে ষোড়শী নবযৌবনসম্পন্না শ্রীরাধিকা ঐ সব পুঁথিতে বিষ্ণুবল্লভা, শ্রী বা লক্ষ্মীদেবীর গুণ ও লক্ষণযুক্তা। তিনি বৃষভানুর কন্যা নন, আয়ান ঘোষের পত্নী নন। শ্রীকৃষ্ণের মাতুলানী নন। এই পরকীয়া পরিকল্পনাটি আদিতে কে করেছিলেন বলা যায় না, তবে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' প্রথম রাধাকৃষ্ণ প্রণয়লীলার পূর্ণাঙ্গ রূপটি বিকশিত হল। বসন্তরাস, মান, অভিসার, বাসকসজ্জা, বিরহ, মিলন প্রভৃতি দ্বাদশসর্গে এবং বাইশটি গীতে তাঁর রাধাকৃষ্ণ লীলা বর্ণিত। এই গীতগুলি প্রাকৃত শব্দের মিশ্রণে সংস্কৃতে রচিত। তারপর আবির্ভূত হলেন নানান পদকর্তা। খাঁটি বাঙলায় প্রথম পুঁথি বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর রাধাকৃষ্ণ-লীলার দৃষ্টিকোণ কিছু বদলে গেল। 'দেহজ-মিলন'স্থলে 'ভাব-মিলন'। কিন্তু 'রাধাতত্ত্বে'র কথা থাক। যে নামেই ডাকুন, আপনাদের,তথা বাউলদের সাধনতত্ত্বের গভীরে বাস্তবে আছে 'প্রকৃতি-পুরুষ' তত্ত্ব। এটি আদৌ 'অর্বাচীন' নয়। প্রাগার্য সভ্যতাতেও পুরুষ ও স্ত্রী জাতির লিঙ্গপূজার আয়োজন ছিল। চীনখণ্ডেও অনুরূপ 'য়াঙ-য়িং' তত্ত্ব অতি পুরাতন। আপনারা সহজী-পন্থার মূলে যে অভ্যুপগমটি গ্রহণ করেছেন, সেখানে কিছু সন্দেহের অবকাশ আছে। আপনার গুরুদেবের মতে প্রকৃতিতে একমুখী প্রেম অস্বীকৃত। পশুপক্ষী, বক্ষপদ, মৎস্য এবং কীটপতঙ্গরা সে বিধান মানে না, এ বাধা মানব সমাজের। প্রথম কথা—তথ্যটা নির্ভুল নয়। অনেক পশু ও পক্ষী আজীবন একমুখীপ্রেমে আবদ্ধ থাকে। তবে স্বীকার্য, তারা সংখ্যায় অল্প। দ্বিতীয়ত মনুষ্যসৃষ্ট ব্যবস্থাপনা মাত্রেই দূষণীয় এ যুক্তি গ্রাহ্য নয়। ইন্দ্রিয়-সংযম, উপচিকীর্ষা, তিতিক্ষা এগুলিও তো মনুষ্যসমাজ সৃষ্ট। ঐ যে দুজন ওখানে অন্নপাক করছে আমাদের নৈশাহারের ব্যবস্থাপনায়, এই যে কর্মবিভাগ, পারস্পরিক সাহায্য এও তো সামাজিক বিধানে। কই এ-সব তো ত্যাগ করছি না। তৃতীয় কথা: মানবসভ্যতা বিবাহপ্রথা গ্রহণ করার পর প্রেমের একমুখীন স্বরূপটা সৃষ্ট হয়েছে—সে আজ কয়েক সহস্র বর্ষের অভিজ্ঞতা। অত সহজে কি তাকে ত্যাগ করা যায়? যায় কি যায় না সেটা পরের কথা—তার পূর্বে বিচার্য: সেটা কি বাঞ্ছনীয়? শীতলচন্দ্র আর রুক্মিণী তাদের সংস্কার পরিত্যাগ করতে পারেনি, তাই আপনাদের মতে তারা ব্রাত্য। কিন্তু আমার মতে তারা আদৌ 'ব্রাত্য' নয়, তারা এ আখড়ার প্রচুর প্রলোভনকে জয় করে তাদের একমুখী প্রেমকে রক্ষা করতে পেরেছিল—তারা তাদের সাধনায় উত্তীর্ণ, সার্থক। তাদের সফলতা আরও উজ্জ্বল এ-কারণে যে, তারা এ আশ্রমের অন্যান্য আবাসিকদের পর্যন্ত নিজ ধর্মমতে গোপনে দীক্ষা দিতে পেরেছিল। তারাও ইন্দ্রিয়-সংযম করে ওদের একমুখী প্রেমকে সম্মান জানিয়েছে।

কর্তা-মশাই এতক্ষণ নীরবে শুনে যাচ্ছিলেন। তাঁর প্রতিক্রিয়া কী হল তা বোঝা গেল না।

আখড়ায় নতুন জাতের কী সমস্যা হয়েছে সেটাও বলার সুযোগ হল না। এই সময়ে অন্যান্য বরাতিরা সবাই ফিরে এল।

কুসুম বিস্মিতা হয়েছিল, কিন্তু প্রতিবাদ করেনি। আহ্বানমাত্র ওঁর সঙ্গে নেমে এসেছিল পথে। এখনো সন্ধ্যা রাত। শুক্লা সপ্তমী। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোক, তবু পথঘাট দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। হাটতলার সীমানার বাহিরে এসে জানতে চেয়েছিল, কোথায় চলেছি আমরা?

রূপেন্দ্র বললেন, শঙ্খঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছ না? ঐ মন্দিরে। মন্দির চাতালেই গিয়ে রাতটা কাটাবো।

—কেন গো? ওঁরা আমাদের খুঁজবেন না রাতে?

—না, খুঁজবেন না। কর্তা-মশাই বুঝবেন। কাল সকালেই তো আমরা ফিরে আসব। আমাদের পোঁটলা-পুঁটলি তো রেখেই যাচ্ছি—

—তা না হয় হল; কিন্তু হাটতলায় রাত কাটাতে কী অসুবিধা ছিল?

পথ চলতে চলতে রূপেন্দ্র সংক্ষেপে জানালেন ওদের নৈশ-সাধনার কৌলিক প্রথার কথা। সে পরিবেশে রূপেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক রাত্রিযাপন করতে অসমর্থ। সব কথা শুনতে শুনতে কুসুম স্তম্ভিতা হয়ে গেল। এ-কথা তার ধারণার বাইরে। বৈষ্ণব বাবাজীদের অনেক কাণ্ড-কারখানাব কথা সে জানে, রূপনগরের মোহান্ত মহারাজের আখড়ায় যে-জাতের ব্যভিচার হত তাও শুনেছিল মাসির কাছে। কিন্তু প্রতি রাতে পর্যায়ক্রমে শয্যাসঙ্গীর পরিবর্তনের কথাটায় তার কেমন যেন বিবমিষার উদ্রেক হল। বললে, রাধাদিও তাই করে?

—একা সেই নয়, সবাই। এটাই তাদের কৌলিক ক্রিয়াকলাপ। ওরা সব পুরুষের ভিতর শ্রীকৃষ্ণকে, সব নারীদেহেই শ্রীরাধিকার সন্ধান করে।

—আমরা বরং এর পর একা-একাই তীর্থে-তীর্থে ঘুরব, কেমন?

রূপেন্দ্রনাথ হাসেন। বুঝতে পারেন, কুসুমের আজন্ম-লালিত সংস্কারে এ বার্তা কী জাতের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। শ্রবণমাত্র গোটা দলটাকে সে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। বললেন, সে-কথা কাল বিবেচনা করে দেখা যাবে। আপাতত ঐ শয়নারতি শেষ হবার আগেই আমাদের মন্দিরে পৌঁছতে হবে। একটু পা চালিয়ে চল।

মন্দিরটি গ্রামের বাইরে। কোন্ দেবী বা দেবতার মন্দির জানা নেই। তবে আলোর একটা আভাস দেখা যাচ্ছে। আর শোনা যাচ্ছে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি। পুরোহিত বোধকরি শয়নারতি করছেন। এর পর গর্ভগৃহে শিকল তুলে তিনি চলে যাবেন। তার পূর্বেই পুরোহিতের অনুমতি নিয়ে মন্দির চাতালে রাতটুকু কাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা চাই। কর্তা-মশাই সহজেই বুঝবেন—কেন উনি ঐ যৌথ শয়নব্যবস্থায় সামিল হতে পারলেন না। আর ভোর-রাত্রে তো ওঁরা দুজন ফিরেই আসবেন।

পথ চল্‌তে চলতে উপলব্ধি করলেন—মন্দিরটি গ্রাম থেকে বেশ কিছুটা দূরে। একটা নদীর কিনার ঘেঁষে। আরও কাছাকাছি এসে বুঝলেন—এটি একটি শ্মশান। ভাঙা হাঁড়ি, দূরে একটি চিতা জ্বলছে। দু-চারজন ঐ অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসে আছে। কথাটা প্রকাশ করলেন না। কুসুম যদি এটা খেয়াল না করে তাহলে তার পক্ষে না জানাই ভাল। অহেতুক ভয় পাবে।

কালীমূর্তি। পুরোহিত পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে আরতি করছেন। দুটি ছোট ছেলে কাঁসর-ঘণ্টা বাজাচ্ছে। স্থানটা বস্তুত জনমানবহীন। শুধু একজন বৃদ্ধ দোলাই গায়ে 'অন্তরাল'-এ বসে আছেন যুক্তকরে। একমাত্র দর্শক বা ভক্ত। ওঁদের দুজনকে এগিয়ে আসতে দেখে চোখ তুলে একবার দেখলেন। তারপর নিমীলিতনেত্রে বোধকরি কালীস্তোত্র আওড়াতে থাকেন।

আরতি শেষ হল। পুরোহিত পিতলের প্রজ্জ্বলিত কর্পূর-দীপটি হাতে নিয়ে এগিয়ে এলেন। কাঁসরঘণ্টা বাদকদের মাথায় অগ্নিতাপ দিলেন। বৃদ্ধের দিকেও দীপাধারটি এগিয়ে ধরলেন। বৃদ্ধ দোলাই থেকে দক্ষিণহস্তটি বার করে তাপ নিলেন। তারপর পুরোহিত ওঁদের দুজনকে দেখে একটু যেন চম্‌কে ওঠেন। দীপাধারটি বাড়িয়ে ধরেন। রূপেন্দ্র তার তাপ নিলেন, স্পর্শ করালেন কুসুমের মাথায়। এরপর চরণামৃত পান।

পুরোহিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওঁদের দেখছিলেন। রূপেন্দ্রকে প্রশ্ন করেন, ভিনদেশী মনে হচ্ছে? পূর্বে তো হরিপালে কখনো দেখিনি?

রূপেন্দ্র যুক্তকরে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। ভিনদেশী। বর্ধমানে বাড়ি। চলেছি ত্রিবেণীর ঘাটে। তীর্থযাত্রী। কাল সকালেই সিঙ্গুর যাব।

—মাত্র দুজন? সচরাচর এমনটি তো হয় না, বাবা?

—আজ্ঞে আমরাও বড় দলে আছি। বাকিরা হাটতলায় রাত্রিযাপন করছে। শয়নারতির শব্দ শুনে আমরা দুজন দেবীদর্শনে এগিয়ে এলাম। মা যেন ডাক পাঠালেন। মূর্তি কি মহাকালীর?

——আজ্ঞে না, ইনি বিশালাক্ষী। মহাকালীরই আর এক রূপভেদ। আপনাদের দুজনের নৈশ আহার হয়েছে? মায়ের প্রসাদ আছে—

রূপেন্দ্র বললেন, আমাদের নৈশাহার সমাপ্ত হয়েছে। তবে প্রসাদের কথা যখন বলেছেন তখন ঐ নৈবেদ্যের কণিকামাত্র প্রদান করুন। ... একটা কথা বাবা, আমরা দুজন যদি ঐ নাটমন্দিরে রাত্রিবাস করি তাহলে কি আপত্তি আছে?

রীতিমতো চম্‌কে উঠ্‌লেন পুরোহিত। বললেন, আপত্তির কিছু নাই। তবে এ স্থানটি জনমানববর্জিত। আমরা এখনি দ্বাররুদ্ধ করে চলে যাব। ঐ দূরে আমার দেবোত্তর ভদ্রাসন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আমার গৃহে স্থানাভাব ....

দোলাই-গায়ে এতক্ষণ নিঃশব্দে ওঁদের কথোপকথন শুনে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দৃঢ়স্বরে তিনি বলে ওঠেন, কিন্তু আমার গৃহে স্থানাভাব নেই। না হয়, কিছু অসুবিধাই হবে; তাই বলে এই শ্মশানে একা ...

কুসুমমঞ্জরী অস্ফুটে বলে ওঠে, শ্মশান!

—দেখছ না মা? ঐ তো চিতা জ্বলছে!

রূপেন্দ্র পুরোহিতমশাইকে প্রশ্ন করেন, এঁর পরিচয়টা ...

পুরোহিত সে-কথার জবাব না দিয়ে বৃদ্ধের দিকে ফিরে বলেন, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করেন

ঘোষাল মশাই! মায়ের ইচ্ছায় এভাবে বাধা দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে? শুনলেন না—উনি বললেন, 'মা যেন ডাক পাঠালেন!'

ঘোষাল অহেতুক থর-থর করে কেঁপে ওঠেন। উঠে দাঁড়ান। লুটিয়ে পড়া দোলাইটা গায়ে জড়িয়ে যুক্তকরে রূপেন্দ্রকে বলেন, না বাবা! মিছে কথা বলেছিলাম! আমার ঘরেও স্থানাভাব! আমি চলি ··· তারা! তারা! মা ···

যেন আকণ্ঠ কারণ-বারি পান করেছেন! টলতে টলতে বৃদ্ধ মন্দির ছেড়ে বার হয়ে গেলেন।

রূপেন্দ্র পুনরায় একই প্রশ্ন পেশ করেন, উনি কে?

—হরিপালের একজন তান্ত্রিক গৃহস্থ। বৃদ্ধবয়সে কিছুটা মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তাহলে, আপনারা দুজন ঐ মন্দির-চাতালেই রাতটা কাটাচ্ছেন? না, ভয়ের কিছু নাই। চোর-ডাকাত ত্রিসীমানায় নেই। 'লতা'র উপদ্রবও নাই এ অঞ্চলে। কিন্তু শয্যাদ্রব্য তো কিছু দেখছি না?

—একটা রাত তো! যা হোক করে কেটে যাবে।

পুরোহিত কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। পূজার বাসনপত্র অহেতুক কিছু নাড়াচাড়া করলেন। হঠাৎ ঐ ছেলেদুটিকে বিনা কারণে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বসলেন, তোরা এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা, ঘর্ যা!

ছেলে দুটি প্রায় হুড়মুড়িয়ে ঘর ছেড়ে বার হয়ে গেল।

পুরোহিত আবার আশ্বাসবাণী শোনালেন, মায়ের স্থান। ভয়ের কিছু নাই। তাছাড়া জমিদার মশায়ের ব্যবস্থাপনায় পাহারাদার চৌকি দেয়। তার হাঁক শুনবেন প্রহরে প্রহরে—'জাগতে রহো'! ভয় পাবেন না।

কুসুমের মুখটা রক্তশূন্য। রূপেন্দ্র বললেন, না, ভয় পাব কেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! মায়ের আহবানে এসেছেন! মায়ের অঞ্চলতলে আশ্রয় নিয়েছেন! ভয় কী? আমি তাহলে চলি, বাবা—

কাঁসর-ঘণ্টা বাদক ছেলে দুটি তাড়া খেয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল বটে কিন্তু একেবারে স্থানত্যাগও করেনি। দাঁড়িয়েছিল 'অন্তরাল'-এর স্তম্ভের আড়ালে।

পুরোহিত-মশাই এরপর যে কাণ্ডটা করলেন তার কার্যকারণ কিছু বোঝা গেল না। উনি মন্দিরদ্বারের বাহিরে একবার উঁকি দিয়ে দেখলেন। ছেলেদুটিকে দেখতে পেলেন না। হঠাৎ তুলে নিলেন ফলকাটার একটা বঁটি। তার ধারালো ফলায় দক্ষিণহস্তের মধ্যমাটা চেপে ধরলেন। রক্ত ফুটে বার হল। উনি প্রায় কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এসে ঐ বহিরাগত দম্পতির ললাটে রক্ততিলক এঁকে দিলেন।

বিস্মিত রূপেন্দ্রনাথ প্রশ্নটা না করে পারলেন না, এর মানে কী?

—এটাই প্রথা! আসুন, প্রণাম করুন মাকে। এবার আমি দ্বাররুদ্ধ করব।

প্রণামান্তে ওঁরা তিনজনে বার হয়ে এলেন গর্ভগৃহ থেকে।

ঠিক তখনই এগিয়ে এল কাঁসর-বাদক। আচমকা কুসুমমঞ্জরীর আঁচলে একটা টান দিল। কুসুম চমকে পিছন ফেরে। বলে, ও কী করছ?

—না, মানে দেখছি, আপনার আঁচলে চাবি বাঁধা আছে কি না!

1342

—চাবি! কেন?

পুরোহিত-মশাই ঘুরে দাঁড়ালেন। প্রচণ্ড একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিলেন ছেলেটার মাথায়। ওরা দুজন ছুটে পালালো।

রূপেন্দ্র বলেন, কী ব্যাপার বলুন তো? ওর ঐ অদ্ভুত কৌতূহল হল কেন? আমার স্ত্রীর আঁচলে চাবি বাঁধা আছে কি না ····

পুরোহিত কোনক্রমে বললেন, বালকের কৌতূহলের কি কোন মাথামুণ্ডু থাকে? আচ্ছা চলি! আপনার নামটিও জানা হয়নি ··· না, না, থাক ··· সে সব কথা কাল সকালে হবে ···

বালকের কৌতূহলের মাথামুণ্ডু হয়তো সব সময় থাকে না। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে বালকের ঐ বিচিত্র কৌতূহলটির একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। তাহলে রূপেন্দ্র-কুসুম উপাখ্যান ছেড়ে তোমাদের নিয়ে যেতে হবে অতীতকালে। হরিপাল জনপদের প্রতিষ্ঠাকালেব ইতিকথায়। এই মাতৃমূর্তির আদিম ইতিহাসটা না জানলে বালকের ঐ বিচিত্র প্রশ্নটা, আর ঘোষালমশায়ের আতঙ্কের তাৎপর্যটা ঠিক মতো ধরা যাবে না। এসব আমার বানানো গল্প নয় গো! রীতিমতো বইপত্র ঘেঁটে কাহিনীটি সংগ্রহ করেছি। কিছুটা পেয়েছি 'দিগ্বিজয় প্রকাশে', কিছুটা জেলা-ভিত্তিক গেজেটিয়ারে, কিছুটা পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত-'বাংলায় ভ্রমণ' গ্রন্থে (হ্যাঁ গো, তোমরা বিশ্বাস করবে তো—দুই খণ্ডে 1940 সালে প্রকাশিত সেই রেক্সিন-বাঁধাই 200+331 = 531 পৃষ্ঠার গ্রন্থটির মোট মূল্য ছিল দেড় টাকা!) এবং বেশ কিছুটা শ্রীসুধীবকুমার মিত্রের 'হুগলী জেলার দেবদেউল' আর 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ' গ্রন্থগুলি থেকে। স্বীকার করি—তার সঙ্গে মিশেছে অধম কথাকোবিদের কল্পনা:

গৌড়ে তখন হিন্দু রাজত্ব। পাল-বংশের আমল। সে সময়ে গৌড়াধিপতি সম্ভবত ধর্মপালের পুত্র দিগ্বিজয়ী দেবপাল। পালবংশীয় নৃপতিগণের কয়েকটি শাখা বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করদ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। হুগলী জেলার রাজা হরিপাল প্রতিষ্ঠিত রাজ্যও তার মধ্যে একটি। তাঁর পিতা কুলপাল সতীদেবীর বরে ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ছিল দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ হরিপাল ও কনিষ্ঠ মহিপাল। বৃদ্ধ বয়সে রাজা কুলপাল তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রকে ডেকে বললেন, আমি তোমার অনুজ অহিকেই আমার সিংহাসন দিয়ে যাব বলে মনস্থ করেছি। এ বিষয়ে তোমার কী অভিমত?

হরিপাল ছিলেন শালপ্রাংশু মহাভুজ বীর। যেমন তাঁর দৈহিক ক্ষমতা, শস্ত্রশিক্ষা, তেমনি উদার হৃদয়। তিনি যুক্তকরে বললেন, আপনার আদেশই শিরোধার্য পিতৃদেব। আমার অভিমতের তো কোনও প্রশ্ন ওঠে না।

মহারাজ বললেন, ওঠে। এ সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছি জান? অহি নাবালক। কিন্তু তুমি মহাবীর্যবান সাবালক। তোমাকে আমি সৈন্যসামন্ত দিচ্ছি, নিজ বাহুবলে তুমি একটি রাজ্য

প্রতিষ্ঠা কর এবং বংশানুক্রমে ভোগ কর। অনুজ অহি তোমার ছত্রছায়াতেই এখানে রাজত্ব করবে। এ বিষয়ে তোমার কী অভিমত?

—আমি প্রস্তুত মহারাজ!

পিতার আশীর্বাদ নিয়ে হরিপাল তখনই যুদ্ধ যাত্রা করলেন এবং পিতার জীবিতকালেই সিঙ্গুরের পশ্চিমে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন: 'মহাগ্রাম'। তাই কালে হল: হরিপাল।

দেবভাষায় না শুনলে তোমরা হয়তো ভাববে কথাকোবিদ বানিয়ে বানিয়ে 'গপ্পো' শোনাচ্ছে।

সুতরাং অবহিত হও:
"সতীদেব্যা বরেণৈব ভীমভুজবলপুত্রকঃ।। ৬৭৭
কুলপালো দেশশালো বিখ্যাতঃ পশ্চিমে তটে।
কুলপালস্য দ্বৌপুত্রৌ হরিপালো অহিপালকৌ।। ৬৭৮
জ্যেষ্ঠঃ সিঙ্গুর পশ্চিমে স্বনামবসতিং কৃত।
'হরিপালো' মহাগ্রামো হট্টবাপীসমন্বিতঃ।। ৬৭৯" —দিগ্বিজয়প্রকাশ।

কী? এবার বিশ্বাস হল তো?

সে আমলে ঐ হরিপাল গ্রামের কিনার ঘেঁসে দু-দুটি নদী প্রবাহিত। একটির নাম কৌশিকী, অপরটি বিমলা। বাস্তবে দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রাচীন দামোদর। তা সে যাই হোক, ঐ জনপদ প্রতিষ্ঠা করার পর বেশ কয়েকঘর মানুষ এসে ওখানে বসবাস শুরু করল—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ-গোপ। অচিরেই জনপদটি সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠতে থাকে। নির্মিত হল মন্দির, চতুষ্পাঠী, পণ্যবিপণী, হাটতলা, অসংখ্য ভদ্রাসন।

কিন্তু একটি উপদ্রব লেগেই ছিল। কৌশিকী নদীর কিনার ঘেঁষে ছিল এক অরণ্য। আর সেখানে বাস করত একদল দুর্ধর্ষ ডাকাত। জাতে তারা চণ্ডাল। রঘু-চাঁড়াল তাদের সর্দার। অসীম বলশালী আর অত্যন্ত দুঃসাহসী। রাজা হরিপাল বহু আয়াসেও ঐ ডাকাতদলকে ধরতে পারেননি। গ্রামপ্রান্তে কৌশিকী নদীর শ্মশানে ছিল এক প্রাচীন ডাকাতে-কালী—তার নাম 'চণ্ডালী-মা'। রঘু ডাকাত প্রতিবার ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে তাঁর পূজা করে যায়। হরিপালে পণ্যবাহী সার্থবাহের দল রঘুডাকাতের আতঙ্কে এ রাজ্যে বাণিজ্যে আসতে সাহস পায় না। প্রায়ই ডাকাতের দল তাদের ধনসম্পদ লুটেপুটে নিয়ে যায়। শুধু তাই নয়—রঘুর ডাকাতির আর এক মর্মন্তুদ বৈশিষ্ট—সর্বস্ব লুটে নেবার পর সে একটি হতভাগ্যকে বন্দী করে নিয়ে যায়। ঠিক যেভাবে চণ্ডালেরা বাঁশ থেকে ঝুলিয়ে নিয়ে যায় শূকর। ঐ ডাকাতে-কালীর যূপকাষ্ঠে বন্দীকে বলি দেওয়া হয়! মাঝে মাঝেই শোনা যায় সেই মৃত্যুভীতের করুণ আর্তনাদ—আরণ্যক অন্ধকার ভেদ করে আসছে। এই পরিবেশে কি রাজ্যের সমৃদ্ধি সম্ভব?

হরিপাল বহু চেষ্টা করেও ডাকাত দলকে ধরতে পারেননি। সে আজ এখানে তো কাল ওখানে। দু একবার ওঁর সৈন্যদলের সঙ্গে ডাকাতদলের প্রত্যক্ষ সংগ্রামও হয়েছে। দু-পক্ষেই হতাহত হয়েছে। রঘু-ডাকাত ঘায়েল হয়নি। জনশ্রুতি, ওর হাতে ঐ চারহাত প্রমাণ লাঠিগাছখানা থাকলে তাকে ঢিল মারা যায় না। বিদ্যুৎবেগে ঘূর্ণ্যমান যষ্টি-প্রাকারে প্রতিহত হয়ে লোষ্ট্রখণ্ড ফিরে আসে। রঘু এ অঞ্চলের দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল।

তারপর একদিন। সূর্য তখন তুলারাশিতে। কার্তিক মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী। রাজা হরিপালের কাছে সংবাদ এল লুট হয়েছে দ্বারহট্টী গ্রামের চণ্ডী ঘোষ-এর গদী। সর্বস্ব লুট করে ডাকাতেরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে তাঁর কিশোর বয়স্ক হতভাগ্য পুত্রকে। গ্রামের অনেকেই শুনেছে সেই কিশোরের 'অরণ্যরোদন'।

হরিপাল সিদ্ধান্তে এলেন ! এই সুযোগ ! দুদিন পরেই কালীপূজা। সেই পুণ্য তিথিতে নরবলি দানের মহাপুণ্য অর্জন করতে চাইছে রঘু। তিনি গোপনে সৈন্য সমাবেশ করলেন। আন্দাজ করলেন—কালীপূজার সন্ধ্যারাত্রে আক্রমণ করলে ঐ চণ্ডালী-মায়ের মন্দিরে সদলবলে রঘুডাকাতের সাক্ষাৎ পাবেন।

হরিপালের অনুমান নির্ভুল। সমস্ত অরণ্যভূমি বেষ্টন করে, পলায়নের প্রতিটি ছিদ্রপথ রুদ্ধ করে রাজা হরিপাল হানা দিলেন মায়ের মন্দিবে।

কিন্তু অতর্কিতে কার্যসিদ্ধি হল না। ওপক্ষও সজাগ ছিল। নিঃশব্দে নীরন্ধ্র অমাবস্যা রাত্রে অগ্রসর হচ্ছিলেন সসৈন্য; কিন্তু অকস্মাৎ অরণ্য মধ্যে কোথায় যেন শঙ্খধ্বনি হল। আর তৎক্ষণাৎ অরণ্যের এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে শোনা গেল দুন্দুভি নিনাদ। মন্দিরের গর্ভগৃহে যে ঘৃতপ্রদীপটা জ্বলছিল এতক্ষণ, তা দপ্ করে নিভে গেল।

অন্তরীক্ষ থেকে যেন দৈববাণী হল : শুন্‌বে হরি-রাজা ! তুই মোবে দ্যাখতি লারছিস। তোরা শহুরে মনিষ্যি—আঁধাবে দ্যাখতে পাস্‌নে ! কিন্তুক মুই তোরে দ্যাখতে পাই ! পেত্যয় না হয় তো বল্—এক বাণে তোরে ফুঁড়ে দিই !

রঘুডাকাতের কণ্ঠস্বর ! হরিপাল বোঝেন, এ ওর ত্রাসসঞ্চারী মিথ্যা আস্ফালন। এ নীরন্ধ্র অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। দেখা সম্ভবপর নয়। কিন্তু মশাল জ্বালা চলবে না—তাহলেই তাঁদের বাণবিদ্ধ হতে হবে। হরিপাল গর্জে ওঠেন, রঘু ! তুই চণ্ডী ঘোষের ছেলেটাকে তুলে এনেছিস ?

—হঁ রে ! তারে বলি দিব আজ ! তা হঁ রে রাজা—তুইও তো হেঁদু ! মায়ের পূজায় বাধ সাধ্‌ছিস্ কেনে রে ?

রাজা বললেন, আজ কালীপূজা। আমি মায়ের পূজা করতে এসেছি। তুইও তো হিন্দু রে রঘু ! তুই আমাকে রুখছিস্ কোন অধিকারে ?

অরণ্যভূম যেন কেঁপে-কেঁপে উঠ্‌ল দুঃসাহসী ডাকাতের অট্টহাস্যে। রঘু হাসি থামিয়ে বললে, ফন্দিটো ভালই ঠাউরেছিস্ রাজা ! কিন্তু এ যে চণ্ডালী মা ! এ ঠাঁইয়ে তুই কেন্ রে ?

হরিপাল বললেন, না ! মা সবারই মা ! আমি এ রাজ্যের রাজা। মায়ের পূজার অগ্রাধিকার থাকে রাজার !

রঘু ফিরিয়ে দেয় জবাব, না রে রাজা ! চণ্ডালী-মা রাজা-পেরজা মানে না ! যার গায়ে তাগৎ বেশি তারই পূজা নেয় !

—তবে সেটাই প্রমাণ কর ! তোর তাগৎ আমার চেয়ে বেশি ! বল, কী নিয়ে লড়বি ? তরোয়াল, লাঠি না মল্লযুদ্ধ ?

রঘু এককথায় মেনে নিল। দু-পক্ষই মায়ের নামে শপথ করলেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধে স্থির হবে মায়ের পূজার অগ্রাধিকার কার। দুপক্ষের ধানুকীরা বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করে রইল ধনুকে আকর্ণ

জ্যা আকর্ষণ করে। কোন পক্ষ তঞ্চকতা করলে তৎক্ষণাৎ ফুঁড়ে দেবে! অরণ্যভূমে জ্বলে উঠল মশাল। রঘু-ডাকাত বেছে নিয়েছে যাতে তার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা: লাঠি!

মন্দিরের চাতালে দণ্ডায়মান হলেন দুই যোদ্ধা। দুজনের হাতেই চারহাত-প্রমাণ লাঠি। দর্শকেরা অদৃশ্য। সবাই বৃক্ষান্তরালে। রঘু ডাকাতের ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। নিম্নাঙ্গে শুধু মালকোচা-সাঁটা খেটো ধুতি। রাজা খুলে রাখলেন তাঁর রাজ-পরিচ্ছদ। দুজনে দাঁড়ালেন মুখোমুখি!

নেপথ্যে বেজে উঠল ভেরী। যুদ্ধারম্ভের ঘোষণা!

রঘু-চাঁড়াল প্রচণ্ড বলশালী। লাঠি খেলায় তার অসীম পারদর্শিতা। আন্দাজ করেছিল লড়াইটা 'ফতে' হতে অদৃশ্য দর্শকদের চোখে পলক পড়বে না। কিন্তু তা হল না। তার প্রতিটি আঘাত প্রতিহত হয়ে ফিরে এল। রাজা হরিপাল যেন এক মন্ত্রঃপূত যষ্টিপ্রাকারের দুর্গে আশ্রয় নিয়েছেন! তিনি ক্রমাগত আত্মরক্ষামূলক লড়াই করে চলেছেন। একবারও প্রত্যাঘাত করছেন না। রঘু একটু বিস্মিত হয়ে পড়ে—লোকটা দুধ-ক্ষীর-ননী খেয়ে মানুষ! এমন লাঠির খেলা সে শিখল কবে? আর লোকটা ক্রমাগত আত্মরক্ষামূলক লড়াই করছে কেন? কই, সে তো একবারও 'শির তামেচা সামালকে' হেঁকে তেড়ে এল না। ক্রমে স্বেদবিন্দু ফুটে ওঠে রঘুর ললাটে। এক লাফে তিন-পা পিছিয়ে গিয়ে বলে, তু লড়ছিস না কেনে রে রাজা?

হরিপালও তিন-পা পিছিয়ে গিয়ে বলেন, লড়ছি না? বলিস্ কী রে রঘু? একবারও ছুঁতে পারলি আমাকে?

—কিন্তুক তু তো খালি ঠেকাইছিস্! এক তরফা! কেনে?

রাজা হেসে বলেন, উপায় কি? আমি রাজা, তুই যে প্রজা! আজ বছরকার দিনে কি তোকে ঘায়েল করতে পারি? তুই যে আমাব ছেলের মতো রে!

—তোর ছাওয়াল! মুই তোর ছাওয়াল! তবে দ্যাখ্!

ক্ষিপ্ত শার্দূলের মতো হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে রঘু ডাকাত সজোরে আঘাত হানল রাজমস্তক লক্ষ্য করে। আর ঠিক তখনই হরিপালের যষ্টি বিচিত্র ভঙ্গিতে একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করল গগনমার্গে। যেন বিদ্যুতের একটা ঝলক!

দেখা গেল রঘু-ডাকাতের যষ্টি হস্তচ্যুত হয়েছে। বহুদূরে ছিটকে পড়েছে। রাজা সে পথটা আড়াল করে দাঁড়ালেন! নিরস্ত্র রঘু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইচ্ছা কবলে হরিপাল সেই মুহূর্তে রঘুকে শুইয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করলেন না। বললেন, যা। কুড়িয়ে নিয়ে আয় তোর লাঠি! নিরস্ত্রকে আমি আঘাত করি না।

রঘু হঠাৎ নতজানু হল। হোক ডাকাত! তবু সে তো লাঠিয়াল! বললে, না রে রাজা! রঘুও যে কারও দয়ায় জান বাঁচায় না! লাঠি কুড়ায়ে আনব কোন কালামুয়ে? মার!মোর শিরটো ফাট'য়ে দে!

হরিপাল নিজের লাঠিটাও ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দূরে। নিরস্ত্র নৃপতি রঘুকে অতিক্রম করে উঠে গেলেন মন্দিরের গর্ভগৃহে। পরমুহূর্তেই ফিরে এলেন তিনি। তাঁর কোলে মূর্ছিত কিশোরের দেহ। তার হাত-পা বাঁধা। রাজা বললেন, তোর লোকজনদের ডাক। এবার আমি মায়ের পূজা করব। তুইও আয়। নরবলি নয়, ছাগবলি হবে এখানে! বাচ্চাটার মুখে-চোখে জল দে। ভয়ে

মূর্চ্ছা গেছে!

রঘু ডাকাত সদলবলে যোগ দিয়েছিল হরিপালের সৈন্যবাহিনীতে। হরিপাল মায়ের মন্দিরটি নতুন করে গড়ে দিয়েছিলেন। 'চণ্ডালী-মা' নামটা কালে পরিবর্তিত হয়ে গেল : মা বিশালাক্ষী।

দেবী চতুর্ভুর্জা, উচ্চতা প্রমাণ-মানুষের চেয়েও বড়। কণ্ঠে মুণ্ডমালা। "দেবী শবোপরি 'আড়বিঘা', মহাকালের উপর দক্ষিণ পদ ও বিরূপাক্ষের মাথার উপর বামপদ দিয়ে দণ্ডায়মানা। তাঁর দু-পাশে আছেন জয়া ও বিজয়া। দেবীর পদতলে পাদপীঠের উপর পাঁচটি অসুরের মুণ্ড অবস্থিত।"

তারপর শতাব্দীর একপাদ অতিক্রান্ত হয়েছে। রাজা হরিপাল এখন বৃদ্ধ। অনেক অনেক কীর্তি স্থাপন করেছেন তিনি। হরিপাল রাজ্যও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে। রঘু এখন আর ডাকাত নয়, রাজার এক বিশিষ্ট সেনানায়ক। বহুবার রাজার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। পর্ণকুটির নয়, পাকা বাড়িতে সে স্ত্রীপুত্র নিয়ে বাস করে। একজন সম্পন্ন অমাত্য।

তারপর একদিন। রঘু তার কিশোরপুত্রটির বিবাহ দিয়ে গ্রামে ফিরছিল। দুটি পাল্‌কিতে বর আর নববধূ, অশ্বপৃষ্ঠে বরযাত্রী দল—যারা এককালে ছিল এ অঞ্চলের কুখ্যাত ডাকাত, এখন রাজ-সেনাবাহিনীর বেতনভুক সৈন্য। বেশ কিছু পদাতিক। সে দলে মশালধারী আর বাজনদার। ভিন গাঁ থেকে বরযাত্রী দল শোভাযাত্রা করে এগিয়ে যাচ্ছিল সেনাপতির বর্তমান আবাসে। হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন রঘু : রুখ্ যা!

তাঁর দলবলকে বললেন, বেটা-বেটাবউ নে ঘরকে ফিরছি, সবার আগে সাবেক মায়েরে পেন্নাম করি আসি। তোরা আগায়ে যা, ঘরকে যেয়ে বল্ কেনে, এখনই আসপ আমরা।

পুত্র ও নববধূর পাল্‌কি নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে শ্মশানের দিকে মোড় নিলেন রঘু। মনে পড়ল, বহুদিন তিনি আসেননি চণ্ডালীমায়ের 'থানে'। এখন এ দেবীর পূজার আয়োজন রাজসরকার নিয়ন্ত্রিত। মন্দিরকে নতুন করে গড়েছেন রাজা মশাই। নিয়োজিত হয়েছে পুরোহিত, দেবোত্তর ভূখণ্ড দান করেছেন—প্রায় দুইশত বিঘা আমন ধানের জমি। প্রতি অমাবস্যায় ছাগবলির ব্যবস্থা, অন্যান্য দিন নিত্যপূজা।

মন্দিরের কাছাকাছি যখন এলেন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। স্থানটা নির্জন। সন্ধ্যারতি সেরে পুরোহিত দ্বারে শিকল দিয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন। অরণ্যপ্রান্তে পাল্‌কি বাহকদের রুখলেন রঘু। অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নিজেও অবতরণ করলেন। পুত্রকে আহ্বান করেন, নামি আয় বাপ্, পায়ে হাঁট্টে যাতি হবে। তুম্মো আইস, মা জননী।

পুত্র নির্দেশমতো নেমে এল পাল্‌কি থেকে। তবু জানতে চাইল, কেন বাবা?

—'কেন' কি শুধাস্ রে পাগলা! মায়ের থানে পাল্কি চাপি যাতি হয়? আয়।

পদব্রজে এগিয়ে গেলেন তিনজন। পাল্‌কি-বাহকেরা অপেক্ষা করল। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলতে থাকেন। নববধূ বালিকা মাত্র—অষ্টম বর্ষীয়া, পুত্রটি কিশোর। রঘুর মনে কৌতুক জমলো। দ্রুতপদে প্রায় দৌড়েই অগ্রসর হলেন। পুত্রকে বললেন, তাড়াহুড়া নাই, ধীর কদমে আগুয়ে আয়।

পুত্র এবং তার নববধূকে এই আরণ্যক নির্জনতায় বোধকরি কিছু সুযোগ দেবার ইচ্ছেটা মাথা

চাড়া দিয়ে উঠেছে খুশিয়াল মানুষটার। একলাই উঠে এলেন মন্দির-সোপান বেয়ে। শিকল খুলে মায়ের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠেন। মা যেন শীর্ণা! মা যেন অনশনক্লিষ্টা!

রঘুনাথ প্রণিধান করলেন তার হেতু। করজোড়ে বললেন, কী করব ক মা? রাজা যে বারণ করিছে। নরবলি হতে দিবেনি। ছাগমাসে কি তোর অভর প্যাট ভরে না রে পাগলি?

মা প্রত্যুত্তর করবার সুযোগ পেলেন না। নবদম্পতি ততক্ষণে এসে পৌঁচেছে। কিন্তু রঘুনাথের প্রত্যয় হল মায়ের তৃতীয় নয়নে স্পষ্ট ভ্রূকুটি। দুটি হাত জোড় করে মনে মনে বললেন, দিব্যি করলম রে মা, তোরে আনি দিব তু যা চাস্। কিন্তু কারেও বলবি না। গুপনে কাম সারপি, হুঁ?

মায়ের মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটে উঠ্‌ল।

রঘুনাথ ওদের বললেন, পেন্নাম কর। মায়েরে দক্ষিণা দে!

তখনই খেয়াল হল। তিনি তো সিক্কাটাকার থলিটা নিয়ে আসেননি। সেটা রাখা আছে পাল্‌কিতে। পুত্রকে বললেন, টুক্ বসি থাক। মুই যাপ আর আসপ।

দ্রুতপদেই ফিরে গেলেন পাল্‌কির কাছে। পাল্‌কিবাহক মুনিষগুলো ছিলিম ধরিয়েছিল। কর্তাকে ফিরে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি ছিলিমটা লুকালো। রঘুনাথ পাল্‌কি থেকে টাকার থলিটা তুলে নিলেন। আজ এই আনন্দের দিনে তিনি যেন সেই হারানো দিনগুলোতে ফিরে যেতে চান। তাই পাল্‌কিবাহক দলের সর্দারকে বলেন, হেই তারকে! ছিলিমটো অ্যাক্কেবারে শ্যাস্ করি দিসনি। পুজো দে আস্যে মুইও টুক্ সেবা করপ নে!

বাহক-সর্দার তারক সরমে যেন মাটিতে মিশে যায়।

দ্রুতপদেই ফিরে এলেন রঘুনাথ। ততক্ষণে অন্ধকার ঘনিয়েছে।

কিন্তু এ কী? মন্দিরে তো ওরা নেই! মন্দিরের দ্বার খোলা। জনমানব নেই সেখানে। এদিক-ওদিক খুঁজলেন। কাকস্য পরিবেদনা। বেরিয়ে এলেন বাইরে। অরণ্যের দিকে ফিরে হাঁকাড় পাড়েন শিবঅ—অঅঅ!

কিশোরপুত্র শিবনাথ সাড়া দিল না। মেজাজটা খিচড়ে গেল। একটু আগে যে খুশিয়াল ভাবটা ছিল—যে মন নিয়ে তারককে বলেছিলেন ছিলিমে গঞ্জিকা কিছু অবশিষ্ট রাখতে, সে মনটা হারিয়ে গেল। তিলতিল করে ফিরে আসছে তাঁর বংশানুক্রমিক চণ্ডালে রাগ। একটা আক্কেল থাকবে তো? বাপ রয়েছে নাগালের মধ্যে, জানে যে এখনি ফিরবে—অথচ এরই মধ্যে কচি বউটাকে নিয়ে এই ভরসন্ধ্যে বেলা লুকোচুরি খেলছিস্!

আবার দিলেন হুঙ্কার: শি—বঅঅঅ—!

প্রতিধ্বনিই ফিরে এল শুধু।

প্রতিবর্তী-প্রেরণায় কাজ। পঁচিশ বছরের অনভ্যাস, তবু জাতে ডাকাত তো! ডানহাতের তালুটা ওষ্ঠাধরে লাগিয়ে 'কুক' দিয়ে উঠ্‌লেন হঠাৎ: আ—বাবাবাবা!

পাল্‌কিবাহকেরাও ওঁর প্রাক্তন চেলা-চামুণ্ডা। দূর থেকে ভেসে এল তাদের প্রতিধ্বনি: আ—বাবাবা! —ভয় নাই কর্তা! শুনছি! মোরাও আলাম বলে!

পরক্ষণেই বনজঙ্গল ভেদ করে ছুটে এল আট-দুকুনে ষোল বেহারা।

তন্নতন্ন করে খুঁজল সবাই। সারা বন। সারা শ্মশান! কোথায় কে?

হঠাৎ তারক স্থান-কাল-পাত্র ভুলে চেপে ধরল কর্তার হাত।

মায়ের দিকে তর্জনী তুলে বল্‌লে, ইডা কি বটে গ কর্তা?

—কী?

কর্তা ঁমায়ের দিকে তাকালেন। তাই তো! ঁমায়ের নাকে তো নথ ছিল না! ওটা তাহলে কী? গোলাকৃতি রূপার নথের মতো! কিন্তু না! নাসিকা থেকে তো ঝুলছে না! গোলাকার বস্তুটা আটকে আছে ঁমায়ের ওষ্ঠাধর প্রান্তে। রঘুনাথ এগিয়ে এলেন। বৃত্তাকার ধাতব বস্তুটায় তর্জনীটা বাঁকিয়ে একটা মোক্ষম টান দিলেন! ছিড়ে বেরিয়ে এল সেটা ঁমায়ের মুখ থেকে!

একটা চাবির ক্ষুদ্রাকার রৌপ্যবলয়! তাতে দু-তিনটি কুঞ্চিকা। আর তার সঙ্গে ঢাকাই খাসা মসলিনের একটা ছিন্নাংশ। ঘোর রক্তবর্ণের। যে শাটিকা পরিধান করে নববধূ এতক্ষণ আসছিল পাল্‌কি চেপে তারই একটা টুকরো!

কিন্তু … কিন্তু সেটা তো ছিল নীলাম্বরী! এ তো ঘোর লাল!

পরক্ষণেই প্রণিধান করলেন হেতুটা। সেই ছিন্ন অঞ্চলপ্রান্ত থেকে টপ্‌টপ্ করে ঝরে পড়ছে রক্ত। নীলবর্ণের খাসা-মস্‌লিন ঘোর রক্তবর্ণের হয়ে গেছে একটি হতভাগিনী বালিকার শোণিতে! ঁমায়ের করাল দংষ্ট্রার নিষ্পেষণে! বরবধূ ঁমায়ের জঠরে!

মরণান্তিক একটা জান্তব আর্তনাদ করে রঘুনাথ লুটিয়ে পড়লেন চণ্ডালী ঁমার চরণমূলে! মূর্ছিত হয়ে!

মূর্ছা ভাঙল তিনদিন পরে, কিন্তু জ্ঞান ফিরল না। রঘুনাথ ঘোর উন্মাদ হয়ে গেছেন। বেঁচে ছিলেন আরও তিন বছর, কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায়—বদ্ধ উন্মাদ! সম্ভবত তাঁর ভারসাম্যহীন অন্তরে ও-প্রশ্নটা আদৌ জাগেনি—চণ্ডালী মা কি ভুল বুঝেছিলেন? ওঁর সেই মনে-মনে বলা প্রতিশ্রুতিটায়: দিব্যি করলম্ রে মা! তোরে আনি দিব তু যা চাস্। কিন্তু কারেও বলপি না, গুপনে কাম সারপি! হুঁ?

রাজা হরিপাল কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল রইলেন। তাঁর রাজ্যকালে ওখানে আর নরবলি হয়নি। হল পরবর্তী জমানায়! তাও কালে-ভদ্রে। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীকে আর ফাঁসিকাঠ থেকে ঝোলানো হত না। এতে সাপও মরে, অথচ লাঠিটাও ভাঙে না।

কিন্তু মানুষের মনে একটা আতঙ্ক জেগেই থাকে। হরিপাল গ্রামে ইতিমধ্যে আরও অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার মধ্যে সর্ববিখ্যাত 1873 সালে প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দজীর মন্দির। রায়বংশের প্রতিষ্ঠা করা পোড়ামাটির আটচালা দেউল। ফলে ভদ্র গ্রামবাসী সেই সব মন্দিরেই পূজা দিতে যায়। শ্মশানকালী ক্রমে ক্রমে উপেক্ষিতা হয়ে পড়তে থাকেন। পূজার অধিকার ফিরে পেল চণ্ডালেরা। তারা ছাগবলির সঙ্গে শূকরবলির প্রবর্তন করল—ফলে, বিশালাক্ষী পুনর্মূষিক হয়ে পড়লেন কালে: চণ্ডালী-মা! তবু যে ব্রাহ্মণ পুরোহিত-বংশ দেবোত্তর ভোগ করেন তাঁরা নিত্যপূজার ব্যবস্থাটা বজায় রেখেছেন—না হলে দেবোত্তর ভোগ করতে পারবেন না।

কালের রথচক্র পাক খায়। আবার নতুন যুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ ফিরিয়ে আনতে চায় প্রাচীন-প্রথা। মাঝে মাঝে নিখোঁজ হয়ে যায় ভিন গাঁয়ের পথ-চল্‌তি মানুষ!

হরিপদ

রূপেন্দ্রনাথ সঙ্গিনীর হাত ধরে এসে বসলেন মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দিরে। দু-হাত উঁচু পোতা—চুন-সুরকির মাজা-মেঝে। প্রাচীর নাই। চারি দিকেই খোলা-মেলা। মোটা মোটা তাল-খুঁটির উপর তালের রলা। তার উপর শালকাঠের চাল-সাঙা। উপরে উলুখড়ের বাঙলা আটচালা। নিপুণ ঘরামির হাতের কাজ—পাড়, পাটি, বাখারি, শারক, শলা-ফোঁড়ের ঠাস্‌বুনানি। উপরে বরফি-আকারে তল্‌তা বাঁশের চৌখুপি। কালবোশেখী ঝড় তো ছাড়—শালিক পাখিও তুলে নিয়ে যেতে পারে না উলু ঘাসের একটি কাঠি!

ম্লান জ্যোৎস্নার আলো। মুঠো-মুঠো জোনাক জ্বলছে। দূরে যে চিতাটা জ্বলছিল সেটা নিবে গেছে। একটু আগেই কলসি ভেঙে শ্মশানযাত্রীরা ফিরে গেছে গৃহে: 'বিমুখাঃ বান্ধবাঃ যান্তি, ধর্মস্তিষ্ঠতি কেবলম'!

রূপেন্দ্র সঙ্গিনীকে বললেন, তুমি শুয়ে পড়। আমি জেগে আছি। ঘুম আসছে না আমার!

মঞ্জরী শুয়ে পড়ে—ওঁর জানুতে মাথা রেখে। বলে, সারাদিন এতটা হেঁটেছি, ঘুম আসছে না কেন?

রূপেন্দ্র জবাব দিলেন না। মঞ্জরী বুঝতে পারে। বলে, কাজটা বোধহয় ঠিক হল না। হাটতলায় রাতটা থেকে গেলেই ভাল হত। না হয় একটু দূরে শুতাম আমরা!

ঐ কথাই ভাবছিলেন তিনিও। কী যেন একটা অস্বোয়াস্তি বোধ করছেন। তাঁরও মনে হচ্ছে: কাজটা ভাল হয়নি।

এই তো কিছুক্ষণ আগেই মঞ্জরী বলেছিল ঐ দলটিকে ত্যাগ করে ওঁরা বাকি পথ পৃথক ভাবেই যাবেন। কিন্তু এখন সেই ভ্রষ্টাচারী সহজপন্থীদেব সান্নিধ্যই কামনা করছে সে। হোক ভ্রষ্টাচারী—তবু তো তারা মানুষ' এটা যে মৃত্যুর ওপাবের রাজত্ব—এই জনমানবহীন শ্মশানভূমি। যে হতভাগ্যদের বলিদান করা হযেছে অশান্ত সেই পরিচয়-হারা প্রেতাত্মার দল যে এখানে পাগলের মতো ঘুরে ঘুরে মবছে! ঐ যে জোনাকিগুলো বারে বারে মিটমিট করে ওঁদের দুজনকে দেখছে তারা কি সেই প্রেতাত্মার চোখ?

শ্মশানের দিক থেকে সমস্বরে ভেসে এল যামঘোষের আর্তনাদ, যেন ওরা সমবেতভাবে সেই কথাটাই বলতে চায়: 'তফাৎ যাও! সব ঝুট হ্যয়!'

হঠাৎ কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসল মঞ্জরী, ওটা কী?

তার তর্জনীসঙ্কেতে ঘুরে দেখলেন। নদীর ওপারে একটা আলোর পিণ্ড জলের উপর নেচে বেড়াচ্ছে। মরা নদী। জলজ উদ্ভিদ পচে একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ ভেসে আসছে। রূপেন্দ্র বললেন, ও কিছু নয়, আলেয়া!

মঞ্জরী ওঁর হাতটা দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরল। রূপেন্দ্র সান্ত্বনা দিলেন, ভয়ের কিছু নেই মঞ্জু, ও একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। বদ্ধ জলাশয়ে আপনা থেকেই অমন আগুন জ্বলে, আপনা থেকেই নিবে যায়।

তাই গেল। আগুনের গোলাটা যেন জলে ডুবে গেল!

রূপেন্দ্রনাথ ওকে আবার জোর করে শুইয়ে দিলেন। আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইল মঞ্জরী। এ পরিবেশে সে কিছুতেই ঘুমাতে পারবে না। রূপেন্দ্র একটা তাল খুঁটিতে ঠেশ দিয়ে বসলেন। তাঁর বার বার মনে হচ্ছিল—এ শ্মশানভূমি আদৌ জনহীন নয়। এখানে অনেক-অনেক দর্শকের সমাবেশ ঘটেছে। এমন নবদম্পতিকে তারা যে অনেক দিন দেখেনি। এখানে কেউ রাত্রিবাস করে না। দর্শকদের দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তারা ওঁদের দেখছে। হয়তো ভাবছে—তাদেরও ছিল এমন আনন্দঘন দাম্পত্য জীবন। সে জীবনে অকস্মাৎ ছেদ পড়েছিল ঘাতকের খড়্গাঘাতে। অতৃপ্তির হাহাকারটুকু সম্বল করে তারা দেহাতীত মৃত্যুরাজ্যে রওনা হতে বাধ্য হয়েছিল এক-দিন।

কিন্তু সেই ছেলেটি হঠাৎ মঞ্জরীর আঁচল ধরে টান দিয়েছিল কেন? অজানা-অচেনা এক ভিনদেশী তীর্থযাত্রিণীর অঞ্চলপ্রান্তে চাবি বাঁধা আছে কিনা সে বিষয়ে তার কিসের কৌতূহল? পুরোহিত-মশাই বলেছিলেন—'বালকের ছেলেমানুষী'। তাই যদি তাঁর ধারণা, তাহলে হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন কেন তিনি? প্রহার করলেন কী কারণে ঐ ছেলেমানুষীর জন্য? ঐ 'চাবি'র গভীরে কি রয়ে গেল কোন অজ্ঞাত রহস্য? কোন্ রুদ্ধদ্বারের সেই কুঞ্চিকা? নাকি চাবির প্রসঙ্গ নিছক একটা অছিলা মাত্র? ছেলেটি তার দিদির বয়সী ঐ সুন্দরী অচেনা মেয়েটিকে সাবধান করে কিছু বলতে চেয়েছিল। কী কথা? 'সব ঝুট হ্যয়, তফাৎ যাও!'

দ্বিতীয়ত সেই ঘোষাল মশাই! অপ্রকৃতিস্থ বলে তো মনে হয়নি তাঁকে! পূর্বমুহূর্তে তিনি বলেছিলেন—তাঁর গৃহে স্থানাভাব হবে না, হলেই বা কী? এমন নির্জন শ্মশানে তিনি ওঁদের দুজনকে রাত্রিবাস করতে দেবেন না। অথচ পুরোহিত-মশায়ের ধমক খেয়েই তিনি সম্পূর্ণ বদলে গেলেন। কাঁপছিলেন থরথর করে। কেন? কেন?

আর সবচেয়ে বড় কথা ঐ পুরোহিতের আচরণ। তিনি নিজেও অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। আগন্তুকদের ললাটে রক্ততিলক পরিয়ে দেওয়ারই বা কী তাৎপর্য? বলেছিলেন, 'এটাই প্রথা!'

প্রথা! অর্থাৎ? তন্ত্র-উপাসকের বংশ! এভাবে রক্ততিলক কপালে এঁকে দেবার কী তাৎপর্য তা তো তাঁর অজানা নয়! কিন্তু এখানে তার প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? তাঁরা দুজন কিছু উৎসর্গ করা ছাগশিশু নন!

সহসা অন্য একটা আশঙ্কা জাগল। তাঁর মনে পড়ল—শ্মশানকালীর পূজা সাধারণত করে ডাকাতের দল। অজানা-অচেনা দেশ। এদের কিছু দুরভিসন্ধি নেই তো? কিন্তু ওঁরা এসেছেন খালি হাতে। মঞ্জরীর সারা দেহে এক রতি সোনা নেই। শুধু শাঁখা আর নোয়া, আর কিছু ইলামবাজারী গালার চুড়ি। কিন্তু না! ভুল হচ্ছে! কুসুমমঞ্জরী অপূর্ব সুন্দরী! ক্রীতদাসীর হাটে তার বাজারদর যথেষ্ট! ওদের দুরভিসন্ধির মূলে সে-রকম কিছু নেই তো! অথবা ...!

হ্যাঁ, সেটাও অসম্ভব নয়। ডাকাতের দল শ্মশানকালীর পূজায় নরবলি দিয়ে থাকে। পুরোহিত কি তাদের কাছ থেকে মোটা হাতে দক্ষিণা পান? তাতেই কি ঐ রক্ততিলক চিহ্ন? সেজন্যই কি তাঁর সর্বদেহ ছিল বেপথুমান!

হঠাৎ মনে পড়ে গেল—তিনি নিরস্ত্র। অন্তত একখানা বংশদণ্ড পাশে নিয়ে বসা উচিত

ছিল। চাঁদের আলো এখনো আছে। হয়তো শ্মশানে খুঁজলে তা পাওয়া যায়; কিন্তু মঞ্জরী তাঁর কোলে মাথা রেখে এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। আহা, তার কাঁচা ঘুমটা···

ঠিক তখনি কে যেন তাঁর কর্ণমূলে বলে উঠল: 'কারেও বলপি না, গুপনে কাম সারপি! হুঁ?'

রীতিমতো চমকে উঠেছেন। কেউ তো কোথাও নেই। মঞ্জরীও ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছে। বললে, কিছু বললে?

—না তো!

—আমার মনে হল তুমি বললে, 'কাকেও কিছু বলবি না, গোপনে কাম সারবি।' —বলনি?

রূপেন্দ্রনাথের দেহের সমস্ত রোমকূপ দাঁড়িয়ে উঠেছে। অসীম সংযমে তিনি বললেন, না তো! আমি তো কিছু বলিনি। তুমি স্বপ্ন দেখেছ বোধহয়।

মিথ্যাভাষণ নয়। কিন্তু সত্যভাষণ কি? মিথ্যার আশ্রয় না নিলে তাঁর বলার কথা: ওকথা আমি বলিনি; কিন্তু শুনেছি!

কিন্তু রূপেন্দ্রনাথের বিশ্বাস: সত্য শুধুমাত্র শিব-এর দিশারী! রাতের এখনো অনেকটা বাকি। যে সত্যকথায় ঐ মেয়েটি মনোবল হারিয়ে আতঙ্কে মূর্ছিতা হয়ে পড়বে তা: মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা!

প্রেতযোনিতে বিশ্বাস করেন না রূপেন্দ্রনাথ ভেষগাচার্য! তাঁর মনে হল, এ কারও কারসাজি! কে বা কারা ওঁদের ভয় দেখাতে চাইছে। যাদুকরেরা দূর থেকে এমনভাবে ধ্বনি নিক্ষেপ করতে পারে যাতে শ্রোতার মনে হয় কথাটা কর্ণমূলে বলেছে কেউ! এ তেমনই এক ভোজবিদ্যা! বললেন, আমার এমন খালি হাতে বসে থাকাটা ঠিক নয়। ওঠ! একটা অস্ত্র চাই!

—অস্ত্র? এই বিজন শ্মশানে অস্ত্র কোথায় পাবে?

—মায়ের চালচিত্রের পিছনে মন্দিরপ্রাচীর থেকে একটি খড়্গ ঝুলতে দেখেছি। সেটা নিয়ে এসে বসব। তুমি আমার সঙ্গে চল! তোমাকে একা ফেলে রেখে যাব না।

মঞ্জরী প্রতিবাদ করতে পারে না। কথাটা অযৌক্তিক কিছু নয়। সভয়ে ওঁর হাতটা চেপে ধরে। রূপেন্দ্র তাকে বলেন, হাত ছেড়ে দিতে। সে যেন ওঁর পিছন-পিছন আসে, ওঁর উপবীতটা আঙুলে জড়িয়ে। বলেন, তুমি যাদের ভয় পাচ্ছ মঞ্জু, তারাও ব্রাহ্মণের উপবীতকে ভয় করে! ভয় কী? আমি তো আছি!

দুজনে নেমে আসেন নাটমন্দির থেকে। নামতে গিয়েই কিসে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যান। কিছু নয়, ওটা হাড়িকাঠ! কিন্তু এত বড়? মহিষবলি হয় না কি এখানে? এঃ! হাতটা আঠা-আঠা হয়ে গেল! বোধহয় রক্ত মাখা ছিল! কাপড়ে মুছে নিলেন হাতটা। পায়ে পায়ে উঠে এলেন মন্দির-চাতালে। মঞ্জরী শক্ত করে ধরে আছে ওঁর উপবীতগাছ!

শিকল খুলে দিলেন। বাইরে জ্যোৎস্নালোক। ভিতরে নীরন্ধ্র অন্ধকার। কপাট দুটি খুলে ভিতরে কিছুই দেখতে পেলেন না। কিন্তু আরতির সময় খড়্গটিকে কোনখানে দেখেছিলেন তা স্পষ্ট মনে আছে। অন্ধকারেও সেটি হাৎড়ে হাৎড়ে খুঁজে পাবেন। তবু অপেক্ষা করলেন। চোখটা অন্ধকারে সইয়ে নেওয়া দরকার। না হলে পূজার তৈজসপত্রে পদস্পর্শ হতে পারে। উন্মুক্ত দ্বারপথে দাঁড়িয়ে রূপেন্দ্রনাথ উপবীতটা আঙুলে জড়িয়ে নীমিলিত নেত্রে অষ্টোত্তর

শতবার গায়ত্রীমন্ত্র জপ করলেন।

এবার তাকিয়ে দেখলেন। হ্যাঁ, অন্ধকারে চোখ অনেকটা সয়ে এসেছে। সম্মুখেই পড়ে আছে কোশাকুশির পাত্রটা। হাত বাড়িয়ে গঙ্গাজলে হাতটা ধুয়ে নিলেন। সঙ্গিনীর ও নিজমস্তকে পবিত্র গঙ্গোদক সেচন করলেন। জানতে চাইলেন, মন্দিরের ভিতরটা দেখতে পাচ্ছ মঞ্জরী?

—হ্যাঁ পাচ্ছি। ঐ তো শবাসনে মহাদেব; কিন্তু ˇমাকে দেখতে পাচ্ছি না!

সেই জন্যই ঐ প্রশ্ন। বস্তুত রূপেন্দ্রও দেখতে পাচ্ছেন না মাতৃমূর্তিকে। বললেন, সেটাই স্বাভাবিক মঞ্জু। মহাদেব গৌরকান্তি, তাই এই অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে তাঁকে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ˇমা যে ঘোর মসীবর্ণা—এই স্বল্পালোকে তিনি তো অদৃশ্যই থাকবেন। দাও তোমার ডান হাতটা দাও!

—কেন?—প্রশ্নটা করল, হাতটাও বাড়িয়ে দিল।

রূপেন্দ্র ওর ঘর্মস্নাত হিমশীতল হাতটি অর্পণ করলেন শায়িত মহাদেবের চরণে।

বললেন, বাবার চরণস্পর্শ করে এখানে বসে থাক। ভয় কী? এর চেয়ে নিরাপদ আশ্রয় কি দুনিয়ায় আছে? আমি অন্ধকারে হাৎড়ে হাৎড়ে খড়্গটা সংগ্রহ করে আনি।

এবারও প্রতিবাদ করল না মঞ্জরী। এই কয়মাসেই সে রূপেন্দ্রনাথের স্ত্রী থেকে যেন উন্নীত হয়েছে—একবল্গা-ঠাকুরের সহধর্মিণীতে। দুহাতে চেপে ধরল বাবার চরণ।

রূপেন্দ্র দেওয়াল হাৎড়ে হাৎড়ে চলে গেলেন মাতৃমূর্তির পিছন দিকে। অনুমান নির্ভুল। প্রাচীরে একটি কীলক থেকে প্রলম্বিত অবস্থায় মায়ের একটি খড়্গ। হাত বাড়িয়ে সেটা নামালেন। ডাকেন, মঞ্জু?

—উঁ?

—যা খুঁজছি তা পেয়ে গেছি। এখন কি ˇমাকে দেখতে পাচ্ছ? ভয় নেই। আমি এখনই আসছি।

পুনরায় নীরন্ধ্র অন্ধকারে মন্দির-প্রাচীরে হাত বুলাতে বুলাতে ফিরে আসতে থাকেন। হঠাৎ তাঁর মনে একটা প্রশ্ন জাগল। এই ঘোর অন্ধকারে এতটা সময় অতিবাহিত করার পরেও কেন মাতৃমূর্তির কোনও আভাসই পাচ্ছেন না? তাঁর একার দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি। মঞ্জুও পাচ্ছে না!

সেই ঘনান্ধকারে রূপেন্দ্রনাথ তাঁর দক্ষিণ হস্তটি বাড়িয়ে দিলেন। মন্দির-তলের দুই-হস্ত উপর দিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে হস্তসঞ্চালনে একটি আনুভূমিক বৃত্ত রচনা করলেন।

বজ্রাহত হয়ে গেলেন রূপেন্দ্রনাথ!

যে উচ্চতায় উনি আনুভূমিক বৃত্তে হস্তচালনা করেছেন তাতে মায়ের পৃষ্ঠদেশের স্পর্শ পাওয়ার কথা! কিন্তু তিলমাত্র বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে নীরন্ধ্র অন্ধকারে তাঁর হস্ত শূন্যে একটি অর্ধচন্দ্র রচনা করল! তার অর্থ?

অর্থ একটাই! শবাসনে শায়িত মহাদেবের বুকের উপর সেই নগ্নিকা নৃমুণ্ডমালিনী নাই!!

এই প্রথম সংযম হারালেন রূপেন্দ্রনাথ! অকস্মাৎ গর্জে উঠলেন তিনি। মন্দিরের প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল তাঁর ভর্ৎসনা—ঐ নিরুদ্দিষ্টার উদ্দেশ্যে:

—কাকে ভয় দেখাচ্ছিস্ রে! আমরা তিনপুরুষে তন্ত্রসাধক! জ্ঞানত কখনো অন্যায় করিনি! তেমন ˇমায়ের সন্তান নই আমি! শোন্:

উদাত্তকণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকেন:

"ধ্যায়োদ্দেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাম্বুনদ প্রভাম্।
চতুর্ভুজাং অম্বিকাংচণ্ডীং খড়গং-খেটক-ধারিণীং।।
নানালঙ্কার ভূষিতাং রক্তাম্বর ধরাং শুভাং।
সদা ষোড়শ বর্ষীয়াং প্রসন্ন্যাস্যাং ত্রিলোচনাং।।
মুণ্ডমালাবলীরম্যাং পীনোন্নত পয়োধরাং।
শবোপরি মহাদেবীং জটা মুকুট মণ্ডিতাং।।
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং সাধকাভীষ্টদায়িকাম্।
সর্ব্বসৌভাগ্য জননীং মহাসশৎ প্রদাং স্মরেৎ।।"

—শুন্‌লি? আমি সেই মহাদেবী-জননীর সন্তান! আমার মা নগ্নিকা 'শ্মশান'কালী নন, দিগম্বরী 'জগৎ-পালিকা' আদ্যাশক্তি! তিনি ভক্তকে ভয় দেখান না! অভয় দেন! যা—শ্মশানে নেচে বেড়াগে যা! আমি তোকে পরোয়া করি না।

ক্রোধে কম্পিততনু রূপেন্দ্রনাথ ফিরে আসেন মন্দিরের সামনের দিকে। হামাগুড়ি দিয়ে। ডাকেন, মঞ্জু?

সাড়া নেই! মঞ্জরী মূর্ছিতা হয়ে পড়ে আছে মহাদেবের চরণপ্রান্তে!

দাঁত দিয়ে চেপে ধরলেন খড়গটা। সংজ্ঞাহীনা সঙ্গিনীর দেহটা তুলে নিলেন দুহাতে! সেই প্রথম দিনটিব মতো! আহা! যেন মূর্ছিতা কবুতরটি!

আবার তাকে নাটমন্দিরের চাতালে শুইয়ে দিলেন। কোশাকুশির গঙ্গোদক ছিটিয়ে দিলেন ওর মুখে। একটু পরেই জ্ঞান ফিরে এল। উঠে বসল। বললে, তুমি তখন বকাবকি করছিলে কাকে?

রূপেন্দ্রনাথ হেসে ফেলেন। বলেন, তোমাকে নয়, মঞ্জু!

—তা বুঝেছি। কিন্তু মাকেই বা ভর্ৎসনা করলে কেন? মা-কে কি গাল দিতে হয়?

—হয়! সন্তানের ভুল হয়, আর মায়ের হয় না? তেমন তেমন ভক্তের হাতে পড়লে ভগবানেরও অবস্থা কাহিল হয়। না হলে স্বয়ং নারায়ণ কেন ভৃগুপদচিহ্ন বুকে ধারণ করবেন? বল? তুমি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের নাম শুনছে?

—না, কে তিনি?

এক মহাসাধক। মা কালীকে তিনি বলেছেন—'এবার কালী তোমায় খাব। ··· তোমার মুণ্ড-মালা ছিঁড়ে নিয়ে অম্বলে সম্বরা দিব।'

মঞ্জরী হেসে ওঠে। বলে, ও মা! এমন বিশ্রি কথাটা বলতে পারলেন তিনি?

—হাঁ! শুধু বলেই থামেননি, গানে সুর দিয়ে তিনি ঐ গান মাকেই নিত্যি শোনান। খড়্গখানি হাতে পেয়ে রূপেন্দ্রনাথ অনেকটা মনোবল ফিরে পেয়েছেন। মাকে ভর্ৎসনা করে পেয়েছেন তৃপ্তি! 'বেটি'র কী দুঃসাহস! তাঁকে ভয় দেখাতে চায়!

মঞ্জরী হঠাৎ উঠে বসে, ঐ দেখ কারা যেন আসছে!

রূপেন্দ্র খড়্গখানি বাগিয়ে ধরে উঠে দাঁড়ান। মঞ্জরীও দাঁড়ায় তাঁর পাঁজর ঘেঁসে।

সত্যিই মশাল হাতে কারা যেন গ্রামের দিক থেকে এগিয়ে আসছে। একজন পুরুষ আর

একজন মহিলা। তাদের মধ্যে পুরুষটি চিৎকার করে ডাকল: কোবরেজ ম—শাই!

ওঁকেই খুঁজছে। রূপেন্দ্র সাড়া দিতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ক্ষিপ্রবেগে মঞ্জরী ওঁর মুখ চেপে ধরে।

—কী হল? ওরা আমাদেরই খুঁজছে। আমাদের দলেরই লোক ...

—হোক! তিনবার ডাকুক। চতুর্থবার সাড়া দিও!

রূপেন্দ্র বুঝতে পারেন এই অনুরোধের মর্মার্থ। 'নিশির ডাক'! প্রথম তিনবার ডাকলে সাড়া দিতে নেই। চতুর্থবার ডাকবার ক্ষমতা নেই সেই অপদেবতার।

রূপেন্দ্র বললেন, 'নিশির ডাক' একটা কুসংস্কার! আমি তা মানি না!

—আমি মাথার দিব্যি দিচ্ছি কিন্তু!

—আমি যদি কখনো তোমার পরামর্শের বিরুদ্ধে যাই তাহলে যুক্তিতর্কে আমাকে স্বমতে আনবার চেষ্টা কর, মঞ্জু! মাথার দিব্যিতে কোন লাভ নেই! ওটাও একটা কুসংস্কার! আমি মানি না!

রূপেন্দ্রনাথ সাড়া দিলেন।

সমস্ত রাত দুটি চোখের পাতা এক করতে পারেননি।

প্রকাণ্ড হাটতলার একপ্রান্তে পুরুষেরা, সে-দলে তিনি নিজে। আর অপরপ্রান্তে শিষ্যার দল, যে-দলে ঘুমাচ্ছে কুসুমমঞ্জরী। মাঝখানে—দীর্ঘায়ত হাটতলার মাঝামাঝি কর্তা-মশাই একাই শুয়েছেন। সমস্ত দিনে পদব্রজে এসেছেন তারকেশ্বর থেকে এই চার-ক্রোশ পথ। দেহ ক্লান্ত। কিন্তু মন অশান্ত। কার্যকারণ সূত্রে সমস্ত ঘটনাগুলিকে গ্রথিত করতে পারছিলেন না।

রাধা একজন তরুণ বরাতিকে, কমলকুমারকে, নিয়ে মশাল হাতে ওঁদের খুঁজতে বের হয়েছিল—কর্তা-মশায়ের নির্দেশেই। তিনি ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন—কী মর্মান্তিক প্রয়োজনে সেই ধন্বন্তরি পৃথকস্থানে রাত্রিবাসের জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন। এটাও বুঝেছিলেন—সম্ভবত ওঁরা আশ্রয় নিয়েছেন কোন মন্দির প্রাঙ্গণে। রাধা কোন প্রশ্ন করেনি রূপেন্দ্রনাথকে। শুধু মঞ্জরীর হাতটি দৃঢ়ভাবে চেপে ধরে বলেছিল, আয়।

কমলকুমার সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল, ঠাকুরমশাই। এই ডাকাতে-কালীর মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন? কী দুঃসাহস। শোনেননি, এখানে নরবলি হয়?

রূপেন্দ্র সহাস্যে প্রত্যুত্তর করেছিলেন, সেজন্যই তো খড়্গহাতে অপেক্ষা করছি। জল্লাদটা এলে তাকে বলি দেব বলে।

বলেছিলেন, মশালটা নিয়ে এসতো ভাই। কোশাকুশি আর খড়্গটা মায়ের মন্দিরে রেখে আসতে হবে।

এবার কপাট খুলেই জ্বলন্ত মশালের আলোয় দেখতে পেলেন—বিশালাক্ষী স্বস্থানে অধিষ্ঠিতা। অট্টহাস্য করে উঠেছিলেন তান্ত্রিক পিতার উপযুক্ত পুত্র। মাতৃমূর্তির দিকে ফিরে যে-কথাটা বলেছিলেন তার অর্থগ্রহণ হয়নি সেই কমলের: ধমক খেয়ে সুবুদ্ধি হয়েছে দেখছি!

ক্ষ্যাপামির একটা সীমা থাকবে তো?

তারপর ফিরে এসে তাঁকেও ঐ একই ভর্ৎসনা শুনতে হয়েছিল কর্তা-মশায়ের কাছে। এবং তারপর যে-যার শয্যায়। কিন্তু নিদ্রার কোনও আভাস নেই।

কী হতে পারে? তিনি কি তাহলে হাতটা সত্যিই বাড়িয়ে দেখেননি? মনে মনে ভেবেছেন, কিন্তু বাস্তবে অর্ধচন্দ্রাকারে হাতটা তিনি ওভাবে ঘোরাননি। তা না হলে মায়ের মূর্তিকে স্পর্শ করতে পারেননি কেন? মাকে ধমক দিয়েছিলেন—কিন্তু সত্য-সত্যই তো মৃন্ময়ী মূর্তি তখন শ্মশানে নেচে বেড়াচ্ছিল না। তা সম্ভব নয়। তাহলে?

—ঘুম যদি নাও হয় চুপটি করে শুয়ে থাকছ না কেন?

রূপেন্দ্রনাথ বসেছিলেন খুঁটিতে ঠেশ দিয়ে। ঘুরে দেখলেন। শুক্লপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ ঢলে পড়েছে পশ্চিমাকাশে—তবু আলোর পশরা তার শেষ হয়নি। আবছা আলোয় চিনতে কোনও অসুবিধা হল না। শুধু কণ্ঠস্বরই নয়, ওর দেহগঠনের একটা আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। ডম্বরু-আকৃতির। ক্ষীণকটির দুই প্রান্তে পুরন্ত দেহের আভাস।

রূপেন্দ্রর ভ্রূকুঞ্চনটা এত কম আলোয় নিশ্চয় দেখতে পায়নি, কিন্তু বাচনভঙ্গিতে বুঝতে পারে তাঁর বিরক্তিটা। রূপেন্দ্র বললেন, ঘুম তো আপনারও হয়নি। ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন অহেতুক?

রাধারানী বসল যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে। বলল, তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ, ঠাকুর। একমাত্র কর্তামশাই বাদে আখড়ায় আর সবাইকেই আমরা 'তুমি' সম্বোধন করি। অহেতুক রাগ কর না।

—কিন্তু এতক্ষণ তো আমাকে 'আপনি'ই বলছিলে?

—সে তো দিনের বেলায়। রাতের কানুন ভিন্ন।

—ও! তাই বুঝি? তা আজ তোমাদের শয়নব্যবস্থাটাও ভিন্ন জাতের হয়ে গেল কেন? আখড়ায় 'ভেজাল' জুটে গেছে বলে?

—তা নয় গো মশাই! আখড়ার বাইরে এটাই প্রথা। কর্তামশাই বলেন, "লোকমধ্যে লোকাচার/সদ্‌গুরু মধ্যে একাচার।" তোমরা দুজন না থাকলেও এই ব্যবস্থাই হত। গাঁয়ে-গঞ্জের গাঙে চখারা এ-পারে, আর চখীরা ও-পারে।

রূপেন্দ্রনাথ হাসলেন। বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে বোঝা গেল মেয়েটি সুরসিকা। তবু জবাব দিলেন না। রাধারানী প্রসঙ্গান্তরে এল, একটা কথা বলবে?

—কী?

—তখন তুমি সেই শ্মশানকালীকে ও-কথা বললে কেন?

বিষয়টা মঞ্জুকে বলেননি। সে ভয় পাবে বলে। ভেবেছিলেন, কাল কর্তা-মশাইকে বলবেন, জানতে চাইবেন কী করে হল এই ভ্রান্তি। কিন্তু এখন এই মেয়েটির প্রশ্নে তাকেই সব কথা খুলে বললেন। কারও সঙ্গে আলোচনা না করে যেন তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। বুঝেছেন, মেয়েটি কিছু প্রগলভা, কিন্তু বুদ্ধিমতী।

আদ্যন্ত শুনে রাধা বলল, তা এতে অবাক হবার কী আছে? মা কালীতো জাগ্রতা। তিনি ইচ্ছে করলে পারেন না পীঠ ছেড়ে শ্মশানে যেতে?

—মা কালী পারেন, শুধু শ্মশানে কেন, মহাকাশের শেষপ্রান্তেও। কিন্তু মানুষের গড়া মৃন্ময়ী

মূর্তি পারে না।

—কেন পারবে না? তিনিই তো ʼমা?

—না! তিনি ʼমায়ের প্রতীক মাত্র। জাগতিক আইন-কানুন মেনে চলতে হয় মৃন্ময়-মূর্তিকে! মাটি-পাথরের মূর্তি ওভাবে শ্মশানে ঘুরে বেড়াতে পারে না।

—কে বলেছে?

—শ্রীরূপেন্দ্রনাথ দেবশর্মাঃ।

এ কথার জবাব নেই। রাধা শুনেছে—কর্তামশাই তাকে গোপনে জানিয়েছেন, রূপেন্দ্রনাথ একজন সিদ্ধপুরুষ। তাঁর আদরযত্নের যেন কোন ত্রুটি না হয় এদিকে রাধাকে সবিশেষ দৃষ্টি দিতে বলেছেন। রূপেন্দ্রের হুকুমে দামোদরে অকাল ষাঁড়াষাঁড়ির বাণ আসে—মত্ত গজদানব শান্ত হয়। তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং এ দার্ঢ্য প্রত্যাশিত। সিদ্ধপুরুষ না হলে কি কেউ ʼমাকে ওভাবে গালমন্দ করার সাহস পায়? বলে, তাহলে কেন তুমি হাত বাড়িয়ে ʼমায়ের স্পর্শ পেলে না?

—জানি না। সমস্যাটা তো সেটাই! আমার মনে হচ্ছে এইভাবে আমি আমার দক্ষিণহস্তটা চালনা করেছিলাম, বাস্তবে হয়তো করিনি। আমি ভেবেছি করেছি, সেই চিন্তাটাই···

নীমিলিত নেত্রে হস্তচালনার ক্রিয়াটা দেখাতে গেলেন রূপেন্দ্র! এবার কিন্তু তা শূন্যে শেষ হল না। বাধা প্রাপ্ত হল একটি নারী দেহে। পৃষ্ঠদেশ নয়, বক্ষে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো হাতটা টেনে নিতে গেলেন রূপেন্দ্রনাথ। আর সে হাতখানি হঠাৎ দু-হাতে ধরে ফেলল রাধা। বললে, সত্যি করে বলতো ঠাকুর— কেন পালিয়ে গেছিলে? কীসের ভয় তোমার? সুন্দরী বউকে কেউ বেদখল করে নেবে ভয়ে? না কি কোন রাক্ষসী তোমার ঘাড় মটকে রক্ত খাবে বলে?

রূপেন্দ্রনাথ কোন জবাব দিলেন না। ধীরে ধীরে ওর মুঠি থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন। রাধা বাধা দিল না। হাতটা ছেড়ে দিল। একটু ঘনিয়ে এসে প্রায় ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, কই, জবাব দিলে না যে?

অসতর্ক হস্ত-সঞ্চালনে ঐ মেয়েটির পীনোন্নত বক্ষে করস্পর্শ করাতেই কি ওর বুকের দরজার আগলটা খুলে গেল? রূপেন্দ্র বলেন, কোন প্রশ্নের জবাব?

—কাকে তোমার ভয়? তুমি শ্মশানকালীকেও ভয় পাও না—তাঁর বেচাল দেখলে তাঁকে ধমক দাও। তাহলে কাকে ডরাও গো তুমি?

—যদি বলি: নিজেকে? নিজের মনটাই কি সব সময় নিজের মুঠোয় থাকে?

রাধা ঠোঁট উলটায়। বলে, তাহলে বলব মিছে কথা বলছ! তুমি সিদ্ধপুরুষ। তোমার মন তোমার মুঠোয়। তাকে আবার ভয় কী?

রূপেন্দ্র ওর চোখে-চোখে তাকিয়ে বলেন, কোন জবাবটা শুন্‌লে খুশি হবে? যদি বলি: তোমার ভয়ে?

রাধার মাথাটা নিচু হয়ে যায়। পরক্ষণেই সে চোখে চোখে তাকায়। কী-একটা কথা বলতে চায়—কিন্তু বলা হয় না। রূপেন্দ্রের পাশেই শুয়েছিল একজন বরাতি—সেই কমলকুমার। ঘুমের ঘোরে ধমক লাগায়, তোমাদের প্রেমালাপ কি থামবে না? ঘুমাও না বাপু!

রাধা তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, চলি। কে কোথায় দেখবে। ভুল বুঝবে।

রূপেন্দ্রও তৎক্ষণাৎ বললেন, তুমি ভুল না বুঝলেই হল।

রাধা পা বাড়িয়েছিল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কিছু বলে না। ধীর পদে চলে যায় ও-প্রান্তে। চাঁদ অস্ত গেছে। পুব-আকাশে আলোর আভাস। সূর্য এখনো দিগন্তের অনেক নিচে। পূর্বগগনে এখন একচ্ছত্র সম্রাট ঐ 'ভুল্‌কো তারাটা'।

'ভুল্‌কো' তারা। কার 'ভুল'কে সম্বল করে ওর ওমন নামটা হল গো? জ্যোতিষাচার্যরা বলেন—উনি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য! আসুরিক-সাধনার মূর্ত প্রতীক।

কিন্তু 'আসুরিক' মানে তো 'তামসিক' নয়।

দেবযানীও তো ঐ শুক্রাচার্যের আত্মজা।

তাঁর সাধনা কি তামসিক? 'ভুলকো'?

পরদিন সকালেই ওঁরা হরিপাল ত্যাগ করে দক্ষিণপুব-মুখো সিঙ্গুরে যাত্রা করলেন।

কিন্তু আমাদের সে পথে যাত্রা করতে কিছু দেরী হবে। ব্যাপারটা কী জানো?—

হরিপালে সংগৃহীত আর একটি ছোট্ট লোকগাথা না শুনিয়ে হরিপাল ছেড়ে যেতে মন সরছে না। আবার কী-ভাবে 'চণ্ডালী-মা' রূপান্তরিতা হলেন 'বিশালাক্ষী'-তে। অর্থাৎ যে ঘটনায় চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল: নরবলি।

এ ঘটনা আমাদের কাহিনীর কালের প্রায় দেড়শ বছর পরের—উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের। ততদিনে বিশালাক্ষীর মন্দির পুনরায় অরণ্যভূমের কুক্ষিগত। চারিদিকেই জঙ্গল। নাট-মন্দিরটা বিধ্বস্ত—কেউ সারায়নি। গাঁথনির ফাটলে পাখিতে নিয়ে আসা বীজ পড়ে বট-অশ্বত্থ জন্মেছে, মোটা শিকড়ের চাপে ফাটিয়েছে দেউল, ঝুড়ি নামিয়ে ঝাঁকড়াচুলো ডাইনীর মতো ঘাপটি মেরে বসেছে। শতাব্দীর সাধনায় শালশিশু জয় করে নিয়েছে শ্মশানঘাট। শত-সহস্র গ্রন্থিতে পত্রপল্লবের আলিঙ্গনে অরণ্য আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে মন্দিরচূড়া—তার মধ্যদেশে সবুজ শ্যাওলার আস্তর—পদতলে শতমূল, সহস্রমূল, শেয়ালকাঁটার আকুলি-বিকুলি। সেই নিবিড় অরণ্যভূমি ভেদ করে মাত্র দুটি বনপথ—একটি শ্মশানযাত্রীদের নিত্য আনাগোনায় বিসর্পিলরূপে শায়িত, দ্বিতীয়টি পুরোহিত মহাশয়ের ভদ্রাসন থেকে মন্দিরে যাবার সোজা পথটা। জমিদারের দান করা দেবোত্তরের অধিকার আছে অটুট। ভক্ত সমাবেশ হোক না হোক চক্রবর্তী-বংশের অধিকার আছে অক্ষুণ্ণ। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় মহাদেব চক্কোত্তি একবার করে মন্দিরে আসেন। শিকল খুলে মাকে ভোগ নিবেদন করেন, সন্ধ্যায় শয়নারতি সেরে আবার শিকল তুলে ফিরে যান। ভক্ত বা যাত্রীর দেখা নেই—মাসে একদিনও নয়। তবে এটুকু না করলে পূজার অধিকার বজায় থাকে না—দেবোত্তর ভোগ করার স্বত্ব হারাতে হয়।

রাজা হরিপাল মায়ের সেবার জন্য প্রায় দুশো বিঘার মতো দেবোত্তরের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন; কিন্তু মধ্যস্বত্বভোগী ভূম্যধিকারীদের উপদ্রবে আর কারসাজিতে তার অধিকাংশই

মহীরুহের আলিঙ্গনে মহাকালীর মন্দির

বেহাত। চক্কোত্তির ক্ষমতা কি যে, জবরদখলকারীদের রোখেন? বর্তমান জমিদারও উদাসীন। ˚মায়ের সম্পত্তি রক্ষার চেয়ে ঐসব প্রতিপত্তিশালী মধ্যস্বত্বভোগীর সৌহার্দ্য তাঁর বেশী কাম্য। মহাদেব চক্কোত্তির বাস্তু-সংলগ্ন বিঘে-তিনেক জমি ছাড়া প্রায় সবই বে-দখল। ঐটুকু জমিতেই ফলে লাউ-কুমড়ো-বেগুন, আলু-মরিচ। তবে জবরদখলকারীদের চক্ষুলজ্জা আছে; তারা চক্কোত্তির সংসারে সংবৎসরের প্রয়োজনের মতো চাউল পাঠিয়ে দেয়। আর সংসার বলতে তো তিনটি প্রাণী। মহাদেব তখন চল্লিশের কোঠায়, স্ত্রী নিরুপমা ত্রিশ, আর একমাত্র পুত্র কাঙালীর বয়স আট।

সেই আট। রঘুনাথের পুত্রবধূ—সেই যার খাসা-মসলিন নীলাম্বরী ˚মায়ের কৃপায় রক্ত-চীনাংশুক হয়ে গেছিল–তার বয়সও ঐ আট ছিল না?

শুরুতে অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা, সমাপ্তিতে অষ্টমবর্ষীয় বালক।

কাঙালীর অক্ষর-পরিচয় হয়েছে। বাপের কাছে। পাঠশালায় তাকে পাঠানোর মতো আর্থিক সঙ্গতি নাই। একটিমাত্র সন্তান—কিন্তু তাকেও গুরুগৃহে পাঠাতে পারেন না। স্থির করেছেন নিজেই যেটুকু পারেন পড়াবেন। মোটামুটি অক্ষর পরিচয়, সামান্য আঁক-কষা আর কৌলীক পূজাবিধি। কাঙালী 'আট'-এ পড়েছে। এটাই প্রশস্ত সময়। উপনয়নের। ব্রাহ্মণের আট, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বারো আর বৈশ্যের পক্ষে ষোল। প্রথমটিই শাস্ত্রোক্ত—পরের দুটি ইদানীং চালু হয়েছে। স্থির করেছেন—নিজেই দীক্ষা দেবেন—তাতে ব্যয়-সঙ্কোচ হবে। শিখিয়ে দেবেন ত্রিসন্ধ্যাবিধি, আচমন, প্রাণায়াম, মার্জন, অর্ঘ্যপ্রদান আর উপস্থানের বিধিগুলি। এবং বলাবাহুল্য: গায়ত্রীমন্ত্র। অন্যান্য পূজাবিধি ক্রমশ শিখে নেবে। বাবা-মশায়ের সঙ্গে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা সে মন্দিরে যায়—পূজাবিধি দেখে। বুদ্ধিমান ছেলে—মন্ত্রোচ্চারণের অধিকার নেই, না হলে এখনই সে বাবার কাজ চালিয়ে নিতে পারে।

তারপর একদিন সন্ধ্যারাতে। কী তিথি তা মনে নেই, তবে আকাশে ছিল ভাঙা-চাঁদ। শয়নারতি সেরে কাঙালীকে নিয়ে ফিরে আসছিলেন ভিটেতে, হঠাৎ মাঝপথে ওঁদের রুখল একজন ভীমকায় পুরুষ। আঁৎকে উঠলেন চক্কোত্তি, কে বাবা তুমি? কী চাও?

উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, পেশীবহুল দেহ। মালকোচা সাঁটা। মাথায় বাবরি চুলে একটা গামছার ফেট্টি। কপালে সিক্কাটাকার মাপে রক্তবিন্দু। হাতে প্রমাণ মাপের লাঠি। নজর হল, কিছু দূরে আরও দুজন অনুরূপ অনুচর। সকলেই সসম্ভ্রমে নিচু হয়ে ওঁকে দণ্ডবৎ করল। দলপতি বললে, পেন্নাম হই ঠাকুরমোশাই। খোকারে ঘর যাতি বলেন, ছিচরণে কিছু নিবেদন করব, আজ্ঞে।

মহাদেব চক্কোত্তি চোখে ওকে কখনো দেখেননি, কিন্তু আন্দাজে চিনতে পেরেছেন। প্রত্যক্ষ্যদর্শীদের বর্ণনা থেকে। এ অঞ্চলের কুখ্যাত ডাকাত। অঘোর চণ্ডাল। অতীতকালের বিভীষিকা রঘু-চণ্ডালের বংশাবতংস। ফেরঙ্গ-সরকারের কোতোয়াল ঐ বাব্‌রিচুলের ঝাঁকড়া মাথাটার উপর কত টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে যেন। গোটা হুগলী জেলার আতঙ্ক।

চক্কোত্তি খোকার হাতে নৈবেদ্যর পাত্রটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ঘরে যা বাবা, আমি এখনি আসছি।

কাঙালী কী বুঝল তা সেই জানে। সভয়ে পিছন ফিরে দেখতে দেখতে সে বাড়ি ফিরে গেল।

—আমারে চিন্তি লারলেন ঠাকুরমোশা? মুই আপনকার ছি-চরণের দাস আজ্ঞে, অঘোর চাঁড়াল।

মহাদেব কাঁপতে কাঁপতে বলেন, তা এ অধমের কাছে কেন বাবা? চাল-কলা-নৈবেদ্য ছাড়া তো আমার কিছুই নাই। তবে হ্যাঁ, ˚মায়ের অঙ্গে কিছু অলঙ্কার আছে—সাত পুরুষ ধরে—জানি না, তা স্বর্ণালঙ্কার—

অঘোর ˚মা বিশালাক্ষীর পাল্লা-দেওয়া জিহ্বা-দংশন করল:

—ইটো কী বুলছেন আজ্ঞে? ˚মায়ের গায়ের গহনা.....

—তবে?

অঘোর পথের মাঝেই পেশ করল তার প্রস্তাব। ˚মা তাকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন। তিনি ক্ষুধার্তা, অনশনক্লিষ্টা—ছাগমাংসে তাঁর তৃপ্তি হচ্ছে না। রঘু-ডাকাতের উত্তরসূরী তাই ফিরিয়ে আনতে চাইছে সেই সাবেক ব্যবস্থাপনাটা।

থরথর করে কেঁপে ওঠেন মহাদেব চক্কোত্তি: এটা কী বলছিস্ রে অঘোর। সে-কাল আর এ-কাল? এখন যে ফিরিঙ্গিদেব জমানা। ও কাজ করা যে মানা। জানাজানি হলে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত।

—কাকপাখিতে জানবেক্ নাই ঠাউর।

—জানবে। লাস জ্বালাতে হবে না? শ্মশানে মাঝরাতে নতুন চিতা জ্বলে উঠতে দেখলে গাঁয়ের মানুষ জানতে চাইবে না—ফৌত হল কে?

—চিতা জ্বলবেক্ না ঠাউর।

অঘোর সব কিছু চিন্তা করেছে। সবরকম ব্যবস্থা করে রেখেছে মনে মনে। তার পরিকল্পনাটি নিশ্ছিদ্র। বলির 'পশু' ওর করতলগত হলে অঘোর লোক-মারফৎ খবর পাঠাবে। ঠাকুর-মশাই পাঁজি-পুঁথি ঘেঁটে ঐ লোক-মারফৎই জানাবেন—কোন তিথিতে রাতের কোন লগ্ন প্রশস্ত। নির্দিষ্ট তিথিতে নৌকাযোগে আসবে অঘোর। সঙ্গে বলির 'পশু', একটি খাটিয়া আর কয়েকজন বাহক। মধ্যরাত্রে পুণ্যকর্ম সমাধা হলে যূপকাষ্ঠের শোণিত ধুয়ে দিয়ে অঘোর একাই ডিঙি নিয়ে ফিরে যাবে; আর বাহকেরা রওনা হয়ে পড়বে মৃতদেহ নিয়ে—নিঃশব্দে। ভিনগাঁয়ে পৌঁছে ধ্বনি দেবে—'বল হরি,হরি বোল'—ওরা চলেছে গঙ্গাতীরে, দাহ করতে। কারও সন্দেহ হবে না। ˚গঙ্গালাভের আসায় এই 'নিগঙ্গা'র দেশ থেকে প্রতিনিয়তই তো চলেছে ঐ জাতের মিছিল—'অহনি-অহনি'। 'দাহ' কোথায় হবে? আদৌ হবে না। যে শ্মশান-ঘাটেই দাহ করতে যাও—ছিন্নশির মৃতদেহ—দাহকেরা নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়বে। দাহ হবে না, তবে কি কবর দেবে? আজ্ঞে না। মৃতদেহেরও একটা বাজারদর আছে। ওরা বেচে দেবে! ঐ ত্রিবেণী, আদিসপ্তগ্রাম, কাটোয়ায় আছে তান্ত্রিক-সাধক, কাপালিক—যারা শবসাধনা করতে চায়, শব জোগাড় করতে পারে না; পঞ্চমুণ্ডির সাধনায় পিশাচসিদ্ধ হতে চায়, নরমুণ্ড পায় না। সে সব চিন্তা 'ঠাউরমোশাই'কে করতে হবে না। আশঙ্কার কিছু নেই। ˚মায়ের ইচ্ছা পূরণ করবেন তাতে আবার ইতস্তত কিসের? আর যেটুকু বা দ্বিধাগ্রস্ততা ছিল সেটা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয়ে গেল দক্ষিণার অঙ্কটা শুনে; বলি-পিছু আড়াইগণ্ডা সিক্কাটাকা।

একটি বছর কেটে গেছে তারপর। হরিপালের গ্রাম্যজীবনে দশ-বিশ বছরে এমন কিছু

পরিবর্তন হয় না; কিন্তু ৺মায়ের আশীর্বাদে মহাদেব চক্কোত্তি ইদানীং একটু সচ্ছলতার মুখ দেখছেন। বর্ষার আগে ছাদটা ছাইয়েছেন, একটি গোয়ালঘরও তুলতে হয়েছে। কী করবেন? দুধেলা গাই কিনতে হল যে একটা। কাঙালী পিটুলিগোলাই পান করেছে এতদিন—দুধের-কাঙাল ছিল সে। পণ্ডিতগৃহিণীকে একটি নাকছাবিও কিনে দিয়েছেন। গৃহিণী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন, এসব কী করে হচ্ছে গো?

—সে-কথা জানতে চেও না! ৺মা অ্যাদ্দিনে মুখ তুলে তাকিয়েছেন।

চক্কোত্তি-গিন্নি সরল-বিশ্বাসে যুক্তকর কপালে স্পর্শ করিয়েছিলেন শুধু। সত্যই তো, তাঁর সাত্ত্বিক প্রকৃতির পরমগুরু আজীবন নিরলস-নিষ্ঠায় ৺মায়ের পূজা করে চলেছেন, ৺মায়ের দয়া তো হতেই পারে। শুধু খোকার উপনয়নটা এখনো হয়নি। আর একটু গুছিয়ে নিয়ে কাজে হাত দেবেন। উপনয়নের প্রশস্তকাল—বয়ঃসন্ধি। আটেই যে হতে হবে এমন কোন অলঙ্ঘনীয় কানুন নেই।

কাকপক্ষীতে টের পায়নি সত্যই। কাকেরা রাতে জেগে থাকে না। তবে প্যাঁচারা জানে। তারা কথা বলে না। পিট্‌পিট্ করে তাকিয়ে দেখে কাণ্ডকারখানা।

কোথায় যেন খচখচ্ করে বাধে। কোন শালা টের পায়নি—কিন্তু পাঁজরার ভিতরে ঐ যে একটা প্রত্যঙ্গ আছে না?—হৃদপিণ্ড?—সেটা মাঝে-মাঝে টনটনিয়ে ওঠে। বলির 'পশুর' মুখে ফেট্টি বাঁধা থাকে, তবু শোনা যায় তার প্রাণভয়ের আর্তি। সে আর্তনাদের গুমরানি অন্তরটা কুরে-কুরে খায়। উপায়ান্তরবিহীন ব্রাহ্মণ কারণপানের মাত্রাটা বৃদ্ধি করে সেই অনাসৃষ্টিকে চাপা দেন।

স্ত্রী সন্দেহ করেনি, করেনি গ্রামবাসী। কিন্তু একজনের দুরন্ত কৌতূহল দিন দিন 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মের' বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কাঙালী। বাবামশাইকে সেই দৈত্যের মতো লোকটা সেদিন সন্ধ্যায় কী বলে গেল? তারপর সেই আজব মানুষগুলো মাঝে-মাঝেই আসে। বাপের সঙ্গে কী যেন পরামর্শ করে। দু-একবার সে এগিয়ে এসেছিল শুনতে। প্রচণ্ড ধমক খেয়ে স্থানত্যাগ করতে হয়েছে। ব্যাপারটার কোন কূলকিনারা করতে পারেনি। এটা যে নিষিদ্ধ কোন কিছু তাও বোঝেনি—তবে এটুকু বুঝেছিল যে, বাবামশাই রহস্যঘন কোন একটা কাজ লুকিয়ে করে থাকেন। আর সেটা ঐ মন্দিরকে ঘিরে।

তারপর এক দিন। অঘোরের যমদূত এসে সংবাদ দিয়ে গেল, ধরা পড়েছে একটি বালক। কাঠুরেদের ছেলে, ভিন্ন গাঁয়ের। কুড়াল কাঁধে বেওয়ারিশ জঙ্গলে কাষ্ঠাহরণে এসেছিল। তারপর থেকে সে বেপাত্তা। অনেক দূরের গ্রাম, হরিপালের কেউ কিছু জানে না, জানবে না। মহাদেব চক্কোত্তি পাঁজি-পুঁথি ঘেঁটে নিদান দিলেন: অমাবস্যা তিথির রাত্রি দুই ঘটিকা গতে শুভলগ্ন, তিনটা বত্রিশ পর্যন্ত। এতদিনে 'ঘণ্টা-মিনিট' বোঝে সবাই।

লোকটা জানিয়ে গেল, ঠিক মধ্যরাত্রে নৌকা এসে ভিড়বে শ্মশানঘাটে। পুরোহিতকে কেউ ডাকতে আসবে না। তিনি যেন একাই উপস্থিত থাকেন মন্দিরে।

দুজনের কেউই জানতে পারেননি এবার অন্তরাল থেকে কথাটা শুনেছে কাঙালীচরণ। ব্যাপারটা কী, তা সে বোঝেনি, এটুকু আন্দাজ করেছে অমাবস্যার মধ্যরাত্রিতে মন্দিরে কিছু-একটা ঘটবে।

ভাদ্র মাস। একে অমাবস্যা,তায় সারা আকাশ মেঘে ঢাকা। মহাদেব অমাবস্যার উপবাসে আছেন। গৃহিণীকে বলে রেখেছেন মধ্যরাত্রে তাঁকে মন্দিরে যেতে হবে একবার। পূজা দিতে হবে—অমাবস্যার পূজা। গৃহিণী বলেছিলেন, খোকা দুপুরে ঘুমিয়েছে, সে মশাল জ্বেলে নিয়ে সঙ্গে যাক।

—না, না, না! সে ঘুমাক। তাকে বিরক্ত করার প্রয়োজন নেই।

কাঙালী যে ঘুমায়নি, তা ওঁরা দুজনেরই কেউই জানেন না। রাত্রে জাগতে হবে বলে সে দিনে বেশ লম্বা একটা নিদ্রা দিয়ে রেখেছে।

মধ্যরাত্রে টোকা-মাথায় রওনা হচ্ছিলেন মহাদেব। গৃহিণী পিছন থেকে বলেন, একটু দাঁড়িয়ে যাও, একটা মশাল জ্বেলে দিই। যে ঘুট্‌ঘুটে আঁধার···

খিঁচিয়ে ওঠেন চক্কোত্তি, যাই একটা শুভ কাজে, পিছন থেকে টুকে দিলে তো?

গৃহিণী অপ্রস্তুত। তিনি মশাল জ্বালার আয়োজনে ব্যস্ত। তাঁর হাত থেকে মশালদণ্ডটা ছিনিয়ে দূরে ফেলে দিলেন। তারপর গৃহিণীর অবাক চাহনি লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি সামলে নেন, যাচ্ছি ঁমায়ের কাজে! পথ দেখাবেন ঁমা! এ পথ কি আমার অচেনা? চোখ বাঁধা হলেও তো চলে যাব! ঁমা—ঁমাগো!

তা বটে! গৃহিণী যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়ে উদ্দেশ্যে প্রণাম করেন। সদর-দ্বারে আগড দিয়ে খোকার পাশটিতে শুয়ে পড়েন।

ঘনান্ধকার। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টিটা থেমেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক। পথ চিনতে অসুবিধা হচ্ছে না কিছু। আর ও-কথাটাও মিথ্যা বাগাড়ম্বর নয়—চোখ বুঁজেও তিনি এ পথে যাতায়াত করতে সক্ষম।

মন্দিরের সোপান বেয়ে উঠে এসে অন্ধকারে শিকলটা খুলতে গিয়ে দেখলেন সেটা খোলাই আছে। ভিতর থেকে জড়িত কণ্ঠে অঘোর চণ্ডাল বলে ওঠে, আসুন, ঠাউর মোশা।

কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চক্কোত্তি বলেন, মন্দিরে তোরা কজন আছিস?

—মুই একাই আছি, আজ্ঞে। স্যাঙাৎরা ডিঙিতে।

—আর 'পশু'টা?

—অদের জিম্মায়।

মহাদেব ভিতর থেকে দ্বার রুদ্ধ করে দিলেন। তাঁর অঙ্গরাখায় ছিল চক্‌মকি। জলে ভেজেনি। আগুন জ্বাললেন। প্রজ্জ্বলিত করলেন ঘৃত প্রদীপ। পূজার নানান উপচার পোঁটলা বেঁধে নিয়ে এসেছে অঘোর। ফল, ফুল, ঘৃত, মধু, দধি, গন্ধদ্রব্যাদি। রাঙাজবা আর অপরাজিতার মালা। আর বড় একটি পাত্রে বিশুদ্ধ কারণ-বারি।

চক্রবর্তী পূজায় বসলেন। কালীপূজার নানাবিধ প্রকরণ—নানান বিধি-বিধান। তার ভিতর একটি হচ্ছে: ধ্বনি! শব্দ! কাংস্য-ঘণ্টা এবং স্ফোটক। মুশ্‌কিল এই যে, নরবলি নিষিদ্ধ হওয়ার পর এ-জাতীয় পূজায় কাংস্য-ঘণ্টা-ধ্বনি, বা স্ফোটকের শব্দ সম্ভবপর হচ্ছিল না। ম্লেচ্ছ শাসকদের অত্যাচারে। কোন এক মহাতান্ত্রিক কাপালিক তাই বিকল্প বিধান দিয়েছেন—কালীপূজায় যদি নরবলিদানের আয়োজন হয়ে থাকে তাহলে কাংস্য-ঘণ্টা-আদি বাদ্যনিনাদ্ নিষ্প্রয়োজন—বিকল্প ব্যবস্থাই গ্রাহ্য। বিকল্প ব্যবস্থাটা কী? কাঞ্চনমূল্য? না! বিকল্প

বিধানটি এই জাতের :

বলির মুহূর্তে যেন 'পশু'র জ্ঞান থাকে। সে যেন অজ্ঞান অচৈতন্য না হয়ে পড়ে। খড়্গাঘাতের পূর্বমুহূর্তে উন্মোচিত করে দিতে হবে তার মুখের বন্ধন। সে মৃত্যুভয়ে অনিবার্যভাবে আর্তনাদ করে উঠবে। সেই মৃত্যু-আর্তির ধ্বনিই কাংস্য-ঘণ্টা স্ফোটকের পরিপূরক।

কিন্তু ঘটনাচক্রে যদি বলির 'পশু' আর্তনাদ না করে?

এমনটা হওয়ার কথা নয়। তবু ব্যতিক্রম-হিসাবে সেই দুর্দৈব যদি উপস্থিত হয় তখন প্রজ্জ্বলিত ঘৃতদীপ শিখাটি তার ভ্রূমধ্যের দিকে তিল তিল করে সরিয়ে আনতে হবে। কোনভাবেই যেন রক্তপাত না ঘটে। প্রাণভয়ে মূক হয়ে থাকলেও ঐ পূত দীপশিখার উত্তাপে বলির 'পশু' আর্তনাদ করতে বাধ্য হবে। তখনই খড়্গাঘাত!

এ সকল বিধিই জানা আছে মহাদেব চক্কোত্তির। এই এক বৎসরে—হিসাব মনে আছে তাঁর—নয়টি 'পশু' বলিদান করা গেছে। প্রথম প্রথম যে বিভীষিকা, যে আতঙ্কে পক্ষকাল ধরে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন ইদানীং সেটা কমে গেছে। একটি অনিবার্য ঔষধও পেয়ে গেছেন যে—মাত্রাতিরিক্ত কারণবারি পান। 'পশু'কে উৎসর্গ করে দেবার পর প্রথম দিকে তিনি স্বচক্ষে বলিদানের পুণ্যকার্যটি দেখতে পারতেন না—বিশেষ ঐ মুখেব বাঁধন খুলে দেবার পর তার আর্তিটা যেন শ্রুতিপথে তীক্ষ্ণ-শলাকার মতো প্রবেশ করত। তারও একটি বিকল্প ব্যবস্থা করেছে অঘোর চণ্ডাল। ওর অনুচর হতভাগ্যের মুখের বাঁধনটা আল্‌গা করে দিলেই অঘোর নিজের মুখে দুটি আঙুল প্রবিষ্ট করে দেয় আর হুবহু অনুকরণ করে শিবাধ্বনি। তাতে দুজাতের সুবিধা। প্রথমত ঘাতকের মনোবল ক্ষুণ্ণ হয় না, দ্বিতীয়ত গ্রামবাসী দূর থেকে ঐ মৃত্যুভীত হতভাগ্যের আর্তনাদটা শুনতে পায় না।

পূজা সমাপনান্তে চক্কোত্তি বসলেন কারণপাত্রটি নিয়ে। ইতিপূর্বেও অনেকটা পান করেছেন : কিন্তু স্নায়ুতন্ত্রীগুলি এখনো সেভাবে উজ্জীবিত হয়নি। মন্দিরেই রাখা আছে একটি বালু-ঘটিকা। মাঝে মাঝে সেটিকে পরীক্ষা করছেন—মহালগ্ন যেন অতিক্রান্ত হয়ে না যায়।

ক্রমে ঘনিয়ে এল লগ্নটি। চক্কোত্তি জড়িতকণ্ঠে তাঁর যজমানকে আত্মীয়-সম্বোধন করে বললেন, যা রে শ্‌শালা, এইবার নিয়ায় তোর সেই শালা ছাগশিশুকে!

অঘোরেরও বিলক্ষণ নেশা হয়েছে। সে পুরোহিতকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, এটা কী বল্‌লি রে বাপ্পোৎ ঠাকুরমশা? ছাগের বাচ্চা হবেক্‌ কেনে রে? কচি খোকন-সোনার মাস-খাওয়াবি বলে লোভ দেখালি বিটিরে, অখন বলিস্‌ ছাগের বাচ্চা? শ্‌শালো!

ধাক্কা খেয়ে কাত হয়ে পড়েছিলেন চক্কোত্তি। সেই অবস্থাতেই বলেন, ওই হল। বিটি জানে কী খাওয়াব। কিন্তুক কাল কোতোয়াল-শালা শুধোলে তো ছাগশিশুই বলতে হবে, না কি বল?

অঘোর জবাব দিতে পারল না। তখনই দ্বার-প্রান্তে দেখা গেল একজনকে। লোকটা হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে বললে, সর্দার! সে শালা বিচ্ছু কি এদিক বাগে এয়েছে?

—কার কতা শুধাস্‌ রে কেলে? কোন বিচ্ছু?

—বলির 'পশু'টো। বাঁধন খুলি জঙ্গলে ছিপাইছে।

মুহূর্তে নেশা ছুটে যায় অঘোরের। প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিল অনুচরের গণ্ডদেশে।

কালী-চাঁড়াল প্রতিবাদ করল না। শাস্তিটা তার প্রাপ্য। তার হেপাজত থেকে বন্দী পলায়ন করলে তাকে চপেটাঘাত সহ্য করতে হবে বৈকি! এক লাফে উঠে দাঁড়ায় অঘোর চণ্ডাল। কে বলবে পূর্বমুহূর্তে সে মাতলামি করছিল। বললে, আয়, চ, জঙ্গল ঢুঁড়ে দেখি। যাবে আর কদ্দূর?

চক্কোত্তি কিন্তু উঠে বসেন না। শুয়ে শুয়েই স্বগতোক্তি করেন, যাঃ শালা। খসল দশ-দশটি সিক্কা টাকা।

অঘোর আর কালী বেরিয়ে গেল খুঁজতে। মহাদেব চণ্ডালী মাকেই গাল পাড়তে থাকেন, অ্যাই তোর বিচার হল? সারাটি দিন মুখে কুটোটি কাটিনি, আর মাঝরাতে গাঁট কাট্‌লি? আড়াইগণ্ডা সিক্কা-টাকা।

সব ভালো যার শেষ ভাল। আধঘণ্টাখানেক পরেই ফিরে এল ওরা দুজন। বালকটিকে পাওয়া গেছে। মন্দিরের বাহিরেই বৃক্ষান্তরাল থেকে সে দেখছিল ওদের কাণ্ড-কারখানা। অঘোর তার গামছাটা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে কাঙালীচরণের মুখটা। তার হাত-পাও শক্ত করে বাঁধা। দুজনে চ্যাঙদোলা করে নিয়ে এল বলির 'পশু'কে।

ঘরে একটি মাত্র ঘৃতপ্রদীপ জ্বলছে। সেই ক্ষীণ আলোকে মহাদেব চিনতে পারলেন না সন্তানকে। বললেন, ভয় কি রে শ্‌শালা। এখনি মায়ের কোলে গিয়ে বসবি। আয়, তোর কপালে ফোঁটা-তিলক কেটে দিই! কাঙালী হাত-পা নেড়ে কী যেন বলতে গেল, শোনা গেল না। অঘোর ওকে কোলপাঁজা করে এগিয়ে নিয়ে এল।

মহাদেব ওর মাথা পবিত্র গঙ্গোদক সিঞ্চন করলেন। গলায় পরিয়ে দিলেন রাঙাজবার একটি মালা। নিজের দক্ষিণহস্তের মধ্যমা চেপে ধরলেন খড়্গে। রক্ত-ফুটে বার হতেই সন্তানের ভ্রূমধ্যে এঁকে দিলেন রক্ততিলক। আদর করে ওর গাল দুটো টিপে দিয়ে জড়িতকণ্ঠে বললেন, লক্ষ্মী বাপ্‌ আমার। এ্যাই শালারা মুখের বাঁধন আল্‌গা করে দিলেই প্রাণভরে একবার হাঁকাড় পাড়বি—'মা!' বুঝলি? তাহলেই মায়ের কোল! মুখটি বুঁজে থাকিস না বাপ্‌। নইলে শালারা আগুনের ছ্যাঁকা দেবে। সে বড় কষ্ট! বড় যন্ত্রনা!

বালক তখন অঘোরের বাহুবন্ধে আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে।

মহাদেব ধমকে ওঠেন তাঁর যজমানকে, দেরি করছিস্‌ কেন শালা! এ দৃশ্য কি চোখ চেয়ে দেখা যায়? যা, কাম সারা কর!

কালী জানতে চায়, উছ্‌ছুগ্‌গ্যু হই গেল?

—না তো দেখলি কী অ্যাতক্ষণ? শালাহ্‌!

কালী আর অধর চ্যাঙদোলা করে বালকটিকে নিয়ে গেল মন্দির চাতালের যূপকাষ্ঠে। যদি প্রয়োজন হয় মনে করে ঘৃতপ্রদীপটি হাতে নিয়ে মহাদেব চক্কোত্তি এগিয়ে এলেন পিছন-পিছন!

হাড়িকাঠে ফেলা হল কাঙালীকে। কালী ওর হাত পায়ের বাঁধন খুলে পিছন থেকে সজোরে টেনে ধরল ঠ্যাঙ-জোড়া। গলাটা সরু লম্বা হয়ে গেলেই কাম সারার সুবিধা! অঘোর খাঁড়াখানা নামিয়ে রেখে এতক্ষণে খুলে দিল ওর মুখের বাঁধন। গলাটা এক বিঘৎ লম্বা হয়ে গেছে। তবু বাঁধন খুলে দিতেই কাঙালী আপ্রাণ প্রয়াসে আর্তনাদ করে ওঠে: বা —বা!

মহাদেব গর্জন করে ওঠেন: শালাহ্‌! কী বললাম এতক্ষণ? বাবা নয় রে! বল: মা——!

কাঙালী তবুও বললে, বা—বা! আ—মি!

হরিদাস

—যাঃ শালাহ্!

অঘোর চণ্ডালের খড়্গ ভীম বেগে নেমে এল যূপকাষ্ঠের দিকে!

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল চক্কোত্তির। হোক শুভকাজ! মায়ের পূজা! তবু একটা মানব শিশু তো! সেই কাঠুরিয়া দম্পতি বোধ করি এখনো বনে-জঙ্গলে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের নিরুদ্দিষ্ট সন্তানকে!

ঠিক তখনই কালীচরণ সন্ত্রস্ত হয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে ওঠে, কে যান্ আসতিছে!

দুজনেই চকিতে সে দিকে দৃকপাত করেন। ঠিক কথা! মশাল হাতে কে যেন এগিয়ে আসছে। অঘোর খাঁড়াটা বাগিয়ে ধরে। কিন্তু ও কী!

যে আগিয়ে আসছে সে পুরুষ নয়, স্ত্রীলোক!

স্ত্রীলোক! এই ঘোর অমাবস্যা রাত্রে শ্মশানভূমিতে! একা! কী চায় সে! কেন ও অমন পাগলের মতো ছুটে আসছে?

কালী স্বগতোক্তি করে, কে বটে গ! মাইয়া ছেলে বটে! ভয়-ডর নাই নি কি!

মহাদেব চক্কোত্তির নেশা ছুটে গেছে এতক্ষণে। কালী আর অঘোর ফেরারী ডাকাত—তাদের মাথার উপর পুরস্কার ঝুলছে; কিন্তু তিনি যে সংসারী মানুষ! বউ-ছেলে নিয়ে সংসার করেন! এই নরবলির একটা সাক্ষীকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না উনি। হিস্‌হিসিয়ে ওঠেন, কেলে! ধর মাগীটাকে। শালীটাকেও উছ্ছুগ্যু করে দিই। মায়ের থানে আজ জোড়া···

কালী ততক্ষণে চিনতে পেরেছে। বলে, কী বুলছ ঠাউর! ও তো মাঠান বটে!

—মাঠান! মানে! আরে, হ্যাঁ, তাই তো।

নিরুপমা উন্মাদিনীর মতো ছুটে আসে। বলে, খোকাকে দেখেছ? খোকা?

—খোকা! কাঙালী? সে তো তোমার কাছে শুয়েছিল।

ততক্ষণে মশালের আলোয় মা দেখতে পেয়েছে যূপকাষ্ঠের ওপ্রান্তে তার সন্তানের নিমীলিতনেত্র মুণ্ডটা আর এ-প্রান্তে কাটাপাঁঠার মতো স্পন্দিত হচ্ছে বাকি দেহটা! নিরুপমা মূর্ছিতা হয়ে লুটিয়ে পড়ল যূপকাষ্ঠের উপর।

মহাদেব তখন থরথর করে কাঁপছেন! এ কী হল! এ কী হয়ে গেল! ভ্রান্তি! কী মর্মান্তিক ভ্রান্তি! বুঝলেন, কেন ঐ বলির 'পশু'টা মৃত্যুমুহূর্তে মায়ের বদলে পিতার করুণা ভিক্ষা করেছিল!

অঘোর এগিয়ে আসে এক-পা। বলে, ঠাউর! বাঁচতি চাও তো মাগের ললাটে এট্টা ফোঁটা কাট্টে অরে উছ্ছুগ্যু করি দাও! নাইলে জানাজানি হয়ি যাবেই!

মহাদেব ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন মুহূর্তে! ব্রাহ্মণ ততক্ষণে চণ্ডাল! দ্রুতহস্তে এক খণ্ড পাথর তুলে নিয়ে সজোরে নিক্ষেপ করলেন অঘোরকে লক্ষ্য করে। উন্মত্তের মতো তিনি লাফাচ্ছেন আর চিৎকার করছেন—হারামজাদা! তোদের সব কটাকে ধরিয়ে দেব। ফাঁসিতে ঝোলাবো!

অঘোর এটা আশঙ্কা করেনি। তার কপালে এসে লাগল পাথরের টুকরোটা। দরদর ধারে রক্ত ঝরল। চণ্ডালের রাগ! মত্তাবস্থায়! তার হস্তধৃত খড়্গটা নৈশ আকাশে একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করল। ছিন্নশির ব্রাহ্মণ লুটিয়ে পড়লেন মূর্ছিতা স্ত্রী ও মৃতপুত্রের দেহের উপর!

তিন-তিনটি মৃতদেহ বিক্রয় করে অঘোর চাঁড়াল কী পরিমাণ কাঞ্চনমূল্য সংগ্রহ করেছিল সেটা এই উপকথার নেপথ্য তথ্য। বাস্তবে উপকথার উপসংহার—যেটা আমি সংগ্রহ করেছিলাম—তা ভিন্ন প্রকারের।

তোমরা যদি কখনো হরিপালের চণ্ডালীমায়ের মন্দিরে—না, ওর নাম এখন 'মা বিশালাক্ষী—তীর্থ করতে যাও, তাহলে লোকগাথার ভিন্নতর উপসংহারটা সহজেই সংগ্রহ করতে পারবে। নেহাৎ যদি অতদূরে যাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে সুধীর কুমার মিত্রমশায়ের 'হুগলী জেলার দেবদেউল' গ্রন্থে (প্রথম সংস্করণ, পৃ: ৩৯) অথবা অম্বিকাচরণ গুপ্তের 'হুগলী'তে (পৃ: ১০৫) সে তথ্যটা পাবে। পড়ে নিও।

আমার কলমটা এমন বে-আদপ, বে-আক্কেলে, নাস্তিক, যে সেই 'বিশ্বাসে-মিলায়ে সাঁই' তত্ত্বটা লিপিবদ্ধ করতে পারল না। শুধু অবিশ্বাসী, একবগ্গা বলে নয়—কলমের যুক্তি: এটা অযৌক্তিক! সেই অলৌকিক উপসংহারটা নরবলি বন্ধের লৌকিক উপসংহার হতে পারে না—

"ব্রাহ্মণ-দম্পত্তির কাতর ক্রন্দনে দেবী প্রসন্না হইয়া দৈববাণীতে কহিলেন, বালক হাটতলায় খেলা করিতেছে, সেখানে খুঁজিলেই পাইবে। অতঃপর আর এখানে নরবলি হইবে না।

"ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী হাটে আসিয়া তাঁহাদের পুত্রকে দেখিতে পাইয়া কোলে লইলেন, সেই অবধি এখানে নরবলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।"

কাহিনীর এই মিলনান্তক উপসংহারটি যদি মেনে নিতে পার তাহলে তো কথাই নেই, নাহলে মহাদেব চক্কোত্তির জন্য তোমরা কি দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলবে না? বেচারি লঘুপাপে গুরুদণ্ড পেল। নয় কি? শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন তো সে একবার মাত্র করেছে। অঘোর চাঁড়ালের ঐ অন্তিম হুঁশিয়ারিটা অগ্রাহ্য করা:

'ঠাউর! বাঁচতি চাও তো মাগের ললাটে এট্টা ফোঁটা কাটে অরে উছ্ছুগ্যু করি দাও!'

ফোঁটা-কাটা বামুন হয়ে তাঁর স্মরণে থাকা উচিত ছিল শাস্ত্রীয় পবিত্র রাজধর্মের নির্দেশটা:

"আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি।
আত্মানম্ সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি।।"[১]

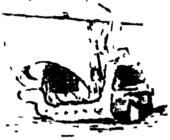

সিঙ্গুরে ওঁরা রাত্রিবাস করেননি। আট ক্রোশ পথ পাড়ি দিয়ে পরদিন সন্ধ্যায় এসে পৌঁছালেন ফ্রেডরিকনগরে। ভাগীরথীতীরে।

ফ্রেডরিকনগর সে-আমলে দিনেমারদের অধিকারে। ডেনমার্কের রাজার নামে এই জনপদের নাম। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম-পাদে জনপদটি ইংরাজ বেণেদের বিক্রয় করে

(১) আপদবিপদের জনাই টাকার সঞ্চয়। কিন্তু গিন্নি যদি বিপদে পড়েন টাকা-কড়ি খরচ করতে পিছুপাও হয়ো না বাপু। আর নিজেই যদি ফ্যাসাদে পড়, তখন কী বা অর্থ; কী বা গিন্নি! সব ছেড়ে তখন মন্ত্র: চাচা! আপন প্রাণ বাঁচা!

দিনেমার কোম্পানি ভারত শোষণের আশা ত্যাগ করে চলে যায়। পরে এর নাম হয় শ্রীরামপুর। তার আদালতের নিকটে গোরস্থানে কিছু সমাধিফলক ভিন্ন দিনেমার শাসনের কোন চিহ্ন আজ ঐ জনপদে নাই।

যাত্রীদলটি অবশ্য এই ফেরঙ্গভূমে ঘাঁটি গাড়েনি। নিকটেই হিন্দু ভূস্বামীদের পাশাপাশি দুখানি বর্ধিষ্ণু গ্রাম—মাহেশ আর বল্লভপুর। মাহেশের রথ সুবিখ্যাত। মনে আছে নিশ্চয়. 'রাধারানী' ঐ মাহেশের রথের মেলাতেই হারিয়ে যায়। এই ফ্রেডরিকনগর—বলা উচিত 'শ্রীরামপুর', বঙ্গসাহিত্যের এক তীর্থ। আমাদের কাহিনীকালের পরবর্তী জমানায় এখানেই পাদরী মার্শম্যান, ওয়ার্ড এবং কেরী-সাহেব বাংলা ছাপাখানায় প্রথম সংবাদ-পত্র 'সমাচার-দর্পণ' প্রকাশ করেন। এখানেই আছে তাঁদের তিনজনের সমাধি। শ্রীরামপুরের ছত্রপুরী, বা চাতরা পল্লীতে সে-আমলেও ছিল একটি শীতলা মন্দির—চাতরার-মা। ওঁরা কিন্তু এসে আশ্রয় নিলেন বল্লভপুরের রাধাবল্লভ-মন্দিরে। বোধকরি বৈষ্ণব বলে।

রাধাবল্লভের মূর্তিটি ভাস্কর্য-শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন।

এই মূর্তির বিষয়ে একটি লোকগাথা আছে।

এ পল্লীটির আদি নাম : আক্না। কৃত্তিবাসী রামায়ণে 'আক্না'-গ্রামের উল্লেখ আছে। সুতরাং পাঁচ-ছয় শত বছরের প্রাচীন গ্রাম তো বটেই। ষোড়শ শতাব্দীতে ঐ আক্না গাঁয়ের নাম পরিবর্তিত হল—যখন রুদ্ররাম পণ্ডিত সেখানে প্রতিষ্ঠা করলেন রাধাবল্লবজীউর আটচালা মন্দির। আক্না হয়ে গেল 'রাধাবল্লভপুর'।

রুদ্ররাম ছত্রপুরীতে মাতুলালয়ে থাকতেন। তাঁর মাতুলগৃহে ছিল একটি অপূর্ব নিমকাঠের শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্তি। জনশ্রুতি, ভাস্কর শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে স্বচক্ষে দেখেনি, কিন্তু 1650 খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তিপাড়া মঠে শ্রীচৈতন্যদেবের যে মূর্তিটি স্থাপিত হয় তারই অনুকরণে দক্ষ ভাস্করের গড়া এই দারুমূর্তি। রুদ্ররামের মাতুল ছিলেন বৈষ্ণব, কিন্তু রুদ্ররাম স্বয়ং শাক্ত বংশের সন্তান। একদিন রুদ্রকে ঐ দারুময় গৌরাঙ্গদেবের মূর্তির সম্মুখে ধ্যানস্থ দেখে মাতুল তাঁকে তিরস্কার করে বলেন. তুমি ঘোর শাক্তবংশের সন্তান, এঁর পূজার অধিকার তোমার নাই।

রুদ্ররাম নিদারুণ দুঃখিত হন। বিনা প্রতিবাদে তিনি গৃহত্যাগ করেন। ঘোর অরণ্যে একাকী তপস্যায় নিরত থাকেন। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে একদিন অন্তরাল থেকে আবির্ভূত হলেন এক দণ্ডী সন্ন্যাসী। ধ্যানভঙ্গে তাঁকে দেখেই শিহরিত হয়ে ওঠেন রুদ্রপণ্ডিত। এ কে? মাতুলালয়ে যে নিম্বকাষ্ঠের দারুময় মূর্তিকে দেখেছেন এ তো সশরীরে তিনি!

সন্ন্যাসী বললেন, কী চাস্?

রুদ্র পণ্ডিত বললেন, যা পেলে চাওয়ার অন্ত হয়, তাই চাই প্রভু।

—কিন্তু তিনি তো বহুবর্ণা। কী রূপে তাঁকে দেখতে চাস্—রাধাবল্লভ, শ্যামসুন্দর, না নন্দদুলাল?

রুদ্রপণ্ডিত মনস্থির করে উঠতে পারেন না। সত্যই তো, তাঁর ইষ্টদেবতা—কে? যে মোহিনী রূপে তিনি শ্রীরাধিকার নয়ন-বল্লভ হয়েছিলেন, না যে শ্যামরূপে তিনি এই প্রপঞ্চময় জগতে সুন্দরের মূর্ত প্রতীক? অথবা যে বাৎসল্য মাধুর্যে তিনি নন্দ-যশোদার হৃদয় জয় করেছিলেন? তাঁর নয়নে তখন দরবিগলিত ধারায় আনন্দাশ্রু। সন্ন্যাসী বলেন, শোন, তোকে গুপ্তধনের সন্ধান

বলে দিচ্ছি: গৌড়েশ্বরের শয়নকক্ষের দ্বারদেশে পশ্চিমপার্শ্বে একটি কষ্টিপাথর আছে। তার ভিতর অন্বেষণ করে দ্যাখ্। যাঁকে পাবি তিনিই তোর ইষ্টদেব। তাঁকে পেলেই চাওয়ার অন্ত হবে।

রুদ্রপণ্ডিত সাষ্টাঙ্গে প্রণত হলেন। গাত্রোত্থান করে দেখেন—সন্ন্যাসী অন্তর্হিত।

রুদ্রপণ্ডিত গৌড়ে এলেন। তখন সুলতানী আমল। সুলতানের প্রধান অমাত্য একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব—তিনিই মহামন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সব কথা খুলে বললেন। বিস্মিত হলেন মহামন্ত্রী। বলেন, হ্যাঁ, নির্দিষ্টস্থানে একটি বৃহদায়তন কষ্টিপাথর আছে বটে; কিন্তু কই তার ভিতর কোন দেবমূর্তি তো কখনো দেখিনি। আচ্ছা লক্ষ্য করে দেখব।

পরদিন প্রস্তরখণ্ডটি নিরীক্ষণ করতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মহামন্ত্রী। স্পষ্ট দেখতে পেলেন—পড়ন্ত সূর্যের আলো পড়েছে সেই প্রস্তরখণ্ডে, আর তাতে ঘর্মের মুক্তাবিন্দু ফুটে উঠেছে। পাথরের স্বেদস্রোত! এ তো অলৌকিক!

প্রস্তরখণ্ডের নিকটে মহামন্ত্রীকে ঐভাবে বসে থাকতে দেখে সুলতান কৌতূহলী হয়ে ঘনিয়ে এলেন। বলেন, অমন করে কী দেখছেন আপনি?

মহামন্ত্রী কৌশলে কার্যসিদ্ধি করতে চাইলেন। বলেন, জাঁহাপনা, এই দেখুন! এই কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরখণ্ডটি অশ্রুবিসর্জন করছে! একে অবিলম্বে মুক্তি দিন, না হলে রাজ্যের অমঙ্গল হতে পারে।

সুলতান তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হলেন। বলেন, এ পাথরখানা এখনি নিয়ে যান।

মহামন্ত্রী লোক দিয়ে সেই বিরাট কষ্টিপাথরখানি স্বগৃহে নিয়ে এলেন।

গৌড়ের প্রখ্যাত এক হিন্দু ভাস্করকে তিনি ডেকে পাঠালেন। পাথরখানা দেখালেন। বলেন, দেখুন, এ থেকে কি কোনও মূর্তি নির্মিত হতে পারে?

ভাস্কর বললেন, একখানা নয়, মহামন্ত্রী। আমি দেখতে পাচ্ছি ঐ কষ্টিপাথরের ভিতর তিনখানি মূর্তির সমাহার ঘটেছে। তিনটিই পুরুষ মূর্তি।

মহামন্ত্রী এবং রুদ্ররাম বিস্মিত। বলেন, কই, আমরা তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আপনি কী করে দেখছেন?

—গুরুর কৃপায়। শিল্পীর সাধনায়। ভাস্করের ধ্যানে!

—কোন দেবতার মূর্তি প্রত্যক্ষ করছেন আপনি? বর্ণনা দিন।

—তিনটিই শ্রীকৃষ্ণের। তাঁর তিন অপরূপ রূপ। এক: যেরূপে তিনি শ্রীরাধিকার মনোহরণ করেছিলেন: রাধাবল্লভ! দুই: যে শ্যামরূপে তিনি 'সত্য-শিব'এর সঙ্গে 'সুন্দর'রূপে সম্পৃক্ত: শ্যামসুন্দর! তিন: যে রূপে তিনি বাৎসল্যরসে জননীবক্ষে ক্ষীরসমুদ্রে তুফান তোলেন: নন্দদুলাল!

রুদ্ররামের দেহ কদম-ফুলের মতো রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে! এই তিন দেবতার নামই তো করেছিলেন সেই মহাসন্ন্যাসী!

ভাস্কর বলেন, মহামন্ত্রী, আপনি নির্বাচন করে বলুন কোন মূর্তিখানি চাইছেন?- আমি বিনা পারিশ্রমিকে সেটি উৎকীর্ণ করে দেব; কিন্তু বাকি প্রস্তর-খণ্ড আমার হবে। আমার পারিশ্রমিক।

মহামন্ত্রী বলেন, এ প্রস্তাবে আমি সম্মত নই, ক্ষোদকাচার্য! আমি কাঞ্চনমূল্যে আপনাকে

পারিশ্রমিক প্রদান করব। তিনটি মূর্তিই আমার চাই।

অগত্যা তাই। তিনটি মূর্তিই উৎকীর্ণ করলেন ভাস্কর—তিনটিই অপূর্ব।

মহামন্ত্রী রুদ্রপণ্ডিতকে বলেন, একটি আমি রাখব, বাকি দুটি আপনি নিয়ে যান। কোনটিকে আপনি দেবেন বলুন?

রুদ্রপণ্ডিত বলেন, নির্বাচন আপনি করবেন মহামন্ত্রী। আপনার অনুগ্রহ ভিন্ন এ সম্পদ আমি কিছুতেই লাভ করতাম না; দ্বিতীয়ত ক্ষোদকাচার্যের পারিশ্রমিক আপনিই সম্পূর্ণ প্রদান করেছেন। নির্বাচনের অধিকার আপনারই।

মহামন্ত্রী বলেন, ও-কথা বলবেন না, আপনি তপস্যায় সন্তুষ্ট করে দেবতার নিকট থেকে এই বিচিত্র সন্দেশটি সংগ্রহ করেছেন। যা হোক, আপনার ইচ্ছানুসারে আমি এই 'নন্দদুলাল মূর্তিটিকেই আমার কাছে রাখলাম। আমার স্বগ্রামে এঁর প্রতিষ্ঠা করব। বাকি দুটি আপনার।

গৌড়ের অনেক সৎ-বৈষ্ণব ওঁর কাছ থেকে যে-কোন একটি মূর্তি ভিক্ষা করলেন। কিন্তু মনস্থির করতে পারলেন না রুদ্ররাম। স্থির করলেন যুগলমূর্তিই প্রতিষ্ঠা করবেন নিজ গ্রামে।

আর্থিক সঙ্গতি সামান্য। সিদ্ধান্তে এলেন, একটি পর্ণকুটির নির্মাণ করে উভয় মূর্তিই স্থাপন করবেন। কিন্তু দৈব যাঁর সহায়, তাঁর আবার কিসের অভাব! মন্দিরের ভিৎ খনন করতে গিয়ে লাভ করলেন এক ঘড়া আকবরী মোহর!

শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত ব্যয় করলেন মন্দির নির্মাণে! যুগলমন্দির সমাপ্ত হলে সাড়ম্বর প্রতিষ্ঠার আয়োজন হল। দেশ-দেশান্তরের বৈষ্ণবাচার্যদের আমন্ত্রণ করলেন রুদ্ররাম—নবদ্বীপ, কাটোয়া, শান্তিপুর, ত্রিবেণী, তেঘরা, সপ্তগ্রাম।

এমনকি নিমন্ত্রণ রাখতে উপস্থিত হলেন স্বয়ং বীরভদ্র-আচার্য।

প্রভু নিত্যানন্দতনয়—'নেড়া'-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ। কিন্তু অশক্ত নন। আচার্য বীরভদ্র গোস্বামী বললেন, রুদ্র! একটি কথা বলি বাবা, কিছু মনে কর না। দেবতার বরে যুগল দেবমূর্তি পেয়েছ। দুর্লভ প্রাপ্তি! কিন্তু তার একটিকে রাখ, একটি দান কর। না হলে সাধনা ঐকান্তিকতা লাভ করবে না।

ব্যথিত হলেন রুদ্ররাম। প্রতিপ্রশ্ন করেন, আপনার কি সিদ্ধান্ত এ দেউল যথেষ্ট বৃহৎ নয়? দুটি মূর্তির স্থান হবে না?

—ঠিক তাই! এ দেউলে একের বেশি দেবতার স্থানাভাব!

ভ্রূকুঞ্চিত হল রুদ্ররামের। বলেন, দেখা যাক। সত্যই যদি স্থানাভাব হয়, তাহলে তিনিই আমাকে স্বপ্নাদেশ দেবেন।

বীরভদ্র সহাস্যে বলেন, কিন্তু তিনি 'কিনি'? রাধাবল্লভ না শ্যামসুন্দর? কে তোমাকে স্বপ্নাদেশ দেবেন?

রুদ্ররাম বিরক্ত হয়ে বলেন, দেখা যাক কার কৃপা হয়। কেউ না দিলে বুঝব যে, স্থানাভাব হচ্ছে না।

—তোমার যেরূপ অভিরুচি, বাবা।

প্রায় এক দশক পরের কথা। বীরভদ্র গোঁসাই-এর শতবর্ষ পূর্ণ হতে তখনো কিছু বাকি। এই সময় রুদ্ররামের পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃশ্রাদ্ধেও তিনি বৃহৎ আয়োজন করেছেন। অনেকানেক

পণ্ডিত সমাগত হলেন। তার ভিতর অতি বৃদ্ধ বীরভদ্র গোঁসাইজী।

কিন্তু শ্রাদ্ধের পূর্বরাত্রি থেকে শুরু হয়ে গেল অকাল বর্ষণ। মাঘ মাস, বৃষ্টির কোনও আশঙ্কা ছিল না। ফলে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। সমস্ত পণ্ড হবার উপক্রম! সমবেত পণ্ডিতেরা বললেন, পারলে একমাত্র ঐ সিদ্ধপুরুষই রক্ষা করতে পারেন। উনি 'মেঘবন্ধনবিদ্যা' আয়ত্ত করেছেন।

রুদ্ররাম যুক্তকরে তাঁরই শরণ নিলেন।

বৃদ্ধ বললেন, হ্যাঁ, ব্যবস্থা তো সহজেই করা চলে। তোমাকে আমি ঐ 'মেঘবন্ধনমন্ত্রটি' শিখিয়ে দিচ্ছি। তুমি তোমার ইষ্টদেবের নিকট ঐকান্তিক নিষ্ঠায় প্রার্থনা মন্ত্রটি উচ্চারণ করলেই বারিপাত বন্ধ হবে।

রুদ্ররাম করজোড়ে বলেন, বলুন প্রভু?

—কিন্তু মুশকিল এই: তুমি 'ঐকান্তিক' হবে কী করে? তোমার ইষ্টদেবের যে যুগলমূর্তি! ধ্যানে তো একজনকেই দেখতে হবে!

রুদ্ররাম বলেন, ওঁরা দুজনেই কি এক নন?

—নিশ্চয়ই। শ্যাম-শ্যামা-শিব-সরস্বতী মায় আল্লাহ্‌ও তিনি। বল, কে তোমার ইষ্টদেব?

রুদ্ররাম লুটিয়ে পড়লেন পরমসাধকের চরণে। বলেন, বুঝেছি প্রভু! লোভ আর মোহের বশবর্তী হয়ে অনেক সৎ বৈষ্ণবকে প্রত্যাখ্যান করেছি। আর করব না। শ্যামসুন্দরকে আপনি নিয়ে যান। আমার বর্তমান সাধনা শুধু রাধাভাবের।

বীরভদ্র বলেন, মনে আছে বাবা? তুমি প্রশ্ন করেছিলে, 'দেউল কি যথেষ্ট বড় নয়?' আমি জবাবে বলেছিলাম, 'ঠিক তাই।' তুমি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সেদিন। বোঝনি, আমি এই দেউলটার কথা বলেছিলাম, বাবা।

বলিরেখাঙ্কিত তর্জনীটি তিনি স্পর্শ করালেন রুদ্ররামের পাঁজরে।

বীরভদ্রের অলৌকিক ক্ষমতায় শ্রাদ্ধকার্য সুসম্পন্ন হল।

সেই থেকে আক্না গ্রাম হয়ে গেল: রাধাবল্লভপুর।

বীরভদ্র প্রতিষ্ঠা করলেন শ্যামসুন্দরকে স্বগ্রামে—অপূর্ব সে মন্দির, আজও অটুট—ভাগীরথীর পরপারে: খড়দহে।

'খড়দহ' নামটা কী-করে হল জান তো? তাও জান না? কিছুই জান না দেখছি দিদিভাই-দাদুভাইরা! বুড়োকে বকিয়ে বকিয়ে মারছ। বার-বার খেই হারিয়ে যাচ্ছে আমার। যা হোক, জান না বললে যখন, তখন শোন বলি:

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশে প্রভু নিত্যানন্দ গার্হস্থ্যধর্মে দীক্ষা নিলেন। নবদ্বীপের নিকটস্থ শালিগ্রামের পণ্ডিত সূর্যদাস সরখেলের দুটি কন্যা—বসুধাদেবী আর জাহ্নবীদেবীকে একযোগে পত্নীত্বে বরণ করলেন। গৃহিণী হলে গৃহ আবশ্যিক। এতদিন অবধূতের শয়নের ব্যবস্থা ছিল হট্টমন্দিরে। এখন আর তা চলে না। গঙ্গাতীরের এক গ্রামে দুই পত্নীকে নিয়ে উপনীত হলেন প্রভু নিত্যানন্দ। শুনলেন, স্থানীয় ভূস্বামী গঙ্গাতীরে আছেন। তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে সামান্য ব্রহ্মোত্তর ভূখণ্ড প্রার্থনা করলেন।

জমিদার-মশাই তখন ইয়ারবন্ধুদের নিয়ে জমিয়ে বসেছেন মৎস্য শিকারে। বললেন, শুনেছি

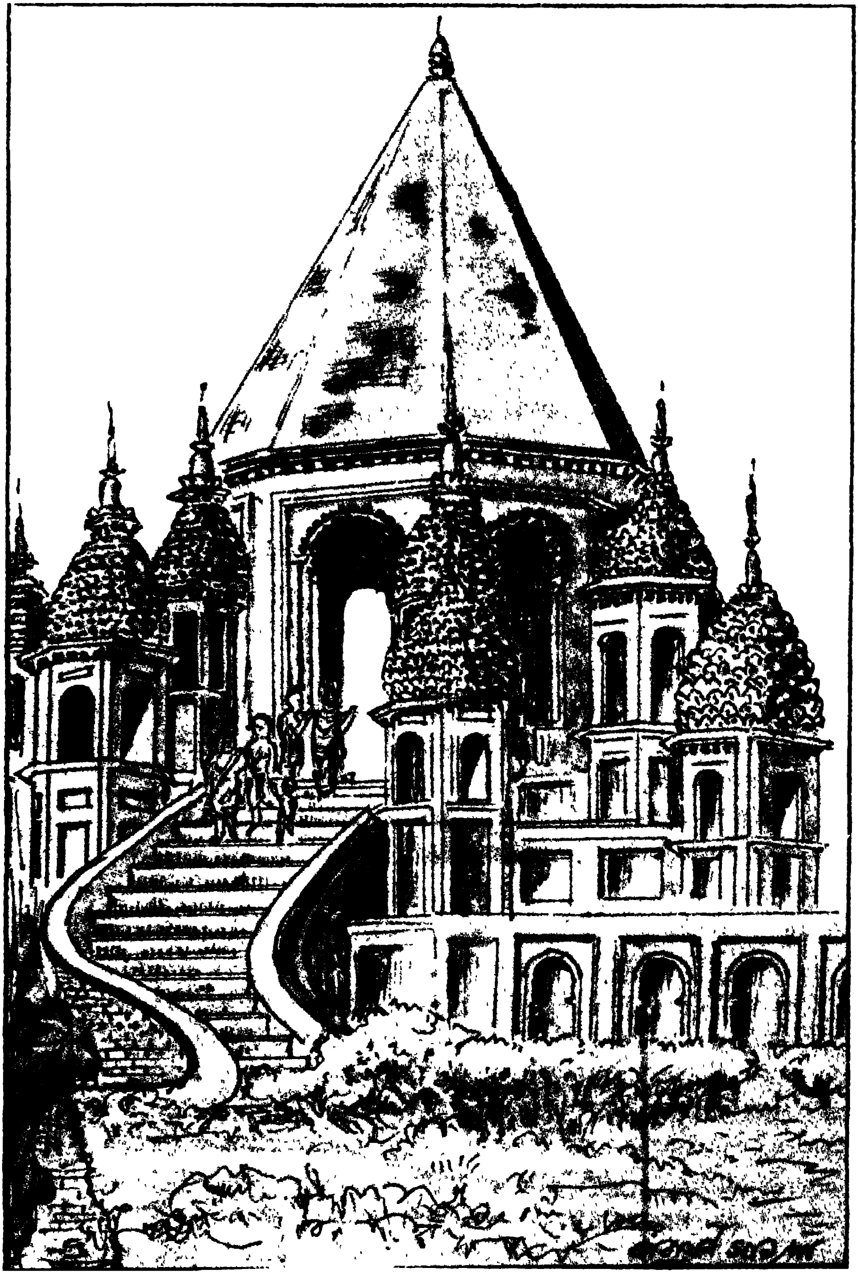

শ্যামসুন্দরের রাসমঞ্চ; খড়দহ

আপনি এককালে অবধূত ছিলেন, অর্থাৎ সন্ন্যাসী! আপনি 'বে' করলেন কোন আক্কেলে? আগে সেটাই আমাকে বুঝিয়ে বলুন।

প্রভু নিত্যানন্দ বিনয়ের অবতার। তৃণাদপি সুনীচ। জিজ্ঞাসুকে কখনো প্রত্যাখ্যান করেন না। করজোড়ে বললেন, অবধূত দুই প্রকার—শৈব ও বৈষ্ণব। মহানির্বাণতন্ত্র মতে তার চারি প্রকার শ্রেণীবিভাগ, যথা ব্রহ্মাবধূত, ধীরাবধূত, শৈবাবধূত ও কূলাবধূত। শেষোক্ত শ্রেণী কুলাচার ধর্ম-মতে অভিষিক্ত থাকেন। তিনি গৃহাশ্রমে সাধন-ভজন করেন। আমি পরমপ্রভুর আদেশক্রমে বর্তমানে সেই কুলাবধূত। আপনি আমাকে সামান্য ভূখণ্ড দান করলে…

জমিদার-মশাই ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন, ও-সব তত্ত্বকথা আমাকে শোনাতে আসবেন না। সন্ন্যাসী হবার পরেও যখন বে-করতে পেরেছেন তখন গঙ্গাগর্ভে ভদ্রাসনও নিশ্চয় নির্মাণ করতে পারবেন। ঐখানে আপনি আপনার ভদ্রাসনটি নির্মাণ করে বংশানুক্রমে ভোগ করতে পারেন।

হুঁকো-বরদার তখন এক-আঁটি জ্বলন্ত খড়ের সাহায্যে তাঁর ছিলিমে অগ্নি-সংযোগে ব্যাপৃত ছিল। জমিদার-মশাই তার হাত থেকে জ্বলন্ত খড়ের আঁটিটা কেড়ে নিয়ে গঙ্গায় নিক্ষেপ করে বললেন, ঠিক ঐখানে। জলের মধ্যে!

নিত্যানন্দ করজোড়ে বললেন, তাই হবে প্রভু!

মোসায়েবের দল অট্টহাস্যে কেয়াবাৎ দিয়ে ওঠে।

নিত্যানন্দ ভ্রূক্ষেপ করলেন না। খড়-দড়ি-বাঁশের এন্তাজামে গেলেন। জমিদার-মশাই বয়স্যদের বললেন, পাগলটাকে তোমরা বাধা দিও না। দেখাই যাক না—রগড় কতদূর গড়ায়।

রগড় যতদূর গড়ালো তাতে সকলের চোখ কপালে ওঠে। প্রজ্জ্বলিত খড়ের আঁটিটি যেখানে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল সেখানে জেগে উঠল একটা চর। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল তা। নিত্যানন্দ সেখানেই নির্মাণ করলেন তাঁর ভদ্রাসন: খড়দহ গ্রামে।

গ্রামটির উৎপত্তি এই অলৌকিক ঘটনায়।

মজার কথা, মাত্র আড়াই ক্রোশ দূরে 'সাঁইবেনা' গ্রাম। গৌড়েশ্বরের মহামন্ত্রীর আদি নিবাস। সেখানেই নির্মিত হয়েছে নন্দদুলালজীর মন্দির।

অর্থাৎ সেই কষ্টিপাথরের ভিতর লুক্কায়িত ত্রি-মূর্তির—গৌড়ের ক্ষোদকাচার্য যাঁদের দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর ধ্যানের দৃষ্টিতে, তাঁরা কাছাকাছিই আছেন আজও। ভাগীরথীর পশ্চিমপারে রাধাবল্লভ আর পুব-পারের পাশাপাশি গাঁয়ে শ্যামসুন্দর আর নন্দদুলালজী। মাঘী-পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে পর্যায়ক্রমে তিন-দেবতার দর্শন নাকি মহাপুণ্য কাজ।

যতদূর মনে পড়ছে—নিতান্ত বাল্যকালে ঐ তিন দেবতাকেই একত্র ঝুলনে দুলতে দেখেছি। কৃষ্ণনগর রাজবাটিতে—বারোদোলের মেলায়। নামগুলিই শুধু মনে আছে: রাধাবল্লভ, শ্যামসুন্দর, নন্দদুলাল। তাঁরা পর্যায়ক্রমে রাধাবল্লভপুর, খড়দহ আর সাঁইবেনার বাসিন্দা কিনা তা বাপু হলপ করে বলতে পারব না। খুব সম্ভবত তাই।

'রাধাবল্লভজী' মন্দির-প্রতিষ্ঠার পূর্বোক্ত কাহিনীটি রূপেন্দ্রনাথ যাত্রাপথেই সকলকে বিবৃত করতে করতে এসেছেন। কর্তামশাই তাই নিদান হেঁকেছেন—তাঁরা ফ্রেডরিকনগর বা শ্রীরামপুরে রাত্রি যাপন করবেন না। আশ্রয় নেবেন ঐ গ্রামে। রাধাবল্লভপুরে। শোনা গেল,

সেই দেবোত্তর সম্পত্তিতে একটি সুবৃহৎ যাত্রীনিবাস আছে। তীর্থযাত্রীরা তিন তিথি সেই ধর্মশালায় আশ্রয় পেতে পারে।

আরও একটি আকর্ষণ ছিল। স্বীকার করতে সঙ্কোচ হয়—তবু বলব, সাধনভজন করছেন বলে ওঁরা তো নির্লোভ সন্ন্যাসী নন। রবি-বাউলের ঐ পংক্তিটা—'সেরা রস রসনায়' তখনো রচিত হয়নি বলে কি তত্ত্বটা তাঁদের না-জানা? এ মন্দিরে বাল্যভোগে একটি বিচিত্র-প্রণালীতে প্রস্তুত ভোগ নিবেদন করা হয়—আহা যেন অমৃত। শোন বলি:

'লোচিকা'-র নাম নিশ্চয় শুনেছ? মিহি গোধূমচূর্ণের ঘৃতপক্ক পিষ্টক। সে তো সে-আমলে অনেকানেক বৈষ্ণব-আখড়ায় ভোগের জন্য প্রস্তুত হত। এ তারই এক রকমফের। পিষ্টকের দুটি পরতের ভিতর পাচক কী-জানি কী-করে প্রবিষ্ট করিয়ে দেয় আর্দ্রক-মৌরী-হিঙ্গু-জীরা-সুরভিত 'ডাইল'-এর এক অনুপান। ঘৃতভর্জিত এই বিশেষ পিষ্টকটি সে আমলে গৌড়মণ্ডলের মাত্র দুইটি দেবমন্দিরে ভোগার্থে প্রস্তুত হত। প্রথমত মুর্শিদাবাদ কান্দির সিংহ-পরিবার প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে, দ্বিতীয়ত এখানে। দুইটি দেববিগ্রহের একই অভিধা: রাধাবল্লভ। পিষ্টকটি পরবর্তীকালে শুধু বৈষ্ণব বাবাজীদেরই নয়, সাধারণ গৌড়বাসীর কাছেও বড়ই আদরণীয় হয়ে পড়ে। এখন তার বহুল ব্যবহার।

তোমরা হয়তো তার নামটি শুনে থাকবে: 'রাধাবল্লভী'!

কর্তামশায়ের সব সংশয় ঘুচে গেছে। দামোদরের অকাল বন্যা আর 'নলগিরিদমনের' উপাখ্যানটি ধন্বন্তরি মেনে নেননি, বারে-বারে প্রতিবাদ করে বলেছেন—এসব গালগল্প; কিন্তু হরিপালের ঘটনাটি যে ওঁর প্রত্যক্ষজ্ঞানে লব্ধ। কুসুমমঞ্জরী আর রাধারানীকে নানানভাবে জেরা করে সম্পূর্ণ তথ্যটি তিনি সংগ্রহ করেছেন। বুঝতে পেরেছেন—সেই পুরোহিত কী উদ্দেশ্যে নবদম্পতির ললাটে রক্ততিলক এঁকে দিয়েছিলেন, কাংস্যবাদক বালকটি কেন কুসুমের আঁচল ধরে টেনেছিল, আর সেই বৃদ্ধ ঘোষালমশাই হঠাৎ কেন পিছিয়ে গেছিলেন পুরোহিতের ধমক শুনে: 'শুনছেন না, উনি মায়ের আহ্বান শুনে এসেছেন!'

সিদ্ধপুরুষ না হলে, শাপভ্রষ্ট দেবতা না হলে, রূপেন্দ্রনাথ যখন প্রণিধান করলেন যে, শ্মশানকালী শবাসন ত্যাগ করে শ্মশানে নেচে বেড়াচ্ছেন তখনই তাঁর সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়ার কথা। পরদিন প্রভাতে মায়ের ওষ্ঠপ্রান্তে তাহলে দেখা যেত কুসুমমঞ্জরীর অঞ্চলপ্রান্তে অনুবিদ্ধ কুঞ্চিকাটি। কিন্তু রূপেন্দ্রনাথ সংজ্ঞাহীন তো হলেনই না, উল্টে ডাকাতে-কালীকে ভর্ৎসনা করে শুনিয়ে দিলেন আদ্যাশক্তির প্রকৃত স্বরূপ কীরকম হওয়া উচিত। ভর্ৎসিতা শ্মশানকালী ভক্তের তিরস্কারে সলজ্জে ফিরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর নির্দিষ্ট শবাসনে—হ্যাঁ, সলজ্জে জিহ্বা দংশন করে।

ভেষগাচার্য—সন্দেহাতীতরূপে সিদ্ধ-পুরুষ।

তাই সুযোগ মতো তাঁর কাছে পেশ করেছেন তাঁর বর্তমান সমস্যাটি। ঐ সিদ্ধপুরুষের সমাধানটিই তিনি নির্বিচারে মেনে নেবেন।

শীতল-রুক্মিণী বিতাড়নের পর কয়েক বৎসর আখড়ায় দিন নির্বিঘ্নে কেটে যাচ্ছিল। গুরুবাক্য মেনে আশ্রমিকেরা দিনে উপাসনা, নামগান, ভিক্ষা করে; রাতে শাস্ত্রোক্ত বিধি-নির্দেশে কৈবল্যানন্দের সন্ধান করে। চান্দ্রায়ণ-ব্রত উদ্‌যাপনের পর বৃদ্ধও ফিরে পেয়েছিলেন মানসিক শান্তি। শীতলদম্পতির কী হল, তারা কোথায় আশ্রয় পেল, সে-সব খবর পাননি। রাসের সময় আখড়ায় নানান যাত্রীসমাগম হয়। ঐ একটি দিন সর্বসাধারণের জন্য আখড়া উন্মুক্তদ্বার। রাসলীলায় নানান উৎসব। কাঞ্চনমূল্যে খিচুড়িভোগ সেবা করতে পারে বহিরাগতরা। রাত্রি সমাগমে তারা ফিরে যায় নাম-গান শুনে। কিছু বিত্তশালী ভক্ত বিশেষ অনুমতিতে—সেটিও কাঞ্চনমূল্যে কিনা জানা যায় না—রাত্রিবাসের অনুমতি লাভ করেন। এসকল তথ্য শীতল-রুক্মিণীর যে না-জানা তাও নয়, তবু তারা রাসোৎসবে কোনবার ফিরে আসেনি। আশ্রমিকেরাও, অন্তত কর্তামশায়ের সামনে তাদের নামোচ্চারণ করেনি।

নতুন করে মুশ্‌কিল হল আখ্‌ড়ায় রাধারানী যোগদান করার পরে।

তাকে সাদরেই গ্রহণ করেছিলেন কর্তামশাই। এ তো রীতিমতো সৌভাগ্য। রাধারানী প্রাক্তন রাইরানী। যৌবনবতী—রীতিমতো সুন্দরী। বরাতিরাও উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। শুনেছিলেন মেয়েটির করুণ কাহিনী—যেটুকু সে বিবৃত করেছে, শুধু সেইটুকুই। বিস্তারিত জানেন না। সে প্রশ্নে এককথায় ছেদ টেনে দিয়েছিল রাধা: আমি ঐ বিধ্বস্ত রূপনগরের প্রাক্তন রাইরানী। এক বৎসর মোহন্ত মহারাজের সেবা করেছি, পরে বহু-পরিচর্যাও করতে হয়েছে। এর বেশি আর কিছু বলার নেই আমার। যদি আশ্রয় না দিতে পারেন খোলাখুলি বলে দিন।

কর্তামশাই আশ্রয় দিয়েছিলেন।

তারপর এই কয়মাসে তিনি তিল তিল করে প্রণিধান করেছেন, কাজটা ভাল হয়নি। কেন, কী বৃত্তান্ত—তা ঠিক জানেন না। বুঝতে পারছেন না। এ যেন এক ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি। শুধু ঐ মেয়েটি একাই নয়, আশ্রমিক বরাতি এবং তাদের সঙ্গিনীরাও গোপনে আশ্রমিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন করছে বলে আশঙ্কা হয়। পূর্ববার হেতুটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন—শীতল-রুক্মিণী ছিল স্বামী-স্ত্রী; তারা সংস্কারমুক্ত হতে পারেনি। যে কোন হেতুতেই হোক, আশ্রমিকেরা গোপনে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। কিন্তু এবার রাধা তো একাকিনী। আশ্রমিকদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ পুরুষের প্রতি কি সে আসক্তা? ঐ কমলকুমার? তাহলে সেটা আর সবাই কেন মেনে নেবে?

কেন তাদের ঈর্ষা হবে না? এবার আর সরেজমিনে তদন্ত করার ভরসা পাননি। গতবারের তিক্ত অভিজ্ঞতাটা স্মরণে থাকায়। আদ্যোপান্ত সমস্যাটা তিনি জ্ঞাপন করলেন রূপেন্দ্রনাথকে। তাঁর উপদেশ চাইলেন।

রূপেন্দ্র স্বতই বিব্রত বোধ করেন। বলেন, এ ক্ষেত্রে আমি কী করতে পারি? আমি বহিরাগত। দু-এক দিনের ভিতরেই আমাদের সম্পর্কের ছেদ হবে।

কর্তামশাই ওঁর হাত দুটি ধরে বলেছিলেন, আপনি শুধু বহিরাগত নন, আপনি একজন

শাপভ্রষ্ট সিদ্ধপুরুষ...

রূপেন্দ্র প্রায় গর্জন করে ওঠেন, না! তা যে আমি নই, তা তো বারে-বারেই বলছি।

—তাই সই! স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু আপনি ভেষগাচার্য! আমাদের আশ্রম ব্যাধিগ্রস্ত। আপনি চিকিৎসাই করুন।

রূপেন্দ্র বললেন, বেশ। আমি চেষ্টা করে দেখব।

তাঁর মনে হল, যে কোন কারণেই হোক ঐ প্রগলভা মেয়েটি তাঁকে কিছু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছে! হয়তো যে-কথা সে কর্তা-মশাইকে বলেনি, সে-কথা তাঁকে জানাতে পারে। হয়তো তিনি তাঁর শিক্ষায়, তাঁর বিদ্যায় একটা সমাধানের নাগাল পাবেন, যা ঐ মেয়েটি নিজে খুঁজে পাচ্ছে না। হতে পারে—ঐ মেয়েটি কোনও মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে, অথচ সে তা জানে না। ঠিক যেমন বর্ধমানে ঘটেছিল।

কিন্তু এক্ষেত্রে একটি বিরাট অন্তরায়ও আছে। হরিপালের সেই রাত্রির শেষপ্রহরে রাধারানীর আচরণ এক বিশেষ ইঙ্গিতবাহী—সেটা যে শুধু তার চারিত্রিক প্রগলভতার প্রভাবে তা মনে হয়নি। তিনি নিজে অবিচলিত, একনিষ্ঠ আছেন, কিন্তু ও-পক্ষও কি তাই? রাধা বলেছিল, 'কে-কোথায় দেখবে আর ভুল বুঝবে।'

রাধা যদি অন্তরের কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর পক্ষে চিকিৎসা করতে যাওয়ার মধ্যে বিপদ আছে। অবিবাহিত হলে তিনি নিঃসঙ্কোচে এ দায়িত্ব নিতে পারতেন ; কিন্তু মঞ্জু যদি ওঁকে ভুল বোঝে?

বিবেকের নির্দেশে চলেন তিনি। স্থির করলেন, এ কাজের ভালমন্দ, আশঙ্কা ও লাভের কথাটা মঞ্জুর সঙ্গে প্রথমে খোলাখুলি আলোচনা করে নেবেন। তাতে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কাটা কমবে। কিন্তু নির্জনে মঞ্জুর সঙ্গে দুটো কথা বলার অবকাশই যে পাচ্ছেন না। বস্তুত সোঞাই গ্রাম থেকে রওনা হবার পর, বর্ধমানে উপনীত হবার পর তাঁর সঙ্গিনীটির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য বারেকের তরেও পাননি। বর্ধমানে বাস করতে হয়েছিল পৃথক কক্ষে, এখানেও প্রায় তাই। শ্মশানকালীর মন্দির চাতালের সে বীভৎস রাত্রিটা তো হিসাবের বাইরে।

সুযোগ হয়ে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। মঞ্জু ওঁকে বললে, আচ্ছা মাহেশ গ্রামটা এখান থেকে কাছাকাছি নয়?

—হ্যাঁ, পাশের গ্রাম। কেন বল তো?

কুসুমমঞ্জরী কারণটা জানায়। তার মনে আছে যে, তার এক পিসিমার বিবাহ হয়েছে ঐ মাহেশ গাঁয়ে। তাঁকে ও ডাকত ফুলপিসি। তাঁর স্বামীর নামটাও মনে আছে—ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায়। তবে সেটা হুগলী জেলার 'মাহেশ' গ্রাম কিনা, ঠিক জানে না।

রূপেন্দ্র বললেন, খোঁজ করে দেখতে দোষ কী? এত কাছাকাছি যখন এসেই পড়েছি। সত্য হলে তুমি হয় তো অনেক খবর পাবে।

দলটি যাত্রীশালায় তিন দিন থাকবে। স্থির করলেন, পরদিন ওঁরা দুজন মাহেশ গ্রামে গিয়ে গাঙ্গুলীমশায়ের তল্লাশ করবেন। যদি তাঁর দেখা না-ও পান তবু মাহেশ গ্রামটাতো দেখা হবে।

কর্তা-মশাই বললেন, মাহেশ থেকে ঘুরে আসতে আপনাদের পাঁচ-ছয় দণ্ড লাগবে। অপরাহ্ণেই ফিরে আসতে পারবেন।

রূপেন্দ্র বলেন, কিন্তু তাঁদের সাক্ষাৎ যদি পাই, আর তাঁরা যদি পীড়াপীড়ি করেন তাহলে হয়তো দু-এক রাত তাঁদের বাড়িতেই থেকে যাব। সুতরাং বিকালে আমরা ফিরে না এলে ব্যস্ত হবেন না।

—কিন্তু মনে আছে তো, পর্শুর পরদিন আমরা ত্রিবেণীঘাটে চলে যাব?

—আছে বৈকি। তার আগে আমি নিশ্চয় ফিরে আসব। সস্ত্রীক যদি নাও হয় তবে একাই। এরকমই স্থির হয়েছে। কর্তামশাই এরপর সদলবলে ত্রিবেণী চলে যাবেন। সেটাই তাঁদের যাত্রাপথের শেষ লক্ষ্য। অপরপক্ষে রূপেন্দ্রের ইচ্ছা ভাগীরথীর উভয় তীরে কিছু তীর্থদর্শন সেরে সস্ত্রীক যাবেন ত্রিবেণী। যদি সেখানে সাক্ষাৎ না হয় তাই দু-পক্ষই তাঁদের আদি-নিবাসের পাকা-ঠিকানা বিনিময় করে রেখেছেন। সহজিয়া পন্থীদেব মূল ঘাঁটি কেন্দুবিল্বের কাছাকাছি—কদমখণ্ডী-ঘাটের ক্রোশ-খানেক পশ্চিমে। কর্তামশাই ওঁকে বিশেষ করে নিমন্ত্রণ করে রেখেছেন রাসপূর্ণিমায় তাঁর আখড়ায় আসতে। তখনই বার্ষিক মহোৎসব।

কর্তামশায়ের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে পিছন ফিরতেই নজর হল অদূরে রাধারানী একা বসে প্রভাতী তিলকসেবা করছে। তার স্নান সারা। চুল শোকায়নি, তাই ধম্মিল্ল বাঁধা হয়নি এখনো। সমুখে ধাতব দর্পণ। ললাটে রসকলির আলিম্পন রচনায় ব্যস্ত। কথাবার্তা সবই শুনেছে। হঠাৎ ডাক দিল, এদিকে একটু আসবেন, গোঁসাইঠাকুর।

রূপেন্দ্র সেদিকে এগিয়ে যান। রাধা একটি পশমের আসন এগিয়ে দিয়ে বলে, বসুন, জপতপ হয়েছে?

—হয়েছে, কিন্তু আমি সমুখে বসে থাকলে তোমার প্রসাধনে ব্যাঘাত হবে না তো কিছু?

রাধা মুচ্‌কি হেসে বলে, একে 'প্রসাধন' বলে না, গোঁসাই। এ হল 'শৃঙ্গার'—'রস'-এর কথা কিছু জানা আছে? 'দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস/চারিভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ।'

রূপেন্দ্র বলেন, আমি বেরসিক—'রস'-এর কথা কী জানি? আমি তো বুঝি: 'পুং স্ত্রিয়াং স্ত্রিয়াঃ পুংসি সম্ভোগং প্রতি যা স্পৃহা/সা শৃঙ্গার ইতি খ্যাতো রতিক্রীড়াদিকারণম্।।'

অপাঙ্গে দৃষ্টি হেনে রাধা জানতে চায়, তার মানেটা কী হল, ঠাকুর?

—অমরকোষ বলছেন, 'স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি স্ত্রীলোকের সম্ভোগকামনায় যা কৃত্য, সেই রতিক্রীড়ার উদ্যোগপর্বের নাম শৃঙ্গার'। প্রসাধনও অবশ্য তাই। তবে প্রসাধন নিতান্তই জাগতিক ব্যাপার, 'শৃঙ্গার'-এর সঙ্গে মিশে আছে কিছু আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা—এই যা!

রাধা কপট তাড়না করে, আপনাকে পণ্ডিত্যেমো করতে হবে না। মঞ্জু কোথায়? তাকে দেখছি না যে?

—ঘাটে গেছে। স্নান করতে। আমরা দুজন একটু পরেই মাহেশে চলে যাব।

—শুনেছি! তাহলে বস দিকি শান্ত হয়ে। এই নাও, খাও! এখনো গরম আছে।

খুঞ্চিপোষের আবরণ সরিয়ে সে বাল্যভোগের প্রসাদপাত্রটি এগিয়ে দেয়। তাতে কিছু কাটা ফল, আখের গুড় আর দুখানি সেই অপূর্ব পিষ্টক: রাধাবল্লভী। রাধা জানায়, আর সকলের

সেবা হয়েছে; শুধু ওদের তিনজনেরটা পৃথক রাখা ছিল।

রূপেন্দ্র প্রসাদের পাত্রটা ললাটে স্পর্শ করিয়ে আহারে প্রবৃত্ত হলেন। বললেন, শুনেছি তোমাদের কানুনে পুরুষ 'আপনি' থেকে 'তুমি'-র নৈকট্যে নেমে আসে রাতের বেলায়। আজ দেখছি এক শৃঙ্গাররতা সে কানুন দিনের বেলাতেও মানছেন না। হেতুটা কী? ঐ 'তাহলে'?

—'তাহলে'! মানে?

—একটু আগে তুমি বললে না: 'তাহলে বস দিকি শান্ত হয়ে'—যখন আমি বললাম মঞ্জু স্নানে গেছে।

রাধা মুখ টিপে হাসল। অপাঙ্গে আবার দেখে নিল। বললে, আখড়ার সে কানুনটা শুধু ভদ্দরলোকের জন্য। চোরকে আবার 'আপনি' বলে কে?

—চোর! চোর আবার কোথায় পেলে তুমি?

রাধা তার প্রসাধনী সরঞ্জাম সরিয়ে রেখে ঝোলার মধ্যে হাৎড়াতে থাকে। বার করে আনে তার খঞ্জনী-জোড়া। কোথাও কিছু নেই ঠুনঠুন্ করে তান ধরে:

"ললিতা কহয়ে শুনহ হরি।
দেখে শুনে আর রহিতে নারি॥
শুন শুন ওহে রসিকরাজ।
এই কি তোমার উচিত কাজ?
উচিত কহিতে কাহার ডর।
কিবা সে আপন কিবা সে পর॥

রূপেন্দ্রের আহার-কার্য বন্ধ হয়েছে। ইতি-উতি তাকিয়ে দেখেন। শ্রুতিসীমার মধ্যে আছে অনেক বরাতি। তারা যে-যার তালে মগ্নচৈতন্য। বৈষ্ণবী খেয়াল-বেখেয়ালে খঞ্জনী বাজিয়ে তান ধরে; এতে ওরা অভ্যস্ত। অবাক হয় না। পদকর্তার বিশেষ পদ চয়ন করে যে মনের ভাব তির্যকরূপে প্রকাশ করা যায় তা ওদের ধারণার বাইরে। গান—গান! মোট কথা, কেউ ফিরেও চাইল না। রাধা দ্বিজ চণ্ডীদাসের জবানীতে এগিয়ে চলে:

"শিশুকাল হইতে স্বভাব চুরি।
সে কি পারে রহিতে ধৈর্য ধরি॥
এক ঘরে যদি না পোষে তায়।
ঘরে ঘরে ফিরে পায় কি না পায়॥
সোনা-লোহা-তামা পিতল কি বাছে?
চোরের কি কখনো নিবৃত্তি আছে॥"

সুললিত কণ্ঠ। দরদ দিয়ে গাইছে। রূপেন্দ্র মুগ্ধ, তবু তাঁর ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয় সজাগ। বৈষ্ণবী তার মোহজাল বিস্তার করতে চাইছে। পরকীয়া-প্রেম ওদের রক্তে। মঞ্জুর অনুপস্থিতেই শৃঙ্গাররতার এই প্রগলভতা। দ্বিজ চণ্ডীদাসের ঐ বিশেষ পদটি চয়নের মধ্যে একটা তির্যক ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন। ওঁর ভিষগ্-সত্তাকে বারে বারে হুঁশিয়ারী জানাচ্ছে তাঁর সাবধানী মন। ঐ বিলোল কটাক্ষ, এই হঠাৎ 'তুমি' সম্বোধন, ঐ 'এক ঘরে যদি না পোষে তায়'-এর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত—সবই একটিমাত্র অর্থবহ। বৈষ্ণবী নিজে মজেছে, এখন ওঁকে মজাতে চাইছে। এ পদাবলীর আকৃতি নৈর্ব্যক্তিক

নয়, ঈশ্বরমুখীও নয়। অন্তরের একটা সাবধানী অংশ ওঁকে বলছে—ঐ প্রগলভাকে নিবৃত্ত করতে, আর সত্যানুসন্ধানী ভিষগ্‌-সত্তা বলছে—তাতে ইন্ধন জোগাতে। তাহলেই বোঝা যাবে ওর অন্তরের জটিলতাটা কী জাতীয়। কেন তাকে কর্তা-মশাই মনে করছেন মানসিক ব্যাধিগ্রস্তা। আত্মবিশ্বাসে সুদৃঢ় না হলে তিনি কিছুতেই পরবর্তী রসিকতাটা করতে পারতেন না, তুমি আমাকে একটা সাধারণ চোর ঠাওরালে, রাধারানী?

—সাধারণ? না গোঁসাই। তুমি নিজেই ভাল জান: তুমি অসাধারণ! না হলে কি আমার দিন-রাত এমন একাকার হয়ে যেতে পারে? শোন, ঠাকুর—গান শোন:

আবার ঠুনঠুন্ করে বেজে ওঠে ওর খঞ্জনী:

"ঘর কৈনু বাহির
বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন
আপন কৈনু পর।
রাতি কৈনু দিবস
দিবস কৈনু রাতি,
বুঝিতে নারিনু সখি,
তোমার পিরীতি।।"

রূপেন্দ্র সিদ্ধান্তে এলেন। কর্তামশায়ের আশঙ্কা অমূলক—কমলকুমার নয়। ওর অন্তঃকরণ এতদিন 'মনের মানুষ' খুঁজে বেড়াচ্ছিল। সেও একমুখী প্রেমের কাঙাল—সর্বপুরুষে পরমপুরুষকে দেখতে পেত না এতদিন। আজ হয়তো পেয়েছে! পরশমণির সন্ধান!

এখন কোন পথে অগ্রসর হবেন? যা জানার ছিল বোধকরি জেনেছেন। আরও অগ্রসর হওয়া বিপদজনক! যা প্রাণে-প্রাণে বলার মেয়েটি তা গানে-গানে বলেছে। কী বলবেন, কী করবেন স্থির করে উঠতে পারেন না। হঠাৎ রাধারানীর একটি কথায় আবার সংযম হারালেন। ওঁর দিকে ফিরে মেয়েটি হেসে বলেছিল, ভুল বুঝ না গোঁসাই ঠাকুর। আমি তোমার ঘর ভাঙতে চাইছি না। তবে এ গান না গেয়ে শান্তিও পাচ্ছিলাম না। হয়তো তুমি বুঝলে, নয় তো বুঝলে না—তা হোক, আমার বুকের পাষাণভারটা তো নেমে গেল। ঐ-কথাটাতেই সান্ত্বনা খুঁজব, 'বুঝ লোক, যে জান সন্ধান।"

রূপেন্দ্র আত্মবিস্মৃত হয়ে ওর হাতখানি তুলে নিলেন নিজের মুঠোয়। অবাক হয়ে বলেন, কী বললে? 'বুঝ লোক যে জান সন্ধান।' এ উদ্ধৃতি তুমি কোথায় পেলে রাধা?

—এঁর কথা তুমি জান না ঠাকুর। এ তোমার অমরকোষ নয়, এ কোন পদকর্তার লেখা গানও নয়। এ এক অখ্যাত আশ্চর্য কবির রচনা। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

—জানি, জানি! কিন্তু তুমি তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' কোথায় পেলে? ঐ পংক্তিটা তো মাত্র ছয় মাস পূর্বের রচনা।

রাধা অবাক হয়। কিন্তু তার মন তখন অন্যদিকে। রূপেন্দ্রের মুঠিতে তখনো বন্দিনী হয়ে

আছে তার করপল্লব। সে দিকে তাকিয়ে ফের গুন্‌গুনিয়ে ওঠে। এবার খালি গলায়:

"গায়ে দিয়ে হাত মোর প্রাণনাথ
অন্তরে বাঢ়ল সুখ।
হাসিয়া কাঁদিয়া আঁখি প্রকাশিয়া
দেখিনু বঁধুর মুখ।।"

রূপেন্দ্র সলজ্জে ওর হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলেন, কই, বললে না? এ কাব্য কোথায় পড়েছ?

দুজনের কেউই লক্ষ্য করেননি—অদূরে এসে দাঁড়িয়েছে কুসুমমঞ্জরী। পুকুরঘাট থেকে সিক্তবসনে ফিরে আসছিল সে। হয়তো নজর হত না। হল গানের কলি শুনে। তখনো রাধার হাতখানি রূপেন্দ্রের করায়ত্ত। সে নিজেই যেন লজ্জা পেল। সন্তর্পণে সরে গেল আড়ালে।

রাধা বললে, 'বিদ্যাসুন্দর' আমি পড়িনি, গোঁসাই। কিছু বিক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি শুনেছি শুধু। তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' পড়েছি। অসাধারণ সেই কবি। মর্মাহত হয়েছি তাঁর বিদ্যাসুন্দরের ক্লেদাক্ত পদে।

—ক্লেদাক্ত পদ। এই যে বললে, তুমি তা পড়নি।

—সবটা নয়। কিছু কিছু দৈহিক মিলনের পদ মাত্র শুনেছি। ঘোরতর অশ্লীল।

রূপেন্দ্র প্রায় ধমক দিয়ে ওঠেন, কবি কয়েক বছর ধরে একটি মহাকাব্য রচনা করেছেন, আর তুমি তার দু-একটি পংক্তি পড়ে বুঝে নিলে—তা অশ্লীল?

রাধা বললে, ভাত সিদ্ধ হয়েছে কিনা বুঝে নিতে দু-চারটি তণ্ডুলকণা পরীক্ষা করাই যথেষ্ট।

রূপেন্দ্র গর্জে ওঠেন, না, তা যথেষ্ট নয়। 'রাঁধুনি' সে ক্ষেত্রে নির্বিচারে কিছু তণ্ডুলকণা দর্বি সহযোগে উঠিয়ে নেয়। তোমাকে সুনির্বাচিত কদন্ন পরিবেশন কবা হয়েছে—প্রস্তরচূর্ণ-মিশ্রিত অপক্ক তণ্ডুল। সম্পূর্ণ কাব্যের মূল্যায়ন ওভাবে করা যায় না।

এবার 'বঙ্কিম'-রচনা শৈলী আশ্রয় করে আমারই বলে উঠতে ইচ্ছে করছে: 'ও রূপেন্দ্র! কী বলিলে! তাহা হইলে সেদিন ভারতচন্দ্রকে ও-কথা বলিয়াছিলে কেন?'

রাধা জানতে চায়, আমি তা ঘটনাচক্রে শুনেছি। ওরা ঐসব অশ্লীল পদ আমাকে পড়ে শোনাতো উত্তেজিত করতে। কিন্তু মাত্র ছয়-মাস পূর্বে রচিত পুঁথির অনুলিপি তুমি কোথায় পেলে?

রূপেন্দ্র বললেন, অনুলিপি নয়, আমি পড়েছি মূল পুঁথি। কবির হস্তাক্ষরে। ভারত আমার বিশিষ্ট বন্ধু।

এবার রাধারই সব কিছু ভুল হয়ে গেল। রূপেন্দ্রর হাতটি টেনে নিয়ে বললে, কবি তোমার বন্ধু? তিনি দেখতে কেমন? কত বয়স?

রূপেন্দ্র কৌতুক করে বলেন, তোমার এই আকুলতা দেখে কবিকে আজ ঈর্ষা হচ্ছে।

একথায় প্রগলভা মেয়েটির উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু এবার আর কোন বাগ্‌বৈদগ্ধের লক্ষণ দেখা গেল না। কেমন যেন বেদনার্ত হয়ে ওঠে। বলে, অসাধারণ কবি ভারতচন্দ্র। হ্যাঁ, কবি আমার প্রিয়জন, অথচ তাঁর কাব্যের কিছু বাছা বাছা অশ্লীল অংশই শুধু শুনেছি আমি! উপায় কী···

রূপেন্দ্র বুঝতে পারেন। কারা ঐ অংশবিশেষ শুনিয়েছে রাধাকে—ঐ রূপনগরের ক্লেদাক্ত পরিবেশে। তাদের নমুনা তো স্বচক্ষেই দেখে এসেছেন বীরনগরে। পাষণ্ডটা কী যেন

বলেছিল? এ-কাব্যের প্রচার হবে সারা গৌড়মণ্ডলে! তখন নাকি কুমোরভায়াকে মূর্তি গড়ার আগে বিশেষ পল্লীতে যেতে হবে না। ঘরে-ঘরেই তেমন মাটি পাওয়া যাবে।.....ইচ্ছা করছিল, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের হাতখানা ধরে হিড়হিড় করে এখানে টেনে নিয়ে আসতেও বলতে, ঐ দেখুন মহারাজ! আপনার প্রিয় কবি কী-ভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন।

দুজনের কেউই লক্ষ্য করেন না—কুসুমমঞ্জরী অদূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। কাছে এগিয়ে আসবে কিনা মনস্থির করে উঠতে পারছে না।

১৭৪২

শ্রীভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায় মাহেশ-এর একজন বিখ্যাত বাসিন্দা। বোধ করি সর্ববিখ্যাত। ধনে মানে, প্রতিপত্তিতে। তিনি হচ্ছেন ফরাসডাঙার প্রখ্যাত দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর প্রধান নায়েব। ইন্দ্রনারায়ণ সমগ্র রাঢ়খণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, রানী ভবানী অথবা বর্ধমানরাজের অপেক্ষা অর্থকৌলীন্যে বোধহয় ন্যূন নন। সেই ইন্দ্রনারায়ণের দক্ষিণহস্ত ইচ্ছা করলে হাতে মাথা কাটতে পারতেন। বোধকরি কাটতেন না—জল্লাদেরা নিষ্কর্মা হয়ে যাবে আশঙ্কায়।

ইন্দ্রনারায়ণ যেমন দুপ্লেক্সের[১] দক্ষিণহস্ত, ভবতারণও তেমনি দেওয়ানজীর দক্ষিণহস্ত। সপ্তাহে পাঁচদিন থাকেন ফরাসডাঙ্গায়, দেড় দিন মাহেশ-এ। প্রতি সপ্তাহান্তে আসেন শনিবার সন্ধ্যায়, ফিরে যান সোমবার প্রত্যুষে। হেতুটি মর্মান্তিক—তাঁর গৃহিণী, মঞ্জুর ফুলপিসিমাতা-ঠাকুরাণী সেই ফেরঙ্গদেশে বসবাস করতে অস্বীকৃতা। কৌতুককর সংবাদটি হচ্ছে এই—ভবতারণ শনিবার অপরাহ্ণে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে সর্বপ্রথমেই 'বার-মহলে'র একটি স্নানাগারে গঙ্গাজলে স্নানপর্ব সারেন। কী গ্রীষ্ম কী শীত! পট্ট বস্ত্র পরিধান করে গৃহে প্রবেশের ছাড়পত্র পান। ম্লেচ্ছদেশের অনাচার তাঁর ভদ্রাসনে বরদাস্ত করেন না মাতঙ্গীদেবী এবং নিভাননী। ভবতারণের দুই পত্নী। শনি-রবি তিনি ভিন্ন-ভিন্ন শয়নকক্ষে নিশাযাপন করে সোমবার প্রত্যুষে পাল্‌কি-চেপে ফরাসডাঙ্গায় ফিরে যান।

নবদম্পতির আদর-আপ্যায়নে কোনও ত্রুটি হল না। পরিচয়মাত্র ওঁরা সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা শুরু করলেন। সেদিন রবিবার—নিতান্ত ঘটনাচক্রে গাঙ্গুলীমশাই ভদ্রাসনে উপস্থিত। কিন্তু ঐ—গাঙ্গুলী-মশাই বিধাতার মতো অনুদার, ব্যাধের মতো উদার নন! মঞ্জরীকে পুরললনার দল টেনে নিয়ে গেল অন্দরমহলে, আর রূপেন্দ্র 'বার-মহলে' খাতিরযত্ন পেতে থাকেন। 'বড় দুঃখে সুখ'লাভের সম্ভাবনা রইল না।

ভিতর-মহল থেকে কিছু ক্রন্দনরোলও কর্ণগোচর হল। ও কিছু নয়—শোনা গেল বর্গী

---

[১] প্রায় সমকালীন এই বিদেশী ভদ্রলোক ফরাসী-চন্দননগরের গভর্নর-জেনারেল হয়েছিলেন ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ আমাদের কাহিনীকালের দুই বৎসর পরে। কিন্তু ঐ অসাধারণ চরিত্রটিকে সেই অপরাধে এড়িয়ে যেতে মন সরল না। ইতিহাস তথা আপনাদের কাছে এই সজ্ঞান-অ্যানাক্রনিজম-এর জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

হাঙ্গামার সময় মঞ্জুর খুড়োমশাই নিহত হয়েছেন। তাঁর পত্নী পুত্রকন্যাদের হাত ধরে বাপের বাড়ি চলে গেছেন। সংবাদ শ্রবণে রূপেন্দ্রনাথ অধোবদনে ব্যথিত মুখভঙ্গি করে নীরব রইলেন। যে পূজ্যপাদ খুড়াশ্বশুর রূপেন্দ্রর ধর্মপত্নীকে কুমারী অবস্থায় মোহান্ত মহারাজের লীলাকুঞ্জে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁর এবম্বিধ অকালমৃত্যুতে সত্যই তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়নি; কিন্তু সৌজন্যের নির্দেশে তাঁকে শোকাভিভূত হবার অভিনয় করতে হল।

জলযোগের পালা মিটলে রূপেন্দ্রনাথ সবিনয়ে আর্জিটা পেশ করলেন তাঁর পিসাশ্বশুরের কাছে: এবার অনুগ্রহ করে ওঁকে ডেকে দিন। আমাদের অনেকটা পথ ফিরে যেতে হবে।

পিসাশ্বশুর বলেন, সে কী বাবাজী! তা কী হয়? তোমরা এলে, কদিন থাক, বিশ্রাম নাও। তারপর তীর্থভ্রমণে যেও। সামনেই দোলযাত্রা—তার পূর্বে কি তোমার শাশুড়ী-ঠাকরুণ ছেড়ে দেবেন ভেবেছ?

দেখা গেল গাঙ্গুলীমশায়ের আশঙ্কা অমূলক নয়। সংবাদটা অন্দরমহলে প্রেরণ করার অনতিকাল পরেই একটি অবগুণ্ঠনবতী এসে বড়কর্তার কাছে নিবেদন করল, জামাইবাবুকে ওঁরা ভিতরে ডাকছেন।

—ঐ দেখ! ডাক এসে গেছে। যাও গিয়ে শোন ওদের বক্তব্য।

অবগুণ্ঠনবতীর পিছন পিছন অনেকটা পথ যেতে হল। দুই মহলের মাঝখানে যে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ তাতে হা-ডু-ডু খেলা যায়। অন্দরমহলের সীমানায় পৌঁছানো মাত্র রূপেন্দ্রর অবস্থা হল সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর মতো, অথবা তার বাপের, প্রমীলা রাজ্যে পদার্পণের পরে। দুই পিসিমা—একটি নকল, তখনো তাঁদের ঠিকমতো চিনে ওঠা যায়নি, তদুপরি তাঁদের দুই জা, তিন ননদ, পুত্রবধূ—সর্বোপরি রূপেন্দ্রের দুই শ্যালিকা! সে এক সুন্দরীদের হাট। কে যে প্রণম্যা আর কার প্রণাম গ্রহণ করতে হবে ঠাওর হয় না।

যাহোক, শিষ্টাচার অবসানে মাতঙ্গী—এতক্ষণে তাঁকে ফুলপিসিমা বলে চিহ্নিত করা গেছে—বললেন, এ কী শুনছি বাবা রূপেন্দ্র! মেয়েটা অ্যাদ্দিন পরে বাপের বাড়ি এল···

রূপেন্দ্র তখন সে প্রমীলারাজ্যে সকলকেই দেখছেন, অথচ যেন 'কাউকেই' দেখতে পাচ্ছেন না—অর্থাৎ যাঁর সুবাদে এ রাজ্যে প্রবেশ। তিনি বোধহয় অন্তরাল থেকে মজা দেখছেন। অনেক কথাবার্তার পর স্থির হল, রবিবারের রাতটা দুজনকে মাহেশে কাটাতে হবে। পরদিন রূপেন্দ্র একলাই প্রত্যাবর্তন করবেন রাধাবল্লভপুরে। সহযাত্রীদের যা বলার আছে বলে আবার ফিরে আসবেন। দোল পূর্ণিমা পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে। তারপর এই মাহেশকে ঘাঁটি করে ওঁরা দুজনে ভাগীরথীর দুই তীরে তীর্থ পরিক্রমা করবেন।

মঞ্জুর পিসতুতো বোন—প্রায় সমবয়সী— রূপেন্দ্রকে কানে কানে বলে গেল, জামাইবাবু যে ভয় পাচ্ছেন তা অমূলক। এটা আপনার শ্বশুরবাড়ি, বর্ধমান নয়।

রূপেন্দ্র বলেন, মানে?

বলেই মনে মনে জিব কাটেন। তুলসী সুযোগের সদ্ব্যবহার করল। বললে, এই সরল কথাটার মানেও বলে দিতে হবে? তবে আপনি কেমনতর দিগ্‌গজ পণ্ডিত? মানে হচ্ছে—এখানে 'চখা ওপারে চখী এপারে' হবে না?

রূপেন্দ্র শ্যালিকার কানবালা-শোভিত প্রত্যঙ্গের নাগাল পাওয়ার আগেই সে হাওয়া। বোঝা

গেল, মঞ্জু ইতিমধ্যেই বোনকে জানিয়েছে বর্ধমানে কীভাবে নাকাল হতে হয়েছিল।

গুরুপাক নৈশ-ভোজনের পর তুলসী প্রতিশ্রুতি মতো রূপেন্দ্রকে পৌঁছে দিল তাঁর শয়নকক্ষে। বিরাট পালঙ্কে মশারি-ফেলা নির্জনতায় হারানো মানিক ফিরে পেলেন। দীর্ঘদিন পরে পাওয়া গেল ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার সুযোগ।

এ অধম কথাশিল্পীও ভারতচন্দ্রের গুণগ্রাহী; কিন্তু তার মানে এ নয় যে, তাঁকে প্রতিপদেই অনুসরণ করতে হবে। অনেক কষ্টে সিঁদ কেটে আমাদের সুন্দর নায়ক এতদিনে বিদ্যালাভ করেছেন; তার পরের একদণ্ডের ঘটনাচক্র অনুমান-নির্ভরই থাক না বাপু! এস, আমরা বরং বিরহতাপ-জর্জরিত সেই মিলন রাত্রির বর্ণনা ঘণ্টাখানেক পর থেকে শুরু করি:

রাধারানীর প্রসঙ্গ উত্থাপনমাত্র মঞ্জু বলে ওঠে, দিদি বড়ই দুখিনি! হ্যাঁ গো—শাস্তরে কোন বিধান-টিধান নেই? রহিমকে শুদ্ধি করে নেওয়া যায় না?

রূপেন্দ্র বলেন, রহিম! রহিম আবার কে?

—বাঃ! যার জন্যে রাধাদির আজ এই আতান্তরি। রহিম ওস্তাগর।

রূপেন্দ্র আকাশ থেকে পড়েন।

দেখা গেল—রাধা আর মঞ্জরী এই কয়দিনের সান্নিধ্যে খুবই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। মঞ্জু তাকে খুলে বলেছে তার সব কথা, স—ব কথা। বাল্য, কৈশোর, প্রথম যৌবনের সেই বিভীষিকাময়ী দিনগুলোর কথা; তারপর তার মূর্ছারোগ, গো-গাড়ি চেপে সোঞাই আসা। শেষমেষ ভিষগাচার্যের হাত থেকে প্রথমে গরল ও পরে অমৃতলাভ! এমনকি ফুলশয্যা রাত্রের সেই বিড়ম্বনার কথাও। অপরপক্ষে রাধারানীও নির্বিচারে মেলে ধরেছে তার ইতিহাস। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলেছে তার সব কথা, স—ব কথা!

এমনটা বোধহয় হয়। রাধারানী ঐ মঞ্জুর ভিতর আবিষ্কার করেছে এক 'বিপ্রতীপ-রাধা'কে। শুরুটা দুজনেরই এক! ঘটনাচক্রে শেষটা ভিন্ন রকম! হয়তো হতভাগিনীর অবচেতন মনে জেগেছে প্রশ্নটা: মূর্ছা রোগটা তো তারও হতে পারত! দু-বছর আগে। তাহলে হয়তো রাধাই গো-গাড়ি চেপে রওনা হত সোঞাইমুখো—ঐ আগুনবরণ ছেলেটার হাত থেকে তাহলে রাধাই প্রথমে গরল আর পরে অমৃতভাণ্ড লাভ করত!

মানুষ যা চায় তা পায় না। যা পায় তা চায় না—ভুল করে পায়! এই চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়ার নামই দুনিয়াদারী। যাকে ঐ রবি-বাউল বলেছেন, ঘড়া ঘড়া অশ্রু ঢেলে মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে হয়। তারপর "মনেরে আজ কহ যে/ভালমন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।"

কিন্তু অমৃতপিয়াসী কি পারে নীলকণ্ঠ শিবের মতো হলাহল পান করতে—'সহজে'? অন্তত রাধা তা পারেনি। রাধারানীর অতীত জীবনের চুম্বকসারটা এই জাতের:

রাধারানীর বাল্য ও কৈশোরস্মৃতিতে অবিমিশ্র আনন্দ। কুসুমমঞ্জরীর চেয়ে তা অনেক বেশি

সৌভাগ্যের দ্যোতক। তার বাবা-মা, ভাই-বোন সবই ছিল। বাবা গঙ্গাপ্রসাদ ছিলেন জিম্বা-তালুকদার, মধ্যস্বত্ব-ভোগী। জাতে বঙ্গজ কায়স্থ—কৌলীক উপাধি বসু। জিম্বা-তালুকদার পেশাগত উপাধি। সে-আমলে জমিদারের অধীনে একাধিক মধ্যস্বত্ব-ভোগী পদ ছিল—লাখরাজদার, যারা খাজনা দিত না, নিষ্কর ভুমি ভোগ করত, প্রায়শই ব্রহ্মোত্তর। তালুকদার, পত্তনীদার, গাঁতিদার, জোতদার প্রভৃতি। সরাসরি কিছু কৃষিজীবীকেও জমির বন্দোবস্ত দেওয়া হত, তাদের বলা হত রায়ত। রায়তেরা কখনো অস্থায়ী, অর্থাৎ কোর্ফা বন্দোবস্ত; কখনো বা স্থায়ী বর্গাদার। তালুকদারেরা জমিদারের অধীনস্থ হয়েছিল পরবর্তী-জমানায়। পলাশীযুদ্ধের প্রাক্কালে তালুকদারেরা সরাসরি নবাব-সরকারে খাজনা জমা দিত—জমিদারের মাধ্যমে নয়; বলা যায় ছোটমাপের জমিদার। কারও বা মৌরসী স্বত্ব, অর্থাৎ পুরুষানুক্রমে ভোগ্য অধিকার, কারও বা মোকররী স্বত্ব—অর্থাৎ খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট। আবার কারও বা 'সোনায়-সোহাগা'—মকররী-মৌরসী স্বত্ব যা নির্দিষ্ট খাজনায় বংশানুক্রমে ভোগ্য। জিম্বা-তালুকদারেরা ঐ তালুকদারের অধীনে। তা, অতসব তত্ত্বকথা আলোচনা করার প্রয়োজন নাই—মোট কথা, গঙ্গাপ্রসাদের আর্থিক সচ্ছলতা যথেষ্টই ছিল। ধর্মে বৈষ্ণব, রূপনগরের বাসিন্দা।

জীবনের প্রথম নয়টা বছর কেটেছে পার্বত্য ঝরনার মতো—নেচে-কুঁদে। সে হাঁটতে গেলে ছুটতো, কথা বলতে গেলে গান গেয়ে উঠত। রাজহাঁসের মতো গায়ের রঙ, বুলবুলের বুকের ধুক্‌পুকানির মতো ঠোঁটদুটি, মাথায় টাকা-টাকা চুল দুধরাজ-রঙের অর্থাৎ শুধু কুচকুচেই নয় চিক্‌চিকে। আর প্রকৃতি খঞ্জন-পাখির মতো। দোষের মধ্যে নয় বছর বয়সেই তার দেহগঠন একটু পুরন্ত। তা হোক, পাড়ায় সে ছিল ডাকসাইটে সুন্দরী।

ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহান্তে অমাবস্যা তিথি। শিবচতুর্দশীর পর দিন। অর্থাৎ মৌনী অমাবস্যা। পঞ্জিকার নির্দেশ এই পুণ্যতিথিতে গঙ্গাস্নানে অক্ষয় পুণ্য। তা অজয়ের তীরে গঙ্গা কোথায় পাবে? ওরা অজয়েই স্নান করে—অবগাহন স্নানই বিধেয়। রাত্রিপ্রভাতে, শুক্লপক্ষের প্রতিপদ থেকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ: মাধবপক্ষ—যার পরিণাম পূর্ণিমায় মাধবের রঙ-দোল।

সেই পুণ্যতিথিতে সহধর্মিণী আর কন্যাকে নিয়ে ভোর-ভোর স্নানে এসেছেন গঙ্গাপ্রসাদ। অমাবস্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে, পুব-আকাশে তখনো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে শুকতারা। মৌনী অমাবস্যার 'মন্তম্বরা-স্নান' উপলক্ষ্যে সেই সাত-সকালেই অজয়ের ঘাটে সমবেত হয়েছে অনেক স্নানার্থী। এ ঘাট মোহন্ত মহারাজের প্রাসাদ-সংলগ্ন; নাম 'মহারাজের ঘাট'।

স্ত্রী-পুরুষদের পৃথক ঘাট। গঙ্গাপ্রসাদ স্নান সমাপনান্তে এসে দেখলেন স্ত্রী-কন্যারও অবগাহন সুসম্পন্ন। গৃহিণী একগলা ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছেন ঘাটোয়াল পাণ্ডাজীর বৃত্তাকার ছত্রতলে; আর কন্যা বসে আছে হাঁটু গেড়ে। পাণ্ডাজী তার ললাটে চন্দনছাপ লেপন করছেন।

সহসা পথের দিক থেকে শোনা গেল এক কলরোল: হট যাও! হট যাও! গঙ্গাপ্রসাদ প্রাচীর সই-সই হয়ে পথ দিলেন। একটি ছোট শোভাযাত্রা এগিয়ে আসছে। শোভাযাত্রার সম্মুখে মোহন্ত-মহারাজের মঠের ধ্বজাধারী কয়েকজন, কিছু ঢাক-ঢোল-শিঙাবাদক। তার পিছনেই

সুসজ্জিত এক বিশাল রণহস্তী। সবাই তাকে চেনে: হেরম্বদাস।

মোহন্ত মহারাজ স্বয়ং এসেছেন গঙ্গাস্নানে। তাই এত কলরব, এত ঢাক-ঢোল-শিঙ্গা। গজরাজ পা মুড়ে বসল ঘাটের কিনারে। মই লাগানো হল। নেমে এলেন স্থূলকায় বৃদ্ধ মোহন্ত-মহারাজ। পরিধানে পট্টবস্ত্র, গলায় গোড়েমালা, মেদের মৈনাক! গজগমনে অগ্রসর হলেন ঘাটের দিকে। সসম্মানে দুই সারি হয়ে মানুষজন পথ দিল।

হঠাৎ গতিরুদ্ধ হল বাবাজীর। হেল্‌তে-দুলতে এগিয়ে এলেন ঘাটোয়ালের দিকে। পাণ্ডাজী গাত্রোত্থান করে দণ্ডবৎ হল। বালিকা তখনো নতজানু—অবাক চোখে দেখছে। প্রণাম করতেও ভুলে গেছে। গোঁসাইজী ওর চিবুক ধরে ওর ভ্রূমধ্যে কী যেন দেখছেন তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে। বলেন, কী নাম রে তোর, রাধারানী?

—শিউলী...মানে, শ্রীমতী শেফালী বসু।

—না, তুই রাধারানী। এ কার মেয়ে?

শেষ প্রশ্নটা পাণ্ডাজীকে। সে হাত তুলে ওর মাকে দেখিয়ে দেয়। গঙ্গাপ্রসাদ ভীড় ঠেলে অগ্রসর হয়ে আসেন। বলেন, আমার কন্যা, প্রভু।

—কত বয়স?

—আজ্ঞে আট পার হয়েছে। নবমবর্ষ চলছে।

—অ! বিবাহ দিয়েছিস্?

—আজ্ঞে না। সম্বন্ধ পাকা হয়ে আছে। বৈশাখে দেব। আপনি অনুমতি দিলেই।

এক গাল হাসলেন মোহন্ত মহারাজ। বললেন, দিলাম না!

—আজ্ঞে?

—বুঝলি না? অনুমতি দিলাম না! এর গৌরীদান হবে না। ষোড়শ বর্ষে এর বিবাহ বিধেয়। ওর ভ্রূমধ্যে আমি সুলক্ষণ দেখতে পেয়েছি। এ মেয়ে মহাসৌভাগ্যবতী।

কপর্দকহীন মানিকচাঁদের ভ্রূমধ্যে তার কোটিপতি হবার সম্ভাবনা দেখেছিলেন তিনি। সবাই তা জানে।... কিন্তু তাহলে রামানন্দ দত্তের বাবাকে কী বলবেন? সম্বন্ধটা ভেঙে দেবেন? প্রতিবেশী দত্তমশায়ের কাছে যে বাকদান করা আছে। রামানন্দ ছেলেটিও খুব ভাল—যেমন বিনয়ী, বুদ্ধিমান, তেমনি সুন্দর। সে যেন ঘরের ছেলে হয়ে গেছে।

সবিনয়ে সে কথাই নিবেদন করেন যুক্তকরে, শিউলীর সম্বন্ধ যে হয়ে আছে প্রভু। কথা দিয়েছি আমি।

—শিউলী! শিউলী কে? বল্‌ছি না—ওর নাম রাধারানী।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বলছিলাম কি যে, ঐ রাধারানী বাকদত্তা...

অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন গোঁসাইজী: বাকদত্তা! বলিস্ কী রে! বাকদানের আগে আমার অনুমতি নিইছিলি?

গঙ্গা পাষাণমূর্তি! এ কী হতে চলেছে? বালিকার গাল দুটি টিপে ধরে লালসাজর্জর কণ্ঠে বলে ওঠেন, আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি রে—আহা! "পহিলে বদরিসম পুন নবরঙ্গ/দিনে দিনে অনঙ্গ আগোড়ালো অঙ্গ।।"

শিউলী জোড়া-পায়ে পিছিয়ে যায়, খঞ্জন পাখির মতো। বলে, আমাকে ছুঁয়ো না। তোমার

হাত নোংরা।

হা-হা করে আবার হাসি। মেদবহুল মধ্যদেশে সে হাস্য তরঙ্গ তোলে। বৃদ্ধ বলেন, ওরে তোরা শোন! রাইরানী কী বলছে শোন। আমার হাত নাকি···

কথাটা শেষ হয় না। নজরে পড়ে নিজের হাত। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে অবতরণের সময় সত্যই তাঁর তালু কালিমালিপ্ত হয়েছে। পট্টবস্ত্রে হাতটা মুছে ফেলে হাঁকাড় পারেন: অক্রুর!

সশস্ত্র দেহরক্ষী অক্রুর সর্দার এগিয়ে এসে দণ্ডবৎ হয়। তাকে বলেন, রাইরানীকে তার কুঞ্জে পৌঁছে দিয়ে আয়।

গঙ্গাপ্রসাদের দিকে ফিরে পাদপূরণ করেন, কাল দেখা করিস! কথা আছে। বুঝলি?

হ্যাঁ, বুঝেছেন। সবটা না হলেও, অনেকটা। না হলে নজরবন্দী হয়ে স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে হবে কেন? পাছে ঐ গোরোচনা গোরী জনারণ্যে হারিয়ে যায় তাই এই সাবধানতা। অক্রুর চলেছে বাড়িটা চিনে রাখতে।

শিউলীর মায়েরও বাকরোধ হয়ে গেছে। মৌনী অমাবস্যার স্নানান্তে যেন মৌনী! অন্তরে জাগছে সেই অব্যক্ত হাহাকার যা বাঙ্ময় হয়ে উঠবে আরও দুশ'বছর পরে সত্যেন্দ্রনাথের কলমে:

“হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে, ওরে!
হারিয়ে গেছে বোল্-বলা সেই বাঁশী।
হারিয়ে গেছে কচি সে মুখখানি
দুধে ধোয়া কচি দাঁতের হাসি!
আঁচল খুলে হঠাৎ স্রোতের জলে
ভেসে গেছে শিউলি ফুলের রাশি।।”

পরদিন বিস্তারিত নির্দেশ পেয়ে বজ্রাহত হয়ে গেলেন গঙ্গাপ্রসাদ। রাজা শান্তনুও পারেননি প্রতিবাদ করতে, যখন গঙ্গাদেবী তাঁর সন্তানকে ডুবিয়ে দিতেন গঙ্গায়। কিন্তু তাঁর বুকফাটা কান্নায় কেউ বাধা দেয়নি। গঙ্গাসাগরে কন্যা বিসর্জন দেবাব প্রথা তখনও চালু—কিন্তু সমাজ অত অনুদার নয়। সন্তানহারা কাঁদলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না। গঙ্গাপ্রসাদ আরও দুর্ভাগা। চোখের জল ফেলা মানা! দু-হাত তুলে কন্যার মৃত্যুতে হরিসংকীর্তনে যোগ দিতে হবে: ‘বল হরি! হরি বল!’ চোখে জল এলে যেন বোঝা না যায় এ আনন্দাশ্রু নয়!

পূর্ববৎসর গোঁসাইজী পুরীধামে তীর্থে গিয়েছিলেন। দেখে এসেছেন, কলিঙ্গের নানান মন্দিরে ‘সুতনুকা’ দেবদাসীদের। তারা ওঁর মঠের সেবাদাসীদের মতো যৌবন-সম্বল শুধু নারীমাংসপিণ্ডই নয়—চৌষট্টি কলায় পারদর্শিনী। প্রেমালাপে সুরসিকা, শৃঙ্গারে কামোদ্দীপিনী, সঙ্গীতে কিন্নরী, নৃত্যে স্বর্গনটী! কাঞ্চনমূল্যে তেমনই দু-একটি বরনারীকে সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন। সফলকাম হননি। পুরোহিতেরা সম্মত হয়নি। কলিঙ্গরাজের বদান্যতায় তাদের অর্থাভাব নাই। তাই এই বিকল্প আয়োজন—স্থির করেছেন: নিজ ব্যবস্থাপনায় সৃষ্টি করবেন কিছু: গোপিকা!

‘গোপিকা’ বোঝ তো? শৈবমন্দিরে প্রধান দেবদাসীকে বলে ‘রুদ্রাণী’, বিষ্ণু-মন্দিরে সে: ‘গোপিকা’! কাঞ্চনমূল্যে গোপিকা ক্রয় করা যায়নি বটে কিন্তু আমদানি করেছিলেন একটি

'গোপালিকা'—জোগতি। 'জোগতি' অর্থে প্রাক্তন দেবদাসী। যৌবন বিকিয়ে যাবার পর তারা নবীন যুগের দেবদাসীদের নানান বিদ্যায় পারদর্শিনী করে তোলে। গাঁয়ের আনপড় সুন্দরী বালিকাকে ঘষে মেজে এই মণিকারেরা তৈরী করে সুদক্ষা কিশোরী দেবদাসীতে। অন্তিমে তার যাদুদণ্ডে সেই কিশোরী রূপান্তরিতা হয়ে যায় যৌবনভারনম্রা সকলকলাপারঙ্গমা গোপিকায়। প্রেমকূজনে রাজনটী, সঙ্গীতে গীতভারতী, নৃত্যে উর্বশী আর সুরতক্রিয়ায় মদনজয়ী রতিদেবীতে।

নগর প্রান্তের এক নিভৃতকুঞ্জে বন্দিনী হল নবমবর্ষীয়া বালিকা। সে বন্দিআবাসে মাত্র দুজন আবাসিক—বর্ষীয়সী জোগতি আর তার বালিকা শিক্ষার্থিনী। প্রাচীর-বেষ্টিত একতলা মোকাম—কারাগারই বলা চলে। বাবা-মা-ভাই-বোন, সই-সয়া কেউ দেখা করতে আসে না। কানুন নেই। সাধনা হওয়া চাই একনিষ্ঠ—নির্বান্ধব পরিবেশে। শুধু গবাক্ষপথে বালিকা দেখতে পায় ফটকের কাছে পাহারা দেয় দাড়িয়ালা এক বন্দুকধারী শান্ত্রী। দেখে কিছু কাক, চড়াই, শালিক—ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে কখনো বা ল্যাজঝোলা হাঁড়িচাচা, হলুদবরণ বেনেবউ বা দীর্ঘপুচ্ছ মসীকৃষ্ণ দুধরাজ! আর বাগানে নাচানাচি করে ফেরে কিছু কাঠবিড়ালী।

জোগতি প্রৌঢ়া নয়, প্রায় বৃদ্ধাই। মনটা নরম। যত্ন নিয়ে শেখায় নাচ আর গান, মুখে মুখে শোনায় নানান তত্ত্বকথা, অক্ষর পরিচয় করায়। রতিরঙ্গের অন্তরঙ্গ কথা শেখানোর সময় হয়নি এখনো।

জানলার ধারে বসে অবকাশের দৈনিক বরাদ্দ ব্যয়িত হয় স্মৃতিচারণে। হোক নবমবর্ষীয়া, তবু তার স্মৃতিভাণ্ডারে কত-কত জমা হয়ে আছে। বাবার কথা, বোনের কথা, ভাই-এর কথা। মায়ের সোহাগ। আর সেই পাগলটার কথা: রামু।

মনে পড়ে 'পুন্যিপুকুর' ব্রতের কথা। 'পুন্যিপুকুর' নয়, কথাটা 'পূর্ণিপুকুর'। বৈশাখ মাসে যাতে পুকুরে জল না শুকোয়, গরমিতে গাছ না মরে যায়, তাই এই ব্রত। ছোট ছোট মেয়েরা বাড়ির আশপাশে ছোট্ট একটা চৌকোণা পুকুর খোঁড়ে—ধর, এক হাত লম্বা, আধ-হাত চওড়া, তিন-চার আঙুল গভীর। তার মাঝখানে পুঁততে হবে বেলগাছের ডাল, তারপর ঢালো জল, যতক্ষণ না শুষে নেবার পরেও পূর্ণিপুকুর টৈটম্বুর হয়ে ওঠে। তারপর সকালবেলা 'উপুস' করে ঠিক 'দুকুর বেলা' পুজো করতে হয়। পুকুরের চার কোণায় জুঁই, বেল, টগরের অঞ্জলি দিয়ে মন্তর পড়তে হবে:

পুন্যিপুকুর পুষ্পমালা
কে পূজে রে 'দুকুর' বেলা?
আমি সতী লীলাবতী,
ভাই-এর বোন পুত্রবতী।
হয়ে 'পুত্তুর' মরবে না,
'পিরথিবীতে' ধরবে না।"

রামু ওর খিদ্‌মদ্‌গার। পুঁচকে বান্ধবীর হুকুমে পুকুর খুঁড়েছে, বেলের ডাল আর পূজার ফুল নিয়ে এসেছে। মায় শিউলী 'উপুস' করছে বলে সকাল থেকে দাঁতে কুটোটি কাটেনি। শিউলী ভিজে চুল পিঠে এলিয়ে জোড়-হাতে ছড়া কেটে-কেটে পুকুরে ফুল ছিটায় আর রামু টুম্-টুম্

হয়ে বসে থাকে সমুখে। যেন তাকেই পুজো করা হচ্ছে।

একদিনের কথা মনে পড়ছে, বছর তিনেক আগেকার কথা। তখন শিউলীর ছয়, রামুর নয়। সেদিন রামুর একটা বেয়াড়া প্রশ্নে সব নয়-ছয় হয়ে গেল। রামু হঠাৎ বললে, অ্যাই শিউলী? তুই ছড়ায় ও-কথা বলিস্ কেন রে? 'ভাই এর বোন পুত্রবতী'?

শিউলী রুখে উঠেছিল—ঈস্! কী বিচ্ছিরি কথাবার্তা তোমার রাম-দা। 'ছড়া' কী? একে বলে 'মন্তর'। বুঝলে?

—তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু তুই কি পুত্রবতী?

—হ্যাঁ গো মশাই! আমার তিনটে কাঠের পুতুল, একটা মাটির! আমার দুই মেয়ে, দুই ছেলে।

—মানছি। কিন্তু মন্তরের ঐখানটা—'আমি সতী লীলাবতী!'

—তাতেই বা অসৈরণ কতাটা কী বলেছি? আমি কি অসৎ?

—দূর পাগলি! 'সতী' মানে বুঝি তাই? 'সতী' মানে যে বরকে ভালবাসে! তোর তো বরই নেই, ভালোটা বাসবি কাকে?

টোবা-টোবা গাল দুটো পাকা-আপেল। ছয়-বছরের বালিকা। ধমক দিয়ে ওঠে, দাঁড়াও! জেঠিমাকে বলে দেব! তুমি আমাকে 'অসভ্য-কতা' শেখাচ্ছ!

মাকে ডরায় রামানন্দ। বলে, আয় বাপ্! 'বর' কতাটা কি অসভ্য কতা? 'ভালবাসা' কি মন্দ-বাসা? খারাপ কতা?

নোলক সমেত মাথা দুলিয়ে শিউলী বলে. জানি না। দিক্ কর না দিনি! আমাকে থির হয়ে পুজো-পাঠ কর্তে দাও!

আজ এই নবমবর্ষীয়া ভাবী-গোপিকার হাসি পায় সে-সব কথা মনে পড়লে। এখন সে অনেক-অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে। অনেক সইয়ের সয়া এসেছে যে ওর। শুনেছে সেইসব সয়া-ওলা ভাগ্যবতীদের কাছে—'বর' কতাটা অসভ্য নয়, কিন্তু বরেরা মাঝে-মাঝে ভারী অসভ্যতা করে। দ্যাখ্-না-দ্যাখ্ ফটাস্ করে চুমু খেয়ে বসে। মায় দিনমানে! পাত্রীর মালিকানা পেলেই স্থান-কালের কথা ভুলে যায়। আর ঐ 'ভালবাসা' কতাটা? সরম হয় স্বীকার করতে, কিন্তু—না, ওটা মন্দ নয়, কতাটা সোন্দর!

সাত আর আট—এ দুটি বছরেও রাম-দাকে সাক্ষীগোপাল করে বেরতো করেছে। তবে মন্তরের বিশেষ বিশেষ পংক্তি 'উরুশ্চারণ' করত না। মনে মনে গুনগুনাতো। রাম্ হাসত মুখ লুকিয়ে। প্রকাশ্যে নয়—তাহলেই পিঠে গুম্-গুম্ হবে! হাসত দু-হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে। পিঠটা ফুলে-ফুলে উঠত। আর লজ্জায় শিউলীর মুখখানি হয়ে যেত শিউলী-বোঁটা রঙের।

আগামী বৈশাখে তার ব্রত সমাপনের শেষ মাহেন্দ্রক্ষণ আসার কথা ছিল—পুন্যিপুকুর হয়ে ওঠার কথা পুণ্যে টৈ-টম্বুর, পূর্ণিপুকুর পরিণত পূর্ণতার সার্থকতায়। লীলাবতী হত সত্যিকারের সতী—সীতা: রামানন্দের হৃদয়লীনা।

কালে—লাজে বাঁচি না—হয়তো পুত্রবতীও হত।

হল না। সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গেল লঙ্কেশ্বর! এক মৌনী অমাবস্যায় সে মুখর সম্ভাবনা হয়ে গেল চির মৌন।

কেটে গেল পাঁচ-পাঁচটা বছর। বালিকা হল কিশোরী। 'নবরঙ্গ' এখনো হয়নি, তবে নব রঙ্গ তো বটে! বদরির কাল অতীত। কিশোরীবক্ষে জেগেছে যুগল কৌতূহল। 'কস্তুরী-মৃগ' হবার জমানা—আপনাতে আপনি বিভোর। পূর্ণিমায় পৌঁছাতে তখন সেই চতুর্দশীর এক-তিথি বাকি: প্রত্যক্ষ অনুভূতির জ্ঞান! পরোক্ষে তার শিক্ষা সম্পূর্ণ। জোগতি ওকে শিখিয়েছে চার-ষোলং চৌষট্টি কলা—ঐ এক-কলা বাকি: হাতে-কলমে! জোগতি-মাসির মঞ্জুষায় ছিল 'কুট্টিনীমতমে'র এক ওড়িয়া অনুবাদ। তাল পাতার পুঁথিতে—হাতে লেখা সচিত্র পুস্তিকা! সুর করে পড়ে শোনাতো—ওড়িয়া-শব্দের আড়াল আবডালে সব কথা বোঝা যেত না, ছবি দেখেও না বুঝলে প্রশ্ন করতে সরম হত। মাসিও ইচ্ছা করেই অনুক্ত রাখত। ছড়া কেটে বলত:

"রসবতী মোর প্রতি যাদু কিলা!
গোটা পান দিয়ে গোটা সুপুরিয়ে
মুচুকিরি হাসি কিরি মোর হাতে দিলা।"

তার শাঙ্করভাষ্য হচ্ছে: এ বিদ্যায় শেষ শিক্ষা শুধু দিতে পারে নাগর। যখন রসবতী মৃদু হেসে তার হাতে তুলে দেবে গুবাক-সুপারীর গুরুদক্ষিণা!

তখনই সেই নিভৃত নিকেতনে ঘুর-ঘুর করতে দেখা গেল একজনকে। নামটা জানে না রাধারানী—সবাই তাকে ডাকত: ছোট-হুজুর। মোহন্ত মহারাজের ভাইপো না ভাগ্নে কী যেন হয়। সেনাবাহিনীর সেনাপতি। অসীম তার ক্ষমতা। দ্বাররক্ষককে অনায়াসে বশীভূত করল উৎকোচে; কিন্তু পদ্মকলির নাগাল পেল না মুগ্ধ ভ্রমর। লঙ্কেশ্বরের লাঞ্ছনা থেকে অশোকবনে জানকীকে কোনও চেড়ি রক্ষা করেছিল কি না বাল্মীকি লিখে যাননি; কিন্তু সেই লম্পটের পাশবিকতা থেকে রাধারানীকে নিরাপত্তা দিয়েছিল ঐ সামান্যা নারী। সামান্যা—তবু অসামান্যা! ভয় দেখিয়ে তাকে জয় করা গেল না, লোভ দেখিয়ে লুব্ধ। ছোট হুজুর তার গলার শতনরী খুলে দিয়েছিল জোগতির হাতে—সসম্ভ্রমে সেটি ওরই পদমূলে নামিয়ে রেখে জোগতি বলেছিল, মুই নেমকহারাম ন-আছি ছুট-হুজুর!

ছোট হুজুর হাসতে হাসতে বলেছিল, নেমকহারামির কথা উঠছে কেন? আমি তো তাঁরই লোক। জোগতি তার পাকা চুলে ভরা মাথাটি নেতিবাচক ভঙ্গিতে নেড়েছিল শুধু!

—ঘটঘট্ করে মাথা তো নাড়ছ, ঐ মাথাটা যদি কেটে নামিয়ে দিই ঘাড় থেকে? কে রক্ষা করবে তোমাকে?

করজোড়ে বলেছিল, মোর ধম্ম আজ্ঞে!

ছোট হুজুর কিন্তু অন্য জাতের খবর পেয়েছিল। কে এক দুঃসাহসী লৌণ্ডা আসে রাতের আঁধারে। প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ করে প্রাঙ্গণে—তার গুপ্তচর স্বচক্ষে দেখেছে—প্রহরী জানে না, কিন্তু জানে ঐ জোগতি। আপত্তি করে না। সে পাহারা দেয়—চোখের আড়াল হতে দেয় না, তবে শ্রুতিসীমার বাহিরে থাকে সে। কে সেই দুঃসাহসী? আর কী মন্ত্রে সে বশীভূত করেছে ঐ বৃদ্ধাকে?

ছোট হুজুর তো ছাড়, রাধারানীও সেটা আন্দাজ করতে পারে না। মানে, তখন পারত না। আজ—কুসুমমঞ্জরীকে গল্প করার সময় বুঝতে পারে। কোন মন্ত্রে রামানন্দ বশীভূত করেছিল বৃদ্ধাকে।

মঞ্জরী জানতে চেয়েছিল—কেন গো রাধাদি?

—আজ বুঝতে পারি, কারণ আমি নিজেই আজ প্রাক্তন গোপিকা। আজ কেউ ঐ অবস্থায় পড়লে আমিও কি সুযোগ করে দেব না? ঐ বৃদ্ধাও কি একদিন অতিক্রম করে আসেনি তার বয়ঃসন্ধির সেই অবাক দিনগুলি—তার প্রাকদেবদাসী জীবনে? তখন তার যৌবনের মৌ-বনে কি গুন্‌গুন্ করতে আসেনি কোন লুব্ধ ভ্রমর?

শেফালী বলত, এভাবে লুকিয়ে দেখা করতে এস না রাম-দা। ধরা পড়লে তোমাকে···

—ধরা পড়ব না রে! ঠিক একদিন পালিয়ে যাব তোকে নিয়ে। সবুর কর—

সবুরে মেওয়া ফলেনি। ধরাই পড়ে গেল শেষ পর্যন্ত। ছোট হুজুর ওকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবার প্রস্তাব দিয়েছিল; কিন্তু মোহন্ত মহারাজ বৈষ্ণব। তিনি স্বীকৃত হননি। অপরাধীকে তুলে দিয়েছিলেন কাজী-সাহেবের হাতে। আর ঐ সঙ্গে এক থলে মোহর! বাদীর উৎকোচের পরিমাণেই যে সে-আমলে নির্ধারিত হত আসামীর শাস্তির পরিমাণটা।

আশ্চর্য! এক থলে মোহর হজম করে কাজী-সাহেব বিচারে অতি লঘু দণ্ড বিধান করলেন সেই পরস্বাপহরকের: তিনমাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড।

মাত্র তিন মাস! তাও বিনাশ্রমে!

ছোট হুজুর তড়পায়—কাজী-শালা দু-তরফা ঘুষ খেয়েছে!

তা সে খায়নি কিন্তু। কাজী-সাহেব একটু নতুন খেলায় মেতেছিল। পরিকল্পনাটি খাশা। বিনাশ্রম কারাদণ্ড বটে তবে বন্দীর আহার এক পদ—কাফেরদের নিষিদ্ধ চতুষ্পদী! শুধুমাত্র শূলপক্ক গো-মাংসের শিককাবাব। দেখা যাক—কদিন না খেয়ে থাকিস্।

শিককাবাব কাজীসাহেবের বড় মন-পসন্দ। বন্দীর শিককাবাবটা কেমন জমে তাই সে দেখবে। মাংস বন্দীর, শূল তার হুকুম, উত্তাপ জঠরাগ্নির! পঞ্চম সপ্তাহে ভেঙে পড়ল তরুণের মনোবল। সেদিনই মুক্তি—তখন কঙ্কালসার মানুষটা চলৎ-শক্তিহীন। দুনিয়ায় সে একা। নির্বান্ধব। কাজী-সাহেব কৌশলে বাকি জীবনের জন্য গোটা দুনিয়াটাই রূপান্তরিত করে দিয়েছে কারাগারে। স্বগৃহে তার স্থানাভাব। স্বগ্রামে তার প্রবেশ নিষেধ। রামানন্দ—না, কারাগার থেকে যে কঙ্কালটাকে ওরা মুক্তি দিয়েছিল তার নাম রামানন্দ নয়, রহিম-মিঞা—এখন সে থাকে ফরাসডাঙায়। আকবর ওস্তাগরের পালিতপুত্র: আবদুল রহিম ওস্তাগর! রাধারানী তার খবর জানে না আর, চোখেও দেখেনি। সে আজ পাঁচ-সাত বছর আগেকার কথা। এতদিনে হয়তো সংসার পেতেছে। কার কাছে যেন শুনেছিল—ওর বিবিজানের নাম, ফতিমা।

এরপর শুরু হল তার নিজের নির্যাতন।

অভিষেক!

লালসা-জর্জর লোলচর্মার তির্যক প্রয়াস। মোহন্ত বোষ্টম মানুষ, শিককাবাব সেবা করা সম্ভবপর নয়—'ঘ্রাণেন' অর্ধভোজন তার 'মনপসন্দ' নয়—অগত্যা বিকৃতকাম!

তবে ছয়মাসের মধ্যেই নিষ্কৃতি পেল। নতুন সাধন-সঙ্গিনীর প্রয়োজন হয়ে পড়ল বাবাজীর। প্রসাদ দিলেন ছোটহুজুরকে। সেখানেও বিড়ম্বনা। ছয়মাসও টিকতে পারেনি। ছোটহুজুরের অরুচি হয়নি, কিন্তু ছুকরি যে সহযোগিতা করতে কিছুতেই রাজী হল না। কেমন করে হবে? সে যে জানে, ঐ লম্পটটার জন্যই রামুদা আজ রহিম মিঞা—গ্রাম থেকে নির্বাসিত। রাতের

পর রাত বলাৎকারে সন্তুষ্ট হবার মানুষ নয় ছোট হুজুর। অগত্যা আবার হাতবদল। তবে নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিতে ভুল হয়নি। আখমাড়াই কলে ওকে নিষ্পেষিত হতে পাঠিয়ে দিল। এমন ব্যবস্থাপনা করল···

কান্নায় ভেঙে পড়েছিল রাধারানী। মঞ্জুর হাত দুটি ধরে বলেছিল, কী হবে তোর শুনে? বলতে আমারও কষ্ট, শুনতে তোরও! সে-সব কথা শুনতে চাসনে আর।

মঞ্জু বলেছিল, থাক দিদি! ও-কথা থাক!

শিউরে উঠেছিল মনে-মনে। এমনটা তো তারও হতে পারত। রাধারানীর মধ্যে সে দেখতে পেয়েছিল এক বিপ্রতীপ–মঞ্জুকে।

রোগ নির্ণয় করা গেছে।

পুরুষ-প্রকৃতিই বল অথবা 'য়াং-য়িঙ'—সৃষ্টিতত্ত্বের সেই অমৃতময় আদিম সত্যটার এ জাতীয় কদর্য রকমফের হলে কী প্রতিক্রিয়া হয় তা আন্দাজ করা শক্ত নয় ভেষগাচার্যের পক্ষে। বোঝেন—কতকগুলো বিকৃতকাম পাষণ্ড যখন ওকে নিয়ে আখমাড়াই কলে পিষেছে তখন শুধু ওর দেহটাই দুমড়ে-মুচড়ে শেষ হয়নি, গেছে মনটাও। নরনারীর দৈহিক-মিলন ওর কাছে এক বিভীষিকার ন্যক্কারজনক প্রতিচ্ছায়া। ওর মনের একটা অংশ সুরত-বিমুখ, কিন্তু আর একটা অংশ? যেটিকে পাঁচ-পাঁচটি বসন্তে গড়ে তুলেছিল সুদক্ষা জোগতি—পদাবলী কীর্তন গানে, কাব্যকথায়, নৃত্যভঙ্গিমার আত্মনিবেদনে? তা আছে অটুট। তা দেহাতীত প্রেম—তার যে মৃত্যু নাই। তা যে 'নিকষিত হেম! কামগন্ধ নাহি তায়।' তাই আজও সে খঞ্জনি বাজিয়ে গাইতে পারে—'গায়ে দিয়ে হাত, মোর প্রাণনাথ অন্তরে বাঢ়ল সুখ!' কিন্তু 'গা' বলতে করমুষ্টির শেষ সীমান্ত। আর একটু ঘনিষ্ঠ হতে চাইলেই ওর অন্তরে জেগে ওঠে বিক্ষোভ, জঠরে বিবমিষা। কে জানে, হয়তো বরাতিরা সবাই এতদিনে জেনে ফেলেছে রহস্যটা। ঐ নির্যাতিতার করুণ ইতিহাস। ওর ঐ শম্বুকবৃত্তির নিদারুণ হেতুটা। ওরা তাকে করুণা করে। টানাটানি করে না। জানে, ঐ আখের ছিব্‌ড়েটায় আর কোন রস-কষ নেই—যতই কেন না দৃষ্টিবিভ্রম হোক।

আর সে জন্যই কর্তা-মশায়ের আশঙ্কা—আখড়ায় নতুন করে অনাচার প্রবেশ করেছে ঐ অপরূপার আগমন-মুহূর্ত থেকে। তাই সাহায্য চেয়েছেন ভেষগাচার্যের।

রোগনির্ণয় তো হল। কিন্তু নিরাময় হবে কী-ভাবে? এ রোগের কী চিকিৎসা?

রাত্রির তৃতীয় যাম। মাধবপক্ষ অনিবার্য নিয়মে চলেছে দোলপূর্ণিমার লক্ষ্যে। আজ শুক্লা একাদশী। নির্মেঘ আকাশে নিদ্রাহারা শশী। তার তির্যক আলো এসে পড়েছে মশারি-ফেলা নির্জনতায়। পাশে আশ্লেষশয়নে রতিক্লান্তা সীমন্তিনী—বিপ্রতীপ-রাধা। নিতান্ত ঘটনাচক্রে যে আখমাড়াই কলে যায়নি।

হয়তো রাধাবল্লভপুরের মন্দির-চাতালে চাঁদের দিকে তাকিয়ে জেগে বসে আছে বিপ্রতীপ-মঞ্জু!

ইতিপূর্বে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; মঞ্জুকে সব কথা খুলে বলবেন। রাধারানীর চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করলে তার পূর্বে মঞ্জরীর অনুমতি নেবেন। তাতে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কাটা কমবে।

কিন্তু এখন মতটা বদলে গেল। ফুল-পিসিমা ওকে ছাড়বেন না—একাকী তাঁকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে সেই সহজপন্থীদের আখড়ায়। সেখানে তিনি ঐ হতভাগিনীর কী-জাতের চিকিৎসা করলেন, আদৌ করলেন কি না, তা মঞ্জু কোনদিন জানতে পারবে না। জানবে—যেটুকু তিনি জানাবেন। কে জানে—সে চিকিৎসাটা কোন্ জাতের হবে শেষ পর্যন্ত। রাধারানীকে যদি নারীজীবনের স্বাভাবিকতার মালভূমিতে উত্তোলন করতে হয়, তাহলে হয়তো তাঁকেই সে-কাজ করতে হবে—ঠিক যেভাবে মৃন্ময়ীকে কোলপাঁজা করে তুলে নিয়েছিলেন ভূশয্যা থেকে ফুলশেযের ফুলেভরা শয্যায়। কিন্তু তারপর? কোথায় থামবেন? এবারেও কি উন্মোচন করে দিতে হবে ঐ মধ্যক্ষামার নীবিবন্ধ—যেমন করেছিলেন স্ফীতোদর মীনুর? কিন্তু সেবার সাক্ষী ছিল ধর্মপত্নীর চর্মচক্ষু। এবার? এবার তা করতে হবে—যদি সেই শেষ চিকিৎসাই করতে হয়—একান্ত নিভৃতে। হোক! তবু তা তাঁর ধর্মবোধের মর্মচক্ষুর সম্মুখে। নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায়—বুঝে নিতে ঐ অনিন্দ্যকান্তি রোগিণীর...

কিন্তু তা কি সম্ভব? তিনি তো মরমানুষ! ভেষগ্‌বিদ্যায় সুস্পষ্ট নিষেধ আছে। মহামুনি চরক তা অনুমোদন করেন না—তৃতীয় ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে যুবতী নারীর দৈহিক পরীক্ষা। কিন্তু বিবেকের নির্দেশে তো চরককে ইতিপূর্বেও অস্বীকার করেছেন। এবারেও কেন করবেন না? শুধু কর্মেই তাঁর অধিকার—'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে'। ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত কর্ম। ফলের আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয় করবেন—রোগিণীর রোগমুক্তি। সে কৃত্য শুধু পরস্মৈপদী ধাতুতে গড়া, আত্মনেপদী নয়। এ তো ঔষধ—ঐ হতভাগিনীর সেব্য। তাকে শুধু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বুঝিয়ে দিতে—দেহজ-মিলন মাত্রেই ক্লেদাক্ত নয়, কামবিকারের বহিঃপ্রকাশ নয়।

কিন্তু তা কি সম্ভব? কামবিকারগ্রস্তাকে তৃপ্তি দিতে হবে, নিজে কামতৃপ্ত না হয়ে। এ তো বাতুলের প্রলাপ! চরক ছাড়, এ তো স্বয়ং ঋষি বাৎস্যায়নেরও ধারণার বাহিরে। এক হাতে খঞ্জনি বাজে না। প্রথমের আঘাতে যদি দ্বিতীয়া স্পন্দিত হয়, তবে দ্বিতীয়ার প্রত্যাঘাতে প্রথমটিও বেপথুমান হতে বাধ্য। এ যে জাগতিক নিয়ম।

যদি হয়ই। তাতেই বা কী? সামাজিক বিধানে, নৈতিক নির্দেশে একমুখীন হবার দায় শুধু নারীর, পুরুষের নয়। মহান হিন্দুধর্মে 'সতীত্ব' শব্দটা একপক্ষের প্রতিই প্রযোজ্য। পুরুষের সে দায় নেই। ব্যতিক্রম যদি নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা হয় তাহলে পঞ্চপতিপ্রিয়া পাঞ্চালী প্রতিষ্ঠা করেছেন এই মত, হিন্দু ভারতে। কাতুর পরমপতি যে কত শত রমণীকে শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে লাভ করেছে তা তার নিজেরই স্মরণ নেই। সমাজ তাতে দোষ ধরে না, কাতুর সে বাবদ কোন ক্ষোভও নেই। তাহলে মঞ্জুই বা অভিমান করবে কেন, যদি খঞ্জনির দুটি পাটিই সমানতালে বাজে? যে-হেতু তার পূর্বে রূপেন্দ্র কিছু অং-বং মন্ত্র উচ্চারণ করেননি?

কে বলে দেবে? কোন শাস্ত্রে আছে এর বিধান?

স্পষ্ট শুনতে পেলেন অন্তরের অন্তস্তল থেকে প্রত্যুত্তর:

—তোমার বিবেক! 'আত্মদীপো ভব! আত্মশরণ ভব! অনন্যশরণ ভব!'

যা অসম্ভব, যা অবাস্তব, যা হয় না—তাই তাঁর লক্ষ্য! কামকলায় তৃপ্ত করতে হবে সেই অনিন্দ্যকান্তিকে—নিজে অনাসক্ত থেকে।

কী যেন গানের কলিটা গেয়েছিল সেই বাউল?

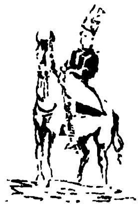

:আমার যেমন বেণী তেমনি রবে, চুল ভিজাবো না!

পরদিন সকাল। রূপেন্দ্র আর গাঙ্গুলীমশাই অশ্বারোহণে এসেছেন ফরাসডাঙ্গায়। এখন হঠাৎ তোমরা রূপেন্দ্রকে দেখলে চিনতে পারতে না। তাঁর গায়ে কুর্তা, অর্কফলাশোভিত মুণ্ডিত-মস্তক নয়, মাথায় পাগড়ি। এটা তুলসী জোর করে পরিয়েছে ওঁকে। মুণ্ডিতমস্তক ব্রাহ্মণ যে অশ্বারোহী হয় না তা নয়, রূপেন্দ্র সেভাবেই গ্রাম-গ্রামান্তরে চিকিৎসা করতে যেতেন; কিন্তু তুলসী রাজী হয়নি। ফরাসডাঙ্গার ফেরঙ্গ-পরিবেশে সে বড় বেমানান। উপরোধে মানুষ ঢেঁকি পর্যন্ত গিলে থাকে আর এক্ষেত্রে সুন্দরী শ্যালিকার বিশেষ উপরোধ! নিজে হাতে ওঁর মাথায় পাগড়িটা বেঁধে দিয়েছে। মঞ্জরী সকৌতুকে লক্ষ্য করেছে। দুজনে অশ্বারোহণে যখন মাহেশ ত্যাগ করে গেলেন—ওরা দুই বোন পাকাবাড়ির ছাদ থেকে লুকিয়ে দেখেছে। মঞ্জুর নিশ্চয় মনে পড়েনি সেই উদ্ধৃতিটা—সেটা রচিতই হয়নি তখন, 'রাজপথ দিয়ে চলে এত লোকে/এমনটি আর পড়িল না চোখে/আমার যেমন আছে।।'

ফরাসডাঙায় ফরাসী-রাজত্ব। তার কর্ণধার তখন যোসেফ ফ্রাঁসোয়া দুপ্লেক্স। ভারতবর্ষে এসেছেন 1720 সালে; ফরাসী চন্দননগরে ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়েছিলেন বছর দশেক পরে। 1741-এ তিনি চন্দননগরে পূর্বভারতের ফরাসী উপনিবেশের গভর্নর জেনারেল। অর্থাৎ পূর্ববৎসর। ভারতীয় স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে তিনি উপেক্ষিত—যেহেতু অন্তিমে ফরাসী জাতি নয়, ইংরাজই ভারত দখল করেছিল। অন্যথায় রবার্ট ক্লাইভ-এর তুলনায় তিনি ছিলেন সব দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ। পণ্ডিচেরী, কর্নাটিক আর চন্দননগরে তিনি যে শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন তা ছিল ইংরাজ অথবা নবাবের চেয়ে উৎকৃষ্টতর। তাঁর সততা ছিল সমকালের এক দুর্লভ দৃষ্টান্ত। তাঁর আমলে ইংরাজ আর ফরাসীদের মধ্যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু ও শেষ হয়; 1746-এ ফরাসী সেনাপতি লা-বুর্দোনে ইংরাজের হাত থেকে মাদ্রাজের শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নেয় আর গোপনে তা ব্রিটিশ ঈস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানিকে প্রত্যর্পণ করতে রাজী হয়ে যায় প্রচুর উৎকোচের বিনিময়ে। উৎকোচের পরিমাণটা ছিল চল্লিশ হাজার ব্রিটিশ স্টার্লিং। বলা বাহুল্য, সেটা দুপ্লেক্স আর লা-বুর্দোনের মধ্যে বাঁটোয়ারা হবার কথা। সমকালীন প্রথাকে দুপ্লেক্স নস্যাৎ করেন। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। লা-বুর্দোনে দেশে ফিরে যায় এবং ব্যাস্টিলে বন্দী হয়। দুপ্লেক্স নিজের শেষ কপর্দক পর্যন্ত ব্যয় করে এবং প্রচুর ঋণ করে যুদ্ধ চালিয়ে যান। 1754 সালে তাঁকে দেশে ফিরে যাবার আদেশ দেওয়া হল। নয় বৎসর পরে নিতান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে এই অবহেলিত মহানায়কের মৃত্যু হয়। ফরাসী সরকার তাঁর প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। হেতুটি সহজবোধ্য: দুপ্লেক্স অন্তিমে পরাজিত। ভারত ফরাসী উপনিবেশ হয়নি!

এই দুপ্লেক্স তখন ফরাসডাঙা বা ফরাসী চন্দননগরের শাসক।

ভবানীচরণ সহজেই সন্ধান জোগাড় করতে পেরেছেন। রহিম ওস্তাগর যার পালিতপুত্র সেই আকবর ওস্তাগর ফরাসী সেনাবাহিনীর পোশাক বানায়। সে—জাতীয় পোশাক বানানোর কায়দা এদেশের ওস্তাগরেরা জানত না : বস্তুত সেলাই করা জামার প্রচলনই ছিল না তার পূর্ব জমানায়, এই গৌড়মণ্ডলে। মুসলমানদের আগমনের পর সেলাই করা জামা-কাপড়ের প্রচলন শুরু হয়েছে বটে, কিন্তু আঁটোসাটো ফরাসী কুর্তার প্রচলন ছিল না। তাই আকবর ওস্তাগরের নাম সবাই জানে।

নায়েব-নাজিরের হুকুম পেয়ে দেখা করতে এল রহিম। বছর সাতাশ-আঠাশ। বলিষ্ঠগঠন। মুসলমানী সাজ, গায়ে মেরজাই, মাথায় সফেদ-টুপি। আভূমি নত হয়ে সেলাম করল রূপেন্দ্রকে। ঘরে তখন তিনি একলাই। বললেন, তোমার নাম রহিম? আকবর ওস্তাগরের পালিত—পুত্র তুমি?

—জী, জনাব।

—কোথায় দেশ তোমার?

—রূপনগর, খোদাবন্দ্। অজয়ের ধারে, বর্ধমান-ভুক্তিতে। কী কসুর হল আমার?

—'কসুর' হয়েছে ধরে নিচ্ছ কেন? বিশেষ একটা কারণে আমি তোমার খোঁজ নিচ্ছি। তুমি ঐ রূপনগরের গঙ্গাপ্রসাদ বসুর কন্যা শেফালীকে চেন?

লোকটা স্বতই আতঙ্কগ্রস্ত হল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ঐ উষ্ণীষপরা রাজপুরুষটির দিকে। তার অন্তরে তখন কী-জাতের তুফান তা বোঝা গেল না। ক্রমে তার দৃষ্টি নত হল। বললে. চিনতাম! শেফালী মারা গেছে হুজুর। তার কথা কেন?

—মারা গেছে! তুমি নিশ্চিত জান?

—না হুজুর। নিশ্চিতভাবে জানি না। জানতে চাইও না। এসব কথা কেন আমাকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করছেন?

রূপেন্দ্রনাথ স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন. ঠিক আছে। তুমি যেতে পার।

তবু স্থানত্যাগ করল না লোকটা। বললে, আপনি যে-কথা জানতে চেয়েছেন তা আমি বলেছি। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব তো আপনি দিলেন না. খোদাবন্দ্? কেন আমাকে ডেকেছিলেন?

—আমি ভুল করেছিলাম রহিম। আমি খুঁজছিলাম রামানন্দ দত্তকে। তোমাকে নয়। তাকে জানাতে যে, শিউলী মরেনি!

এবারও দেরী হল জবাবটা দিতে। তবু বললে, বুঝতে পারছি, আপনি অনেক কথাই জানেন। আমার কাছে সে মৃত—এটা হক কথা নয়, হুজুর?

—আমি তা ভাবিনি! তুমি জানালে, তাই এখন জানতে পারলাম।

—শুনেছি, সেই রূপনগরের মঠ বর্গীতে লুট করেছিল। শিউলী যে মারা যায়নি, তা আমি জানতাম না।

—না, সে জীবিতা। কোথায় আছে তা আমি জানি। তুমি কি তার সঙ্গে দেখা করতে চাও?

—কী লাভ খোদাবন্দ? সেও দাগা পাবে। আমিও!

—তুমি সাদি করেছ? সন্তানাদি কী?

—জী, না। আমি আজও সে পাপ করিনি।

উৎসাহে সোজা হয়ে বসেন। বলেন, পাপ কাজ! কী বলছ? সাদি করা পাপকাজ?

—জী, না। তা বলিনি। কিন্তু কী দরকার তৃতীয় একজনকে এ জটিলতার মধ্যে টেনে আনার? সে তো আমাকে সাদি করে সুখী হবে না!

রূপেন্দ্র ওর হাতখানা চেপে ধরেন। বলেন, রামানন্দ! তাই যদি হবে তাহলে তুমি কেন আজ তাকে গ্রহণ করতে পারছ না? সে অনেক দাগা পেয়েছে, অনেক নির্যাতন সয়েছে। কিন্তু সেও তো সাদি করেনি? তোমার পথ চেয়ে আছে!

রহিম তার হাতখানা টেনে নিল না। বললে, সে কি রাজী হবে ধর্মত্যাগ করতে?

—যদি হয়, তুমি কি তোমার কুসংস্কারকে ত্যাগ করতে পারবে?

—কুসংস্কার! তার মানে?

—রাধারানী বহুভোগ্যার জীবন কাটিয়েছে এতদিন! তা তুমি জান!

মাথা খাড়া করে রহিম বললে, আমি তো কাফের নই গবিবপরবর! আল্লারসুলের দরবারে সে অপরাধের কোন শাস্তির বিধান তো নেই। তাছাড়া সে দুর্ভাগ্য তো হয়েছে রাধারানীর—তাকে আমি চিনি না। আমরা শিউলীর কথা আলোচনা কবছি হুজুর! ... সে এখন কোথায়?

রূপেন্দ্র একটু ভেবে নিয়ে বললেন, তুমি কি যে-কোন শর্তে তাকে গ্রহণ করতে স্বীকৃত?

—যে কোন শর্তে, মানে?

—আমি জানি না, সে ধর্মত্যাগ করতে স্বীকৃতা হবে কি না। জানি না হিন্দু পণ্ডিতেরা তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে কোনও শুদ্ধির মাধ্যমে...

রহিম মাঝখানেই বাধা দিয়ে ওঠে, মাপ করবেন। আমি রাজী নই। আমি কোনও পাপ করিনি। প্রাণধারণের জন্য খাদ্যগ্রহণ পাপ কাজ নয়! প্রায়শ্চিত্তের কোনও বিধান আমি মানব না!

—ঠিক কথা, রামানন্দ ...

—মাপ করবেন হুজুর। আমাকে রহিম নামেই ডাকবেন।

—তাই ডাকব, রহিম! কিন্তু একটা কথা বল। আজ তুমি রহিম, কিন্তু এককালে তুমি তো রামানন্দ ছিলে। এ কথা কি বুঝবে না—কেন শেফালী মুসলমানী হয়ে যেতে পারে না?

—তাহলে আর উপায় কী বলুন? আমি প্রায়শ্চিত্ত করব না— সে আমার ধর্ম গ্রহণ করবে না। সেক্ষেত্রে ...

—না, না, সে তো তার কথা বলেনি এখনো। আমি কেমন করে জানব? আমি কি জানি: সব কথা শোনার পর কোনটা তার কাছে বড় হয়ে উঠবে— প্রেম, না ধর্ম? তুমি এক কাজ কর। আজ সন্ধ্যায় এখানে এস। আমি জেনে এসে তোমাকে জানাব।

—একটা কথা শুধু বলুন—আপনি কে? আপনার কী গরজ? আপনি তাকে কী করে চিনলেন?

—এখন নয়, রহিম। সে-কথাও পরে বলব। তুমি এস এখন।

আদাব জানিয়ে রহিম প্রস্থান করছিল। আবার তাকে ফিরে ডাকলেন, রহিম!

—জী?

—সব কথা তোমাকে এখনি বলতে পারছি না। তবু দু-একটা কথা বলা দরকার। আমি একজন কবিরাজ। শিউলীর চিকিৎসা করছি ...

—ওর কী হয়েছে?

—মানসিক ব্যাধি। ওর মনের একটা অংশ জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে। মস্তিষ্কবিকৃতির কোনও লক্ষণ নেই—কথাবার্তা চাল-চলনে সে নিতান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু যে তাকে বিবাহ করবে তাকে জানিয়ে রাখা উচিত নরনারীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটাকে সে ঘৃণার চোখে দেখে।

রহিম বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। বললে, সেটাই তো স্বাভাবিক, কবিরাজমশাই। যে অত্যাচার তার উপর দিয়ে গেছে ...

রূপেন্দ্র ওর হাতটি আবার টেনে নিয়ে বললেন, তুমি পারবে! তুমি নিশ্চিত তাকে আবার স্বাভাবিক করে তুলতে পারবে। চেষ্টা করে দেখবে, রহিম?

রহিমের চোখ দুটি ছলছল করে ওঠে। বলে, বাবুজী, জানি না আপনি আমাদের কথা কতদূর জানেন—কিন্তু এটা কেন বুঝছেন না, একমাত্র সেই হতভাগীই পারে এই আধখানা মানুষটাকে আবার একটা গোটা মানুষ করে তুলতে। এ তো শুধু দেওয়া নয় হুজুর! এ যে দেওয়া আর নেওয়া! আমরা দুজনেই তো ভুগছি! একই অসুখে!

—আরও একটা কথা! আমি যদি তোমাদের দুজনকে কোনও গীর্জায় নিয়ে যাই? তোমরা কি খ্রীস্টান মতে বিবাহ করতে পার না?

—সে রাজী হলে পারি। কারণ আন্দাজ করছি পাদরী-সাহেব আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলবে না! পাদরী তো আর কাফের নন!

সেদিনই অপরাহ্ণ কাল। অশ্বারোহণে রূপেন্দ্র রাধারানীকে নিয়ে ফিরে আসছিলেন রাধাবল্লভপুর থেকে ফরাসডাঙ্গায়। প্রকাণ্ড আরবীয় অশ্ব, অনায়াসে দুইজন আরোহীর ভার বহনে সক্ষম। রাধারানীকে নিয়ে আসতে হবে বলে এই 'উচ্চৈঃশ্রবা'-কেই বেছে নিয়েছিলেন ফরাসী-সরকারের মন্দুরা থেকে। রাধারানী বসেছে সামনে, বাঁ-দিকে, দু-পা ঝুলিয়ে। ডানহাতে একটা পোঁটলা, অপরহস্তে শিথিলবন্ধনে বেষ্টন করে ধরে আছে রূপেন্দ্রের কটিদেশ। অশ্ব আস্কন্দিত গতিছন্দ লাভ করলেই সেই বন্ধনটি প্রতিবর্তী-প্রেরণায় দৃঢ় আলিঙ্গনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। রূপেন্দ্র বোঝেন, এটা ঐ বৈষ্ণবীর প্রগলভতা-জনিত কারণে নয়, নিতান্ত প্রাণ ধারণের তাগিদেই মাঝে-মাঝে তার পীবর-প্রত্যঙ্গ নিষ্পেষিত হচ্ছে ওঁর কবাটবক্ষে।

রাধারানীর ধারণা, ওরা দুজনে আসছে মাহেশে। সে-কথাই বলেছিলেন রূপেন্দ্র কর্তা-মশাইকে। বলেছিলেন রাধারানী যদি ফিরে না আসে তাহলেও যেন তিনি চিন্তিত না হন; কারণ রোগিণীর নিরাময়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করছেন। ব্যবস্থাটা যে কী জাতীয়, তা বুঝে উঠতে পারেননি কর্তামশাই। তবু আপদ বিদায় হওয়ায় তিনি নিশ্চিন্ত—বিশেষ, মেয়েটি যখন নিজেই রূপেন্দ্রের সঙ্গে চলে যেতে স্বীকৃতা হল।

রূপেন্দ্রকে দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে গিয়েছিল রাধারানী, এ কী, এ কী! এ তো প্রত্যাবর্তন নয়, এ যে আবির্ভাব! গোঁসাইঠাকুর! তুমি রাজপুত্তুর হয়ে গেলে কেমন করে?

—কর্তা মশায়ের কাছে শোননি, আমি সিদ্ধপুরুষ? বহুরূপীর মতো আমার রঙ বদলায়!

--তাই তো দেখছি! কিন্তু যুগলে আসার কথা ছিল যে, রাজপুত্তুর!

—না! সে বলেছে তোমাকে নিয়ে যেতে। তোমার পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে নাও!

তাই বামদিকের সড়ক ছেড়ে রূপেন্দ্র যখন দক্ষিণ দিকের রাজপথ ধরলেন তখনই রাধারানী প্রশ্ন করেছিল, এ কী! এদিকে কেন? আমারা কোথায় যাচ্ছি?

সড়ক যেখানে দ্বিধাবিভক্ত, সেখানে আছে নবাবী পূর্তবিভাগের পথনির্দেশ —সাদা বাঙলায়—কোন দিকে মাহেশ এবং কোনদিকে ফরাসডাঙা। রাধারানী নিরক্ষরা নয়, তার বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, তাদের গতিমুখ এখন ফরাসী চন্দননগর।

রূপেন্দ্র বললেন, আমরা যাচ্ছি তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে প্রাণ-ভোমরার সন্ধানে!

—কিন্তু এমন তো কথা ছিল না গোঁসাই?

—গোঁসাই! গোঁসাই কে? এখন আমি রাজপুত্তুর!

—মানছি, কিন্তু রাজকন্যার পথ যে বাঁদিকের সড়কে?

রূপেন্দ্র বললেন, "এক ঘরে যদি না পোষে তায়/ঘরে ঘরে ফিরে পায় কি না পায়।"

রাধারানী চুপ করে যায়। বোধকরি হঠাৎ আতঙ্কগ্রস্তা হয়ে পড়ে। হয়তো তার মনে হয়, কাজটা ভাল হয়নি। এভাবে মানুষটাকে উত্তেজিত করা। ভুল বোঝানো।

ভুল? তা সে নিজেও জানে না! কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল! নিজের কাছে স্বীকার করতে আর লজ্জা কী? পরিচয় পাওয়ার পূর্বেই ঐ আগুনবরণ মানুষটাকে দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেছিল! প্রথম দিনই। দূর থেকেই। তারপর পরিচয় পাওয়া মাত্র যে-কথাটা ওর মনে পড়েছিল—কী লজ্জা! —সেটার কথা মঞ্জুকেও মন-খুলে বলতে পারেনি: মূর্ছা রোগটা তো তারও হতে পারত! তারপর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে। মনের যে অংশটা দুমড়ে-মুচড়ে অষ্টাবক্র হয়ে যায়নি —হঠাৎ লক্ষ্য করেছিল সেই অংশে একটা ছোট্ট চারা গাছ! দু-তিন দিনের ভিতরেই সে চারাগাছে দেখা দিয়েছিল কাঁচা কিশলয়, গোপন বৃন্তে মুঞ্জরিত হয়েছিল কচি পুষ্প-কোরক। গানে-গানে দল মেলে ফুটে উঠতে চেয়েছিল সেই কুসুমকলিকা। কিন্তু তাই বলে মঞ্জুর ঘরভাঙার কথা তার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না—সে কথা সে স্পষ্টাক্ষরে জানিয়েও দিয়েছিল গোঁসাই ঠাকুরকে।

কাজটা ঠিক হয়নি। ও পুরুষ! মানবে কেন? প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়ার পরেও?

রাধারানীর মন তখন দ্বিধাবিভক্ত! বুঝেছে—এ ওদের অভিসার! অবৈধ অভিসার! গোঁসাই আজ বেপরোয়া রাজপুত্তুর: 'চোরের কি কভু নিবৃত্তি আছে!'

কিন্তু! নিজের মনটাকেই কি চিনতে পেরেছে রাধারানী? সে তো জানে তার সীমারেখা! কাব্যে, গানে, লাস্যে, হাস্যে প্রণয়কথা এক জিনিস, আর···

শেষ সময়ে যদি ঐ অষ্টাবক্র-মনটা পথ রুখে দাঁড়ায়!

অশ্বের গতি স্তিমিত হয়ে এল একটি নাকা-চৌকির সম্মুখে। পথের সামনে এড়োএড়ি করে একটি বাঁশ বাঁধা। তার একপ্রান্তে দড়ির বাঁধন; অপরপ্রান্তে ভারী পাথর-বাঁধা হাঁসকল! কী

ব্যাপার? পথ রুদ্ধ কেন?

এটাই কানুন। এটা ফরাসী-চন্দননগরের শহরসীমান্ত। ও-প্রান্ত ফরাসী সরকারের শাসনাধীন। নাকাচৌকীর পাশেই একটি ছোট গুমটি ঘর। তার সম্মুখে পগ্গ মাথায় একজন রক্ষী, ঘরের ভিতর টক্‌টকে লালমুখো এক সাহেব।

—পথে আগড় দেওয়া কেন? —জানতে চাইল রাধারানী।

—আমরা নগরসীমান্তে পৌঁচেছি। ছাড়পত্র দেখাতে হয় এখানে।

রূপেন্দ্র অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন। রাধার কটিদেশ বেষ্টন করে তাকে ভূতলে নামিয়ে আনলেন। সাহেবের চোখের সামনে এভাবে অবতরণ করতে সলজ্জ হয়ে পড়ে।

সহাস্য-বদনে ঘর ছেড়ে বাইরে বার হয়ে এল ফরাসী যুবক। এমন রাঙামুখো মানুষ রাধা সারাজীবনে দেখেনি। আর তার সাজপোশাকেরই বা কী বাহার! ঊর্ধ্বাঙ্গে খাটো কুর্তা, নিম্নাঙ্গে যে পরিচ্ছদ—ব্রিচেস্—তা আগে কখনো দেখেনি। মাথায় বিরাট টুপি, তাতে আবার কী একটা পাখির পালক লটকানো। কোমরবন্ধে শুধু তরবারীই নয়, পিস্তলও।

মাথা থেকে টুপিটা খুলে ওঁদের দুজনকে বলে, বঁ সোয়ে!

রূপেন্দ্র নমস্কার করে প্রত্যভিবাদন করেন: 'বঁ সোয়ে'!—কথাটার মানে না জেনেই। 'নমস্কারে'—'নমস্কার', 'রাম-রাম'-এ 'রাম-রাম', 'শুভসন্ধ্যায়' যদি 'শুভসন্ধ্যা' প্রত্যভিবাদন হয়, তাহলে 'বঁ সোয়ে'-র ক্ষেত্রেই বা নিপাতনে সিদ্ধ হতে যাবে কেন?

সাহেব বলে, আঁত্রে, আঁত্রে, সিল ভু প্লে—

এবার আর হালে পানি পান না। তবে ওর দুটি হাতের মুদ্রায় বোঝা যায় বক্তব্যটা, আসুন, আসুন, অনুগ্রহ করে ভিতরে আসুন।

রূপেন্দ্র বিনাবাক্যব্যয়ে জেব থেকে তাঁর অনুমতিপত্রটি বার করে দেখান। পিসেমশাই সেটা ওঁকে দিয়ে রেখেছেন; বলেছেন, প্রয়োজনে সেই সনাক্তিকরণ পত্রটি দেখাতে হতে পারে। সাহেব দেখে খুশি হল। হড়বড় করে কী যেন অনেকটা বলে গেল তার মাতৃভাষায়। রূপেন্দ্র উপায়ান্তরবিহীনভাবে না-য়ের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে আধা-সংস্কৃত আধা-বাঙলায় বললেন, ফরাসী নাহং বেদ!

লোকটা বুঝল। সেও নীরবে তার দুটি হাত বাড়িয়ে দিল ফরাসী চন্দননগরের দিকে, যে ভঙ্গিতে কন্যাকর্তা বরযাত্রীদের 'আস্তাজ্ঞা-হোক' জানায়।

অর্থাৎ রূপেন্দ্র নগরে প্রবেশ করতে পারেন।

রূপেন্দ্র পুনরায় যুবতীর কটিদেশ বেষ্টন করে অশ্বারূঢ়া করতে চাইলেন। রাধা বাধা দিল। বললে, ঐ সাহেবের চোখের সম্মুখে নয়। চল, একটু পায়ে হেঁটে আড়ালে যাই। মুখপোড়া ভাববে আমি বুঝি তোমার বিয়ে করা বউ।

কোথাও কিছু নেই লালমুখো আকাশ-ফাটানো হাসি হাসল। মাথা থেকে টুপিটা পুনরায় খুলে বিচিত্র ভঙ্গিতে দোলাতে দোলাতে বললে, আঁশাতে মাদ্‌মোয়াজেল! মুখপুড়া কিছু-কিছু বুঝিল! কম্‌প্রিহেন্দ্‌।

—ও মা গো। সাহেব বাঙলা বোঝে।—রাধারানীও এখন রাঙামুখো।

হাঁটতে হাঁটতেই নাকা-চৌকির এলাকাটা পার হয়ে এলেন দুজনে। বাঁক ঘুরতেই একেবারে

নির্জন প্রান্তর। শুধু পথের ধারে নয়ানজুলিতক্ গাছ-গাছালির ঘন আচ্ছাদন। রূপেন্দ্র ডাকেন, এবার এস। ঘোড়ার উপর বসিয়ে দিই।

—না। —রাধারানী সড়কটা পার হয়ে একটা সাঁকোর পাঁচিলের উপর গিয়ে বসল।

—কী হল আবার?

—আগে বল, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

—বললাম তো। আমার রাজপ্রসাদে। ফরাসডাঙায়।

ফরাসডাঙায় রূপেন্দ্র ভেষগাচার্যের রাজপ্রাসাদ থাকার কথা নয়। এটা জানা আছে। হয়তো সেখানে কোন পান্থশালায় একটা কামরা ভাড়া করেছে। সেখানেই নিয়ে গিয়ে ওকে তুলতে চায়। হেতুটা সহজবোধ্য। রাধারানী বলে, কাজটা কি ঠিক হচ্ছে?

—কেন নয়? এটাই তো তুমি মনে-মনে চাইছিলে, রাধা।

হঠাৎ রুখে ওঠে। বলে, না। তাহলে তুমি ভুল বুঝেছ আমাকে। আমি তো সেদিন বলেছিলাম গোঁসাঞ, মঞ্জুর ঘর ভাঙতে চাইছি না আমি।

—আমিও তো সেটা চাইছি না, রাধা।

—তাহলে মাহেশের বদলে আমাকে এখানে নিয়ে চলেছ কেন?

রূপেন্দ্র অশ্বটিকে গাছের ডালে বেঁধে ওর পাশটিতে এসে বসলেন, বললেন, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না, রাধা? আমি তোমার কোন ক্ষতি করতে পারি? তোমার, অথবা মঞ্জুর? জেনে শুনে?

—তাহলে আমাকে কেন নিয়ে চলেছ ফরাসডাঙায়? মাহেশে কখন যাব?

—কাল সকালে। রাতটা এখানে কাটিয়ে।

হঠাৎ ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল রাধারানী। বললে, তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ ঠাকুর। আমি··· আমি··· তুমি যে আমার সব কথা জান না।

রূপেন্দ্র ওর হাতদুটি তুলে নিয়ে বললেন, আমি তোমার সব কথা জানি, শেফালী!

—শেফালী?

—হ্যাঁ। আমি তো সেই ছোট হুজুর নই! আমাকে ভয় কী?

হঠাৎ অশ্রুআর্দ্র মুখখানি মেলে ও আকুলভাবে বলে, তা তুমি পারবে?

—কী?

—এক বিছানায় শুয়েও···যদি আমার মন হঠাৎ বিষিয়ে ওঠে···

রূপেন্দ্র ওর করমুষ্টি আকর্ষণ করে ওর কপালে একটি চুম্বনচিহ্ন এঁকে দিলেন, বললেন, সে আত্মবিশ্বাস আমার আছে, রাধা। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন তোমার গাত্রস্পর্শ করব? তুমিই না বলেছিলে, আমি—অসাধারণ!

হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল! আত্মবিস্মৃত হয়ে রাধারানী সবলে আকর্ষণ করে ধরল রূপেন্দ্রকে। তাঁর ওষ্ঠাধরে এঁকে দিল সুনিবিড় এক চুম্বনচিহ্ন। দীর্ঘ সময় ধরে। পরমুহূর্তেই আলিঙ্গন-মুক্ত হয়ে দু-হাতে মুখ ঢাকল।

রূপেন্দ্র অবিচলিত। ব্রত উদ্‌যাপন করছেন তিনি। অনাসক্ত থাকার ব্রত।

পুনরায় ওর হাত ধরে আকর্ষণ করেন। বলেন, এবার এস।

—তুমি রাগ করনি?

—তোমার কি তাই মনে হল?

—না। কিন্তু···

—কিন্তু কী?

—বোঝ না যেন! তোমার ভাবখানা ছিল—না আবাহন, না বিসর্জন।

রূপেন্দ্র মনে মনে অস্বস্তি বোধ করেন। মেয়েটা বুঝে ফেলেছে! প্রখর বুদ্ধিমতী সে। এমন নিরাসক্ত থাকলে চলবে না। সক্রিয়ভাবে নিরাসক্ত হতে হবে।

রাধারানী বলে, কী ভাবছ, সত্যি করে বলবে?

—বলব! তোমার চুমু খাওয়া দেখে মনে হল—জীবনে তুমি এই বোধহয় প্রথম কোন পুরুষমানুষকে চুম্বন করলে—আযৌবনের তৃষ্ণা নিয়ে।

রাধা সলজ্জে মুখ নিচু করে বললে, কথাটা কিন্তু ঠিকই। এই প্রথম।

—এর আগে কখনো খাওনি?

—না! আমাকে খেয়েছে, আমি খাইনি। যেমন এখন তুমি আমাকে খেলে না।

এবার রূপেন্দ্রই ওকে সবলে আকর্ষণ করে টেনে আনেন।

"অধরের কানে যেন অধরের ভাষা,
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে—
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর সংগমে।।"

তীর্থযাত্রা। তীর্থ শেষ নয়। এ তো শুধু কুসুমচয়নের পর্যায়।

এর পরিণতি "মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে।"

কঠিন সে পরীক্ষা সম্মুখে!

রাজপ্রাসাদ দেখে চোখ কপালে উঠে যায়। এ যে সত্যিই কল্পলোকের রাজপুত্রের প্রকাণ্ড ।সাদ। গঙ্গার কিনার ঘেঁষে। সারি-সারি পলতোলা মর্মর স্তম্ভ, উপরে ঊর্ধ্বমুখ সহস্রদল। 'কারিন্থিয়ান-কলাম' ও বেচারি কোথায় দেখেছে এর পূর্বে যে, বুঝবে? দ্বিতলে সারি-সারি খি-খড়খড়ির গবাক্ষ। সেটা লাট বাহাদুরের আবাস। একতলায় পর্যায়ক্রম কক্ষ, াহাফেজখানা। প্রাচীর-বেষ্টিত প্রকাণ্ড উদ্যান, কেন্দ্রস্থলে ফোয়ারা। তার মাঝখানে একটি অপূর্ব রীমূর্তি—আহা! হাতদুটি ভাঙা! এত এত খরচ করেছে, আর ঐ সুন্দরী মর্মরমূর্তির ভাঙা হাতদুটি মেরামত করায়নি, কেন, গো? এ প্রশ্নের জবাব রূপেন্দ্র জানেন না। মহাপণ্ডিত তিনি, কিন্তু জানেন না— কেন ঐ ভাঙা হাত দুটি মেরামত করা যায় না, যাবে না। বস্তুত ভাস্কর ওর হাত দুটি আদৌ গড়েনি— কারণ ও যার ছায়ামূর্তি সেই গ্রীক ন্যুড, অ্যাসকুইলিন ভেনাসকে ভগ্ন অবস্থাতেই যে পাওয়া গেছিল। সে-কথা রূপেন্দ্র কেমন করে জানবেন?

উদ্যানের অপরপ্রান্তে দু-একটি বিচ্ছিন্ন মোকাম—অতিথিশালা। তারই একটা তখন গাঙ্গুলীমশায়ের বন্দোবস্তে রূপেন্দ্রের দখলে।

সিংদরোজার কাছেই দুজনে অবতরণ করেছেন। অশ্বাবাসরক্ষক অশ্বটিকে নিয়ে গেছে। পদব্রজে ওঁরা অতিথিশালার দিকে অগ্রসর হয়ে আসেন। একতলা বাড়ি। দুটি মাত্র কক্ষ। সংলগ্ন স্নানাগার। খিদমদগার অগ্রসর হয়ে আসে। সেলাম করে। রাধারানীর হাত থেকে পোঁটলাটা নেয়।

প্রথমটি অভ্যর্থনা কক্ষ, ভিতরে শয়নাগার। প্রকাণ্ড পালঙ্ক, একটি মেজ, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি কেদারা। একটি আরাম-কেদারা। পুষ্পপাত্রে কুসুমস্তবক সুবিন্যস্ত।

সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। খিদমদগার খাশগেলাসের বাতিদানে আলো জ্বেলে দিল। গবাক্ষগুলি রুদ্ধ—সন্ধ্যার ঝোঁকে না হলে ঝাঁক-ঝাঁক মশা ঢুকে পড়ে।

মেজ-এর উপর ভৃঙ্গার, পানপাত্র। নির্মল পানীয় জল।

পরিচারকটি জানতে চাইল, নৈশাহারের কী জাতীয় ব্যবস্থা হবে।

রূপেন্দ্র দুজনের মতো নিরামিষ আহার্যের বন্দোবস্ত করতে বললেন। লোকটা বিদায় নিল। রূপেন্দ্র তার পিছন পিছন বার হয়ে এসে বললেন, সে লোকটা এসেছে?

—জী নহী! বহ্ রহিম ওস্তাগর ন?

—হ্যাঁ। তার আসার কথা আছে। এলে, তাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে আমাকে খবর দিও।

—যো হুকুম, সরকার। —লোকটা অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

ঘরে ফিরে এসে দেখেন রাধা মেঝের উপর বসে আছে।

—ও কী! ওখানে বসেছ কেন? কেদারায় উঠে বস। ওরা দেখলে কী ভাববে!

রাধা চট্ করে উঠে দাঁড়ায়। কী করবে, কী বলবে যেন ঠাওর পায় না। রূপেন্দ্র বলেন, গা ধোবে? পাশের ঐ ঘরটা গোসলখানা। হাণ্ডায় জল আছে, গামছাও আছে। এই বাতিটা নিয়ে যাও বরং।

ফাল্গুনের শেষ। শীতের ভাবটা নেই। রাধারানী খুশি হল। ঘামে সে ভিজে গেছে। পোঁটলাটা নিয়ে সে গোসলখানায় ঢুকে পড়ে। রূপেন্দ্র ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিলেন আরাম কেদারায়। অনতিবিলম্বেই শ্রান্ত দেহে নিদ্রাগত হন। কতক্ষণ ঘুমিয়েছেন জানেন না, হঠাৎ ললাটে একটি পেলব স্পর্শ লাভ করে চোখ মেলে তাকান। রাধারানীর স্নান সারা। সামান্য প্রসাধনও করেছে। না, শৃঙ্গার নয়, প্রসাধন! তিলকসেবা করেনি, তবে ধম্মিল্ল বেঁধেছে। ইতস্তত করতে করতে শেষমেশ পুষ্পপাত্র থেকে একটা নাম-না-জানা বিদেশী ফুল তুলে গুঁজে দিয়েছে চূড়ো করে বাঁধা কবরীবন্ধনে।

রূপেন্দ্র ওর সেই বাসকসজ্জা দেখে খুশিয়াল হয়ে ওঠেন। আবৃত্তি করেন:

“বাসঃ সূক্ষ্মং বপুষি ভুজয়োঃ কাঞ্চনী চাঙ্গদশ্রীর্
মালাগর্ভঃ সুরভি মসৃণৈর্গন্ধতৈলৈঃ শিখণ্ডঃ।
কর্ণোত্তংসে নবশশিকলানির্মলং তালপত্রং
বেশং কেষাং ন হরতি মনো বঙ্গবারাঙ্গনাম।।”

রাধা এতক্ষণে মেনে নিয়েছে। গোঁসাই -ঠাকুর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ—মঞ্জুর ঘর ওরা ভাঙছে না!

ধরা যদি দিতেই হয় তাহলে ধরাকে সরাজ্ঞানই বা করবে না কেন? মঞ্জুর তো পড়ে আছে সারাটা জীবন—ওর জীবনে, হ্যাঁ! এটাই তো প্রথম ফুলশয্যা! হয়তো এটাই শেষ! আকৈশোর তো দাঁতে দাঁত দিয়ে অগণিত পিশাচের বলাৎকার সহ্য করে এসেছে এতদিন। তাই জানতে চায় ঐ সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখা। রূপেন্দ্র বলেন, দেহে সূক্ষ্মবসন, ভুজবন্ধে সুবর্ণ অঙ্গদ, সুগন্ধ তৈলসুরভিত মসৃণ কেশদামে যূথির মালিকা, কর্ণে নবশশিকলার ন্যায় তালপত্রের কর্ণাভরণ—বঙ্গললনার এই বাসকসজ্জা কার না মনোহরণ করে?

বক্তা আর শ্রোতা দুজনেই জানেন, এ বর্ণনার সঙ্গে রাধার সজ্জার কোন মিল নেই। কিন্তু এ কথাও জানেন, তাতে শেষ পংক্তিটা উচ্চারণে কোনও বাধা নেই। সে কথাই বলে রাধা, একজনের মনোহরণ করলেই যথেষ্ট।

রূপেন্দ্র ফস্ করে বলে বসেন, কেন? ফরাসডাঙায় এসেও আর একজনের কথা তোমার মনে পড়ছে না, রাধা?

কেমন যেন চমকে ওঠে। বলে, মানে? কার কথা বলছ?

—ফরাসডাঙায় তোমার চেনা-জানা কি কেউ নেই?

এক ফুঁয়ে যেন প্রদীপটা নিবে গেল। বলে, সে হতভাগার কথাও বলেছে মুখপুড়ি?

—বলেছে। তখনি তো বললাম আমি, তোমার স—ব কথা জানি।

রাধা বসে পড়ল ওঁর আরামকেদারার হাতলে। বললে, তার কথা আজ থাক!

—কেন গো? রাম-দার কথা কি তোমার একটুও মনে পড়ে না?

চোখ দুটি জলে ভরে এল। তবু ঝরে পড়ল না। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বললে, অহেতুক কেন দাগা দিচ্ছ আমাকে? সে তো আর তোমার মতো অসাধারণ নয়। তার স্ত্রী আছে, সংসার আছে···,

—তুমি নিশ্চিত জান?

—না, তা জানি না। আন্দাজ করতে পারি।

—তোমার ধারণাটা ভুল রাধা। আমি ফরাসডাঙায় এসে তার খোঁজ করেছি। দেখা পেয়েছি।

শিহরিত হয়ে ওঠে এবার। উঠে দাঁড়ায়। বলে, তুমি তাকে দেখেছ?

—হ্যাঁ। আজই সকালে।

কী যেন প্রশ্ন করতে গেল। পারল না। আঙুলে অঞ্চলপ্রান্তটা অহেতুক জড়াতে থাকে।

—সে নিজেও একই অসুখে ভুগছে।

চকিতে মুখ তুলে তাকায়, একই অসুখে! মানে?

—যে অসুখে তুমি ভুগছ! তাই সে আজও বিয়ে করতে পারেনি। সে ভুলতে পারেনি তার ছেলেবেলার সঙ্গিনীকে: শিউলী।

আর ধরে রাখা গেল না। ঝরঝরিয়ে ঝরে পড়ল এবার। লজ্জা পেল না সে জন্য। অশ্রুআর্দ্র দু-চোখ মেলে বললে, এ কথাটা কাল সকালে বলা চলত না?

রূপেন্দ্র বিস্মিত। কেন, কেন? এখন বলায় কী ক্ষতি হল?

—বোঝ না? আমি··· আমি যে আজ স্বাভাবিক হতে চাইছিলাম। এরপর সে পরীক্ষা—

কথাটা শেষ করতে পারে না।

ওর হাতদুটি ধরে নিজের দিকে টেনে আনেন। বলেন, সে যদি রাজী থাকে তাহলে কি পরীক্ষাটা তার সঙ্গেই করে দেখতে পার না?

কথাটা এমন কিছু দুর্বোধ্য নয়। কিন্তু যেন ওর মাথায় ঢুকল না। অর্থহীন দৃষ্টি মেলে শুধু তাকিয়ে থাকে। রূপেন্দ্র পুনরায় বলেন, আজ সকালে সে আমাকে কী বলেছিল জান? বলেছিল, 'পারলে একমাত্র শিউলীই পারে এই আধখানা মানুষটাকে আবার একটা গোটা মানুষ করে তুলতে।' তুমি কি চেষ্টা করে দেখবে না, রাধা?

মাথাটা নিচু করে বলে, আমি তো তাকে ঠকাতে পারব না ঠাকুর। সে তো জানেই কত-কত পিশাচের....এ ফুলে তো আর পুজো হয় না।

—হ্যাঁ, জানে। সে কথাও তাকে বলেছিলাম। তার জবাবে সে কী বলল জানো? বললে, আমি তো কাফের নই বাবুজী। আল্লারসুলের কানুনে এটা স্ত্রীলোকের কোন পাপই নয়। তার কী কসুর বলুন?

রাধা প্রত্যুত্তর করে না।

রূপেন্দ্রই প্রশ্ন করেন, প্রেমের জন্য কি তুমি ধর্মত্যাগ করতে পার না?

রাধারানী নেতিবাচক গ্রীবাভঙ্গি করল।

রূপেন্দ্র বিস্মিত হয়ে বললেন, ধর্মত্যাগ এতই অসম্ভব তোমার পক্ষে? তোমার রাম-দার চেয়েও সেটা বড়?

এবার মুখ তুলে চোখে-চোখ রেখে জবাব দিল, সে-জন্যে নয়। আমি মুসলমান হয়ে যেতে পারি না। তাহলে সেই শয়তান কাজীটার কাছে আমাদের দুজনেরই হার হবে। এই তো চেয়েছিল সে।

—কিন্তু রামানন্দকে প্রায়শ্চিত্তের কোন বিধান কি পণ্ডিতেরা দেবেন?

—দিলেও সে তা মানবে কেন? সে তো পাপ করেনি কিছু। কিসের প্রায়শ্চিত্ত? আমিই বা তাকে তা করতে দেব কেন?

ঠিক তখনই দ্বারে কার করধ্বনি হল।

রূপেন্দ্র দ্বার খুলে বাহিরে এলেন। খিদমদগার বললে, রহিম আ গয়া।

রূপেন্দ্র বেরিয়ে এলেন বাইরে। আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদ। ফিন্‌কি দিয়ে জ্যোৎস্না ফুটেছে। অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল রহিম ওস্তাগর। রূপেন্দ্র এগিয়ে এসে তার হাতটা তুলে নিলেন। বললেন, রহিম। ঐ ঘরে শিউলী আছে। সে জানে না তোমার আসার কথা। সে তোমার প্রত্যাশাতে নেই। যাও। আর শোন। তুমি রাতটা এখানেই থাকবে। দুজনের খাবার ওরা দিয়ে যাবে।

—সেকি! আপনি? আপনি কোথায় থাকবেন?

—আমি মাহেশ ফিরে যাচ্ছি। কাল সকালে এসে শুনব তোমরা কোন সিদ্ধান্তে এলে! আমার মনে হয় মেরীমাতা তোমাদের দুঃখ বুঝবেন।

রূপেন্দ্র পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন অশ্বাবাসের দিকে। রহিম অবাক বিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। আজব মানুষ ঐ কবিরাজ! বাঁকের মুখে রূপেন্দ্র মিলিয়ে যেতে সে অতিথিশালার দিকে ফিরল।

উন্মুক্ত দ্বারপথে দেখতে পেল সেখানে অনির্বাণ শিখায় একটা প্রদীপ জ্বলছে।

মাহেশ

পাখির পালকের মতো হালকা মন দিয়ে রূপেন্দ্রনাথ ফরাসডাঙা থেকে অশ্বারোহণে প্রত্যাবর্তন করলেন মাহেশে। রাত তখন প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত। পথ জনমানবহীন। এ সকল স্থানে সন্ধ্যা সমাগমের পরেই ঘনিয়ে আসে নৈঃশব্দ্য। প্রথম প্রহরের শিবাধ্বনিও হয়ে গেছে। রূপেন্দ্র তাঁর ব্রত নির্বিঘ্নে উদ্‌যাপন করেছেন:
"যেমন বেণী তেমনি রবে, চুল ভিজাব না!"

চরক তাঁর প্রথম অধ্যায়ের নবম সূত্রেই নির্দেশ দিয়েছেন,

"মৈত্রী কারুণ্যমার্তেষু শক্যে প্রীতিরূপেক্ষণং
প্রকৃতিস্থেষু ভূতেষু বৈদ্যবৃত্তিশ্চতুর্বিধাঃ ॥"

—যে আর্ত, যে ব্যাধিগ্রস্ত, তাকে করুণা করতে হবে, তার সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, কিন্তু সে হবে বন্ধুর মতো—এভাবেই বৈদ্য আরোগ্য-বিষয়ে তার আস্থা, তার বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারেন। তাই এনেছেন ভেষগাচার্য! রাধারানীর সঙ্গে বন্ধুত্বের, শুধু পরমমিত্রের নয়, নাগরের মতো ব্যবহার করে তাকে আশ্বস্ত করেছেন। অথচ "দাক্ষং সৌচম্‌ ইতি জ্ঞেয়ং বৈদ্যগুণ চতুষ্টয়ম্"—নির্দেশও অতিক্রম করেননি। বৈদ্য তাঁর অন্তরের শুচিতা, আত্মপবিত্রতা সর্বদা রক্ষা করবেন। রাধারানীর রোগনির্ণয় তিনি ঠিকই করেছিলেন—"বিপ্রকৃষ্ট-রৌদ্রভৈরবাদ্‌ভূতবিষ্ট বীভৎস বিকৃতাদিরূপদর্শনং মিথ্যাযোগঃ"—তার অন্তরের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, যেহেতু ঘটনাচক্রে নরনারীর মধুর দৈহিক মিলনের কিছু "উগ্র, ভয়ঙ্কর, অদ্ভুত এবং অতিশয় ঘৃণাজনক বিকৃতাদি মিথ্যারূপ" তার সামনে বারে বারে মেলে ধরা হয়েছিল। তিনি নিজেই তাকে স্বাভাবিকতার মালভূমে উন্নত করতে পারতেন; কিন্তু মঞ্জুর অজ্ঞানে সে কাজ করতে তাঁর কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছিল। তাঁর মতে স্বামীস্ত্রীর সমান দায়—একমুখীন পবিত্রতা রক্ষায়! পরম করুণাময়ের কৃপায় সুসময়ে সে দায়িত্ব রামানন্দ দত্তকে অর্পণ করে আসতে পেরেছেন। ঔষধ ও পথ্যের বিধান দিয়েছেন, সেটা সেবন করাবে ঐ রহিম ওস্তাগর

মঞ্জুকে কি খুলে বলবেন সব কথা?

চরক ঋষির স্পষ্ট নিষেধ আছে: "নান্যং রহস্যমাগময়েৎ।"

'আর্তের গোপন কথা কদাচ তৃতীয় ব্যক্তিকে জানাবে না।' হোক সে তোমার নিকটতম বন্ধু অথবা ধর্মসঙ্গিনী। মঞ্জুকে সে কথা জানানোর অধিকার তাঁর নাই। শুধু চরকের নির্দেশ নয়, তাঁর বিবেকেরও তাই নির্দেশ!

অন্দর-মহলে পদার্পণমাত্র ছুটে এল তুলসী। মাথা থেকে উষ্ণীষটি খুলে নিয়ে বললে, আহা! রাজপুত্রের মুখটি শুকিয়ে গেছে!

রূপেন্দ্র বলেন, যাবে না? সারাদিন কতটা অশ্বারোহণ করেছি তা তুমি কী জানবে?

তোমাদের ঐ ঘোড়াটাকে জিজ্ঞেস কর।

তুলসী বললে, লিঙ্গে ভুল হল জামাইবাবু! ওটা ঘোড়া নয়, ঘোটকী।

—তা হবে। আমি খেয়াল করিনি!

প্রগলভা শ্যালিকা একটা দ্বর্থ্যবোধক রসিকতা করল, সেটাই তো আমাদের মনোবেদনার হেতু, জামাইবাবু! কার পিঠে কখন চাপছেন তাও আপনাদের নজর হয় না!

ফুলপিসি এগিয়ে আসেন। বলেন, ওকে আর বিরক্ত করিস না তো। জিরুতে দে! হ্যাঁ বাবা, স্নান করবে নাকি? এত রাত্রে গা ধুলে ঠাণ্ডা লাগবে না তো?

রূপেন্দ্র জানালেন তা সত্ত্বেও সারাদিনের এই ধূলিধূসরিত দেহটা পরিমার্জনা না করলে তার তৃপ্তি হবে না। তুলসী বললে, একটু গরম জল করে দিই বরং।

রাত্রে অনিবার্যভাবে প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হল, রাধাদি কী বলল?

—তোমাকে না নিয়ে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ হল। উপায় কী? তবে দলের সঙ্গে আবার তো ত্রিবেণীঘাটে দেখা হবে।

রাধারানীর সঙ্গে তখন যে দেখা না-ও হতে পারে এ প্রসঙ্গটা উহ্য রইল। সেটা চাপাই পড়ে গেল মঞ্জুর পরবর্তী যোজনায়। বললে, তোমার সঙ্গে হবে। আমার সঙ্গে হবে না।

—কেন? দোলপূর্ণিমার পর আমরা তো সেখানেই যাব।

—না গো। এত হাঁটতে আমার কষ্ট হয়। তুমি একাই তীর্থদর্শন করতে থাক। আমি মাস-ছয়েক এখানেই থাকব।

—ছয় মাস! কেন? কী হল তোমার?

—বললাম তো এখনি—অত হাঁটতে আমার কষ্ট হয়। সেটা উচিতও নয়।

এজন্যই বোধহয় চরকের নির্দেশ—অতি প্রিয়জনের চিকিৎসা নিজে করতে নেই!

রূপেন্দ্র ওর রোগনির্ণয় করতে পারলেন না। বললেন, বেশ তো, কিছুদিন না হয় বিশ্রাম নাও; আমি ভাগীরথীর দুই পারে তীর্থদর্শন সেরে আসি। কিন্তু সে তো পক্ষকালের ব্যাপার। ছয় মাস তোমাকে থাকতে হবে কেন?

মঞ্জু কী একটা কথা বলতে গেল। পারল না। এতবড় সংবাদটা কীভাবে জানাবে যেন বুঝে উঠতে পারছে না। নিজে সে নিঃসন্দেহ। আকৈশোরের একটা জৈবিক চক্রাবর্তনই যে শুধু বন্ধ হয়েছে তাই নয়, আরও কিছু লক্ষণ নজরে পড়েছে তার। ক্ষুধামান্দ্য, বিবমিষা! আশা করেছিল ভেষগাচার্য নিজেই তা বুঝে ফেলবেন। মুখ ফুটে তাঁকে কিছু বলতে হবে না। কিন্তু তিনি নজরই করতে পারছেন না।

রূপেন্দ্র পুনরায় বলেন, বেশ তো। অন্যান্য তীর্থে না যাও, ত্রিবেণীতে তো যাবে গুরুদেবকে প্রণাম করতে?

মঞ্জুর মুখটা রক্তবর্ণ ধারণ করে। নত নেত্রে সে নিশ্চুপ বসে থাকে।

—কী হল জবাব দাও? যাবে না?

—যাব। এখন নয়। পরে!

—ছয় মাস পরে?

ইতিবাচক গ্রীবা সঞ্চালন করে নীরবে।

—তোমার কী হয়েছে বল তো? দুজনে যাব, এমন কথাই তো ছিল?

—তা ছিল। এখন ভাবছি—দুজনে নয়, তিনজনে একসঙ্গে যাব।

—তিনজনে! তৃতীয় জন আমি কোথায় পাব?

মঞ্জু দু-হাতে মুখটা ঢেকে বললে, আমার কাছে!

—তোমার কাছে?

—হ্যাঁ! আত্মদীপ!

এর পরেও বুঝবেন না এতবড় মূর্খ নন! রীতিমতো চমকে ওঠেন। দুহাতে ওকে আকর্ষণ করে বলেন, সত্যি? তুমি নিশ্চিত?

ওঁর বুকে মুখ লুকিয়ে মঞ্জু কোনক্রমে শুধু বলতে পারে—হুঁ!

চুমায় চুমায় মঞ্জুর দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম।

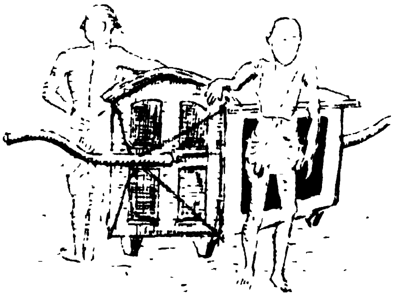

ভৌগোলিক নাম	
প্রাচীন	আধুনিক
ওলন্দাজনগর	চুঁচুড়া
কনেনগর	কোন্নগর
কাঞ্চনপল্লী	কাঁচড়াপাড়া
কুমারহট্ট	হালিশহর
গৌড়িফা	নৈহাটী
ঘুসুড়ি	বালী
চক্রদহ	চাকদহ
চাণক	ব্যারাকপুর
নিমতা	বেলঘড়িয়া
পীরের-থান	আগড়পাড়া
প্রদ্যুম্ননগব	পালপাড়া
ফবাসীডাঙ্গা	চন্দননগর
ফ্রেড্রিকনগব	শ্রীরামপুর
বন্দব	ব্যাণ্ডেল
বিশালাক্ষী	টিটাগর
ভাটপাড়া	কাঁকিনাড়া
মূলাজোড়	শ্যামনগর
যশোড়া	শিমুরালী
রাজানগর	শ্যাওড়াফুলি

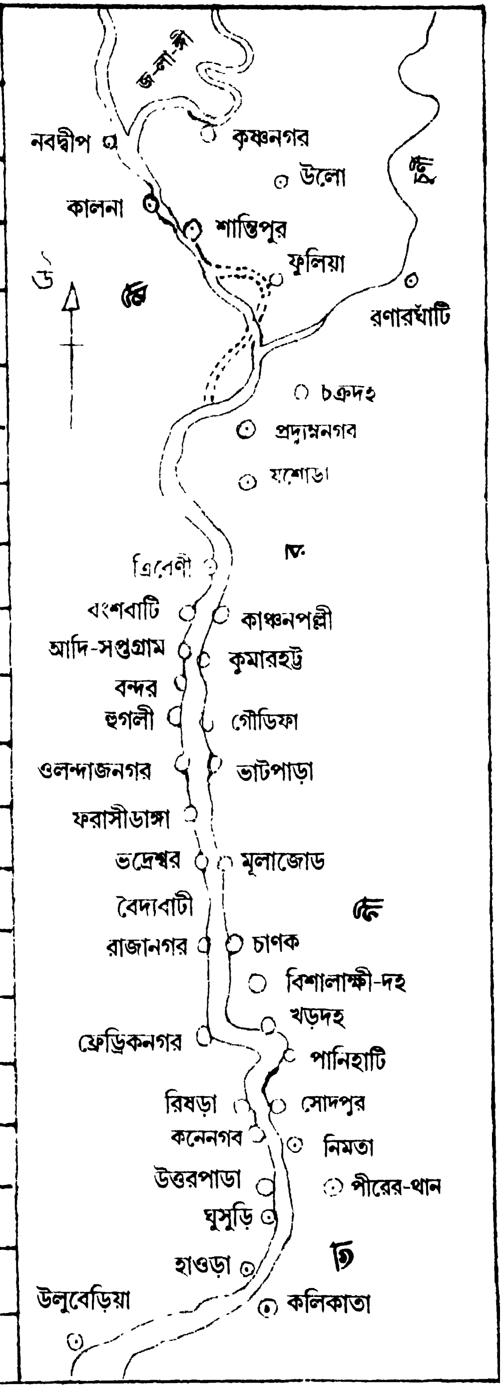

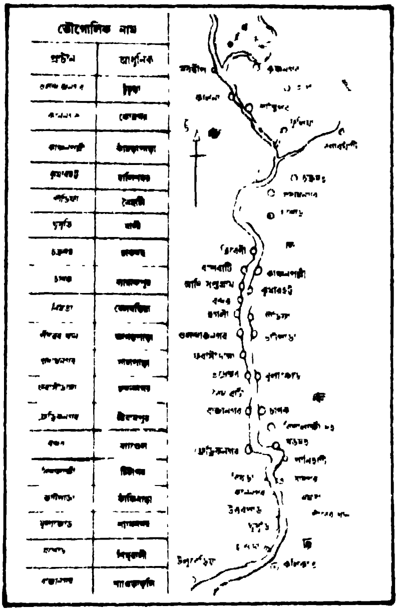

ভাগীরথী
1742
পঞ্চম পর্ব

নীলাম্বরী শাড়ি-পরা এই তরুণীটিকে দেখলে তোমরা চিনতেই পারতে না। তোমরা ওকে চেন—ভিন্ন নামে, ভিন্ন রূপে। ইদানীং সে গৈবিকবসনা সন্ন্যাসিনী। প্রৌঢ়া উদাসিনী। যৌবনে সে এমন গৈরিকবসনা ছিল না। তার পরনে তখন ছিল ঘন নীল নীলাম্ববী. শাড়ির দুই সমান্তরাল পাড় গাঢ় সবুজ রঙের, তাতে আবার আম-জাম-কাঁঠাল-নারিকেল গাছের নক্সা আঁকা। শ্রাবণ-ভাদ্রে তার শাড়ির রকমফের হত—তাও গিরিমাটিব রঙ নয়, যেন গবাঘৃত! আশ্বিন-কার্তিকে আবার তার শাড়ির পাড়ে সাদা-সাদা চুম্‌কি—শারদলক্ষ্মীর চরণে কাশফুলের উপচে-পড়া অঞ্জলি!

রূপের সঙ্গে নামটাও হারিয়ে গেছে। ছিল ভাগীরথী, হয়েছে হুগলী নদী! পাটকলের চোঙার কালিতে মায়েব সারা অঙ্গ আজ কালিঝুলি মাখা!

কে বলবে. ঐ মেয়েটিই বালিকা বয়সে বেণী দুলিয়ে মহাদেবের জটার ঘুল্‌ঘুলিয়ায় লুকোচুরি খেলেছে। পাতাঝরা পাইন আর দেওদার বনে পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে এক্কা-দোক্কা খেলেছে। বয়ঃসন্ধিকালে মহা-ঐরাবৎ এসেছিল ওর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে, তাকে ধরাশায়ী করে উচিত শিক্ষা দিয়েছিল কিশোরী মেয়েটি। তারপর একদিন বড় হয়েছে, চিনেছে দুনিয়াকে. মহারাজ শান্তনুকে শান্ত করেছে হস্তিনাপুর-মহিষীরূপে; অষ্টবসুকে করেছে শাপমুক্ত—মহাভারতকে উপহার দিয়েছে ভীষ্মের মতো চরিত্র—আধাদেবতা-আধামানুষ!

তারপর? অচিন দেশের এক রাজপুত্র ওকে হঠাৎ মাতৃসম্বোধন করে বসল! তার আকুল আহ্বানে বিগলিত-করুণা জাহ্নবী দেবপ্রয়াগ-হরিদ্বার-হৃষীকেশ ছেড়ে ছুটল সাগর পানে—সগর রাজার অভিশপ্ত সন্তানদের উদ্ধার করতে।

মানুষের অত্যাচারে পদ্মা-মেঘনার বিকল্প-পথে সে তখনও কীর্তিনাশা হয়ে ওঠেনি ভাগীরথী তখন ছিল ভিন্নপথের পথিক। পুরাণে, বিশেষ করে মৎস্য ও বায়ুপুরাণে নির্দেশ আছে যে, তখন তাম্রলিপ্তি দেশের ভিতর দিয়ে ছিল গঙ্গার প্রবাহ। এই পুরাণ অনুযায়ী গঙ্গা বা

ভাগীরথী যে যে রাজ্য ধন্য করত তাদের নাম কুরু (দিল্লী), পাঞ্চাল (উত্তর প্রদেশ), কোশল (এলাহাবাদ অঞ্চল), মগধ (বিহার) অতিক্রম করে ব্রহ্মোত্তর (উত্তর-রাঢ়), বঙ্গ এবং সুহ্ম (তাম্রলিপ্তি) দিয়ে সগরমুনির আশ্রম। সপ্তদশ শতকে জাহানাবাদের কাছাকাছি গঙ্গার ধারা ছিল দ্বিধাবিভক্ত। একটি স্রোত বাঁকা-দামোদরের জলধারা আশ্রয়ী আর একটি ছিল সুহ্ম-অভিমুখী। কবি ক্ষমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্যপাঠে সে রকম মনে হয়। অপরপক্ষে বিপ্রদাস পিপিলাই-য়ের মনসামঙ্গলে চাঁদ-সওদাগরের যাত্রা-পথে একে একে পড়ছে—অজয় নদ, উজানী, কাটোয়া, নদীয়া, ফুলিয়া, গুপ্তিপাড়া, মীর্জাপুর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, কুমারহট্ট, ডাইনে 'হুগুলী', বামে ভাটপাড়া—তারপর কাঁকিনাড়া, 'মূলাজোড়া', ভদ্রেশ্বর, 'চাণক', মাহেশ, খড়দহ, 'শ্রীপাট', 'রিসিড়া', 'ঘুষুড়ি', 'চিত্রপুর', কালীঘাট, পার হয়ে শেষমেশ সমুদ্র-সংগম:

"তাহার মেলান ডিঙা সংগমে প্রবেশে
তীর্থকার্য কৈল রাজা পর[ম] হরিষে।।"

ত্রিবেণী-সপ্তগ্রামে তিনটি নদীর 'মুক্তবেণী'র কথা অনেকেই বলেছেন, বিপ্রদাস পিপিলাই (1495), কবি ক্ষমানন্দ (1640), ফান্ ডেন্ ব্রোক (1660)। তার ভিতর আজও সরস্বতীর কিছুটা হদিস মেলে—ভাগীরথীর কোল ছেড়ে কিছুক্ষণ দক্ষিণদিকে 'ভেল-মারি কিৎ-কিৎ' বলে একটা চক্কর দিয়ে আবার বেতড়ের কাছে নিজের কোটে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু বিপ্রদাসের পঞ্চদশ শতকের 'অতি বিশাল যমুনা নদী' বেমালুম না-পাত্তা!

নদীমাতৃক বঙ্গসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র এই ভাগীরথীর দুই-কিনার। গ্রীক ঐতিহাসিক বর্ণিত 'গংগারিডি' যথার্থ 'গঙ্গাহৃদি'; জননী তাঁর স্তনভাণ্ডারের নির্মল ধারায়, পলিমাটির আশীর্বাদে, নাব্য স্রোতধারায় এ-দেশকে দিয়েছেন পানীয়, খাদ্য, পরিবহনের সুযোগ। তাঁর দুই তীরে গড়ে উঠেছে বঙ্গ-সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র: নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কাটোয়া, ত্রিবেণী, ভাটপাড়া, মূলাজোড়, কালীঘাট!

রূপেন্দ্রনাথ যে সদ্যবিবাহিত সহধর্মিণীর শাঁখাপরা হাতটি ধরে ঘর ছেড়ে পথে নেমেছিলেন তা এই গঙ্গাতীরের অযুতনিযুত মন্দির-প্রাঙ্গণে শুধু 'পেন্নাম' করতেই নয়, বঙ্গসংস্কৃতির মূল ধারাটির সঙ্গে পরিচিত হতে—'পরশপাথর' খুঁজতে।

আকৈশোর তিনি যে একটা স্বপ্ন দেখে আসছেন: ধর্মসংস্থাপনার্থায় 'তাঁর' যে আসার কথা। যিনি এসে এই অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজকে ধরে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি দেবেন। তার মোহভঙ্গ করে পথের নির্দেশ দেবেন। এটাই যে ভারত সংস্কৃতির ঐতিহ্য। এককালে যেভাবে সমাজকে ধরে নাড়া দিয়েছিলেন শাক্যসিংহ, আদি শঙ্করাচার্য বা অতি সম্প্রতি চৈতন্যদেব। তিনি আসবেন, নিশ্চয় আসবেন, হয়তো তিনি লুকিয়ে আছেন এখনো, প্রকট হননি। তাঁকে খুঁজে বার করতে হবে। থাকলে তিনি নিশ্চয় আছেন এই ভাগীরথী-বিধৌত কোন একটি জনপদে। শাক্যসিংহ ছিলেন রাজ-পরিবারভুক্ত—রানী ভবানী বা কৃষ্ণচন্দ্রও তো তাই। আদি শঙ্করাচার্য বা নিমাই পণ্ডিত সোনার ঝিনুকে দুগ্ধপান করেননি শৈশবে—জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বুনো রামনাথও তা করেননি। এদের মধ্যে কে এগিয়ে এসে চেপে ধরবেন রূপেন্দ্রনাথ ভেষগাচার্যের হাতখানি—তাঁর স্বপ্ন সফল করে তুলতে?

মহাগরুড় আজ ভগ্নপক্ষ সম্পাতির মতো ধুঁকছে। কিন্তু কেন?

রূপেন্দ্রনাথের বিশ্বাস তার দুটি হেতু—

প্রথম কথা: তার পিঠে জগদ্দল পাথরের বোঝা—যা পিঠে করে সেই মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম মহাকাশে উড্ডীন হতে অশক্ত। সে বোঝা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অবহেলিত উপেক্ষিত একদল শক্তিমান মানুষ, যারা অচ্ছুত, জল-অচল, শূদ্র।

দ্বিতীয় বাধা: বিহঙ্গমের একটি পক্ষ শাতন করেছে ঐ কূপমণ্ডূক টুলো-পণ্ডিতের দল। নারীসমাজ। তাকে অশিক্ষায়, অবজ্ঞায়, অন্ধকারে, অত্যাচারে জর্জরিত করে। তাকে 'নরকের দ্বার' রূপে চিহ্নিত করে। চৈতন্যদেব আচণ্ডালকে কোল দিয়েছিলেন, কিন্তু হতভাগী বিধবাদের পুড়িয়ে মারার কদর্য ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত কেউ রুখে দাঁড়াননি। উনি যাচাই করে দেখতে চান, এই ভাগীরথীতীরের দুই কিনারে মহা পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে কী ভাবেন। এঁদের মধ্যে কে এগিয়ে আসবেন এই ব্রত উৎযাপন করতে।

হায়! রূপেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেননি, সেই মহাপুরুষ তখনো অজাত। তাঁর আবির্ভাব হতে আরও তিন-দশক বাকি।

এস, তোমাদের হাত ধরে রওনা হয়ে পড়ি ঐ 'গঙ্গাহৃদি'র দুই কিনারের মহাতীর্থের পথে। রূপেন্দ্রনাথ হয়তো সব কয়টি তীর্থে যাননি। তবে আমাদের যেতে বাধা কোথায়? রাজা রামমোহন আসন্ন—কিন্তু বঙ্গ সংস্কৃতির কোন পরিবেশে তিনি লড়াইটা শুরু করেছিলেন জানতে হলে গঙ্গাতীরের ঐ জনপদগুলির তদানীন্তন স্বরূপটুকু আমাদের চিনে নিতে হবে। সব তীর্থে হয়তো আমরাও যেতে পারব না, তবে ঐ যে কথা বলেছিল রাধা-বোষ্টমী—'হাঁড়ির ভাত সিদ্ধ হয়েছে কিনা বুঝে নিতে কয়েকটি তণ্ডুলকণা পরীক্ষা করাই যথেষ্ট' সেটাই আপাতত মেনে নেওয়া যাক।

সে আমলের 'দিন আনি দিন খাই'-দের কথা, মাঠে মাঠে যারা লাঙ্গল দিত, ফসল তুলতো, কুমোরের চাকা ঘোরাতো, তাঁত চালাতো, মাছ ধরতো, নৌকা বাইতো—তাদের কথা কেউ বলেনি, কেউ লিখে যায়নি। তাদের ছায়া মাড়ানোও যে পাপ। আন্দাজে কল্পনাআশ্রয়ী ছবি এঁকে তোমাদের উপহার দিতে সাহস হয় না—'সৌখিন-মজদুরি' করতে গিয়ে যদি ভুল ছবি আঁকি? তাই হয়তো সেই হতভাগাগুলোর কথা আমারও বলা হল না।

নবদ্বীপ থেকে আমরা সাগরদ্বীপের দিকে যাব, ভাগীরথীর স্রোতরেখা ধরে। দু-পাশের জনপদগুলি দেখতে দেখতে—ঐ 'মারহাট্টা-ডিচ্'-তক্। তার ওপারে শহর কলকাতা। সেটা পরে দেখা যাবে, সুযোগ হলে রূপেন্দ্রনাথের সঙ্গে না হয় নাই হল।

নবদ্বীপ ও গোয়াড়ীকৃষ্ণনগরকে আগেই দেখা শেষ হয়েছে। আমরা বরং যাত্রা শুরু করি শান্তিপুর থেকে—

শান্তিপুর

ভাগীরথীর পুব-পারে এই গ্রামটি অতি প্রাচীন—প্রায় হাজার বছর আগেও তার উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈষ্ণবদের একটি শ্রীপাট। 'শান্ত' নামের জনৈক মুনি এখানে বাস করতেন কি না,

তার কোন হক-হদিস নেই। তোমরা বলতে পার: তাহলে 'শান্তিপুর' নামটা হল কী করে?

আমি প্রতিপ্রশ্ন করব—ঐ রবিবাউল তাঁর 'শ্রীপাটে'র নাম 'শান্তিনিকেতন' রেখেছিলেন কেন গো?

অদ্বৈত আচার্যের (জন্ম: 1434) আমল থেকে শান্তিপুরের খ্যাতি। শ্রীহট্টের লাউড় পরগণার রাজা দিব্যসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন কুবের আচার্য। তাঁরই পুত্র কমলাক্ষ—মাত্র দ্বাদশ বৎসর বয়সে এসে ভর্তি হলেন শান্তিপুরের অন্তঃপাতী পূর্ণবাটী গ্রামের শান্ত বেদান্তবাগীশের গুরুকুলে। তাঁর কাছেই বেদচতুষ্টয় আয়ত্ত করে হলেন 'বেদ-পঞ্চানন'। দীক্ষা গ্রহণ করলেন মাধবেন্দ্র পুরীর কাছে। উপাধী লাভ করে কমলাক্ষ হলেন অদ্বৈতাচার্য। দীর্ঘজীবী তিনি—অনুমান একশ পঁচিশ বৎসর ধরাধামে ছিলেন। চৈতন্যদেবের জন্মসময়ে তিনি পঞ্চাশোর্ধ। অদ্বৈতাচার্য নাকি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় সেই 1486-খ্রীষ্টাব্দের দোলপূর্ণিমারাত্রে অনুভব করেন যে, নিমাই জন্মগ্রহণ করেছেন আপামর জনসাধারণকে ত্রাণ করতে। তিনিই প্রথম বৈদিক মন্ত্র সহযোগে সচন্দন তুলসীপত্র সমেত নিমাই পণ্ডিতকে ভগবানরূপে প্রণাম করেন—স্বীকৃতি দেন। পুরীর রথযাত্রায় লক্ষ লক্ষ যাত্রীর মধ্যে তিনি শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব ঘোষণা করেন। শান্তিপুরের 'মদনগোপাল' মূর্তির তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। লোকাচার অপেক্ষা ভক্তিবাদে বিশ্বাসী। তাঁর পুত্র অচ্যুতানন্দ বাল্যকাল থেকেই মহাপ্রভুর সঙ্গী, পরে ভক্ত। আচার্য অদ্বৈতের জীবনী পাওয়া যাবে 'অদ্বৈতপ্রকাশ' গ্রন্থে—রচনা ঈশান নাগর; শৈশব থেকেই তিনি অদ্বৈতাচার্যের গৃহে প্রতিপালিত। ইনি লাউরিয়া কৃষ্ণদাস নামে খ্যাত।

অদ্বৈত প্রতিষ্ঠিত 'মদনমোহন' মন্দিরের সন্ধান পাইনি; কিন্তু শান্তিপুরে অন্তত তিনটি প্রাচীন মন্দির এখনো দেখতে পাওয়া যায়। শ্যামচাঁদ, গোকুলচাঁদ এবং জলেশ্বর মন্দির। শ্যামচাঁদের বিশাল মন্দিরটি নির্মাণ করেন স্থানীয় তন্তুবায়বংশজাত রামগোপাল খাঁ চৌধুরী। নির্মাণ সমাপ্ত হয় 1726 খ্রীষ্টাব্দে—অন্যূন দুই লক্ষ তঙ্কা ব্যয়ে! মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় স্বয়ং নদীয়াধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। মন্দির-প্রবেশের জন্য পাশাপাশি তিনটি অশ্বখুরাকৃতি খিলান—ইসলামী স্থাপত্যশৈলীর। দুটি কাল্‌বুদের মধ্যবর্তী অংশে (স্প্যান্ড্রিল অংশে) যে নকশা তাও মুগলরীতির—প্রতিটি খিলানে এক জোড়া পদ্ম-নক্‌শা ফতেপুর সিক্রির বুলন্দ দরওয়াজার কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

গোকুলচাঁদের মন্দিরটি আমাদের কাহিনীর কালে সদ্যসমাপ্ত—প্রতিষ্ঠা: 1740 খ্রীষ্টাব্দে।

জলেশ্বর মন্দিরটি নির্মাণ করেন নদীয়া-মহারাজ রামকৃষ্ণের জননী প্রায় সমকালেই। এ মন্দিরে পোড়ামাটির নক্‌শায় যে কারুকার্য তা ভুবনেশ্বরের মুক্তেশ্বর মন্দিরের অলঙ্করণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে!

শান্তিপুরে পরবর্তী যুগে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নামও এইসঙ্গে লিপিবদ্ধ করে যাই। শ্রীরাম গোস্বামী, চন্দ্রশেখর বাচস্পতি এবং রামনাথ তর্করত্ন। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে আবির্ভূত হন আশানন্দ মুখোপাধ্যায়। তাঁর একটি স্মৃতিস্তম্ভ হালে—1932 সালে—নির্মিত হয়েছে। তিনি ছিলেন অসাধারণ বীর ও ক্ষমতাশালী। এক রাত্রে মুখুজ্জেমশাই কোন ধনী গৃহস্থের বাটীতে অতিথিরূপে বাস করছিলেন। স্থানীয় ডাকাতদলের দুর্ভাগ্য, তারা সেই রাত্রেই ঐ বাড়িতে ডাকাতি করতে আসে। আশানন্দ নিদ্রাভঙ্গ হয়ে মুশকিলে

পড়লেন—তিনি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। অপরপক্ষে ডাকাতদলের হাতে নানান মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র। ঢেঁকিশালে ছিল একটি প্রকাণ্ড ঢেঁকি। উপড়ে নিয়ে তিনি ডাকাত দলের সঙ্গে একলাই সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। কয়জন ডাকাত হতাহত হয়েছিল তা ইতিহাসে লেখা নেই, কিন্তু তরোয়াল বা বল্লমের ধার যে ঢেঁকির ভারের কাছে ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল এ তথ্যটা স্বীকৃত। রবি-বাউলের পুরাতন ভৃত্যটি নাকি ছিল 'বুদ্ধির ঢেঁকি'; আশানন্দ হয়ে গেলেন: 'শক্তির ঢেঁকি'।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বাড়িও শান্তিপুরে।

শান্তিপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম বাঘ্-আঁচড়ায় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত বাগ্‌দেবীর মন্দিরটি বর্তমানে নিশ্চিহ্ন, তার চেয়েও করুণ অবস্থা ব্রহ্মশাসন গ্রামে চাঁদ রায় প্রতিষ্ঠিত অতিবৃহৎ মন্দির: চাঁদরায়ের শিবমন্দির। তাতেও ছিল অপূর্ব পোড়ামাটির কাজ।

ফুলিয়া

সংলগ্ন মানচিত্র দেখে তোমরা হয় তো ভাববে যে, আমি ভাগীরথীর তীর ছেড়ে তোমাদের নিয়ে চলেছি দক্ষিণপূর্ব দিকে। বাস্তবে তা নয়। যে আমলের গল্প তখন ভাগীরথী ঐ ফুলিয়া্র কিনার ঘেঁষেই বইত।

আদি কবি নিজেই যে লিখে গেছেন তাঁর গ্রামের পরিচয়:

"গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিনী।"

কাকতালীয় ঘটনা যদি বল তবে তাই সই। জন্ম: 1440 খ্রীষ্টাব্দে সরস্বতীপূজার দিনে, মাঘী শুক্লা শ্রীপঞ্চমীতে। পিতার নাম বনমালী ওঝা, মায়ের নাম মালিনীদেবী। 'ওঝা' নবাবী খেতাব। আসলে ওঁরা মুখুটি ব্রাহ্মণ। গুরুগৃহে শিক্ষা শেষ করে কৃত্তিবাস রাজপণ্ডিত হওযার মনোবাসনা সমেত রওনা দিলেন গৌড়েশ্বরের সভায়। কেউ বলেন, গৌড়েশ্বর নন, বাস্তবে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ, কেউ বলেন রাজা গণেশ। মোট কথা, স্বরচিত পাঁচটি শ্লোক তিনি শুনিয়েছিলেন সেই রাজার দরবারে। রাজা অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন, আমি তৃপ্ত। বলুন, কী পুরস্কার দেব?

এই তো মুশ্‌কিল ঐসব আধ-পাগ্‌লা কবিগুলোকে নিয়ে। যায় রাজকবি হওয়ার বাসনা নিয়ে, বেমক্কা চেয়ে বসে: রাজকণ্ঠের মালা! তাও সোনার নয়, ফুলের।

কৃত্তিবাস তা চাননি। পরিতৃপ্ত ভূস্বামীকে জানালেন তাঁর মনোবাসনা। বাল্মীকি রামায়ণ তো দেশের সাধারণ লোক পড়তে পারে না, তাই সাদা বাঙলায় উনি সারা জীবনভর একটি 'ভাষা-রামায়ণ' রচনা করতে ইচ্ছুক।

রাজা বললেন, তথাস্তু। আপনার মাসোহারা বন্দোবস্ত করে দেওয়া হবে। লিখুন, যা মন চায়।

বাঙলা ভাষায় রামায়ণ-রচনা যে একটা অবাস্তব প্রস্তাব সে-কথা আর ঐ পাগলটাকে স্পষ্টাক্ষরে জানালেন না।

ফুলিয়া

জলেশ্বর মন্দির,
ফুলিয়া

কৃত্তিবাস স্তম্ভ,
ফুলিয়া

১৫শ শতাব্দী

সারাজীবনে বাংলার আদি কবি কৃত্তিবাস রচনা করলেন তাঁর 'ভাষা রামায়ণ'।

না, বাল্মীকি রামায়ণের হুবহু অনুবাদ নয়। অন্যান্য পুরাণ, ভাগবৎ থেকে কাহিনী চয়ন করে তিনি রচনা করলেন 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'। অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ। যেমন শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধন—বাল্মীকির কী গরজ দশভুজা দুর্গার মহিমা প্রচারে? অথচ বাংলার জলহাওয়ায় মানুষ ঐ ওঝা পণ্ডিত কি দুর্গাপূজাকে বাদ দিতে পারেন? হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ-হরণও এক সংযোজন, যেমন মহীরাবণ বধ। সবচেয়ে সুন্দর সংযোজন লবকুশের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধ ও পরাজয়। হয়তো এতে কবি কালিদাসের শকুন্তলা কাব্যের প্রভাব পড়েছে; কিন্তু কাব্য হিসাবে ঐখানটা যে কী পরিমাণে উৎরেছে তা তোমরা বুঝবে না, দিদিভাই! দাদু-দিদাদের জিজ্ঞেস কর—তাঁরা দেখেছেন শিশির ভাদুড়ীর ঐ অংশের অভিনয়। বুঝিয়ে বলে দেবেন তোমাদের।

স্মৃতিস্তম্ভটি প্রতিষ্ঠা করেন স্যার আশুতোষ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে।

রেলিং দিয়ে ঘেরা একটা চতুষ্কোণ মঠ-প্রতীক, ঊর্ধ্বাংশ সমচতুষ্কোণ শঙ্কু আকারের। মর্মরফলকে উৎকীর্ণ করা আছে:

"মহাকবি কৃত্তিবাসের
আবির্ভাব—1440 খ্রীষ্টাব্দ, মাঘমাস, শ্রীপঞ্চমী, রবিবার
হেথা দ্বিজোত্তম
আদি কবি বাঙ্গলার ভাসা রামায়ণকার
কৃত্তিবাস লভিলা জনম,
সুরভিত সুকবিত্বে ফুলিয়ার পুণ্যতীর্থে
হে পথিক, সম্ভ্রমে প্রণম।

শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী কর্তৃক ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হইল।
২৭ শে চৈত্র, ১৩২২ বঙ্গাব্দ।"

সৌভাগ্য আমার—চাকরির প্রথম পর্যায়ে ফুলিয়াতে বদলী হয়েছিলাম। বারে বারে ঐ স্মৃতিস্তম্ভটির সামনে নতমস্তকে দাঁড়াবাব সুযোগ পেয়েছি। পাশেই 'কৃত্তিবাস কূপ', অনতিদূরে 'কৃত্তিবাস স্মৃতি বিদ্যালয়'। এসব তো মানুষের কীর্তি। প্রকৃতিও ঐ সঙ্গে যোগ করেছে তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ: একটি অতি বিশাল বটবৃক্ষ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে অভ্রংভেদী মহিমায় দণ্ডায়মান।

যেন প্রকৃতি-রোদ্যাঁ কৃত্তিবাস-বালজাকের মূর্তি গড়েছেন!

কৃত্তিবাসের জন্মভিটার অনতিদূরে যবন হরিদাসের 'গোফা'।

মহাপ্রভুর ভক্তদের মধ্যে 'হরিদাস' নামের কিছু বাড়াবাড়ি। বড় হরিদাস, ছোট হরিদাস, তার উপর আবার এই যবন হরিদাস। এঁর আদি নাম ব্রহ্ম ঠাকুর। হরির ভক্ত ছিলেন বলে নাম হয় 'হরিদাস'। কেউ বলেন ইনি মুসলমান পিতার সন্তান, আবার কেউ বলেন, তা নয়—আসলে বাল্যকালে তিনি এক সহৃদয় মুসলমানের গৃহে পালিত হয়েছিলেন। এঁর অসাধারণ হরিভক্তির কথা শুনে কাজী ক্ষেপে যান। মুসলমান হয়ে এ কী ধাষ্টামো! দিবারাত্র শুধু—হরিবোল? হরিবোল?

ফুলিয়া

গ্রেপ্তার হলেন যবন হরিদাস। মুসলমান ফৌজদার আর কাজী মিলে ফতোয়া জারী করলেন ওঁদের এলাকায় বাইশটি হাটে বন্দীকে ক্রমান্বয়ে নিয়ে যাওয়া হবে; আর হাটে-বাজারে লোক যখন জমজমাট, তখন বন্দীকে বেত্রাঘাত করা হবে। যাতে ভবিষ্যতে কোনও মুসলমান এ জাতীয় 'পাপ কাজ' না করে।

যবন-হরিদাস প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ, 'হরিদাস-গোফা', ফুলিয়া

যবন হরিদাস বাইবেল পড়েছেন বলে মনে করার কোনও কারণ নেই। কিন্তু প্রতিবার তিনি বাইবেল থেকে নির্ভুল উদ্ধৃতি শুনিয়ে গেলেন: প্রভু! এরা জানে না, এরা কী অন্যায় করছে। তুমি ওদের ক্ষমা কর। হরিবোল! হরিবোল!

অবশ্য তথ্যটা আমরা পাই ছন্দবদ্ধ পদে:

"এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ।
মোরে দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ।।"

বাইশ-বাজারে যবন হরিদাসকে দণ্ডভোগ করতে হয়নি, এটাই রক্ষে। দু-চার হাট পার করেই কোতোয়াল এসে জানিয়ে গেল শাস্তিদানের কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে? কাজী আর সুবেদারকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বলছে 'জোড়া-পাষণ্ড'; আর হরিদাস হয়ে উঠছেন সবার প্রণম্য! শহীদ! অবতার!

বন্ধ হল অত্যাচার। বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হল। ফিরে এলেন নিজের গোফায়। প্রতিষ্ঠা করলেন ছোট এক সারি বিগ্রহ—বলরাম, রেবতী, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা। অপূর্ব!

রনারঘাট

গঙ্গার এক উপনদী চূর্ণীর কিনারে আর একটি জনপদ গড়ে উঠেছিল। সেখানে ছিল অনেক আগেকার কালে অবশ্য—এক দস্যু সর্দার। তার নাম রণা-ডাকাত। তার প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধেশ্বরী কালীর 'থানে' নাকি সেকালে নরবলি হত। সেই 'রণার ঘাঁটি' থেকে পরে জনপদটার নাম হয়: রানাঘাট।

এসব অবশ্য গালগল্প। শহরের ক্রোশ দুই দূরে চূর্ণীনদীর দুইতীরে ছিল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত দুটি নদীনিবাস—হরধাম-আনন্দধাম। কে জানে যমুনার দুই পারে কৃষ্ণতাজ ও শুভ্রতাজ গড়ার শাহজাহানী খোয়াবে সে দুটি নির্মিত হয়েছিল কিনা। তার ধ্বংসস্তূপের কাছাকাছি আছে নদীয়ারাজ প্রতিষ্ঠিত: চিন্ময়ী কালী।

রানাঘাট হচ্ছে বিখ্যাত জমিদার বংশ পালচৌধুরীদের আদি-নিবাস। আলোচ্য শতাব্দীর মাঝামাঝি ঐ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন কৃষ্ণকান্তি পাল। তাঁর নামটা স্মরণ করছি একটি বিশেষ হেতুতে। পলাশী যুদ্ধের পরে ওয়ারেন হেস্টিংস্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করতে চান। স্বাদেশিকতার প্রভাবে অনেকেই পরবর্তীকালে ইংরাজের দেওয়া খেতাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। যতদূর জানি, কৃষ্ণকান্তি মহাশয়ই বোধহয় সেই জাত্যাভিমানীদলের প্রথমসূরী। তিনি বিদেশী বেনিয়াদের দেওয়া সেই খেতাবটি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। সে-সংবাদে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র—হ্যাঁ, ততদিনে তিনি নিজে আর 'রাজা' নন, 'মহারাজা'—ওঁকে 'পাল-চৌধুরী' উপাধি প্রদান করেন। সেই অবধি ওঁরা 'পালচৌধুরী'।

রানাঘাটের সাড়ে-চার ক্রোশ দূরে 'দেগাঁর ঢিবি' একটি প্রাচীন জনপদ। ভাবতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে দেগাঁর দে-পাল রাজার উল্লেখ আছে; তিনি ছিলেন কুম্ভকার শ্রেণীর এক ভূস্বামী। পরে এই জায়গাটি গভীর জঙ্গলে ঢেকে যায়। এখন অবশ্য বনজঙ্গল সাফা করে জনবসতি হয়েছে। যাঁরা নতুন করে বাড়ি বানাতে চান তাঁরা বনিয়াদ খুঁড়তে গিয়ে মাঝে মাঝে অপরূপ কারুকার্য-করা পোড়ামাটির টালি উদ্ধার করে অবাক হয়ে যান—এ জিনিস কোথা থেকে এল?

ঐ দে-পাল বা দেবপালের নামে একটি লোকগাথা আজও শোনা যায়।

একবার স্থানীয় মুসলমান শাসনকর্তার সঙ্গে রাজা দেবপালের মনোমালিন্য হয়। দু-পক্ষই দিল্লীতে বাদশাহের কাছে দরবার করতে যান। যাত্রাসময়ে দেবপাল দুটি সুশিক্ষিত পারাবত সঙ্গে নিয়ে যান। একটি শুভ্রবর্ণের, একটি কৃষ্ণবর্ণের—তাদের নাম জয় ও বিজয়। স্বীয় মহিষীকে এই নির্দেশ দিয়ে যান যে, যদি তিনি মামলায় জয়লাভ করেন তাহলে শুভ্রবর্ণের 'জয়'কে আকাশে ছেড়ে দেবেন। সে দ্রুতগতিতে ফিরে এসে রানীমাকে শুভবার্তা জ্ঞাপন করবে। আর যদি সংবাদ অশুভ হয় তাহলে তিনি কৃষ্ণবর্ণের 'বিজয়'কে উন্মুক্ত করে দেবেন।

সে-ক্ষেত্রে স্থানীয় মুসলমান শাসনকর্তার অত্যাচার অনিবার্য হয়ে পড়বে। গঙ্গা বে... রাজামশায়ের প্রত্যাবর্তনের জন্য দু-তিন মাস সময় লাগবে। প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান শাসনকর্তা সেই সুযোগে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করতে পারে। রানী সব শুনে বলেছিলেন, আপনি চিন্তা করবেন না, সে-ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য আমি যথাকর্তব্য করব।

কাহিনীটি করুণ। দিল্লীব বাদশাহ্ দেবপালের অনুকূলেই রায় দিলেন। মহারাজ মামলা জিতে তাঁর দিল্লীস্থ শিবিরে ফিরে এসে জয়কে বন্ধনমুক্ত করতে গিয়ে দেখেন যে, পিঞ্জরে দ্বিতীয় পারাবতটি অনুপস্থিত। তদন্ত করতে গিয়ে জানতে পারলেন, তাঁর একান্ত সহচর তথা দেহরক্ষীটিও পলাতক।

মুসলমান শাসনকর্তার পক্ষে মামলা পরিচালিত করতে যে লোকটি দিল্লী গিয়েছিল সে ছিল খলিফা। দেবপালের দেহরক্ষীকে উৎকোচে বশীভূত করে এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে।

দেবপাল তাঁর শুভ্রবর্ণের পারাবতটিকে তৎক্ষণাৎ আকাশে উড়িয়ে দিলেন।

জয় ও বিজয় দুজনেই অত্যন্ত দ্রুতগতি সংবাদবহ। সমান ব্যবধানে তারা একের পর এক এসে উপস্থিত হল রণার ঘাঁটির উপকণ্ঠে সেই দেগাঁর ঢিবিতে। কালীক ব্যবধান তিনদণ্ডের। আড়াই শ যোজন, অর্থাৎ প্রায় দুই হাজার মাইল পথ উড়ে এসে শুভ্রবর্ণের জয় দেখল বাজপ্রসাদ শোকে আচ্ছন্ন। প্রায় অর্ধদণ্ড পূর্বে রাজমহিষীর মৃতদেহ অন্তঃপুরস্থ পুষ্করিণী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সে দেহ এখনো সৎকার করা হয়নি। নিদারুণ শোকে প্রাসাদে সকলেই নিমজ্জমান। শুধু কার্নিশে নিঃঝুম বসে আছে তার সঙ্গী, বিজয়। ক্লান্ততনু, বিষণ্ণ, বক্‌বকম্ করতেও ভুলে গেছে। সে যেন বুঝে উঠতে পারছে না: এত জোরে উড়ে এসেও সে কেন মাল্‌কিনকে খুশি করতে পারেনি!

দেবপাল দুইমাস পরে নৌকাযোগে ফিরে এলেন প্রাসাদে। নিদারুণ সংবাদে তিনিও আত্মঘাতী হলেন। মুসলমান শাসনকর্তা এবার নির্বিবাদে দখল করে নিল রাজপ্রাসাদ।

কাহিনীতে শুধু দুটি তথ্য অনুক্ত। দেবপালের সেই দেহরক্ষীকেই কি বিজয়দর্পী মুসলমান পরস্বাপহারক ঐ রাজার সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল? এবং সেই লোকটাই কি ছিল মীরজাফব আলী খাঁর গুরু-মুর্শেদ?

দেগাঁর ঢিবির অনতিদূরে চৌবেড়িয়া গাঁয়ের নাম শুনেছ? সেই গাঁয়ের এক দুরন্ত দামাল ছেলে কী-একটা নাটক বুঝি লিখেছিল, যার ইংরেজী অনুবাদ করে যশোরের সাগরদাঁড়ি গাঁয়ের সেই জাত-খোয়ানো কবিটা, আর তার প্রায়শ্চিত্ত করতে 'লঙ-এর হল কারাগার'!

এই চৌবেড়িয়া গাঁয়ের মাঝখানে ছিল এক দুর্ভেদ্য দুর্গ—তার চারিদিকেই যমুনা নদীর পরিখা, তাই তার নাম 'চতুর্বেষ্টিত দুর্গ'। সেই দুর্গের দুর্গাধিপ ছিলেন কাশীনাথ রায়। পাঠান-বিজয়ে মোগল-বাহিনীকে সাহায্য করায় যিনি সম্রাট আকবরের কাছ থেকে 'সমরসিংহ' উপাধি লাভ করেন। এত কথা বলছি, কারণ 'নীলদর্পণে'র মতো এই চতুর্বেষ্টিত দুর্গের সঙ্গেও বাংলাসাহিত্যের একটি অচ্ছেদ্যবন্ধন ঘটেছিল পরবর্তী জমানায়। এই দুর্গটিই রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক কাহিনীর পটভূমি : 'বঙ্গবিজেতা'।

দুর্গটি বর্তমানে সম্পূর্ণ নদীগর্ভে। উপন্যাসটি কিন্তু সগৌরবে টিকে আছে বিভিন্ন বঙ্গসাহিত্য-প্রেমিকের সঞ্চয়ে।

পৌরাণিক যুগ

চক্রদহ

চারক্রোশ দক্ষিণে চক্রদহ।

আদি নাম: চক্রদ্বীপ; অন্তিম নাম: চাক্‌দা।

এমন নাম কেন হল গো? বলি শোন:

ভগীরথ রথে চেপে শঙ্খধ্বনি করতে করতে এগিয়ে আসছেন গোমুখ থেকে কপিল মুনির আশ্রমে। তাঁর পিছন পিছন আসছেন মা গঙ্গা। রওনা হয়েছিলেন অক্ষয় তৃতীয়ায়; কিন্তু পথ বড় কম নয়! রাজমহল, গৌড়, কর্ণসুবর্ণ অতিক্রম করে, কাটোয়া-নবদ্বীপ পার হতে হতেই নামল বর্ষা। এখানে প্রচণ্ড বর্ষণের মধ্যে তাঁর রথের চাকা আটকে গেল কাদার দহে। ইতিমধ্যে পশ্চাদগামী গঙ্গাও এসে উপস্থিত। ফলে আদিগন্ত জল-থৈ-থৈ! ভগীরথ হতোদ্যম হবার মানুষ নন। টেনে তুললেন রথ ও রথাশ্ব। তবে ঐখানটায় হয়ে গেল একটা প্রকাণ্ড 'দহ', ঘূর্ণী। তারই নাম চক্রদহ। যে ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে রথটাকে টেনে তুলেছিলেন তার নাম চক্রদ্বীপ।

তোমরা হয়তো এসব কথা বিশ্বাস করবে না; কিন্তু সে-আমলের লোকে তা অন্তর থেকে বিশ্বাস করত। এখন হয়তো চাকদার মানুষ—ঐ যাবা ওপার-বাঙলা থেকে এসে নয়া-বসত গড়ে তুলেছে—তারা জানেই না—তিন চারশ বছর পূর্বে চক্রদহ ছিল এক মহাতীর্থ! ঐ যেমন আজ মায়াপুরের রব্‌রবা! চাকদহ থেকে বনগ্রাম হয়ে শহর চণ্ডীকান (যশোহর) পর্যন্ত ছিল বাদশাহী পাকা সড়ক। চাকদহে খুঁজলে আজও দেখতে পাবে গঙ্গার মরা-খাত। অবশ্য বিগত বিশ ত্রিশ বছরে সেই মরা খাতের বুকে শালবল্লার পিন্ পুঁতে বৃন্তচ্যুত মানুষগুলো নতুন বসতি গড়ে তুলেছে। আহা, তারা সুখে থাকুক। কিন্তু ঐ মরা খাতে ভিত খুঁড়তে গিয়ে যদি শিশুর কঙ্কাল খুঁজে পাও তাহলে ঘাবড়ে যেও না। অমঙ্গলের কিছু নয়। ওগুলি শুভ প্রতীক। ঐ কচি কচি হাড়গুলো অক্ষয় স্বর্গলাভকামীর কিছু পার্থিব অবশেষ মাত্র। স্থানীয় পুণ্যকামীরা তো বটেই এমনকি যশোর-খুলনা থেকেও ঐ সড়ক ধরে আসত পুণ্যকামীরা—যাদের গঙ্গাসাগরে তীর্থযাত্রা করার সঙ্গতি নেই। ঐ চক্রতীর্থের পূতসলিলে শিশু সন্তানকে নিক্ষেপ করে মহাপুণ্য অর্জন করত তারা। কোন কোন হতভাগিনী 'দিবি না ফিরায়ে?' বলে শিউরে উঠত কি না, ঠিক জানি না। সে-কথা আর কে লিখবে বল? রবি-বাউলের ঠাকুর্দাই যে তখনো জন্মাননি!

পুরাণ-টুরান তোমরা বিশ্বাস করতে চাও না—ইতিহাসকে তো মানবে? তাতেও চক্রদহের মহিমার হদিস পাবে। এখানেই মহারাজ মানসিংহ তাঁর বিরাট মুগল বাহিনী নিয়ে আটকে পড়েছিলেন বর্ষার প্রকোপে। সে কিস্‌সা আগেই শুনিয়েছি ভবানন্দ মজুমদারের প্রসঙ্গে।

এন-এইচ থার্টিফোর ধরে ঐ বিপদজনক এলাকাটা পাড়ি দেবার বাসনা যদি চাগে, তাহলে দেখে নিও বাপু, গাড়িতে বাড়তি স্টেপ্‌নি আর জ্যাক আছে কি না।

আধক্রোশ দক্ষিণে পালপাড়া। সে-কালের প্রদ্যুম্ননগর।

এখন তো ইস্টিশনও হয়েছে। রেলগাড়ির কামরায় বসেই দেখতে পাবে পালপাড়ার মন্দির।

গাড়িতে বসে হয়তো নজর হবে না, মন্দিরটি যে ভূখণ্ডে অবস্থিত তা নিকটবর্তী জমির তুলনায় অনেকটা উঁচু জমিতে। ছোট ছোট লাল পাথরে গাঁথা মন্দিরটি ভারী সুন্দর। আমার তো মনে হয়েছে তার বয়স অন্তত পাঁচ শ' বছর! কে কবে এটি নির্মাণ করেছিলেন তার হদিস নেই। কাছেই একটি দীঘি—প্রদ্যুম্ন সরোবর।

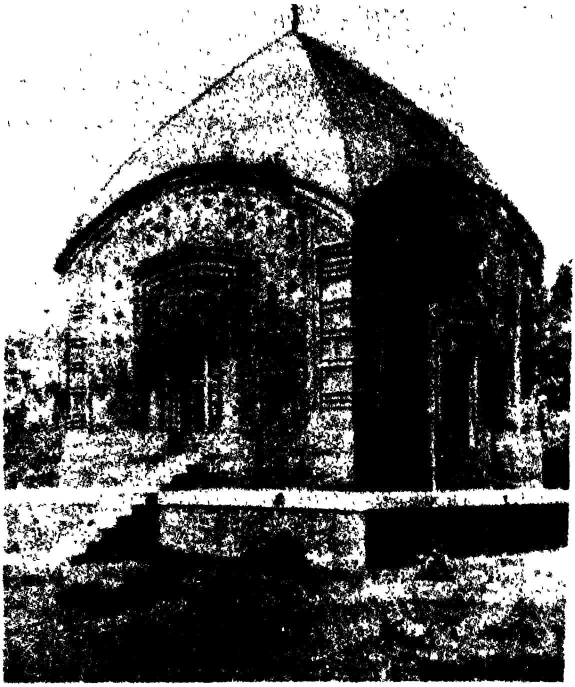

প্রদ্যুম্ননগরের দেউল, চক্রদহ

আবার পুরাণ কাহিনী শোনাই: শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন এই জনপদের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি চক্রতীর্থে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, এ-কথাটা নিশ্চয়ই শুনেছ! বিশ্বাসী মানুষের ধারণা—সেই চক্রতীর্থ হচ্ছে ঐ চক্রদহ বা চাক্‌দা। সাফল্যলাভ করে সেই তীর্থেই বসবাস শুরু করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণতনয়। তাঁরই নামে জনপদটির নাম হয়ে যায়: প্রদ্যুম্ননগর।

আবার সেই একই কথা বলি—তোমরা, আজকালকার ছেলেমেয়েরা, পুরাণে বিশ্বাস কর না। বলি পুরাতত্ত্ব আর ইতিহাস তো মানবে? মন্দির সংলগ্ন ভূভাগের ঐ উঁচু জমি কি ইঙ্গিত করে না যে, ওখানে ছিল এক বর্ধিষ্ণু জনপদ? আর ইতিহাস? স্মার্ত রঘুনন্দন 'তীর্থযাত্রাবিধি' গ্রন্থে ষোড়শ শতাব্দীতে এই প্রদ্যুম্ননগরের উল্লেখ করেছেন 'মুক্তবেণী'র স্থান নির্দেশ করতে।

যশোড়া

যশোড়া গণ্ডগ্রামকে না চেন, শিমুরালি-ইস্টিশানকে নিশ্চয় চিনবে।

এখানে ছিল জগদীশ পণ্ডিত-এর শ্রীপাট। তাঁর প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথদেবের মন্দিরটি বিশেষ দ্রষ্টব্য। মূর্তিটি হুবহু পুরীর জগন্নাথের অনুসরণে। সাদৃশ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে!

এ সম্বন্ধে যে লোকগাথা আছে তা এবার বলি। বিশ্বাস করা-না-করা তোমাদের অভিরুচি :

জগদীশ পণ্ডিত যখন অশীতিপর বৃদ্ধ, তখন স্নানযাত্রার প্রাক্কালে পুরীধামে যান তীর্থ করতে। নিশ্চয় শুনেছ যে, শ্রীধামের ঐ ত্রিমূর্তির নবকলেবর হয় দ্বাদশ বৎসরের ব্যবধানে। দারুময় ব্রহ্ম! পুরাতন মূর্তি কীভাবে বিলীন হয়ে যায় তা নিয়ে নানা মত। কেউ কেউ বলেন তা সৎ-ব্রাহ্মণেরা লোকচক্ষুর অন্তরালে সমুদ্রতীরে দাহ করেন—ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, দধি ইত্যাদি সহযোগে, চন্দন কাষ্ঠের বেদী গড়ে। তা সে যাই হোক, মোটকথা দেবতার নবকলেবর হলে সাধারণ মানুষ পূর্বযুগের জগন্নাথ-মূর্তিকে আর চর্মচক্ষুতে দেখতে পায় না।

বৃদ্ধ জগদীশ পণ্ডিত স্নানযাত্রার পূর্বে পুরীধামের প্রধান পাণ্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অনুরোধ করেন—তিনি অনুমতি করলে পূর্ব-প্রজন্মের পরিত্যাজ্য দারুময় ত্রিমূর্তিকে তিনি স্বগ্রামে নিয়ে যাবেন। সেখানে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করবেন।

এটি শাস্ত্রবিরোধী যাচ্ঞা। বড়পাণ্ডা কিন্তু সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন না। অদ্ভুত এক শর্ত আরোপ করলেন, আপনি পুরাতনী ত্রিমূর্তিকে স্বগ্রামে নিয়ে যেতে পারেন একটি শর্তে। ত্রিমূর্তির ভিতর জগন্নাথদেবের মূর্তিটি আপনি যদি স্বয়ং পদব্রজে বহন করে নিয়ে যেতে স্বীকৃত হন।

হয়তো প্রধান পাণ্ডার এ এক কৌশল। সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে একটি অবাস্তব শর্ত আরোপ করলেন তিনি। অশীতিপর বৃদ্ধের পক্ষে পদব্রজে সমস্তটা পথ প্রত্যাবর্তনই এক অবাস্তব প্রস্তাব। তদুপরি ঐ জগদ্দল দারুমূর্তিকে বহন করে নিয়ে যাওয়া তো নিতান্ত অসম্ভব। সকলেই অবাক হয়ে গেল বৃদ্ধের প্রত্যুত্তরে। তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য! দারুময় ব্রহ্মকে স্বয়ং বহন করে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনাকে আরও একটি অনুমতি দিতে হবে প্রভু! আমি বৃদ্ধ ; পথে যদি আমার জীবনাবসান হয় তাহলে যেখানে আমার মৃত্যু হবে সেখানেই ঐ মূর্তিকে প্রতিষ্ঠা করা হবে। তার ব্যয়ভার আমি বহন করব!

এ শর্তে স্বীকৃত না হওয়ার হেতু নেই!

বৃদ্ধ জগদীশ পণ্ডিত অসম্ভবকেই সম্ভব করলেন। স্বয়ং ঐ দারুময় ব্রহ্মকে বহন করে উপনীত হলেন স্বগ্রামে। প্রতিষ্ঠা করলেন দেবতাকে। আশ্চর্যের কথা, তারপরও দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন তিনি। আজও—না, আজও বলা উচিত হবে না, আমাদের বাল্যকালেও—প্রতিবৎসর পৌষমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে যশোড়ায় জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব উৎসব হত। এ ছাড়া মাঘী পূর্ণিমাতেও গঙ্গাস্নানের যোগ উপলক্ষ্যে বহু তীর্থযাত্রীর

হত সমাগম।

শিমুরালীতে যদি যাও জগন্নাথদেবের দোলমঞ্চটিকে দেখে এস। তার চিহ্ন বোধহয় আজও আছে!

জগন্নাথদেবের দোলমঞ্চ, যশোড়া (শিমুরালি)

আজকের হিসাবে চব্বিশ পরগণা জেলার সমাপ্তি আর নদীয়া জেলার শুরুতে এই কাঁচড়াপাড়া—প্রাচীন কাঞ্চনপল্লী। যা ছিল কাঞ্চন তা আজ কাঁচকড়াও নয়, একেবারে কাঁচড়া! ঐ যেখানে আজ দৈত্যের মতো রেলওয়ে ইঞ্জিনগুলোকে মেরামত করা হয়, দিবারাত্র গজগজ ফোঁসফোঁস করে, ওর নাম সেকালে ছিল বীজপুর! তখনো ওখানে ছিল দৈত্যাকার যন্ত্রচালিত কিছু ইঞ্জিনের মতো কালো মুষকো মানুষ—ডাকাত তারা। ছিল এক ডাকাতে-কালী। নরবলির আয়োজন করে তারা ডাকাতি করতে বার হত।

বৈষ্ণবসাহিত্যে এর পরিচয়: সেন শিবানন্দের পাট।

শিবানন্দ ছিলেন চৈতন্যপ্রভুর এক অনুগত ভক্ত। তাঁর ভদ্রাসনে পদধূলি দান করেছিলেন প্রেমের ঠাকুর। সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীচৈতন্যদেব যখন নীলাচলের বাসিন্দা তখন রথযাত্রার প্রাক্কালে গৌড়মণ্ডলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে সমবেত হতেন বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ—ঐ শিবানন্দের ভদ্রাসনে। তাঁদের বাসস্থান ও আহারের ব্যবস্থা তো বটেই এমনকি অনেক দুঃস্থ

ভক্তকে পাথেয় পর্যন্ত যোগান দিতেন শিবানন্দ। তাঁর তিন পুত্র—চৈতন্যদাস, রামদাস ও পুরীদাস। সর্বকনিষ্ঠ পুরীদাস ওরফে পরমানন্দ সেন ছিলেন পণ্ডিত। সংস্কৃত ভাষায় তিনখানি পুঁথি রচনা করেন : চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য এবং গৌরগণোদ্দেশদীপিকা। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য তাঁকে উপাধি দান করেছিলেন: কবিকর্ণপুর পরমানন্দ!

সেন শিবানন্দ প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণরায়ের বাঙলা আটচালা মন্দিরটি নয়নাভিরাম। স্থাপত্যশৈলী শান্তিপুরের শ্যামচাঁদ মন্দিরের অনুসরণে—সম্মুখভাগে তিন-খিলান, অশ্বখুরাকৃতি। এই মন্দিরটি

সেন-শিবানন্দ প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণরায়ের মন্দির, কাঞ্চনপল্লী

যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাতপুত্র রাঘব রায় পুনর্নির্মাণ করে দেন এবং দেবসেবার জন্য একটি নিষ্কর ভূখণ্ড দান করেন। দু-একশ বছরের ভিতর গঙ্গার প্রবাহ পরিবর্তিত হওয়ায় সে মন্দিরটিও গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। বর্তমানে যে আট-চালা বাঙলা মন্দিরটি দেখা যায় তার নির্মাণকাল 1785 খ্রীষ্টাব্দ। নির্মাণ ব্যয় যৌথভাবে বহন করেন শহর কলকাতার নিমাইচরণ ও গৌরচরণ মল্লিক।

কবি ঈশ্বরগুপ্তের (1812-59) জন্মস্থানও এই কাঞ্চনপল্লী।

আরও একজনের কথা বলি: যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (1845—1904)।

'আর্যদর্শন' পত্রিকার এই সম্পাদক, গ্যারিবল্ডি-ম্যাটসিনি, জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবন চরিত

রচনা করে স্বাদেশিকতার বাতাবরণ সৃষ্টি করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তিনিও ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বাঙলার জাতীয় ভাব উদ্দীপনে বিদ্যাভূষণের প্রভূত দান। তাঁর সম্বন্ধে আর একটি তথ্য—যা প্রায়ই উল্লিখিত হয় না—এখানে লিপিবদ্ধ করে যাই। সেটা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কথা। যুবক বয়সেই তাঁর প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। বাঁড়ুজ্জে বংশের কুলীন পাত্র—এম· এ· পাশ, ক্যাথিড্রেল মিশন কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক, এবং তখন তিনি সরকারী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কন্যাদায়গ্রস্তের দল হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। বিদ্যাভূষণ বেয়াড়া বায়না ধরলেন—বিপত্নীকের সঙ্গে বিবাহ হওয়া উচিত বিগতভর্তার। কোনও মানে হয়? উপার্জনক্ষম পুত্র—পিতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রখ্যাত ডাব্‌লু· সি· ব্যানার্জি নন) পুত্রকে ত্যাগ করতে পারলেন না, তবে ব্যাজার হলেন। আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করলেন তাঁকে। মহাপণ্ডিত একঘরে হয়ে প্রকাশ্যে বিবাহ করলেন পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বিধবা কন্যাকে। গোপনেও কিছু করলেন তিনি—রচনা করেছিলেন কয়েকটি স্বদেশাত্মমূলক গ্রন্থ: প্রাণোচ্ছ্বাস, আত্মোৎসর্গ, কীর্তিমন্দির। বাঙলার গুপ্ত বিপ্লবীদলের সদস্যদের সেগুলি অবশ্য-পাঠ্য ছিল।

কাঞ্চনপল্লী থেকে আড়াইক্রোশ দূরে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কেন্দ্র: ঘোষপাড়া। আউলেচাঁদের শিষ্য সদ্‌গোপ-বংশীয় রামশরণ পাল এই ঘোষপাড়াকেই তাঁর মূল কেন্দ্র করেন। রামশরণের স্ত্রী হচ্ছেন 'সতী মা'। পীঠস্থানের অদূরে হিমসাগর দিঘি। সেখানে ডুব দিলে অন্ধও নাকি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।

অদূরেই কুলিয়ার পাট বা অপরাধভঞ্জন। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে এখানে তিন দিন ব্যাপী মেলা হত। উপলক্ষ: ঐ তিথিতে শ্রীচৈতন্যদেব কুলিয়া গ্রামবাসী বৈষ্ণব-নিন্দক পণ্ডিত দেবানন্দের অপরাধ মার্জনা করেছিলেন।

চল, এবার গঙ্গার ওপারে যাওয়া যাক। কাঞ্চনপল্লীর ওপারে বংশবাটী। না, দিদি, স্টীমলঞ্চে পার হওয়া চলবে না। কেন? ভুলে গেলে নাকি হে, তুমি আমার যাত্রাসঙ্গিনী হয়েছ অষ্টাদশ শতাব্দীতে। আমি এখন এই স্থবিরা বিংশশতাব্দীর পলিতকেশ কথাসাহিত্যিক নই, আমি এখন—'কালিদাসকে হারিয়ে দিয়ে গর্বে বেড়াই নেচে'।

চল, পারানি নৌকায় তোমাকে ওপারে নিয়ে যাই।

পারানির কড়ি আছে তো তোমার ঐ 'ফুটুনি-বটুয়ায়'? এক কড়ি লাগবে। নেই বুঝি? তা না থাক, পয়সা তো আছে? কপর্দক? তাও নেই। সর্বনিম্ন মুদ্রা কী আছে তাহলে? পাঁচ নয়া? অহো ভাগ্য! নিরানব্বই কড়া ভাঙানি পাব কোথায়? ঠিক আছে, আমিই না হয় তোমার পারানির কড়ি গুণে দেব। কী আর করা? যাত্রাসঙ্গিনী হতে যখন রাজী হয়েছ, তখন এক-কড়া বেহুদ্দো খরচই করা যাক!

তুমি-আমি পারানি-নৌকায় গঙ্গা পার হলাম।

ঐ দেখ, ঘাটোয়াল আমাকে চেনে। বলছে, হুঁসিয়ার ঠাকুর-মোসা! ঘাট পিছল হৈ!

আমি ওকে বলতে গেলাম, 'দুনিয়ার সব ঘাটই তো পিছল মাঝি-ভাই'—কিন্তু বলা হল না। নজর হল, তুমি ইতস্তত করছ নৌকা থেকে পিছল-ঘাটে পা বাড়াতে।

ঘাটোয়াল আমাকে ধমক দেয়, কেমন মানুষ আপনি ঠাকুর-মোসা! মাইজির হাতটো তো পাকড়ান!

শুধু তুমি নয়, আমিও লজ্জা পেয়েছি। ঘাটোয়াল ভুল বুঝেছে! লেখক-পাঠিকার সম্পর্কটাও নিবিড়—শ্রদ্ধা-স্নেহ-ভালোবাসার—কিন্তু তা কি জানে ঐ ঘাটোয়াল? তুমি সামলে নিয়ে বললে, না না, ভয় পাইনি, ভাবছিলাম আলতাটা ধুয়ে যাবে!

তা বটে! তোমার পায়ে তো হাই-হিল নেই, নূপুর-বেষ্টিত অলক্তক-আলিম্পন। কিন্তু তাই বলে আমি তো আর তোমাকে পাঁজা-কোলা করে পিছল ঘাটটুকু পার করে দিতে পারি না। হয়তো সে আশঙ্কাতেই তুমি আর ইতস্তত করলে না—খপ্ করে চেপে ধরলে আমার হাতটা।

শৈশবের হাঁটি-হাঁটি পা-পা ছন্দে দুজনে উঠে এলাম শক্ত জমিতে।

বংশবাটী

আমরা দুজন বংশবাটীতে পৌঁছলাম—সেই 1742 সালে। তখনো ওখানে হংসেশ্বরী মন্দিরটা নির্মিত হয়নি। সেটার নির্মাণকার্য শেষ হয়েছিল 1814 খ্রীষ্টাব্দে। তবে স্বয়ম্ভরা এবং অনন্ত বাসুদেবের মন্দির দুটি ছিল। কিন্তু সেসব গল্প দ্বিতীয়বার বলব না। 'হংসেশ্বরী'-তে তা বিস্তারিত বলেছি। অনন্ত বাসুদেব মন্দিরটিই প্রাচীনতম। নির্মাণ কাল 1679; ঔরঙ্গজেবের জমানায়। বংশবাটী সম্বন্ধে যে দুটি তথ্য "হংসেশ্বরী" উপন্যাসে বলা হয়নি, শুধু তাই বলি। প্রথম কথা: দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" নাটকে বর্ণিত নীলকুঠির অবস্থান এই বাঁশবেড়েয়। দ্বিতীয় কথা: এখানে 1843 খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার তত্ত্ববোধিনী সভা একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কিশোরমতি পড়ুয়ার দল বেদান্তের দিকে ঝুঁকে পড়ছে দেখে স্থানীয় পণ্ডিতেরা তার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যান। একযোগে সবাই ছাত্রদের ছাড়িয়ে নিয়ে যান। বিদ্যালয়টি উঠে যায়।

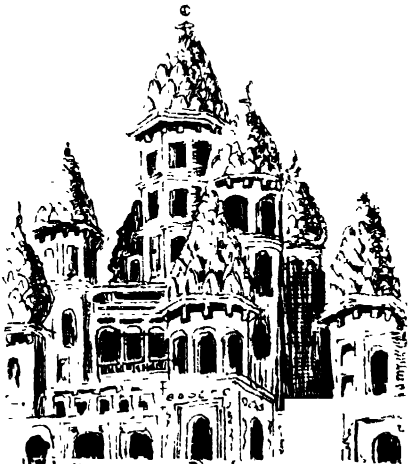

হংসেশ্বরী মন্দির

আরও দুটি কথা প্রসঙ্গত বলি:

এক নম্বর: এখানে বহু পূর্বযুগে একটি গীর্জা ছিল। কারও কারও মতে সেটি বঙ্গদেশের প্রথম নির্মিত গীর্জা। সেটা বিতর্কমূলক, কিন্তু এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, সেই গীর্জার প্রধান পাদ্রী ছিলেন প্রথম ভারতীয় পাদ্রী: তারাচাঁদ। ইংরাজী, ফরাসী এবং পর্তুগীজ তিন-তিনটি ভাষা জানতেন তিনি। বলাবাহুল্য, তার সঙ্গে বাঙলা, হিন্দি ও সংস্কৃত। সম্ভবত আরবী-ফার্সিও!

দ্বিতীয়ত: তারাশঙ্কর তাঁর 'রাধা' উপন্যাসে দরাফগাজীর উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন, মনে পড়ে? ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে গাজীকে আসতে দেখে পাঁচিল-আসীন হিন্দু সন্ন্যাসী 'পাঁচিল চেপে' এগিয়ে আসেন? সেই ঘটনাটি এই বাঁশবেড়ের। সন্ন্যাসীর নাম ভিখারীদাস। খামারপাড়ায় বাবাজীর আখড়াটির অবস্থান লোকে এখনো দেখায়।

ত্রিবেণী

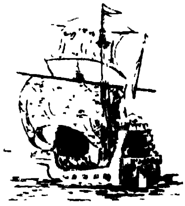

ত্রিবেণী: 'মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে'।

অতি প্রাচীন তীর্থ—গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মহাসঙ্গমে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ীর 'পবনদূতম্' কাব্যে এর উল্লেখ আছে। বঙ্গাধিপ ফিরোজ এখানে কিছুকাল বাস করেছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা তাই অনেক সময় একে বিকল্প নামে উল্লেখ করেছেন: 'ফিরোজাবাদ'।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ণনা করছেন

"বামদিকে হালিশহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি।।"

স্থাপত্যের ছাত্রদের কাছে এখানে জনান্তিকে কিছু নিবেদন করি: ত্রিবেণীতেই আছে বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যার প্রাচীনতম একটি মুস্‌লিম স্থাপত্য নিদর্শন—জাফর খাঁ মসজিদের মিহ্‌রাবটি। সপ্তগ্রাম-বিজেতা জাফর খাঁর সমাধি আছে যে প্রাচীন মসজিদে সেটি ভাগীরথী ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে। এই সুবৃহৎ মস্‌জিদটি প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের প্রস্তরখণ্ড দ্বারা নির্মিত। কিন্তু মন্দিরের মিহ্‌রাবটি অন্য মসজিদ থেকে সংগৃহীত। তার গায়ে শিলালেখে উৎকীর্ণ করা আছে যে তারিখ, সেটা 1298 খ্রীষ্টাব্দ!

পর পর দুইটি শতাব্দীতে ত্রিবেণী বঙ্গসংস্কৃতিকে উপহার দিয়েছে দুটি দুর্লভ প্রতিভা। গোটা অষ্টাদশ-শতাব্দীব্যাপী পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এবং উনবিংশতি শতাব্দীতে বাঙলার এডমন্ড বার্ক: রামগোপাল ঘোষ (1815-68)।

রামগোপাল 'সেই সময়' কালের মানুষ, আমাদের এক্তিয়ারের বাহিরে। আমরা আছি 'সেইতর সময়ে', তাই শুধু জগন্নাথের কথা বলি:

জগন্নাথের যখন জন্ম হয় (1694) তখন তাঁর পিতৃদেব রুদ্রদেব তর্কবাগীশের বয়ঃক্রম তিনকুড়ি-ছয়। জগন্নাথের জননীকে যখন বিবাহ করেন তখনই তাঁর বয়স ষাটের উপর। তার পশ্চাতে এক অদ্ভুত লোকগাথা। জগন্নাথের-দাদামশাই বাসুদেব ব্রহ্মচারী একজন বিখ্যাত জ্যোতিষীর কাছে শুনতে পান যে, জরাজীর্ণ-রুদ্রদেবের বৃদ্ধ বয়সে এক পুত্রসন্তান হবে এবং সেই পুত্রটি হবে অলৌকিক গুণসম্পন্ন এক ক্ষণজন্মা। নিতান্ত

পীড়াপীড়ি করে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ রুদ্রদেবকে সম্মত করেন এবং তাঁকেই কন্যা সম্প্রদান করেন। কেটে গেল দু-চার বছর—বাসুদেব ব্রহ্মচারীর দৌহিত্র আবির্ভূত হল না। তখন তিনি কন্যার পুত্রকামনায় পুরুষোত্তম ধামে চলে যান। পুরশ্চরণাদি পুত্রেষ্টী যজ্ঞ করেন। তাঁর প্রতি স্বপ্নাদেশ হয়—'তুমি গৌড়মণ্ডলে প্রত্যাবর্তন কর। তোমার কন্যা গর্ভবতী হয়েছে। পুত্র জন্মিলে নাম রেখ জগন্নাথ।'

বাসুদেব ফিরে এলেন ত্রিবেণীতে। শুনলেন, যা স্বপ্নে প্রত্যাদেশ হয়েছে তা সত্য।

দৌহিত্রের নামকরণ তাঁরই ইচ্ছানুসারে হল: জগন্নাথ।

পাঁচ বৎসরে শিক্ষারম্ভ। অক্ষর-পরিচয় হওয়ার পূর্বেই নাকি তিনি মুখে মুখে ব্যাকরণের সূত্রগুলি শিখে ফেলেন। অসাধারণ মেধা, স্মৃতিশক্তি আর অলৌকিক প্রতিভাবলে তিনি দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালেই প্রায় সর্বশাস্ত্র আয়ত্ত করে নেন। যদিচ রুদ্রদেব তর্কবাগীশ একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত, তাঁর প্রণীত 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকের টীকা সে সময়ে প্রামাণ্য, তবু পিতার আদেশে তিনি জ্যেষ্ঠতাত ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারের বংশবাটীস্থিত চতুষ্পাঠীতে ভর্তি হলেন।

গাজীপুরে অবস্থিত, ফ্ল্যাক্সম্যান-নির্মিত (১৮৪৩) এ-মূর্তিটি কি জগন্নাথের?

চতুর্দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে অশীতিপর পিতৃদেব এক সুলক্ষণা কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিলেন। অতঃপর ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন। পিতার মৃত্যু হল যখন, তখন তাঁর বয়স চব্বিশ বৎসর। তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি—যা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন—তা হল একটি পিতলের গাড়ু, একটি 'অমৃতি' জলপাত্র, অনধিক দশ বিঘা নিষ্কর ভূমি এবং একটি ভগ্ন কুটীর। নিজের মৃত্যুকালে তিনি অন্যূন এক লক্ষ টাকা নগদ, বার্ষিক চারি সহস্র তঙ্কা লাভের নিষ্কর ভূমি, তিন পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং তস্যপুত্রদের রেখে যান। জ্যেষ্ঠ পুত্র কালিদাস নিঃসন্তান, কিন্তু কনিষ্ঠপুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র ঘনশ্যাম সার্বভৌম ছিলেন অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন। স্বয়ং জগন্নাথ বলেছিলেন, 'বাগদেবীর কৃপায় আমি কিছু কিছু প্রসাদ পেয়েছি, কিন্তু ঘনশ্যাম যে প্রসাদ লাভ করেছে তা আমার সৌভাগ্যকেও অতিক্রম করে যায়।'

দুর্ভাগ্যবশতঃ জগন্নাথোত্তীর্ণ প্রতিভার সম্যক পরিচয় আমরা পাইনি। যৌবনকালেই তিনি ঘোর উন্মাদ হয়ে যান।

চতুষ্পাঠী থেকে 'তর্কপঞ্চানন' উপাধি লাভ করে জগন্নাথ নিজ ভদ্রাসনে একটি টোল খুলে বসেন। অনতিবিলম্বে তাঁর বুদ্ধি ও প্রতিভার যশ দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সৌভাগ্যলক্ষ্মী এই

সরস্বতীর বরপুত্রটিকে একই ভাবে আশীর্বাদ করলেন। ক্রমে তদানীন্তন বঙ্গদেশের প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে তর্কপঞ্চাননের বিশেষ হৃদ্যতা জন্মায়। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেববাহাদুর, নবাবের দেওয়ান মহারাজ নন্দকুমার, নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস, স্যার জন শোর প্রভৃতি। সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি হ্যারিংটন ছিলেন তাঁর বিশেষ বন্ধু। সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি অগাধবিদ্য স্যার উইলিয়ম জোন্‌স্ ছিলেন তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রায়ই স্যার জোন্‌স্ নৌকাযোগে সস্ত্রীক ত্রিবেণীঘাটে এসে ঐ ব্রাহ্মণটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। অন্যান্য সাহেবদের তুলনায় স্যার উইলিয়ম জোন্‌স্ যে তাঁর দিকে অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয়ে পড়বেন সেটাই স্বাভাবিক, কারণ স্যার জোন্‌স ছিলেন প্রাচ্য সংস্কৃতি-বিশারদ। ওদিকে গ্রীক, ল্যাটিন, গথিক, কেল্টিক থেকে শুরু করে ইংরাজী, ফরাসী পর্তুগীজ, জার্মান আবার এদিকে সংস্কৃত, আরবী, ফার্সি তাঁর আয়ত্তে। 'গ্রীস, ইটালী ও ভারতের দেবদেবী', 'হিন্দুরাজগণের কালক্রম', 'হিন্দু সঙ্গীত', 'জ্যোতিষ ও সাহিত্য', 'হিন্দু আয়ুর্বেদ' জাতীয় মনোগ্রাম লিখে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা তাঁর প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 'এশিয়াটিক রিসার্চেস্' পত্রিকায় একে একে প্রকাশ করেছেন। সেইসব বিষয়ে তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহমানসে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মতো মানুষের কাছে তাঁকে বারবার ছুটে যেতে হত। সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে স্যার জোন্‌স্ 'হিন্দু জাতির ইতিহাস ও সভ্যতা' সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়েছিলেন (1786) তার বহু তথ্যের সত্যাসত্য নির্ধারণে তাঁকে ঐ পণ্ডিতের কাছে আসতে হত। সুবলচন্দ্র মিত্র তাঁর অভিধানে লিখেছেন, "দেশে সে সময় ডাকাতির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হওয়ায় জগন্নাথ সেই ভয়ে সর্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন। এই ব্যাপারে অবগত হইয়া স্যার উইলিয়াম জোন্‌স্ নিজ ব্যয়ে কয়েকজন বন্দুকধারী প্রহরী জগন্নাথের বাটীতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।"

মিত্র মহাশয়ের অভিধানে যে তথ্যটা অনুল্লেখিত এবার তা তোমাদের জনান্তিকে জানাই। তথ্যটি আমি সংগ্রহ করেছি দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রামাণিক গ্রন্থ "বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান" থেকে—

স্যার জোন্‌স্ ঐ বন্দুকধারীর ব্যবস্থা করে দেন জগন্নাথের বাড়িতে ডাকাতি হওয়ার পরে। এই ডাকাতির জন্য জগন্নাথ নিজেই দায়ী! শোন তবে মজার কিস্‌সা:

স্যার উইলিয়াম জোন্‌স্-এর অনুরোধে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন দুইখানি দায়-সংক্রান্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। একটির নাম "অষ্টাদশ বিবাদের বিচার গ্রন্থ" অপরটির নাম "বিবাদ-ভঙ্গার্ণব"। এর সাহায্যে সে-সময় এ-দেশে বিচারপদ্ধতি পরিচালিত হত। নানা লোক নানান বিষয়ে বিধান নিতে তাঁর দ্বারস্থ হত। উপযুক্ত পারিশ্রমিক নিয়ে পণ্ডিতমশাই শাস্ত্রসম্মত নিদান হাঁকতেন। ঐ দুইখানি বিচার-বিভাগীয় গ্রন্থ রচনার পর তাঁর মক্কেলদের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেল। পণ্ডিতজীর বিধান পেলে আদালত কিছু করতে সাহস পাবে না, এটাই ছিল সকলের ধারণা। বিশেষ দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি হ্যারিংটন, এমনকি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার জোন্‌স্ও তাঁর বন্ধুস্থানীয়। বিচারের প্রয়োজনে ঐ পণ্ডিতকে দিয়ে গ্রন্থ লিখিয়ে নিচ্ছেন, মাসিক সাতশত টাকা সম্মানমূল্য দিয়ে (এ জন্য গ্রন্থ সমাপ্ত হবার পর মাসিক তিনশত টাকা পেন্সনও পেয়েছেন)।

একদিন পণ্ডিতমশায়ের কাছে এসে হাজির হল অপরিচিত একজন 'মক্কেল'। পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী সে-সময়ে ব্যারিস্টার-সাহেবের চেম্বারে রূপান্তরিত। 'জুনিয়ার'দের কাছে ঐ লোকটা তার নাম কিছুতেই জানাতে চাইছে না। বলছে, যা বলবার তা স্বয়ং পণ্ডিতমশাইকে বলবে জনান্তিকে। এমন আবদারও মেনে নেওয়া হল। বোধ করি আগন্তুক 'জুনিয়ার'দের যথাযোগ্য কাঞ্চনমূল্যের ব্যবস্থা ঠিক মতোই করেছিল।

নির্জন কক্ষে পণ্ডিতের সাক্ষাৎ পেল আগন্তুক।

জগন্নাথ তাকে বলতে গেলেন, কে বাবা তুমি? কী চাও?

বলা হল না। লোকটাকে দেখে মনে হল, 'কুরুক্ষেত্র' যাত্রার আয়োজন হলে আর সেই সাক্ষাৎপ্রার্থীকে ঘটোৎকচের ভূমিকাটি প্রদান করলে 'মেক-আপ্'-এর প্রয়োজন হবে না।

দশাসই জোয়ান লোকটি বিনয়ে বিগলিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললে, ছিচরণের দাসের নাম শ্যাম মল্লিক আজ্ঞে, বড় বিপদে পড়ি আপনার ছামুতে আস্যে পড়ছি ঠাউর। টুক চরণামৃৎ দে উদ্ধার করি দেন।

জগন্নাথের পরিবর্তে পণ্ডিতটি রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত হলে এবম্বিধ অনুরোধে নির্ঘাৎ ঠ্যাঙ-জোড়া সামনে বাড়িয়ে ধরে বলতেন, নাও বাবা। চরণধুলি নিয়ে বিদেয় হও। আমার অনেক কাজ বাকি।

জগন্নাথ তা বললেন না। তিনি তো শুধু বাগ্‌দেবীরই বরপুত্র নন। বুঝলেন, ঐ শ্যাম-ঘটোৎকচ বিপদে পড়ে ওঁর বিধান নিতে এসেছে। ওর 'অনুপপত্তি' অন্য জাতের।

বলেন, ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছিস্ মনে হচ্ছে? জামিন দিলে?

—তা দিছে! গোটা একটা আসরফি বেমক্কা খর্চা হই গেল, ঠাউর!

—তা আমার কাছে মরতে এসেছিস্ কেন?

—মর্তে নয়, ঠাউর। বাঁচতি। টুক বিধান দে মোরে বাঁচায়ে দ্যান, কর্তা।

বোঝ ব্যাপার! ব্যাটা ডাকাতি করতে গিয়ে ফেঁসেছে। এখন শাস্ত্রের বিধান চাইতে দৌড়ে এসেছে ত্রিবেণী। হাঁকিয়ে দেবেন ভাবছিলেন, তার পূর্বেই শ্যাম-ঘটোৎকচ ওঁর চরণমূলে নামিয়ে রাখল এক মুঠি সিক্কা টাকা।

কাঞ্চনমূল্যে সব কিছুই শোধন হয়ে যায়। জগন্নাথ মা লক্ষ্মীর ঐ রূপালী আশীর্বাদ-কয়টা তুলে নিয়ে বললেন, বইপত্র দেখে রাখব, কাল আসিস্।

লোকটা পেন্নাম করে প্রস্থান করল।

'ফী' নিয়েছেন। তঞ্চকতা করতে পারেন না। 'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব' থেকে দু-ছত্র নিদান লিখে দিলেন ভূর্জপত্রে। একটি মর্মান্তিক উদ্ধৃতি। সে 'অং-বং' নিদানের সবটা তোমরা বুঝবে না দিদি ভাই—কী বলে ভাল, আম্মো বুঝিনি—তবে দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয় বুঝেছিলেন। হুবহু মাছি-মারা কেরানির ভূমিকায় নেমে পড়া যাক:

> বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে, পার্শ্বিকদ্যূতচৌর্য্যাদিপ্রতিরূপসাহসৈঃ। ব্যাজেনাপার্জ্জিতং যচ্চ তৎ কৃষ্ণং সমুদাহৃতম্॥ ইতি বচনেন চৌর্য্যস্য স্বত্বজনকত্বম্। অতএব তচদ্‌রাস্য ঋণদানেঽপি চৌরস্য বৃদ্ধিলাভঃ এবং তদ্ধনেন পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানেন কিঞ্চিৎ ফলং ভবতি। পিতামহচরণাশ্চ চোরিতদ্রব্যে চৌরস্য স্বত্বং স্বীকুর্ব্বন্তি॥

সবটা না বুঝলেও কিছু কিছু বুঝেছি। অনুবাদ করতে সাহস হচ্ছে না। সে ক্ষেত্রে আমার বইটি আইনের প্যাঁচে বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবার আশঙ্কা। চুরি-ডাকাতির সহায়তা করছি বলে থানা থেকেও আমার নিমন্ত্রণ আসতে পারে। কিন্তু তত্ত্বটা বিচার করে দেখার। সাহসী ডাকাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, দুরন্ত বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও তার বৃত্তিতে অবিচল। ফলে 'চোরিতদ্রব্যে চৌরস্য স্বত্বং' স্বীকার করা যাবে না কেন?

মোটকথা তুমি-আমি না বুঝলেও বিচারপতি আধাআধি বুঝতে পারলেন তাঁর আদালতের সংস্কৃতভাষী পণ্ডিতদের সাহায্যে। বাকিটা বুঝলেন প্রশ্ন করে, টেল মি অন ওথ, ঐ নিদানের নিচে সিগ্‌নেচার জগরনাট পণ্ডিতের আছে? করেক্ট?

আদালতের পণ্ডিত ইতিবাচক গ্রীবাভঙ্গি করায় শ্যাম-ঘটোৎকচ বেকসুর খালাস পেয়ে গেল।

ভাবছ এটাই আমার কিস্‌সার ক্লাইম্যাক্স? না গো। কিস্‌সার আর কিছু বাকি আছে।

পরের সপ্তাহেই জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ভদ্রাসনে হল ডাকাতি। নগদ সিক্কা টাকা, সোনার অলঙ্কার, বাসনপত্র (সম্ভবত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গাড়ু ও অমৃতি জলপাত্র দুটি বাদে) ডাকাতেরা নিয়ে গেছে। পরিবর্তে রেখে গেছে একটি পত্র। ব্রজবুলিতে, দেবনাগরী হরফে। শ্যাম-ঘটোৎকচের ভাষায় অনূদিত করলে যার মর্মার্থ, 'ফালতু ঝ্যামেলা করেন না ঠাকুর-মোশা। আমার জেব্-এ জগু-পণ্ডিতের বেম্‌হাস্ত্র আছে! কোন শালা কোতোয়াল আমারে ছোঁবেনি; বুয়েছেন?'

সম্ভবত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তাঁর ভদ্রাসনে ডাকাতির পশ্চাদপটে এবম্বিধ আত্যন্তরির দুঃসংবাদটি স্যার জোন্‌সের গোচরে আনেননি।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বুদ্ধি, মেধা ও শ্রুতিধরপ্রতিম স্মৃতিশক্তির বিষয়ে নানান কাহিনী প্রচলিত। তার ভিতর একটি হয়তো শুনে থাকবে—সেই আদালতে সাক্ষী দেবার কিস্‌সাটা। সেটা সুবলচন্দ্রের জবানীতে পেশ করি, "একদিন ইনি ত্রিবেণীর বাঁধাঘাটে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেখানে একখানি বজরা আসিয়া উপস্থিত হইল। বজরা হইতে দুইজন গোরা তীরে অবতীর্ণ হইয়া তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া দিল। কথান্তর হইতে হইতে দুইজনে শেষে হাতাহাতি পর্যন্ত হইয়া গেল। জগন্নাথ আহ্নিক করিতে করিতে তাহাদিগের ঝগড়া আদ্যোপান্ত শুনিলেন। অতঃপর সাহেবদ্বয় পরস্পরের নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিল। বিচারপতি জানিতে পারিলেন, সে সময়ে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ঘাটে আহ্নিক করিতেছিলেন। বিচারপতি কর্তৃক আহূত ও সাহেবদ্বয়ের বিবাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া তর্কপঞ্চানন বলিলেন, 'উহারা মারামারি করিয়াছে দেখিয়াছি। দুইজনের বচসাও শুনিয়াছি, কিন্তু ইংরেজী জানি না বলিয়া উহাদের কথার অর্থ বুঝিতে পারি নাই, তবে কে কী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিল, অবিকল বলিতে পারি।' এই বলিয়া যে যাহাকে বলিয়াছিল, যথাক্রমে সমুদায় অবিকল বলিলেন। ইঁহার এতাদৃশী স্মৃতিশক্তি অতি প্রাচীনকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। কালিদাসের সংস্কৃত অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ ইঁহার আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ ছিল।"

কোন প্রামাণিক গ্রন্থে আমি এই কাহিনীর সমর্থন পাইনি। অথচ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের

প্রসঙ্গে সুশিক্ষিত যাঁর সঙ্গেই আলোচনা করেছি, লক্ষ্য করে দেখেছি, এ কাহিনীটি তাঁর জানা। যেন এটিই জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ খণ্ডকাহিনীটি আদৌ বিশ্বাস করি না। জানি দিদিভাই, এবার তুমি আমাকে প্রশ্ন করবে, বিশ্বাস যদি না-ই করেন তাহলে অতবড় উদ্ধৃতিটা না লিখে আপনার হাত আর আমাদের চোখকে নিষ্কৃতি দিলেন না কেন? দিইনি অন্য একটি হেতুতে। বলি, শোন:

এটা বঙ্গ-সংস্কৃতির অধোগমনের একটি উদাহরণ। এই অতিভঙ্গ বঙ্গদেশে অনেক অনেক মনীষী এসেছেন, অনেক কথা বলে গেছেন। তুমি-আমি তার সারাংশ বর্জন করে ভূষিমাল নিয়ে বাহবা দিই। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ থাকা কোন বাহাদুরী নয়। আমার ভগ্নিপতি ত্রিপুরারী চক্রবর্তী মশায়ের কণ্ঠস্থ ছিল আদ্যন্ত সংস্কৃত মহাভারত। গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনে দশ-পনের বছর ধরে তিনি প্রতি সপ্তাহে মহাভারত পাঠ করেছেন—তোমরা তাঁকে দেখনি, দাদু-দিদারা দেখেছেন, শুনেছেন—তাঁদের জিজ্ঞেস্ কর, কোনদিন বক্তৃতামঞ্চে তাঁর হাতের কাছে 'মহাভারত' গ্রন্থটি থাকত না। চক্রবর্তী-মশাইকে আমি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তার হেতু এ নয় যে, অষ্টাদশপর্ব মহাভারত তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল।

ভেবে দেখ, সুবল মিত্র মশায়ের কাহিনীটি যদি আমরা 'হোল ট্রুথ অ্যান্ড নাথিং বাট দ্য ট্রুথ' বলে স্বীকার করে নিই তাহলে সেই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষকে আমরা কোন নরকে নামিয়ে নিয়ে আসি। পাতা উল্টে এ বইয়ের ১৩৬ পৃষ্ঠাটি আর একবার দেখবে দিদিভাই? কী প্রভেদ তাহলে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সঙ্গে দুর্গা-খুড়োর? দুজনেই আঙুলে পৈতে জড়িয়ে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে করতে কান-জোড়াকে সজাগ রাখেন—কে কী বলছে? একজন পট্টবস্ত্র পরিধান করে পূজা ঘরে যন্ত্রচালিতের মতো অং-বং করছেন, আর জন সর্বাঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকা মেখে গঙ্গাজলে আবক্ষ নিমজ্জিত করে জপ করার ঢং করছেন। 'যথা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানিব সর্ব্বশঃ'[১] নির্দেশনা কেউই মানছেন না। রবিশঙ্করের সেতার অথবা জর্জদার রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে শুনতে, সাহিত্য-রচনা বা তার রসাস্বাদন করতে করতে তুমি-আমি যেভাবে তন্ময় হয়ে যাই, বাহ্যজ্ঞানশূন্য একাগ্রতায় তন্নিষ্ঠ হয়ে যাই, তর্কপঞ্চানন সেটুকুও হতে পারতেন না? এ কি বিশ্বাস্য?

কিন্তু না! ভারতীয় সাধকদের এভাবেই বিচার করা হয়। কে কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে মরা বাঁচিয়েছেন, অন্ধের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন, অপুত্রের পুত্র আর নির্ধনকে ধনদান করেছেন এই সব আষাঢ়ে গপ্পোই আমাদের অভিভূত করে। তাঁদের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে ভুলে যাই আমরা। তাঁদের বিভূতিতেই অভিভূত হই, তাঁদের বাণী ও নির্দেশ হয়ে যায় ঝরাপাতার চেয়েও ঝরা।

সরস্বতী ও লক্ষ্মীর আশীর্বাদ তুল্যমূল্যভাবে লাভ করা কোন অপরাধ নয়। বুনো রামনাথ শুধু পণ্ডিত ছিলেন না, ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী, সাধক। তর্কপঞ্চানন পণ্ডিত, বিদ্বান তথা বিষয়ী। সংসদ 'বাঙ্গালী চরিতাভিধানে' যে-কথা বলা হয়েছে—'দীর্ঘজীবী এই পণ্ডিত একক প্রচেষ্টায় সংস্কৃতচর্চায় নবদ্বীপের খ্যাতি প্রায় নিষ্প্রভ করে তোলেন'—সেটাই কি কম কৃতিত্ব?

(১) কূর্ম যেমনভাবে তার হাত-পা দেহের ভিতর টেনে নেয় সেইভাবে ধ্যানরত যোগী তাঁর যাবতীয় ইন্দ্রিয়কে সংহত করে ধ্যানস্থ থাকেন। —গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়।

অথবা স্বয়ং রাজা রামমোহনের মূল্যায়ন "Jagannath was universally acknowledged to be the first literary of his day and his authority has as much weight as that of Raghunandana."[১]

কথোপকথনে, বাকপ্রয়োগের চাতুর্যে তাঁর রসিকমনের পরিচয়।

একবার নবদ্বীপের একজন পণ্ডিত কথাপ্রসঙ্গে এক পণ্ডিতসভায় বলেছিলেন, সরস্বতী সারাদিনের মধ্যে অন্তত একবার নবদ্বীপে অধিষ্ঠিত হতে বাধ্য হন—কোন না কোন পণ্ডিতের ভদ্রাসনে—

ইঙ্গিতটি পরিষ্কার। নবদ্বীপে অসংখ্য পণ্ডিত, ত্রিবেণীতে একমেবাদ্বিতীয়ম্। সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নবদ্বীপই শ্রেষ্ঠ।

জগন্নাথ তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তরে বলে ওঠেন, ওখানেই নবদ্বীপের সঙ্গে ত্রিবেণীর পার্থক্য। ত্রিবেণীতে সরস্বতী দিবারাত্র অধিষ্ঠান করেন।

চমকে উঠলেন সভাস্থ সবাই! এ কী দম্ভ! আত্মপ্রশংসা না আত্মহত্যার সমতুল্য? তর্কপঞ্চানন এ কী বললেন? এতদূর স্পর্ধা! স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্য পর্যন্ত অনুরূপ অবস্থায় বলেছিলেন, 'ব্রহ্মিষ্ঠের পদে শতকোটি নমস্কার', আর এ লোকটা···

জগন্নাথ ওঁদের বিস্ময়বিমূঢ় ভাব দেখে অট্টহাস্য করে ওঠেন। বলেন, কী আশ্চর্য! বুঝলেন না? এটা 'শ্লেষ' অলঙ্কার! ত্রিবেণীতে সরস্বতী-নাম্নী নদী নিত্য প্রবহমানা। নয় কি?

পণ্ডিত তথা বিদ্বৎসমাজে জগন্নাথের প্রভাব কী আকাশচুম্বী ছিল সেকথা বোঝাতে আর একটি কৌতুককর কাহিনী শোনাই।

রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে অযুত-নিযুত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করেছেন। জনৈক পণ্ডিত সেই তালিকায় নিজের নামটি দেখতে না পেয়ে মর্মাহত হলেন। শুধু ভালমতো পণ্ডিত বিদায়টুকুই নয়, এ নিমন্ত্রণ-তালিকায় নাম-না-থাকার অর্থ পণ্ডিতসমাজে এক ধাপ নিচে নেমে যাওয়া। পণ্ডিত এসে মুরুব্বি পাকড়াও করলেন উপস্থিত-কবি কবিচন্দ্রকে। বললেন, আপনি অনুগ্রহ করে একবার ত্রিবেণীর তর্কপঞ্চানন ঠাকুরকে অনুরোধ করুন। তিনি নির্দেশ দিলেই আমার নামটি তালিকাভুক্ত হয়ে যাবে।

কবিচন্দ্র বললেন, তাতে আর সন্দেহ কী? কিন্তু জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নিজেই একজন আমন্ত্রিত, রাজা-বাহাদুরকে এ জাতীয় অনুরোধ করা কি তাঁর পক্ষে শোভন? আপনি বরং চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নকে ধরুন।

চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন হচ্ছেন মহাকবি বাণেশ্বরের পৌত্র, আমাদের এই খণ্ড-কাহিনীর কালে তিনি রাজা নবকৃষ্ণের সভাপণ্ডিত।

উপেক্ষিত পণ্ডিত বলেন, শুনেছি তালিকাটি চূড়ান্তভাবে রাজাবাহাদুরের অনুমোদন লাভ করেছে। এত বিলম্বে চতুর্ভুজের এ ব্যাপারে আর হাত নেই।

উপস্থিত-কবি কবিচন্দ্র তখন বলেন, 'চতুর্ভুজে ভুজো নাস্তি নির্ভুজং কিং করিষ্যতি?'[২]

এই ক্ষণজন্মা পুরুষটির দৈহিক বর্ণনা সমকালীন প্রত্যক্ষদর্শীরা যেভাবে দিয়েছেন তাতে

(১) 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ 731.

(২) চতুর্ভুজ চার হাতে যার নাগাল পেলেন না ঠুঁটো জগন্নাথ তা কেমন করে পাবেন?

নিম্নোক্ত বিশেষণ তাঁর প্রতি প্রযোজ্য—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, প্রিয়দর্শন, লোমশ, দীর্ঘ ভুজদ্বয়, উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত ললাট, মুণ্ডিত মস্তক, দীর্ঘ অর্কফলা।

গৌতম বুদ্ধদেবের সমকালে কোনও ভাস্কর তাঁর মূর্তি গড়েনি। শরদিন্দুর 'চন্দনমূর্তি' সাহিত্যসত্য মাত্র। সৌভাগ্যক্রমে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের প্রায় সমকালে একজন প্রখ্যাত ভাস্কর তাঁর একটি মূর্তি গড়েছিলেন। তথ্যটি সংগ্রহ করেছি একটি প্রাচীন সূত্র[১] থেকে। লর্ড কর্নওয়ালিসের মৃত্যু হয় 1805 খ্রীষ্টাব্দে, যুক্তপ্রদেশের গাজীপুরে। সেখানে তাঁর একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই মর্মরমূর্তির পাদদেশে একজন মুসলমান গাজী এবং একজন হিন্দু পণ্ডিতের মূর্তি উৎকীর্ণ করার আদেশ দেওয়া হল ভাস্করকে। ভাস্করের নাম: ফ্ল্যাক্সম্যান। তিনি হিন্দুপণ্ডিতের মূর্তির মডেল হিসাবে নির্বাচন করেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে। মূর্তিটি গাজীপুরে গেলে দেখতে পাবে। সে সুযোগ না হলে আপাতত আমার এই পিটুলি-গোলাতেই তৃপ্ত হতে হবে।

তাই বা কেন? চলে যাও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। দক্ষিণ প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকে বাঁ-হাতি—গঙ্গার দিকে দেখতে পাবে উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক-এর একটি মর্মরমূর্তি। তার পাদদেশে সতীদাহের একটি অতি অনবদ্য ভাস্কর্য—অর্ধোৎকীর্ণ, অর্থাৎ 'অলটো-রিলিভো'। আমার ব্যক্তিগত অভিমত, 'সতীদাহ' বিষয়ে সেটি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিল্প-নিদর্শন। যদি কলকাতার বাসিন্দা হও এবং শিল্পবিষয়ে উৎসাহ থাকে তবে সেটি না-দেখা একটা অপরাধ। যখন দেখতে যাবে তখন এ বইটি নিয়ে যেও। আমার অক্ষম স্কেচ-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মূর্তিটি!

সতীদাহের নিষ্ঠুর নির্দেশ প্রত্যাহার করতে পারছেন না বলে সেই পণ্ডিত কী নিদারুণ মর্মপীড়ায় ভুগছেন!

অনবদ্য ভাস্কর্য!

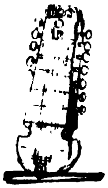

কুমারহট্ট

গঙ্গার ওপারে, কাঞ্চনপল্লীর দক্ষিণে কুমারহট্ট। ইদানীং নাম হয়েছে: হালিশহর। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গলে' (রচনাকাল আঃ 1598-1606) হালিশহর নামটি আছে। অর্থাৎ আকবরের জমানাতেই নামটি প্রচলিত। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব যে গ্রামের ধূলিমুষ্টি তাঁর উত্তরীয়প্রান্তে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলেন, বৈষ্ণব সাহিত্যে দেখছি তার নাম: কুমারহট্ট।

অবাক হয়ে যাচ্ছ, তাই নয়? যে প্রেমের ঠাকুরের চরণধূলি লাভের জন্য পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মহারাজ প্রতাপরুদ্র থেকে জ্ঞানসাগর বাসুদেব সার্বভৌম পর্যন্ত লালায়িত, তিনি কেন হঠাৎ এ গাঁয়ের একমুঠি ধূলি কুড়িয়ে নেবেন? কারণ আছে।

হালিশহরে যদি যাও তাহলে জিজ্ঞেস্ কর: 'হ্যাঁ গো, চৈতন্য ডোবাটা কোন বাগে?'

---

(১) Fisher : N. W P.Gazetteer– Gazipur, 1883, pp 12-3.

কুমারহট্ট

না, না, রিকশা-আলা বা ডেলি-প্যাসেঞ্জার নয়, তারা কিছু জানে না—ঐ যে পড়ো দাওয়ায় তিন-মাথাওয়ালা থুত্থুরে বুড়োটা বসে বসে কাশছে—নাকে রসকলি, গলায় কণ্ঠী, ওরে শুধিয়ে দেখ। শুক্‌নো আম্‌সির মতো আঙুলটা তুলে লোকটা বলবে: ঐ হোথা।

পুরাতন পুষ্করিণী। বাস্তবে ডোবা। সর্বাঙ্গে কচুরিপানার নামাবলী। সেটা আছে তো? প্রভু নিত্যানন্দই জানেন! অন্তত আমাদের বাল্যকালে ছিল। এখন হয়তো ডোবাটার বিক্রি-কোবালা হয়ে গেছে। ডোবা ভরিয়ে, পিন পুঁতে, কেউ নয়া-মোকাম বানিয়েছে। সেকালে একটা মঠ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের কথা শুনেছিলাম, মনে হচ্ছে মঠে গৌর-নিতাই-এর যুগল-মূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও ছিল। সেটা বাস্তবায়িত হয়েছিল কিনা জানা হয়নি। হালিশহরবাসী কোন পাঠিকা-পাঠক যদি, গোবিন্দের ইচ্ছেয়, আমাকে জানান, কৃতার্থ হব।

ঐ ডোবাটা পড়েছিল একটা খড়ো-ঘরের চরণ আঁকড়ে। সেই পর্ণকুটীরে এককালে বাস করতেন মহাত্মা ঈশ্বর পুরী। শ্রীচৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু। আর তাতেই ঐ উত্তরীয়প্রান্তে পদরেণু-সংগ্রহের আকৃতি!

শ্রীচৈতন্যের আশীর্বাদধন্য শ্রীবাস পণ্ডিতের ভদ্রাসনও এই কুমারহট্টে।

আরও তিনজন ভক্ত কীর্তনীয়ার নাম সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি: বাসুদেব ঘোষ আর তাঁর দুই ভ্রাতা—মাধব ও গোবিন্দানন্দ।

আমাদের কাহিনীর কালে—অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে—হালিশহরবাসী দুই প্রখ্যাত ব্যক্তি—রামপ্রসাদ সেন ও আজু গোঁসাই। দুজনেই পদকর্তা, একজন শ্যামাভক্ত, একজন শ্যামভক্ত! মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রায়ই হালিশহরের অস্থায়ী আবাসে এসে দুই পাগলকে নাচিয়ে মজা দেখতেন—'চাপান-উতোরের' গান শুনতেন।

রামপ্রসাদ সেন (আঃ 1720-81):

গল্পটা শুরু করি খিদিরপুরের গোকুলচন্দ্র ঘোষাল-মশায়ের দফতরখানায়।

কী বললে? 'গোকুল ঘোষাল, না দুর্গা মিত্তির?

এই তোমাদের দোষ! গপ্পো শুনতে চেয়েছ, শোন না বাপু। সব কথায় টিক্‌টিক্ করা কেন? ক্রমাগত খালি 'দক্ষিণরায়? দক্ষিণরায়?'

বেশ, ফস্ করে যখন প্রশ্নটা পেশ করেই বসেছ তখন বলি—

ঈশ্বর গুপ্তের মতে (সংবাদ প্রভাকর, ১২৬০ বঃ) ঘটনাটা ঘটে খিদিরপুরের গোকুল ঘোষাল অথবা কলকাতার দুর্গাচরণ মিত্রের ভদ্রাসনে। হরিমোহন সেনের বিশ্বাস (বিবিধার্থ সংগ্রহ, ১৭৭৩ শক, ফাল্গুন) ঘটনাটা কৃষ্ণনগরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দফতরখানায়। আবার কেউ কেউ বলেন, ঘটনাস্থল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ঠিকেদার কেষ্টমল্লিকের ডেরা। অন্য এক মতে: চুঁচুড়ায় শীলেদের বাড়ি। তা সঠিক তথ্য জানতে হলে আমার কাছে কেন বাপু? অসিত বাঁড়ুজ্জে-মশায়ের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' ঘাঁটতে থাক। তথ্যের লক্ষ্মণগণ্ডীর তো চারটি চৌহদ্দী—ধনাঢ্যব্যক্তি যেই হন তিনি ছিলেন সহৃদয়, গুণগ্রাহী, ঈশ্বরভক্ত আর সমঝদার। নাম

যাই হোক না, দেখ, আমি সেই লক্ষ্মণের গণ্ডীর বাইরে পা দেব না।

যাক, যে-কথা বলছিলাম :

হরিহর আঢ্য-মশাই দফতরে এসেই সুসংবাদটি পেলেন—জীবন কুণ্ডু ফৌত হয়েছে। সুসংবাদ, তা বলে প্রকাশ্যে তো উৎফুল্ল হতে পারেন না। জিহ্বা ও তালু সহযোগে একটা শব্দ করলেন—শুনতে মনে হল 'স্তু-স্তু'। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, জীবন কুণ্ডুও তাহলে দুনিয়ার মায়া কাটালো। আহা, ভালই গেছে। বহুদিন ভুগছিল।

আঢ্য-মশাই হচ্ছেন গোকুল ঘোষালের তহবিলদার, আজকাল তোমরা যাকে বল 'কেশিয়ার'। নগদ লেনদেনটা তাঁর হাত দিয়ে। তাতেই দু-কপর্দক আটকে যায় আঙুলের ফাঁকে। জীবন কুণ্ডু ছিল তাঁর অধীনে মুহুরী। মাস-তিনেক সান্নিপাতিক জ্বরে ভুগছিল। বড়ই অসুবিধা চলছিল এ কয়মাস। শুধু নগদ জমা নয়, তার হিসাবও রাখতে হচ্ছিল ওঁকেই। ইতিমধ্যে বার-কয়েক নায়েব শ্রীহরি গাঙ্গুলীর কাছে দরবার করেছেন ; কিন্তু গাঙ্গুলী-মশাই সম্মত হননি। লোকটাকে তো অসুখে-ভোগার অপরাধে বরখাস্ত করা যায় না। হরি আঢ্যের গরজটা অন্যজাতের। বৃদ্ধ বয়সে তৃতীয়পক্ষ করেছেন, নববধূর দাদা বেকার বসে আসে। বালিকাবধূর কাছে তিনি প্রতিশ্রুত, তার একটা হিল্লে করে দেবেন। এতদিনে সেই পথের কাঁটাটা দূর হয়েছে। কিন্তু আজই নায়েব-মশায়ের কাছে আবার প্রস্তাবটা তোলা কি ভাল দেখাবে? মৃত্যু-সংবাদ মাত্র আজই এসেছে। তা বলে দেরী করাও সুবুদ্ধির হবে না। দফতরের সব কটা হাড়-হাবাতে মুকিয়ে আছে—কারও ছেলে, কারও ভাইপো-ভাগ্‌নে। ইতস্তত করতে করতেই ডাক এসে গেল। কালী পেয়াদা এসে সসম্ভ্রম নমস্কার করে বললে, নায়েব-মশাই সেলাম দিয়েছেন।

'সেলাম দেওয়া' একটা দফ্‌তরী লব্‌জ—সৌজন্যব্যঞ্জক। আসলে 'তলব করেছেন'। আঢ্য-মশাই কাছাটা ঠিকমতো সেঁটে নিয়ে নায়েব-মশায়ের দফ্‌তরের দিকে এগিয়ে গেলেন। ঘরে ঢুকে যুক্তকরে নমস্কার করে বলেন, ডাকছিলেন?

—হ্যাঁ, বসুন, কথা আছে।

নায়েব-মশাই কোনদিন ওঁকে বসতে বলেন না। এই পরম সৌভাগ্যলাভে একটু হকচকিয়ে যান। বসে পড়েন চৌকির একান্তে। নায়েব-মশাই বলেন, শুনেছেন নিশ্চয়, জীবন কুণ্ডু ফৌত হয়েছে। আপনার এ কয় মাস খুবই আতান্তরি যাচ্ছিল। আপনি বার-তিনেক তাগাদাও দিয়ে রেখেছেন। যা হোক, আপনার আর অসুবিধা নেই। বড়কর্তাকে বলে ব্যবস্থা করে ফেলেছি। এই ছোকরা আপনার নতুন মুহুরী। কী নাম যেন তোমার?

এতক্ষণে নজর হল দেওয়াল-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটি শ্যামবর্ণ কিশোর।

এগিয়ে এসে যুক্তকরে আঢ্য-মশাইকে নমস্কার করে বললে, শ্রীরামপ্রসাদ আজ্ঞে, ঠাকুরের নাম রামরাম সেন। নিবাস নদীয়ার কুমারহট্ট, ইদানীং লোকে বলে—হালিশহর।

হরিহর ওকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে নায়েব-মশাইকে বলেন, এ কি পারবে? এর তো গোঁফই ওঠেনি এখনো।

নায়েব-মশাই তাঁর মোম-দিয়ে-পাকানো সূচালো গোঁফের প্রান্ত চুমড়িয়ে বললেন, মুহুরির পক্ষে গোঁফটা তো আবশ্যিক অনুসঙ্গ নয়, আঢ্যি-মশাই। আর গোঁফ-জোড়াও তো অনিত্য

বস্তু। গজালেও কি তা সকলের বরাতে টেকে?

নিদারুণ লজ্জা পেলেন হরিহর। দুরন্ত ক্রোধও হল। রাগটা গিয়ে পড়ল ঐ ছোকরার উপর। এর পশ্চাতে একটি করুণ ইতিহাস ছিল! আঢ্যি-মশায়ের আকৈশোরের পুরুষ্টু কাঁচাপাকা গোঁফ-জোড়া অন্তর্হিত হয়েছিল তৃতীয় পক্ষ করার পরে। ভিতরের কথাটা অবশ্য কেউ জানে না—বালিকাবধূর সুড়সুড়ি লাগার গোপনবার্তাটা; কিন্তু তৃতীয়পক্ষ করা আর তার এক সপ্তাহের ভিতর গুম্ফমুণ্ডন ব্যাপারটাকে দফতরের ঐ 'সুবুদ্ধির-পো'গুলো ঠিক কাকতালীয় ঘটনা বলেও মেনে নেয়নি। হরিহর সামলে নিয়ে বলেন, তা নয়, ইয়ে হয়েছে, হিসাবপত্রের ব্যাপার! লেখাপড়া কদ্দূর?

শেষ প্রশ্নটা ঐ ছোকরাকে। কিন্তু জবাব দিলেন নায়েব-মশাই স্বয়ং, বাঙলা, হিন্দি, সংস্কৃতই শুধু নয়, ও ফার্সিও শিখেছে।

বোঝ কাণ্ড। ছোকরা কটা ভাষা শিখেছে তা পর্যন্ত জানা, অথচ নায়েব মশাই সিক্ত-মার্জারের ভূমিকায় মুখপাত করেছিলেন, 'কী নাম যেন হে তোমার?' হরিহর বুঝতে পারেন, নায়েবমশাই-এর শ্যালক না হলেও, ছোকরা তাঁরই সুপারিশে জীবন কুণ্ডুর চিতা নেবার আগেই টুলটা দখল করেছে। বেজার হয়ে বলেন, ভাষা নিয়ে কি ধুয়ে খাব? আঁক-টাঁক জানে তো? গাঁয়ের ছেলে, কলকাতার পথঘাটই হয় তো চেনে না।

নায়েব বলেন, আপনার হেপাজতে দিচ্ছি। শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবেন। ও তো আর ডাকহরকরার কাজ করবে না। পথঘাট বেশি না চেনাই ভাল। এ হল গিয়ে শহর কলকাতা!

আঢ্যি-মশায়ের পিছন-পিছন ছোকরা দফ্তরখানায় এল। জীবন কুণ্ডুর টুলটায় গিয়ে বসল। দফতরের সব কটা চোখ এখন তার দিকে। বুঝতে আর কারও বাকি নেই। শিরোমণিমশাই বলেন, এ-ছোকরাই বুঝি কুণ্ডু-মশায়ের পদে বহাল হল?

শিরোমণি ঘোষাল-বাড়ির নিত্যপূজা করে যান। পূজান্তে ক্যাশবাক্সে কিছু ফুল বেলপাতা ফেলে যাওয়া তাঁর নিত্যকর্মপদ্ধতি। সে-কাজেই এসেছিলেন দপ্তরে। বাহুল্য বোধে আঢ্য-মশাই জবাব দিলেন না। শিরোমণি কাঠের ক্যাশবাক্সে রক্তচন্দনের ফোঁটা দিয়ে, আঢ্য-মশায়ের মাথায় শান্তির জল ছিটিয়ে এগিয়ে এলেন ছেলেটির দিকে। বললেন, আজ তোমার শুভ কর্মারম্ভ। তোমার কপালেও একটা ফোঁটা দিয়ে যাই। এই নাও।

রামপ্রসাদ লজ্জা পেল। মাথা নিচু করে যুক্ত-করে দাঁড়িয়ে রইল। শিরোমণি সহাস্যে বললেন, আঁক-টাক জান তো, বাবা? বল তো, সাত আর পাঁচে কত হয়?

রামপ্রসাদ বুদ্ধিমান। বোঝে, এটা নিতান্তই কৌতুক। সতের বছরের ছেলেকে কেউ এ-জাতীয় অঙ্ক কষতে দেয় না। তাই সহাস্যে বললে, আপনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, মায়ের পূজারী। এসব আঁকের সাতে-পাঁচে তো আপনার জড়িয়ে পড়ার কথা নয়, ঠাকুরমশাই।

শিরোমণি উৎফুল্ল, বাঃ বাঃ। 'সাত-পাঁচ' শব্দটার উপর শ্লেষটা তো বড় জবর ছেড়েছ হে! বলি পদ্য-টদ্য লেখ না কি?

কিশোরের উজ্জ্বল চোখজোড়া উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। মাথা নিচু করে সলজ্জে বলে, আজ্ঞে পদ্য নয়, গান! মায়ের নামে!

—মায়ের নামে গান! সে আবার কী? কেত্তনের ঢঙে?

1337

—আজ্ঞে না। এ গান অন্য সুরে…

কথাটা শেষ হল না আদ্যের ধমকে। তিনি শিরোমণিকে বলেন, আপনি এবার আসুন ঠাকুর মশাই! জাবদা-খাতার অনেক কাজ বাকি।

শিরোমণি রাগ করলেন না। প্রশান্ত হেসে ছেলেটিকেই পুনরায় প্রশ্ন করেন, তা বাবা মায়ের নামে গান লেখার দিকে ঝোঁক, তুমি এই আঁকের সাতে-পাঁচে জড়িয়ে পড়লে কেন?

রামপ্রসাদ ঐ শিরোমণিকে ইতিমধ্যে ভালবেসে ফেলেছে। হেসে স্বরচিত গানের দুটি কলি শুনিয়ে দিল। সুর দিয়ে গাইতে সাহস হল না, আবৃত্তি:

"সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।।"

শিরোমণি ভাবুক প্রকৃতির মানুষ। স্থান-কাল-পাত্র এবং স্পর্শদোষের কথা বিস্মৃত হয়ে ঐ কিশোরটিকে বুকে টেনে নিলেন।

আদ্য-মশাই একটা স্বগতোক্তি করলেন, এ তো ভ্যালা ঝামেলা হল!

রামরাম সেনের ছিল দুইটি বিবাহ। প্রথম পক্ষের একমাত্র সন্তান নিধিরাম। দ্বিতীয় পক্ষের তৃতীয় সন্তান রামপ্রসাদ। জাতে বৈদ্য। মধ্যবিত্ত নয়, নিম্নবিত্তের সংসারী মানুষ। বিঘেকয়েক নিষ্কর ভূমি ছিল, সম্বৎসরের চাউল উৎপন্ন হত তাতেই। এ ছাড়া ছিল পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত এক কালীমূর্তি—দেবী শঙ্করী। তাঁর প্রণামীও কিছু জুটত। চারপুত্র, তিনটি কন্যা, দুই গৃহিণী একটি গাইগরু—সংসার চলাই দায়। জ্যেষ্ঠপুত্র মায়ের পূজার ব্যবস্থাপনা করত। জমিজমাও দেখা-শোনা করত রামের দুই সহোদর দাদা। রামরাম কনিষ্ঠ পুত্রটিকে কৃতবিদ্য করতে চেয়েছিলেন। ভর্তি করে দিয়েছিলেন চতুষ্পাঠীতে। ফার্সিও শেখাতে শুরু করেন। বাসনা ছিল ঐ কনিষ্ঠ পুত্র রামপ্রসাদ কোনও জমিদারী সেরেস্তায় কর্মসংস্থান করে নেবে। দুর্ভাগ্যবশত সে-কাজ সম্পূর্ণ হল না। তার পূর্বেই ওপারের ডাক এসে গেল। নিধিরাম বাধ্য হয়ে বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে টোল থেকে ছাড়িয়ে আনলেন। তাকে পাঠিয়ে দিলেন শহর কলকাতায়। রামপ্রসাদের মাতুল—তাঁর নামটা জানা যায় না—জোড়াসাঁকোর কাছে দয়েহাটায় বসবাস করতেন। ঐ মামার সঙ্গে চেনাজানা ছিল ঘোষাল-মশায়ের নায়েব শ্রীহরি গাঙ্গুলীর। এই সূত্রেই ঐ চাকুরি-লাভ।

রামপ্রসাদ বাল্যকাল থেকেই ভাবুক প্রকৃতির। কবি-কবি ভাব। স্বভাবভক্তও বটে। সমবয়সী বালকদের সঙ্গে হুটোপুটি করার পরিবর্তে দেখা যেত সে ঐ দেবী শঙ্করী মন্দিরে চুপচাপ বসে আছে! একটু বড় হয়ে সে মা-কালীর সঙ্গে বিড়বিড় করে কথা বলত। লোকজন দেখলেই সলজ্জে চুপ করে যেত। এমন ভাবুক প্রকৃতির মানুষটিকে সংসারের প্যাঁচে এসে যোগদান করতে হল বৈষয়িক ভূস্বামীর দফতরে। সাত-পাঁচের বন্ধনে পড়ল জড়িয়ে।

ভূস্বামী বৈষয়িক হলেও গোকুল ঘোষাল পাষণ্ড ছিলেন না। তিনিও শ্যামাভক্ত। স্বগৃহে প্রতিষ্ঠা করেছেন তারা-মায়ের মূর্তি। ব্রাহ্মণ সন্তান—দৈনিক কয়েক ঘণ্টা ঐ মন্দিরে কাটিয়ে যেতেন। ধ্যান করতেন। সেকালের ভূস্বামীদের যেসব দোষ প্রত্যাশিত, তার কিছু ছিল, কিছু

ছিল না। মদ্যপান করতেন, বাইজীর গানও শুনতেন—বস্তুত গানবাজনার দিকে তাঁর দারুণ ঝোঁক; কিন্তু ম-কারান্ত মারাত্মক কু-অভ্যাসটি ছিল না। দুই পত্নীতেই সন্তুষ্ট, উপপত্নীর বালাই নেই। নিজেও সঙ্গীতজ্ঞ। মাহিনা-করা ওস্তাদ ছিল তাঁর।

রামপ্রসাদ অবশ্য তাঁকে চোখেও দেখেনি কোনদিন।

আঢ্য-মশাই দিনদিনই কেমন যেন সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ছেন। ঐ ছোকরা ঠিক স্বাভাবিক নয়। কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করে না। টুলে বসে নিরন্তর জাবদা-খাতায় যোগ অঙ্ক করে যায়। আর কাজ না থাকলে আপন মনে কী-যেন বিড়বিড় করে। লুকিয়ে লুকিয়ে কাগজে কী সব গোপন পত্র লেখে। কেউ নজর করছে দেখলেই লুকিয়ে ফেলে।

তুমি-আমি এক্ষেত্রে যে-জাতের সন্দেহ করতাম হরিহরের মনে সে জাতীয় প্রশ্ন আদৌ জাগল না। হেতু—কালের দোষ। স্থান: শহর কলকাতা, পাত্র: সতের বছরের উঠতি জোয়ান: কিন্তু কালটা যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। তখন ছোকরার দল না লিখত প্রেমের কবিতা, না প্রেমপত্র। বাংলা ভাষাটা তখনো কবিতা লেখার মতো পোক্ত নয়, আর প্রেমপত্র পাঠ করার পাঠিকা কোথায় সেই 'সেইতর-সময়ে'? শহর কলকাতায় হাজার-করা একটি যুবতীরও অক্ষরজ্ঞান নেই; গোটা গৌড়মণ্ডলে লাখে একজন আছে কিনা সন্দেহ!

অক্ষর-পরিচয় আর অকালবৈধব্য যে পরস্পরের হাতে রাখী বেঁধেছে।

তাহলে ও ছোকরা কী লেখে লুকিয়ে লুকিয়ে?

আরও একটা কথা। দফতরে ছুটি হয়ে যাবার পর রোজ সাঁঝের ঝোঁকে ও ছোকরা খাল ধারের দিকে কোথায় যায়? 'খাল' বলতে 'মারহাট্টা ডিচ'। ইংরেজ বেনিয়ার দল গোটা কলকাতা শহরকে বেষ্টন করে খুঁড়েছে ঐ খাল—বর্গী-আক্রমণ ঠেকাতে। ঘোষাল-মশায়ের ভদ্রাসনটা যেখানে ছিল, বর্তমানে তার নাম ধর্মতলা। তার পুবে ঐ খাল। সেখানে ভদ্রপল্লী নেই—বস্তুত মনুষ্যবাসই নেই। সেটা শেয়াল আর শকুনের রাজত্ব। আছে একটা শ্মশান—খালের কিনার ঘেঁষে। ভদ্রলোকের নয়, ছোট জাতের—ঐ যাদের নিমতলা বা গঙ্গা কিনারে আর কোন শ্মশানে যাবার সঙ্গতি নেই। পরপর কদিনই লক্ষ্য করলেন—দফতর ছুটি হয়ে যাবার পর রামপ্রসাদ ঐ জনহীন খালপারের দিকে রওনা দিল। ব্যাপার কী? জানতে হবে।

সন্ধান দিল কালী বেয়ারা। না, খাল-ধারটা একেবারে জনহীন নয়। শ্মশানের রশি-কয়েক দূরে একটা নুড়িয়া-খোলার বস্তি আছে। ঘননিবদ্ধ গুটি আট-দশ পর্ণকুটীর। সেখানে বাস করে কিছু অন্ত্যজ রূপোপজীবিনী। বাঙালী মেয়ে নয়, ওড়িয়া, তৈলঙ্গী, কিছু পশ্চিমা। ভদ্রঘরের বাঙালী বাবুরা সে পাড়ায় যায় না। তাদের খরিদ্দারও ভিনদেশী মেহনতী মানুষ—ঐ যারা এসেছে জরু-গরু দেশে ফেলে রেখে, রুজি-রোজগারের ধান্দায়, এই কলকাতা শহরে। বেশির ভাগ পাল্‌কি-বাহক।

হরিহরের নাক কুঁচকে ওঠে। বলেন, বলিস কী রে! ঐ যমের অরুচি রণ্ডি বস্তিতে যায় রামপ্রসাদ। ভদ্র বৈদ্যবংশের সন্তান?

কালী নখ দিয়ে মেঝে খুঁটতে খুঁটতে বলে, 'আর কোন্ নরকে যাবে বলুন বড়বাবু? ও দিগড়ে তো কোন ভদ্রলোকের বাস নেই।

চকিতে একটা সম্ভাবনা ঝিলিক দিয়ে উঠল। কর্তা-মশাই সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ। ছোকরাব এই কলঙ্কের কথাটা তাঁর কানে তুলে দিতে পারলে কি ওর চাকুরিটা ভক্ষণ করা যা: না? ঝুঁকে পড়ে বলেন, সঠিক পাত্তা নিয়ে আসতে পারবি কালী? তোকে খুশী করে দেব।

—সঠিক পাত্তা মানে? কী খবর চাইছেন?

—ও কার ঘরে রাত কাটায়। কার সঙ্গে আশ্‌নাই?

সামাজিক বিধানে ফারাকটা আশমান-জমিন; কিন্তু নিজের গরজে বড়বাবু স্বয়ং ও: সমতলে নেমে এসেছেন। কালী বেয়ারা একগাল হেসে বললে, এ একটা কথা হল? রং বাজারে কেউ কি আশনাইয়ের টানে যায় বড়বাবু? আজ গুলাবী, তো কাল মতিয়া, পর রুক্‌মিণী—একটা হলেই হল।

তা বটে। তবু একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর যে প্রয়োজন। মা-কালীর নামে শপথ করে বলতে পারবে—সে স্বচক্ষে ব্যাপারটা দেখেছে। অনেক পীড়াপীড়িতে কালী সম্মত হ সরেজমিনে তদন্তটা করে দেখতে। নগদ বিদায়ও পেল কিছু।

কিন্তু পরের সপ্তাহেই সে এসে যা বলল তাতে পিলে চমকে যাবার জোগাড়! ছোকবা রং বস্তিতে আদৌ যায় না। মাগীগুলো ন্যাকামি করে, হাতছানি দিয়ে ডাকে কিন্তু রামপ্রসা ভ্রুক্ষেপও করে না। নিষিদ্ধ পল্লীটি অতিক্রম করে সোজা চলে যায় ঐ অন্ত্যজ-পরিবারে শ্মশানঘাটে। নির্জন শ্মশানকালীর ছাপরায়। চক্‌মকি ঠুকে প্রদীপ জ্বালে। তারপর ধ্যানে বসে

কালী বললে, ছোট মুখে বড় কতা হয়ে যাচ্ছে বড়বাবু, কিন্তু আপনার ভালোর জুন্যি বলছি—অর পিছনে লাগবেননি। ছোকরা পিচাশসিদ্ধ!

—পিচাশসিদ্ধ! তুই কেমন করে জানলি?

কালী বিস্তারিত জানায়। একদিন সে মুহুরীবাবুর মুখোমুখি পড়ে গেছিল। মুহুরীবাবু অবা হয়ে বলে, কালী! তুই এখানে?

কালী বুদ্ধি করে বলে, এ বাগে আসি ছিলাম। দূব থেকে ঠাওর হল আপনি মন্দিরে ব আছেন। তাই আগায়ে এলাম। মায়ের ঠাঞে কী করছিলেন?

—মন্দিরে মানুষে আবার কী করে? মায়ের পূজা।

—ভয়-ডর লাগে না? জনমানবশূন্যি শ্মশান, শ্যাল-শকুনের পাড়া··

রামপ্রসাদ নাকি হেসে বলেছিল, দূর ভীতুর ডিম! ভয় কিসের রে? আমি যে মায়ে আদরের ছেলে! আমি যা চাইব, মা তাই দেবেন আমাকে।

—যা চাইবেন? তাইলে মরতে মুহুরীগিরি করেন কেন? সোনাদানা চাইলেই পারেন

—সোনাদানা যারা চায় তারা মায়ের আশীর্বাদ পায় না। বুঝলি?

সব বৃত্তান্ত শুনে হাত-পা পেটের ভিতর সেঁদিয়ে যাবার দাখিল। নায়েববাবু এ ব আতান্তরিতে ফেললেন ওঁকে! 'পিচাশসিদ্ধ' মুহুরী! বোঝ বখেড়া!

তার কিছুদিন পরেই একটা মারাত্মক আবিষ্কার করে বসলেন হরিহর আঢ্যি। জাবদা খাতা রামপ্রসাদ তার মনোবাসনার কথা লিপিবদ্ধ করেছে। না, সে সোনাদানা চাইনি মায়ের ঠাঞে সরাসরি মৃত্যুকামনা করেছে আঢ্যি-মশায়ের! জীবন কুণ্ডুকে ফৌত করে হয়েছিল মুহুরী, এখ তহবিলদার হরিহর আঢ্যের মারণ-উচাটনে লেগেছে! তহবিলদার ফৌত হলে C

ঘোষাল-মশায়ের তহবিলদার হয়ে বসতে পারে! দু-ছত্র কবিতা পড়ে হাত-পা থরথর করে কাঁপতে থাকে:

"আমায় দে মা তবিলদারি,
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করি।"

'নিমকহারাম' কেন লিখেছে? ও ছোকরা কোন্ সূত্রে টের পেল যে, উনি শতকরা পাঁচকড়া-হারে দস্তুরী নিয়ে থাকেন? সেটাই প্রথা! শহর কলকাতার যাবতীয় তহ্‌বিলদার ঐ হারে উৎকোচ গ্রহণ করে। সেটা উৎকোচ নয়, বাঁধা-রেট দস্তুরী। তাহলে নিমকহারামীর কথাটা উঠছে কোন সূত্রে?

প্রথামাফিক আর্জিটা পেশ করার কথা নায়েববাবুর এজলাসে। আদ্যি সে-পথে গেলেন না। নায়েববাবু স্বয়ং ঐ ছোকরার মুরুব্বি। তিনি ঘোড়া ডিঙিয়ে তৃণভক্ষণে প্রয়াসী হয়ে পড়েন। জাবদা খাতাখানি বগলদাবা করে হাজির হলেন স্বয়ং বড়কর্তার বৈঠকখানায়।

বড়কর্তা ধৈর্য ধরে সব কিছু শুনলেন। কী মর্মান্তিক হেতুতে নায়েববাবুর কাছে সংবাদটি গোপন করে তহবিলদার একেবারে বড়কর্তার খাস-কামরায় আসতে বাধ্য হয়েছে, সে-কথাও। বড়কর্তা বললেন, খাতাখানা রেখে যাও। সেই মুহুরীটিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

ছেলেটির বিষয়ে দু-চার কথা ইতিপূর্বেই কানাঘুষা শুনেছেন। নায়েব গাঙ্গুলী-মশায়ের মতে ছোকরা কিছু অস্বাভাবিক; শিরোমণি-মশায়ের মতে সে কবি, পদকর্তা! সে নাকি মা কালীর নামে গান লেখে! মা কালীর নামে গান? সে আবার কী? গোকুল ঘোষাল ঐ দু-ছত্র পড়ে অনায়াসে বুঝতে পেরেছেন কিশোর কবির আকুলতা। এ কোন মারণ-উচাটন মন্ত্র নয়। কিশোর কবিযশোপ্রার্থী মায়ের কাছে ভক্তি-সিন্দুকের চাবিকাঠি চেয়েছে! এ কোনও পার্থিব কামনা নয়।

ছেলেটি এল। গরুড়পক্ষীর মতো যুক্তকরে দাঁড়িয়ে রইল সম্মুখে। গোকুল ওকে বসতে বললেন। জানতে চাইলেন, জাবদা-খাতায় এ পদ্য তুমি লিখেছ?

যুক্তকরে ছেলেটি বললে, এবারকার মতো মাপ করে দিন হুজুর। আর কখনো হবে না।

—বাজে কথা বল না! এ পদ্য তোমার রচনা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে ওটা পদ্য নয়, গানের পদ।

—গান। কী ঢঙে গাইতে হবে? কীর্তন, বাউল না ভাটিয়ালী?

কিশোর-কবি তখন মরিয়া। ফস্ করে বলে বসে, আজ্ঞে তিনটার একটাও নয়, 'রামপ্রসাদী' ঢঙে!

গোকুল ঘোষাল স্তম্ভিত। সঙ্গীতে তাঁর যথেষ্ট অধিকার। ধ্রুপদ-ধামার এবং যাবতীয় লোকায়ত সঙ্গীত। 'রামপ্রসাদী'-ঢঙ শব্দটা ইতিপূর্বে কখনো শোনেননি। চকিতে মনে পড়ে গেল ঐ ছোকরার নাম 'রামপ্রসাদ'। তবে কি নিজের নামটাই বলছে? সোজা হয়ে বসে বলেন, 'রামপ্রসাদী ঢঙে' কাউকে গাইতে শুনেছ?

সতেজ শালচারার মতো সোজা হয়ে বসল রামপ্রসাদ। বললে, আজ্ঞে না হুজুর। শুনিনি, কিন্তু গাইতে পারি।

ছোকরার এই অপরিসীম দার্ঢ্যে ক্রোধান্বিত হলেন না বড়কর্তা। বললেন, তাহলে শোনাও দেখি রামপ্রসাদী ঢঙে মায়ের নামে একখানা গান!

রামপ্রসাদ ইতস্তত করল না। অনেক অনেক পদ রচনা করেছে সে। সুর দিয়েছে, গেয়েছে। শ্রোতা একমাত্র মা কালী। কেউ কোন দিন তাকে ডেকে বলেনি, মায়ের নামে একখানা গান গেয়ে শোনাও তো ভাই। এই তার জীবনের প্রথম শ্রোতা: মা আজ চোখ তুলে চেয়েছেন। তার গানের প্রথম শ্রোতা দশজনের দশমজন—লক্ষ্মী-সরস্বতীর যুগ্ম-বরপুত্র। চাকরি যায় যাক। আজ সে তার জীবনের প্রথম শ্রোতাকে গান শোনাবে। আবেশে মুদ্রিত হয়ে গেল কিশোর কবির ডাগর দুটি চোখ। বর্তমান অবলুপ্ত হয়ে গেল। এই বিলাসকক্ষ, ঐ ঝাড়লণ্ঠন, দেয়ালগিরি, খাট-পালঙ্ক তার মালিক বিলীন হয়ে গেল ক্রমে। মগ্নচৈতন্য সাধক স্বরচিত গান ধরল তার নিজস্ব ঢঙে:

"হৃৎকমল মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মনপবনে দুলাইছে দিবসরজনী ও মা।।
ইড়া-পিঙ্গলা নামা সুষুম্না মনোরমা
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা ব্রহ্মসনাতনী ওমা।।"

গান যখন শেষ হল তখন গায়ক ও শ্রোতার চোখের জলে কার্পেট ভিজেছে।

রামপ্রসাদের চাকরিটা থাকল না!

কর্মচ্যুত রামপ্রসাদ ফিরে এল কুমারহট্টে। ঘোষাল-মশাই গুণগ্রাহী, সমঝদার ব্যক্তি। গানটি শুনে এক কথায় ওর চাকরি খেলেন। নিদান হাঁকলেন, কিশোর-কবিকে আজীবন মাস-মাহিনার ত্রিশটাকাই বৃত্তি হিসাবে দেওয়া হবে। সে স্বগ্রামে বসে যথেচ্ছা মায়ের নামে গান বাঁধবে, সুর দেবে, গাইবে, গাওয়াবে—গৌড়মণ্ডলে শ্যামা মায়ের নামের বন্যা বইয়ে দেবে।

তাই দিয়েছিলেন রামপ্রসাদ।

ঠিকই বলেছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন অমর হয়ে আছেন। বাস্তবিক পক্ষে এই আড়াইশ' বছর পরে বঙ্গদেশে সমকালীন মহাকবি ভারতচন্দ্রের নাম দৈনিক যতবার উচ্চারিত হয় তার তিনগুণ উচ্চারিত হয় রামপ্রসাদের নাম—বিশেষ্য-পদ হিসাবে নয়, বিশেষণ হিসাবে: 'রামপ্রসাদী' গান।

রামপ্রসাদ ছিলেন বীরাচারী তন্ত্র সাধক। 'পঞ্চ মকার' সাধনা ও 'পঞ্চমুণ্ডির' আসন প্রতিষ্ঠার কথা তাঁর পদে বারে বারে পাওয়া যায়। সারাটা জীবন তিনি সেই অধরাকে খুঁজে বেড়িয়েছিলেন—মা কখনো রণরঙ্গিনী মহাকালিকা—'ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে;' আবার কখনো বা মা তাঁর মেয়ে, আদরের বেটি। দুঃখের কথা, দারিদ্র্যের কথা মন খুলে মাকে বলেছেন,

"দুঃখের কথা কই গো তারা, মনের কথা কই।
কে বলে তোমারে তারা দীন দয়াময়ী।।

★ ★

কারও অঙ্গে শাল দো-শালা ভাতে চিনি-দই।
(আবার) কারও ভাগ্যে শাকে বালি ধানে ভরা খই।।"

দারিদ্র্যের বন্ধনমুক্ত হতে পারেননি কবি। তার অর্থ এই নয় যে, এতবড় ভক্তের কথা মায়ের কানে প্রবেশ করেনি। মা তাঁকে দিয়েছেন যথেষ্ট; কিন্তু কবির অর্থকৃচ্ছ্রতা যে তাঁর নিজের সৃষ্ট। এ বিষয়ে প্রামাণিক ইতিহাস শোনাই বরং, "কবির কিছু উপার্জন ছিল। ভক্তগণ প্রণামী দিত; তাহা ছাড়াও অনেক ধনাঢ্য ভূস্বামীর নিকট তিনি ভূমিদান লাভ করিয়াছিলেন। স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কবির গ্রামের নিকটে চৌদ্দ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত জমির মোট পরিমাণ পঞ্চাশ বিঘারও অধিক। সুতরাং কবি নিতান্ত নিঃস্ব ছিলেন না। কিন্তু অধিকাংশ অর্থ দানধ্যানেই ব্যয় হইয়া যাইত বলিয়া কবির দারিদ্র্য দুঃখ কোনদিনই ঘুচে নাই।"[১]

এর পরে কবি যখন তান ধরেন

"কেন আসার আশা ভবে ভাসা আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রইল।।
মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় করে ছলো।
ওমা, মিঠার লোভে তিত মুখে সারাটা দিন গেল।।"

তখন পার্থিব-জননী হলে হয় তো বলতেন: ন্যাকামি।

জগজ্জননী তা বলেননি। তিনি জানতেন ঐ 'মিঠা' আর 'তিত' শব্দের ভিন্ন ব্যঞ্জনা। মিঠা অর্থে সোনা-দানা, জমি-জেরাৎ নয়, বিশুদ্ধ ভক্তি!

বয়সে রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের চেয়ে কিছু ছোট। তিনিও একখানি 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করেছিলেন। গবেষকদের মতে সেটি ভারতচন্দ্রের রচিত 'বিদ্যাসুন্দরে'র পরে। একই বিষয়বস্তু নিয়ে কবি কেন ঐ কাব্য লিখেছেন সে বিষয়ে নানামুনির নানামত। কাব্য বিচারে পূর্ববর্তীকালের রচনা হলেও ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' উৎকৃষ্টতর। আমাদের মনে হয়, রামপ্রসাদের ধারণা হয়েছিল ভারতচন্দ্র ঐ কাব্যে মহাকালীর মহিমা যথোচিতভাবে প্রকাশ করতে পারেননি। সেই ত্রুটি পূরণের জন্যই হয়তো রামপ্রসাদের প্রয়াস। কিন্তু তিনি কুত্রাপি ভারতচন্দ্রের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেননি।

কবি ভণিতায় নিজ নামের পূর্বে 'কবিরঞ্জন' উপাধি ব্যবহার করেছেন। এ উপাধি তাঁকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র দিয়েছেন বলে মনে করা স্বাভাবিক; কিন্তু 1759 খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে জমিদান করে যে দলিল সম্পাদন করেন, তাতে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দেখা যায় না। অনেকের বিশ্বাস এ উপাধি কৃষ্ণচন্দ্র প্রদত্ত নয়। 'মহাত্মাজী, দেশবন্ধু, নেতাজী' প্রভৃতি উপাধির মতো সেটিও স্বদেশবাসীর স্বতঃপ্রদত্ত সম্মানের দ্যোতক। অপরপক্ষে রামপ্রসাদও সমকালীন পদকর্তার পদাঙ্ক-অনুসরণে 'পৃষ্ঠপোষক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রে'র নাম তাঁর কাব্যে লিপিবদ্ধ করেননি।

'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'——অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতীয় খণ্ড: দ্বিতীয় পর্ব 1981, পৃ: 310-11

এই সাধক-কবির সম্বন্ধে নানাপ্রকার অলৌকিক গালগল্প, প্রবাদ ও জনশ্রুতি গড়ে উঠেছে। মা অন্নপূর্ণা নাকি কাশী থেকে হালিশহরে এসে তাঁর গান শুনে যেতেন, মা-কালী তাঁর বাগানে বেড়া-বাঁধার কাজে দড়ি ফিরিয়ে দিয়েছেন অথবা তাঁর মৃত্যুসংক্রান্ত। সেসব কাহিনী সত্য বলে গ্রহণ করেন বিশ্বাসপ্রবণ ভক্তরা ; কিন্তু না করলেও তাতে রামপ্রসাদের মহিমা খর্ব হয় না। সে সব কাহিনীর লৌকিক ব্যাখ্যা দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, লেখক অবিশ্বাসী, পাষণ্ড!

এর পর যে গল্পটা শোনাব তার জন্যে এই সাফাইটুকু আগাম গেয়ে রাখলাম।

রামপ্রসাদের দুই পুত্র—রামদুলাল ও রামমোহন এবং দুই কন্যা পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী। আর প্রতিবেশী অচ্যুত গোস্বামী বা সংক্ষেপে আজু গোঁসাই। তিনি বৈষ্ণব এবং উপস্থিত-কবি। কোন পুঁথি তিনি লিখে যাননি, কিন্তু শাক্ত প্রতিবেশী রামপ্রসাদকে আক্রমণ করে কয়েকটি পদ রচনা করে বিখ্যাত হয়েছেন। কবি ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায় "রাজা (অর্থাৎ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র) যখন কুমারহট্টে আসিতেন তখন রামপ্রসাদ সেন এবং আজু গোঁসাইকে একত্র করিয়া উভয়ের সঙ্গীত যুদ্ধের কৌতুক দেখিতেন। রামপ্রসাদ সেন কবীন্দ্র ছিলেন, আজু গোঁসাই আধ-পাগ্লা ছিলেন, কিন্তু মুখে মুখে রহস্যকবিতা রচনা করিতে পারিতেন। রামপ্রসাদ সেন যখন জ্ঞানভক্তির বিষয়ে পদবিন্যাস করিতেন, ইনি তখন রহস্য ছলে তাহার উত্তর করিতেন।"

অসিতকুমারের মতে, "ঈশ্বর গুপ্ত ইঁহার (আজু গোঁসাই) সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ দিয়াছেন, তাহার অধিক বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ...ইনি বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহাকে আধ্-পাগলা বলিয়াছেন ; তাহা বোধহয় ঠিক নহে। শুনা যায়, ইনি বৈষ্ণব সাধনমার্গের পথিক ছিলেন, অপরদিকে বেশ পরিহাসপটুও ছিলেন। রামপ্রসাদের কোন কোন শ্যামাসঙ্গীতকে তিনি বেশ রঙ্গরহস্যের দ্বারা তীক্ষ্ণভাবে আক্রমণ করিতেন। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়া স্বভাবতঃই তিনি শাক্ত রামপ্রসাদকে ততটা পছন্দ করিতেন না।"

ঐতিহাসিক তথ্য ঐটুকু। এবার গল্প ফাঁদা যাক। কিন্তু তার আগে আজু গোঁসাই কী-জাতের 'উতোর' গাইতেন, তার দু-একটা নমুনা শোনাই:

রামপ্রসাদ হয়তো গাইলেন,

"আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরুতলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে খাবি।।"

নির্দোষ দুটি পংক্তি। কারও ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেওয়া হয়নি। কিন্তু আজু গোঁসাই প্রতিবাদ করে ওঠেন:

"কেন রে মন বেড়াতে যাবি?
কারও কথায় কোথাও যাস্ নে, রে মন,
মাঠের মাঝে মারা যাবি।।"

ভক্তকবি রামপ্রসাদ হয়তো তান ধরলেন,

"ডুব দে রে মন কালী বলে।
হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে।।"

কুমারহট্ট

বিশুদ্ধ ভক্তিরসের পদ। গান হচ্ছে হালিশহরে, মহারাজার কাছারিবাড়ি সংলগ্ন বিশ্রামগৃহে—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আগমন উপলক্ষ্যে। গণ্যগ্রামের ভদ্রলোকেরা ফরাসে বসে আছেন আসনপিঁড়ি হয়ে। মহারাজ কিঞ্চিৎ উচ্চাসনে তাকিয়া ঠেশান দিয়ে। গানটি নিঃসন্দেহে তাঁর ভাল লেগেছে। তবু আজু গোঁসাইকে খোঁচা দিয়ে বলেন, গোঁসাই-কবি এবার একখানা শোনাও।

উপস্থিত-কবি আজু-গোঁসাই—তাঁরও অদ্ভুত প্রতিভা—মুখে মুখে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে ঐ রামপ্রসাদী সুরেই গেয়ে ওঠেন

"ডুবিস নে মন ঘড়ি ঘড়ি।
দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি॥
একে তোমার কফোনাড়ী
ডুব দিও না বাড়াবাড়ি
তোমার হলে পরে জ্বরজ্বারি
মন, যেতে হবে যমের বাড়ি॥"

তোমরা তুলনামূলক বিচার করে দেখ। রামপ্রসাদের ঐ দুটি ছত্রে কাব্যমাধুর্য নিঃসন্দেহে অধিক; বোঝা যায় যে, ভক্তকবির আকুলতা মিশে আছে তাতে। কিন্তু ভুললে চলবে না—রামপ্রসাদ পদটি লিখে এনে গাইছেন, আজু-গোঁসাই শ্রবণমাত্র তার 'প্যারডি' রচনা করেছেন। মুখে মুখে ছয়-পংক্তির অন্ত-মিল সমেত 'উতোর' রচনাও কম কৃতিত্বের কথা নয়!

আজু গোঁসাই যে শুধু লঘুভঙ্গিতে 'উতোর' গেয়েছেন তাও বলতে পারি না। এক এক সময় তীব্র শ্লেষের মাধ্যমে তিনি রামপ্রসাদের রচনার দোষত্রুটির সম্যক বিচারও করেছেন। যেমন উল্লেখ করা যায়, রামপ্রসাদ একবার গৌরীর বাল্যলীলার বর্ণনার মধ্যে কৃষ্ণলীলার অবতারণা করে বসলেন! পদাবলীর গোষ্ঠলীলার অনুপ্রেরণার একটি চিত্র অঙ্কিত করলেন—গৌরী গোধন নিয়ে গোচারণে এসেছেন, বাঁশী বাজিয়ে ধেনুদের ডাকছেন! আজু গোঁসাই-এর মতে এটি 'রসাভাস'। লিখলেন,

"না জানে পরমতত্ত্ব কাঁঠালের আমসত্ত্ব
মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে?
তা যদি হইত যশোদা যাইত
গোপালে কি পাঠায় রে?"

অসিতকুমারের মতে, "এই বিদ্রূপের খোঁচা অতিশয় বুদ্ধিদীপ্ত হইয়াছে।"

আর একবার রামপ্রসাদ গাইলেন তাঁর বিখ্যাত শ্যামাসঙ্গীত

"এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)
এবার তুমি খাও কি আমি খাই, মা দুটোর একটা করে যাব।
হাতে কালী, মুখে কালী সর্বাঙ্গে কালী মাখিব।"

1920-81

রামপ্রসাদের এই ভাবোন্মাদে আজু গোঁসাই 'উতোর' গাইলেন:

"সাধ্য কি তোর কালী খাবি?
ওযে রক্তবীজের বংশ খেলে তার মুণ্ডমালা কেড়ে নিবি!
সর্বাঙ্গে নয়, উভয় গালে ভুষো কালি মেখে যাবি।"

অসিতকুমার এই দুটি উদ্ধৃতি শুনিয়ে বলেছেন, "আজু গোঁসাইয়ের ধর্মবিশ্বাসে রামপ্রসাদের যে গান অসঙ্গত মনে হইয়াছিল, তিনি শাণিত ব্যঙ্গোক্তি নিক্ষেপ করিয়া তাহার যথোপযুক্ত উত্তর দিতেন। দুঃখের বিষয় জনশ্রুতি ছাড়া এবিষয়ে আর কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের এক অভিনব দৃষ্টান্ত মিলিত।"

পাওয়া যখন নেহাৎ গেলই না, তখন কথাসাহিত্যের বাজারে কিছু আনন্দলাভে আপত্তি কিসের? এস, গপ্পো শোন:

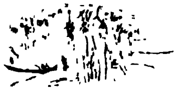

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন হালিশহরে আসতেন তখন উভয়-কবির জন্যই কিছু কিছু উপঢৌকন নিয়ে আসতেন। শাল দো-শালা থেকে ধুতি-চাদর, কবিপত্নীর জন্য মুর্শিদাবাদী শাড়ি থেকে ঘূর্ণীর মৃত্তিকাশিল্প। একবার তিনি দুই কবিকেই উপহার দিলেন কিছু ফুলগাছের বীজ। বললেন, এই বীজ থেকে ফুলের চারা হবে, ফুল ফুটবে, তাতে কবিদ্বয় তাঁদের ইষ্টপূজার ব্যবস্থা সহজেই করতে পারবেন। রামপ্রসাদকে দিলেন জবা আর অপরাজিতার বীজ; আর আজু গোঁসাইকে নয়নতারা আর শ্যামসোহাগী। দুই কবিই খুশি। নিজ নিজ বাগিচায় প্রয়োজনীয় ফুল ফুটলে কত সুবিধা।

দু-বাগানেই চারাগাছ জন্মালো। পাতা বার হল, ক্রমে ফুলও ফুটল।

কিন্তু কী বিড়ম্বনা! মহারাজের ভ্রমে বীজের পুলিন্দা ওলট্-পালট হয়ে গেছে। গোঁসাইজীর বাগিচায় ফুটল রাঙা জবা আর নীল অপরাজিতা, ওদিকে শাক্তকবির বাগানে শ্যামসোহাগী! কোন মানে হয়! রাজার উপহার দেওয়া ফুলগাছের চারা, না যায় উপড়ে ফেলা, না ছাগল দিয়ে খাওয়ানো। মহারাজা পরের বার পরিদর্শনে এসে সে-বার্তা শুনে বললেন, কবিরঞ্জন, এজন্যই চণ্ডী বলেছেন, "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা!" দেখুন দেখি কাণ্ড! তা সে যাই হোক, ভুল জায়গায় ফুটেছে বলে তো ওদের প্রাণদণ্ড হতে পারে না? আপনারা প্রতিদিন ফুল ও-বাড়ি দিয়ে আসবেন, এ-বাড়ি নিয়ে আসবেন।

দুজনের কেউই বুঝতে পারেননি, এটি মহারাজের ভ্রান্তি নয় আদৌ। তিনি চেয়েছিলেন দুটি পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হোক। দুজনে বলতে গেলে প্রতিবেশীই। দুই ভদ্রাসনের মাঝখানে একটি মাত্র দিঘির ব্যবধান। একটি মাত্র পুষ্করিণী, কিন্তু তারও নাম দু-দুটো। রামপ্রসাদ তার নাম রেখেছেন "কালী দহ", শুনে আজু গোঁসাই তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন, না, ওটার নাম "কালীয়দমন দহ"!

রাজা-মশাই বললেন, আপনাদের দুজনেরই কন্যাসন্তান আছে। একদিন তুলসী কবিরঞ্জনের বাড়িতে পৌঁছে দেবে জবা, অপরাজিতা; পরদিন জগদীশ্বরী গোঁসাইজীর বাড়িতে পৌঁছে দেবে

নয়নতারা আর শ্যামসোহাগী।

রাজাদেশ। লঙ্ঘন করা যায় না। আজু তবু আপত্তি তোলেন, ছোটখুকি বালিকা মাত্র, কিন্তু তুলসী ত্রয়োদশে পড়েছে, ঘরের বার হয় না যে মহারাজ।

ছোটখুকি অর্থে জগদীশ্বরী, রামপ্রসাদের কনিষ্ঠা কন্যা।

মহারাজ সহাস্যে বলেন, তা তুলসী যদি পথে বার না হয় তবে তার মা নিজেই সে কাজটা করে দিতে পারেন, একগলা ঘোমটা টেনে। এ তো বলতে গেলে পাশের বাড়ি! অবশ্য কবিরঞ্জনের বাড়িতে খাঁড়া আছে, সেই ভয়ে যদি গৃহিণীকে ও বাড়ি না পাঠান···

গোঁসাইজী সলজ্জে বাধা দিয়ে বলেন, না না, খাঁড়াকে আমি থোড়াই ডরাই!

মহারাজও সহাস্যে বলে ওঠেন, এই তো বীরেব মতো কথা! ওঁর খাঁড়া আছে তো আপনারও বাঁশি আছে! আর বাঁশির ধর্মই হচ্ছে পরস্ত্রীকে মোহিত করা! কবিরঞ্জনকেও নিজের ঘর সামলাতে হবে!

আলোচনাটা গৃহিণী-ঘেঁষা হয়ে যাচ্ছে দেখে দু-পক্ষই প্রসঙ্গান্তরে আসেন।

—এবার একটু গান-বাজনার আসর শুরু করা যাক মহারাজ!

যে তথ্যটা মহারাজ ছাড়া দুই কবিও জানতেন না তা এই—বাঁশি শাক্ত-ঘরের ছেলেও বাজায়, আর তাতে পরস্ত্রী নয়, পরের ঘরের অনূঢ়া ত্রয়োদশীও মোহিত হয়ে যেতে পারে।

তাই গিয়েছিল। কবিরঞ্জনের কনিষ্ঠপুত্রটি—রামমোহন, আজু গোঁসাই-এর দাদার টোলে পড়তে যেত। বয়সে সে তুলসীর চেয়ে বছর তিন-চারের বড়। আলাপ না হওয়ার হেতু নেই, আর বয়সটা এমন যে, মুগ্ধ না হওয়ারও!

মহারাজের ইচ্ছা কিছুটা সফল হয়েছিল। ছোটখুকি বা তার মা সকালে শ্যামসোহাগী ফুলগুলি তুলে গোঁসাই বাড়ি দিয়ে আসতেন আর সাজি ভরে নিয়ে আসতেন জবা আর অপরাজিতা। পরদিন গোঁসাই গৃহিণী তার প্রতিদান দিতেন। ফলে সহজেই দুটি পরিবারেব মধ্যে দেখা দিল সম্প্রীতি। কিন্তু দু-পক্ষই সজাগ—ঘি আর আগুন যেন পরস্পরের সন্নিকটে না আসে। শাক্তবাড়ির ছেলে আর গোঁসাই-বাড়ির মেয়ে। তারা যে কোথায় লুকিয়ে-চুরিয়ে সাক্ষাৎ করত তা কাকপক্ষীতে টের গেলেও অভিভাবকেরা টের পেতেন না।

এর মধ্যে আরও কিছু জটিলতা দেখা দিল। শ্যামচাঁদের পূজা হয় সকালে, মা শঙ্করীব পূজা রাত্রে। সুতরাং ফুল দিয়ে ফুল নিয়ে আসা চলে না। তাহলে সারা দিনে জবা-অপরাজিতা ফুলগুলি শুকিয়ে যায়। ফলে দান-প্রতিদানটা দৈনিক নয়, এ-বেলা ও-বেলার ব্যাপার। কখনো বা রামমোহন নিজেই গিয়ে তুলসীর তোলা ফুল সাজি ভরে নিয়ে আসত। তাতে দোষের কিছু নেই।

তারপর একদিন। ছোটখুকি যে সান্নিপাতিক জ্বরে শয্যাশায়ী সে খবরটাও জানা নেই কবিরঞ্জনের। সংসার বিষয়ে তিনি উদাসীন। সারাদিন আছেন ভাবের ঘোরে। পদরচনা করা, তাতে সুর দেওয়া আর মাকে শোনানো।

সেদিন অপরাহ্ণকালে উনি বাগানের বেড়া বাঁধছিলেন। তলতা-বাঁশের পিঠ-মুলি চাটাই। এপার-ওপার স্পষ্ট দেখা যায় না। ভরাট বাঁশের খুঁটি পুঁতেছেন চার হাত তফাৎ-তফাৎ। তলতা-বাঁশগুলি চেরাই করে বাঁধা হয়ে গেছে। এখন কাজ হচ্ছে সেটাকে খাড়া করা। এ-কাজে

1770

বেড়ার দু-পাশে দুজন লোক থাকলে বাঁধন দিতে সুবিধা হয়। রামমোহনের খোঁজ করেছিলেন, সে নাপাত্তা। গিন্নিকে যে এ-কাজে ডাকবেন তার সাহস নেই। সংসারের পাঁচকাজ সারতে সারতেই তাঁর নাকি হাড়-মাস কালি। হঠাৎ মনে হল, বেড়ার ওপাশ দিয়ে পা টিপে-টিপে ছোটখুকি কোথায় সট্‌কে পড়ার তালে আছে। রামপ্রসাদ বুঝতে পারেন—ছোটখুকিটা বিচ্ছু। ঠিক বুঝে ফেলেছে এখনি হয়তো বাবামশাই ওকে ডাকবেন বেড়া-বাঁধার কাজে ফেরতা দিতে। না হলে চোরের মতো পা টিপে টিপে সটকে পড়ার কী হেতু?

রামপ্রসাদ বজ্রগম্ভীর স্বরে হাঁকাড় পাড়েন: ছোটখুকি!

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। *ন যযৌ, ন তস্থৌ!*

—কোথায় পালাচ্ছিলি?

ও-প্রান্তে তুলসী ততক্ষণে পাষাণ প্রতিমা। ছোটখুকির জ্বর হয়েছে সে জানে। তার মায়েরও 'হাত-অপ্‌সর' নেই। সামনে মাধব পঞ্চমী—মা আনন্দনাড়ু পাকাচ্ছে। মা-ই বললে, তুলসী, যা, চট করে ও-বাড়ি ফুলকটা পৌঁছে দিয়ে আয়। যাবি আর আসবি। ছোটখুকির সঙ্গে আড্ডা দিতে বসবি না।

তুলসী বলেছিল, ছোটখুকির জ্বর হয়েছে মা। তবে দেরি করব না। যাব আর আসব। তা ঠিক হয়নি। বনপথেই দেখা হয়ে গেছিল ওর রামদার সঙ্গে। ফুলের সাজিটা তার হাতে ধরিয়ে দিলেই হত। প্রাণে ধরে তা পারেনি। কথাবার্তা বলতে বলতে অপরাহ্ণ গড়িয়ে গেছিল সন্ধ্যার দিকে। শাঁখে ফুঁ-পড়তেই চমকে উঠে বলেছিল, আজ যাই রাম'দা, না হলে মা আমাকে আস্ত রাখবে না।

রাম খপ করে ওর হাতখানা চেপে ধরে বলেছিল, তাহলে কথা দাও, কাল আবার ঠিক এই সময়ে আসবে।

—কাল তো তোমার যাওয়ার কথা।

ঠিক তখনই বেড়াব ওপাশ থেকে ভেসে এসেছিল বজ্রগম্ভীর আহ্বান: ছোটখুকি!

রামমোহন তার ওষ্ঠাধরে দক্ষিণ তর্জনীটা ছুঁইয়েছে। তুলসীর ছুটে পালানোর মতো সাহস নেই। বেড়ার ওপাশ থেকে রামপ্রসাদ ধমক দেন, দিনরাত শুধু পাড়া-বেড়ানো। মায়ের হাতে-হাতে কোন্ কাজটা করিস্ সারাদিনে?

এবারও তুলসী নিশ্চুপ।

—স্থির হয়ে ওখানে দাঁড়া। আমি এদিক থেকে গুণ-সূচের ফোঁড় দেব, তুই ফের্তা দিয়ে সূচ এ বাগে ফিরিয়ে দিবি। বুঝলি?

তুলসী শুধু বললে, হুঁ।

তারপর মুলিবাঁশের চাটাই শুধু এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হতে থাকে তুলসীর হৃৎপিণ্ডের মতো! অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে দেখে রামমোহন পা-টিপে এগিয়ে আসে। মক্ষিকাবিতাড়ন মুদ্রায় তুলসীকে কেটে পড়তে বলে। তুলসী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে নিঃশব্দে পালিয়ে যায়। রামমোহন অতঃপর ছোটখুকির ভূমিকায় বেড়ায় ফের্তা দিয়ে চলে, আর বাবা-মশায়ের হিতোপদেশ শুনতে থাকে। রামপ্রসাদ এক-তরফা বক্‌বক্ করে চলেন বেড়ার এপাড়

থেকে—দুদিন পরেই তো পরের ঘরে চলে যাবি, মা। তখন কি আর মাকে পাবি? যেটুকু পারিস মায়ের হাতে-হাতে সাহায্য করিস্। সে বেচারি একাহাতে আর কতটা পারে, বল? তুই ছাড়া আর তার কে আছে? আমি তো ভাবের ঘোরে পড়ে আছি, তোর দাদাটা তো দিন দিন একটা বাঁদর হচ্ছে...

রামমোহন কোন প্রতিবাদ করে না। অন্ধকার ঘনিয়ে এলে রামপ্রসাদ বলেন, আজ থাক, মা। আর দেখা যাচ্ছে না। তুই ইদিকে আয়।

এতক্ষণ সব আদেশ পালন করেছে। এইবারে পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করল মেয়েটি। বাস্তবে ছেলেটি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হাঁকাড় পাড়েন, কী হল? ছোট খুকি? আয়!

কোন সাড়া নেই।

কাটারিখানা হাতে তুলে নিয়ে বেড়ার ফটক পার হয়ে এপারে এসে দেখেন ভোঁ-ভোঁ। কী-হল? মেয়েটা বাড়িতেই ঢুকল তো? কই নজরে পড়েনি তো। কিন্তু বাড়ি না ঢুকলে এই আঁধারে সে যাবেই বা কোন চুলোয়? ব্যস্ত-সমস্তভাবে ফিরে আসতে থাকেন ভদ্রাসনের দিকে। লক্ষ্য হল গৃহিণী শঙ্খ হাতে বার হয়ে এসেছেন দাওয়ায়। তাঁকেই প্রশ্ন করেন, ছোটখুকি ফিরে এসেছে বাড়িতে?

গৃহিণী শাঁখ বাজাতে ভুলে গেলেন। কপালে করাঘাত করে বলেন, হা আমার পোড়া কপাল! কী মানুষ নিয়েই ঘর করছি। ছোটখুকি আজ দু-দিন জ্বরে বেহুঁস, সে খবরটাও ঘরের মানুষটা জানে না।

—জ্বরে বেহুঁস্! কে? ছোটখুকি?

গৃহিণী রামপ্রসাদের রাম-দা সমেত হাতখানি ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলেন ঘরের ভিতর। দেখিয়ে দিলেন, ঐ দেখ' সে নিজের চোখে!

বজ্রাহত হয়ে গেলেন রামপ্রসাদ। তাহলে কে ওঁর হাতে-হাতে দড়ি ফিরিয়ে দিল এতক্ষণ? আহা মুখখানি দেখা যায়নি। ডুরে শাড়ির আভাসটুকু দেখেছেন। বেড়ার ফাঁক দিয়ে চরণদুটি—তাতে আলতাপরা! বেহুঁস ছোটখুকির পায়ে আলতার চিহ্নমাত্র নাই।

রামপ্রসাদ কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েন অসুস্থ কন্যার শয্যাপার্শ্বে। তাঁর দু-চোখে অশ্রুর বন্যা। মুখে বোল, এ তুই আমাকে কী ছলনা করলি দয়াময়ী পাষাণী!

বসে পড়েছেন কবিপত্নীও। কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে। আধপাগলা নিয়ে ঘর করা যায়; এ যে বদ্ধ উন্মাদ!

যে-কথা আগে বলেছি, আবার তাই বলি: কালিকা দেবী স্বহস্তে রামপ্রসাদের বেড়া ফিরিয়ে দিয়েছেন কি দেননি তার উপর নির্ভর করে না সেই মহা-সাধকের মহিমা। তাঁর নামে সুপ্রচলিত অলৌকিক কাহিনীর এই লৌকিক-ব্যাখ্যা স্বজ্ঞানে দিতে বাধ্য হচ্ছি তাঁকে তুচ্ছ করতে নয়, তাঁর প্রতি সম্মান জানাতে। রজ্জুতে যে ব্যক্তির সর্পভ্রম হয়, তার 'সর্পজনিতভীতি'তে তিলমাত্র পার্থক্য হয় না। রামপ্রসাদ যে মা কালীকে কন্যারূপে লাভ করে ফোটা কদমফুলের মত

রোমাঞ্চিততনু হয়েছিলেন সেই আনন্দ অনুভূতি, সেই পরমপ্রাপ্তির তূরীয়ভাব তো তিলমাত্র খাটো হচ্ছে না। ভক্ত রামপ্রসাদ তবু ভক্ত রামপ্রসাদই থাকছেন।

রামপ্রসাদের মৃত্যুর সম্বন্ধও এক অলৌকিক কাহিনী। এটাকে 'অলৌকিক' বলা ঠিক নয়। অনেক সাধক নিজের লীলা সম্বরণের বিষয়ে পূর্বাহ্নেই ইঙ্গিত পান। এ নিয়ে উনবিংশ শতকের অনেক ভারতীয় সাধকের নানান কাহিনী প্রচলিত। বিংশ শতাব্দীতেও তা আছে, আমাদের জমানায়। স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীঅরবিন্দ নিজেদের তিরোভাবের ইঙ্গিত পূর্বেই জানিয়েছিলেন।

ফলে রামপ্রসাদের সম্বন্ধে ঐ প্রচলিত কাহিনীটি অসাধারণ হলেও অলৌকিক নয়।

রামপ্রসাদের তখন পরিণত বয়স—একষট্টি। সেটা 1781 সালের কার্তিক মাস। ভক্তকবির জীবনের শেষ কালীপূজা। সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন তিনি। সারাদিন উপবাস করে কালীপূজা সম্পন্ন করলেন।

তারপর মায়ের সামনে স্বরচিত একটি গান গাইলেন কবি. এটাই তাঁর শেষ রচনা:

"তারা! তোমার আর কি মনে আছে?
ওমা, এখন যেমন রাখলে সুখে, তেমনি সুখ কি পাছে?
শিব যদি হন সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি, মা গো?
ওমা ফাঁকির উপরে ফাঁকি, ডান চক্ষু নাচে।।
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমাকে সাধিতাম নাই, মাগো।
ওমা, দিয়ে আশা, কাটলে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে।।
প্রসাদ বলে মন দড়, দক্ষিণার জোর বড়, মা গো।
ওমা, আমার দফা হল রফা, দক্ষিণা হয়েছে।।"

গানের মধ্যে কেমন যেন অমঙ্গলের সুর। রামমোহন এগিয়ে এসে বাবা-মশায়ের হাতখানি ধরে বললে, এবার উঠে আসুন। সারা দিন-রাত উপবাসে আছেন, আর গান নয়।

কবি হেসে বলেন, হ্যাঁ রে রাম, ঠিক বলেছিস্! আর গান নয়। গানের পালা সাঙ্গ হয়েছে আমার। 'দক্ষিণা' যে হয়ে গেল।

—আসুন, উঠে আসুন। এবার বিসর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে।

হঠাৎ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। বলেন, হ্যাঁ, বিসর্জন! চল ঘাটে যাই।

—না! আপনার যাওয়া হবে না। আমরাই বিসর্জন দিয়ে আসব।

কবি মাথা নেড়ে বলেন, কী পাগলের মতো কথা বলিস্। আজ যে বিসর্জন! মায়ের সঙ্গে ছাঁ-ও যাবে। তোরা আয়, মা কে নিয়ে আয়। আমি ঘাটের দিকে চললাম!

হঠাৎ গৃহিণীর দিকে ফিরে বললেন, পেন্নাম করবে তো করে নাও। আমি কিন্তু আর ফিরছি না!

শিউরে উঠলেন কবিপত্নী। বলেন, ওমা! সে আবার কি কথা?

—শুনলে না, আজ বিসর্জন! দক্ষিণা হয়ে গেছে যে! 'আমার দফা, হল রফা, দক্ষিণা হয়েছে।'

হালিশহর

কারও নিষেধ কোনদিন মানেননি। যা মন চেয়েছে চিরটাকাল তাই করেছেন। কালীপ্রতিমার সঙ্গে নাচতে নাচতে চললেন গঙ্গার দিকে। দরাজ গলায় গান গাইতে গাইতে। এ গান তিনি নাকি কালি-কলমে রচনা করেননি। শেষ বিসর্জনের যাত্রাকালে উপস্থিত-কবির মতো রচনা করে গাইতে গাইতে গিয়েছিলেন:

“কালীগুণ গেয়ে
বগল বাজায়ে
এ তনু তরণী ত্বরা করি চল ধেয়ে
ভবের ভাবনা কিবা মনকে কব নেয়ে॥”

রামপ্রসাদের পঞ্চবটী, কুমারহট্ট

বিসর্জনের পর গঙ্গাস্নান করে ঘরের ছেলে ঘরে ফেরে। সবাই তাই ফিরল। শুধু কবি আর ফিরলেন না তাঁর খেলা-ঘরে। ফিরে গেলেন মায়ের কোলে। চিরশান্তির রাজ্যে।

নৈহাটি

কুমারহট্ট বা হালিশহরের দক্ষিণে নৈহাটী। কেউ কেউ বলেন, ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এখানে একটি নয়া হাট বসান—ঐ কাঞ্চনপল্লী আর ভাটপাড়া নামক দুটি প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী গ্রামের মাঝামাঝি অবস্থানে, গঙ্গার তীরে। সেই নয়া হাট থেকে নয়াহাটি, ক্রমে নৈহাটি।

পূর্বে এর কাছাকাছি ছিল একটি ঐতিহ্যসম্পন্ন গ্রাম: গৌরিফা।

ভাটপাড়া অথবা কাঞ্চনপল্লীর মতো এখানেও বাস করতেন অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত উনবিংশ শতকে এটি বাঙলার এক সাহিত্য-তীর্থ হয়ে ওঠে।

বর্তমান নৈহাটী স্টেশনের পুবদিকে কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভিটেখানি ছিল। তার অনেকটা এখন রেলওয়ে ইয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত, তবু তাঁর বৈঠকখানা ও পৈত্রিক দেবালয়গুলি রক্ষা পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কুলদেবতা ˘ বিজয় রাধাবল্লভ জীউর রথযাত্রা বোধকরি এখনো হয়ে থাকে। কাঁঠালপাড়ার সাহিত্যসেবীরা আজও সাহিত্য-সম্রাটের জন্মদিন পালন করেন, 'বঙ্কিম-সাহিত্য সম্মেলন' করে থাকেন।

ঐতিহাসিক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভদ্রাসনও ছিল নৈহাটীতে।

গৌরিফা গ্রামখানি নৈহাটী রেলওয়ে স্টেশানের কিছু উত্তরে। 'নববিধান' মতাবলম্বী বাগ্মী ও সমাজ সংস্কারক ব্রাহ্মধর্মের মহান নেতা কেশবচন্দ্র সেনের স্মৃতিধন্য।

উনবিংশ শতকের সেই ঐতিহ্য বহন করে আমাদের সমকালীন প্রথিতযশ কথাসাহিত্যিক বন্ধুবর সমরেশ বসুও নৈহাটীতে বাগ্‌দেবীর পতাকা উড্ডীন রেখে গেছে।

ভাটপাড়া

নৈহাটীর ক্রোশখানেক দক্ষিণে ভাটপাড়া। সেকালের ঐ অতিবিখ্যাত জনপদটির অবস্থান জানাতে একালীন পাঠক-পাঠিকাকে বলে দিতে হবে: কাঁকিনাড়া ইস্টিশানের কাছে!

কাশী, নবদ্বীপ, ত্রিবেণীর সঙ্গে সমান তালে সংস্কৃত চর্চার দীপশিখাটি প্রজ্জ্বলিত রেখেছিলেন এখানকার পণ্ডিতসমাজ। কোন সামাজিক বিধানদানে ভাটপাড়ার অধিকার ছিল তুল্যমূল্য। ভাটপাড়া কথাটা এসেছে 'ভট্টপল্লী' থেকে। বলা বাহুল্য: ভট্ট অর্থে ব্রাহ্মণ।

এই জনপদের অযুত-নিযুত পণ্ডিতদের ভিতর দু-একজনের কথা বলি:

হলধর তর্কচূড়ামণি (জন্ম: 1790): স্ববংশীয় জনার্দন বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য। প্রখ্যাত ন্যায়াধীশ। নব্যন্যায়ের একটি 'পত্রিকা' প্রকাশ তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয়।

রাখালদাস ন্যায়রত্ন (জন্ম: 1829): সীতানাথ বিদ্যাভূষণের সুযোগ্য পুত্র। প্রথমে ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করে নৈয়ায়িক হলধর তর্কচূড়ামণি এবং যদুনাথ সার্বভৌমের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। নব্যন্যায়ে তাঁর উদ্ভাবিত যুক্তি-কৌশল এখনো আলোচিত হয়। ভারতীয় পণ্ডিতসমাজ যখন 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি বিতরণের আয়োজন করেন তখন প্রথম আটজন মহাপণ্ডিতের ভিতর রাখালদাসকেও ঐ উপাধি প্রদান করা হয়। তাঁর শিষ্য শিবচন্দ্র সার্বভৌমও পরে (1903) এই উপাধি লাভ করেন।

নিমাই তর্কপঞ্চানন—ইনিই নিমাইচন্দ্র শিরোমণি কিনা ঠিক জানি না।

শিবচন্দ্র সার্বভৌম (জন্ম: 1847): রাখালদাসের সুযোগ্য শিষ্য। পশ্চিমদেশীয় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ভট্টপল্লীতেই বসবাস করতেন। প্রথম জীবনে পিতা রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ও খুল্লতাত জয়রাম ন্যায়ভূষণের নিকট শিক্ষা করতেন। মাত্র যোলো বৎসর বয়সে 'পাণ্ডবচরিত্রম্' নামে একটি সংস্কৃত নাটক রচনা করে বিখ্যাত হন। পরে মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজে আমৃত্যু অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং তখনই 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন।

মূলাজোড়

মূলাজোড় : বর্তমান রেলস্টেশন শ্যামনগরে নেমে যেতে হয়।

স্টেশানের কাছেই ব্রহ্মময়ীর কালীমন্দির। সঙ্গে দ্বাদশ শিবমন্দির। কালীর প্রতিষ্ঠা নিয়ে একটি প্রাচীন লোকগাথা আছে। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

এই মূলাজোড়েই আমাদের কাহিনীর অন্যতম চরিত্র ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর তাঁর শেষজীবন অতিবাহিত করেন। এই গ্রামে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর প্রিয় সভাকবিকে কিছু ব্রহ্মোত্তর দান করেছিলেন। কবি সেখানে একটি ভদ্রাসন নির্মাণ করেন। তাঁর আজীবন-প্রোষিতভর্তৃকা পত্নীকে পিত্রালয় থেকে নিয়ে এসে 'রাধানাথ'-রূপে জীবনের শেষ কয়েকটি বৎসর সানন্দে অতিবাহিত করেন।

মূলাজোড়ের অনতিদূরে রহুতা গ্রাম।

সে গ্রামের দুই পণ্ডিত আমাদের নমস্য। দুই সহোদর ভ্রাতা। জ্যেষ্ঠ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় (জন্ম : 1840) কিশোর বয়সেই সংসারের দায়িত্ব নিতে বাধ্য হওয়ায় কোনও প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতে পারেননি, কোন ডিগ্রিও পাননি। কিন্তু অসীম অধ্যবসায়ে স্বীয় প্রচেষ্টায় বাঙলা, ইংরাজী, সংস্কৃত এবং গণিতে সুপণ্ডিত হয়েছিলেন। এবং আর একটি বড় কাজ করেছিলেন : অনুজ ভ্রাতাটিকে সুপণ্ডিত করে তুলেছিলেন। অর্থভাবে নিজ জীবনে যে ইচ্ছা পূরণ হয়নি, অনুজের ভিতর তা পরিস্ফুট করে তৃপ্তি পেয়েছিলেন।

রঙ্গলাল বীরভূমে একটি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করতেন। ডিগ্রি থাকা না-থাকা সে-আমলে বিদ্যার কোনও মানদণ্ড ছিল না। ঐ কাজ করতে করতেই 1880 সালে কলকাতায় একটি ছাপাখানা খুলে বসেন। পরে সেটি স্বগ্রামে অপসারিত করেন। দুরন্ত আত্মবিশ্বাসে ঐ ক্ষুদ্র ছাপাখানায় তিনি ছাপতে শুরু করেন বাঙলা ভাষার প্রথম 'বিশ্বকোষ'! কী দুর্জয় সাহস! অর্থবল নাই, সাহায্যকারী বলতে একমাত্র তাঁর অনুজ। তবু তিনি ঐ বৃহৎ কাজে নেমে পড়লেন।

প্রথম খণ্ডটি সম্পাদনা করলেন তাঁর অনুজ : ত্রৈলোক্যনাথ!

হ্যাঁ, সেই আশ্চর্য মানুষটি। যাঁর কলম থেকে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ব্যতিরেকেও জন্ম নিয়েছিল : কঙ্কাবতী, ডমরুচরিত! সমকালীন এক মহাপণ্ডিত। বিচিত্র তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বহুমুখী প্রতিভা। দীর্ঘদিন তিনি ছিলেন কলকাতা সংগ্রহশালার (ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের) সহকারী কিউরেটার। 1883 সালে সরকার তাঁকে বিলাতে পাঠান। প্রত্যাবর্তন করে লেখেন : ইউরোপ-ভ্রমণ।

রঙ্গলাল প্রবর্তিত এবং ত্রৈলোক্যনাথ সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ'-এর সেই প্রথম খণ্ডের অঙ্কুর কালে মহীরূহে রূপান্তরিত হয় আর একজন মনীষীর কৃতিত্বে : নগেন্দ্রনাথ বসু।

আজও গবেষকগণ বারে বারে শরণ নেন ঐ বাইশ খণ্ডে সমাপ্ত মহাগ্রন্থের।

মূলাজোড়ের নিকটবর্তী ঝাউগাছী গ্রামে একটি প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এটি

নির্মাণ করিয়েছিলেন বর্ধমানের তদানীন্তন নাবালক-মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের জননী—বর্গী আক্রমণের আশঙ্কায়। অবশ্য কারও কারও মতে ঐ ধ্বংসাবশেষ একটি প্রাচীন নীলকুঠির।

এবার শ্যামনগর স্টেশানের কাছে ঐ ব্রহ্মময়ী কালীমন্দিরের উপকথাটি শোনাই: তথ্যসূত্র একটি মাত্র পংক্তি: "কথিত আছে, পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহনের সাত বৎসর বয়স্কা কন্যা ব্রহ্মময়ীর মৃত্যু হইলে তাহার শব গঙ্গার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে মূলাজোড়ের ঘাটে গিয়া লাগে এবং সেরাত্রে গোপীমোহন স্বপ্নাদেশ···· পাইয়া এই মন্দির নির্মাণ করেন।"[১]

ডিহি-কলিকাতা

কিন্তু মূলাজোড়ের ব্রহ্মময়ী মন্দিরের গল্প শুনতে হলে ঐ খালটি তোমাদের পার হতে হবে, বাপু —'মারহাট্টা ডিচ'; প্রবেশ করতে হবে ডিহি কলকাতায়।

সুতানুটি-গোবিন্দপুরের ইতিহাসস্বীকৃত আদিম বাসিন্দাদের মধ্যে উল্লেখ করতে হবে জনার্দন শেঠ, আর রাজারাম মল্লিকের নাম, বলতে হবে বসাক আর পঞ্চানন কুশারীর কথা। ইংরেজ ঐতিহাসিকের মতে জনার্দনতনয় বৈষ্ণবচরণ শেঠ ছিলেন The richest and the most honest merchant of his time." এই ধনকুবের পরিবার যে পণ্যদ্রব্যটি নিয়ে আদি যুগে ব্যবসা ফেঁদে ছিলেন তা হচ্ছে বিশুদ্ধ গঙ্গোদক! 'কলিকাতার-কথা'-য় প্রমথনাথ মল্লিক জানাচ্ছেন, "বৈষ্ণবচরণ শেঠের পিতার শীলমোহর করা গঙ্গাজল দেশে-বিদেশে যাইত ও ত্রৈলঙ্গদেশে শ্রীশ্রীঁরামচন্দ্রের পূজায় ঐ জল ভিন্ন অন্য কোনও জল ব্যবহৃত হইত না।" বিশুদ্ধ গঙ্গাজল ক্রমে রূপান্তরিত হয়েছিল নিকষিত সুবর্ণে! রাজারাম মল্লিক আদিতে বাস করতেন ত্রিবেণীতে। ব্যবসায় সূত্রে পরে চলে আসেন কলকাতায়। তাঁর দুই পুত্র—দুজনেই আর্থিক মূল্যায়নে স্বনামধন্য: দর্পনারায়ণ ও সন্তোষ মল্লিক। শেষোক্তের নামের বাজারটি আজও বর্তমান।

আমাদের কাহিনীর সূত্র: পঞ্চানন কুশারী। তিনি বাস করতেন আদি গঙ্গার ধারে।

শোনা যায়, তাঁর পূর্বপুরুষ মহেশ্বর এবং তাঁর ভ্রাতা শুকদেব কুশারী পূর্বযুগে বাস করতেন যশোহরের বারোপাড়া গ্রামে। কী কারণে জানা যায় না, দুই ভাই তাঁদের যশোহরের আদি নিবাস ত্যাগ করে গোবিন্দপুর গ্রামে এসে ভদ্রাসন নির্মাণ করেন। এখানেও এক জনশ্রুতি: তাঁদের একজন পূর্বপুরুষকে নাকি মুসলমান সুলতান অথবা কাজী নিষিদ্ধ মাংস ভোজনে বাধ্য করেছিল! সেই সুবাদে নাকি স্বগ্রামে তাঁদের বসবাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ওঁরা উঠে আসেন গোবিন্দপুরে।

পঞ্চানন কুশারী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জাহাজী কারবারে যোগ দেন। তাঁর কাজ ছিল দেশী মেহনতি মানুষদের সাহায্যে বিদেশী বণিকদের জাহাজ থেকে মাল খালাস করা। ঐ সঙ্গে

(১) 'বাঙলায় ভ্রমণ', প্রথম খণ্ড; পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত, 1940

আগন্তুকদের প্রয়োজনীয় খাদ্যপানীয় সরবরাহ করা। পঞ্চানন তাঁর কর্মস্থলের কাছাকাছি, অর্থাৎ আদি গঙ্গার ধারে শূদ্র-অধ্যুষিত অঞ্চলে নির্মাণ করেন এক ক্ষুদ্রায়তন ভদ্রাসন। সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। জল-অচল জাতের মানুষ তাদের পাড়ায় একঘর ব্রাহ্মণ পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেল। ওঁরা পীরালী শ্রেণীর বৈদিক ব্রাহ্মণ। বামুন মানুষ—নাম ধরে তো আর ডাকা যায় না, তাই সবাই তাঁকে ডাকত: 'ঠাকুর-মশাই'। তা থেকেই উপাধিটা হয়ে গেল: ঠাকুর। 'কুশারী' উপাধী পরিত্যক্ত হল। সাহেবদের উচ্চারণে হল: টেগোর।

আমাদের কাহিনীর কালে, 1742 এ—অর্থাৎ মূলাজোড়ে ব্রহ্মময়ী মন্দির প্রতিষ্ঠার অর্ধশতাব্দী পূর্বে, কলকাতায় জরিপের কাজ শুরু হয়। পঞ্চানন তাঁর দুই পুত্র—জয়রাম ও রামসন্তোষকে লাগিয়ে দিলেন জরীপের কাজে—আমিন হিসাবে। জয়রামের দুই পুত্র—অগ্রজ নীলমণি হচ্ছেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের আদিপুরুষ—যে শাখায় কালে আবির্ভূত হবেন রবীন্দ্রনাথ। আর অনুজ দর্পনারায়ণ (1731-93) হচ্ছেন পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা।

আমিন হিসাবে জীবন শুরু করলেও দর্পনারায়ণ পরে চাকুরী নিয়েছিলেন একটি ফরাসী কোম্পানিতে; ক্রমে হুইলার-সাহেবের দেওয়ান। শেষে ইস্তফা দিয়ে নিজ ব্যবসায়। অচিরেই অগাধ সম্পত্তির মালিক। জ্যেষ্ঠভ্রাতা নীলমণির সঙ্গে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কিছু মতান্তর হওয়ায় পৃথক হন। পাথুরিয়াঘাটার সাবেক ভদ্রাসনে রয়ে গেলেন দর্পনারায়ণ, প্রাচীন ক্ষুদ্রায়তন গৃহটির স্থলে নির্মাণ করলেন বিরাট প্রাসাদ; অগ্রজ নীলমণিও তৈরী করলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি।

মূলাজোড়ের ব্রহ্মময়ী মন্দির প্রতিষ্ঠাতা গোপীমোহন ঠাকুর (1760-1819) দর্পনারায়ণের পুত্র। বস্তুত পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের দ্বিতীয় পুরুষ, অসাধারণ তাঁর পাণ্ডিত্য। অন্তত আটটি ভাষায় তাঁর অধিকার: ইংরাজী, ফরাসী, পর্তুগীজ, সংস্কৃত, ফারসী, উর্দু, হিন্দি ও বাঙলা। ব্রিটিশ সরকারে বরাবর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাক-রামমোহন যুগের এক আধুনিকমনা। পাশ্চাত্য-সংস্কৃতিকে চিনবার আগ্রহ তাঁর প্রবল। ইংরাজী শিক্ষার প্রসারকল্পে 'হিন্দু কালেজ' স্থাপনের সময় এককালীন দশ-হাজার টাকা দান করেন এবং 'হিন্দু-কালেজে'র বংশানুক্রমিক গভর্ণর পদও লাভ করেন। সংস্কৃত-চর্চায় উৎসাহী এই ধনকুবের সঙ্গীতজ্ঞ এমনকি ব্যায়ামবীরদেরও প্রতিপালন করতেন। এঁরই কন্যা ব্রহ্মময়ী।

ব্রহ্মময়ীর অনুজ ভ্রাতা প্রসন্নকুমার (1801-1868)—কৃতবিদ্য পি· এন· টেগোর। যিনি রক্ষণশীল হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও রামমোহনের সতীদাহ-নিবারণ আন্দোলনে সহযোগিতা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জন্ম হয় জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ব্রহ্মময়ীর মৃত্যুর পর।

এতক্ষণ যে-সব কথা বলেছি তা তথ্যনির্ভর ইতিহাস। তোমাদের সঙ্গে 'ব্লাইণ্ড' খেলব না বলে সবার আগে হাতের সবকটা তাসই বিছিয়ে দিয়েছি টেবিলে। এবার শোনাই শ্যামনগরে ব্রহ্মময়ী মন্দিরে সংগৃহীত উপকথা, কথাসাহিত্যিকের কল্পনায় মিশিয়ে:

সন 1793—অর্থাৎ পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-বংশের প্রতিষ্ঠাতা দর্পনারায়ণের মৃত্যু বৎসর।

কার্তিকের অমাবস্যা। পাথুরিয়াঘাটা প্রাসাদের দ্বিতলে দক্ষিণ-পূর্বে কর্তামশায়ের শয়নকক্ষ। বৃহদায়তন কামরা। উপরে ঝাড়লণ্ঠন, দেওয়াল-গিরিতে বাতি জ্বলছে। ঘরে বৃহদাকার পালঙ্ক।

উপরে টানা-পাঙ্খা, এখন চলছে না। এটির ব্যবহার ধনাঢ্য-পরিবারে সদ্য-আমদানি। কায়দাটা শিখিয়েছে ওলন্দাজেরা—যেমন তারা নিজেরা শিখেছে বঙ্গদেশে এসে আলবোলায় তাম্বাকু সেবন। দেওয়ালে প্রকাণ্ড কয়েকটি তেলরঙে-আঁকা প্রতিকৃতি-চিত্র : জয়রাম, নীলমণি আর দর্পনারায়ণের। এগুলি এতদিন ছিল একতলার বৈঠকখানায়। কর্তামশাই শয্যাশায়ী হয়ে পড়ার পর বর্তমানে তাঁর শয়নকক্ষে নিয়ে আসা হয়েছে। তাঁরই ইচ্ছায়। মানসিকভাবে তিনি ঐ প্রাচীনকালেই থাকতে ভালবাসেন। তৈলচিত্রগুলি এঁকেছেন একজন বিদেশী চিত্রকর, গোপীমোহনের উদ্যোগে। জয়রামের চিত্রটি আন্দাজে, বর্ণনা শুনে শুনে। বাকি দুটি সামনে বসিয়ে।

সন্ধ্যা অতিক্রান্ত। দীপাবলীতে কলকাতা শহর আলোকোজ্জ্বল। খোলা জানলা দিয়ে দেখা যায় আতসবাজির রোশনাই। এটিও ঐ ফিরিঙ্গিদের অবদান। দীপাবলী ছিল—শোনা যায়, শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয়ের পর অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের সময়েও শহরে দীপসজ্জা হয়েছিল; কিন্তু ঐ হাউই আর তুবড়ির চল হয়েছে বিদেশীরা আসার পর।

দর্পনারায়ণের বয়স এমন কিছু নয়—তিনকুড়ি দুই। কিন্তু শরীর ভেঙে গেছে। বস্তুত বুঝতে পেরেছেন, তাঁর কর্মময় জীবনের শেষ সীমান্তে উপনীত হয়েছেন তিনি। বিদায় নেবার দিন যত এগিয়ে আসছে ততই যেন সংসারের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইদানীং তাঁর সুবৃহৎ পালঙ্কে তিনি একা শয়ন করেন না। তাঁর আদরের নাতনিটি এসে গুটিগুটি শুয়ে পড়ে বৃদ্ধের পাঁজর ঘেঁষে। গোপীমোহনের জ্যেষ্ঠাকন্যা—সপ্তমবর্ষীয়া ব্রহ্মময়ী!

'ব্রহ্মময়ী'। নামটা উচ্চারণ করা শক্ত। কিন্তু কী করবেন? বাপের দেওয়া নাম—সেটাই চালু হয়েছে। পণ্ডিত ছেলে, উপেক্ষা করা যায়নি। সবাই ডাকে 'বড়খুকি'। উনি ডাকতেন 'ছোট্ট গিন্নি'। তাতে এতদিন আপত্তি ছিল না ওঁর নাতনির। ইদানীং—কথাটার অর্থ বুঝতে পারার পর, সে ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছে। তাই আজকাল ওকে ডাকেন 'দিদিভাই'। গতবৎসর ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পর থেকে। ব্রহ্মময়ীর ছোট ভাই নেই। সবাই ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেয়, ও বেচারি দিতে পারে না। তাই বৃদ্ধ সে দায়িত্বটুকু নিয়েছেন—ব্রহ্মময়ীর 'দাদা' সেজেছেন। ভারী ন্যাওটা মেয়েটা।

নিচে পূজাদালানে কর্মব্যস্ততা। আজ মধ্যরাত্রে মায়ের পূজা। বাড়িসুদ্ধ সবাই সেখানে জুটেছে। শুধু দলছুট দিদিভাই এসে টুমটুম হয়ে উঠে বসেছে দাদুর পালঙ্কে। সন্ধ্যাহ্নিক শেষ হলে প্রতিদিন বৃদ্ধ ওকে বিগতযুগের গল্প শোনান। আজও তাই চলছিল। কেষ্টা—ওঁর ব্যক্তিগত খিদ্‌মদ্‌গার, মার্বেল-মেঝেতে থাপন জুড়ে বসে ঊর্ধ্বমুখে সে গল্প শুনছিল।

—তারপর? তারপর কী হল দাদু?

—তিন-দিন একটানা বৃষ্টির পর শুরু হল ঝড়! উঃ! সে কী ভীষণ ঝড়! গঙ্গার জল ফুলে ফেঁপে উঠেছে। ডিহি-কলকাতার পথে-ঘাটে শুধু কাদা আর জল। সাহেবদের ব্রুহাম, হ্যানসম বের হচ্ছে না, পাল্‌কি-বেয়ারা পথে নামতে পারছে না। পথঘাট ভোঁ-ভাঁ! যে-যার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। তখন তো এমন দোকান-বাজার ছিল না। হপ্তায় দুদিন হাট বসত গোবিন্দপুরে—বেস্পতিবার আর রোব্বার। তা হাট বসবে কোথায়? সব তো জল থৈ-থৈ! যে-যার ভাঁড়ারের চিড়ে-মুড়ি খেয়ে অথবা পেটে কিল মেরে পড়ে আছে! এমন সময় এল

ঝড়! তাতেও নিস্তার নেই! সেই প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যেই হল ভূমিকম্প! আমার অল্প অল্প মনে পড়ে সে রাত্রের কথা! মনে হল—এবার সবাইকে একসঙ্গে মরতে হবে। দাদু আমাদের সবাইকে নিয়ে চৌকিতে উঠে বসেছেন। কল্‌কল করে ঘোলা জল ঢুকছে ঘরে…

ব্রহ্মময়ী জানতে চায়, আপনারা দোতলায় উঠে এলেন না কেন?

—কী পাগল মেয়ে রে তুই! তখন কি আমাদের পাকা দালান ছিল? আমরা সবাই থাকতাম খড়ো ঘরে, আদি গঙ্গার ধারে। আমরা তখন যে খুব গরিব—

—ঐ কেষ্টদার মতো?

দিদিমণির এই বোকার মতো প্রশ্নে দারুণ লজ্জা পেয়ে কেষ্টা মুখটা লুকায়। কানটা কিন্তু সজাগই থাকে। কর্তা-মশাই হাসতে হাসতে বলেন, না রে! কেষ্টা তো পাথুরেঘাটা ঠাকুরবাড়ির পেয়াদা—মস্ত বড়লোক—গায়ে পিরান চরায়! আমাদের অবস্থা ছিল আরও খারাপ।

—তারপর? তারপর?

—সব কথা তো আমার মনে নেই। তখন আমার বয়স এই তোর মতো। পরে শুনেছি। সাহেবদের গীর্জার মাথাটা ভেঙে গেসল; গোবিন্দরামের নবরত্নমন্দিরের চূড়োটাও গেল ভেঙে! কত লোক যে ডুবে মরে গেল, কত বাড়ি ভেঙে পড়ল তার আর লেখা-জোখা নেই!

দর্পনারায়ণ বর্ণনা করছিলেন 1737 খ্রীষ্টাব্দের সেই ঐতিহাসিক দিনটির: এগারোই অক্টোবর। তখন তাঁর বয়স ছয়-সাত। তার ঐতিহাসিক বিবরণ পাব 'অনারেব্‌ল জন কোম্পানির গুড ওল্ড ডেজ'-এ।

হলওয়েল-সাহেব বলেছিলেন মৃতের সংখ্যা তিন লক্ষ। সেটা নেহাৎই বাড়াবাড়ি। হলওয়েল-এর বদ-অভ্যাস সব কিছুই বাড়িয়ে বলা। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কলকাতার লোকসংখ্যাই এক লাখের কম। তবে হ্যাঁ—বিশ-ত্রিশ হাজার মানুষ ভেসে গেছিল নিশ্চয়। গঙ্গার জলস্ফীতি হয় প্রায় চল্লিশ ফুট! সমকালীন Gentleman's Magazine-এ প্রকাশিত সংবাদে বোঝা যায় যে, কয়েক হাজার নৌকা ডুবে যায়, অন্তত বারোখানি বড় জাহাজও ডুবে যায়। কলকাতার ইতিহাসে এতবড় প্রাকৃতিক দুর্বিপাক আর কখনো হয়নি। প্রমথনাথ মল্লিকের 'কলকাতার কথা' অনুযায়ী "ঝড় থামিবার পর জলমগ্ন জাহাজের গর্ভ হইতে মাল উদ্ধার করিবার চেষ্টা হয়। একে একে তিনজন ডুবুরি নামিয়া গেল, কিন্তু তাহারা আর ফিরিল না। শেষে দেখা যায় যে,এক প্রকাণ্ড কুম্ভীর সেই ডেকের মধ্যে উহাদিগকে জলপান করিয়াছে! পরে উহাকে বধ করিলে উহার উদর মধ্যে হইতে তাহাদের মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়।"

শুধু কলকাতা নয়, সমগ্র দক্ষিণবঙ্গই এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। পর বৎসর রাঢ় অঞ্চলে হয়েছিল অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ।

গল্পে বাধা পড়ল। নিভাননী দ্বারের প্রান্তে এসে দাঁড়ায়। অবগুণ্ঠনে মুখটি আবৃত করে। কর্তার সামনে সে প্রকাশ্যে কথা বলবে না; তাই কেষ্টাকে উঠে গিয়ে কানে-কানে শুনতে হল। কেষ্টা পরিচারিকার বার্তাটিকে বাঙ্ময় করে তোলে, দিদিমণি, বড়মা ডাকছেন। এবার আকাশ-পিদিম তোলা হবে। ছাদে এস!

ব্রহ্মময়ী তার বেড়াবেণীবাঁধা মাথা দুলিয়ে প্রতিবাদ করে, আমি যাব না! আমি যে এখন গল্পো শুনছি!

দর্পনারায়ণ ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করান। কার্তিক মাস ভর ভদ্রাসনের শীর্ষে আকাশ প্রদীপ জ্বালাতে হয়; যাতে স্বর্গত পূর্বপুরুষেরা পথ চিনে এসে তাঁদের অধঃস্তন পুরুষদের আশীর্বাদ করতে পারেন। প্রদীপটি যখন কপিকলের সাহায্যে বংশদণ্ডের শীর্ষে ওঠানো হয় তখন পরিবারের সকলে গৃহশীর্ষে সমবেত হয়ে পূর্বপুরুষদের প্রণাম করেন। এটাই প্রথা। কিন্তু ব্রহ্মময়ীর যুক্তি অন্য জাতের: আজ তো এ-বাড়ির ছাদে শত শত প্রদীপ! দাদুর বাবা-দাদাদের আজ আকাশ-পিদিম দরকারই হবে না! দর্পনারায়ণ তত্ত্বটা ওকে বুঝিয়ে দেন। রাজী করান।

ব্রহ্মময়ী ছাদে উঠে গেলে বৃদ্ধ আবার অতীত কালের স্মৃতিচারণে অবগাহন স্নান করতে থাকেন। এখন তিনি উত্থানশক্তিরহিত—গৃহশীর্ষে যাবার ক্ষমতা নাই। তাই এখানেই বসে বসে উদ্দেশ্যে প্রণাম করেন, প্রপিতামহকে, —পিতামহ, পিতা এবং জ্যেষ্ঠাভ্রাতাকে।

জ্যেষ্ঠাভ্রাতা নীলমণি স্বর্গে গেছেন মাত্র দুই বৎসর পূর্বে।

এককালে সম্পত্তি নিয়ে মনোমালিন্য হয়ে ছিল বটে; কিন্তু পৃথগন্ন হবার পর দু-ভায়ে সম্প্রীতি হয়েছিল পুনরায়। জয়রাম প্রয়াত হয়েছিলেন পলাশী যুদ্ধের পূর্ব বৎসর। তখন তাঁরা 'ধনসায়রে' বাস করতেন। অর্থাৎ বর্তমানে যেখানে ধর্মতলা স্ট্রীট এসে পড়েছে এসপ্লানেডে। দর্পনারায়ণের পিতৃদেব এবং খুল্লতাত তাঁদের আমলেই আদিগঙ্গার ধারের পর্ণকুটীর ত্যাগ করে সরে আসেন 'ধনসায়র'-এ। দুই ভাই—জয়রাম আর রামসন্তোষের সদ্ভাব ছিল আজীবন, ছিলেন একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত হয়ে। জয়রামের মৃত্যু-বৎসরে সিরাজউদ্দৌলা আক্রমণ করে বসে শহর কলকাতা। তখন সিরাজের তোপের মুখে যেসব বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার ভিতর ছিল ওঁদের ভদ্রাসন। পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর সিরাজের সেই 'হঠকারিতার' প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ নবাবের তহবিল থেকে কলকাতা-ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ দিতে হয় ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানিকে। ঠাকুর পরিবারও পেলেন খেশারৎ। সে অর্থে ধনসায়রের ভদ্রাসন মেরামত করার উদ্যোগ করতে করতেই এসে গেল ক্লাইভের ফতোয়া। সেটা 1758 খ্রীষ্টাব্দ। হুকুমনামা অনুযায়ী জানা গেল, ইংরেজ লালদীঘির ধারে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ বানাতে উদ্যোগী। সেই কেল্লার চৌহদ্দির মধ্যে যেসব 'জেন্টু'-র ভদ্রাসন পড়েছে তাদের অন্যত্র সরে যেতে হবে। এজন্য তারা ক্ষতিপূরণও পাবে।

এইসময় দুই ভাই—পরবর্তী জমানার নীলমণি আর দর্পনারায়ণ—সরে আসেন পাথুরিয়াঘাটায়। গড়ে তোলেন নতুন একটি মোকাম। মাঝারি আকার। কিন্তু তাতেই নির্বিবাদে বাস করতে থাকেন দুই ভাই—একান্নবর্তী হয়ে।

কেটে গেল এক দশক। তারপর নীলমণি ঠাকুর কোম্পানির দেওয়ানী-কাজ পেয়ে চলে গেলেন উড়িষ্যায়। কালেক্টারের সেরেস্তাদার হিসাবে। তাঁর পরিবার রয়ে গেল পাথুরিয়াঘাটা। এ কাজে নীলমণি প্রচুর অর্থোপার্জন করেন। দর্পনারায়ণ সে সময় ছিলেন ইংরেজ হুইলারের দেওয়ান। তিনিও প্রচুর অর্থোপার্জন করেন। অর্থই নাকি সকল অনর্থের মূল। মনোমালিন দেখা দিল। বিষয়-সম্পত্তি ভাগ হয়ে গেল। নগদ এক লক্ষ টাকা নিয়ে নীলমণি পাথুরিয়াঘাটার এজমালি বাড়ি ও দেবোত্তর সম্পত্তির উপস্বত্ব দর্পনারায়ণকে লিখে দিলেন। ততদিনে তিনি আবার ফিরে এসেছেন ডিহি-কলকাতায়। জোড়াবাগানের বৈষ্ণবচরণ শেঠের কাছ থেকে এব বিঘা জমি ক্রয় করেন জোড়াসাঁকোতে। নির্মাণ করেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। নির্মিত হয

পাথুরিয়াঘাটা

সেই স্বনামখ্যাত—'দক্ষিণের বারান্দা'।

দর্পনারায়ণও পাথুরিয়াঘাটার মোকামটিকে রূপান্তরিত করলেন প্রাসাদে।

এইসব পুরানো দিনের কথাই বসে বসে চিন্তা করেন দর্পনারায়ণ। তৈলচিত্রগুলির দিকে নির্নিমেষ-নেত্রে তাকিয়ে থাকতে থাকতে। প্রাসাদশীর্ষ থেকে ভেসে এল শঙ্খধ্বনি। অর্থাৎ আকাশ-প্রদীপ উঠে গেল কার্তিক অমাবস্যার অন্ধকার আকাশে।

দর্পনারায়ণ যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করালেন।

গোপীমোহন চিন্তিতমুখে বসেছিলেন বার-মহলে। বৈঠকখানায়। হুঁকো-বরদার রূপোর আলবোলায় তামাক সাজিয়ে দিয়ে গেছে, ফরসির নলটা ওঁর হাতে ধরা। কিন্তু টান দিচ্ছিলেন না। কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে তিনি চিন্তা করছিলেন—সংবাদটা কীভাবে বাবামশাইকে বলবেন? প্রায় দেড়-কুড়ি বয়স, সুন্দর সুগঠিত যুবাপুরুষ। সমকালীন প্রথা অগ্রাহ্য করে এই পীরালী ব্রাহ্মণটি একপত্নিক। একটিমাত্র সন্তান—কন্যা 'ব্রহ্মময়ী'। বড় আদরের। কন্যার নামটি তাঁর দেওয়া। বিচিত্র হেতুতে। এমন নাম এ পরিবারের পক্ষে অপ্রত্যাশিত। তাঁর পিতৃকুল শাক্ত—মেয়েদের নাম হয় তারা, কালী, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী। মাতৃকুল বৈষ্ণব—সে তরফে মেয়েদের নামগুলি লক্ষ্মী অথবা শ্রীরাধিকার ছায়া দিয়ে গড়া; যেমন তাঁর নিজের নামটি দাদামশায়ের দেওয়া। গোপীমোহন দুই-কুলের সমঝোতা করতেই এমন একটি নাম বেছে নিয়েছেন—এটাই ছিল সকলের বিশ্বাস। বাস্তবে তিনি নামটি চয়ন করেছিলেন সম্পূর্ণ অন্য হেতুতে। একটি কিশোরবয়স্ক ক্ষণজন্মা তার্কিকের প্রভাবে।

অপরাহ্নকালে কবিরাজ-মশাই এসে বাবা-মশায়ের নাড়ি দেখে গেছেন। জনান্তিকে গোপীমোহনকে জানিয়ে গেছেন—আপাতদৃষ্টিতে দর্পনারায়ণকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখাচ্ছে বটে—তিনি উঠে বসছেন, গল্পগাছাও করছেন—কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁর জীবনীশক্তি তিল-তিল করে নিঃশেষিত হয়ে আসছে। যে-কোন মুহূর্তে তাঁর কর্ণমূলে 'তারকব্রহ্ম' নাম শোনানো শুরু করতে হতে পারে। গোপীমোহনকে পরামর্শ দিয়েছেন, শ্যামা-মায়ের নিরঞ্জন হয়ে গেলেই যেন গঙ্গাযাত্রার আয়োজন করা হয়। দৃঢ় অভিমত জানিয়ে গেছেন—এমন অবস্থায় যেন কর্তামশাইকে পূজা-দালানে কোনক্রমেই নিয়ে আসার চেষ্টা না করা হয়।

এটাই ওঁর দুশ্চিন্তার হেতু। ঠাকুরদালানে মা-কালীর মূর্তিপূজা হবে আর দর্পনারায়ণ সেখানে উপস্থিত থাকবেন না—এটা যেন চিন্তাই করা যাচ্ছে না। বাবামশাইকে রাজী করাতেই হবে। কিন্তু কীভাবে?

পূজা গভীর রাত্রে। আত্মীয়-স্বজনে ভরা বাড়ি। নিমন্ত্রিতেরা এখনো আসতে শুরু করেনি। গোপীমোহন বৈঠকখানায় একটি ইজি-চেয়ারে বসে চিন্তা করছিলেন। দ্বাররক্ষক শিউশরণ এসে নত হয়ে প্রণাম করল, জানায় দক্ষিণপাড়ার চাটুজ্জেমশাই সাক্ষাৎপ্রার্থী। তাঁর সঙ্গে আছে একটি কিশোর।

'দক্ষিণপাড়া' বলতে মারহাট্টা-খালের দক্ষিণ পার। সেটা আগাছা আর জঙ্গলে আকীর্ণ। শৃগাল প্রচুর, খটাশ ও খরগোশ দেখা যায় সে অরণ্যে। কিছু কিছু অংশ সাফা করে মানুষে ভদ্রাসন তৈরী করছে। কারণ আছে। মানুষজন সেই জঙ্গল অতিক্রম করে আরও দক্ষিণে

যায়— মায়ের দর্শন লাভে। " মা" অর্থে কলিতীর্থ কালীঘাট। 'দক্ষিণপাড়া' অঞ্চলটার বর্তমান নাম : ভবানীপুর।

গোপীমোহন তাঁদের নিয়ে আসতে বললেন। দক্ষিণপাড়ার চিরসুহৃদ চট্টোপাধ্যায় মশায়ের পরিবারের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের দীর্ঘ দিনের সৌহার্দ্য।

এলেন ওঁরা দুজন। চিরসুহৃদ পঞ্চাশোর্ধ্ব। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। উত্তরীয়ের ফাঁক দিয়ে দীর্ঘ সামবেদী উপবীত দেখা যায়। নগ্নপদ। মাথায় কাঁচাপাকা চুলের ভিতর থেকে অর্কফলা পরিদৃশ্যমান, তার শেষপ্রান্তে একটি কলকে ফুল। সঙ্গে তাঁর কিশোরবয়স্ক পুত্র—তাকেও চেনেন : মদনমোহন। তার ঊর্ধ্বাঙ্গে ফাঁস-দেওয়া বেনিয়ান। মাথায় পাগড়ি। গোপীমোহন উঠে এলেন, বৃদ্ধের পদধূলি নিয়ে বলেন, আসুন, আসুন চাটুজ্জেকাকা! কী সৌভাগ্য আমার! আজ বচ্ছরকার দিনে আপনার পদধূলি পেলাম।

চিরসুহৃদ ওঁকে আশীর্বাদ করে ফরাসের একান্তে ধূলিধূসরিত পদযুগল গুটিয়ে উঠে বসেন। মদনমোহনও গোপীমোহনের চরণবন্দনা করে উপবেশন করে।

বৃদ্ধ প্রথমেই জানতে চাইলেন, দাদার শরীর গতিক এখন কেমন আছে, গোপী?

গোপীমোহন সংক্ষেপে তা জানালেন। কবিরাজমশায়ের শেষ নিদানটা অনুক্ত রইল। ইতিমধ্যে হুঁকো-বরদার কড়ি-বাঁধা হুঁকোয় তামাক দিয়ে গেছে। চিরসুহৃদ দর্পনারায়ণের বন্ধুস্থানীয়। ফলে তাঁর সম্মুখে গোপীমোহন তাম্বাকু সেবন করলেন না আর। পরবর্তী যুগের 'বাবু কালচারের' প্রভাবে উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ যেভাবে আর্থিক মূল্যায়নে নির্ধারিত হতে শুরু করে, তখনো সেই প্রবণতাটা কলকাতা সংস্কৃতিকে গ্রাস করেনি। রাধাকান্ত দেব (1783-1867) অথবা কালীপ্রসন্ন সিংহ (1840-70)-এর আমলে এ জাতীয় শিষ্টাচার পরিহার্য হয়েছিল। কিন্তু গোপীমোহন তার আগেকার জমানার মানুষ। ফরসির নলটি তিনি সরিয়ে রাখলেন।

প্রশ্ন করলেন, আপনার জামাতা বাবাজীবনের কোন সংবাদ পেলেন, চাটুজ্জেকাকা?

—হ্যাঁ, বাবা, পেয়েছি। সেজন্যই তোমার কাছে আসা।

একটু অবাক হলেন। নিরুদ্দিষ্ট জামাতা-বাবাজীবনের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে গোপীমোহনের কী সম্পর্ক থাকতে পারে? পুনরায় প্রশ্ন করেন, কী ব্যাপার? সে এখন কোথায়?

—মনে হয়, কলকাতাতেই আছে। ঠিক কোথায়, তা জানি না।

—কোথায় সাক্ষাৎ পেলেন তার?

—নিজেই সে এসেছিল আমার ভদ্রাসনে। দেখা-সাক্ষাৎ করে চলে গেল আবার।

—সন্ন্যাস নেয়নি তাহলে?

—মনে তো হল না। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে তেমন তো কিছু আশঙ্কা হল না।

—সে কেন গৃহত্যাগ করেছিল তা জানি; তা এতদিন কোথায় ছিল? কী বললে?

বৃদ্ধকে কেমন যেন অসহায় মনে হল। বলেন, শুনলুম সে নাকি হিমালয় ডিঙিয়ে তিব্বতে চলে গেসল।

—তিব্বত! সে তো অনেক দূর। দুর্গম পথ! হঠাৎ তিব্বত কেন?

বৃদ্ধ হতাশার ভঙ্গি করলেন। বোঝা গেল কারণটা তাঁর অজানা। গোপীমোহন অসহিষ্ণু হয়ে

প্রশ্ন করেন, কী আশ্চর্য! আপনি তা জানতে চাননি?

চাটুজ্জে-মশাই এবার স্বীকারই করলেন, কী জান বাবা? সম্পর্কে সে আমার জামাই। কিন্তু সত্যিকথাই বলছি গোপী—ওর চোখে-চোখ রেখে কথা বলতে আমার সাহস হয় না!

তা বটে! ঐ বিচিত্র জামাতা বাবাজীবনটিকে গোপীমোহন দেখেছেন। তার বিবাহে। তখন তার বয়স বছর পনের। চাটুজ্জে-মশায়ের কন্যা উমার বয়স নয়। পরেও তাকে একবার দেখেছেন—রাধানগরে। গোপীমোহনের মাতুলালয়ে, খানাকুল কৃষ্ণনগর সন্নিহিত ঐ রাধানগর গ্রামে। একটি সামাজিক নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে ঐ কিশোরবয়স্ক ছেলেটির—যার শ্বশুরমশাই তার চোখে-চোখে তাকিয়ে কথা বলতে সাহস পান না—তার সঙ্গে কিছু জনান্তিক আলাপচারীও হয়েছে। গোপীমোহন প্রগাঢ় পণ্ডিত এবং আধুনিকমনা শুনে সেই ষোড়শবর্ষীয় জামাতা বাবাজীবন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আলাপ করতে এগিয়ে আসে। প্রসঙ্গটা ছিল হিন্দুধর্মের তথাকথিত পৌত্তলিকতার বিষয়ে। গোপীমোহন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন সেই কিশোরটির মুখে ক্রমাগত আরবী-ফার্সি উদ্ধৃতি শুনে। হাফেজ, মৌলানা রুমি, শামী,তাব্রিজ প্রভৃতির বয়েৎ শুনে। উনি নিজে ফারসি জানেন ভালই, আরবী জানেন না—যেমন ছেলেটি জানে না ইংরাজী, সংস্কৃত। কিন্তু ভাষা নয়, গোপীমোহন মুগ্ধ হয়েছিলেন তার মৌলিক চিন্তাধারায়, তার ক্ষুরধার যুক্তিতে। ঐ কিশোরটির যুক্তি তিনি মেনে নিতে পারেননি, কিন্তু খণ্ডনও করতে পারেননি। বলেছিলেন, এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসার আগে তোমাকে ভাল করে সংস্কৃত অধ্যয়ন করতে হবে।

—জানি! এবার কাশীধামে যাব তাই। শুধু সংস্কৃত নয়, ইংরাজী, ফরাসীও শিখতে হবে।

পরে শুনেছিলেন, পিতৃদেবের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় কিশোব বিদ্রোহীটি গৃহত্যাগ করে। কিন্তু তিব্বতে গিয়েছিল কেন? যা হোক, এখন শোনা যাচ্ছে ছেলেটি আবার ভারত ভূখণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেছে। হিসাব মতো এখন তার বয়স উনিশ-কুড়ি।

. গোপীমোহন জানতে চান, আপনার জামাতার আরও দুটি বিবাহ, নয়?

—হ্যাঁ, তিনটি দার-পরিগ্রহ করেছে বটে, কিন্তু প্রথমা পত্নী জীবিতা নাই। দ্বিতীয়া, বর্ধমান জিলার কুড়মন-পলাশী গ্রামের। কনিষ্ঠা আমার কন্যা, উমা।

—যা হোক, তা আমি কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

বৃদ্ধ এবার সে-কথা সবিস্তারে নিবেদন করলেন।

ওঁর বৈবাহিক রাধানগর নিবাসী রামকান্ত বাঁড়ুজ্জে—না, বন্দ্যোপাধ্যায় নয়, 'রায়'। রামকান্তের পিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদে নবাব-সরকারে 'শিকদার'-এর কাজ করতেন। নবাবী খেতাব পান: 'রায়'। তাঁর নাতি, অর্থাৎ ওঁর বৈবাহিক রামকান্ত রায়ের সঙ্গে দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বিশেষ সৌহার্দ্য, দর্পনারায়ণই বয়োজ্যেষ্ঠ,তাঁকে শ্রদ্ধা করেন রামকান্ত। চাটুজ্জে-মশায়ের ধারণা—ওঁর জামাতা বাবাজীবন যে হঠকারিতা করে বসেছে, যে কারণে সে গৃহত্যাগী—তার সুরাহা হতে পারে, যদি রামকান্ত পুত্রকে ক্ষমা করেন। দর্পনারায়ণ কি এ বিষয়ে রামকান্তকে একটি পত্র দিতে পারেন না? পুত্রকে ক্ষমা করার অনুরোধ জানিয়ে?

গোপীমোহন বললেন না যে, তাঁর পিতৃদেবের এখন এ জাতীয় পত্ররচনার দৈহিক ক্ষমতা নেই। বরং বলেন, কিন্তু ডাকলে কি আপনার জামাই যাবে?

1493

এতক্ষণে কিশোর মদনমোহন যোগদান করে কথোপকথনে। বলে, দিদি বলেছিলেন, ওঁর বাবা ডেকে পাঠালে উনি যাবেন।

হিসাব মতো এখন উমারানী ষোড়শী। মদনমোহন তার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। মর্মান্তিক প্রয়োজন না থাকলে সে এই বড়োদের কথায় কথা বলত না। গোপীমোহন আন্দাজ করতে পারেন ব্যাপারটা। ওঁদের প্রতিশ্রুতি দেন, এ বিষয়ে যথাকর্তব্য করা হবে।

স্থির করেন বাবা-মশায়ের জবানীতে পত্রখানি তিনিই লিখে পাঠাবেন।

নিশ্চিন্ত হলেন চাটুজ্জে মশাই।

সে রাত্রে অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা হল দর্পনারায়ণের।

কবিরাজ-মশায়ের নির্দেশটা মেনে নিতে হল। উপায় কী? পাথুরিয়াঘাটা-প্রাসাদের ঠাকুরদালানে মায়ের পূজা হবে, কিন্তু তখন কর্তামশাই সেখানে কুশাসনের উপর বজ্রাসনে বসে থাকতে পারবেন না। নাতনি এসে জনান্তিকে প্রশ্ন করেছিল, আপনার মনে মনে খুব কষ্ট হচ্ছে, না দাদু-ভাই?

—না রে। এটাই যে মায়েব ইচ্ছা। মা তো শুধু মৃন্ময়ী নন, তিনি যে চিন্ময়ীও বটে!

—তার মানে?

—তার মানে আমি এই পালঙ্কে বসে বসেই তাঁকে ধ্যান করব। সে মূর্তি তো আমার মনে আঁকা হয়ে আছে।

তা আছে। জয়রাম কুশাবীর স্বপ্নে পাওয়া ধ্যানমূর্তি—'হরউরে ললিতাসনে' বসে আছেন জগজ্জননী। দক্ষিণ চরণ প্রলম্বিত—শতদল পঙ্কজের উপর স্থাপিত, বামপদ দক্ষিণজানুর উপর ন্যস্ত। চতুর্ভুজা মূর্তি। খড়্গ, নৃমুণ্ড, বর ও অভয়। নয়ন মুদ্রিত করলেই দেখতে পান।

নাতনি যখন তাঁর শয্যায় উঠে দাদুর পাঁজর ঘেঁষে শুয়ে পড়ল তখন বৃদ্ধ বিস্মিত হয়ে বললেন, একি রে? পূজা দেখবি না?

নাতনি বললে, নাঃ।

বৃদ্ধ জানেন তার হেতুটা। বলির ঐ মর্মান্তিক দৃশ্যটি বরদাস্ত করতে পারে না দিদিভাই। তাছাড়া অত রাত পর্যন্ত কি জেগে থাকতে পারে?

বাজি পটকার শব্দ—পূজাদালানে ঢাকের বাদ্যি—তাতে নিদ্রার কোনও ব্যাঘাত হল না সপ্তমবর্ষীয়া নাতনির। দাদুর পাশে চুপটি করে শুয়েই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ল। সারাদিন দৌড়ঝাঁপ, দুরন্তপনা তো কম করেনি। কিন্তু দর্পনারায়ণের চোখে নিদ্রার কোন আভাস নেই। যত মোলায়েম ভাবেই বলে থাক, গোপীমোহনের কথায় উনি বুঝতে পেরেছেন ঠিকই—কবিরাজ-মশাই শেষ নিদান শুনিয়ে গেছেন। এখন বাঁধন ছেঁড়ার পালা। তিল-তিল করে যা সঞ্চয় করেছেন—এই প্রাসাদ, জমিদারী, আসবাব, ঘর-গেরস্থালী সব, স—ব পিছনে ফেলে একলা চলার পথে রওনা হবার লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে। খেদ নেই বৃদ্ধের—যা রেখে গেলেন, অপব্যয় না করলে তা সপ্তপুরুষ নিঃশেষ করতে পারবে না। এই তো দুনিয়াদারীর নিয়ম—উপযুক্ত উত্তরাধিকারের হাতে সব কিছু সমর্পণ করে মায়ের কোলে ফিরে যাওয়া। ভরা সংসার পড়ে রইল পিছনে। গোপী, বধূমাতা. কন্যা-জামাতা, ব্রহ্মময়ী। গোপীমোহনের

পুত্রসন্তান এখনো হয়নি; কিন্তু কী-বা বয়স তার? ঘর আলো করে আসবে সোনার চাঁদেরা।

ক্রমে ঘনিয়ে এল রাত্রি। গবাক্ষপথে দেখা যায়, প্রতিবেশীদের ভদ্রাসনে যেসব প্রদীপ জ্বলছিল তা একে-একে নিবে গেল। লক্ষ্য হল, প্রদীপগুলি নির্বাপিত হওয়ার আগে কেমন যেন দপ্ দপ্ করে ওঠে। উনিও কি সেভাবেই প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবেন নিবে যাবার আগে? ঘনিয়ে এল কার্তিক-অমাবস্যা রাত্রির ঘনান্ধকার। মাঝে-মাঝে হাউই উঠে যাচ্ছে কোনও উৎসববাড়ি থেকে—নৈশাকাশে আলোকের ছটা ছড়িয়ে দিয়ে অনিবার্য নিয়তির টানে ফিরে আসছে একমুঠি ছাই! এ-ঘরেও একটি প্রদীপ জ্বলছে পিলশুজের উপর—সারারাত্রিই জ্বলে। কক্ষটা তাই আলো-আঁধারী। কেষ্টা মেঝের উপর মাদুর বিছিয়ে শুয়েছে। সারারাত সে এঘরে থাকে, কর্তার কখন কী প্রয়োজন হয়।

মধ্যরাত্রি। ঠাকুর-দালানে ঢাকের বাদ্যি প্রবলতর হয়ে উঠল ক্রমে। দর্পনারায়ণ বোধকরি কিছুক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। ঢাকের বাদ্যিতে ঘুমটা ভেঙে গেল। উঠে বসলেন শয্যায়। পদ্মাসনে। ইতিমধ্যে কক্ষের প্রদীপটিও নির্বাপিত হয়েছে। বারান্দার দেওয়াল-গিরিতে জ্বলছে মোমের বাতি। তাতেই ঘরটা আলো-আঁধারী। নিমীলিত নেত্রে দর্পনারায়ণ মায়ের ধ্যান করতে থাকেন।

কতক্ষণ নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো পদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন ছিলেন তার আন্দাজ নেই। পূজা-দালানে ঢাকের বাদ্যি নিরবচ্ছিন্নভাবে শোনা যাচ্ছে। সহসা ঘ্রাণে লাভ করলেন অদ্ভুত একটা পদ্মগন্ধ। বোধকরি ঠাকুর দালানে ওরা যে অগুরু ধূপ জ্বেলেছে তারই সৌরভ ভেসে আসছে দ্বিতলে। ধীরে ধীরে ধ্যানমগ্ন আঁখি-পল্লব দুটি উন্মীলিত হয়ে গেল। সম্মুখে অন্ধকারের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের ভিতর মায়ের স্বরূপ অন্বেষণের প্রচেষ্টা। চমকে উঠলেন বৃদ্ধ।

এ কী!

অন্ধকারের ভিতর তাঁর দৃষ্টিসম্মুখে ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে উঠল একটি মাতৃমূর্তি!

না! এ কোন দৃষ্টিবিভ্রম নয়! স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রম নয়! চর্মচক্ষুতেই দেখছেন উনি। অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে যেন রূপান্তরিত হল ওঁর ধ্যানে-দেখা জননীমূর্তিতে।

মা দিগাঙ্গনা নন, বামস্কন্ধের উপর আঁচলের আভাস। চতুর্ভুজাও নন—দ্বিভুজা। খর্পর এবং নৃমুণ্ডকে পরিহার করে দুই হস্তে শুধু বরাভয় মুদ্রা। শয্যার অপরপ্রান্তে, একই পালঙ্কে শিবশবের উপর বসে আছেন জগজ্জননী—ললিতাসনে! জননী যেন বালিকা!

সহসা গবাক্ষ-পথে ভেসে এল এক হঠাৎ-আলোর-ঝলকানি—কোন গৃহশীর্ষ থেকে হাউই বুঝি উঠেছে অমারাত্রির অন্ধকার ভেদ করে। সেই ক্ষণপ্রভার দ্যুতিতে রহস্যভেদ হয়ে গেল বৃদ্ধের। রোমাঞ্চিত তনুদেহ শান্ত হয়ে গেল আবার।

বৃদ্ধ বললেন, দিদিভাই?

—উ?

—তুই ওখানে ওভাবে বসে আছিস কেন রে?

উপাধানের উপর ললিতাসনে বসে ছিল ব্রহ্মময়ী—নিথর, নিস্পন্দ! বললে, আপনার জন্যেই তো আমি মা-কালী হয়ে বসে আছি। নইলে আপনি ধ্যান করবেন কী করে?

কী পাগল মেয়ে!

1793

নাতনিকে পাঁজর-সর্বস্ব বুকে জড়িয়ে ধরলেন বৃদ্ধ।

পরদিন। নিষ্ঠুর উদ্যতবজ্র নিয়তি যে এভাবে নেপথ্যে প্রতীক্ষা করছিল তা কেউ আশঙ্কা করেনি। অতর্কিতে নেমে এল সেই বজ্র পাথুরিয়াঘাটার প্রাসাদে। উৎসব-গৃহে মুহূর্তমধ্যে দেখা দিল শ্মশানের হাহাকার!

কর্তামশাই যে তাঁর কর্মময় জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়েছেন তা জানতে কারও বাকি ছিল না। মায়ের নিরঞ্জন সমাপনান্তে যে কর্তামশায়ের গঙ্গাযাত্রার আয়োজন হচ্ছে এ-কথা গোপন রাখার চেষ্টা হলেও বস্তুত সকলেরই জানা। সেজন্য মানসিকভাবে সকলে প্রস্তুত। কিন্তু এ কী হয়ে গেল! কেন, কেন এমনটা হয়?

প্রতিদিনের মতো প্রত্যুষে ব্রহ্মময়ী গিয়েছিল প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে, পুষ্পচয়নে। হঠাৎ তার গগনবিদারী আর্তনাদ শুনে লোকজন ছুটে গেল। যা হবার নয়, তাই হয়েছে। পুষ্পবিতানে এক বিষধর সর্প দংশন করেছে বালিকাকে।

এ উদ্যানে সাপের উপদ্রব ছিল না। তাছাড়া কার্তিক মাস। এসময়ে সর্পকুল তাদের শীতকালীন যোগনিদ্রায় অভিভূত থাকে। কিন্তু—'নিয়তি কেন বাধ্যতে?

ধরাধরি করে ওকে নিয়ে আসা হল বৈঠকখানায়। ছোটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি। ওঝা, গুণীন, কবিরাজ! কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। দ্বিপ্রহরের পূর্বেই সব সব যন্ত্রণার অবসান হল।

গোপীমোহন যেন পাথর হয়ে গেলেন। অন্তঃপুরে ব্রহ্মময়ীর গর্ভধারিণী মূর্ছাগতা; কিন্তু সেখানে তাঁর কোন কর্তব্য নাই। পিসিমাতা ঠাকরুণ আছেন, বড়বাড়ির বৌঠানরাও দুঃসংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছেন জোড়াসাঁকো থেকে। আত্মীয়-স্বজনেরা যথাকর্তব্য করছে। সংবাদটি গোপন রাখার চেষ্টা হয়েছিল কর্তামশাইয়ের কাছ থেকে—সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বাবামশাই কী করছেন, জানেন না। গোপীমোহন প্রগাঢ় পণ্ডিত—সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত করতে যাওয়া বৃথা। তাঁকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে এল না কেউ। তিনি নিজেও কোন সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছেন না।

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়···"!

জীর্ণানি? সে যে ছিল টাট্‌কা জুঁই ফুলের মতো তরতাজা! এ বাড়িতে সেই তো এসেছিল সবার শেষে! আজ কেন তাকে বিদায় নিতে হবে সবার আগে? কে দিয়েছে এই বিধান? পরম করুণাময়ী?

প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য শোভাযাত্রার বিরাট আয়োজন হয়েছিল। প্রতিবারই হয়। সারি সারি গো-গাড়িতে সঙ-সাজানো আছে। চলন্ত গো-শকটে পুতুলনাচের আয়োজন। গুদামঘর থেকে

বার করা হয়েছে নয়-জোড়া তেরমুখী কারবাইড গ্যাসের ঝাড়। বাজনাদারেরা বায়না পেয়ে হাজির হয়েছে। বিচিত্র সাজে। এমনকি পথের ধারে ধারে সমবেত হয়েছে মানুষজন, যারা প্রতি বছর এসে বসে থাকে পথের ধারে—পাথুরেঘাটা ঠাকুরবাড়ির নিরঞ্জন শোভাযাত্রা দেখতে।

কেউ ওঁর পরামর্শ নিতে এল না। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বড়দাই হুকুম দিলেন—শোভাযাত্রা হবে না। শাস্ত্রীয় বিধানে যেটুকু না করলেই নয়, তাই করা হবে। সন্ধ্যালগ্নে প্রতিমা নিরঞ্জন করে বাহকেরা ফিরে আসবে।

রাত্রেই ব্রহ্মময়ীকে নিয়ে যেতে হবে শ্মশানে।

কে-যেন এসে খবর দিয়ে গেল—বাবামশাই ডেকে পাঠিয়েছেন।

গোপীমোহন নিজেকে শক্ত করেন। অনিবার্য নিয়তিকে মেনে নিতে হয়। মনে পড়ে যায় বৃদ্ধের কথা। কী প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন তিনি! গতকাল অপরাহ্ণে উনি গোপন করতে চাইলেও বৃদ্ধ বুঝতে পেরেছিলেন—কবিরাজ-মশাই কী নিদান দিয়ে গেছেন। নিজেই বলেছিলেন, মায়ের নিরঞ্জন হয়ে গেলে গঙ্গাযাত্রার আয়োজন করিস, গুপী। কালীঘাটে।

বৃদ্ধ মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এমন সময় শেষ মুহূর্তে তাঁকে পেতে হল এই কুলিশকঠোর আঘাত । দ্বিপ্রহরে পাথুরিয়াঘাটার রাজপ্রাসাদ যখন হঠাৎ বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল আর্ত ক্রন্দনরোলে তখন বৃদ্ধের বোধহয় বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে যায়। তিনি নিজে-নিজে পালঙ্ক থেকে নেমে পড়তে চান—কী-উদ্দেশ্য ছিল তা তিনিই জানেন—ভারসাম্য রক্ষিত হয়নি। পড়ে যান মেঝেতে। তারপর থেকে তাঁর বাম অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত—বাম হস্ত ও বাম পদ!

ধীরপদে গোপীমোহন এসে দাঁড়ালেন পিতৃদেবের শয্যাপ্রান্তে।

বৃদ্ধ তাঁর ডান হাতে ধরলেন পুত্রের হাতখানি। আকর্ষণ করলেন নিজের দিকে।

গোপীমোহন এগিয়ে এলেন কাছে। বৃদ্ধ ওঁকে আকর্ষণ করলেন। মাথাটা টেনে নামিয়ে নিলেন নিজের বুকের উপর। আর আত্মসংযম করা সম্ভবপর হল না স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতের। পিতার পাঁজরসর্বস্ব বুকে মুখ লুকিয়ে হুহু করে কেঁদে ফেললেন।

বৃদ্ধ ওঁর কর্ণমূলে হঠাৎ অদ্ভুত একটা কথা বললেন। নিতান্ত পাগলের প্রলাপ : দিদিভাইকে যেন চিতায় তুলিস্‌নি গুপী! নরম শরীর! আগুনের তাপ সইবে না!

দর্পনারায়ণ বোধকরি প্রবেশ করেছেন তাঁর দ্বিতীয় শৈশবে! তাঁর আদরের নাতনি যে শীতাতপ রাজ্যের ওপারে চলে গেছে সে বোধটুকুও নেই!

বিধান দিলেন শিরোমণি-মশাই। দু-দিক রক্ষা হল।

চিতায় না তুলে মরদেহ কীভাবে সৎকার করা যাবে? কবর তো দেওয়া যায় না। ওদিকে—হোক শিশুসুলভ চাপল্য—পিতার এই অযৌক্তিক শেষ আদেশ লঙ্ঘনই বা করেন কী করে? দু-দিক রক্ষা করে কুল-পুরোহিত বিধান দিলেন—সর্পদংশনে মৃত্যু হয় যার, তাকে ভেলায় ভাসিয়ে দেওয়া শাস্ত্রসম্মত। তাকে দাহ করতে নেই। লক্ষ্মীন্দরের মরদেহ এভাবেই সৎকার করা হয়েছিল। অগত্যা।

কিন্তু মন থেকে মেনে নিতে পারছিলেন না গোপীমোহন। তাঁর বিশ্বাস, এ প্রথাটি বর্জনীয়। এতে গঙ্গার জল দূষিত হয়ে যায়। তাছাড়া আগুনের উত্তাপ যার সহ্য হয় না সে কি সইতে

1503

পারে কাক-শকুনের বীভৎস আক্রমণ ? কামট-কুম্ভীরের কদর্য দংশন ! নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা মতো তিনি জ্যাকবের মাধ্যমে আনিয়ে নিলেন একটি ছোট্ট কফিন। ব্রহ্মময়ীকে কফিনজাত করে ভাসিয়ে দেওয়া হল কলার ভেলায়। তখন গঙ্গায় জোয়ার এসেছে। ছোট্ট মেয়েটা কপিলমুনির আশ্রমের দিকে গেল না। এগিয়ে চলল উজানে, ঢেউয়ের দোলায় নাচতে নাচতে। ঠিক যেভাবে আলতা-পায়ে, নোলক দুলিয়ে সে সারা বাড়ি নেচে বেড়াত।

পরদিন আবার ডাক পড়ল দ্বিতলের কক্ষে—কর্তামশাই ডাকছেন।

ইতিমধ্যে দুজনেই কিছুটা সামলেছেন। দিন কারও অপেক্ষায় বসে থাকে না। ব্রহ্মময়ীর গর্ভধারিণীও উঠে বসেছেন। সংসারের কাজ—যেটুকু না করলে নয়—করা হচ্ছে। শুধু মাত্র একটি দুরন্ত মেয়েকে আর সারা বাড়ি দাপিয়ে বেড়াতে দেখা যায় না।

কর্তামশাই এবার যে-কথা বললেন তাও অপ্রত্যাশিত।

তিনি অনুভব করেছেন, তাঁর সময় হয়েছে। গঙ্গাযাত্রার আয়োজন এবার করা চলতে পারে। তবে কালীঘাটে নয়। মূলাজোড়ে!

মূলাজোড়ে ? কেন ?

বিচিত্র হেতু। পূর্বরাত্রে দর্পনারায়ণ স্বপ্নে তাঁর নাতনিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। দিদিভাইকে উনি স্বপ্নে দেখেছেন প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর ললিতাসনে! সে তার দাদুকে জানিয়েছে—তার কোন যন্ত্রণা নেই, সে ব্রহ্মময়ীতে বিলীন হয়ে গেছে। আরও বলেছে, সে মূলাজোড়ের শ্মশানঘাটে তার দাদাভাইয়ের জন্য প্রতীক্ষা করছে।

—দেরী করবেন না যেন দাদাভাই, ভাইফোঁটা নিতে হবে না?

হোক মৃত্যুপথযাত্রীর প্রলাপ, পিতার আদেশ জীবনে কোনদিন লঙ্ঘন করেননি। আজও করলেন না। এ ব্যবস্থা করা আর কঠিন কী?

বজরা করে রওনা দিলেন ওঁরা। সঙ্গে আরও দুটি নৌকা। তাতে আত্মীয়স্বজনেরা। হরি-সংকীর্তনের দল। শিরোমণি-মশাই, কবিরাজ-মশাই ইত্যাদিরা।

মূলাজোড়ে ছুটে গেল অশ্বারোহী ব্যবস্থাপক। ওঁরা উপনীত হবার পূর্বেই সব আয়োজন সম্পূর্ণ। সংবাদ পেয়ে মূলাজোড় গ্রামের ইতর-ভদ্র সমবেত হয়েছে শ্মশানঘাটে। পাথুরিয়াঘাটার রাজামশাই—হ্যাঁ, রাজামশাই বইকি—দর্পনারায়ণকে সবাই এক ডাকে চেনে—কালীঘাটকে উপেক্ষা করে মূলাজোড়ে এসেছেন গঙ্গাযাত্রায়! জনসমাগম তো হতেই পারে।

মহাশ্মশানে জনারণ্য। কাতারে কাতারে মানুষ। পাথুরিয়াঘাটার দর্পনারায়ণ ঠাকুর বজরায় করে এসেছেন মূলাজোড়ে। কলিতীর্থ কালীঘাটকে উপেক্ষা করে। গঙ্গার তীরে খাটানো হয়েছে প্রকাণ্ড একটা সামিয়ানা। তার এক দিকে চিকের আড়াল। সেখানে অপেক্ষা করছেন পুরললনার দল—গোপীমোহনের সহধর্মিণী, পিসিমারা, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মহিলাবৃন্দ। পরের বজরায় এসেছেন তাঁরা। দর্পনারায়ণের দেহ একটি পালঙ্কে শায়িত। তাঁর অর্ধ-অঙ্গ গঙ্গাতীরে, অর্ধ-অঙ্গ গঙ্গানীরে। না, অর্ধ-অঙ্গ নয়, শুধু বলিরেখাঙ্কিত চরণদুটি জলস্পর্শ করছে। ছোট ছোট ঢেউ এসে আঘাত করছে চরণদ্বয়ে—ছলাৎ ছল, ছলাৎ ছল। একদল কীর্তনীয়া

পালঙ্কটি পরিক্রমা করছে হরিসংকীর্তন করতে করতে। গঙ্গায় পরিক্রমা করার সময় তাদের হাঁটু-জলে নেমে যেতে হচ্ছে। কিছু দূরে বসে শিরোমণি শ্রীমদ্ভগবৎগীতা পাঠ করে চলেছেন:

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥"

কবিরাজ-মশাই মাঝে মাঝে অগ্রসর হয়ে আসছেন, নাড়ির গতি পরীক্ষা করে যাচ্ছেন। তাঁর দক্ষিণহস্তে একটি সাবেক বালুকা-ঘড়ি। বলছেন, তাঁর গণনা অভ্রান্ত—সূর্যাস্তকালে দর্পনারায়ণের প্রাণবায়ু পটাকাশে বিলীন হয়ে যাবে। দর্পনারায়ণের শিয়রের কাছে বসে আছেন গোপীমোহন। কিছুক্ষণ পরে পরে গঙ্গোদক ঢেলে দিচ্ছেন বৃদ্ধের বিশুষ্ক ওষ্ঠাধরে। তারকব্রহ্ম নাম শোনাচ্ছেন। দর্পনারায়ণের বাম অঙ্গ পড়ে গেছে; তবু পূর্ণজ্ঞান আছে তাঁর। মাঝে মাঝে দু-একটি কথাও বলছেন। অধিকাংশ সময়ে নির্নিমেষ নয়নে শেষবারের মতো তাকিয়ে দেখছেন এই রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শময় জগৎকে।

মনে হল, বৃদ্ধ কিছু বলতে চান। গোপীমোহন তাঁর কর্ণমূল অগ্রসর করে দিলেন। প্রশ্ন করলেন, কিছু বলবেন?

—হুঁ! আজ তো শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি?

সেই পাগলের প্রলাপ! বৃদ্ধ বিদায়কালে জানতে চাইছেন, আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কিনা। গোপীমোহন তাঁকে জানালেন।

—দি—দি-ভাই আসেনি?

এর কী জবাব?

ঠিক তখনই অগ্রসর হয়ে এলেন মূলাজোড়ের সর্বানন্দ বাচস্পতিমশাই। গোপীমোহনের পাশে এসে বললেন, আপনাকে এ সময়ে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে বড় বিব্রত বোধ করছি। কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আসতে হয়েছে।

—বলুন?

—আমাদের একটি সমস্যায় আপনাকে কিছু বিধান দিতে হবে।

—বিধান? শাস্ত্রীয় বিধান? আমি দেব আপনাকে?

বাচস্পতিমশাই সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেন সমস্যাটা এমন যে, শুধু শাস্ত্রজ্ঞ হলেই তার সমাধান লাভ করা যাবে না। তাকে ফেরঙ্গ ব্যাপারেও পণ্ডিত হতে হবে।

বাধ্য হয়ে ঘাটে উঠে এলেন গোপীমোহন। দেখলেন মূলাজোড়ের আরও কয়েকজন এসেছেন একই হেতুতে। বাচস্পতিমশাই তাঁদের সকলের হয়ে ঘটনাটি বিবৃত করেন।

গতকাল জোয়ারের সময় গঙ্গাস্রোতে ভাসতে ভাসতে একটি কফিন এসে ঠেকেছে মূলাজোড়ের স্নানঘাটে। 'কফিন' বস্তুটাকে ওঁরা চেনেন—ফেরঙ্গরা ঐরকম কাঠের বাক্সে মৃতদেহকে রক্ষিত করে কবর দেয়—যেমন দেয় মুসলমানেরা। ফলে কফিনের ভিতরে যে দেহটি আছে—যতই ছোট হোক—সেটি বিধর্মীর। প্রশ্ন হচ্ছে, কফিনসমেত মৃতদেহকে ভূগর্ভস্থ গর্তে স্থাপিত করাই প্রথা—কী সাহেবদের, কী মুসলমানের। কোন দুর্জ্ঞেয় হেতুতে ওটিকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হয়েছে ওঁরা আন্দাজ করতে পারছেন না। জোয়ারের জলের সঙ্গে সেটি যদি ভেসে যেত তাহলে মূলাজোড়ের দায়িত্ব থাকত না; কিন্তু তা যায়নি। এক্ষেত্রে কী

1742

করণীয়? মৃতদেহকে ওখানে পচতে দেওয়া যায় না—চণ্ডাল দিয়ে সৎকার করানো অসম্ভব নয়; কিন্তু তাতে বিধর্মীরা আপত্তি করবে না তো? গোপীমোহন যেহেতু ফারসিতে আলিম, ইংরেজিতে পণ্ডিত, তাই তাঁর নির্দেশ চাইতে এসেছেন ওঁরা।

দর্পনারায়ণকে স্বপ্নে ঠিকই বলেছিল ব্রহ্মময়ী।

দাদাভাইয়ের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বলেছিল, 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যম-দুয়ারে পড়ল কাঁটা!'

তবে ভাই-বোন দুজনেই তখন যমদুয়ারের কণ্টকময় পথ অতিক্রম করে বৈকুণ্ঠলোকে উপনীত। একই চিতায় দাহ করা হল দুজনকে। দ্বিতীয়া তিথি তখনও ছিল।

তোমরা যদি শ্যামনগরে যাও ব্রহ্মময়ীর মন্দিরে প্রণাম করে এস।

ব্রহ্মময়ী নামটি অসামান্য পণ্ডিত গোপীমোহন ঠাকুরেব দেওয়া; কিন্তু তোমরা এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ সে নামটি তিনি চয়ন করেছিলেন যে কিশোরবয়স্ক বিদ্রোহীর প্রভাবে তিনি 'অসামান্যতর' পণ্ডিত। ইতিহাসে সেই দক্ষিণপাড়ার চাটুজ্জে-মশায়ের নিরুদ্দিষ্ট জামাতা বাবাজীবনেব নাম:

রাজা রামমোহন রায়।

মাহেশ

'তবু ভরিল না চিত্ত'।

দীর্ঘদিন ভাগীরথীর দুই তীরে তীর্থ পবিক্রমা কবে রূপেন্দ্রনাথ ফিবে চললেন মাহেশে।

অনেক-অনেক কিছু দেখলেন। বর্ধিষ্ণু গণ্ডগ্রাম, আলিবর্দীর শাসনে ব্যবসা-বাণিজ্য চলেছে নির্বিঘ্নে। তাঁতিরা তাঁত চালায়, কুম্ভকাবেরা চাকা ঘোরায়, রেশমশিল্পীরা কাপড় বোনে। চাষীরা মাঠে মাঠে ফলায় সোনার ফসল। গ্রামজীবনের মধ্যমণি ব্রাহ্মণ-সমাজ—মহামহোপাধ্যায়েরা ন্যায়ের ভাষ্য নিয়ে চুলচেরা বিচার করেন। পাঠশালা, টোল, চতুষ্পাঠী—কিন্তু যে 'পরশপাথর' খুঁজছেন তার দেখা পেলেন না। কোন পাঠশালায় নজরে পড়ল না বেণী-দোলানো ডাগর-চোখো কোনও বালিকা অথবা কিশোরী। ওদের অক্ষর-পরিচয় হওয়া মানা, খাগের কলম স্পর্শ করায় নিষেধ, এমনকি কোন বাদ্যযন্ত্র বাজানোতেও আপত্তি। সেসব নিষিদ্ধ কাজ তো শুধু বারবণিতাদের জন্য। ভদ্রঘরের মেয়ে গান গাইবে কী? পুঁথির পাতা ওল্টাবে কী? বড়জোর মুখে মুখে শিখতে পারে কিছু শুভঙ্করীর আর্যা, কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, নামতা।

জল-অচল অচ্ছুতেরা বাস করে অন্তেবাসীর মতো ভদ্রপল্লীর বাহিরে। তারাও গঙ্গাস্নান করে, তবে বামুন-ঘাটে নয়। পথেঘাটে সতর্ক হয়ে চলে, যেন তাদের ছায়াপাত না ঘটে বামুন-গায়ে।

সে নীরন্ধ্র অন্ধকারে রাজা-রাম, বিদ্যাসাগর বা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের আভাসমাত্র নাই। প্রায় তিন'শ বছর আগে যে বিদ্রোহী গৌড়মণ্ডলকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন প্রেমের বন্যায়, তাঁর প্রভাবও লুপ্ত হতে বসেছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় সমৃদ্ধিলাভ করেছে সন্দেহ নেই, শাক্ত-গৌড়রাজ্যের পরিমণ্ডলে সে ধর্ম এতদিনে সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তা আচার-সর্বস্ব! মূল তত্ত্ব থেকে তারা সরে গেছে। তারা মাথা কামায়, তিলক সেবা করে, খঞ্জনী বাজিয়ে মাধুকরী করে ফেরে আর কিশোরী-ভজনের তাল খোঁজে। চৈতন্যদেবের যে ঋজু ধর্মমত—আচণ্ডালকে কোলে টেনে নিয়ে হরিনাম বিতরণ করা—তা থেকে ওরা সরে গেছে। কূপমণ্ডূক ব্রাহ্মণ্যসমাজের টুলো-পণ্ডিতদের বিধানে অথবা প্রতিপত্তিশালীদের ষড়যন্ত্রে যাদের জাত গেছে তারাই হয়েছে বোষ্টম; ঠিক যেভাবে প্রাক্-শঙ্করাচার্য যুগে জাত খুইয়ে দিশেহারা মানুষগুলো ঝুঁকেছিল বৌদ্ধধর্মের দিকে, নাথ-সম্প্রদায়ের আশ্রয়ে। মুষ্টিমেয় কিছু সাত্ত্বিক বৈষ্ণব—প্রভু নিত্যানন্দের প্রভাবে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, ত্রিবেণী, তেঘড়া, ভাটপাড়ায়, আর বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর প্রভাবে তাঁদের উত্তরসাধকেরা গাঙ্গেয় উপত্যকায় আজও সেই প্রেমের ঠাকুরের পবিত্র দীপশিখাটি জ্বালিয়ে রেখেছেন। কিন্তু তাঁদের প্রভাবক্ষেত্র সীমিত—আখড়ার চৌহদ্দীতে, আশ্রমের সীমান্তে অথবা নিজ নিজ ভদ্রাসনে।

রূপেন্দ্র অনেক কিছু দেখলেন—বর্তমানের স্বরূপ, অতীতের উত্তরাধিকার; কিন্তু যা খুঁজছেন তার কোনও ইঙ্গিত নেই। এই গাঙ্গেয় উপত্যকায় 'তিনি' এখনো এসে পৌঁছাননি—সেই যাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করছেন: 'পরিত্রাণায় সাধূনাম, বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।"

এতদিনে মনে পড়ে যাচ্ছে অতীত জীবনের কথা। দেশঘরের কথা। ফেলে আসা পথপ্রান্তের নানান স্মৃতি। দেশ ছাড়ার পর গঙ্গা-কাতু অথবা জগুপিসির কোন খবর পাননি। মৃন্ময়ী? হিসাবমতো এতদিনে তার সেই পরীক্ষা শেষ হয়েছে। কী হয়েছে তার? পুত্রবতী হতে পেরেছে কি?

পরিচিত মানুষ বলতে একটি মাত্র লোকের সঙ্গে ঘটনাচক্রে সাক্ষাৎ হয়েছিল একদিন। গঙ্গার পারানি-ঘাটে: নবা বায়েন। দূর থেকে ওঁকে দেখতে পেয়েই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। ছুটে এগিয়ে এসেছিল কাছে। ঘাড় থেকে ঢাকটা নামিয়ে ঘাটের পাষাণ রানায় রেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। স্পর্শ বাঁচিয়ে। হঠাৎ গাঁয়ের মানুষকে দেখে রূপেন্দ্রও আনন্দে ওকে বুকে টেনে নেন। নবা লজ্জিত হয়ে বলে, ছুঁয়ে ফ্যাললেন ঠাকুর।

—দূর বোকা। এ যে মা গঙ্গার ঘাট! এখানে কি ছোঁয়াছুয়ি হয়? এক অঞ্জলি গঙ্গা মাথায় ছিটিয়ে দিলেই তো সব শুদ্ধি! তারপর? তুই কোথায় যাচ্ছিস?

নবা জানায় সে ঢাক নিয়ে শহর কলকাতার দিকে চলেছে। কর্মসংস্থান মানসে। শুনেছে, অনেক-অনেক ধনাঢ্য-ব্যক্তি নতুন-নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা করছেন। বাঁধা-মাহিনার ঢাকী কি কারও প্রয়োজন নেই?

কেন যে সে গ্রাম ত্যাগ করে কর্মসংস্থানে এ-ভাবে বার হয়ে এসেছে সেটা স্বীকার করল না। এমনকি রূপেন্দ্র যখন জানতে চাইলেন—ওর ভাই হয়েছে না বোন, তখনও মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, জান্নে ঠাউরমশাই। গাঁয়ের খবর মোরে শুধোবেননি!

কী একটা বেদনার ভারে সে দেশত্যাগী। স্বীকার করতে পারছে না। রূপেন্দ্র পীড়াপীড়ি করেননি।

ওরা তো সব দূরগ্রামের মানুষ, হাতের কাছে রাধা-বোষ্টমীর কী শেষগতি হল সে খবরটাও জানতে পারেননি। পরদিন ফরাসডাঙার সেই যাত্রী-আবাসে সংবাদ নিতে গিয়ে চৌকিদারের কাছে খবর পান, তারা চলে গেছে—একত্রে, অথবা পৃথক পৃথক, তাও জানে না চৌকিদার। কোন গীর্জায় কি যুগলে গিয়ে সমস্যার সমাধান খুঁজে ছিল? না কি ভাঙা পাত্রের দুটি অংশ জোড় বাঁধেনি? জানেন না। মঞ্জুকে রাধা-বোষ্টমীর অন্তিম সংবাদটা আর জানাননি।

সেই 'মা ব্রুয়াৎ···' সূত্র অনুসারে।

সূর্য এখন বৃষরাশিতে। দেশভ্রমণের উপযুক্ত সময় এটা নয়। নির্মেঘ আকাশে অনলবর্ষী দাবদাহ। সমস্ত প্রকৃতি রুদ্ধশ্বাসে প্রহর গণে, কোন শুভ মুহূর্তে নৈঋত-কোণ থেকে ধেয়ে আসবে পুষ্কর মেঘের 'কালবৈশাখী' আশীর্বাদ। ক্লান্ত ঘুঘুর ঘুমজড়ানো কূজন, মাঝে-মাঝে ফটিক-জলের আর্তি।

রূপেন্দ্র মাহেশে ফিরে এসে কদিন বিশ্রাম নিলেন।

মঞ্জুর এখন অন্য এক রূপ—আসন্ন মাতৃত্বের: অপর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা—যেন পুষ্পমঞ্জরীর ভারে নুয়ে-পড়া পল্লবশাখা। গতি হয়েছে শ্লথ, মুখাবয়বে একটা দীপ্তি। রূপেন্দ্র ওকে বিস্তারিত বর্ণনা দেন—এ কয়দিন কী দেখেছেন, দে-গাঁর রাজার সেই করুণ কাহিনী, যুগল-পারাবতের; রামপ্রসাদের কর্মচ্যুতির বিবরণ; জগদীশ পণ্ডিতের অসাধ্যসাধন: দারুময় ব্রহ্মকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র থেকে গৌড়মণ্ডলে বহন করে নিয়ে আসা। করলগ্নকপোলে মঞ্জু নিশ্চুপ শুনে যায়।

রূপেন্দ্র বলেন, অনেকদিন দেশের খবর পাইনি। তোমার তো এখনো মাস দুই-তিন বাকি, একবার চট্ করে সোঞাই ঘুরে আসব?

মঞ্জু বললে, তা যদি বল, তাহলে বলব, অনেক আগেই তোমার যাওয়া উচিত ছিল। যখন মীনুদি তোমার পথ চেয়ে ছিল।

রূপেন্দ্র লজ্জা পান। বস্তুত মঞ্জুর এই আসন্ন-মাতৃত্বের মূর্তিটাতেই তিনি কিছু বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল সেই নিভৃত সন্ধ্যাটির কথা। প্রায়ান্ধকার নির্জন কক্ষ। ওঁরা শুধু দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। দুর্গা-খুড়ো এগিয়ে গেছেন পাল্‌কি বেয়ারাদের সন্ধানে। অনবগুণ্ঠিতা মীনু-খুড়িমা অস্ফুটে সেদিন বলেছিল—সোনাদা! শেষ সময়ে আমি যদি তোমার পায়ের ধুলো নিতে হাত বাড়াই, তুমি পিছিয়ে যেও না যেন!

রূপেন্দ্র সলজ্জে বলেন, আমি কি শুধু মীনু-খুড়িমার জন্যই ব্যস্ত হয়েছি?

—হলেও লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। সে বেচারি তোমার ভরসাতেই ছিল তো?

--মানে?

মঞ্জু চোখে-চোখে তাকায়। বলে, দেখ, আমি লেখাপড়া শিখিনি। মুখ্যু! কিন্তু তা বলে এটুকুও কি বুঝব না?

—কোনটুকু?

—মীনুদি তোমাকে কী-চোখে দেখে! কেন শোভারানী আমাদের সেই ফুলশয্যার রাতে অমনভাবে বিঁধেছিল মীনুদিকে, আর কেনই বা সে ম্লান হয়ে গেছিল।

রূপেন্দ্র অনেকক্ষণ জবাব দিলেন না। তারপর কথা ঘোরাতে বলেন, জান, সেদিন নবা বায়েনের সঙ্গে হঠাৎ গঙ্গার ঘাটে দেখা হয়ে গেল।

মঞ্জু জানতে চায় নবা বায়েন লোকটা কে। রূপেন্দ্র বিস্তারিত সব কথা জানালেন। যমুনার সেই সতী হতে যাওয়ার কাহিনী। মঞ্জু সে-কথা ভাসা-ভাসা জানত। আজ বিস্তারিত জানল। দুজনে অনেক আলোচনা করেও স্থির করে উঠতে পারলেন না—কেন নবা বায়েন গাঁ-ছেড়ে বার হয়ে পড়েছে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে। শেষে মঞ্জু বলে, আমার সঙ্গেও একজন চেনা লোকের হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। দিন পনের আগে। ওরা যুগলে এসেছিল তোমার খোঁজে।

—ওরা! মানে? কাদের কথা বলছ?

—রাধাদি আর রাম-রহিম!

—রহিমও এসেছিল?

—রহিম নয় গো, 'রাম-রহিম দরবেশ'!

বিচিত্র সংবাদ! রহিম অথবা রাধা প্রভু যীশু বা মেরী মাতার শরণ নিতে যায়নি। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অনুদার, কূপমণ্ডূকদের নির্দেশে চলে; তবু ব্রাহ্মণ্যধর্ম উদার, সর্বংসহা, যুগে-যুগে ঐ কূপমণ্ডূকদের সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেছেন সাধকবৃন্দ! সব সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবে এই ভারতে! রাম-রহিম তার সঙ্গিনীর হাত ধরে রূপেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, জানাতে এসেছিল তার কৃতজ্ঞতা। তার পরিধানে তাপ্পি-দেওয়া আলখাল্লা, হাতে একতারা, চূড়ো-করে বাঁধা তার বাবরি চুল। পাঁজর ঘেঁষে ওর সাধনসঙ্গিনী: রাধা।

ওরা কবীরপন্থী। জাত-পাত মানে না। সত্যসুন্দরের দিশারী।

গুরু রামানন্দের দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে কবীর সর্ববিখ্যাত। তিনি হিন্দুশাস্ত্রের গোঁড়ামি আর মোল্লাদের ধর্মান্ধতাকে তুল্যভাবে তিরস্কার করেন। সম্ভবত জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন জোলা। তাঁর দোঁহা—

"প্রথম হি রূপ জোলাহা কীন্হা।
চারি বরণ মোহি কানুন চীন্হা।
রামানন্দ গুরু দীক্ষা দেহু।
গুরুপূজা কছু হম সোঁ লেহু।।"[১]

---

(১) প্রথমে আমি ছিলাম জোলা। চারি বর্ণের মধ্যে কেউ আমাকে চিনত না। গুরু রামানন্দ! তুমি আমাকে দীক্ষা দাও! আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদানের অনুমতি দাও।

মহাত্মা কবীর যে ধর্মমত প্রচার করেন তা না-হিন্দুর, না-মুসলমানের। তা মিলিত হিন্দু-মুসলমানের। জাত-পাতের বিভেদ তিনি মানেননি। অথচ তাঁর দেহাবসানের পর বিবাদ দেখা দিল দুই সম্প্রদায়ের—কীভাবে তাঁর মরদেহের সৎকার হবে। অলৌকিক ভাবে সে লৌকিক বিবাদের মীমাংসা হয়ে যায়। তাঁর মৃতদেহ রূপান্তরিত হয়ে যায় এক মুঠি পদ্মফুলে। সে ফুলের অর্ধাংশ নিয়ে কাশীনরেশ বীরসিংহ মণিকর্ণিকার ঘাটে দাহ করেন, বাকি অর্ধেক গোরক্ষপুরে সমাধিস্থ করেন মুসলমান-নেতা বিজলিখান। কবীর বলেছিলেন:

"জাতি পাঁতি কুল কাপড়া যেহুঁ শোভা দিন চারি।
কহে কবীর শুনো হো রামানন্দ যেউ রহে ঝকমারি!!
জাতি হমারি বাণী কুল করতা উর মাহি।
কুটুম্ব হমারে সন্ত হায় কোই মুরখ সমঝল নাহি" ॥[১]

তা বটে! বেদ-বেদান্ত গুলে খেয়েছেন রূপেন্দ্রনাথ, তবু সন্ধান দিতে পারেননি। ঐ রাম-রহিম আর রাধাকে বলেছিলেন হিন্দু-মুসলমান ধর্মে ওদের আশ্রয় হতে পারে না। বিদেশী ধর্মের দ্বারস্থ না হলে ওদের সমস্যার সমাধান নাই। অথচ ঐ অর্ধশিক্ষিত রাম-রহিম আর তার সঙ্গিনী সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছে এই 'মহাভারতের' ধর্মে। সন্ত কবীর ওদের দিশারী!

রাম-রহিম নাকি মঞ্জুকে বলেছিল, কই গো বৌঠান? আমার গুরু-মুর্শেদ কই? তাঁরে ডেকে দিন। সেলাম-পেন্নাম দুটোই তো করতে হবে।

মঞ্জু হেসে বলেছিল, তিনি তীর্থদর্শনে গেছেন।

রাম-রহিম দরবেশ বলেছিল, সে কী! গুরু-মুর্শেদ মন্দির-মসজিদে গেছেন মালা-টপকাতে? শুনুন বৌঠান:

"মনকা ফেরৎ জনম গয়ো, গয়ো ন মন্‌কা ফের।
করকা মন্‌কা ছোড় কর মন্‌কা মন্‌কা ফের!!"[২]

রূপেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ স্থির হয়ে কী-যেন ভাবতে থাকেন। তারপর মনস্থির করে বলেন, আজ তোমাকে একটা কথা বলব মঞ্জু। ভেবেছিলাম এ-কথা কোনদিনই জানাব না; কিন্তু মনে হচ্ছে তা গোপন করে যাওয়া অন্যায় হবে। তুমিও এতদিন বিস্তারিত জানতে চাওনি। আমি ঐ রাধা-বোষ্টমী আর রাম-রহিমের কথাটা বলতে চাইছি।

ভারী মিষ্টি করে হাসল মঞ্জু। বললে, থাক! তোমাকে বলতে হবে না। আমি তা জানি। আর একথাও জানি, কেন সঙ্কোচে সে-কথা এতদিনে আমার কাছে বলনি!

রূপেন্দ্রনাথ অবাক হয়ে যান। বলেন, কে বলেছে? রাধা?

—শুধু রাধাদি বলবে কেন? আমি নিজের চোখেই তো দেখেছি!

(১) জাতি, পাঁতি, কুল, কাপড় এসব শোভা তো দু-চার দিনের। কবীর বলেন, শুন গুরু রামানন্দ! এসব বিলকুল ঝকমারি! আমার বচনই আমার জাতি; আমার হৃদয়েশ্বরই আমার কুল, আর সাধুজন আমার কুটুম্ব। কবে যে মূর্খগুলো এ-কথা বুঝবে!

(২) জপমালার গুটিক ঘূর্ণন করতে করতে জীবন বিকিয়ে গেল, অথচ মনের ঘোর কাটল না। ওরে ভাই, হাতের মালা টপ্‌কানো বন্ধ করে মনের মালা টপ্‌কানো অভ্যাস কর!

বিস্তারিত জানায়। সেই প্রথম দর্শনেই রাধা এসে যখন আচমকা রূপেন্দ্রনাথের হাত চেপে ধরে তখনই বুঝতে পেরেছিল মঞ্জু। মেয়েরা এ বিষয়ে ভুল করে না। তারপর সেই হাটতলার চণ্ডীমণ্ডপে শেষ রাত্রে যখন রাধা শয্যাত্যাগ করে ঘনিয়ে এসেছিল রূপেন্দ্রর কাছে তখনও সে সব কিছু দেখেছে, শুনেছে। সাড়া দেয়নি। তারপরেও নানান ছোট ছোট ঘটনা।

রাধা ওকে বাকিটা জানিয়ে গেছে। অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। কোনও সঙ্কোচ করেনি। এমনকি ফরাসডাঙার নাকা-দরওয়াজা অতিক্রম করার পর নির্জন সাঁকোর ধারে ওদের ঘনিষ্ঠ প্রেম-বিনিময়। রাধা অসঙ্কোচে জানিয়ে ছিল, সে আত্মসংবরণ করতে পারেনি। রূপেন্দ্রনাথকে সবলে আকর্ষণ করে মুখচুম্বন করেছিল!

তারপর ওদের ফরাসডাঙার অতিথিশালায় আশ্রয় লাভ। কীভাবে রূপেন্দ্র তাকে তুলে দিয়েছিলেন রাম-রহিমের হাতে। নিঃশব্দে সরে গিয়েছিলেন অন্তরালে!

রূপেন্দ্রনাথ রীতিমতো অবাক হয়ে বলেন, আশ্চর্য! তুমি সব জান! কই আমাকে তো কিছু বলনি?

মঞ্জু হাসি লুকিয়ে বলে, তুমিও তো আমাকে কিছু বলনি!

—আমার গোপন করার একটা অর্থ হয়। বলতে পার, সঙ্কোচ, অথবা তোমাকে দাগা দিতে চাইনি বলে। কিন্তু তোমার ঈর্ষা হল না কেন? তুমি আমার কৈফিয়ৎ চাইলে না কেন?

—ঈর্ষা হবে কেন? গৌর তো ইচ্ছে করলে আমাদের ভাগ্যটা বদলে দিতেও পারতেন! তা তিনি দেননি, এতে কি ঈর্ষা হওয়ার কথা? এ তো আমার সৌভাগ্য!

—ভাগ্য বদলানো মানে?

—রাধাদির মূর্ছা রোগ হতে পারত, তাকেই গো-গাড়ি করে সেই মোহান্ত তোমার কাছে পাঠাতে পারতেন। আমি, আমি হয়তো সে ক্ষেত্রে ...

রূপেন্দ্রনাথ ওকে বুকে টেনে নিয়ে বলেন, তোমার আজ অন্য এক রূপ দেখলাম মঞ্জু। 'এ-তুমি' আমার অচেনা ছিলে এতদিন!

মঞ্জু আবেশে ওঁকে জড়িয়ে ধরে।

রূপেন্দ্র বলেন, তুমি আমাকে সন্তান দিয়েছ, তোমার একটা পুরস্কার পাওনা! বল, কী নিয়ে আসব তোমার জন্যে এবার তীর্থ করে ফেরার সময়।

ভারী সুন্দর জবাব দিল মঞ্জু। বললে, তুমি না প্রথম দিনই বলেছিলে স্বামী আর স্ত্রীর সমান অধিকার! তাহলে ও-কথা বলছ কেন? 'আত্মদীপ' আসছে; কিন্তু কে-কাকে উপহার দিল তার তো হিসাব হয়নি আজও!

তা বটে! তবু রূপেন্দ্রনাথ বলেন, তা হোক, তুমি আজ যে উদার মনের পরিচয় দিলে সেটাকে পুরস্কৃত করা আমার কর্তব্য।

মঞ্জু বললে, তাহলে আমি যা চাইব তা দেবে?

—দেব, যদি আমার সাধ্যের মধ্যে হয়। বল?

—আমার বড় সাধ—ঐ বড়মার মতো তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলার। তুমি আমাকে লেখাপড়া শেখাবে? লুকিয়ে লুকিয়ে?

রূপেন্দ্র শয্যাপ্রান্তে উঠে বসেন। এমন একটি গোপন বাসনা যে মঞ্জুর অন্তরে লুকিয়ে আছে

1742

তা আন্দাজ করতে পারেননি। অবাক হয়ে বলেন, তোমার ভয় হয় না? লোকে বলে, লেখা-পড়া শিখলে ...

মঞ্জু তার হাতটা বাড়িয়ে চাপা দেয় ওঁর মুখ। বলে, ও-কথা বল না! বড়মা তো প্রমাণ করে দিয়েছেন সেটা ভুল। তুমিও তো তাই বলে থাক।

—তা বলি। কিন্তু বড়মাকে জেঠামশায়ের সঙ্গে কখনো তত্ত্বকথা বলতে শুনেছ?

—না, শুনিনি; কিন্তু রাধাদি তোমার সঙ্গে কীভাষায় কথা বলত তা তো শুনেছি। আমি গান গাইতে পারি না, কেউ শেখায়নি, কিন্তু ...

—বুঝেছি। তাই হবে মঞ্জু। শেখাব, তোমাকে বাঙলা পড়তে-লিখতে শেখাব। সংস্কৃতও শিখবে। কিন্তু এখানে তো তা সম্ভবপর নয়। এখানে সুযোগ হবে না। জানাজানি হয়ে যাবে। গুরুজনেরা কেউ যদি একবার নিষেধ করেন ...

—না, না, এখানে নয়। সোঞাই ফিরে গিয়ে।

—সেই ভাল। কথা দিচ্ছি, আত্মদীপের হাতেখড়ি দেবে তার মা, বাবা নয়। অক্ষর পরিচয়ও করাবে তার মা। সেই যেমন কাশী-রাজমহিষী মদালসা করিয়েছিলেন রাজপুত্র অলর্কের। কিন্তু এটা তো আমার ইচ্ছাপূরণ হল না, মঞ্জু?

—হল না? তুমি চাও না আমি লেখাপড়া শিখি?

—তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। সে-কথা বলছি না। আমি তোমাকে পুরস্কৃত করতে চাইলাম, আর উল্টে তুমিই তা আমাকে করে দিলে!

মঞ্জু আবার মিষ্টি করে হাসল। বলে, কিন্তু সেটাই তো নিয়ম। দেওয়া আর নেওয়ার আনন্দ যদি সমান না হয় তবে কিসের এই স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক!

বাঃ! মাতৃত্ব-গৌরবে মঞ্জু আজ অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে!

বণিকের মানদণ্ড
1498—1757
ষষ্ঠ পর্ব

সমকালীন ভারতবর্ষ বুঝতে পারেনি তত্ত্বটা : 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার।' দু-তিন শ' বছরের ব্যবধানে সুবিধাজনক মালভূমিতে দাঁড়িয়ে সেজন্য তাকে দোষারোপ করা ঠিক নয়। প্রথম কথা, সমকালে, একই কালীক সমতলে দাঁড়িয়ে এ জাতীয় তত্ত্ব বোঝা যায় না। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত। সক্রেটিস বা যীশুখ্রীষ্টের বিচারকও তা বুঝতে পারেনি। প্রণিধান করতে পারেননি গ্যালিলেওর সমকালীন পোপ। দ্বিতীয় কথা, আদি যুগে পশ্চিমের দ্বার দিয়ে যারা এসেছিল তারা ঐ মন্ত্রটা বিশ্বাস করত না : 'দিবে আর নিবে'। তারা এসেছিল শুধু লুট করতে। ফলে, ভারতবর্ষের দৃষ্টিভঙ্গিটাও হয়ে উঠেছিল প্রত্যাশিতভাবে শত্রুভাবাপন্ন।

আমাদের আরও একটা স্বভাবগত দোষ ছিল : ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজ ছিল বড় বেশি সহিষ্ণু। তাই কূপমণ্ডূক টুলো পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে কোনও মার্টিন লুথার, রেজা খাঁ বা দেবী সিংহের বিরুদ্ধে কোনও অলিভার ক্রমওয়েল এখানে মাথা তুলে দাঁড়ায়নি। প্রতিবাদ হয়েছে, এখানে-ওখানে, গৌরবে তাকে আমরা বিদ্রোহও বলে থাকি; কিন্তু তা রাজ্যব্যাপী ব্যাপক আকার ধারণ করেনি।

সব কিছু 'বেদ-এ আছে' বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করার কিছু নেই। য়ুরোপ যখন চাষবাস জানত না, কাঁচা মাংস খেত তখন আমরা নগরের পত্তন করেছি, পরমপুরুষের স্বরূপ প্রণিধানে সচেষ্ট হয়েছি—একথা যেমন সত্য, তেমনি অন্ধযুগ অতিক্রমণে য়ুরোপ যখন রেনেসাঁয় প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে তখন আমরা সতীদাহ, বহুবিবাহ, জাতিভেদ জাতীয় কুসংস্কারে মগ্নচৈতন্য হয়ে পড়েছিলাম এ কথাও সলজ্জে স্বীকার্য।

'বেঙ্গল রেনেসাঁ' বা বাঙলার নব জাগরণ হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। নিঃসন্দেহে তার প্রথম শঙ্খনির্ঘোষ করেছিলেন রাজা রামমোহন। তিনিই প্রথম পাশ্চাত্ত্য ভাষার মাধ্যমে তৌল করতে চেয়েছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে—গ্রীক, রোমক, ফরাসী সভ্যতার তত্ত্বে। তিনিই প্রথম প্রণিধান করতে পেরেছিলেন পৌত্তলিকতায়, আনুষ্ঠানিক সংস্কারে কী-ভাবে রুদ্ধ হয়ে গেছে

বেদ-উপনিষদের জ্ঞানচর্চা। উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করে তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি স্বচক্ষে পশ্চিমখণ্ডের সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ মূল্যায়ন করতে ছুটে গিয়েছিলেন।

কিন্তু রাজা রামকে স্বয়ম্ভূ মনে করা ভুল। তাঁর প্রাগ্বর্তী যুগেও কেউ কেউ নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন ঐ পশ্চিমের দ্বার দিয়েই আসবে জ্ঞানের আলো। তাঁদের কথা আমরা জানতে পারি না। তাঁরা ইতিহাসে হারিয়ে গেছেন। আমার কল্পনায় তাঁদের এক সম্ভাব্য প্রতীক: পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর। যিনি পশ্চিমের পরকলায় জীবনকে দেখতে চেয়েছিলেন। কুসংস্কারচ্ছন্ন ও কূপমণ্ডূক সমাজকে ভেঙে নতুন করে গড়ার প্রয়োজনটা নিশ্চয়ই অনেকে প্রণিধান করেছেন। তাঁরা সে সুযোগ পাননি তাঁদের জীবনে।

আবার বলি, আমার কল্পনায় তার আর এক প্রতীক: হটী বিদ্যালঙ্কারের পিতৃদেব।

এই পশ্চিমের দরজাটা কী ভাবে ধীরে ধীরে খুলে গেল সে-কথা এবার বলি।

সেই ধারাবাহিকতা পৃথকভাবে বর্ণনা করব বলেই ভাগীরথী তীরের তীর্থ-পরিক্রমা কালে আমরা কয়েকটি জনপদের কথা অনুক্ত রেখেছিলাম: সপ্তগ্রাম, ব্যাণ্ডেল, হুগলী, ওলন্দাজনগর।

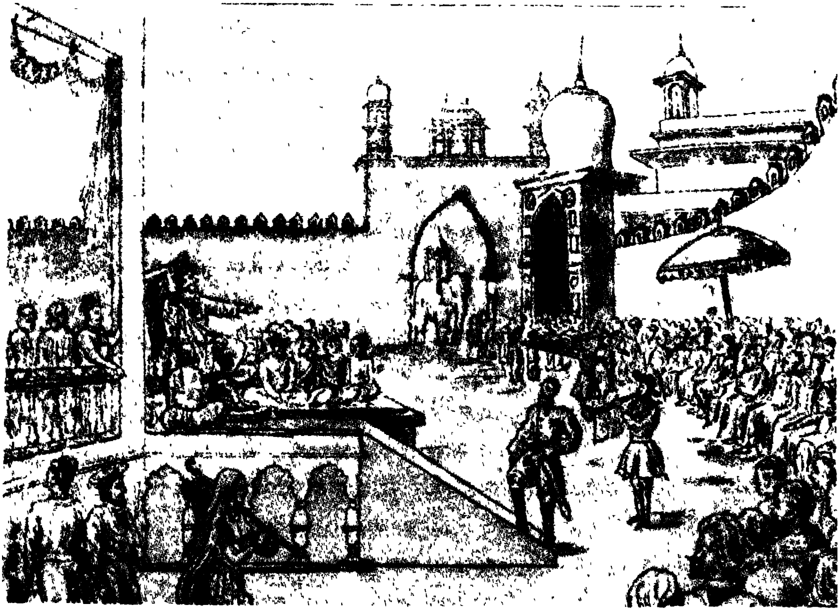

বণিকের মানদণ্ড

ভাস্কো-দা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করে কালিকট বন্দরে এসেছিল 1498 খ্রীষ্টাব্দে। বলা বাহুল্য, সেই প্রথম য়ুরোপীয় নয়। স্থলপথে তার পূর্বে বহু বহু য়ুরোপীয় ভারত ভূখণ্ডে এসেছেন, সেই ম্যাসিডোনীয় সেকেন্দার শাহ্‌র আমল থেকে। জলপথেও দা-গামাই প্রথম আগন্তুক নয়। পূর্ববর্তী দশকে জলপথেই কালিকটে এসে পৌঁছেছিলেন আর একজন পর্তুগীজ ভাগ্যান্বেষী: পেদ্রু দা কোভিলহাস। কিন্তু ইতিহাসের ঐ রেওয়াজ—আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে

বঙ্গদেশ

পদার্পণ না করেও কলম্বাস যেমন হয়েছেন আমেরিকার আবিষ্কারক, এভারেস্টের উচ্চতা না মেপেও যেমন এভারেস্ট-সাহেব অমর, তেমনি আমাদের জানানো হয়েছে দা-গামাই এই সম্মানের অধিকারী।

দা-গামা আরব সাগরে নৃশংস লুটতরাজ করে পর্তুগীজ নৌ-বাণিজ্যের স্বরূপটা বুঝিয়ে দিয়েছিল। মক্কায় তীর্থযাত্রী আরব-জাহাজ মেরী'-র যাবতীয় পণ্যসামগ্রী লুট করে কী-ভাবে তিনশজন নরনারীকে হত্যা করেছিল তার বিবরণ শরদিন্দুর 'রক্তসন্ধ্যা'। সে কাহিনী ইতিহাসেব চেয়েও সত্য।

লুট আর অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিয়ে মালাবার উপকূলের শান্তশিষ্ট জনপদগুলিকে শ্মশানে রূপান্তরিত করে দা-গামা ফিরে গেল স্বদেশে। সঙ্গে প্রচুর পণ্য ও ধনসম্পদ এবং অসংখ্য ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী। লোভে-লোভে সে দ্বিতীয়বারও এসেছিল।

ভারতবর্ষে তখনও বাবুর বাদশাহ এসে পৌছাননি। পাঠানযুগ চলছে—লোদী বংশ। সব বৃত্তান্ত শুনে মুগ্ধ হলেন পর্তুগাল রাজ। পোপকে প্রচুর উপঢৌকন পাঠিয়ে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন আর ঐ সঙ্গে পূর্বদেশ-শোষণের ধর্মীয় অনুমতি। কাঞ্চনমূল্যে সব কিছুই শোধন হয়ে যায়। পোপ অনুমতি দিলেন—পর্তুগালরাজ হয়ে গেলেন "Lord of the Navigation, Conquests and Trade of Aethiopia, Arabia, Persia and India."

তত্ত্বটা প্রণিধানযোগ্য। পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে পর্তুগীজ বোম্বেটেরা যা কিছু করেছে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সে-কাজে কোনও পাপ ছিল না। স্বয়ং পোপ-এর অনুজ্ঞাবলে তারা এই 'হীদেন'দের প্রভু। তারা যদি সেটা না মানে তবে তাদের হত্যায় পাপ নেই।

পোপের আশীর্বাদ পেয়ে পর্তুগালরাজ এবার পাঠালেন তাঁর প্রতিনিধিকে—পর্তুগীজ ভাইসরয়: ফ্রান্সিস্কো দ্য আলমেইডা (1505)। কোচিন সমুদ্রোপকূলে থানা গাড়লেন তিনি। খুলে বসলেন দপ্তর। কাজ একটাই: সুযোগমতো আরব বণিকদের জাহাজ লুট করা।

পরবর্তী ভাইসরয় আফাঁসো দ্য আলবুকার্ক। এবার স্থলভাগের দিকে নজর দেওয়া হল। দুই দশকের ভিতর অধিকৃত হল গোয়া, দমন, দিউ। কোচিন থেকে রাজধানী সরিয়ে আনা হল গোয়ায়।

তারপর দৃষ্টি পড়ল ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে। দুটি বন্দর তাদের লক্ষ্য: সমুদ্রের কাছাকাছি চট্টগ্রাম আর সরস্বতী তীরের সপ্তগ্রাম। ক্রমে তারা এল বঙ্গদেশে।

কিন্তু তার পূর্বেও সপ্তগ্রামের ইতিহাস আছে। এবার বরং ফিরে আসি ভাগীরথী তীরের বাকি কয়টি জনপদ দেখতে: সপ্তগ্রাম, ব্যাণ্ডেল, হুগলী, চুঁচুড়া।

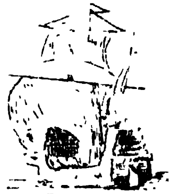

সপ্তগ্রাম

বংশবাটীর কিছু দক্ষিণে আদি সপ্তগ্রাম। বঙ্গসংস্কৃতির মধ্যযুগে তা 'স্বর্ণনগরী'। তার সে আদিমরূপ আজ চিন্তার বাইরে। বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গলে' দেখছি চাঁদ সদাগর সপ্তডিঙা

ভাসিয়ে চলেছেন সমুদ্রে—বিপুল বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে। পথে পড়ল সপ্তগ্রাম। দেখতে পেলেন :

"অভিনব সুরপুরী দেখি সব সারি সারি
প্রতি ঘরে কনকের ঝারা,
নানা রত্ন অবিশাল জ্যোতির্ময় কাচ ঢাল
রাজমুক্তা প্রবালের ধারা।।"

নামকরণের সূত্রটি পাওয়া যাবে পৌরাণিক ইতিহাসে—

কিংবদন্তি অনুসারে বহু বহুযুগ পূর্বে কান্যকুব্জে ছিলেন এক নৃপতি। নাম প্রিয়বন্ত অথবা প্রিয়ব্রত। তাঁর ছিল সাত-সাতজন জোয়ান ছেলে। তাদের নাম : অগ্নিত্র, মেধাতিথি, বপুষ্মান, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতুমান, সবন ও ভব্য। রাজার ছেলে, কিন্তু মতিগতি রাজসিক নয়, সাত্ত্বিক। সাতভাই একযোগে একদিন গৃহত্যাগ করল। 'যেনাহং নামৃতা স্যাম'—মন্ত্র তাদের, রাজসুখে বাঁধা পড়তে চায় না। দেশ-বিদেশ ঘুরতে ঘুরতে তারা এসে থামল ভাগীরথীর কিনারে। গঙ্গা-যমুনার কিনারে সাতটি স্থানে তপস্যায় বসল তারা। সেই তপস্যাস্থলে গড়ে উঠল সাত-সাতটি গ্রাম : বাঁশবেড়িয়া, বাসুদেবপুর, কৃষ্ণপুর, খামারপাড়া, দেবানন্দপুর, শিবপুর আর ত্রিশবিঘা। এই সাতটি গ্রাম নিয়েই হল সপ্তগ্রাম। পাশেই ত্রিবেণী—ভাগীরথী, সরস্বতী আর যমুনার মুক্তবেণী সঙ্গম। এ কাহিনীরও উল্লেখ আছে বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গলে'—

"বহিত্র চাপায়ে কূলে চাঁদ অধিকারী বলে
দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম
তথা সপ্তঋষিস্থান সর্বদেব অধিষ্ঠান
শোক দুঃখ সর্বগুণধাম।।
জ্যোতি হইয়া এক মূর্তি ঋষিমুনি সেরে তথি
জপ-তপ করে নিরন্তর।
গঙ্গা আর সরস্বতী যমুনা বিশাল অতি
অধিষ্ঠান উমা-মহেশ্বর।"

মাধবাচার্যের 'চণ্ডীমঙ্গল', মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল', মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ী রচিত 'পবনদূতম্' কাব্যে এবং 'চৈতন্য চরিতামৃতে' আছে সপ্তগ্রামের বর্ণনা। আগেই বলেছি, গ্রীক ঐতিহাসিক বর্ণিত গঙ্গারিডি রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীরূপে সপ্তগ্রাম চিহ্নিত।

চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মিশর দেশীয় ভূপর্যটক ইবন বতুতা (1304-68) এসেছিলেন এখানে। আফ্রিকা ছাড়েন 1325-এ, ঘরে ফিরে যান আঠাশ-বছর পরে। বাংলার মসনদে তখন সুলতান ফকরউদ্দীন। দিল্লীতে তখন দাস-বংশের গিয়াসুদ্দীন বলবন। ইবন বতুতা প্রসঙ্গক্রমে সপ্তগ্রামের অনেক বর্ণনা দিয়েছেন। এমনকি বাজার দরও—"সপ্তগ্রামে একটা রূপোর দিহ্‌রামে পাওয়া যায় পঁচিশ রিখল চাউল।" হিসেবটা বুঝিয়ে বলি। তখন মুদ্রা হিসাবে চালু ছিল রূপোর দিনার—আজকের একটাকার মতো। আট দিহ্‌রামে এক দিনার। আর 'পঁচিশ রিখল' মানে প্রায় বিশ কিলোগ্রাম! দুগ্ধবতী একটি গাভীর দাম আজকের তিন টাকা। 'পরমা সুন্দরী ক্রীতদাসীর দাম একটা সোনার দিহ্‌রাম।" অর্থাৎ দশ টাকা! শোনা কথা নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—"ঐ দামে

আমি স্বয়ং একটি সুন্দরী বালিকাকে ক্রয় করেছিলাম। তার নাম লালুয়া।" -লিখে গেছেন ইবন বতুতা।

এক বৃদ্ধ বাঙালী মুসলমান নাকি বলেছিলেন, 'সংসারে তিন তিনটি খাওয়াইয়া, মুই নিজে, এক বিবি, আউর এক কমবক্ত নোকর। সম্বৎসরে খাওনের খরচ হল গিয়ে পুরো এক দিনার!

ইবন বতুতা এ প্রসঙ্গে শেষ উপসংহারে বলেছেন, গোটা হিন্দুস্থানে শুধু নয়, গোটা দুনিয়ায় তখন বাংলাদেশের মতো সস্তার বাজার আর ছিল না।

হায়রে কবে কেটে গেছে ইবনবতুর কাল!

আরও জানাচ্ছেন, ফলের বাজারে মিলত—আম, জাম, আঙুর, ডালিম, নারকেল। আহারান্তে পান-চর্বণের রেওয়াজ ছিল। দিন-আনি দিন-খাই চিবাতো পান সুপারি, সৌখীন ব্যক্তিদের জন্য করঙ্কবাহিকা হাজির করত রূপার রেকাবীতে ভিন্ন ভিন্ন খোপে: পান, গুবাক, চুন, অন্যান্য মশলা ও কর্পূর। অর্থাৎ পূর্বযুগে নৈষধচরিতে যে বর্ণনা পাই তা তখনো টিকে আছে। ঘরানা ঘরের মেয়েরা পথ চলত দোলায় চেপে; সেটা পালকির বিকল্প। ঢাকা থাকত রেশমের পর্দায়। রেশম আসত ঢাকা অঞ্চল থেকে। দেশে সতীদাহ প্রথা ছিল, তবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে নাকি পুড়িয়ে মারা হত না।

আর একটি সূত্রে দেখছি—সাল তারিখ নিয়ে কিছু ভ্রান্তি আছে কিনা জানি না—ইবন বতুতার সপ্তগ্রাম দর্শনের প্রায় পঞ্চাশবছর আগে যখন রুকরনউদ্দীন কৈকাউস শাহ্ গৌড়াধিপতি, তখন উলুগ-ই-আজম জাফব খাঁ বাহরাম ইৎগীন সপ্তগ্রাম অধিকার করেছিলেন। তখন নাকি সেটাই ছিল গৌড়মণ্ডলের শ্রেষ্ঠ নগরী। তার পূর্বে সপ্তগ্রাম ছিল হিন্দু রাজার অধিকারে। কোন রাজার হাত থেকে জাফর খাঁ এই অধিকার ছিনিয়ে নেন তাঁর নাম জানা যায় না। কবি কৃষ্ণরামের 'ষষ্ঠীমঙ্গল' কাব্যে অনুমান করা যায় তাঁর নাম শত্রুজিৎ। ঐ জাফর খাঁ একটি বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। ইনি নাকি 1295 থেকে 1313 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সপ্তগ্রামে অধিপতি ছিলেন, তাঁর মৃত্যুও হয় ওখানে। সরস্বতী ও ভাগীরথীর সঙ্গমে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, সেখানেই তাঁর সমাধি। বিতর্কিত বিষয়টি হল এই যে, অনেকের মতে ইনিই হচ্ছেন সাধক দরাফ খাঁ, যাঁর নামে সংস্কৃতে রচিত একটি গঙ্গাস্তোত্র পাওয়া যায়।

দু-আড়াইশ বছর পরের কথা। সুলতান হুসেন শাহ্-র (1493-1519) আমলে সপ্তগ্রামের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়—'হুসেনাবাদ'। নামটি স্থায়ী হয়নি। হুসেন শাহ্কে নিশ্চয় চিনতে পারছ। তিনি বস্তুত বাঙলাদেশের স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। চৈতন্যদেবের প্রায় সমসাময়িক। তাঁর আমলে অনেক হিন্দু রাজপুরুষ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উজির ছিলেন পুরন্দর খাঁ (গোপীনাথ বসু), এছাড়া দবীর খাস (রূপ গোস্বামী), সাকর মল্লিক (সনাতন গোস্বামী), চিকিৎসক মুকুন্দ দাস। একদিকে যেমন রাজধানী গৌড়ে নির্মাণ করেছেন ছোট-সোনা মসজিদ, অন্যদিকে তাঁরই আদেশে ও অর্থানুকূল্যে মালাধর বসু বঙ্গানুবাদ করেন শ্রীমদ্ভগবৎগীতার। প্রতি জেলায় মসজিদসহ হাসপাতালও প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তগ্রামে তিনি একটি টাঁকশাল প্রতিষ্ঠা করেন। তার প্রধান কর্মাধ্যক্ষও একজন হিন্দু। সপ্তগ্রাম-টাঁকশালে মুদ্রিত হুসেন শাহ্, শের শাহ্ প্রভৃতির নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গেছে।

সম্ভবত হুসেন শাহের আমলেও সপ্তগ্রামে পর্তুগীজ প্রভাব পড়েনি। দু-চারটি নৌকায়

পর্তুগীজ ব্যবসায়ী হয়তো এসেছে; কিন্তু বড়জাতের অভিযান ঘটেনি। পূর্ণেন্দু পত্রী অবশ্য লিখেছেন, "1533—বাংলা দেশে তখন হোসেন শাহী রাজত্ব। পাঁচটা জাহাজ আর দুশো লোক নিয়ে অ্যাফোনসো ডি মেলো বাংলাদেশে এসে হাজির। উদ্দেশ্যে বাণিজ্য।"[১] মনে হয় তথ্যটায় কোথাও কিছু ভ্রান্তি আছে। পর্তুগীজদের এই নাটকীয় আবির্ভাব যদি 1533 খ্রীষ্টাব্দেই ঘটে থাকে তবে তা হুসেনশাহী জমানায় নয়, কারণ হুসেন ফৌত হয়েছেন 1519 খ্রীষ্টাব্দে। সম্ভবত তখন মামুদ শাহ্ গৌড়েশ্বর।

সুলতান মামুদকে তারা নানান মূল্যবান উপঢৌকনে নজরানা দিল। কিন্তু ফল হল উল্টো। কোতোয়াল সনাক্ত করল সেগুলি চট্টগ্রাম অঞ্চলের অপহৃত দ্রব্য! হার্মাদদের অপকীর্তি। ফলে সুলতান মামুদ ডি মেলোকে তার সাঙ্গোপাঙ্গ সমেত কয়েদ করলেন। দুঃসংবাদ পৌঁছালো কেন্দ্রীয় দফতরে, গোয়ায। গোয়ায় পর্তুগীজ গভর্নর তখন নান্ ডি কুনহা। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে পাঠিয়ে দিলেন আর এক নৌ-সেনাপতিকে, আন্তোনিয় ডি সিলভা মেজেসকে। মেজেস ঘাঁটি গাড়লেন চট্টগ্রামে। সেখান থেকে তদ্বির-তদারক চলতে থাকে। সুলতান নির্বিকার! বন্দীদের মুক্ত করার কোন গরজ নেই। মেজেস লুট করল চট্টগ্রাম। তাতেও কোন প্রতিক্রিয়া হল না। তখন মেজেস-এর সেনানায়ক দিয়ানো রিবেলো সসৈন্য অবরোধ করল সপ্তগ্রাম বন্দর। ভাগীরথী দিয়ে নৌকা চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। সবাই আশা করেছিল এইবার সুলতান মামুদ সবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়বেন ঐ পর্তুগীজ বোম্বেটেগুলোর উপর। বাস্তবে তা হল না। বরং সুলতান মামুদ ওদের ডেকে এনে সন্ধি করলেন।

কারণ ছিল। সেটা 1536; দিল্লীর মসনদে তখন বাবর-তনয় হুমায়ুন। তাঁর সঙ্গে সুলতান মামুদের সদ্ভাব আছে। কিন্তু বিহারে কে এক ভুঁইফোঁড় তরুণ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বাজারে গুজব সে কৈশোরে ডাকাতি করত। সাসারামে সামান্য এক সুবেদার হাসানের ত্যাজ্যপুত্র—নাম ফরিদ। লোকটা এই কিছুদিন আগেও বিহারের এক সুলতান—বাহার খাঁ লোহানীর কিল্লায় গৃহশিক্ষকের নোকরি করত—তাঁর নাবালক পুত্র জালাল খাঁর 'আতালিখ' অর্থাৎ গৃহশিক্ষক। তবে লোকটার যেমন দেহের ক্ষমতা তেমনি দুর্জয় সাহস। কোন এক বিজন বনে তাকে নাকি বাঘে আক্রমণ করে, আর লোকটা তরোয়ালের এক কোপে বাঘটাকে দুখণ্ড করে ফেলে। সুলতান লোহানী তাঁর পুত্রের গৃহশিক্ষককে একটা নয়া খেতাব দেন: শের খান্!

জবর কিসমৎ লোকটার, আশমান ফুঁড়ে কিস্‌মতী-হুরী নেমে এসে ধরা দিল শের খাঁর হাতে। কাশীর কাছে চুনার কিল্লার অধিপতি তাজ খাঁকে বুঝি তারই যুবকপুত্র হত্যা করেছিল কিল্লার দখল নিতে। সদ্যবিধবা লাদ মালিকা তার এক বিশ্বস্ত অনুচরকে পাঠিয়ে দিল যুবক বীর শের খাঁর কাছে—সপত্নীপুত্রের হাত থেকে তাকে রক্ষা করার আর্জি সমেত। শের সসৈন্য চুনারে এসে উদ্ধার করলেন লাদ মালিকাকে। কৃতজ্ঞ মেয়েটি উদ্ধারকারীর হাতে কিল্লাসমেত তুলে দিলেন কিল্লাদারনিকে!

সেই ভুঁইফোঁড় লোকটা নাকি হুমায়ুনকে হিন্দুস্থান থেকে তাড়াতে চায়! বোঝ দুঃসাহস!

---

[১] 'পুরনো কলকাতার কথাচিত্র', পূর্ণেন্দু পত্রী, দে'জ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারি 1982, পৃঃ 68.

আর সে-কাজের আগে দখল নিতে চায় বঙ্গাল-মুলুক্! হুসেন শাহ্ তাই সে-সময়ে—সেই 1536 খ্রীষ্টাব্দে—আশঙ্কা করছিল পশ্চিমদিক থেকে শের খাঁর আক্রমণ। পর্তুগীজদের সে আল্লাতালার আশীর্বাদ বলে মনে করল। হাতে হাতে মেলালো।

শের খাঁ এ যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। পর্তুগীজদের সহায়তা সত্ত্বেও শের খাঁ-কে রুখতে পারল না মামুদ। তার অন্যতম হেতু—শের তালিয়াগাড়ির (আধুনিক সাহেবগঞ্জ) প্রচলিত পথে আদৌ আসেনি; শের জানত—সে পথে সুলতান হুসেন তার সৈন্য সমাবেশ করেছে। বনজঙ্গল ভেদ করে সে বাংলায় এল এক ঘুর পথে। সেই অতর্কিত আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে গেল গৌড়াধিপতি মামুদশাহ্-র বাহিনী। বহু উপঢৌকন দিয়ে সুলতান মামুদ শের খাঁর বশ্যতা মেনে নিল।

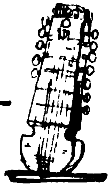

কিন্তু ভারতেতিহাস আমাদের আলোচ্য নয়,আমরা আলোচনা করছি সপ্তগ্রামের ইতিহাস।

হুমায়ুন হিন্দুস্থান থেকে বিতারিত, শের খাঁ এখন দিল্লীশ্বর শের শাহ শুর। তা হোক, পর্তুগীজেরা ঐ সুযোগে সুলতান মামুদের ছত্রছায়ায় সপ্তগ্রামে জাঁকিয়ে বসেছে।

ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পাঠান রাজত্বের অবসান; দিল্লীশ্বর হয়েছেন আকবর।

সম্রাট আকবরের আমল (1556-1605)। গৌড়ে তখন সুলেমান কররানির সুলতানি। তাঁকে চিনতে না পারলেও তাঁর সেনাপতিটি তোমাদের অচেনা নয়: কালাপাহাড়! নঞর্থক ভাস্কর্যকীর্তিতে সে সারা পূর্বভারতে কুখ্যাত!

সুলেমান কররানি সেবার ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ রুদ্রনারায়ণের রাজ্যটি দখল করার মতলব ভাঁজছে। রুদ্রনারায়ণ সাহায্য চাইলেন তদানীন্তন কলিঙ্গরাজ মুকুন্দদেবের। এবং পেলেন। রুদ্রনারায়ণের জ্ঞাতিভ্রাতা প্রখ্যাত বীর রাজীবলোচন রায় ভূরিশ্রেষ্ঠ এবং কলিঙ্গের সম্মিলিত বাহিনীর সৈনাপত্য গ্রহণ করেন। 1565 খ্রীষ্টাব্দে রাজীবলোচন মুসলমান সুবেদারের হাত থেকে সপ্তগ্রামকে পুনরুদ্ধার করেন। সপ্তগ্রামকে পুনর্বার অধিকারে আনার সঙ্কল্প নিয়ে সুলেমান কররানি ও তাঁর সেনাপতি কালাপাহাড় উপর্যুপরি চারবার সপ্তগ্রাম আক্রমণ করেন এবং চারবারই ব্যর্থ হন। পরিশেষে রুদ্রনারায়ণকে প্রচুর উপঢৌকন প্রেরণ করে সন্ধিস্থাপন করেন।

সপ্তগ্রাম দীর্ঘদিন পরে আবার হয়ে গেল হিন্দুরাজার শাসনে একটি বন্দর।

কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি—অতঃপর সুলেমান কররানি কলিঙ্গরাজ মুকুন্দদেবকে উচিত শিক্ষা দিতে তাঁর সেনাপতি কালাপাহাড়কে প্রেরণ করলেন উড়িষ্যা বিজয়ে। "ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে দুর্ভাগ্য পুনরুক্তিদোষে ক্লান্তিকর এবারেও তাই ঘটল। এই চরম দুঃসময়ে মুকুন্দদেবের অমাত্যবর্গ সুযোগ বুঝে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসল। নিরুপায় কলিঙ্গরাজ কোণার্কের সূর্যমূর্তিটি পুরীর মন্দিরে স্থানান্তরিত করে (সম্ভবত আজও তা সেখানে আছে) স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। সে যুদ্ধে বুকের রক্ত দিয়ে মুকুন্দদেব তাঁর অমাত্যবর্গের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যান। আর কালাপাহাড়ের অপকীর্তি মহাকালের

শিলালেখে চিরস্থায়ী হয়ে রইল উড়িষ্যার নানান দেবদেউলে। এই মুকুন্দদেবই উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা।"[১]

হয়তো ভুল বলেছি। এ কাহিনী এ গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক। আমাকে এর পরের দশকে পলাশী প্রান্তরের যুদ্ধটিও তো বর্ণনা করতে হবে—গৌড়দেশের শেষ স্বাধীন মুসলমান নবাবের সেই মর্মন্তুদ কাহিনীটি। ইতিহাস যে নিজের পুনরাবৃত্তি এই সূত্রে তা জানানো গেল।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকে সপ্তগ্রামের ভাগ্যে ঘটল দু-জাতের যুগান্তর। একটি ভৌগোলিক, একটি সাংস্কৃতিক।

ভৌগোলিক পরিবর্তনের হেতু সরস্বতী নদীর মহামৃত্যু।

ষোড়শ শতকের ষষ্ঠ দশকে বিদেশী পর্যটক সীজার ফ্রেডরিকের বর্ণনায়—

"A good tides rowing before you come Satgan, you shall have a place which is called Buttor, and from thence upwards the Ships doe not goe, because that upwards the River is very shallow, and little water.

ভাষা বা বানান যাই হোক, ক্যাপিটাল অক্ষরের ব্যবহারে যতই যথেচ্ছাচার থাক, বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না—সরস্বতী তিলতিল করে মরে যাচ্ছে। এতকাল ঐ সরস্বতীর খাতেই প্রবাহিত ছিল ভাগীরথীর মূলধারা। দেশের বাণিজ্যের রাজপথ ছিল সেটাই। সপ্তগ্রাম এতদিন ছিল প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ বন্দর—তাম্রলিপ্ত, চট্টগ্রামের প্রতিদ্বন্দ্বী। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত সরস্বতীতীরের অনেকগুলি বন্দর ছিল সমৃদ্ধশালী: শিয়াখালা, সিঙ্গুর, জনাই, চণ্ডীতলা, বেগমপুর, ঝাপড়দহ, মাকড়দহ, আন্দুল, হরিপাল প্রভৃতি। সরস্বতী নদী মজে যাওয়াব পর মাথা চাড়া দিয়ে উঠল গঙ্গাতীরবর্তী হুগলী বন্দর। সে-কথা যথাস্থানে।

ঐতিহাসিক তথা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন: বৈষ্ণব প্রভাব।

চৈতন্য-মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ প্রভু সংসার জীবন প্রবেশ করেছিলেন। তিনি তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত করেন এই সপ্তগ্রামে।

গড়ে উঠল দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাটে প্রতিষ্ঠিত গৌর-নিতাই বিগ্রহমন্দির। শ্রীকর দত্তের পুত্র উদ্ধারণ ছিলেন প্রভু নিত্যানন্দের প্রিয় শিষ্য। পৈত্রিক বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে তিনি সুলতান হুসেন শাহ্‌র কাছ থেকে একটি জমিদারী ক্রয় করেন। কাটোয়ার কিছু উত্তরে। নিজ নাম অনুসারে তার নামকরণ করেন 'উদ্ধারণপুর'। তিনি নিজেই করেন, অথবা উদ্ধারকামী ভক্তবৃন্দ এ নামটি দেন তা জানা যায় না। প্রভু নিত্যানন্দ ঐ জনপদে শেষজীবন অতিবাহিত করেন। শোনা যায়, নিত্যানন্দের বিবাহে উদ্ধারণ দশসহস্র সিক্কা টাকা ব্যয় করেন।

দ্বিতীয়ত সপ্তগ্রামের আর এক গৌরব, রঘুনাথ দাস গোস্বামী।

চৈতন্যচরিতামৃত' বলছেন:

হিরণ্য গোবর্ধন নাম দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥

---

[১] 'কারুতীর্থ কলিঙ্গ', নারায়ণ সান্যাল, ভারতী বুক স্টল, 1987– পৃঃ 119.

সপ্তগ্রাম

হিরণ্য ও তাঁর ভ্রাতা গোবর্ধন মজুমদারের জমিদারীর আয় ছিল বার্ষিক বার লক্ষ টাকা। রঘুনাথ ঐ গোবর্ধনের একমাত্র পুত্র। ধর্মানুরাগী পুত্রকে সংসারী করার অভিপ্রায়ে গোবর্ধন সপ্তদশবর্ষীয় কিশোরের সঙ্গে একটি সুন্দরী বালিকার বিবাহ দিলেন। কিন্তু তবু বেঁধে রাখা গেল না। রাহুলমাতা বা বিষ্ণুপ্রিয়ার নামটা অন্তত মনে রেখেছে ইতিহাস, রঘুনাথজায়ার নামটাও মুছে গেছে!

বিবাহের অনতিকাল পরেই রঘুনাথ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বলরাম আচার্যের শিষ্য। দীর্ঘ ষোলো বৎসর নীলাচলে মহাপ্রভুর সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর চলে যান শ্রীবৃন্দাবনে। রূপ ও সনাতন গোস্বামীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করেন। বৃন্দাবনে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড উদ্ধার। বহু গ্রন্থও রচনা করেন। শ্রীবৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর অন্তর্গত এই পরমবৈষ্ণব সপ্তগ্রামের মানুষ। তাঁর স্মৃতিতে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে আজও সেখানে একটি বৈষ্ণব মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদ। একজন ইংরাজ বণিক এলেন সাতগাঁয়। নাম রালফ্ ফিচ। তিনি এসেছিলেন স্থলপথে, মধ্যপ্রাচ্য হয়ে। প্রায় আট বছর ধরে ভ্রমণ করেন ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ (1583-91)। বিলাতে ফিরে গিয়ে তিনি এই পূর্বরাজ্যের এক সোনালী স্বপ্নের ছবি প্রকাশ করেন তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে। সমসাময়িক বিলাতি পত্রিকায় সমালোচনায় বলা হল, "He thrilled London in 1591 with the magnificient possibilities of Eastern commerce."

সন্ধ্যেবেলার আলোকসজ্জার প্রসঙ্গে যদি সকালবেলাকার পলতে পাকানোর কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে হয়, তাহলে 1600 খ্রীষ্টাব্দে রানী এলিজাবেথ যে ইংরেজ কোম্পানিকে সান্ধ্য আলোকসজ্জার 'চার্টার' দিলেন, তার সলতেটি পাকিয়েছিলেন ঐ রাল্‌ফ্ ফিচ।

উনবিংশ শতাব্দী: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'বেণের মেয়ে'তে এঁকেছেন সপ্তগ্রামের সম্পদের চিত্র। সমকালীন সপ্তগ্রামের নয়, অতীতের। বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীতে 'কপালকুণ্ডলা'য় সপ্তগ্রামের পতন সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়েছেন তা যথার্থ:

"পূর্বকালে সপ্তগ্রাম সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। এককালে যবদ্বীপ হইতে রোমক পর্যন্ত সর্বদেশের বণিকেরা বাণিজ্যার্থ এই মহানগরে মিলিত হইত। কিন্তু বঙ্গীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে (অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে) সপ্তগ্রামে প্রাচীন সমৃদ্ধির লাঘব জন্মিয়াছিল। ইহার কারণ এই যে, তন্নগরের প্রান্তভাগ প্রক্ষালিত করিয়া যে স্রোতবতী বাহিত হইত, এক্ষণে তাহা সংকীর্ণশরীরা হইয়া আসিতেছিল। সুতরাং বৃহদাকার জলযান সকল আর নগর পর্যন্ত আসিতে পারিত না। এ কারণ বাণিজ্য-বাহুল্য ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল। বাণিজ্য-গৌরব নগরের বাণিজ্যনাশ হইলে সকলই যায়। সপ্তগ্রামের সকলই গেল। বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীতে হুগলী নতুন সৌষ্ঠবে তাহার প্রতিযোগী হইয়া উঠিতে ছিল। তথায় পর্তুগীজেরা বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া সপ্তগ্রামের ধনলক্ষ্মীকে আকর্ষিতা করিতেছিলেন।"

বিংশ শতাব্দী: ইস্টার্ন রেলওয়ে টাইম-টেব্‌ল্ খুঁজলে ছোট-হরফে আদি সপ্তগ্রাম নামটি দেখতে পাবে। কোন কোন লোকাল-ট্রেন ওখানে আজও দাঁড়ায় যে!

হুগলী

বঙ্কিমী পথপ্রদর্শন অনুসারে সপ্তগ্রাম ছেড়ে এবার হুগলী যেতে হয়।

আদি সপ্তগ্রামের ক্রোশখানেক দক্ষিণে দুটি জনপদ : ব্যাণ্ডেল আর হুগলী। যেন হরিহরাত্মা। সরস্বতী নয়, ভাগীরথী তীরে। 'ব্যাণ্ডেল' শব্দটাও বঙ্কিমীপথে এসেছে 'বন্দর' শব্দ থেকে: বন্দর ⟶ বন্দল ⟶ বণ্ডল ⟶ ব্যাণ্ডল ⟶ ব্যাণ্ডেল।

আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি পর্তুগালরাজ পোপের সনদ পেয়ে নিজেকে পূর্বপৃথিবীর ঈশ্বর বলে ভাবতে শুরু করেছেন। পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর প্রতিনিধিকে উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে।

প্রথম ভাইসরয় ভারতবর্ষে এসে পৌছালেন 1505 খ্রীষ্টাব্দে: ফ্রাঁসিস্কো দ্য আলমেইডা। পরবর্তী ভাইসরয় আফোঁসো দ্য আলবুকার্ক। রাজধানী স্থানান্তরিত করা হল গোয়ায়। এবার দৃষ্টি পড়ল ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে। দুটি বন্দর তাদের লক্ষ্য—সমুদ্র উপকূলে চট্টগ্রাম আর সরস্বতী তীরে সপ্তগ্রাম। কিন্তু সরস্বতী নদীর জলধারা ক্রমশ বিশুষ্ক হয়ে আসছে, তাই ওরা উপনিবেশ গড়ল কিছু দক্ষিণে—ব্যাণ্ডেল-হুগলীতে।

কেটে গেছে বছর-পঞ্চাশ। বাবর-হুমায়ুন শের শাহ্‌কে পাড়ি দিয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এসে গেছে আকবর-জমানা। আকবর নিরক্ষর, কিন্তু সর্বধর্মের মর্মকথা জানবার আগ্রহ তাঁর। তিলক কাটেন, নিরামিষ আহার করেন, রাজান্তঃপুরে হোম পর্যন্ত হয়, মন্ত্রপাঠ চলে। একটি বিশেষ দরবারকক্ষই নির্মিত হয়েছে সবধর্মের মূল কথা অনুধাবনের জন্য : ইবাদৎ-খানা-ই খাশ্‌।

1579। সম্রাট আকবরের বিশেষ দূত আবদুল্লা এক দোভাষীকে নিয়ে উপস্থিত হল গোয়ায়। বিচিত্র আমন্ত্রণপত্র! সম্রাট দু-জন জেসুইট পাদ্রীকে বাইবেল ও গসপেলের বিভিন্ন গ্রন্থ সমেত রাজধানী ফতেপুর সিক্রিতে আহ্বান করেছেন। জানিয়েছেন—তাঁর উদ্দেশ্য খ্রীষ্টধর্মের মর্মকথা জানবার, পাদ্রীদের নিরাপত্তার দায়-দায়িত্ব সম্রাটের।

এমন আজব কথা ভাইসরয় কল্পনা করতে পারেন না। তবে ঝুঁকিটা নিলেন। তিনজন পাদ্রীকে প্রেরণ করলেন আগ্রায়—দলনেতা রুডলফ্ অ্যাকোয়ভিভা। সম্রাট মন দিয়ে ওদের কথা শোনেন, মেরী মাতার একটি মূর্তিকেও স্থান দিয়েছেন রাজপ্রাসাদে ; কিন্তু যে আশা নিয়ে পাদ্রীরা এসেছিলেন তা পূরণ হল না—সম্রাট খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন না।

কিন্তু বছরখানেকের ভিতরেই তাঁরা একটি সনদ পেলেন সম্রাটের কাছ থেকে—সুদূর বঙ্গদেশে হুগলীতে একটি কুঠি নির্মাণের অনুমতি। 1580 খ্রীষ্টাব্দে। তার বিশ-ত্রিশ বছর আগে থেকেই হুগলীতে পর্তুগীজদের একটা আস্তানা গড়ে উঠেছিল। কারণ ব্যাণ্ডেল গীর্জার নির্মাণকালটা 1559 ; তবে এই প্রথম পাকাপাকি সনদলাভ।

পর্তুগীজদের উদ্দেশ্য ছিল ত্রিমুখী। কিছু এসেছিল বাণিজ্য করতে, কিছু সত্যই খ্রীষ্টের বাণী ও ধর্মপ্রচার মানসে। তারা গীর্জা বানাতে থাকে এখানে-ওখানে। কূপমণ্ডূক সমাজপতি আর

ক্ষমতাবান জমিদারদের প্রভাবে যারা হিন্দু-ধর্মচ্যুত হয় তাদের ওরা সাদরে গ্রহণ করে, দীক্ষিত করে, গড়ে তোলে প্রথম ইঙ্গবঙ্গ সমাজ। তৃতীয় দল—তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, নিছক দস্যু—এসেছে দেশটাকে লুট করতে। তারা জলে-ডাঙায় চালিয়ে যায় অকথ্য অত্যাচার—নির্বিরোধী মনুষ্য-বসতিতে। তাদের প্রধান ঘাঁটি চট্টগ্রাম, খুলনা, নোয়াখালি, সন্দীপ, বরিশাল। গ্রামের পর গ্রাম তারা শ্মশান করে দিয়েছে। সর্বস্ব লুণ্ঠন করে ধর্ম নষ্ট করেছে পল্লীবধূর—তারপর চালান দিয়েছে ক্রীতদাসীর হাটে। তাদের বলে: হার্মাদ। কথাটা এসেছে 'আর্মাডা' থেকে। কুঠিয়াল আর পাদ্রীরা প্রকাশ্যে বলেন—ওরা আমাদেরও শত্রু, কিন্তু গোপনে স্বজাতীয়দের প্রতি অনুকম্পা ও সৌহার্দ্য বজায় থাকে।

ঘটনাচক্রে ঐ সময়ে শুকিয়ে যেতে থাকে সরস্বতী নদীর সাবেক জলধারা। সপ্তগ্রামের পতন আর হুগলীর উত্থান প্রায় সমকালীন ঘটনা। হার্মাদদের এই অত্যাচারে শুধুমাত্র দক্ষিণবঙ্গের শান্তিই ব্যাহত হয়নি—এর পরোক্ষ ফল বিপর্যস্ত করে দিল গোটা বঙ্গসংস্কৃতিকেই। কারণ বহুশতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী বাঙলার বহির্বাণিজ্যের পথ গেল চিররুদ্ধ হয়ে। সপ্তডিঙা, মধুকর ভাসিয়ে বাঙালী সওদাগর আর যেতে পারে না—সিংহল, চম্পা, চীন! ভাষান্তরে পশ্চিমের গবাক্ষপথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে পর্তুগীজরা বন্ধ করে দিল আমাদের পুবের দরওয়াজা। ফলে ঐ বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল অভ্যন্তর-ভাগের বাজার মার খেল। কেটে গেল আরও পঞ্চাশ বছর। আকবরের দেহান্তে জাহাঙ্গীর এখন ভারতসম্রাট। জাহাঙ্গীরের জমানায় সেনাপতি মানসিংহ যখন দ্বিতীয়বার বঙ্গভূমে এলেন দ্বাদশ ভৌমিক বা বারো ভুঁইয়াদের বিদ্রোহ দমন করতে, তখন কিছু হার্মাদ নৌ-সেনাপতি বিদ্রোহীদলে যোগ দিল, সুযোগ বুঝে—ফ্রান্সিস কার্ভালো, গঞ্জালেস্, রডা এসে হাত মেলালো প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে।

সে সময়ে হুগলীর কুঠিয়ালরাও তাক বুঝে বেপরোয়া হয়ে পড়েছে। ভাগীরথী বেয়ে কোন জাহাজ বা বাণিজ্যতরী যাতায়াত করলে তারা শুল্ক আদায় করতে শুরু করেছে। হিন্দু মন্দিরে দেবদেবীর মূর্তি ভাঙছে। মাঝে-মাঝে কুঠিয়ালরা সম্রাটের হারেমে অপহরণ-করা সুন্দরী মেয়ে পাঠায়। জাঁহাপনার রাগ পড়ে যায়। কিন্তু অত্যাচারের নেশায় পর্তুগীজ দস্যুরা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে বসল একবার। এক জাহাজ হজযাত্রীর সর্বস্ব লুণ্ঠন করে তাদের হত্যা করল। জাহাঁপনা জাহাঙ্গীর আর স্থির থাকতে পারলেন না। বাঙলার সুবেদারকে হুকুম দিলেন হুগলীর কুঠি ধূলিসাৎ করে দিতে।

অচিরেই মুঘল বাহিনী এসে অধিকার করে নিল হুগলী-ব্যাণ্ডেল জনপদ। কেল্লা এবং গীর্জাটি হল ধ্বংস। বহু পর্তুগীজকে বন্দী করে পাঠিয়ে দেওয়া হল আগ্রায়, তার ভিতর ছিলেন ব্যাণ্ডেল-গীর্জার সাত্ত্বিক প্রকৃতির প্রধান ধর্মযাজক দা'ক্রুজ। সম্রাট আদেশ দিলেন হস্তিপদতলে পিষ্ট করে তাঁকে হত্যা করতে হবে। অলৌকিকভাবে নাকি তিনি রক্ষা পান।

চার্চকে ক্ষমা করলেন, কিন্তু ব্যবসায়ীদের নয়। ওলন্দাজ কুঠির সঙ্গে বাণিজ্যের নয়া চুক্তি করলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। সেটা হুগলীর নয়, চুঁচুড়ার কাহিনী।

১৭শ শতাব্দী

এ পর্যন্ত যা বলেছি তা ইতিহাস, ঐ উপাদানটুকু নিয়ে এবার গল্প ফাঁদা যাক:

1604 খ্রীষ্টাব্দ। সম্রাট আকবর অসুস্থ। বস্তুত মৃত্যুশয্যায়। টোডরমল্ল ইতিমধ্যে বঙ্গদেশের রাজস্ব-ব্যবস্থার ছকটা বানিয়ে ফেলেছেন। সেলিম অর্থাৎ যুবরাজ জাহাঙ্গীর ইতিমধ্যে একবার 'খোকা-বিদ্রোহ' করেছে—বাপের একমাত্র অপরাধ সে বড় বেশিদিন বেঁচে আছে। তা বুড়ো-হাবড়াকে সিংহাসনচ্যুত করতে পারেনি। যেটুকু তার ক্ষমতায় কুলায় সেটুকুই করেছে বিদ্রোহীপুত্র—পিতার অকৃত্রিম বন্ধু, প্রখ্যাত পণ্ডিত ও ইতিহাসবেত্তা আবুল ফজলকে গুপ্তঘাতকের মাধ্যমে হত্যা করিয়েছে।

অশ্বারোহণে ফাদার দা'ক্রুজ ফিরে আসছিলেন গীর্জায়। পরিধানে পাদ্রীর ঢিলেঢালা কালো পোশাক, মাজার কাছে ফাঁস দেওয়া। নিরস্ত্র তিনি। হঠাৎ বিরাট গীর্জা-চৌহদ্দীর গেটের বাহিরে অশ্বের গতিরোধ করেন। অবতরণ করে পদব্রজে এগিয়ে আসেন। সিংদরোজার বাহিরে একজন অত্যন্ত সুদর্শন মুসলমান যুবক নির্নিমেষনেত্রে লক্ষ্য করছে গীর্জার স্থাপতা-শিল্প। পোশাক-পরিচ্ছদ রাজপুরুষের, মাথায় জমকালো টুপি, কোমরে দীর্ঘ তরবারি। তার পাশেই একটি মহিলা। সর্বাঙ্গ কালো বোরখায় ঢাকা। শুধু দুটি চম্পকাঙ্গুলি দিয়ে মুখ-ঢাকাটুকু তুলে সেও গীর্জার চূড়ায় ক্রুশকাষ্ঠটির দিকে তাকিয়ে আছে। চম্পক-গৌর বর্ণ, এণাক্ষীবিনিন্দিত দৃষ্টি। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যুবক পাদ্রী! রমণীদেহে এমন সৌন্দর্য তিনি কখনো প্রত্যক্ষ করেননি—না বাস্তবে, না শিল্প-কর্মে। রোম, ফ্লোরেন্স, ভেনিস, মিলানের চিত্রসংগ্রহশালা তিনি দেখেছেন—রাফায়েল, তিজিয়ানো, করেজ্জিও তাঁর অপরিচিত নয়—কিন্তু এ কী!

অস্ফুটে স্বগতোক্তি করেন পাদ্রী: আফ্রোদিতে!

শব্দে পাশ ফিরে তাকায়। অপরিচিত পুরুষকে দেখে তৎক্ষণাৎ মুখাবরণটি স্বস্থানে নামিয়ে দেয়। এতক্ষণে লক্ষ্য হল মহিলার পাঁজর ঘেঁষে একটি ফুটফুটে ফুলের মতো মেয়েও দাঁড়িয়ে আছে। দা'ক্রুজ রাজপুরুষটিকে বললেন, বে-নস্ দীয়াস্।[১]

সম্বোধনটি পর্তুগীজ নয়, স্প্যানিশ্। দা'ক্রুজ বোধকরি ভেবেছিলেন, এ ভাষা অন্তত ওরা বুঝবে। যুবাপুরুষ কাঁধ ঝাঁকিয়ে খানদানি উর্দুতে বললেন, আপনার ভাষাটা আমার অজানা, মহাশয়। সম্ভবত আপনি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ফলে, আমার জবাব, সেলাম আলাইকুম্।

—আলাইকুম সালাম! —দা'ক্রুজ দীর্ঘদিন আছেন ভারতবর্ষে। ভাঙা ভাঙা উর্দু বলতে পারেন। বলেন, বাইরে কেন? আসুন, ভিতরে আসুন।

যুবাপুরুষ বলেন, আমরা বিধর্মী, মুসলমান—

—সেটা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু মা মেরীর গীর্জা সকল ধর্মের জন্যই অবারিতদ্বার। আমি

---

(১) Buenos dias = হ্যালো!

এই উপাসনা-গৃহের প্রধান পুরোহিত—দা'ক্রুজ। আপনাকে সাদরে আমন্ত্রণ করছি।

আগন্তুক বলেন, অত্যন্ত প্রীত হলাম। আমার নাম শের আফকন। আমি বর্ধমানের সুবেদার। সস্ত্রীক হুগলীতে এসেছিলাম। এটি আমার কন্যা: লাড্‌লি।

—লাড্‌লি নয়, লাভ্‌লি! আর বেগম-সাহেবার নাম আমি জানি না; তাঁর নাম হওয়া উচিত: আফ্রোদিতে!

শের আফকন আরবী-ফার্সিতে আলিম, কিন্তু বুঝে উঠতে পারেন না এ শব্দটির অর্থ। সঙ্গিনীকে বলেন, এস মেহের, পাদ্রী-সাহেব আমাদের ভিতরে যেতে ডাকছেন।

মেহেরুন্নিসা ফিস্‌ফিস্ করে স্বামীকে কী-যেন বলে। শের বলেন, বেগমসাহেবা জানতে চাইছেন ভিতরে কি আপনার সহধর্মিণী আছেন?

—আছেন, আছেন। গৃহস্বামিনীর তরফেই আমি নিমন্ত্রণ করছি।

শের আফকন সপরিবারে ভিতরে এলেন। গীর্জাটি ঘুরে ঘুরে দেখলেন। অল্‌টারের পিছনে রঙিন কাচের একটি অতি দীর্ঘ গবাক্ষ। তাতে নানান নক্‌শা। মাঝখানে মা মেরীর এক মর্মরমূর্তি। শিশুক্রোড়ে মাতৃমূর্তি। সংলগ্ন বাগিচায় নানান মরশুমী ফুল; একান্তে কবরখানা।

একটি বেলা ওঁরা কাটিয়ে গেলেন ব্যাণ্ডেল-চার্চে। মাদাম দা'ক্রুজ মোহিত হয়ে গেলেন মেহেরুন্নিসার সৌন্দর্যে। মেহের সুযোগ মতো জানতে চায়, 'আফ্রোদিতে' শব্দটার অর্থ কী?

মাদাম দা'ক্রুজ খিল্‌খিলিয়ে হেসে ওঠেন। বলেন, কে বলেছে? ঐ পাদ্রী তো? ওর দোষ নেই!—বুঝিয়ে দেন, 'আফ্রোদিতে' গ্রীকশিল্পীদের ধারণায় সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

পাদ্রীসাহেবের নির্বন্ধাতিশয্যে 'আলমেয়ারথো'টা'[1] সেখানে সারতে হল। দা'ক্রুজ ওঁদের আশ্বস্ত করলেন কোন ভোজ্যদ্রব্যে শূকরমাংস মিশ্রিত নেই।

কথাপ্রসঙ্গে শের বলেন, আপনি তো এদেশের ভাষাটা চমৎকার শিখে নিয়েছেন। মাদামও শিখেছেন দেখছি। কতদিন আছেন হিন্দুস্থানে?

পাদ্রী দা'ক্রুজ রহস্য করে শুনিয়ে দিলেন একটি পর্তুগীজ ছড়া:

'Vicerei Va , vicerei vam
Padre Paulista sempredtem.'[2]

পরবর্তী ঘটনাটি প্রায় বিশ বছর পরের।

ইতিমধ্যে সম্রাট আকবরের দেহান্ত ঘটেছে। নূরউদ্দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর তখন ভারতসম্রাট।

হুগলীর পর্তুগীজ কুঠিয়ালদের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে জাহাঙ্গীর হুকুম দিলেন হুগলীর দখল নিতে। সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ। অচিরেই মুঘল সেনাপতি দখল করে নিল পর্তুগীজ উপনিবেশ। হুগলী দুর্গ এবং ব্যাণ্ডেল গীর্জাকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হল। বহু পর্তুগীজ খ্রীষ্টানকে বন্দী করে

(1) Almuerzo = মধ্যাহ্ন ভোজন।

(2) 'Viceroys come and Viceroys go, but the Jesuit Fathers are always there'
লাটেরা আসে লাটেরা যায়, চিরদিন কেউ থাকে না তারা। পাদ্রী-সাহেব বারোমাস ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন একপায়ে খাড়া।।

বঙ্গাল-মুলুক থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হল আগ্রায়। বন্দীদলে আছেন হুগলী গীর্জার প্রধান ধর্মযাজক দা'ক্রুজ সস্ত্রীক।

জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ মৃত্যুদণ্ড বিষয়ে রকমফের করতেন সেকথা আগেই বলেছি। স্বচক্ষে সেই মৃত্যুদৃশ্য দর্শন করা তাঁর এক বিলাস। এক্ষেত্রে জাহাঁপনা হুকুম জারী করলেন, ঐ পর্তুগীজ পাদ্রীটাকে হস্তিপদতলে দলিত-মথিত করতে হবে। মাদাম দা'ক্রুজ মহিলা—তাকে লঘুশাস্তি দেওয়া হল—শুধুমাত্র স্বামীর মৃত্যুদৃশ্য দর্শন!

একাজের জন্য একটি সুশিক্ষিত হস্তী সম্রাট আকবরের জমানা থেকেই আছে। প্রকাণ্ড রণহস্তী। অদ্ভুত তার শিক্ষা। আগ্রা কিল্লায় বাদশাহ্ যখন দেওয়ান-ই-আম-এ দরবারে বসেন তখন ঐ গজদানবকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় উপস্থিত করে মাহুত। বাদশাহ্ আসেন দক্ষিণপূবের জাহাঙ্গীরী মহল থেকে, উঠে বসেন মসনদে। আকবরের কোন মহিষী প্রকাশ্য দরবারে বসতেন না। জাহাঙ্গীরের ক্ষেত্রে এটি হয়নি। তাঁর পাশে উপবেশন করেন ভারতসম্রাজ্ঞী নূরজাহাঁ। তিনি আসেন পিছনের দরওয়াজা দিয়ে, খাশমহল থেকে, শীস্-মহল পথে।

বসেন অনবগুণ্ঠিতা হয়ে। এটাও জাহাঙ্গীরের এক বিলাস—জগতকে দেখানো, তিনি শুধু ভারতেশ্বর নন, সুন্দরী-শ্রেষ্ঠার মরদ!

নূরজাহাঁ: জগতের আলো। অন্তত এককালে ছিল বর্ধমানের সুবেদার শের আফকনের ঘরের ধৃত প্রদীপ। আকবরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গদিয়াল হয়ে জাহাঙ্গীরের প্রথম কাজ ঐ শের আফকনকে হত্যা করে মেহেরুন্নিসাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা। মেহের প্রথম কয়েক বছর স্বামীহন্তাকে স্বীকার করে নেয়নি। ক্রমে পোষ মেনেছে। শুধু তাই নয়, পোষ মানিয়েছে। বস্তুত জাহাঙ্গীর জমানায় ভারত শাসন করেছে নূরজাহাঁ—জাহাঙ্গীর নয়। রাজকীয় দলিল, ফর্মান, যেখানেই জাহাঙ্গীরের স্বাক্ষর সেখানেই নূরজাহাঁ। এমনকি স্বর্ণমুদ্রায় পর্যন্ত ছাপ দেওয়া হত 'বহুবভ শাহ্ জহাঙ্গীর যাফৎ সদ জেবব/বনামে নূরজাহাঁ বদসহে বেগম অর।' অথচ এমনই তার কূটকৌশল যে, সম্রাট স্বয়ং অনুধাবন করতে পারতেন না—তিনি বেগমের হাতের পুত্তলীমাত্র!

জাহাঙ্গীর শাস্তি বিধান করলেন। হস্তিপদতলে বন্দীর মৃত্যু। সচরাচর এই মৃত্যুদণ্ডটি অনুষ্ঠিত হয় প্রকাশ্যে, সভাভঙ্গে। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হতভাগ্যকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় ভূতলে ফেলে রাখা হয়। জাহাঙ্গীর জানেন—মৃত্যুদণ্ড দীর্ঘায়ত করার মধ্যে একটা মজা আছে। সাধারণত আমীর, ওমরাহ—যাঁরা এই নৃশংস দৃশ্য দেখতে চান না, তাঁরা উঠে চলে যান। নূরজাহাঁ স্থানত্যাগ করেন। তখন হত্যাউৎসবে মেতে ওঠেন বাদশাহ্। করতালি দিতেই মাহুত সুসজ্জিত গজদানবকে পরিচালিত করে অগ্রসর হয়ে আসে। অদ্ভুত শিক্ষা গজরাজের। সে বন্দীর নিকটস্থ হয়ে শুণ্ড উৎক্ষিপ্ত করে একটি বৃংহিত ধ্বনি করে। তারপর একটি পা তুলে ঐ ভূতল-শায়িত হতভাগ্যের মস্তকের উপর উৎক্ষিপ্ত করে অপেক্ষা করে। বাদশাহ্ যতক্ষণ না দ্বিতীয়বার করতালিধ্বনি করেন ততক্ষণ গজদানবকে তিন-পায়ে দেহভার রক্ষা করে প্রতীক্ষা করতে হয় জাহাঙ্গীর এইসময় তাড়াহুড়া করেন না। শায়িত বন্দীর মুখচ্ছবি রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করেন কখনো বা তার মরণান্তিক আর্তনাদ। তারপর তালি বাজান। গজরাজ তার উৎক্ষিপ্ত চরণটি ধীরে ধীরে নামিয়ে আনে—দেহের অন্য কোনও অংশে নয়, ঠিক মাথার উপর।পাকা কয়েৎ

বেলের মতো ফট্ করে সেটা ফেটে যায়! ভারী মজার সে দৃশ্য।

পাদ্রী দা'ক্রুজকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় ভূতলশায়ী করা হয়েছে। তার মস্তকটি একটি পাষাণখণ্ডের উপর ন্যস্ত। সুসজ্জিত হস্তীর উপর মাহুত প্রতীক্ষা করছে। আমীর-ওমরাহরা অনেকে উঠে গেলেন। জাহাঙ্গীরের লক্ষ্য হল নূরজাহাঁ স্থানত্যাগ করেননি। বলেন, এবার তুমি ভিতরে যাও। এখন মৃত্যুদণ্ড হবে।

নূরজাহাঁর লক্ষ্য হল, অদূরে মাদাম দা'ক্রুজ শায়িতা। দুর্ভাগ্যবশত তাঁকে স্বামীর মৃত্যুদৃশ্যটি দেখানো যাচ্ছে না। তিনি মূর্ছিতা। নূরজাহাঁ বললেন, না, আমি থাকব। আমি দেখব।

সম্রাট কিছু বিচলিত। এমন তো কখনো হয় না! পেয়ারী বেগম তো এমন কথা ইতিপূর্বে কখনো বলেনি। জানতে চান তার হেতু।

নূরজাহাঁ বলেন, দীন-দুনিয়ার মালিক! আমি গতকাল রাত্রে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। স্বয়ং পয়গম্বর যেন আমাকে এসে বলছেন—ঐ পাদ্রীটা আমার প্রিয় ভক্ত। ও আল্লাতালাকেই 'গড' নামে উপাসনা করে। তুই তোর স্বামীকে বল, ওকে মুক্ত করে দিতে!

জাহাঙ্গীর বিস্মিত হয়ে বলেন, তারপর? তারপর?

—তখন আমি পয়গম্বরকেই সালাম জানিয়ে বললাম, আপনি তো অসীম ক্ষমতাবান। আপনি নিজেই তো ওকে রক্ষা করতে পারেন। আমাকে কেন বলছেন? আমি জানি, আমার স্বামী কখনো অন্যায় করেন না, তাঁর রাজকার্যে আমি কখনো হস্তক্ষেপ করি না। তারপর আমার নিদ্রাভঙ্গ হল। তাই আমি দেখতে চাই তিনি ওঁকে রক্ষা করেন কিনা।

জাহাঙ্গীর কিছুটা বিচলিত। তারপর সজোরে করতালি ধ্বনি করে ওঠেন।

গজগমনে অগ্রসর হয়ে এল মহামাতঙ্গ। যথারীতি শুণ্ড উৎক্ষিপ্ত করে গজভাষে অভিনন্দন জানালো বাদশাহ্‌কে। তারপর একটি পদ উৎক্ষিপ্ত করে প্রতীক্ষা করল। জাহাঙ্গীরের আজ ধৈর্য মানছে না। সজোরে করতালি দিয়ে ওঠেন তিনি।

কী আশ্চর্য! কী অপরিসীম আশ্চর্য! গজরাজ প্রত্যাশিত কর্ম করল না। উৎক্ষিপ্ত পদটি নামিয়ে আনল ভূতলে। নিপুণ-শুঁড়ে একটানে বন্ধনমুক্ত করে দিল বন্দীকে! যেন শুঁড় দিয়ে আদর করল তাঁকে! ধীর পদে ফিরে গেল তার স্বস্থানে।

বাদশাহ বিহ্বলের মতো বেগমের দিকে ফিরে বলেন, কী করতে বল এখন? নূরজাহাঁ একটি সেলাম করে বলেন, জাহাঁপনা। আপনার রাজকার্যে আমি কখনো হস্তক্ষেপ করি না। কী করবেন তা আপনার বিবেচ্য। তবে পয়গম্বরের স্বপ্নাদেশ যদি মানেন...

বাকিটা অনুক্ত রইল।

জাহাঙ্গীরের আদেশে দা'ক্রুজকে মুক্তি দেওয়া হল। তাঁকে সসম্মানে হুগলীতে প্রত্যাবর্তনের আদেশও দেওয়া হল। এমনকি রাজকোষ থেকে গীর্জাটি পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থাও করা হল। কাহিনীর যে অংশটুকু নেপথ্যে আছে তা এবার বলি:

হুগলীতে ফিরে যাবার আগে মাদাম দা'ক্রুজ নূরজাহাঁর খাশমহলে এসে দেখা করেছিলেন। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বলেন, আপনার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা পরিসীমা নেই। কিন্তু একটা কথা, ভারতেশ্বরী! এ কাজের জন্য মাহুতকে যে পরিমাণ অর্থ উৎকোচ দিয়েছেন সেটুকু আমাদের পরিশোধ করতে দিন।

নূরজাহাঁ স্মিত হেসে প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, আপনার গীর্জায় যে নুন খেয়েছি তার দাম দিতে হবে না? সেটা যে নিমকহারামি হয়ে যাবে।

মাদাম দা'ক্রুজ বলেন, গ্রাথীয়াহ্‌স![1] তাহলে কণ্ঠহারটি রাখুন। লাডলিকে দেবেন। প্রতিদান নয়, উপহার।

হাত বাড়িয়ে মালাটা নিতে হল।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ভারতেশ্বরীর। মন খুলে মাদামকে বলতে পারলেন না—

উপহারটা লাডলি-বেগমকে দেওয়া যাবে না। মায়ের সঙ্গে সে কথা বলে না। পিতৃহন্তার অঙ্কশায়িনী জননীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।[2]

হুগলী থেকে আমরা অনেকটা দূরে সরে এসেছি। চল, সেখানে ফেরা যাক।

শাহজাহাঁ সিংহাসনে আরোহণ করে পর্তুগীজদের অধিকার থেকে হুগলী-ব্যাণ্ডেল পুনরায় অধিকার করে নেন। তার একটি বিশেষ হেতু আছে। জাহাঙ্গীরের শেষাবস্থায় যুবরাজ খুররম্‌ও একবার 'খোকা-বিদ্রোহ' করেন। মুঘল বাহিনীর হাতে লাঞ্ছিত হয়ে পালিয়ে আসেন বঙ্গদেশে। সে-সময় তিনি হুগলীর পর্তুগীজ গভর্নরের কাছে সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু অভিজ্ঞ গভর্নর বুঝতে পারেন এ ব্যাপারে যুবরাজকে সাহায্য করা উচিত হবে না। খুররম প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। মসনদে বসে তারই প্রতিশোধ নিলেন এতদিনে শাহজাহাঁ।

সেটা সম্রাট শাহজাহাঁর শাসনকালের দ্বাদশ বৎসর! রাজধানী তখনো আগ্রা। দিল্লীর লালকেল্লায় পুরা-কদমে কাজ চলছে। এ-যুদ্ধে পর্তুগীজরা প্রায় তিনমাস কাল মুঘল বাহিনীকে প্রতিহত করে রেখেছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা লিখে গেছেন—মুঘল সেনাপতি সেই সময় ভাগীরথীর উপর একটি সাঁকো নির্মাণ করেন। স্থানটা শ্রীরামপুরের কাছাকাছি! সম্ভবত সেটি একটি 'পন্টুন-সাঁকো'—অর্থাৎ পাশাপাশি নৌকা সাজিয়ে বানানো সাঁকো—যা বানিয়ে ছিলেন জারেকশাস দার্দানালেস প্রণালীতে, বহু বহু পূর্বযুগে; আর যা বানিয়েছিলেন ইংরেজ স্থপতি বহু-বহু পরবর্তীযুগে—প্রথম হাওড়া ব্রীজ; যা তোমরা দেখনি, আমরা হামেহাল পার হয়েছি, জোয়ার-ভাঁটা খেয়াল করে। কারণ তদানীন্তন ভাগীরথীর বিস্তার ও প্রযুক্তিবিদ্যার জ্ঞানের কথা মনে করে এটাই একমাত্র সমাধান। তবে মুঘল সেনাপতি সুবেদার কাশেম খাঁ দুর্গবেষ্টনকারী পরিখার বাঁধ দিয়ে জল নিষ্কাশন করতে পেরেছিল। পরে বারুদ দিয়ে দুর্গপ্রকারের খানিকটা অংশ উড়িয়ে দেয়। সেই পথে মুঘল সৈন্য দুর্গের ভিতর প্রবেশ করে। হুগলী দুর্গের পতন হয়।

বহু পর্তুগীজ নরনারী হতাহত হয়। ওদের অনেকগুলি জাহাজ ও গ্রাব ডুবিয়ে দেওয়া হয়।

---

১) Gracias = লাখ্‌-লাখ্‌ সুক্রিয়া,
২) বিস্তারিত বিবরণ লেখকের 'লাডলি-বেগম' উপন্যাসে।

বস্তুত এই যুদ্ধেই ভারতে পর্তুগীজ প্রাধান্য চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। মহামান্য পোপের সনদ যাই বলুক না কেন এই ঘটনার দুই দশক পরে, অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে পর্তুগীজদের পরিত্যক্ত ভূখণ্ডে ইংরেজরা একটি কুঠি বানায়। প্রথম দিকে ব্যবসায়ে তারা খুব একটা সুবিধা করতে পারে না। পরে, অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের ঠিক একশ বছর আগে ঐ কুঠি লাভবান হতে শুরু করে। সোরা, লবণ ও রেশমের ব্যবসায়ে। তবু মুঘল সুবেদারের সঙ্গে ইংরেজ কুঠিয়ালদের বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই ছিল। আরও দুই দশক পরে এই কুঠি থেকেই একদিন জোব চার্নক নেমে আসেন ভাগীরথীর মোহনার দিকে।

একদিন নোঙর গাড়েন: গোবিন্দপুরে। সেটাই কলকাতা পত্তনের সূচনা। জোব চার্নকের হুগলী ত্যাগের পর নবাবী ফৌজ হুগলী কুঠি দখল করে। সেটি পুনরুদ্ধার করেন রবার্ট ক্লাইভ পলাশীযুদ্ধের প্রাক্কালে।

ইংরেজ সৈন্য হুগলীর দুর্গ ও ফৌজদারের সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করে নেয়। এক সপ্তাহকাল হুগলী-ব্যাণ্ডেলের সংলগ্ন গ্রামগুলি নির্বিচারে লুট করে। বর্তমানে যেখানে হুগলীর কালেক্টার-সাহেবের বাসভবন দুর্গটি ছিল সেখানে।

বঙ্গসংস্কৃতিতে হুগলীর আর একটি দানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মর্তব্য—বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা হয় এখানেই। রাজা-রাজড়ার কুকীর্তির কথা শোনাচ্ছিলাম এতক্ষণ; এবার দুটি মেহনতী মানুষের কথা বলি: পঞ্চানন কর্মকার আর মনোহর দাশ। তাঁদের যৌথ সহযোগিতা ভিন্ন উইলকিন্স-সাহেব ঐ ছাপাখানাটি বানাতে পারতেন না। হ্যালহেড-সাহেব এই ছাপাখানা থেকে যখন প্রথম বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ করেন তখনও রাজা রামমোহনের জন্ম হতে দু-বছর বাকি।

হুগলী ত্যাগ করে যাবার আগে পর্তুগীজদের প্রসঙ্গটা শেষ করে নিই।

দা-গামা আর তার উত্তরসূরীরা এসেছিল এ দেশে লুট করতে। কিন্তু 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।' ঐ দলের সঙ্গেই এসেছেন অনেক মহান পর্তুগীজ—যাঁরা মানুষের ভালো করতে চান। সবার আগে বলতে হয় সেন্ট ফ্রান্সিস্ জেভিয়ারের কথা (1506-52)। গোয়াতে এসে পদার্পণ করেন 1542-খ্রীষ্টাব্দে। "He laboured with equal zeal and success among the Corrupt Europeans and the native population." বহু নির্যাতিত অচ্ছুৎকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। পরে শ্রীলঙ্কা ও জাপানেও যান। তাঁর মরদেহ গোয়াতেই রক্ষিত।

এই পর্তুগীজরাই বাংলাভাষার প্রথম বই ছেপে প্রকাশ করে। ভারতে নয়, খোদ রাজধানী লিসবনে। হরফও বাংলা নয়, রোমান হরফ। সময়টা আমাদের কাহিনীর প্রায় সমকালে—1743 খ্রীষ্টাব্দে। মুদ্রিত হয়েছিল তিনখানি পুস্তক। প্রথমটির লেখক আন্তোনিও দো রোজারিও; পরের দুখানির লেখক: মানোয়েল দ্য আসস্যুম্প্সা। বইটির নাম—মলাটে যা লেখা ছিল: Crepar Xaxtroer Orths. Bhed—Xixio Guror Bichar!

অর্থভেদ হল? বঙ্গানুবাদে: "কৃপার-শাস্ত্রের অর্থভেদ—শিষ্যগুরুর বিচার।"

এ-ছাড়া বাংলাভাষায় মিশে আছে অসংখ্য পর্তুগীজ শব্দ: সাবান, আলমারি, জানলা, তোয়ালে, বালতি, বোতাম, 'আলপিন' থেকে 'কামান'। আরও কত শব্দ: আলকাতরা, আচার,

কাকাতুয়া, চা, গির্জা, নিলাম, তামাক, চাবি, ফিতা, গুদাম, লণ্ঠন, বারান্দা, ইস্পাত, কম্পাস, কামরা। অনেক ফুলফল তারা আমদানি করেছিল: আনারস, পেঁপে, পেয়ারা, কামরাঙা, আলু, জামরুল, সফেদা, চীনাবাদাম, কমলালেবু এমনকি সেই ফুলটি—'কালো যাকে বলে গাঁয়ের লোক': কৃষ্ণকলি!

সবার আগে এসেছিল পর্তুগীজ—তাদের আস্তানা হুগলী-ব্যাণ্ডেল। তার পরে আসে দিনেমাররা। সব শেষে ইংরাজ আর ফরাসী। দিনেমারদের আস্তানা ছিল ওলন্দাজ-নগর বা চুঁচুড়া। পর্তুগীজ নাবিকেরা আফ্রিকা বেষ্টন করে যে জলপথটি খুঁজে পেয়েছিল তার চার্ট, ম্যাপ ইত্যাদি সযত্নে লুকিয়ে রাখত—যেন 'চিচিংফাঁক' মন্ত্র। কিন্তু কিছু ওলন্দাজ নাবিক চাকরি সূত্রে ওদের জাহাজে বার কয়েক যাতায়াত করার ফলে গুপ্তধনের চাবিকাঠিখানি পেয়ে গেল।

ওলন্দাজ অধিকারের পূর্বযুগে চুঁচুড়ার ইতিহাস অজ্ঞাত। তখন সেটি ছিল এই গৌড়দেশের অযুত-নিযুত গ্রামের মতো গঙ্গাতীরবর্তী একটি শান্ত জনপদ। হুগলীতে যখন পর্তুগীজ প্রভাব বিনষ্ট হল, শাজাহানী-জমানায়, তখনই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল 'চুঁচুড়া'। সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। তারপর দেড়শ বছর ধরে ওরা ওখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে। তাদের চরম উন্নতি অষ্টাদশ শতকের অষ্টম দশকে।

হুগলীর কথায় ফিরে আসি:

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পারস্যের রাজধানী তেহরান থেকে আসেন—খাঁ জাহান খাঁ। হুগলীতেই থাকতেন। প্রথমে মুঘল, পরে ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানির কাছে সুবেদারী পেয়ে। বিলাসিতার চূড়ান্ত বাহ্যাড়ম্বরে তিনি ভাষায় স্থান পেয়েছেন। মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতা দেখলে আমরা বলি: লোকটা যেন নবাব খাঞ্জা খাঁ। তিনি নবাব ছিলেন না আদৌ।

দানবীর হাজী মহম্মদ মহসীনের বিখ্যাত ইমামবাড়া হুগলীর এক দিকচিহ্ন।

আরও একজন হুগলীবাসী প্রবাদ কথায় অমর হয়ে আছেন।

'—লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন!'

গৌরী সেনও দানবীর। প্রচুর ধনসম্পত্তিও করেছিলেন তিনি। তাঁর প্রতিষ্ঠা করা গৌরীশঙ্কর দেউলটি আজও টিকে আছে। তা ধনী ব্যক্তি তো ডজন-ডজন, তার ভিতর কেউ কেউ মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন। দানধ্যানও অনেকে করেন এ-কথা অস্বীকার করব না। তার ভিতর সেন-মশাই কী-করে প্রবাদবাক্যে নিজের ঠাঁই করে নিয়েছেন? বলি শোন:

সেন-মহাশয় অনেক বিচার-বিবেচনা করে দেখলেন—যে লোকটা দান চাইতে আসে তার বড় সঙ্কোচ। হাত পেতে কিছু চাইতে হবে—সে বড় লজ্জা! কী করা যায়? উনি দারুণ এক বুদ্ধি খাটালেন। প্রার্থীদলকে সেই লজ্জা-সঙ্কোচের হাত থেকে রেহাই দিতে একটি অভিনব ব্যবস্থা করলেন। হুগলী বাজারে গিয়ে কয়েকটি বড় বড় দোকানে—মুদী-দোকান, জামা-কাপড়ের দোকান, দশকর্ম ভাণ্ডারে বলে এলেন, 'দেখ বাপু, আমার নাম করে কেউ যদি কিছু খরিদ করে তাহলে তোমরা তার দাম চেও না, ক্রেতার নামও জানতে চেও না। খরচটা শুধু খাতায় লিখে রেখ। মাসান্তে আমার কর্মচারী এসে দামটা মিটিয়ে যাবে।'

তাঁর সেই অপরিসীম বদান্যতার সুযোগ যে শুধু সমকালই নিয়েছে তা বলতে পারি না। আজও সরকারী চাকরি পেয়ে অথবা ভোটে জিতে তাঁর নামটি আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি:

'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন!'

সতী
1742-57
ষষ্ঠ পর্ব

কাজী-সাহেব বলেছিলেন, মানুষেব দুনিয়ায় যতটুকু বেহেস্তী মুবারকী আর যতখানি দোজখী-ইর্ব্‌লিসি, সবটাই আমাদেব যৌথ দায়িত্বে—'অর্ধেক তার রচিয়াছে নর, অর্ধেক তাব নারী।' হিসাবটা নিশ্চয় আঠারো-শতকেও প্রযোজ্য। কিন্তু পর্দাব আড়াল থেকে যে পাপীযসীরা পাপাত্মাদের কুপরামর্শ জুগিয়েছে, নবকের পথে টেনে নিযে গেছে, ইতিহাস তাদের কথা লিখে রাখেনি। অপরপক্ষে যাঁরা মহাত্মাদেব অনুপ্রাণিত করেছেন অথবা জনহিতাথে নিজেরাই নিবেদিতপ্রাণা, তাঁদের সকলের কথাও আমরা জানি না। ইতিহাসকেই বা দোষ দিই কোন হিসাবে? ভাবীজীরা সেযুগে ছিলেন পর্দানসীন, বৌঠাককণেবা অবগুণ্ঠনবতী। জাহ্নবীর জলোচ্ছ্বাসেব মতো যাঁরা দিগন্তব্যাপী পলিমাটিব গেরুযা আশীর্বাদ ছড়িযে গেছেন সেইসব রানী ভবানীদের কথা আলাদা, না হলে ইতিহাস তাব পর্বতপ্রতিম নথীপত্রের মধ্যে কোন্ প্রান্তে বর্জাইস হরফে জনৈকা মহিমমযীর কথা সলজ্জে লিখে রেখেছে কে তাব হদিস পাবে? আজকের দিনে লাখে-একজনও কি খুঁজে পেত সন্ন্যাসী বিদ্রোহের আমলে ঐতিহাসিক চবিত্র ভবানী পাঠকের এক ঐতিহাসিক শিষ্যা ঐ নামে বাস্তবেই আবির্ভূতা হয়েছিলেন 'পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্'? সহজ সরল পথে ইতিহাস ঘেঁটে কেউ দেবী চৌধুবানীকে খুঁজে পেত না, যদি না সাহিত্যসম্রাট কথাসাহিত্যের বঙ্কিমপথে দীপশিখাটি জ্বালিযে যেতেন গবেষক ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতন্দ্র সাধনা ব্যতিরেকে আমরা সন্ধান পেতাম না অষ্টাদশ শতাব্দীর দুই মহিলা বিদ্যালঙ্কারের।

তোমাদের ইতিহাস পড়ানোর বায়না নিয়ে আমি কাগজ-কলম নিয়ে বসিনি বাপু। তবু দুটি বিদ্যালঙ্কারের আবির্ভাবের পূর্বযুগের দু-একটি 'কাব্যে উপেক্ষিতার' কথা না বলেও প্রাণটা শান্ত হচ্ছে না। একজনের কথা বলি। কিন্তু নাম বললেও কি চিনতে পারবে তাঁকে?

: শরফ উন্নিসা।

ঘসেটি বেগমকে তোমরা চেন। না চিনবে কেন? বাপের দেহাবসানে হারেমের অন্তরালে

থেকে নবাবী করার নূরজাহানী খোয়াবে সে গড়েছিল মতিঝিল, বেতনভুক সৈন্যদল মোতায়েন করেছিল অবৈধ প্রেমের নায়কের সহায়তায়। চেন আমিনা বেগম-সাহেবাকেও, সিরাজজননীরূপে। কিন্তু শরফ উন্‌নিসার নাম তোমরা শোননি। অথচ তিনি ছিলেন সে-আমলে মার্কিন-কেতায় সুবে বংগাল-মুল্‌কের: দ্য ফার্স্ট লেডি!

তিনি ছিলেন আলিবর্দী খাঁ মহব্বত জঙ-বাহাদুরের অদ্বিতীয়া বেগমসাহেবা। আশ্চর্য মহিলা। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের ভাষায়:

> আলিবর্দীকে মুর্শিদাবাদের বা বাঙ্গলার আকবর বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। মুর্শিদাবাদ নবাবদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি সম্প্রীতি দেখাইয়া মহাবিপ্লবমধ্যেও শান্তভাবে প্রজাপালন করিতে তাঁহার ন্যায় আর কেহই সমর্থ হয় নাই। তাঁহার প্রভু পূর্ববর্তী নবাব সুজাউদ্দীন এই হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সম্প্রীতির সূচনা করিয়া যান এবং আলিবর্দী তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিণত করেন। সেই কর্মবীর আলিবর্দী খাঁর রাজনৈতিক জীবন তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীর সহায়তায় পূর্ণতালাভ করিয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আলিবর্দীর উচ্ছৃঙ্খল সংসার যেমন এই মহিলার তর্জনীতাড়নের অধীন ছিল, সেইরূপ বিপ্লবসাগরে নিমগ্ন সমগ্র বঙ্গদেশের শাসনও তাঁহারই পরামর্শানুসারে চালিত হইত। জ্ঞান, ঔদার্য, পরহিতেচ্ছা ও অন্যান্য সদ্‌গুণে তিনি রমণীগণের মধ্যে অতুলনীয়া ছিলেন। রাজ্যের যাবতীয় হিতকর কার্য তাঁহারই পরামর্শের উপর নির্ভর করিত।[১]

সুলতানা রিজিয়ার মতো তিনি সিংহাসনে আসীন হতে চাননি, নূরজাহাঁ বা ঘসেটি বেগমের মতো নেপথ্য থেকে কলকাঠি নেড়ে বিলাসবৈভবে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হতে চাননি। লোকচক্ষুর অন্তরালে যথার্থ মহারানীর ভূমিকা পালন করে গেছিলেন। নিখিলনাথ তো অনেক পরে (১৮৯৮) ইতিহাস ঘেঁটে এ-কথা লিখেছেন, সমকালীন বিপক্ষ-শিবিরের লোক কী লিখে গেছে?

এবার শোনাই ইংরাজ ঐতিহাসিক 'হলওয়েল'-এর জবানীতে। নবাব-সরকারের সব কিছুকেই তিনি কালিমালিপ্ত করতে বদ্ধপরিকর। লক্ষণীয়, উদ্ধৃত-অংশেও মহিলার স্বামীকে 'নবাব' বা 'আলিবর্দী' নামে উল্লেখ না করে ক্যাপিটাল U-ব্যবহার করে বলা হয়েছে Usurper!

বেগম-সাহেবার প্রসঙ্গে হলওয়েল লিখছেন:

> A woman whose wisdom, magnanimity, benevolence and every amiable quality, reflected high honour on her sex and station. She much influenced the Usurper's councils, and was ever consulted by him in every material movement in the state, except when sangninary and treacherous measures were judged necessary, which he knew she would oppose as she ever condemned them when

১) *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*, নিখিলনাথ রায়, পুথিপত্র, 1943, পৃ:79.

prepetrated, however successful—predicting always that such politics would end in the ruin of the family.

অর্থাৎ হলওয়েল-সাহেবের মতে এই সর্বগুণান্বিতা মহিমময়ী বেগমের পরামর্শে 'পরস্বাপহারক' রাজকার্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলি করতেন। কেবলমাত্র রক্তাক্ত ষড়যন্ত্র অথবা অন্যায় রাজনৈতিক চক্রান্তর পরিকল্পনাগুলি বেগমসাহেবাকে জানানো হতো না। তিনি তা কোনকালেই অনুমোদন করতেন না। বলতেন, এই জাতীয় অন্যায় রাজনীতি অন্তিমে শুধু রাজপরিবারের সর্বনাশই ডেকে আনে।

আলিবর্দীর শাসনকালে সবচেয়ে বড় জাতের 'রক্তাক্ত ষড়যন্ত্রের' কাহিনীটাই প্রথমে শোনাই। বেগমসাহেবার অগোচরে ঘটনাটা ঘটেছিল, কারণ তিনি কিছুতেই সেটা সমর্থন করতেন না। সমকালীন ঐতিহাসিকের দল এ-জন্য আলিবর্দীকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করেছেন। যাঁরা করেননি, তাঁদের সেজন্য ভর্ৎসিত হতে হয়েছে।[১]

মসনদে উঠে বসার দিন থেকে আলিবর্দী বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিব্রত। দীর্ঘ পনের বছর বৃহত্তর বঙ্গের প্রজাসাধারণকে রক্ষা করতে এই বঙ্গাধিপ মুক্ত তরবারি হস্তে অশ্বপৃষ্ঠে ছোটাছুটি করেছেন বটে, কিন্তু একদিনের তরেও 'নবাবী' করার সুযোগ পাননি। একপত্নিক, হারেমে উপপত্নী নেই, কোন রকম উচ্ছৃঙ্খলতাই বরদাস্ত করেন না, কিন্তু হতভাগ্য 'নবাব'-এর কি দুদণ্ড শান্তিতে নিদ্রা যাবার অধিকারটুকুও থাকবে না?

নবাব আলিবর্দী সিংহাসনে আরোহণ করে দেখলেন পূর্ব জমানা থেকেই দক্ষিণবঙ্গের মানুষজন মধ্য-বাঙ্গলার উর্বর ভূখণ্ডে ক্রমাগত চলে আসছে। হেতু, সুন্দরবন-অঞ্চলে পর্তুগীজ হার্মাদ আর আরাকান প্রদেশের মগ ডাকাতেরা ঐ সব গ্রামে বৎসরান্তিক লুটতরাজ করে যায়। নবাব মগ-ফিরিঙ্গি দমনে মন দিলেন। নবাব-সরকার থেকে ঢাকাপ্রদেশে প্রায় পৌনে আট শতটি রণতরী সর্বদা প্রস্তুত থাকত। এই রক্ষীবাহিনীর জন্য 'জায়গীর নৌয়ারা' মহালের সম্পূর্ণ রাজস্ব ব্যয় করার বন্দোবস্ত হল। এই ব্যবস্থা করতে করতেই পশ্চিম থেকে এসে উপস্থিত হল আর এক নতুন জাতের উপদ্রব: বর্গী।[৩]

প্রথম বর্গীর হাঙ্গামা বেয়াল্লিশ-সালে, আলিবর্দীর রাজত্ব শুরুর তৃতীয় বর্ষে। দ্বিতীয় আক্রমণ পরের বছর বসন্তকালে। আগেই বলেছি, আলিবর্দী 'চৌথ' দিতে অস্বীকার করেছিলেন; কিন্তু

---

১) *Interesting Historical Events*, Holwell, Pt. I, Chap. II. pp. 170-71.

২) "Golam Hossein, the Mohamedan historian, has no words of blame for this atrocity." H. Beveridge C.S. [এবং "মনকবার শিবির আলিবর্দীর কলঙ্কস্তম্ভে পরিণত হইল, কিন্তু মুসলমান ইতিহাস-লেখক তাহার জন্য একবারও আলিবর্দীর নিন্দা করিলেন না।"—*সিরাজদ্দৌলা*, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, পৃঃ 30.

৩) 'বর্গী' শব্দটা মারাঠী, অর্থ মহারাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর সর্বনিম্ন শ্রেণীর সৈনিক, যাদের না আছে নিজস্ব অশ্ব, না অস্ত্র। যখন যে বাহিনীতে যোগ দেয় তখন সেখান থেকে তা যোগান দেওয়া হয়। এর বিপরীতার্থবোধক শব্দটি 'সিলাদার', অর্থাৎ যার নিজস্ব অশ্ব ও তরবারি আছে। যে বাহিনীতে 'তলব' এবং লুটের হিস্যা লাভের সম্ভাবনা বেশি, সিলাদারেরা ইচ্ছামতো সেই বাহিনীতে যোগ দেয়।

তখন ব্যাপারটার বিশ্লেষণ করিনি। আলিবর্দী যখন দিল্লীশ্বরের বশ্যতা মানছেন তখন তাঁর আদেশ অমান্য করছেন কী হেতুতে? আলিবর্দীর যুক্তিটা যথেষ্ট জোরালো।

মুগল বাদশাহ মারাঠা-প্রধানের কাছে রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ বা 'চৌথ' দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য বাধ্য হয়ে। কিন্তু প্রতিশ্রুতিটা দিয়েছিলেন কাকে? মহারাষ্ট্র দলনায়ক রাজা সাহুকে। রাজা সাহু তারপব নাগপুরের সেনানায়ক রঘুজী ভোঁসলেকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার চৌথ আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে স্বয়ং দিল্লীর মুগল বাদশাহ—কী কারণে বোঝা মুশকিল (সম্ভবত কিছু নগদ প্রাপ্তিযোগের বিনিময়ে)—পেশোয়া বালাজী বাওকে অনুরোধ করলেন রঘুজীকে চৌথ আদায় থেকে বিরত করতে। পেশোয়া বালাজী রাও আর রঘুজী ভোঁসলে দুজন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী—মারাঠা শক্তির সর্বময় কর্তা হওয়ার আশায় প্রতিযোগিতা করে চলেছেন। ভাস্কর পণ্ডিত হচ্ছেন ঐ রঘুজীব দক্ষিণহস্ত। তিনি চৌথ আদায় করতে এলেনেই লুট করতে করতে। রাজা সাহুর প্রাপ্য বাজস্বের এক-চতুর্থাংশ কোন্ মহারাষ্ট্রীয় সেনানায়ক সংগ্রহ করবেন সেটা যতক্ষণ না স্থিরীকৃত হচ্ছে ততক্ষণ নবাব আলিবর্দী কী করে চৌথ দেন? ওদিকে ভাস্কব তার অত্যাচার চালিয়েই যাচ্ছে। সেবার আলিবর্দী মহাষ্টমীর দিন অতর্কিত আক্রমণে ভাস্করকে পলায়নে বাধ্য করেন।

পরবৎসর (1743) ভাস্কর পুনরায় ফিরে এলেন। কিন্তু তাঁর পিছন পিছন এসে হাজির পেশোয়া বালাজী রাও! আলিবর্দীকে বিশেষ কিছু করতে হল না। ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খেল। বালাজী রাওয়ের বৃহত্তর সৈন্যবাহিনীর কাছে তাড়া খেয়ে ভাস্কর পণ্ডিত নাগপুরের দিকে পালিয়ে গেলেন। যথারীতি প্রতিরোধহীন গ্রাম গুলি লুণ্ঠন করতে করতে।

পেশোয়া বালাজী রাও আর আলিবর্দী মিলিত হলেন ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে 'চৌরিয়াগাছী' গ্রামে। পেশোয়া আলিবর্দীকে সাহু-রাজার ফরমান দেখালেন, 'চৌথ' আদায়ের অধিকারী তিনিই। নবাব স্বীকৃত হলেন সাহু-রাজার প্রাপ্য তাঁকে দিতে। উপরন্তু সৈন্যবাহিনীর খরচ বাবদ বাড়তি বাইশ লক্ষ তঙ্কা খেসারত দিতে।

বিভিন্ন জমিদারবর্গের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে নবাব এই অর্থ কোনক্রমে মিটিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে দেশে ফিরলেন। ঠিক নিশ্চিন্ত হয়ে নয়; কারণ বর্গীর নতুন হাঙ্গামা আশঙ্কা করে তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে এবং ধনদৌলত ইতিপূর্বেই মুর্শিদাবাদ থেকে স্থানান্তরিত করেছিলেন—গোদাগাড়িতে, পদ্মা ও মহানন্দার সঙ্গমস্থলে, যেখানে অশ্বারোহী সৈন্যদের মহড়া নিতে পারবে নবাবের নৌবাহিনী।

এই বছরেই কলকাতার ইংরেজ বণিকেরা 'মারাঠা-ডিচ' খনন করে।

নয় মাস নিরুপদ্রবে কাটল। তেতাল্লিশের শ্রাবণ থেকে চুয়াল্লিশ সালের বৈশাখ পর্যন্ত। তারপরই শোনা গেল, ভাস্কর পণ্ডিত পুনরায় ফিরে আসছে উড়িষ্যা ও মেদিনীপুরের পথে—তৃতীয় বার! শোনা গেল, ভাস্কর নাকি রাগে অগ্নিশর্মা! তার প্রভু রঘুজী ভোঁসলের প্রতিদ্বন্দ্বী ঐ বালাজী হতচ্ছাড়া বাইশ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়ে গেছে শুনে রাগ তো হতেই পারে। আগের বছর জগৎশেঠের গদি লুট করে কিছু জুটেছিল; কিন্তু এবার নিরন্ন গ্রামবাসীদের পর্ণকুটির লুট করে ভাস্কর সে তুলনায় কী বা পেয়েছে?

আলিবর্দী দ্রুতগতি সংবাদবহ মারফৎ পেশোয়াকে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করলেন।

পরিবর্তে পেশোয়া বালাজী রাও একটি বিচিত্র সংবাদ পেশ করলেন:

ইতিমধ্যে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠা সর্দার রঘুজী ও বালাজী নাকি তাঁদের প্রভু রাজা-সাহুর দরবারে হাজির হয়েছিলেন ; এবং রাজা-সাহু দুই দস্যুসর্দারকে খুশি করে সহজ ফয়শালা বাৎলে দিয়েছেন : দুজনেই চৌথ আদায় করতে পারবেন। পেশোয়া বালাজীর ভাগে সাহাবাদ জেলা সমেত পাটনা ও উত্তর বিহার ; আর রঘুজীর ভাগে উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশ। উল্লেখ করা বাহুল্য, ঐ দুই বাহিনী যখন নিজ নিজ অংশের হিস্যা বুঝে নিতে আসবেন তখন পথপ্রান্তের অরক্ষিত জনপদগুলি লুণ্ঠন করতে করতে আসবেন! তা তো বটেই!

এই চরম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েই বৃদ্ধ নবাব—তখন তাঁর বয়স আটষট্টি—ঐ ষড়যন্ত্রের আয়োজন করলেন। এ ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না।

ভাস্কর তাঁর বাইশজন সেনানায়ক সহ এসে ঘাঁটি গেড়েছেন সেই দাঁইহাটিতে, যেখানে বছর-দেড়েক আগে দুর্গাপূজা অসমাপ্ত রেখে তাঁকে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়েছিল। সেখানে এসে ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন নবাবের দুই বিশ্বস্ত দূত, মুস্তাফা খাঁ আর দেওয়ান জানকীরাম। জানালেন, নবাব ভাস্করের সঙ্গে পৃথকভাবে সন্ধি করতে ইচ্ছুক। শর্তগুলো স্থির করতে পণ্ডিতজী যেন রাজধানীর কাছে মনকরা-ময়দানে শুভাগমন করেন।

ভাস্কর সন্দিগ্ধ। কিন্তু মুস্তাফা খাঁ কোরাণ স্পর্শ করে আর জানকীরাম তামা-তুলসী-গঙ্গাজল হাতে দিব্যি গেলে বললেন এর মধ্যে কোনও কারসাজি নেই। ভাস্কর স্বীকৃত হলেন, কিন্তু জানালেন সব কয়জন বর্গী সেনানায়কই তার সঙ্গে সন্ধিমণ্ডপে যাবেন। বিশ হাজার সৈন্যও সঙ্গে যাবে।

চুয়াল্লিশ সালের মার্চ মাসের শেষ দিন। মনকরা-ময়দানে পড়েছে অতি প্রকাণ্ড এক তাঁবু। ভাস্করের মনে বেশ কিছুটা সন্দেহ ছিলই। তাই বাইশজন সর্দারের মধ্যে একুশজন (একমাত্র রঘুজী গায়কোয়াড় অসুস্থতার কারণে সঙ্গী হতে পারেননি, এবং তাই প্রাণে বেঁচে যান) সর্দার ও বিশ হাজার বর্গী সৈন্য নিয়ে ময়দানে এসে উপস্থিত।

তাঁবুটি উপবৃত্তের আকারে। অতি প্রকাণ্ড। আধুনিককালের সার্কাসের তাঁবু যেন। তবে সেটি বিচিত্র কায়দায় নির্মিত। ডবল্ কানাতের। অর্থাৎ তাতে দু-দুটি পর্দার আচ্ছাদন। তার ফাঁক-ফোকরে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে সর্বাঙ্গে বর্ম সেঁটে লুকিয়ে আছে নবাবের শতখানেক বাছা-বাছা যোদ্ধা। ভাস্কর সসৈন্য অগ্রসর হয়ে তাঁবুর কাছাকাছি এলেন। বিশ হাজার অশ্বারোহী বর্গী সৈন্যকে পঞ্চাশ-হস্ত পরিমাণ ভূমির দূরত্বে অপেক্ষা করতে বলে একুশজন সর্দারসহ অশ্বপৃষ্ঠে অগ্রসর হয়ে এলেন তাঁবুর প্রবেশদ্বারের দিকে। মুস্তাফা খাঁ আর দেওয়ান জানকীরাম তাঁবুর বাহিরে এসে আভূমি নত হয়ে আগন্তুক অতিথিকে কুর্নিশ করলেন।

ভাস্কর সন্দিগ্ধ ; বার-কতক প্রবেশদ্বারের সমুখে অশ্বকে টহল দিয়ে ভিতরটা ভাল করে দেখে নিলেন। না! আশঙ্কার কিছু নাই! দূর-প্রান্তে আরাম-কেদারায় অর্ধশায়িত বৃদ্ধ নবাব, তাঁর হাতে আলবোলার নল। পাশে কয়েকজন প্রবীণ আমীর ওমরাহ্। দুদিকে দুই নিশানধারী—ওদেরই একজন বোধকরি নবাবের দেহরক্ষী। ঐ আটদশজন নবাবপক্ষের মানুষ ভিন্ন বিশাল তাঁবুটি জনশূন্য।

বর্গী-সর্দারেরা দলপতির ইঙ্গিতে অশ্ব থেকে অবতরণ করলেন। নবাবের খিদমদগারেরা

এগিয়ে এসে অশ্বগুলির লাগাম ধরল। অতঃপর একুশজন সেনাপতিসহ দুর্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয় কালান্তক যম ভাস্কররাম পন্থ ধীরপদে অগ্রসর হতে থাকেন বিপরীতপ্রান্তে অর্ধশয়ান অসহায় বৃদ্ধটির দিকে। যাকে তোমরা আজকাল বল—'মরাল-চরণ-ক্ষেপভঙ্গিমা'য়: 'গুজ্-স্টেপ'-এ।

তাঁরা যখন উপবৃত্তাকার পটমণ্ডপের মাঝামাঝি উপস্থিত তখন অন্তরীক্ষ থেকে ধ্বনিত হল তূর্য-নিনাদ।

এ কী ভোজবাজি! তূর্যধ্বনি কানাতের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসার আগেই দু পর্দা তাঁবুর ভিতরের কানাৎটা উঠে গেল। মুহূর্তমধ্যে মঞ্চসজ্জার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে! ভাস্কর দেখলেন, তাঁর চতুর্দিকে শতখানেক সশস্ত্র ঘাতক। তাদের সর্বাঙ্গে বর্মের আচ্ছাদন, হাতে নাঙ্গা তলোয়ার! পর মুহূর্তেই তারা বিদ্যুৎবেগে ধেয়ে এল। মারাঠা সর্দারেরা সকলে তরবারি কোষমুক্ত করার সময়টুকুও পেলেন না। চোখের পলক ফেলার আগেই তাঁবুর ভিতরে বাইশটি ছিন্নশির বর্গীনায়কের মৃতদেহ।

পঞ্চাশ হস্ত পরিমাণ ভূমির দূরত্বে বিশ-হাজার অশ্বারোহী বর্গী সৈন্য। নাগপুর থেকে বিনা বাধায় লুট করতে করতে এসেছে এই গাঙ্গেয় মোহনায় শান্তিপ্রিয় কৃষিজীবীদেব দেশে। ইচ্ছা মতো লুট করেছে গ্রাম, গঞ্জ, জনপদ, নগর; আগুন ধরিয়েছে পাকা ধানের ক্ষেতে, পর্ণকুটিরে। বেছে বেছে তুলে এনেছে যৌবনবতী অসহায়াদের। শুধু গণধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, পৈশাচিক উল্লাসে তরোয়ালের কোপে কেটে নিয়ে গেছে তাদের মাতৃত্বের যুগল অমৃত-ভাণ্ডার!

ওরা জানে, সন্ধির শর্ত নিয়ে অনেক দরাদরি হবে। দু-পক্ষই দড়াদড়িতে ঢিল দেবেন, টান দেবেন। সময় লাগবে। তাই ওরা অবতরণ করেছে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে। কেউ জমিয়ে বসেছে ঘাসের উপর, কেউ অর্ধশয়ান, কেউবা খইনি ডল্‌ছে। আচম্‌কা তূর্যধ্বনি শুনে চম্‌কে ওদিক পানে একবার তাকিয়েছিল,—ডবল্‌-কানাতের জন্য বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায়নি। ওরা বুঝে নিল—ঐ তূর্যধ্বনি আর কিছু নয়, আগন্তুক মহান অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে।

আসল ঘটনাটা কী, তারা বুঝল যখন অন্তরীক্ষ থেকে ছুটে আসতে শুরু করল কামানের গোলা!

নেতৃত্বহীন বর্গী সৈন্যদলের অতি অল্পসংখ্যকই সেবার নাগপুরে ফিরে যেতে পেরেছিল জঙ্গল-মহাল পর্যন্ত নবাবের অশ্বারোহী বন্দুকধারীরা ওদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল, অগ্নিদগ্ধ পাকাধানের ক্ষেতে এবার ধর্ষিতা নারীর চোখ থেকে নয়, অশ্বপৃষ্ঠ থেকে টপ্‌-টপ্‌ করে ঝরে পড়েছিল মারাঠা বর্গী! বস্তুত এই ঘটনার পর নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসর থেকে চিরতরে নেমে গেলেন।

মারাঠাদের সঙ্গে আলিবর্দী চূড়ান্ত সন্ধি করেন 1751 সালে। কিন্তু তখন মারাঠা দস্যুদলের সর্দার—না বালাজী, না রঘুজী! বস্তুত সে সন্ধিপত্রে বাঙ্গলার পক্ষে স্বাক্ষর করেন পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ আলিবর্দী এবং মারাঠা-পক্ষে একজন মুসলমান সেনানায়ক: মীর হাবিব। সে না হিন্দু, না মারাঠা!

কিন্তু সে-সব তো ইতিহাসের কথা। কথাসাহিত্যের খাতিরে আমরা যদি ধরে নিই—মুহূর্তমধ্যে ঐ গণহত্যা সংগঠিত হয়নি, তাহলে কল্পনা করতে পারি ভাস্কর পণ্ডিত বৃদ্ধ আলিবর্দীকে তিরস্কার করে হয়তো বলতো: রে নরাধম! পাপিষ্ঠ! এই কি যোদ্ধার প্রতি

যোদ্ধার আচরণ! নরকের ভয় নেই তোর?

আলিবর্দী আরাম-কেদারায় সোজা হয়ে বসতেন, আলবোলার নলটি সরিয়ে রেখে বলতেন, শত শত গ্রামের সহস্র সহস্র অসহায় নরনারীকে যখন পৈশাচিক উল্লাসে হত্যা করেছিলি তখন তোর দোজখের ভয় হয়নি? আমি তো বেহেস্তে যাব রে! তোদের মতো বাইশটি নরকের কীটকে হত্যা করে আমি তো বাইশ হাজার ঔরতের ইজ্জৎ রক্ষা করেছি!

পরস্বাপহারকের বৃত্তি গ্রহণ করে সংসারযাত্রা নির্বাহের আয়োজন করেছিল দস্যু রত্নাকর। তার বাপ-মা-স্ত্রী-পুত্র জানত, কী-ভাবে সংসার চল্‌ছে। কিন্তু পাপের হিস্যা নেবার প্রশ্ন যখন উঠল তখন কেউই রাজী হয়নি। আলিবর্দী এ ষড়যন্ত্রের কথা পরিবারবর্গের কাছে সম্পূর্ণ গোপন রেখেছিলেন। তিন মেয়ে, তিন জামাই, এক পত্নী এবং নাবালকদের কথা বাদ দিলে একমাত্র দাদুভাই—চতুর্দশবর্ষীয় সিরাজ—কেউই কিছু জানত না! তাই বলে পাপের ষোল-আনা হিস্যা কী-করে বৃদ্ধের স্কন্ধে চাপাই? দু-আনা অংশ তো নিতে হবে মুস্তাফা খাঁ আর জানকীরামকে! পাপের ভাগ তো তারাও পেল।

দেওয়ান জানকীরাম রাত পোহালে হয়ে গেল 'রাজা' জানকীরাম। তার পুত্র দুর্লভরামকে করা হল কটকের শাসনকর্তা। আফগান সর্দার গোলাম মুস্তাফা খাঁকে দেওয়া হল নগদ অর্থ। তাছাড়া পাঁচ-হাজারী মনসবদারের পদ থেকে তাকে উন্নীত করা হল চৌদ্দ-হাজার সৈনিকের সেনাপত্যে! কিন্তু মুস্তাফা তাতে খুশি নয়। সে দাবী করল বিহার প্রদেশের সুবেদারী। আলিবর্দী তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন—তা কেমন করে সম্ভব? সেখানে বর্তমান সুবেদার হচ্ছে জৈনুদ্দীন আহ্‌মেদ, নবাবের দামাদ (সিরাজদ্দৌলার পিতৃদেব)। তাকে তো বিনা অপরাধে পদচ্যুত করা চলে না। তাছাড়া গোলাম মোস্তাফা খাঁ চরিত্রগতভাবে যোদ্ধা, শাসক নয়—এটাই আলিবর্দীর ধারণা। ফলে, কালে হয়তো তাকে প্রধান সিপাহ-সালার করা যেতে পারে, কিন্তু শাসকের দায়িত্ব দেওয়া চলে না। মুস্তাফা ক্ষুব্ধ হল। পদত্যাগ করল। আলিবর্দী বললেন, তোমার পুরস্কারের নগদ অর্থ এবং সৈন্যদলের বাকি-বকেয়া মিটিয়ে নিয়ে তুমি চলে যেতে পার।[১] যে-কোন দিন আবার ফিরেও আসতে পার। আমার দুয়ার চিরকাল তোমার জন্য উন্মুক্ত।

ন্যায়, ধর্ম, ইমান, ইনসাফের প্রসঙ্গ তুলেছিলে না তোমরা? এবার শোন: টাকা-কড়ির হিস্যা বুঝে নিয়ে মুস্তাফা খাঁ সোজা গিয়ে হাজির হল রঘুজী ভোঁসলের দরবারে। তাকে আমন্ত্রণ জানালো বাঙ্গলা লুট করতে। রঘুজী আক্রমণ করল উড়িষ্যা। কটক অধিকার করে বন্দী করল

---

১) "Mustafa began to threaten him. An armed conflict in the capital seemed imminent; but Alivardi seduced some of the other Afgan captains and even a few of the lieutenants of Mustafa. The general at last resigned the Nawab's service, and left Murshidabad with his own contingent in February 1745, on his dues being paid in full." *The History of Bengal*, Vol II, Muslim Period, Edited by Sir Jadunath Sarkar, The University of Dacca, Ramna, Dacca, 1948 (3rd impression: Aug'76, P. 462).

জানকীরামের পুত্র দুর্লভরামকে। আর মুস্তাফা স্বয়ং আক্রমণ করল পাটনা। আলিবর্দী ছুটে এলেন মুর্শিদাবাদ থেকে। কোনক্রমে রক্ষা পেল পাটনা। মুস্তাফা খাঁ পালিয়ে গেল চুনারের দিকে।

আটচল্লিশ সালের প্রথম দিকে শুধু বাংলা নয়, গোটা ভারতের ভাগ্যেই দেখা দিল এব অভিশাপ। দিগ্বিজয়ী নাদির শাহর উত্তরাধিকারী আহ্‌মদ শাহ্ দুরানী আক্রমণ করল পাঞ্জাব আর দিল্লী। এই সুযোগে নবাব আলিবর্দীর প্রাক্তন আফগান সর্দারেরা—গোলাম মোস্তাফা, সমশের খাঁ, সর্দার খাঁ প্রভৃতি সম্মিলিতভাবে পাটনা আক্রমণ করে বসল। রঘুজী ভোঁসলের কিছু মারাঠা সৈন্যও এই আক্রমণে অংশ নেয়। সিরাজদ্দৌলার পিতা সুবেদার জৈনউদ্দীন আহ্‌মেদ সম্মুখ যুদ্ধে একপক্ষকে প্রতিহত করেন। মোস্তাফা খাঁ প্রথমে হত হয়। অন্যান্য সর্দারেরা তাতে হতোদ্যম হয়ে পড়ে। জৈনুদ্দীন তখন সেই বিদ্রোহী আফগান সর্দারদের সঙ্গে সন্ধির শর্ত বিষয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী হন। ঠিক যেভাবে ভাস্কর সন্ধি-মণ্ডপে নিহত হন, সেইভাবেই অতর্কিত আক্রমণে সন্ধির মণ্ডপে জৈনুদ্দীনের শিরশ্ছেদ করা হল। আফগান সর্দারের সদ্যোবিধবা আমিনা বেগম ও তার সন্তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে উন্মুক্ত শকটে পাটনা শহর পরিক্রমা করায়। জৈনুদ্দীনের পিতা, অর্থাৎ আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহমেদকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করে।

ঐতিহাসিক নিখিলনাথ বলছেন:

> নবাব এই সংবাদশ্রবণে হৃদয়ে এতদূর আঘাতপ্রাপ্ত হন যে, আফগানদিগের দমনে কী উপায় করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। তিনি নিজের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জামাতা জৈনুদ্দীনের ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার তাদৃশ শোচনীয় পরিণামে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। স্নেহপুতলী কন্যা, দৌহিত্র ও দৌহিত্রীদিগের নির্যাতন ও অবমাননায় নবাব স্ত্রীলোকের ন্যায় কাতর হইলেন।[১]

আমিনা-বেগমের দুই পুত্র ও এক কন্যার উল্লেখ পেয়েছি। জ্যেষ্ঠপুত্র সিরাজদ্দৌলা মায়ের কাছে পাটনায় থাকত না। নবাব ঐ আদরের দাদুভাইকে সর্বদা কাছে কাছে রাখতেন। গোলাম হুসেন সালিমের 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন' পাঠে, অন্তত আবদুস সালামকৃত তার ইংরেজি অনুবাদ পড়ে জেনেছি—'নবাব সম্পূর্ণ হতোদ্যম হয়ে পড়েন। শিশুর মতো ক্রন্দন করতে থাকেন। এই সময়ে তাঁকে উজ্জীবিত করেছিলেন বেগমসারাহ্। তাঁরই প্ররোচনায় নবাব প্রতিশোধে বদ্ধপরিকর হন।'

সমস্ত প্রাসাদ যখন শোকে মুহ্যমান তখন এই পলিতকেশা বৃদ্ধা হারেম থেকে বার হয়ে এলেন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত রূপসজ্জায়। যেন মুক্তকেশী পাঞ্চালী! ঘটোৎকচ অথবা অভিমন্যু বধের পর পাণ্ডব শিবিরে নেমে আসা চরম হতাশার মুহূর্তে যেন জ্বলন্ত যাজ্ঞসেনী!

আলিবর্দী থমকে গেলেন। ধর্মপত্নীর তীব্র ভর্ৎসনায় সম্বিৎ ফিরে পেলেন যেন। মনে পড়ল—ঐ বৃদ্ধার পাঁজর-সর্বস্ব বুকেও তো শেলটা একইভাবে বিদ্ধ হয়েছে! তবু তো সে ভেঙে পড়েনি! উৎসাহ জোগাচ্ছে স্বামীকে, নাতিকে! ক্ষাত্রতেজে জ্বলে উঠলেন আলিবর্দী

১) মুর্শিদাবাদ কাহিনী/নিখিলনাথ রায়/পৃঃ ৪২

যেমন্ত সেনানায়ককে একত্র করে বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধ রণহুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। সব সেনাপতি বাবের পদতলে তরবারি রেখে আমৃত্যু সংগ্রামের জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন। অক্ষয়কুমার এখানে লিখেছেন, "সিরাজদ্দৌলা বালক হইলেও এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পিতা ও পিতামহ উভয়েই শত্রহস্তে নিহত, মাতা বন্দিনী, সিরাজদ্দৌলা নীরবে এই শোকল সংবাদ সহ্য করিতে পারিলেন না। অসিহস্তে মাতামহের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজ বালক হইলেও বীর বালক। নবাব তাহাকে লইয়া যাত্রা করিলেন।"[১]

অঙ্কের হিসাবে সিরাজের বয়স তখন আঠারো। কেন যে তাকে মহাপণ্ডিত বারে বারে 'বালক' বলেছেন জানি না। সে যাই হোক, আলিবর্দী মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করলেন সেই 'লীপ-ইয়ার'-এর বাড়তি দিনটায়: 29.2.1748 তারিখে। ভাগলপুরের কাছাকাছি নয়া মারাঠা-নায়ক মীর হাবিবের সৈন্যদলকে পর্যুদস্ত করলেন মার্চের মাঝামাঝি। এ যুদ্ধে অসীম বীরত্ব দেখিয়েছিলেন সিরাজ। গঙ্গার দক্ষিণতীরে পাটনা শহরের ছাব্বিশ মাইল পুবে রানীসরাইয়ের ময়দানে সংযুক্ত আফগান ও মহারাষ্ট্রীয় বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করলেন ষোলই এপ্রিল। এখানেও সিরাজদ্দৌলা যুদ্ধক্ষেত্রে অপরিসীম বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তারপর রা উপনীত হলেন পাটনায়। দখল করলেন দুর্গ। ভূগর্ভস্থ অন্ধ কারাগাব থেকে আমিনা-বেগম ও তার নাতি-নাতনিদের উদ্ধার করতে যখন ছুটে গেলেন বৃদ্ধ নবাব, তখনো তাঁর পাঁজর-ঘেঁষে হাজির ছিল আঠারো-বছরের জওয়ান নাতি!

স' দুর্ভাগ্য সেই বাংলার শেষ নবাবের। আজও আফিংখোর বুড়ো ইতিহাস বলে চলেছে, 'না হল তার যুদ্ধবিদ্যা শেখা, না হল তার রাজকার্য চালানোর কোনও জ্ঞানগম্যি।'

জ' বাহাত্তুরে বুড়োর এই 'ভীমরথী'র কথাটা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রেখেছে ইতিহাস। কিন্তু সেই দলিত আফগান-মারাঠা শক্তির বিরুদ্ধে নাতি-দাদুর অবিশ্বাস্য যুদ্ধজয়ের নেপথ্যে এক বাষট্টি বছরের বুড়ি দিদাব নথ-নাড়া আর মুখ-ঝামটার অনুপানটুকুর কথা ইতিহাস লিখে রাখতে ভুলেছে। আফিংখোর বুড়ো ইতিহাসেরও ঐ এক চিরকেলে ভীমরথী! যার যা পাওনা তা ন্যায্য অন্যায় ভাগ-বাটোয়ারা করতে তার ভুল হয়ে যায়: কত নারী দিল মাথার সিঁদুর লেখা নাই ইতিহাসে।

মু' সিরাজের কুকীর্তির কথা আর কী বলব? বেহুদ্দো এ কেতাবের কলেবর কয়েক ফর্মা বৃদ্ধি হয়ে যাবে। কী দরকার? সে-সব তো তোমরা জানই:

> বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঔদ্ধত্য-লাম্পট্য-কাণ্ডজ্ঞানের অভাব যেন আরো বেড়ে যেতে লাগল। বুনো স্বভাব যেন আরও বন্য হতে চলল। না হল তাঁর যুদ্ধবিদ্যা শেখা, না হল তাঁর রাজকার্য চালানোর কোনো জ্ঞানগম্যি। এক কাব্যকাহিনী ছাড়া আর কিছুতে তো সিরাজদ্দৌলাকে কোনক্রমে শহীদ বানাতে পারা যাচ্ছে না: কী হিন্দু, কী মুসলমান, কী ইংরেজ, কী ফ্রেঞ্চ, কী ডাচ্ একজনও কেউ তাঁকে একটা ভালো সার্টিফিকেট দিয়ে যাননি।[২]

১। সিরাজদ্দৌলা/অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়/পৃঃ 34

২। পলাশীর যুদ্ধ/তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়/চতুর্থ মুদ্রণ/পৃঃ 103

এরপর আমাদের সমকালীন লেখক দুটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন কাশিমবাজার ফরাসি-কুঠি অধ্যক্ষ জাঁ ল-সাহেবের স্মৃতিচারণ থেকে। প্রথমটায় এক নবাবী-খেলার কথা উল্লেখ ক হয়েছে :

> বর্ষাকালে যখন ভাগীরথী জলে-জলে টৈটুম্বুর হয়ে দুকূল উপছে পড়ছে তখন সিরাজদৌ তাঁর অনুচরদের মারফত কৌশলে যাত্রীদের খেয়াপারের নৌকাগুলিকে উল্টিয়ে দিয়ে ম দেখতেন। যাত্রীরা যখন প্রাণের দায়ে চীৎকার করত আর তারপর নিরুপায় হয়ে হাত- ছুঁড়ে এক-এক করে জলে ডুবে মরত তখন তাই দেখে সিরাজদৌল্লা আমোদ পেতেন

ফরাসী লেখকের স্মৃতিচারণ অবলম্বনে তপনমোহন আরও জানিয়েছেন,

> কোন সুন্দরী হিন্দু-স্ত্রীলোক গঙ্গাস্নানে নেমেছেন দেখলেই সিরাজদৌল্লাব চরেরা তখুনি গিয়ে তাঁকে সেই সংবাদ জানাত। তারপর সেই স্ত্রীলোক একেবারে নিখোঁজ। তাঁর আত্মী স্বজনেরা কেউ আর কস্মিনকালেও তার সন্ধান পেতেন না।[২]

স্বীকার্য, মস্যুয়ে জাঁ ল ইংরাজের বিপক্ষদলের লোক। কিন্তু তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞা কাশিমবাজারে বসে হওয়া সম্ভবপর নয়। তথ্য সংগ্রহ করেছেন কোন সূত্র থেকে? নবাবে পক্ষে তখন কেউ নেই। পরেও নেই। এইসব জনশ্রুতির অন্য কোনও সূত্র থেকে সমর্থন নেই। সিরাজ যে বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই দাদুর অতি আদরে অতিরিক্ত মদ্যপান ও নারীস করত এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য। হিন্দু রাজা-রাজড়া এবং মুসলমান আমীর ওমরাহরা নিজ নি নানান স্বার্থে সিরাজকে সরিয়ে অন্য কোনও উত্তরাধিকারীকে আলিবর্দীর পর গদীতে বসা চেয়েছিলেন। পুত্র-সন্তানহীন নবাবের জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রই যে গদীর হকদার এটা অস্বীকার করা উপায় নেই। ফলে সকলেই উঠে পড়ে লেগেছিলেন সিরাজের দুর্নাম রটাতে। যাতে সবা সিরাজের সিংহাসন লাভে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সিরাজ নিজেই মদ্যপ ও দুশ্চরিত্র ; ফলে তা কাম-বিকারের চিত্রগুলি আরও বীভৎস করে পরিবেশিত হতে থাকে। শোনা যেতে থাকে সিরাজের এক বিলাস—গর্ভিণী নারীর নিম্নোদর বিদীর্ণ করে সন্তানদের বার করে দেখা! শোনা গেল, রানী ভবানীর বিধবা কন্যা তারা দেবীকে বজরার ছাদ থেকে দেখতে পেয়ে সিরা না কি ক্ষেপে ওঠেন। পাইক পাঠিয়ে তারাহরণের প্রচেষ্টা করেন! জগৎ শেঠের এক কুলবধূ একবার স্বচক্ষে দেখবার জন্যও নাকি সিরাজ ক্ষেপে ওঠেন!

যুবরাজ সিরাজ মদ্যপ, ইন্দ্রিয়াসক্ত—একশ বার! কিন্তু নবাব সিরাজ?

> একটা কথা বলিয়া রাখি, বাঙ্গলার ইতিহাসে সিংহাসনে আরোহণের পরেও সিরাজ যে ঘোরতর মদ্যপায়ী বলিয়া বর্ণনা করা হয়, ইহা সম্পূর্ণ অমূলক। যৌবনারম্ভে সিরা মদ্যপান করিতেন বটে কিন্তু আলিবর্দী মৃত্যুশয্যায় সিরাজকে কোরান স্পর্শ করাই

---

১ ও ২) ঐ [মূল তথ্যঃ *Memoire sur l' Empire Mogul, by Jean Law, ed. by Martineau (Paris, 1913)*

৩) 'সিরাজদ্দৌলাব সমসাময়িক ইংবাজ এবং মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ তাঁহার জীবনকালে যে-সকল ইতিহাস লিপিব করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁহাব অনেক কুকীর্তির উল্লেখ আছে ; কিন্তু গর্ভবিদারণ, নৌকাসহিত ভাগীরথীগর্ভে নরনারী-নিমজ্জ প্রভৃতি অদ্ভুত অত্যাচাবের কোনও উল্লেখ নাই! বলাবাহুল্য যে, ইহার অধিকাংশই নিছক রটনা।'—সিরাজদ্দৌলা/অক্ষয়কুমা মৈত্রেয়/পৃঃ ৫৭.

ভবিষ্যতে মদ্যপান না করিতে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন এবং সিরাজ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন মাতামহের সেই হিতকর অনুরোধ রক্ষা করিতে ত্রুটি করেন নাই।[১]

তাই অবাক হয়ে যাই যখন 1953 সালে প্রকাশিত 'পলাশীর যুদ্ধ' গ্রন্থে তপনমোহন ললেন, তিনি 'নবাব' সিরাজের স্বপক্ষে কারও কোনও সার্টিফিকেট খুঁজে পাননি, নবীন সেনের কবিতা ব্যতিরেকে।

নিখিলনাথ হিন্দু এবং তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচনা করেছেন মুর্শিদাবাদ কাহিনী। কিন্তু তথ্যসূত্রের ইঙ্গিতও তো তিনি দিয়ে গেছেন:

> I have before mentional Siraj Dowla, as giving to hard-drinking; but Allyverde, in his last illness, foreseeing the ill consequences of his excess, obliged him to swear on the Koran, never more to touch any intoxicating liquor; which he ever after strictly observed ("An Enquiry into our National Conduct to Other Countries", Chap II, p.. 32)

লেখক ইংরাজ ঐতিহাসিক। পাছে নিখিলনাথকে ঐতিহাসিকেরা অবিশ্বাস করেন, তাই সক্ষেদে তিনি গত শতাব্দীতে লিখেছিলেন:

"ইহা একজন ইংরেজের কথা, দেশীয়ের নহে।"

হায় নবাব সিরাজ! আজও তোমার বরাতে একটা 'গুড-কন্ডাক্টের' সার্টিফিকেট জোগাড় ল না ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে।

তবে হ্যাঁ, সিরাজের একটি বিশেষ অপকীর্তির কথা আলোচনা না করে প্রসঙ্গান্তরে যেতে পারছিনা। একটি অসমাপ্ত হত্যা-মামলার তদন্ত!

ইতিহাস কী-ভাবে পাঠককে বিভ্রান্ত করতে পারে এটি তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইতিহাস রা লেখেন তাঁরা যদি রচনার পূর্বকাল থেকেই একটি বদ্ধ-ধারণার বশবর্তী হয়ে কলম নিয়ে সেন তাহলে সেটা হয়ে পড়ে আরও বিড়ম্বনার।

সিরাজের এই অপকীর্তিটার বিবরণ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জবানীতেই শোনাই:

> সম্ভ্রান্ত লোকেরা সিরাজের নাম শুনলেই আতঙ্কে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। কার যে কখন তাঁর হাতে মাথা কাটা যায় এই ভয়ে তাঁদের কারো রাত্রে ঘুম হয় না। একদিন প্রকাশ্য রাজপথেই হোসেন কুলী খাঁ বলে একজন আমীর লোককে সিরাজউদ্দৌলা খুন করলেন। হোসেন কুলী খাঁর সঙ্গে তাঁর বড় মাসী ঘসেটী বেগমের গুপ্ত-প্রণয় ছিল ব'লে লোকে সন্দেহ করত। ঘসেটী বেগমের এ-বিষয়ে বড়ই দুর্নাম। আত্মীয়-স্বজনের কাছে সিরাজ তাই দোহাই পাড়লেন। দেখা যায় যে-দোষটা নিজের খুব বেশী, সে-দোষটা অপরের চরিত্রে দেখলে লোকে আর সেটাকে সহ্য করতে পারে না! কিন্তু আসলে অন্য একটা কারণ ছিল। সকলের কাছে হোসেন কুলী খাঁর প্রতিপত্তি দিন দিন যেরকম বেড়ে উঠছিল তাতে সিরাজউদ্দৌলার মনে তাঁর সম্বন্ধে খুবই ভয় ঢুকে গিয়েছিল। আর বেশি

---

[১] *মুর্শিদাবাদ কাহিনী/নিখিলনাথ রায়/পৃঃ 115.*

বেড়ে ওঠবার আগেই তাঁকে এ-জগৎ থেকে সরিয়ে দেওয়াটা সিরাজউদ্দৌলা অনেক আগে থেকেই স্থির করেছিলেন। তাই প্রকাশ্যে সাফাই গেয়ে বলে বেড়ালেন হোসেন কুলী খাঁ-ই তাঁকে খুন করবার জন্য সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছেন।[১]

দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলাম, 1953 সালে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থটি থেকে, শুধু দেখাতে যে, আমরা কী-ভাবে পণ্ডিতদের দ্বারা বিভ্রান্ত হই! এ গ্রন্থ প্রকাশের পঞ্চাশ বছর আগে নিখিলনাথ যে অরণ্যরোদন করেছেন তা ব্যর্থ:

> ঐতিহাসিকেরা একটি ঘটনার জন্য সিরাজকে যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার কারণটি জানিতে পারিলে কেহই সিরাজকে তজ্জন্য বিশেষরূপে দায়ী করিবেন না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ঐতিহাসিকগণ ... মনের আবেগে সিরাজকে নিন্দা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহার মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই। ... কারণটি সেই নৃশংস হত্যা অপেক্ষা কোন অংশে অল্প গুরুতর নহে। আলিবর্দী খাঁ ও তাঁহার বেগমের ন্যায় মহিলা যে-সংসারের কর্তা ও কর্ত্রীস্বরূপ ছিলেন, দুঃখের বিষয়, সেই সংসারে ব্যভিচার ও পাপ প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদের হৃদয়ে সর্বদা সহস্র বৃশ্চিকদংশনের যন্ত্রণা প্রদান করিত। বলিতে দুঃখ ও লজ্জা বোধ হয় যে, আলিবর্দী খাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসেটী ও কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা উভয়েই আপনাদিগের পবিত্র চরিত্র রক্ষা করিতে পারেন নাই। ঘসেটী অনেকদিন হইতে পাপপথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। জৈনুদ্দীনের (সিরাজের পিতা) মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী আমিনাও ভগিনীর পথের অনুসরণ করেন। এই আমিনাই সিরাজের মাতা। দুই ভগিনীই হোসেনকুলী খাঁর প্রণয়ভাগিনী হইয়া উঠেন। ...কিন্তু...আমিনা স্বামীর মৃত্যুর পর মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলে হোসেনকুলী খাঁ তাহার সহিত গুপ্তপ্রণয় স্থাপন করেন। ...কন্যাগণের কুপথগমনের কথা জ্ঞাত হওয়া অবধি নবাব-বেগম তাহা নিবারণের জন্য অশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ক্রমে যখন তাঁহাদের গুপ্তপ্রণয় কথা লইয়া সমস্ত মুর্শিদাবাদে আন্দোলন উপস্থিত হইল, তখন নবাব-বেগম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা পূর্বে সচ্চরিত্রা থাকিয়া এক্ষণে অধঃপাতের দিকে যাইতেছে দেখিয়া এবং হোসেনকুলী খাঁকেই সেই অধঃপতনের কারণ জানিয়া তিনি তাহার প্রতিবিধানে যত্নবতী হইলেন। সিরাজ স্বীয় জননীর কলঙ্কের কথা শুনিয়া...[২]

কী বলবেন এরপর?

সমকালীন ইংরাজ ও মুসলমান ঐতিহাসিকদের মানসিকতা প্রণিধানযোগ্য। একটা দেশে বাণিজ্য করতে এসে শাসনদণ্ড ছিনিয়ে নিতে হলে এছাড়া উপায় কী? ন্যায্যশাসককে বঞ্চিত করতে যদি তার সেনাপতিকে ঘুষ খাওয়াতে হয়, তখন ইতিহাসে লেখার প্রয়োজন হয়: ‘গিলি-গিলি হোকাস-পোকাস!’ সমকালীন হিন্দু-মুসলমান রাজা-রাজড়া এবং আমীর-ওমরাহরাও তাঁদের বিশ্বাসঘাতকতার কৈফিয়ৎ হিসাবে—দেশী শাসককে পিছন থেকে

১) *পলাশীর যুদ্ধ*/তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়/চতুর্থ মুদ্রণ/পৃঃ 105

২) *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*/নিখিলনাথ রায়/পৃঃ 84

ছুরি মেরে বিদেশীকে ডেকে আনার যৌক্তিকতা হিসাবে—সিরাজ চরিত্র নানাভাবে কলঙ্কিত করেছেন। এটুকু সহজেই বোধগম্য। কিন্তু বিংশশতাব্দীর ইতিহাস লেখকের এমন মানসিকতা হল কেন? বিশ্বাস করা কঠিন যে, তপনমোহনবাবু 'পলাশীর যুদ্ধ' রচনার পূর্বে নিখিলনাথের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' পড়েননি। এ যেন 'গিবন' না পড়ে রোম-সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন সম্বন্ধে একখানা নয়া-কেতাব লেখার প্রচেষ্টা। বেশ, না-হয় তর্কের খাতিরে তাও ধরে নেওয়া গেল। কিন্তু তপনমোহন তো ক্রমাগত 'মুতাক্ষরীন'-গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই তথ্যটি সেই ইংরাজি অনুবাদেও[১] তো বিস্তারিতভাবে বর্ণিত! তাহলে?

তবু তপনমোহন বুঝে উঠতে পারেন না— কেন সিরাজ বলে বেড়ালো যে, হোসেনকুলী খাঁই তাকে খুন করতে চায়! তা না বলে হতভাগ্য সিরাজ কী বলে বেড়াবে—"ওগো, তোমরা ভুল শুনেছ! শোন, বুঝিয়ে বলি! বড়মাসী নয়। হোসেনকুলী ছিল আমার বিধবা মায়ের গুপ্তপ্রণয়ী। তাই দিদার হুকুমে...."

আচ্ছা, আবার না হয় ধরে নিই—মুতাক্ষরিনের প্রথমখণ্ডের ঐ 647 নম্বর পৃষ্ঠাটি তপনমোহনের নজর এড়িয়ে গেছে; কিন্তু সেই বাইশ-বছরের বাইশ-সেরী ওজনের বাঈজীর ঐতিহাসিক উক্তিটা? সমকালীন ভারতের সে নাকি ছিল শ্রেষ্ঠা সুন্দরী। সেটা শোনা কথা। কিন্তু সে যে সবচেয়ে মর্মান্তিক মৃত্যুর রেকর্ড করে গেল। আর সবচেয়ে বড় কথা: মৃত্যুমুহূর্তে তার মুখের পেশীতে কোথাও কুঞ্চনরেখা দেখা যায়নি!

নারীর প্রেম যে বাজারের পণ্য নয়, তার দেহটাই কেনা-বেচা করা যায়, এই তত্ত্বটার একটা জ্বলন্ত প্রমাণ রেখে মৃত্যুঞ্জয়ী হল মেয়েটি। তার মৃত্যুমুহূর্তে কেউ উপস্থিত ছিল না, কোন সাক্ষী নেই। সে ছিল পালঙ্কে শুয়ে। পায়ের কাছে জড়ো করা ছিল স্তূপাকার জরোয়া গহনা। আমার তো মনে হয় মৃত্যুমুহূর্তে এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবার আগে সে শেষ কথা যেটা বলে গেছে আপনমনেই, তা: আমি মৃত্যু চেয়ে বড়!'

সেই ফৈজী ফয়জান-এর বিস্মরণের-অতীত ঐতিহাসিক—উভয় অর্থেই ঐতিহাসিক—উক্তিটা ইতিহাস ঘেঁটে জেনে নেবার সৌভাগ্যও কি হয়নি তপনমোহনের?

ফৈজী ফয়জান ছিল দিল্লীর নটী। অতি বিখ্যাত নর্তকী। রূপের খ্যাতিই বেশি। "মুর্শিদাবাদে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, তৎকালে ফৈজীর ন্যায় সুন্দরী সমগ্র ভারতবর্ষ দ্বিতীয় কেহই ছিল না।" তার ওজন মাত্র বাইশ সের। সিরাজ এই অদ্বিতীয়া রূপবতীর কথা শুনে মোহিত হয়ে যায়। তখন সে নবাবজাদা। এক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে ফৈজী বাইজীকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসে। হারেমজাত করে।

অর্থমূলে কেনা সখের ঠুনকো জিনিস। মালিকানা ক্রেতার। হক্কের ধন। কিন্তু ঐ যে এক বেয়াড়া দেবতা আছেন না, যাঁকে ভস্ম করেও পরে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন মহাদেব, তিনি এসব সহজ হিসাব মানতে নারাজ। মুর্শিদাবাদে এসে ফৈজী প্রেমে পড়ল এক আশ্চর্য যুবকের—বলিষ্ঠ, সুগঠিততনু, অপূর্ব সুন্দর তার রূপ: সৈয়দ মহম্মদ খাঁ। লোকটা সিরাজের ভগ্নিপতী। অন্তঃপুরে তার অবাধ যাতায়াত।

---

১) *Mutaqherin*, Vol. I., p. 647.

সিরাজের গুপ্তচর সর্বত্র। খবর পেল। বিশ্বাস হল না। তবে তক্কে তক্কে থাকল। তারপর একদিন [illegible] ধরে ফেলল দুজনকে। সৈয়দ মহম্মদ পালিয়ে বাঁচে। সিরাজ তার পশ্চাদ্ধাবন করল না। নিজের ভগিনীপতি! তাকে তো আর কোৎল করা যাবে না! সমস্ত আক্রোশটা গিয়ে পড়ল ঐ কসবির উপর। তরবারি কোষমুক্ত করে সিরাজ চাপাগলায় হিস্‌হিসিয়ে ওঠে: ওরা তাহলে ঠিকই বলে! বেশ্যা কোথাকার!

খোলা তলোয়ারের সামনে দাঁড়িয়েও মেয়েটি ভয় পেল না! মাথা খাড়া রেখেই বললে, সে কী নবাবজাদা! লাখটাকা দিয়ে রণ্ডিবাজার থেকে যখন আমাকে কিনে এনেছিলেন তখন ও কথাটা জানতেন না? ও-গালাগালে আমার সরম হবে কেন? কথাটা বরং আপনার মাকে বলে দেখবেন—সত্যি হলেও দেখবেন, তিনি তা সইতে পারবেন না!

সিরাজ বজ্রাহত হয়ে গেল! ধীরে ধীরে কোষবদ্ধ করল তরবারি। তাহলে সেদিন দিদা যেকথা বলেছিল তা তো মিথ্যা নয়! গোটা মুর্শিদাবাদ এ-কথা জানে!

ধীরপদে গৃহত্যাগ করল সিরাজ। কোন আঘাত না করে। পরেও কেউ ঐ সিরাজ-জননীর লাঞ্ছনাকারিণীকে স্পর্শ করেনি। শুধু সিরাজের আদেশে মীর মুন্‌সি এসে সেই ঘরের জানলা-দরজাগুলি পাকা ইটের গাঁথনিতে বন্ধ করে দিয়ে গেল। ফৈজী টুঁ শব্দটি করেনি। দু চোখ মেলে দেখেছে রাজমিস্ত্রি আর মজুরদের গাঁথনির কাজ! কথা বলেনি, কিন্তু একে-একে তার গা থেকে খুলে ফেলেছিল বহুমূল্য হীরে-জহরৎ-বসানো অলঙ্কার। ভয়ে কণ্ঠ রোধ হয়ে এল মীর-মুন্সির। এ আচরণের তো একটাই অর্থ: ঐ বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি হস্তান্তর করে মেয়েটি প্রাণ-ভিক্ষা চাইবে—কিন্তু কার কাছে? মীর মুন্সি, প্রহরী না নবাবজাদা?

আশ্চর্য! কারও কাছেই সে প্রাণ-ভিক্ষা চাইল না। শুধু শেষ ইটখানা বসিয়ে যখন কর্নিক দিয়ে ঠুকতে গেল—ভুলও হতে পারে—মীর মুন্সির মনে হয়েছিল ঐ বাইশ বছরের মেয়েটির কণ্ঠ থেকে অস্ফুটে উচ্চারিত হয়েছিল একটি মাত্র শব্দ : অল্লাহ্!

অনেক-অনেকদিন পরে প্রাচীর ভেঙে সে গৃহে প্রবেশ করেছিল রাজপ্রহরী। দেখে, পালঙ্কে শায়িত অবস্থায় এক নারীর কঙ্কাল! তার পায়ের কাছে স্তূপাকার করে রাখা আছে মণি-মাণিক্যে গাঁথা নানান অলঙ্কার—নবাবজাদার প্রণয়োপহার! মৃত্যুপথযাত্রিণী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত! ফৈজী ফয়জানের ধিক্কার কেন 'ঐতিহাসিক', জান? এ তিরস্কার ফৈজী করেনি নবাবজাদাকে! বিশ্ববারাঙ্গনার তরফে পুরুষশাসিত মনুষ্যসমাজের বিরুদ্ধে এ ধিক্কার! জান দিয়ে ফৈজী ফয়জান বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল: নারীর প্রেম অর্থমূল্যে কেনাবেচার বেসাতি নয়!

নবীন সেন থেকে শচীন সেনগুপ্ত কেউই দাবী করেননি যে, সিরাজউদ্দৌলা ছিল ধোওয়া তুলসী পাতাটি! কিন্তু 'ডেভিল'কে কেন বঞ্চিত করা হচ্ছে তার 'ডিউ' থেকে? দাদুর মৃত্যুর আগে আর পরে সিরাজ যে ভিন্ন চরিত্র এটা ইতিহাস আর কবে মেনে নেবে? জাঁ ভালজাঁ লোকটা তো সেই জন্যই 'মিজারেব্‌ল্'! কারণ দুনিয়া মেনে নিতে পারেনি যে, বিশপের বাতিদান চুরি করার আগে আর পরের মানুষ দুটো ভিন্ন ব্যক্তি!

পলাশীর যুদ্ধের পর দু শ' বছর তো কেটে গেছে। বিজয়ী লর্ড ক্লাইভ আত্মহত্যা করে মুক্তি পেল, 'ইম্পিচড্' হল ওয়ারেন হেস্টিংস, মীরজাফর দীর্ঘদিন যন্ত্রণাদায়ক কুষ্ঠরোগে ভুগে প্রাণ দিল আত্মীয়-বন্ধুদের কাছ থেকে বিতাড়িত হয়ে। ব্যভিচারিণী ঘসেটী-আমিনা দু-বোনের হল

যৌথ সলিল-সমাধি! মীরন মরল বজ্রাঘাতে। সকলের সব পাপের তামাম শুদ্! মায় জেতা-সাম্রাজ্যটা 'কুইট' করে ইংরেজ এই তো সেদিন ফিরে গেছে তাদের নিজের দেশে। বাকি আছে একমাত্র ঐ ঃ লা মিজারেব্ল্।

এখনো পণ্ডিতেরা তাকে কবর থেকে টেনে তুলে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বলেন ঃ সবুর কর! তোমার বিচারটা বাকি আছে হে! হোসেনকুলী হত্যা মামলা!

এখনো ঐতিহাসিকেরা মেনে নিতে পারেননি অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র গবেষণাগ্রন্থের একেবারে শেষ পংক্তিটি:

"Sherajaddaulah was more unfortunate than wicked!"

বড় অভাগা ঐ দিদাও — বেগম শরফ উননিসা।

না, দ্রুপদনন্দিনী যাজ্ঞসেনীর মতো নাথবতী অনাথবৎ নয় সে; পাঁচ-ভাতারি আতান্তরিতে ভুগতে হয়নি তাকে। ওদিকে প্রজাপালনের অজুহাতে একমাত্র বেগমকে বনে পাঠাবে এমন খসম্-এর ঘরও করতে হয়নি তাকে। তবে শেষ জীবনে নানা দিক থেকে মৃত্যু এসে তছনছ করে দিল তার সোনার সংসার। তৃতীয়বার কন্যাসন্তান জন্মানোর পর ওর জোয়ান খসমকে বলেছিল, 'আমার নসিবে নেই গো, তুমি আর একটা নিকে কর!' ওর স্বামী কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল; বলেছিল, 'ছাওয়াল নিয়ে কী করব গো? মসনদ কাকে দিয়ে যাব সে চিন্তা তো নেই! দিন আনি, দিন খাই — মেয়েরাই বুড়ো বয়সে দেখভাল করবে।'

তখন ওর স্বামী, মীর্জা মহম্মদ আলী দিল্লী থেকে বাঙলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর কাছে চাকুরির সন্ধানে এসে সদ্য প্রত্যাখ্যাত হয়ে কটকে গিয়ে যাহোক একটা নোকরি জুটিয়ে নিয়েছে। সঙ্গে তার জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজী আহমদ। সেখানে সে নায়েব সুবার দরবারে পারিষদ আর কিছুদিন পরে একটি জেলার ফৌজদার হয়। তার পরেই কিসমতের খেল হল শুরু। দুই ভাইয়ের বুদ্ধিতে মুর্শিদকুলির মৃত্যুর পর সুজাউদ্দীন উঠে বসলেন বাঙলার মসনদে। নবাব সুজাউদ্দীন খুশি হয়ে মীর্জা মহম্মদ আলীকে 'আলিবর্দী' উপাধি দিয়ে রাজমহলের ফৌজদার করে দেন। সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পরে সরফরাজ খাঁ মসনদে বসলে, দুইভাই বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। 1740 সালে গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজকে হারিয়ে বাঙলার গদীতে উঠে বসেন শরফ উননিসার খসম একটা জবরদস্ত উপাধি নিয়ে: 'সুজা-উল-মুল্ক-হেসামুদ্দৌলা মহব্বৎ জঙ বাহাদুর'।

তখনো কিন্তু শরফ-উন্নিসা তার খসমকে রাজী করাতে পারেনি। তখন অবশ্য আলিবর্দীর বয়স চৌষট্টি, বেগম-সাহেবার চুয়ান্ন। আলিবর্দী বলেছিলেন, চিন্তার কী আছে? দাদুভাই তো সে সমস্যার সমাধান করেই রেখেছে!

আলিবর্দী যখন মসনদে বসেন, তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রের বয়স দশ।

তিন মেয়েরই ততদিনে বিয়ে হয়ে গেছে ওঁর ভাসুরের তিন ছেলের সাথে।

বেগম-সাহেবা সর্বক্ষণ তাঁর স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও! হয়তো সম্মুখ যুদ্ধে নয়, কিন্তু সমরক্ষেত্রের অদূরে মূল-শিবিরে অপেক্ষা করতেন, যাতে দিনান্তে স্বামীসেবা থেকে একটি দিনও বঞ্চিত না হতে হয়।

একবার এক কাণ্ড হল। বর্গীদের সঙ্গে নবাবের লড়াই চলছে। বর্গীনায়ক খবর পেল স্বয়ং বেগম-সাহেবা মাইল দশেক দূরে নবাবের মূল-শিবিরে অবস্থান করছেন। ওরা বুদ্ধি খাটালো—কোনক্রমে যদি বেগম-সাহেবাকে বন্দিনী করা যায় তাহলে নবাবকে কব্জা করা যাবে। বর্গীনায়ক একদল দক্ষ সেনা নিয়ে রণস্থল এড়িয়ে এগিয়ে চলল নবাবের অস্থায়ী ছাউনির দিকে। বর্গী নায়কের এই উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন নবাবের একজন সেনানায়ক, ওমর খাঁ। তিনি তরিৎগতি তাঁর পুত্রকে পাঠিয়ে দিলেন বেগম-সাহেবাকে স্থানান্তরিত করতে। সৌভাগ্যক্রমে বেগমের হেপাজতে ছিল একটি প্রকাণ্ড রণহস্তী—'লণ্ডা' তার নাম। বেগম একাকী পলায়ন করতে অস্বীকৃতা হলেন। তখন ওমর খাঁর পুত্র মোসাহেব খাঁ বেগম-সাহেবাকে হাওদায় উঠিয়ে স্বয়ং হস্তী পরিচালিত করে ঐ প্রকাণ্ড রণহস্তীর মারফতেই মারাঠা অশ্বারোহীদলকে পর্যুদস্ত করেন।[১]

> নবাব আলিবর্দী খাঁর রাজত্বের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা এইরূপে নবাব-বেগমের সহিত গাঢ়ভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। পত্নীর এই অসাধারণ প্রতিভার জন্য আলিবর্দী খাঁ রাজধানী হইতে তাঁহার অনুপস্থিতি কালে অনেক সময়ে বেগমের প্রতি রাজকার্যের দায়িত্ব প্রদান করিতেন। তজ্জন্য তিনি বাদশাহ্-দরবার হইতে বিশেষ আদেশ লইয়াছিলেন।[২]

আলিবর্দীর মৃত্যুসময় বেগম-সাহেবার বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি। তার পূর্বেই তাঁর তিন কন্যা বিধবা হয়েছে। বড় মেয়ে ঘসেটী-বেগমের নিজের কোন সন্তান ছিল না। সিরাজের ছোট ভাই আক্রামউল্লাকে তিনি পুষ্যি নিয়েছিলেন। আলিবর্দীর পর ঐ আক্রামকে শিখণ্ডী করে পর্দানসীন অবস্থায় বাঙলা শাসনের স্বপ্ন দেখছিলেন ঘসেটী। দুর্ভাগ্যক্রমে আক্রাম বসন্ত-রোগে বেমক্কা মারা গেল। তার শোকে কিছু দিনের মধ্যেই ঘসেটীর স্বামী নোয়াজিশ খাঁও মারা গেলেন। তার দু-মাস যেতে না যেতে মেজো মেয়ে হল বিধবা। বছর না ঘুরতে বেগম-সাহেবা নিজেই বিধবা হয়ে গেলেন।

চৌদ্দমাস নবাবী করে সিরাজ ফৌত হল পলাশী-প্রান্তরে যৌথ বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে। নিখিলনাথ সক্ষেদে লিখছেন—

> যে বেগমের পরামর্শে নবাব আলিবর্দী খাঁ সমস্ত রাজনৈতিক কার্য সম্পন্ন করিতেন এবং যাঁহার পরামর্শবলে নবাব আলিবর্দী খাঁর আদর্শ-শাসনে বঙ্গের প্রজাগণ বিঘ্নরাশির মধ্যেও শক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, যে অতুলনীয় রমণীরত্নকে দেশীয় ও বিদেশীগণ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেন, তাঁহারই অন্নে ও সংসারে প্রতিপালিত হইয়া

---

১) *রিয়াজ-উস্-সালাতিন*, পৃঃ ৩৩৭

২) *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*/নিখিলনাথ রায়/পৃঃ ৪৫.

মুর্শিদাবাদ

মীরজাফরের পুত্র 'ছোট-নবাব' মীরন তাঁহার প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিতে গেলে, দুঃখে ও ঘৃণায় হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে। আলিবর্দীর বেগম ও তাঁহার কন্যাদ্বয় ঘসেটী ও আমিনা এবং সিরাজউদ্দৌলার স্ত্রী ও শিশুকন্যাকে অযথা কষ্ট প্রদান করিয়া বন্দীভাবে রাখা হয়। বন্দী অবস্থায় তাঁহারা চূড়ান্ত যন্ত্রণা ভোগ করিলে, তাঁহাদিগকে মুর্শিদাবাদ হইতে ঢাকায় নির্বাসিত করা হইল।[১]

ঢাকায় তাঁদের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় বাস করতে হয়েছিল। মীরন ঐ সময় ঢাকার নায়েব যেশারৎ খাঁকে নির্দেশ পাঠায় ঐ মহিলাবৃন্দকে গোপনে হত্যা করতে। যেশারৎ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে স্বীকৃত না হওয়ায় মীরন তার একজন বিশ্বস্থ প্রিয়পাত্রকে মুর্শিদাবাদ থেকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়। তারই বন্দোবস্তে ঘসেটী আর আমিনা বেগমকে নৌকা থেকে নদীতে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়। নবাব আলিবর্দীর বেগম ও সকন্যা নবাব সিরাজের বেগম নিতান্ত ভাগ্যক্রমে রক্ষা পেয়ে যান।[২]

পরে দুই জমানার দুই ফার্স্ট-লেডি ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসার সৌজন্যলাভ করেন লর্ড ক্লাইভের হস্তক্ষেপের ফলে।[৩]

একটি সূত্রে দেখছি 1765 সালেও শরফ-উন্নিসা জীবিত ছিলেন। তাহলে তাঁর বয়স তখন উন-আশি। আর কোনও খবর পাইনি। বছর দশেক আগে শিল্পী ইন্দ্রদুগার, শিল্পী রথীন মৈত্র এবং শিল্পরসিক দ্বিজেন্দ্র মৈত্রের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলাম। নবাব আলিবর্দীর সমাধির নিচের দিকে একটি সমাধি দেখিয়ে স্থানীয় রক্ষক বলেছিল সেটি আলিবর্দী-মহিষীর কবর। উর্দু-হরফে কী লেখা ছিল পড়তে পারিনি, তবে তথ্যটা মেনে নিতে অসুবিধা হয়নি। এমন সতীসাধ্বীর ঠাঁই আর কোথায় হতে পারে? তার একটি স্কেচও করে এনেছিলাম মনে আছে।

এ বিশাল উপন্যাসটি যে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করেছি তার পৃথক পৃথক নামকরণও করা গেছে। বর্তমান পর্বের নাম : 'সতী'। সে প্রসঙ্গে তো এখনো আসা হয়নি। মুর্শিদাবাদ ছেড়ে এবার আমাদের ত্রিবেণী যাবার সময় হয়েছে, তাই মুর্শিদাবাদের 'সতী'-র কাহিনীটা এবার সেরে নেওয়া উচিত।

১) *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*/নিখিলনাথ রায়/পৃ: ৪7.

২) Holwell's *India Tracts*, pp—40-42, as also Vansittart's Narrative, Vol I, p. 153

৩) 'Sharaf-un-nisa and Lutf-un-nisa, and the latter's young daughter escaped the violent watery grave which ended the sorrows of Ghasiti and Amina They were released through the exertions of Lord Clive, the Governor of Bengal and came back to Murshidabad." *Begams of Bengal*, Brajendranath Banerji, pp. 36.

ঋষি গৌতম সত্যকামকে বলেছিলেন, 'তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।' পাণ্ডবাগ্রজ মহাবীর কর্ণও বলেছিলেন মানুষের জন্ম দৈবায়ত্ত, শুধু কর্মেই তার অধিকার। আমরা মুর্শিদাবাদের যে মহিমময়ীর কথা এবার আলোচনা করব সে সেই অর্থেই: 'সতী'!

তার পিতৃপরিচয় নেই, হয়তো পতিতালয়েই তার জন্ম; মৃত স্বামীর মাথা কোলে নিয়ে জীবন্তে অগ্নিশুদ্ধও হয়নি মেয়েটি। তার সম্বন্ধে নানা গুজব। না! তাকে নিয়ে গল্প ফাঁদব না। ইতিহাস হাৎড়ে ঠিক যেটুকু পেয়েছি—নিরপেক্ষ তথ্যসন্ধানীর মতো, শুধু সেটুটুই তোমাদের কাছে পেশ করব। কারণ তাকে নিয়ে অনেকেই অনেক ছবি এঁকেছেন—নবীন সেন-এর পলাশীর যুদ্ধ', ডি·এল· রায়ের 'বঙ্গে বর্গী', শচীন সেনগুপ্তের সিরাজদ্দৌলা'য় তা হয়েছে সর্বত্রই স্বনামে নয় অবশ্য। তবে নারীচরিত্রগুলি তারই জীবনের উপাদানে গঠিত। আমি সিরাজের বেগম-এর কথা বলছি লুৎফ-উন্‌নিসা।

সিরাজের কয়জন স্ত্রী তা নিয়ে নানামুনির নানামত। নথীপত্র ঘেঁটে আমাদের মনে হয়েছে আইনসম্মতভাবে দাদুর মতো নাতিও 'একপত্নিক'! মৌলভী ডেকে কলমা পড়ে একবারই সিরাজ বিবাহ করেছিলেন। আলিবর্দীর ইচ্ছা ছিল তাঁর দাদা হাজী আহম্মদের দৌহিত্রী, অর্থাৎ আতাউল্লা খাঁর কন্যার সঙ্গে দাদুভাই-এর সাদীর এন্তেজাম করবেন। কিন্তু আল্লারসুলের মর্জি তা নয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হবার আগেই হতভাগিনী ফৌত হল। তখন বাধ্য হয়ে আলিবর্দী তাঁর বিশিষ্ট অমাত্য মির্জা ইরাজ খাঁর কন্যা ওমজাৎ উন্-নিসার সঙ্গে সিরাজের সাদী দেন। এই বিবাহ মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়। তিন দিন ধরে মুর্শিদাবাদে আতসবাতি পুড়তে থাকে। মুতাক্ষরীনে সে বিবাহ-উৎসব বিস্তারিতরূপে বর্ণিত। সমকালীন ইতিহাসে সিরাজের দ্বিতীয়বার আনুষ্ঠানিক বিবাহের কোনও বিবরণ পাইনি। আন্দাজ হয়, দুজনে প্রায় সমবয়সী· ছিলেন। বিবাহকালে তাঁদের বয়স চৌদ্দ-পনের। ওমজাৎ-উন্-নিসার সন্তানাদি কী হয়েছিল তার হক-হদিস পাইনি, কিন্তু তিনি যে নিঃসন্তানা ছিলেন না, তার একটি প্রমাণ পেয়েছি। কারণ ইংরাজ-সরকারের দৃষ্টিতে তিনিই সিরাজের আইনসম্মত বেগম—সবচেয়ে বেশি মাসোহারা পাওয়ার হক্‌দারণী। Board of Revenue-এর Proceeding-এ 1780 খ্রীষ্টাব্দে দেখছি লেখা আছে "Miscellaneous Indend— Jageer, Jessore. Application from Umdat-ul Nissa Begam, daughter of Mirza or Nabab Muhomed Ariffee Kawn or Eratch Khan, and widow of Seroje-ul-dowlah, for continuance to her the jageers ... on the applicant's claim with a list of the family ... including the *daughters of the Nabab* for the support of ..."

এই সূত্র থেকেই অনুমান করছি, ওমদাৎ উন-নিসার গর্ভে সিরাজের দু-একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছিল। ওমদাদের সমাধি খোসবাগে আছে।

এই আইনসম্মত ধর্মপত্নী ব্যতিরেকে সিরাজের পর্যায়ক্রম্ শয্যা-সঙ্গিনী হিসাবে আরও তিনটি রমণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তার ভিতর অর্থমূল্যে ক্রীত ফৈজী ফয়জানের কথা ইতিপূর্বেই বলেছি। বাকি রইল দুজন। অনেকের সন্দেহ ঐ দুইজন এক এবং অভিন্ন। আমরা দুই তরফের যুক্তিই বিচার করে দেখব। একজন লুৎফ উন-নিসা, অপরজন মোহনলালের ভগিনী। বেভারিজ তো ভুল করে লুৎফ উন্-নেসা এবং ওমদাৎ উন্-নেসাকেই অভিন্ন বলে ধরে

নিয়েছিলেন। নিখিলনাথ যুক্তি দিয়ে সে ভ্রান্তি অপনোদন করেছেন (পৃঃ 118-19) কিন্তু মোহনলালের ভাগনী আর লুৎফ-উন্‌নিসা যে পৃথক এটা প্রমাণিত হয়নি।

> নিখিলনাথ বলছেন, মূল সায়র মুতাক্ষরীনে লুৎফ উন্নেসাকে সিরাজের *জারিয়া* বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। (মূল মূতাক্ষরীন ১৮১ পৃঃ)। *জারিয়া* শব্দে ক্রীতদাসী বুঝায়; কিন্তু জারিয়াগণ নিতান্ত হীনভাবের দাসী নহে। তাহারা যে সংসারে প্রবিষ্ট হয়, তাহার মধ্যে কেহ ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে ভার্যারূপে গ্রহণ করিতে পারেন। মুতাক্ষরীনের ইংরেজী অনুবাদক জারিয়াকে Bond-maid বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন, (Mutaqherin Eng. Trans., Vol I., p. 614).

এই তথ্যসূত্র অনুসারে লুৎফ উন্‌নেসা বাল্যে অথবা কিশোরী বয়সে ক্রীতদাসীরূপে নবাব আলিবর্দীর হারেমে প্রবেশ করে। আন্দাজে মনে হয়, সিরাজের চেয়ে বয়সে সে বছর চার-পাঁচের ছোট। সুতরাং লুৎফ-উন্‌নেসা যখন রাজান্তঃপুরে বয়ঃসন্ধি অতিক্রমণে পূর্ণ যুবতী হয়ে ওঠে তার পূর্বেই সিরাজ বিবাহিত, হয়তো ফৈজী-ফয়জান নিহত! লুৎফও অসামান্যা সুন্দরী। ফৈজীর মৃত্যুতে সিরাজের হৃদয়ও তখন শূন্য! আবার নিখিলনাথের ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার শরণাপন্ন হতে হল—

> লুৎফ উন্নেসার প্রতি সিরাজের অধিকতর ভালবাসার আর একটি কারণ ছিল। সিরাজ কোন একটি রমণীর সৌন্দর্যতরঙ্গে একবার আপনাকে ভাসাইয়াছিলেন। রূপে পাগল হইয়া যাহাকে তিনি হৃদয়ে স্থান দান করেন, সে কিন্তু ঘোর বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া দেয়। এই রমণীর নাম ফৈজী ফয়জান ··· ফৈজীর বিশ্বাসঘাতকতায় রমণীজাতির উপর সিরাজের আন্তরিক ঘৃণা উপস্থিত হয়। কিন্তু তিনি যখন লুৎফ উন্নেসার হৃদয় পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, তখন দেখিলেন যে, সে হৃদয় অটল! তাহার প্রবাহ কেবল একই দিকে প্রবাহিত হয়। ফৈজীর হৃদয় যেরূপ পৈশাচিক, লুৎফ উন্নেসার হৃদয় তদোধিক পবিত্র; তাই লুৎফ উন্নেসার প্রতি তাঁহার অগাধ ভালবাসা দেখিতে পাওয়া যায় এবং তিনিই সিরাজের প্রিয়তমা মহিষী বলিয়া ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়া থাকেন। (পৃঃ 116-18)

আমরা কিন্তু এখানে নিখিলনাথের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। না! কী কারণে লুৎফ সিরাজের প্রিয়তমা মহিষী হয়ে উঠেছিলেন সে বিষয়ে মহাপণ্ডিতের বিশ্লেষণে আমাদের আপত্তি নেই; কিন্তু প্রসঙ্গত তিনি ফৈজী ফয়জানের বিষয়ে যে বিশেষণ ও মন্তব্য আরোপ করেছেন সেখানেই আমাদের আপত্তি তবে নিখিলনাথকেও পুরোপুরি দায়ী করা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে দাঁড়িয়ে—তাঁর ঐ কথা মনে হতে পারে বটে। ওটা কালের দোষ!

কিন্তু আজ এই নারী প্রগতির যুগে আমরা কী দেখছি? ফৈজী কেন বিশ্বাসহন্তা? যে হেতু সিরাজ তার পূর্বতন মালিককে লক্ষ তঙ্কা দাম মিটিয়ে দিয়েছিল, তাই? নাকি উপপত্নীকে দামী-দামী অলঙ্কার কিনে দিয়েছিল বলে? শরফ-উন্‌নেসা যদি আলিবর্দীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতেন তাহলে সে-কথা উঠতে পারত, কারণ নবাব আলিবর্দী সমস্ত জীবনভর দ্বিতীয় কোনও রমণীকে বক্ষে ধারণ করেননি। কিন্তু সিরাজ? একাধিক পোষা পাখি ছিল তার। লাখটাকা খরচ

করে আরও একটা ময়না পুষেছিল সে ; ময়নাও প্রতিরাত্রে যথারীতি 'রাধাকৃষ্ণ' বুলি কপচেছে ; সাচ্চা কৃষ্ণভক্তি সিরাজ আশা করে কোন দাবীতে ? না, ফৈজীর হৃদয়ের ভালবাসা 'পৈশাচিক' ছিল না !

অর্থমূল্যে যে নবাবজাদা তার দেহটা কিনেছে তাকে দেহ দিতেতো সে কার্পন্যে করেনি ; কিন্তু যে মুগ্ধ-ভ্রমর ওর নারী-হৃদয়টিকে বিনামূল্যে কিনে নিয়েছিল তার প্রতি তো সে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। প্রেমের অমর্যাদা করে প্রাণভয়ে ক্ষমাভিক্ষা চায়নি একবারও ! মাথা খাড়া রেখে মৃত্যুবরণ করেছিল !

না, নিখিলনাথদাদু, আমরা জানি : অর্থমূল্যে নারী-দেহ আজও বিক্রীত হয়, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস : নারীর সাচ্চা প্রেম আনমোলমোতি, কোন যুগেই তা 'বিক্রীত'ও হয় না, 'বিকৃত'ও হয় না !

লুৎফ-এর কথায় ফিরে আসি।

আমাদের অনুমান, এটা ওর পিতৃদত্ত নাম নয়। কেন ? কারণ 'লুৎফ' মানে প্রেম ; 'উন' বোঝায় সেরা-মাত্রা ; superlative degree. আর 'নেসা' হচ্ছে পত্নী। ফলে 'লুৎফ-উন্‌নেসা' অর্থে 'প্রিয়তমা পত্নী'। ইতিহাস সিরাজের এই প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনীকে সর্বত্র বলেছে 'লুৎফ-উন্‌নেসা'। শুধু 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে সে 'আলেয়া'।

'নাম' হচ্ছে 'রূপের' সংজ্ঞা। কী দার্শনিকদের 'দর্শনে', কী চক্ষুষ্মানদের 'দর্শনে'। কিন্তু 'নাম' বলতে আরও একটা জিনিস তো বোঝায় ! যেটা সদ্যোজাত লাভ করে—বাপ-মা-দাদু-দিদা, নেহাৎ সমকালীন কবি-সাহিত্যিকের কাছ থেকে। আমাদের ধারণা, সিরাজের এই 'প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনী'র সেই অর্থে নামটা ছিল না : 'লুৎফ উন্‌নেসা'।

স্বীকার করি, এর পশ্চাতে কোনও ঐতিহাসিক তথ্য আমরা দাখিল করতে পারছি না। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, এটা সিরাজের দেওয়া আদরের ডাক, যা ইতিহাস মেনে নিয়েছে। সদ্যোজাত সন্তানের নাম কি কেউ দেয় : প্রেয়সী ?

তাহলে কী দাঁড়ালো ?

সিরাজের ঐ প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনীর পিতৃদত্ত নামটা পাওয়া যাচ্ছে না।

আশ্চর্যের কথা, মোহনলালের ভগিনীর নামটাও ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ! না তার পিতৃদত্ত নাম, প্রাকবিবাহ সংজ্ঞা, না সিরাজ-হারেমে প্রবেশ করার পর !

দ্বিতীয়ত মোহনলাল যে স্বীয় ভগিনীকে সিরাজকে উপহার দিয়েছিলেন, নিখিলনাথের বিশ্বাস "ইহা ইংরেজী অনুবাদকের কথা। আমরা মূল মুতাক্ষরীনে তাহার কোন উল্লেখ দেখিতে

পাই না।"[১] ইংরেজী অনুবাদে পাচ্ছি "This Mohonlal had made present of his sister to Seradjeddoulah which sister was a true Indian beauty; small and delicate. Nothing is more common amongst Indians, when they want to give an idea of surpassing beauty, than to say : *when she ate paan you might have seen through her skin the coloured liquid run down her throat and she was so delicate, as to weigh only twenty-two seers* (or about fifty lbs averdupois), which, by the by, was, they say, the weight of that beloved girl, which Seradj-eddoulah ordered to be immured alive."[২]

মুতাক্ষরীনের সাতশ সতের পাতায় মোহনলালের ভগিনীর এই রূপ বর্ণনার পাশাপাশি এবার পাঠ কর ছয়শ' চৌদ্দ পৃষ্ঠায় ফৈজী ফয়জানের রূপবর্ণনা :

> She was, says the amorous chronicle of that capital, complete Indian beauty of that right golden hue, so much coveted all over that region, and of that delicacy of person, which weighs only two and twenty seers, or about fifty pounds averdupois; a small delicate woman with a cool retract being the *summum bonum* of an Indian. This last girl, Faizy, had been a knecheni (dance-girl) at Delhi, from where *her attendance had been supplicated* (and this was the expression used), at the court of Moorshoodabad, the request being accompanied by no less than a draught of one lac of rupees"[৩]

এই দুটি বর্ণনা লক্ষ্য করে নিখিলনাথ বলছেন,

> মুতাক্ষরীনের অনুবাদকের মতে ফৈজী ও মোহনলালের ভগিনী স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দুইজনের রূপবর্ণনা ও কৃশাঙ্গত্ব একই হওয়ায় দুই জনকে অভিন্ন মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কেবল রূপবর্ণনা ও কৃশাঙ্গের কথা হইলে আমরা যথেষ্ট মনে করিতাম না। কিন্তু দুই জনেরই ওজন যখন বাইশ সের বলিয়া উল্লিখিত, তখন সেই ধারণা আরও প্রবল হইয়া উঠে। কৃশাঙ্গত্ব ভারতবর্ষে সৌন্দর্যের পরিচায়ক বটে, কিন্তু ঠিক 'বাইশ সের' ওজন যে প্রতিটি নারীর সৌন্দর্যের লক্ষণ, তাহা তো কখনো শুনা যায় নাই।

কথাটা ভাববার!

তাছাড়া আরও একটা কথা। ওমদাদ-উন্নেসার কবর আছে, লুৎফ উন্নেসার কবর আছে। দুজনেই সিরাজের মৃত্যুকালে জীবিতা। ফৈজী ফয়জানের মৃত্যু সিরাজের জীবিতকালে। কিন্তু

---

১) নিখিলনাথ, পৃ 117.

২) Muaqherin, Vol I, Note P: 717.

৩) Mutaqherin, Vol. I. Note, p. 614.

মোহনলালের ভগিনী? তার আদিও নেই অন্তও নেই—আছে যৌবনকালের উপস্থিতিটুকু! তাও নামহারা!

তোমরা আমাকে একটা পরামর্শ দেবে, দিদিভাইয়ের দল? গপ্লোটা যদি এইভাবে ফাঁদি?

মোহনলাল একজন বঙ্গজ কায়স্থ। বাড়ি পুরুলিয়া, বীরভূম অঞ্চলে। সে যখন কিশোর তখন তার ছোট বোনটিকে বর্গী দস্যুরা হরণ করে নিয়ে যায়, কিশোরী কিম্বা বালিকা বয়সেই। লাঞ্ছিতা মেয়েটি কোনক্রমে গ্রামে ফিরে আসে; কিন্তু সমাজ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হয়। মোহনলাল ক্ষোভে দুঃখে গ্রাম ত্যাগ করে চলে যায় মুর্শিদাবাদে, নাম লেখায় নবাবী ফৌজে। (এ পর্যন্ত নাট্যকার ডি· এল· রায় আমাদের স্বপক্ষে।) খবর পায় না, হাত-ফিরি হতে হতে তার অসামান্য রূপবতী ভগিনীটি গিয়ে উপনীত হয়েছে দিল্লীর রণ্ডি-বাজারে। সিরাজের হারেমে তাকে আবিষ্কার করে স্তম্ভিত হয়ে যায়! অর্থাৎ ফৈজী ফয়জানই মোহনলালের ভগিনী। এক ঢিলে আমরা তাহলে তিন-তিনটে সমস্যা-পাখিকে মেরেছি: কেন মোহনলাল ভগিনীর নাম পাওয়া যাচ্ছে না, কেন তার শেষ পরিণতি জানা যাচ্ছে না, কেন সিরাজ মোহনলালের ভগিনীকে উপপত্নী করে রাখা সত্ত্বেও মোহনলাল পলাশীর যুদ্ধে সিরাজপক্ষে অটল ছিলেন।

কিন্তু না! একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে! ফৈজী ফয়জানের ঐ অমানুষিক হত্যার পরেও কি মোহনলালের আনুগত্য অটুট থাকতে পারে?

তার চেয়ে বরং সহজতর হবে দ্বিতীয় বিকল্প মতটা মেনে নেওয়া:

> বেভারিজের মতে লুৎফউন্নেসা হিন্দুরমণী—মোহনলালের ভগিনী। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের দেওয়ান ফজলে রব্বী খাঁ বাহাদুরেরও এই মত। মুতাক্ষরীনে কিন্তু লুৎফ উন্নিসা জারিয়া অর্থাৎ ক্রীতদাসী বলিয়া অভিহিত···'রিয়াজুস্ সালাতীন' নামক গ্রন্থে মোহনলালকে কায়স্থ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। তাহা হইতে তিনি বাঙ্গালী ছিলেন কিনা বুঝা যায় না।

এতক্ষণে সমাধানে পৌঁছানো গেছে। আমাদের ইকোয়েশানটা হচ্ছে লুৎফা = মোহনলালের ভগিনী। হ্যাঁ, সে ক্রীতদাসী তো বটেই! দস্যুদ্বারা অপহৃত এবং সমাজ দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা হওয়ায়। এতক্ষণে মোহনলালের ভগ্নীর নাম, তার অন্তিম গতি সব জানা গেছে। নিজ ভগিনীকে সিরাজের উপপত্নীরূপে দেখা সত্ত্বেও কোন্ দুর্জ্ঞেয় হেতুতে মোহনলাল আজীবন সিরাজ-পক্ষে লড়াই করে গেল তাও বোঝা যাচ্ছে! আমার হাতে সময় নেই, এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্লটটা তোমাদের উপহার দিলাম। দেখ কিছু খাড়া করতে পার কিনা!

সিরাজের এই প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনী সূর্যমুখী ফুলের মতো সর্বক্ষণ একমুখী। উদয়াচলে সিরাজ যখন ফৈজীর প্রেমে বার্লাক-রক্তিম, তখন ঐ সূর্যমুখী ছিল কুঁড়ি। সিরাজ যখন যৌবনের মধ্যগগনে তখন তার চোখ ধাঁধিয়ে গেছিল দ্বিপ্রহরের মার্তণ্ডতেজে। তারপর যখন সেই দিনমণি ঢলে পড়লেন পশ্চিম গগনে, একে-একে সব সুদিনের বন্ধু তাঁকে ত্যাগ করে গেল—সেই যখন পলাশীর প্রান্তর থেকে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর আলির বক্ষবিদ্ধ খঞ্জরখানা চেপে ধরে মানসিক রক্তক্ষরণে অসুস্থ নবাব ফিরে এলেন মুর্শিদাবাদে, তখনো সে তাঁর পাশে।

> কোন কোন বিশ্বাসী বন্ধুর কথায় সিরাজ একবার নগররক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। আবার বিশ্বাসঘাতকেরা পরামর্শ দিল—পলায়ন কর, নতুবা তোমার নিস্তার নাই।

খুশ্‌রোজ

> সিরাজ অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার অনুগমন করিবার জন্য অনেককেই অনুরোধ করিলেন।... কেহই তাঁর সেই কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিল না। এমন কি তাঁহার শ্বশুর পর্যন্ত তাঁহার সহিত একপদ গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন না।[১]

গভীর রাত্রে সিরাজ একাকী রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। সঙ্গে শুধুমাত্র তাঁর দীর্ঘ তরবারি — দাদু-সাহেবের দেওয়া উপহার। তখন সেই ঘনান্ধকারে কে-যেন নবাবের হাতখানি চেপে ধরল। সিরাজ দেখলেন লুৎফা। ক্রোড়ে নিদ্রাগত চার-বছরের শিশুকন্যা উম্মৎ জহুরা!

নৌকাযোগে ওঁরা রাজমহলের কাছাকাছি পৌছান। বস্তুত তিন দিন তিন রাত্রি ওঁরা অভুক্ত ছিলেন। ঐ সময়ে ঘাটে নৌকা লাগিয়ে সিরাজ স্থানীয় দোকান থেকে কিছু চাল-ডাল-নুন কিনে আনতে যান। লুৎফা নদীতীরে ইটের সাহায্যে একটি উনান বানিয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন। দানাশাহ্ নামে এক ফকির নবাবকে চিনে ফেলে। গোপনে মীরজাফরের জামাতাকে খবর পাঠায়। সিরাজ সপরিবারে ধৃত হন। মুর্শিদাবাদে নীত হওয়ার পর মীরনের আদেশে মহম্মদী বেগ সিরাজের শিরশ্ছেদ করে। নবাব নাকি মৃত্যু-মুহূর্তে ঐ মহম্মদী বেগ-এর কাছে একটি অন্তিম আর্জি পেশ করেছিলেন — অজু করে শেষবারের মতো নামাজ পড়ার অনুমতি। মহম্মদী বেগ নবাবের এ আর্জি খারিজ করে খড়্গাঘাত করে!

তারিখটা: দোশরা জুলাই, 1757.

পরদিন একটি হাতির পিঠে সিরাজের মৃতদেহ চড়িয়ে সমস্ত মুর্শিদাবাদ শহরটা পরিক্রমা করানো হয়। মীরন না মীরজাফর কার হুকুমে জানা যায় না, উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট। সিরাজ-সমর্থকেরা স্বচক্ষে দেখে নিক লোকটা ফৌত হয়েছে।

> হাতি চলেছে। চল্‌তে চল্‌তে এক জায়গায় এসে থেমে গেল। তিন বছর আগে ঠিক এইখানেই সিরাজ হোসেন কুলী খাঁকে খুন করিয়েছিলেন। লোকে সভয়ে তাকিয়ে দেখল, সিরাজের দেহ থেকে দু-ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে এসে সেইখানকার মাটিতে পড়ল।[১]

গজায়ুর্বেদ-সংহিতায় বলা হয়েছে হাতির স্মৃতিশক্তি বিস্ময়কর। তিন বছর পরে রাজপথের সেই চিহ্নিত স্থানটি চিনে নেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব নয়, যদি ধরে নিই হোসেন কুলীর সঙ্গে তার দোস্তি ছিল। কিন্তু মৃত্যুর চব্বিশ ঘণ্টা পরে মৃতদেহ থেকে দু-ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে একথা চরক- সুশ্রুত কি কোথাও বলেছেন?

তারপর হাতিটাকে নিয়ে যাওয়া হল সিরাজের বাড়ির সমুখে। তিন বিধবাকে দৃশ্যটা দেখাতে — লুৎফ-উন্‌নেসা, আমিনা-বেগম আর আলিবর্দী-মহিষী বৃদ্ধ শরফ-উন্‌নেসা। শেষোক্তের অন্নেই মীরন প্রতিপালিত। স্ত্রী, মা, আর দিদা। এদের মধ্যে কে আর্তনাদ করেছিলেন, কে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, কে বে—পর্দা হয়ে পড়েন তার ঠিক হিসেব ইতিহাসে লেখা নেই। অতঃপর সিরাজের মৃতদেহটা বাজারে চকের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল।

---

১) *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*/নিখিলনাথ রায়/পৃঃ 122.

১) *পলাশীর যুদ্ধ*/তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়/পৃঃ 184.

মীর্জা জৈন-উল-আবেদীন নামে এক ওম্‌রাহ্ সাহস করে এগিয়ে এলেন। নিজ ব্যয়ে প্রাক্তন নবাবের দেহটা প্রাক্তনতর নবাবের সমাধির পাশে গোর দেবার ব্যবস্থা করলেন। খুশবাগে, দাদু আর নাতি পাশাপাশি এতদিনে নিশ্চিন্ত হয়ে পশ্চিমদিকে মুখ করে শুয়ে আছেন। বর্গী অথবা বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির কব্জার বাইরে।

মীরজাফর হল নয়া-নবাব। ক্লাইভের হুকুমে চলতে হত বলে লোকে আড়ালে তাকে যে খেতাবটা দিয়েছিল সেটাও ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রেখেছেঃ ক্লাইভের গাধা! সে মসনদে চড়ে বসার পর 'ছোট-নবাবসাব'—মীরন, লুৎফ উন্‌নিসার কাছে দূতী প্রেরণ করে, নিকার বিনীত প্রস্তাব। শোনা যায়, লুৎফ উন্‌নেসা অকুতোভয়ে দূতীকে জানায়, তোমার মালিককে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল, চিরটাকাল যে হাতির পিঠে সওয়ার হয়ে কাটিয়েছে সে কি আজ গাধার বাচ্চার পিঠে চাপতে পারে? ছিঃ!

মীরনের ক্ষমতা ছিল, না লুৎফ-এর ঘরের জানলা-দরজাগুলো পাকা ইট গেঁথে বন্ধ করে দেবার; কারণ তার বাপের গদী ততক্ষণে টলমল করতে শুরু করেছে। অনেক অনেক ঘুষের টাকা দেওয়া যে বাকি!

এরপর মৃত্যুকাল পর্যন্ত (1790) লুৎফ-উন্‌নেসা বেগম-সাহেবা প্রতিদিন সন্ধ্যায় সিরাজের কবরের উপর একটি করে চিরাগ জ্বালিয়ে যেতেন, ক্লাইভের হস্তক্ষেপে ঢাকা থেকে যখন মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন অতি বৃদ্ধা দিদি-শাশুরীর সাথে। 1782 সালে একত্রিশে আগষ্ট তারিখে ফর্স্টার নামে একজন ইংরেজের লেখা একটি চিঠি আবিষ্কৃত হয়েছে; তিনি বিলাতে তাঁর স্ত্রীকে লিখছেন[১], সন্ধ্যাবেলা তিনি প্রাক্তন নবাবের সমাধি দেখতে গিয়ে হঠাৎ থমকে গিয়েছিলেন; দূর থেকে নজরে পড়ে পর্দানসীন এক বৃদ্ধা আর একটি যুবতী চিরাগ হাতে ঐ সমাধির দিকে অগ্রসর হয়ে আসছেন। তাঁদের জীর্ণ, ধূলিমলিন বোর্খা! তাঁরা কে তা উনি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন।

এর সাত বছর পরে গোলাম মোস্তাফা এক সন্ধ্যায় দৃশ্যটা দেখতে পান, 1789 খৃষ্টাব্দে। সেদিন লুৎফা ছিলেন একলা। দূর থেকে প্রত্যক্ষদর্শীর নজরে পড়ে—সিরাজের জীর্ণ-সমাধি-প্রস্তরের উপর জনৈকা বিধবা লুটিয়ে পড়ে কাঁদছেন।[২]

বাল বিখারকে টুটি কব্‌রোঁপো
জব কোই মেহেজবীন রোহ্‌তি হ্যয়
মুঝকো অখসর খয়াল আতা হ্যয়:
মৌৎ কিৎনি হাসিন হোতি হ্যয়![৩]

---

১) *Journey from Bengal to England*, Forster p. 10.

২) *Mutaqherin*, Vol I., p. 643.

৩) 'বিকীর্ণমূর্ধজা' অবস্থায় ভাঙা কবরের উপর/যখন কোন বিধবা লুটিয়ে পড়ে কাঁদে/আমার তখন অকস্মাৎ মনে হয়: আহা! মৃত্যু কী সুন্দর।